

শ্রী  
স্ব.স্ব.স্ব.

শ্রী শ্রী গুরুবে নমঃ ।

# মাহত

মাসিক পত্র



ষষ্ঠ খণ্ড



প্রথম ভাগ

( সন ১৩২১ সালের কাঠিক হইতে ১৩২১ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত )

ইণ্ডিয়া প্রেস—২৭ নং মিডল রোড, ইটালি, কলিকাতা হইতে  
ত্রৈকয়নাথ বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

# বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

## ১। আলোচনা

|                                                      |      |                                                       |      |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|
| অষ্ট্রিয়ার বেদনা                                    | ১৪   | টোলে শিক্ষা-সংস্কার                                   | ২১১  |
| অন্তঃফার্ড-কেব্রিজের মধ্যে                           | ১১৮  | তুর্পণ                                                | ১০৮৭ |
| অন্তঃস্রাব্য পূবা                                    | ৩০২  | তুর্ধাকথিত রেসিডেন্সিয়ালে বিশ্ববিদ্যালয়             | ১১৮  |
| অনৈতিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন-<br>বিষয়ক প্রস্তাব | ৪০১  | দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রবাসী ভারত সন্তান                  | ৪০২  |
| আইবিপ স্থাপতির বদেই আন্দোলন                          | ৬    | দক্ষিণাভ্যাস শিক্ষানুষ্ঠান সমিতি                      | ৪২৮  |
| আচায়া মঙ্গলীশচন্দ্রের বাণী                          | ১০২৪ | দর্শ সংস্কারের প্রভাব                                 | ১১৭  |
| আর্দেলেও পল্লীর সমবায় বোঝান                         | ৩০৪  | নব্যকেন্দ্রিক আন্দোলন                                 | ৮    |
| আমাদের জাতীয় উন্নতি ও জাতীয়<br>চরিত্র              | ৩১৬  | নব্য নেপোলিয়ন ও বর্তমান রাষ্ট্রমণ্ডল                 | ১৪   |
| আর্দেলে সম্মিলন                                      | ৪০০  | নব্য বাঙ্গালীর উপনিবেশ                                | ৪২৪  |
| ইংল্যান্ডের ইতিহাস                                   | ১১   | পল্লীর আদর্শ সেবাশ্রম                                 | ২১৬  |
| ইতালীর চিত্রকলা কেন্দ্র                              | ১১৪  | পূজা                                                  | ১০৮১ |
| ইংল্যান্ডে প্রাচীন-সময়                              | ২১৬  | পার্বিক দাতিস কমিশন                                   | ৪০৩  |
| ইংল্যান্ডের ভারতীয় যুবক সম্মেলন                     | ৪০৪  | পাটনা কলেজ চাপকা-সমিতি                                | ১০২৩ |
| ইন্দোরে কেশব-শিল্প                                   | ৩০৭  | পাক্ষাত্য ইতিহাস অনৈক্য ও পরাধীনতা                    | ১০   |
| উপদেশ-সংগ্রহ                                         | ১০২১ | পাক্ষাত্য সমাজে প্রাচীন-চিত্রকলা                      | ২২১  |
| ওলন্দাজ চিত্রশিল্প                                   | ১১৬  | প্রাচীন ও পাক্ষাত্য পরিবার                            | ১৭   |
| কংগ্রেস পরলোকগত বাঙ্গালী                             | ৩০৮  | প্রাচীন ও পাক্ষাত্য হুমায়ূর শিল্প ...                | ১১৪  |
| কলিকতা বহন বিভাগ                                     | ১২৬  | প্রাচীন চিত্র প্রভাব                                  | ১১২  |
| কেন্দ্রিক আদর্শের পুনরুত্থান                         | ৩    | বর্তমান ইউরোপ ( ১৪৪৩-১৮৭০ বৃহৎ )                      | ১০   |
| কেন্দ্রিক অধ্যয়ন ও রোমান্টিক আন্দোলন                | ৪    | বর্তমান ভারতের নৈতিক                                  | ৪০৬  |
| কেন্দ্রিক বীরসাবা ও খুইবখ                            | ৪    | বর্তমান সার্বভৌম পরিষদ                                | ৪০৮  |
| কেন্দ্রিক, গ্রীক ও হিব্রু                            | ৪    | বড়লোক                                                | ৪০৬  |
| কেন্দ্রিক সভ্যতার স্থিতি                             | ৬    | বড় লাইটের ব্যবস্থাপক সভা                             | ৪০০  |
| কংগ্রেস কথা                                          | ৩২২  | বড়োয়া ও মহীশূর                                      | ১০৮২ |
| সোমলে ছাত্র-সমিতি                                    | ১০২২ | বাঙ্গালার একজন পরলোকগত হুমায়ূর                       | ৪০২  |
| প্রথমাল-প্রচার                                       | ২২২  | বিলাতের জনসাধারণ                                      | ২    |
| চীন ও জাপান                                          | ৪০২  | বিংশ শতাব্দীর কৃষিক্ষেত্র—উৎপাদন পদ্ধতি               | ১২   |
| ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠান                               | ৩১১  | বিশ্বাধিকার-ম্যাজিন-মেট্রনিকের ইউরোপ<br>( ১৮৮০-১৯১৪ ) | ১৪   |
| ছাত্রজীবনের যুগ ধ্রুং                                | ৩১২  | বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রের<br>লাভালাভ     | ১১৮  |
| অগস্ত্যের শাস্তি                                     | ৩১০  | বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের প্রবস্থা                       | ১১২  |
| অদর্শাধারণের যুগ                                     | ১০২২ | বিলাতের কৃষিশিল্প                                     | ২১২  |
| জাতীয় অবস্থা                                        | ১০৮৬ | বিলাতি সমাজে ভারতীয় ঐতিহাসিক                         | ২১২  |
| জাপানের বৈষয়িক উন্নতি                               | ২২৩  | বিলাতের ভারতবাসী                                      | ৪০১  |
| জীবন কথা                                             | ৪২৭  | বিলাতি যুবক জীবন                                      | ৪০৭  |
| জীবনের কাহ—কংগ্রেস                                   | ৪২২  | জীবিতের ভারতবাসী                                      | ৪১৪  |
|                                                      |      | ভারতের পুরাতন শিল্পকলা                                | ১১৬  |

|                                 |     |                           |
|---------------------------------|-----|---------------------------|
| ভারতের চক্রম লক্ষ্য             | ১২৩ | শিক্ষা ও শাসন             |
| ভারতের ব্যক্তিগত                | ২০২ | সমাজ ও চিত্রকলা           |
| ভারতীয় ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ        | ১১২ | সভ্য ও শাস্ত্র            |
| ভারত সেবক সমিতি                 | ৫০৪ | সমাজ বিজ্ঞান              |
| মধ্যযুগের ইথিওপিয়া             | ১১০ | মতলভ্য ও বিকলতার প্রভাব   |
| মহাশয় গোবিন্দ বানার্ডের শিক্ষণ | ৪২৮ | সভ্য বাস ও গ্রামভাগ       |
| মাত্রাঙ্কে শিল্পসভা             | ৩০২ | স্বদেশী শিল্পের উন্নতি    |
| রাষ্ট্রমণ্ডলে ওলটপালট           | ১৫  | সাহিত্য সংরক্ষণ-নীতি      |
| লড়াই বিজ্ঞান                   | ১০  | সাহিত্য-পরিচয়            |
| লওনে শোনার ভারত প্রতিনিধি       | ৪০৩ | সাহিত্যে স্বপ্নবাস        |
| লোক সাহিত্য ও আটচল ভাবুকতা      | ১   | স্বদেশী মনোবাস            |
| শাসনতত্ত্ব                      | ১২১ | সাহিত্য-শাসন              |
| শাসন বিজ্ঞান ও মানব প্রকৃতি     | ১২২ | ভেদমণ্ডলের শ্রীগোবিন্দ মঠ |
| শিল্পসংগে মৌলিকতা ও পার্থক্য    | ১১১ |                           |

## প্রবন্ধ

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| আত্মজ্ঞানের সমস্যা পক্ষী ভাবুক কবি জর্জ রাসেল                                        | ১৭৩          |
| আত্মবীক্ষণিক উদ্ভিদ তত্ত্ব প্রবেশিকা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিতনারায়ণ মিত্র বি, এ.            | ১৮৩          |
| আত্মার্থ ও পরার্থ—শ্রীযুক্ত ব্রজচাঁদী দেবব্রত                                        | ৩৪৫          |
| আসামের পথে—শ্রী                                                                      | ৪৪২          |
| কয়েকটি বিভিন্ন জামগাভের পরিচয়—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত                         | ৩৭৬          |
| স্টল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার                               | ৩৪১, ৫১৫     |
| কালিদাসের আবির্ভাব কাল—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ                                        | ১৫২          |
| গুরুগুরু—শ্রীযুক্ত বিদ্যেশ্বর শাস্ত্রী                                               | ২২           |
| গো দুহ—শ্রীযুক্ত কেশবনাথ চৌধুরী                                                      | ৩৬৩          |
| আগ্রস্ত কিশোরী—শ্রীযুক্ত আতিকর দাস                                                   | ৫২৬          |
| আন্তর্জাতিক—সংস্কার ভেদ—শ্রীযুক্ত অম্বোনাথ বসু কবিশেখর                               | ১            |
| নবা বিলাতের রত্নমণ্ড ও নট্যকলা—শ্রীমদ্রব                                             | ৪            |
| নাট্য সাহিত্যে "অমর মঞ্চ"—শ্রীযুক্ত পদমান কাব্যগ্রীর্থ                               | ৩৮৩, ১       |
| নেগ্রোজাতির কণ্ঠস্বর—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ.                               | ২৭, ১২২, ২৪৫ |
| পল্লীগ্রামে দুহ-সমস্যা—শ্রীযুক্ত অম্বোনাথ বসুদাস                                     | ৪৬১          |
| প্রভাববর্তন—শ্রীযুক্ত বোমেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়                                   | ৩৪৮          |
| প্রবু নিভানন্দ ওষধীর জগদ্ব্যবহার চর্চনা—শ্রীযুক্ত রামভাগ্য রায়                      | ১৫২          |
| বকীর জননীর শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বৈদ্যপ্রসাদ রায়                                         | ৩২২          |
| বকীর সাহিত্য-পরিচয় ও বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—শ্রীযুক্ত বোমেন্দ্রকুমার মৃতকী |              |
| পর্বা                                                                                | ৫৪১          |
| বঙ্গ প্রায়ন—শ্রীযুক্ত অম্বোনাথ দাস গুপ্ত এম, এ.                                     | ৩১২          |
| ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও সামাজিক বৈষম্য—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সাহিত্যী ...                    | ৩২০          |
| বন্ধে রেশম ও রেশম শিল্পের অবনতিগুণ-সংক্ষেপে নানা কথা—শ্রীযুক্ত রামভাগ্য রায়         | ৫৬৮          |
| বাদকী-লীলা—শ্রীযুক্ত ব্রজচাঁদী দেবব্রত                                               | ৫৮০          |
| বিবাহ-বিধি—শ্রীযুক্ত অম্বোনাথ দাস চিত্রকলা                                           | ৫৬১          |

বিবাহ-বিধি—শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈষ্ণব  
 বিলাতে সমাজে কাপ্তান ও কোম্পারেরটিব আন্দোলন "বনবিভাগ"  
 বিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণকোষ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ,

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| (ক) উনিবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক                                       | ২৮       |
| (খ) দক্ষতা কাঠকে বলে ?                                                | ৩৩       |
| (গ) লড়াইয়ের খরচ                                                     | ৩৪       |
| (ঘ) যুদ্ধকালে টাকার বাজার                                             | ৩৭       |
| (ঙ) পাণ্ডা ত্রৈলোক্যের হতুগ                                           | ৩৯       |
| (চ) লড়াইয়ের সময়ে অসহযোগী সম্প্রদায়                                | ৪২       |
| (ছ) আমরানী রক্তানী ও হালালী                                           | ৪৬       |
| (জ) যুদ্ধান্তে নগর দৃশ্য                                              | ৪৯       |
| (ঝ) পশুপক্ষীগণের সামরিক ও সাধারণ                                      | ৪৪       |
| (ঞ) লড়াই মওল ও আমেরিকার যুদ্ধ-দ্রষ্টা                                | ৪৭       |
| (ট) বিলাতে বৈদেশিকতার আন্দোলন                                         | ৬১       |
| (ঠ) বর্তমানে কৃষ্ণকোষের যুগ্মত্ব                                      | ৬৬       |
| (ড) লড়াই মওলের নিয়ম                                                 | ৬৮       |
| (ঢ) চুক্তির নিবারণের প্রকাশ                                           | ৭২       |
| (ণ) যুদ্ধকালে সমাজ পেশা                                               | ৭৬       |
| (ত) ত্রিধা বিভক্ত গোলাও                                               | ৮২       |
| (থ) অসহযোগী সমাজ                                                      | ৮৬       |
| ভাষালোকের কৃষি—শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার                              | ৪৩০      |
| ভারতীয় ভাষার বিশদগণ্য গঠন—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস                   | ২৮৭      |
| ভারতের একক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদ দেব এম, এ,                    | ২৫       |
| ভারতীয় প্রাচীণ ও নৃপতিবর্ণের প্রতি—শ্রী শ্রীমান ভারত সঙ্গীতের সঙ্গীত | ১০৩      |
| ভূগোলিক—ভূগোল না জমিদার ?—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ,       | ২১       |
| মনোবৃত্তি ভেদ-বহন—শ্রীযুক্ত বলরাম বল্লভ-বেদান্ত কবিরত্ন               | ৪৬৭      |
| মহারাষ্ট্রের বর্তমান কৃতি সন্তানগণ—শ্রীযুক্ত অম্বালাল বসু             | ৪৭১      |
| মুগ্ধগণ কৃষ্ণকোষের দুই একজন ধনকুবের—শ্রীযুক্ত তারকানাথ মুখোপাধ্যায়   | ৪৪৩      |
| নৌকিক ধর্ম শ্রীমতী নারায়ণ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়            | ১৬৫      |
| শস্যক্ষেত্রে লব্ধ সাহা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার                      | ২৩১      |
| সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বেবেগমণ্ড                           | ৫১১      |
| সমাজ বিজ্ঞান—শ্রীশ্রীকান্ত                                            | ২৬৫      |
| স্বকবি ৮৩৩নিকায় ও তাঁহার কবিতা—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ,         | ২৬২, ৩৩২ |
| স্ব-ধর্ম—শ্রীযুক্ত ব্রজচাঁদী বেবেগমণ্ড                                | ১৭৮      |
| হিন্দুট্রাষ্ট—শ্রীযুক্ত তারকানাথ মুখোপাধ্যায়                         | ১৪৭, ২৮৬ |

## মহাভারতের বাণী

|                              |     |                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|
| অমৃতের অহুদ্যান              | ১০৪ | গোবিন্দ কেন বৈদ্যনাথস্বামী |
| "ক"                          | ৩০১ | হইচাঁদিলেন                 |
| কবিকল্প চৌর্য বর্তমান স্মৃতি | ৪৮৭ | শো-ভাতির উত্তম সাধন        |
| কবি                          | ৩২৭ | একান্ত আব্রাহাম            |



জাতবিশেষ জাতিয়া কথা  
 অশ্রুভূমি  
 স্মরণীয় মন অলুকা  
 দেশভাষে পাণশ্রোত  
 ধর্মের সংসার  
 পরীক্ষিত মুক্তিযোগ  
 পূর্ববঙ্গে শিল্প শিক্ষা  
 বর্তমান অবস্থার আমাদের কর্তব্য  
 বাঙ্গালীর কলক  
 বিশ্ব বিজ্ঞানচ ও বঙ্গভাষা

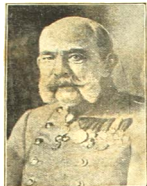
বিশ্বেশ্বরতাকীর গ্রন্থটি  
 বাঙ্গালীর কলক  
 মধ্য বিস্তার অন্ন সমস্ত  
 মধ্যম দিনের বাণিজ্য সমৃদ্ধি  
 যুদ্ধে ভারতের লাভ  
 বাট অল্পসম্মানসম্মতি  
 শ্রীমদ বুদ্ধাবন  
 সারা দেশের উৎসাহন  
 বাহ্য সম্বন্ধে মলাকা  
 চন্দ্রের অধিকার

## পরিশিষ্ট

|                      |         |                     |         |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| জৈমিনীর উপদেশ সূত্রম | ১১০—১২০ | মার্কণ্ডেয় পুরাণম্ | ৪৪১—৫১২ |
|                      | ১২১—১৩৮ |                     | ৫১৬—৫৯০ |
|                      | ১৩৯—১৫৬ |                     | ৫৯১—৬৬৮ |
|                      | ১৫৭—১৭৪ |                     | ৬৬৯—৭৪৬ |
|                      | ১৭৫—১৯২ |                     | ৭৪৭—৮২৪ |
|                      | ১৯৩—২১০ |                     | ৮২৫—৯০২ |

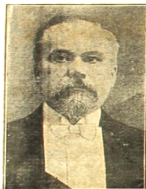
## চিত্রসূচী

|                                        |     |                                   |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| বিশ্ব শতাব্দীর কৃষ্ণক্ষেত্রে বৃহৎসপ্তম | ১   | স্বর্গীয় অথোবনাথ চট্টোপাধ্যায়   |
| আমাদের সময়-পটের লর্ড-কিটেনবার         | ২০২ | বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির      |
| মহাযজুর্গোপাধ্যায় বাবাল দাস স্মারক    | ৩০৩ | নিম্নোক্তচিত্র কণ্ঠবীর দুর্কার টি |
| বিশ্বনাথ বৃথোপাধ্যায়                  | ঐ   | গুণালিঙ্গ                         |
| মহীন্দ্রনাথ দাস কবিগণাকব               | ঐ   | মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোপালে          |



ভারত-সভ্যটি ইংলণ্ডের

অট্টিয়া হান্সারী সভ্যটি



ফরাসি প্রেসিডেন্ট

রুশিয়া সভ্যটি

বেলজিয়ামের রাজা



সার্কিয়ার ভূরূপের রাজা

ভ্যার বর্তমান রাজা

# গাহন

—

“বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশে সিন্ধু-গঙ্গাসঙ্গমভূমিতে। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্ভূমি.....সামান্যতঃ-প্রণেতা কপিলদেব অত্র সকল দেশ ভ্রমণ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহারই অংশাবতারগণ ছায়দর্শন বাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুদ্ধিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হইলেন এবং ত্রীতীয়ায়ুধপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—মুকুন্দানন্দস্বামীর তাত্ত্বিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুদ্রাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সমুদ্র তন্ত্রাদিগণ যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সমুদ্রাদিগের প্রতিও সেই কার্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাদিগেরই দেশে পূর্বে শিত্বেগের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।”

৩ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( “পুণ্ডালিক” )

৬ষ্ঠ বর্ষ

৬ষ্ঠ বর্ষ

কার্তিক, ১৩২১

প্রথম সংখ্যা।

## আলোচনা

### ১। সাহিত্যে স্বপ্ন-রাজ্য

আদর্শগোষ্ঠের রাষ্ট্রের স্বরাজ-আন্দোলনের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক আর একটা আন্দোলন আইরিশ সমাজের অভ্যন্তরে এখন চলিতেছে। তাহার প্রভাবে সমগ্র ইউরোপের চিন্তামণ্ডল এবং জীবন-ভঙ্গ প্রবল রূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে। সেদিকে ইউরোপের বেশী

লোক এখনও দৃষ্টি দেন নাই। এনিয়াসও তাহার কোন পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সমীপবর্তী ভবিষ্যতে পাক্ষাত্য জগতে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হইতে চলিয়াছে তাহার পুষ্টিবিধান করে আদর্শগোষ্ঠের এই চিন্তা-ভরণ বিশেষ শক্তি প্রদান করিবে।

ইউরোপের এক নগণ্য অবনত বীণের রুম্ব মধো পাক্ষাত্য-জগৎ-সংস্কারের বাণী

উন্মিত হইয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যের  
নিতান্ত পদদলিত প্যারিস সমাজেই তাহার  
মুক্তিনাভা, স্বর্গের পথপ্রদর্শক “ভগবৎ পুত্রের”  
আবির্ভাব হইয়াছিল। দুনিয়ার সর্বত্রই—

“বন্ধন পীড়ন দুঃখ অশ্রুমান যাকে  
হেরিগা তোমার মুক্তি কর্ণে ঘোর রাখে  
আখ্যার বন্ধনহীন আনন্দের গান,  
মহাতীর্থবাজীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ  
আশার উল্লাস, গভীর নির্ভর বাণী  
উদার মুক্তার।”

এই জীবনের আন্দোলন, আনন্দের  
আন্দোলন, মহাপ্রাণতার আন্দোলন, এবং  
আশাবাদের আন্দোলনের তুলনায় রাষ্ট্রীয়  
“হোমকল-আন্দোলন অতি তুচ্ছ। কিন্তু  
এই সকল আন্দোলন আদর্শগে আছে  
বলিয়াই আজ আইরিশ জাতির স্বরাজ-প্রচেষ্টা  
জগতের গৌরব-সামগ্রী।

আদর্শগের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নূতন নহ।  
উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বহু অভিনয় হইয়া  
গিয়াছে। যথং আজকাল ইহা লইয়া বাক্য-  
বৃত্ত বেকি হইতেছে। পূর্বে এত বাক্যবিত্ত ও  
হইত না। অনেক সময়েই ইংল্যান্ডে রাক্ষসী  
মুদ্রি দেখা বাইত। তবাপি স্বরাজ-আন্দোলনে  
আদর্শগের প্রাণ ছিল না,—তাঁহাতে আইরিশ  
জাতির স্বপ্ন দেখিতে পাইতাম না। বিংশ-  
শতাব্দীতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখিতেছি  
তাঁহা আইরিশ জাতীয়তায় “বপু দিয়ে তৈরী  
সে যে স্বাধীন দিয়ে বেগা।” ইংল্যান্ড বর্তমান  
হোমকল-আন্দোলনের বিশেষত্ব। কবি  
হীটসের (Yeats) ভাব-রাশ্য নিয়ে বর্ণিত  
হইতেছে :—

“All world be well  
Could we but give us wholly to the  
dreams,  
And get into their world that to  
the sense,  
Is shadow, and not linger wretch-  
edly  
Among substantial things ; for it  
is dreams,  
That lift us into the flowing  
changing world

That the heart longs for. What is  
love itself,  
Even though it be the highest of  
light love,  
But dreams that hurry from beyond  
the world,  
To make low laughter more than  
meat and drink,  
Though it but set us sighing.”

রীটস্ “The Land of Hearts De-  
sire” লিখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী  
রাসেল (Russell) “The Divine Vision”  
লিখিয়াছেন। রচনাষয়ের নামেই আন্দোলন  
বিষয় বুঝিতে পারা যায়। রাসেলের কথা  
“The spirit in man is not a product  
of nature, but antecedes nature,  
and is above it as sovereign, being  
of the very essence of that spirit  
which breathed on the face of the  
waters, and whose song flowing  
from the silence as an incantation,  
summoned the stars into being out  
of chaos. To regain that spiritual  
consciousness, with its untramm-  
elled ecstasy is the hope of every  
mystic. That ecstasy is the poetic  
passion.”

এই স্বপ্ন-প্রচারক ডাব্লুকেবা আদর্শগের  
ভবিষ্যৎ স্বপ্নগুণ চিত্রিত করিতেছেন। ইংল্যান্ড  
স্বপ্ন অনাক্ষত্ব অনীমের উপাসক—এবং  
জগতের নরনমায়ে সেই অদৃষ্ট অজ্ঞাব্য  
বিষয়ের বার্তা প্রচলিত করিতে চাহেন।  
ইংল্যান্ড বর্তমান মানবকে অমরতার তত্ত্ব  
শিখাইতেছেন—বন্ধনহীন বাধাহীন মহত্ব  
বিকাশের পথ দেখাইতেছেন। ইংল্যান্ডের  
বিবেচনার দৃষ্টমান জগতের ভোগ্য বস্তু  
সমূহই সংসারের একমাত্র পদার্থ নহ—এগুলি  
বিরাট সত্যের আবরণ মাত্র। এই বাহ্য  
সৌন্দর্য, বাহ্য জ্ঞান, বাহ্য দৃষ্টির অন্তরাল তেজ  
করিয়। ক্রমশঃ অন্তঃসৌন্দর্য, হৃদয়দৃষ্টি,  
অন্তদৃষ্টি লাভের অস্ত্র সর্বদা প্রস্তুত থাক।  
ইংল্যান্ডের জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য। বাহ্য-

যাত্রেয় ভগ্নই ইহারা এই আদর্শ ও লক্ষ্য উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন। “বিভ্রমাহ-  
নৃতমমুত্তে”—তবকে ইহারা পরম সত্য  
বিবেচনা করেন। রাসেল গাহিতেছেন :—

“Now when the giant in us wakes  
and broods,  
Filled with home-yearnings, drow-  
sily he flings  
From his deep heart high dreams  
and mystic moods,  
Mixed with the memory of loved  
earth things  
Clothing the vast with a familiar  
face ;  
Reaching his right hand forth to  
great the starry race.  
Nearer to Thee, not by delusion  
led,  
Though there no housefires burn  
nor bright eyes gaze  
We rise, but by the symbol  
charioted,  
Through loved things rising up to  
Love's own ways  
By these the soul unto the vast has  
wings  
And set the seal celestial on all  
mortal things.”

### কেন্টিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন

এই তথ্যই আইরিশ জাতির প্রাচীন জীবন প্রতীকিত ছিল। সে জীবন আশ্রয় বহননি নির্দোষিত হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া অনেক কড় বহিয়া গিয়াছে। এতদিন রক্ষিত চূর্ণের তলদেশে সেই জাতীয় জীবনবলী কতর স্রাব প্রবাহিত হইতেছিল। সত্যি নব্য আদর্শের তারুণ্য সেই অতীত স্মৃতি আগাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার ফলে প্রাচীন জীবনের সরলতা, স্বাভাবিকতা,

দৃঢ়তা, ওজস্বিতা এবং ভগবৎপরাদেশতা স্বাভাবিক নরনারীমুগ্ধের স্মৃতি প্রাপ্তি করা হইতেছে।

এই প্রাচীন আইরিশ আদর্শের পুনরা-  
বর্তনের নাম Celtic Revival. নব্য  
আধুনিক অর্থশাস্ত্র, নৃত্য বেঙ্গলিয়ামের  
মেট্রোলিড, অবনত পোল্যান্ডের নীটেনেতব,  
নব্য ফরাসীর বার্গসো বর্শন, এবং যুবক  
আইরিশের “ব্রেন্ডী” আন্দোলন বর্তমান যুগে  
নবীন ভগ্ন গঠনের সূত্রপাত করিতেছে।

প্রাচীন কেন্টিক-সাহিত্যের আদর্শ ইতি-  
পূর্বে অনেকই প্রচার করিয়াছেন। জার্মান  
অধ্যাপক মেয়ার এবং ফরাসী লেখক রেন।  
এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যসেবীদিগের দৃষ্টি  
আকর্ষিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সমালোচক  
ম্যাক্স জার্মান্ডও কেন্টিক সাহিত্যের গৌরব  
কীর্ণন করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যবিষয়ক  
ইতিহাস গ্রন্থেও কেন্টিক প্রভাবের আলো-  
চনা যথেষ্ট যথেষ্ট দেখিতে পাই। প্রাচীন  
কেন্টের প্রকৃতিপূজা, তাহার আত্মিক  
ভগবদ্ভক্তি, এবং তাহার স্বাভাবিক স্বদেশ-  
প্রেম পণ্ডিত-মহলে কিছুকাল হইতে স্মৃতি  
রহিয়াছে। আধুনিক ইতিহাসিকেরা প্রাচীন  
ইউরোপের ইতিহাসিক তথ্য আলোচনার  
অল্প কেন্টিক সত্যতার অগ্রহণ্যও  
করিয়া থাকেন। সত্যি ফ্রান্সের Rennes  
বিবিসিডালস হইতে প্রাচীন কেন্টের  
ধর্মমত এবং দেবসেবীত্ব সন্ধানও পাণ্ডিত্য-  
পূর্ণ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

কিন্তু এইগুলির সাহায্যে আদর্শের  
কেন্টিক আন্দোলন সঠিক হয় নাই। নব্য  
কেন্টিক আন্দোলনের মূল বাহির করিবার  
অল্প ইতিহাসিক অগ্রহণ্য বা পাণ্ডিত্যের  
স্বাভাবিক ইতিহাস সঙ্গ্রহ করিতে হইবে  
না। কারণ এই সময়ের খণ্ড আইরিশ  
ভাবুত্বা খুঁটী হয় নাই। আদর্শের  
তারুণ্য নিম্ন জাতি ও দেশের প্রকৃত আত্মা  
অধরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের  
“অতীত গৌরববাহিনী বাসীর” পুনরুজ্জীবন  
করিয়াছেন। এই উচ্চারণে ফলে এমন এক  
বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে বাহার দ্বারা ইউরোপ  
এক বিশাল আন্দোলন স্রষ্টাই উপস্থিত হইবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই নূতন জগতের কথা বর্তমানে আইরিশ কবিগণই প্রচার করিতেছেন। সম্ভ্রান্ত ইংরাজ একাকী তত্ত্বৎ—ইউরোপের কোন সাহিত্যে ঘোষিত সম্মান এখনও পান নাই।

### ৩। কেন্টিক অভ্যুদয় ও “রোমান্টিক” আন্দোলন

বিংশনশতাব্দীর সাহিত্যে এই প্রাচীন জগদাবিস্কারের কথা শুনিলে বসন্তবতাই উন-বিশ শতাব্দীর রোমান্টিক আন্দোলনের তথ্যসমূহ মনে পড়ে পাসির “Ancient Reliques” ম্যাক্সফোর্সনের “Ossian,” এবং স্কট ওয়াটসনের স্কটের মধ্যযুগ সম্বন্ধীয় সাহিত্য—এই সকলের দ্বারা গত শতাব্দীর চিন্তামণ্ডল প্রচুর পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই সঙ্গে প্রাচীন কেটের জীবন-কথাও সাহিত্য সংসারে আলোচিত হইত। কিন্তু সেই যুগের কেন্টিক সাহিত্যে ও চিন্তায় বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অধিকন্তু, ম্যাক্সফোর্সনের রচনায় কেন্টিক কাহিনীর আঁতি বৎসামাত্র উপকথা বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল। ফলতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যমণ্ডলে যথার্থ কেন্টিক আন্দোলনের স্থান ছিল না। শুধু কথা, তখনও কেন্টিক আন্দোলন আরম্ভই হয় নাই।

স্বাভাবিক পক্ষে, গত শতাব্দীর রোমান্টিক আন্দোলনে এবং বর্তমান কেন্টিক আন্দোলনে কোন বোণ নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে ত নাইই—অধিকন্তু দুইয়ের প্রেরণা স্বতন্ত্র, দুইয়ের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। রোমান্টিক আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর বহন-শৃঙ্খল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু নব্য আইরিশ ভাবুকরা কেনে প্রবল শক্তির প্রতিবাদস্বরূপ প্রাচীন আদর্শে ঘাইতে প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরাজ তাঁহাদের জাতীয় জীবনবিকাশের ধারা অক্ষত রাখিয়া করিতেছিলেন। ইংরাজ তাঁহাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সংরক্ষণ করিতে ঘাইয়া

দৈবক্রমে এই অমূল্য রত্নের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

তাঁহা ছাড়া, নব্য কেন্টিক সাহিত্য গত শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বার্লস্‌ স্ট ইত্যাদি রোমান্টিকেরা প্রধানতঃ প্রেমসম্বন্ধ উচ্ছ্বলতা এবং সংযমহীনতার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কেন্টিক সাহিত্য প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক। প্রাচীনতম বীর-যুগের গাথায় যে ধর্মপ্রাণতা, সরল জীবনবৃত্তা এবং শক্তিমত্তা দেখা যায় আধুনিকের নব্য সাহিত্যে তাহারই পরিচয় বোধ। প্রকৃতিপূজা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রোমান্টিক ও কেন্টিক দুই সাহিত্যেই আছে মতঃ—কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিংবা শেলীর চিন্তায় প্রাচীন কেন্টিক কল্পনার সরল স্বাভাবিক গতি নাই। কেটেরা প্রকৃতি ও দেবতার আবেষ্টনে সর্বদা বাস করিতেন। এই রূপ আশ্রয়ের দামায়েন পাণ্ডুরা যায়। কিন্তু প্রকৃতির সহচর, দেবতায় ভক্ত, ধর্মপ্রাণ সরলস্বভাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়নারীর কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্যে পাণ্ডুরা ঘাইবে না।

আরগ্যাণের একটি প্রাচীন—বোধ হয় প্রাচীনতম—কেন্টিক কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে :—

“I am the wind which breathes  
upon the sea,  
I am the wave of the ocean,  
I am the murmur of the billows,  
I am the ox of the seven combats,  
I am the vulture upon the rock,  
I am the beam of the sun,  
I am the fairest of plants,  
I am a wild boar in valour,  
I am a salmon in water,  
I am a lake in the plain,  
I am a word of Science,  
I am the point of the lance of  
battle,  
I am the god who creates in the  
head ( i. e. of man ) the fire  
( i. e. the thought ).

Who is it who throws light into  
the meeting on the mountain ?

Who announces the ages of the  
moon (if not I ?) ?

Who teaches the place where  
couches the sea (if not I ?) ?

এই উচ্চাঙ্গ পাঠ করিলে হিন্দু সহজেই  
যে উপনিষদ ও ঐতার বাণী শ্রবণ করিবেন।  
আর যেনে পড়িবে—

“তটিনী হইয়া ঘাইব বহিয়া

ঘাইব বহিয়া ঘাইব বহিয়া”—ইত্যাদি।

• •

### কেণ্টিক বীরগাথা ও

খৃষ্টধর্ম

প্রাচীন কেণ্টিক বীরগাথা বলিলে কোন্  
যুগের কাহিনী বুঝিব ? নব্য আইরিশ  
কবিত্বল কোন্ গাথাসমূহের আধুনিক গদ্য  
বা পদ্য সংস্করণ প্রচার করিতেছেন ? খৃষ্টধর্ম  
প্রচারের পর ২০০০-৫০০ বৎসর কাল  
আইরল্যান্ডের এক গৌরবযুগ ছিল। তাহার  
পর দিনেমার এবং র‍্যাফো-নুম্যানেরা  
আইরল্যান্ডের কলিযুগ আনয়ন করে। সেই  
খৃষ্টীয় পৌরবকাল বা লতাযুগকে আইরিশ  
ভাবুকরা তাঁহাদের বীরযুগ বিবেচনা করেন  
কি ?

খৃষ্টধর্ম প্রচারের যুগ ইহাদের সত্যযুগ বা  
বীরযুগ নয়। ইহাদের কেণ্টিক বীরগাথা  
আরও প্রাচীন—খৃষ্টীয় প্রভাব অপেক্ষা বহু  
পুরাতন। সেই যুগের ইতিহাস রচিত হয়  
নাই। বোধ হয় সেই সময়ে গ্রীক জনপদে  
হোমারীয় সাহিত্য এবং হিন্দু জনপদে রামায়ণী  
সাহিত্য রচিত হইতেছিল। কত প্রাচীন  
তাহা বলা কঠিন। আইরিশ ভাবুকগণ  
বিবেচনা করেন যে—খৃষ্টধর্মের বহুপূর্বে  
আইরল্যান্ডে যে বাহীনতা, আধ্যাত্মিকতা,  
ভগবদ্ভক্তি, অনন্ত-বোধ এবং প্রকৃতি-  
পরায়ণতা ছিল খৃষ্টধর্মের প্রভাবে তাহা বিনশ  
হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মতে খৃষ্টপ্রভাবে  
আইরল্যান্ডে ভক্তি হইয়াছে—বিশুদ্ধ উপকার  
সাবিত্রি হয় নাই। সরল সহজ আনন্দময়

প্রকৃতিপূজার পরিবর্তে আরল্যান্ডের জনগণ  
কতকগুলি মতবাদ এবং আদর্শনিক ও  
বাচনিক স্বাভাব্য ও নরকতত্ত্ব শিখিয়াছে  
মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে আত্মার কথা,  
ঈশ্বরের কথা, পরজন্মের কথা ভুলান  
হইয়াছে।

কিন্তু হুনিয়াছে কি ? নব্য আইরিশ  
ভাবুকরা বলিতেছেন, “না। আইরল্যান্ডের  
কোন লোকই সত্যভাবে খৃষ্টান নয়।  
বিশেষতঃ আইরিশ আত্মার নামজাণা যে  
কোন লোকের ধর্মজীবন আলোচনা করুন,  
লেখিবেন তাহারা সকলেই অখৃষ্টান, কেটে—  
সকলেই আত্মার স্বাধীনতা, মাহুতের দেবতার  
প্রাণি, এবং সর্বময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার  
করেন। খাঁটি খৃষ্ট-সত্যবলম্বী আইরিশ নাই  
বলিলেই চলে। আইরল্যান্ডের দার্শনিক  
বাক্যে খৃষ্টান ছিলেন না, ঐতিহাসিক  
লোকও খৃষ্টান ছিলেন না। বর্তমানে নাট্য-  
কার লীল, খৃষ্টান নন, কবি হ্যুইটস খৃষ্টান নন,  
রাসেলও খৃষ্টান নন।”

আইরল্যান্ডে খৃষ্টধর্মের কৃৎসল সম্বন্ধে একটি  
প্রাচীন কেণ্টিক কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।  
একজন প্রাচীন কেণ্ট খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী আইরিশ  
সমাজ দেখিবার জন্য মর্ন্ত্যে আসিয়াছেন।  
তাঁহার নাম Oisín. ইনি খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক  
Patrick-এর সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়া তর্ক  
করিতেছেন। ওসিন ঘাঘা বলেন তাহাতে  
ব্যক্তিত্ব, স্বাভাবিকতা, এবং জীবন বিকাশের  
কথা প্রকাশিত হইতেছে। আর খৃষ্টান  
ঘাঘা বলিতেছেন তাহাতে সাম্রাজ্যিক দল  
গঠন, সমাজের বন্ধন, আত্মবিকাশের বিঘ্ন  
এবং মৃত্যুপথের বাধাসমূহ স্পষ্ট হইতেছে।  
উভয়ের তর্কে প্রাচীন Bard বা চারণ  
স্বাভাবিকতা ও স্বাধীনতার ভয় প্রচার  
করিয়াছেন।

• •

### ৫। কেণ্ট, গ্রীক ও হিন্দু

এতদূর অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং প্রকৃতির সঙ্গে  
সংবাদের আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন কেণ্টের মূল-  
গত। খৃষ্টান সাহিত্যে ইহার ভুলনা নাই।  
নব্য আইরিশ সাহিত্যসেবীরা বলেন যে,

পুঁঠোনেবা ইহার উপর বন্ধনের বন্ধ পরাইয়াছেন মাত্র।

এমন কি ইহার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের রোমায়ী সাহিত্যেরও তুলনা হয় না। অবশ্য ঋগ্বেদের বীরবৃগ্বে সকল স্থানেই চারণগগন বীর-মূলক চরিত্র দৃঢ়তা এবং সবাগতা ও নৈশর্গিক উজ্জ্বল-প্রবণতা দেখাইয়াছেন। ক্রান্তিনাতীয়, রোমায়ী, কৈশিক, ভারতীয়—সকল প্রাচীন বীরগাথাই তাহা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ কেটের অধ্যাত্মবাদ এবং মুক্তিতত্ত্ব গ্রীসে পাই না। গ্রীক সাহিত্যে প্রত্যেক আকারে চরম পরিণতি দেবি না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আম্রকালকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ছবিয়ার সকল পদার্থই গ্রীস হইতে টানিয়া আনেন! ইহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, “রোমায়ী সাহিত্যের ব্যাকিলিগই কৈশিক সাহিত্যের কুঙ্কলান, এবং দুই সাহিত্যের ঘটনা এক প্রকার।” কিন্তু আর্যলগ্নের ভাবুক কি সম্ভব বিবেচনা করেন যে, এই মত সম্পূর্ণ প্রমাদ্যক। রাসেল বলেন,—কৈশিক সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন কোন চিত্তাঙ্গারি তুলনা করিতে হইলে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। Mysticism, ভাবুকতা, প্রকৃতি-পূজা ও অধ্যাত্মবাদ এত সহজ ভাবে ঋগ্বেদের আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। কেট ও হিম্ম বোধ হয় এক অধ্যাত্মশক্তির সন্ধান।

• •

### ৬। কৈশিক সভ্যতার বিবৃতি

গ্রীকরা এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারী রোমানেরা সকল জাতিকেই অশিক্ষিত বর্গের রেখা বিবেচনা করিতেন। কেটেবাইও ইহাদের সম্মান পাইতেন না। অথচ সেই বৃগ্বে ইউরোপের অবিকাসই কৈশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৈশিক ভাষা ও সাহিত্য, কৈশিক শিল্পকলা ও সমাজবন্ধন ইউরোপের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আর যেখানে ক্রাশ, বেলজিয়াম, উত্তর ইতালী, দার্শনিক কিয়ৎপণ, হাইল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আর্যলগ্ন অবস্থিত

সেই সমস্ত ক্ষুভাগই কৈশিক জাতীয় নর-নারীর আবাণ স্থান ছিল। পরে এই সকল স্থানে রোমীয় সভ্যতা এবং টিউটনিক সভ্যতা যথাক্রমে বিকৃতি লাভ করে। তাহার ফলে কৈশিক জাতি ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপথে এবং পর্তুগলসহরে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অগত্য স্থানে কৈশিক জাতির সকল প্রকার স্বাভাব্য নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু ক্রাশের ব্রিটানী, ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল ও ওয়েল স্কটল্যান্ড এবং আর্যলগ্ন প্রকৃতি স্থানে টিউটনিক সভ্যতা হইতে পূরে মুচ্ছাদিত থাকিবার সুযোগ পষ্ট হইয়াছিল। এমত কৈশিক সভ্যতার বিশেষত্ব এই সকল স্থানে রক্ষিত হইতে পারিয়াছে।

প্রাচীন কালের সেই বিপুল কৃষকের জাতীয় জীবন ও আদর্শ বৃত্তিবার উপায় এক্ষণে বেশী নাই। কারণ গ্রীক, রোমীয় এবং টিউটনিক সভ্যতার সংমিশ্রণে অথবা চাপে পড়িয়া কৈশিক আদর্শের অস্তিত্ব সোপ পাইয়াছে। কিন্তু ওয়েলস, আর্যলগ্ন, ব্রিটানী ইত্যাদি জনপথে তাহার সাক্ষ্য এখনও পাওয়া যায়। এমত এই সকল দেশেই বর্তমানকালে নব্য কৈশিক বর্ণনামঙ্গল দেখা যাইতেছে। এই Renaissanceএর ফলে প্রাচীনতম ইউরোপীয় সভ্যতারই পুনরুদ্ধার হইতেছে।

• •

### ৭। আইরিশ জাতির

ব্রদেশী আন্দোলন

আইরিশ জাতি তাঁহাদের জাতীয় স্বাভাব্য বহুগঠে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। সাতশত বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের উপর বিদেশীয় সভ্যতার কঠোর আবরণ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাঁহাদের উৎসব, আয়োদ, সঙ্গীত, নৃত্য, জীভা কৌতুক সকল বস্তই বধাসম্বল ধরে করা হইয়াছে। এখন কি, তাঁহাদের ভাষা পর্যন্ত রক্ষা পায় নাই। ইহারা বিদেশীয় ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ, এই সাতশত বৎসরের ভিতর যে কয়জন যশে-শেখর আর্যলগ্নে অবস্থিত হইয়াছেন তাহার কেহই প্রকৃত



স্বাধৈনিকতা বা জাতীয়তার ধ্বংসা তুলিতে পারেন নাই। উহার। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন মাত্র—পূর্বে বঙ্গ-যুদ্ধ করিতেন, গত শতাব্দীতে পার্লামেন্টে Constitutional agitation বা স্বাধৈনিকতা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিগত ২০।২৫ বৎসরের ভিত্তর আয়ারল্যাণ্ডে যথার্থ “জাতীয়” আন্দোলনের সূত্রপাত ও জন্ম-বিকাশ হইয়াছে। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন সাহিত্যসেবীর চেষ্টায় আয়ারল্যাণ্ডে Gaelic League নামক জাতীয় ভাষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়। ইহার। প্রধানতঃ দুই কার্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ, আইরিশ-দিগের প্রকৃত মাতৃভাষা সজীবিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। বিভাগের পাঠ্য-তালিকার গেলিক ভাষার স্থান নিশ্চিত করা হয়। দৈনিক দৈনিক লেখক, কবি, গায়ক, সম্পাদক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকই আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষার রচনা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হন। বর্তমানে এই ভাষা-পরিষদের ১,০০০ শাখা আয়ারল্যাণ্ডের নানা কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহাদের অধীনে ১০০ পর্য্যটক গেলিক ভাষার জ্ঞান প্রচার করিয়া বেড়ান। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি শিক্ষক-বিভাগেরও ইহার। পরিচালনা করিতেছেন। তাহার। সাহায্যে মাতৃভাষার শিক্ষা দিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া শিক্ষকেরা উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয়ে কৰ্ম গ্রহণ করেন। আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন ভাষা এই উপায়ে নবজীবন লাভ করিয়া জাতীয়তার পুষ্টিবিধানের সাহায্য করিতেছে।

• •

## লোকসাহিত্য ও আইরিশ

### ভাবুকতা

গেলিকল্যাণের দ্বিতীয় বর্ষ লোক-সাহিত্যের প্রচার। ইহার। দেশের অনিচ্ছিত, অর্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের আবেদন প্রযোজ্য, নৃত্য গীতবাত্ত এবং রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার জ্ঞানদায়ী

তুলিয়াছেন। এই জনির অধিকাংশই প্রাচীন কৌণ্টিক জীবনের নিবর্ণন। কৌণ্টিক আদর্শ এই উপায়ে আয়ারল্যাণ্ডের পল্লিতে পল্লিতে পুনঃ প্রবর্তিত হইতেছে। এই প্রচার-কার্যের জন্য ইহার। প্রতিবৎসর নানাবিধে নানাপ্রকার মেলা, দর্শন, সন্ধ্যা, প্রদর্শনী, ভোজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। এই সকল উৎসবে খাঁতি প্ৰদেয়ী রীতি অল্পসংখ্যক নাচ গান হাঙ্গ্যাকোতুক, রঙ্গকণ্ঠা, বঙ্গবস, নাট্যকান্ডিন, খেলা ধূলা, ব্যায়াম মনযুদ্ধ ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ফলতঃ কৌণ্টিক জনগণের আবহাওয়া বহল পরিমাণে নব্য আইরিশ সমাজে সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকতর শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত জনগণের রীতিনীতিকেই জাতীয় সম্পদজ্ঞানে আদর করিতেছেন।

নিম্নলিখিত এবং জনসাধারণের ভাষাও ইহার। উচ্চ সাহিত্যে ব্যবহার করিতেছেন। নব্য আয়ারল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গ প্রাচীন নাট্যকার উহার “The play boy of the Western world” নামক বাহ্যনাটকের কৃষিকার লিখিয়াছেন :—

“In writing *The playboy of the Western World* as in other plays I have used one or two words only that I have not heard among the country people of Ireland, or spoken in my own nursery before I could read the newspapers. A certain number of the phrases I employ I have heard also from herds and fishermen along the coast from Kerry to May, or from beggar-women and ballad-singers nearer Dublin and I am glad to acknowledge how much I owe to the folk-imagination of these fine people. \* \* \* \* \* When I was writing *The Shadow of the Glen*, some years ago I got more aid than any learning could have given me from a chink in the floor of the old Wicklow house where

I was staying, that let me hear what was being said by the servant girls in the kitchen."

কেবল তাহাই নহে। কেন্টিক ভগ্নতের অস্তঃকরণও বাহ্যতে ফিরাই আসিতে পারে তাহার অস্তঃকরণের অয়োজন করা হইয়াছে। ইহাই নব্য আইরিশ ভাবুকগণের অসাধারণ কৰ্ম পটুত্বের পরিচয়। ইহারা একত্র প্রাণ-দগ্ধ চেষ্টা করিতেছেন। পুরাতন সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনপূৰ্ব্বক ইহারা কেন্টিক আদর্শ বর্তমান চিন্তাক্ষেত্রে ও সাহিত্যমণ্ডলে বিকীর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এক্ষণ কঠোর প্রয়াস বোধ হয় ভগ্নতের আর কোন সাহিত্য-মণ্ডলী করেন নাই এবং এক্ষণ উচ্চমে সফলতা লাভও এত দীর্ঘ আর কোথাও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

লোক সাহিত্য, প্রবাদ, প্রবচন, কাহিনী, উপকথা, এবং জনগণের সংস্কার অবলম্বন পূৰ্ব্বক কাব্য, নাট্য ও গল্প রচনা করিতে অগ্রসর হইলে সাহিত্যে সুগন্ধর স্রষ্টি করিতে পারা যায়। একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। স্বাধীন সাহিত্যে হার্ডার এক্ষণ করিয়াছিলেন। নব্য আয়র্ল্যান্ডের কবিবৃন্দ তাহাই করিয়াছেন। স্কটল্যান্ডে যে সকল গল্প ছেলে বেলায় শুনিয়াছে, ঠাকুরমার তুলির ভিতর যে সমুদয় গল্প শুদ্ধ সাধারণতঃ থাকে, আবহমান কাল হইতে যে সমুদয় কথা দেশ মধ্যে চলিয়া আসিতেছে নব্য আইরিশ ভাবুকগণ সেই সমুদয় লইয়া উৎকৃষ্ট গল্প, কাব্য ও নাট্য স্রষ্টি করিয়াছেন।

এই নূতন সাহিত্য রচনার অস্তঃ ইহারা স্বার্থ মাক্‌তাযাব ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কারণ ইহা এখনও পুরাপুরি বাঁচিয়া উঠে নাই। আয়র্ল্যান্ডে ইংরাজী ভাষাই এখন পর্যন্ত অধিকাংশ লোকের মাক্‌তাযাব পরিণত হইয়াছে। কাজেই ইহারা ইংরাজীতে এই সমুদয় কবিতা ও নাটক রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

••

৯। নব্য কেন্টিক আন্দোলন

ভালা ছাড়া, প্রাচীন কেন্টিক সাহিত্যে যে সকল উপাখ্যান সুপ্রচলিত ছিল

আয়র্ল্যান্ডের কবিবৃন্দ সেইগুলিও নূতন ভাষায়, নূতন ছন্দে, নূতন আকারে প্রকাশ করিতেছেন। সেই বীরগাথা সমূহের আধুনিক ইংরাজী সংস্করণই নব্য কেন্টিক আন্দোলনের দীর্ঘনিঃশ্বাস।

প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্যে দেখিতে পাই, হোমারের চিত্তরাশিকেই তাঁহার পরবর্তী যুগে ইম্পালান, স্কল্লোস, ইউরিপিডিস ও গ্র্যারিট ফেনিস নূতন আকারে প্রচার করিয়া-ছিলেন। সেইরূপ ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যই পরবর্তী যুগে কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবিহর প্রাচীন নূতন আকারে প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন কথাবস্তুর ভিতর নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিলে নূতন কলা স্রষ্টি হয়—অথচ জাতীয় জীবনের পারম্পর্য্য এবং ঐক্যও রক্ষিত হয়। এই লক্ষ্যই কালিদাস অশ্বারথ্যে গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছেন :—

“অথবা কৃত বাণুযায়ে বশেনহসিন্  
পূৰ্ণস্রুতিভিঃ।

মণৌ বহু সমুৎকীর্ণে স্রুত্রেষাতি

মে গতিঃ।”

কিন্তু আয়র্ল্যান্ডের বীরগাথা রচিত হইবার পর সেগুলিকে নূতন আকারে প্রাচীন করিবার সুযোগ ২৫০০ বৎসরের ভিতর আসে নাই। কোন দম্ভে সেগুলি লোক-মুখে বিস্তৃত ভাবে বাঁচিয়া গিয়াছে মাত্র। অথবা তাহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি অসংখ্য হস্ত লিখিত পুঁথির ভিতর সূক্ষ্মাণ্ডিত রহিয়াছে। সেই ভাণ্ডার ব্যবহার করিতে পারিলে আয়র্ল্যান্ডের কালিদাস ও ইউরিপিডিস আবিষ্কৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

এইরূপ স্রষ্টিয়া আইরিশ নবশৈলী আন্দোলনের প্রবর্তকেরা “জাতীয় রক্ষক” স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন বীরগাথা সমূহ অবলম্বন পূৰ্ব্বক নাটক রচনা করিবার অস্তঃ আয়র্ল্যান্ডের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবীদিগকে আহ্বান করা হয়। সেই নাট্যাবলীর অভিনয় এই যুগে দেখান হইয়া থাকে। বিগত ১৫ বৎসরের ভিতর এই উপায়ে শতাধিক জাতীয় নাট্য অভিনীত হইয়াছে।

এই সকল বীরগাথার কল্যাণ পরিচয় নিয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। O'Grady কৃত গৃহ

অহুসান গ্রন্থের একখানার কৃমিকায় লিখিত আছে :—

"There are three great cycles of Gaelic literature. The first treats of the gods; the second of the Red Branch Knights of Ulster and their contemporaries; the third is the so-called Ossianic. Of the Ossianic, Finn is the chief character; of the Red Branch cycles Cuchulain, the hero of our tale.

Cuchulain and his friends are historical characters seen as it were through mists of love and wonder, whom men could not forget, but for centuries continued to celebrate in countless songs and stories. They were not literary phantoms but actual existences. . . . And as to the gigantic stature and superhuman prowess and achievements of those antique heroes it must not be forgotten that all art magnifies, as if in obedience to some strong law; and so even in our own times Grattan where he stands in artistic bronze is twice as great as the real Grattan thundering in the Senate. . . .

I have endeavoured so to tell the story as to give a general idea of the cycle and of primitive heroic Irish life as reflected in that literature, laying the cycle so far as accessible, under contribution to furnish forth the tale."

"জাতীয় বন্ধমকে" নাটকগুলি ইংরাজী ভাষাতেই অভিনীত হয় সত্য—কিন্তু ইহার কলে সমগ্র আইরিশ জাতির চিত্রা নূতন পথে ধাবিত হইয়াছে। সেলিক ভাষা বেশের ভিতর পুনরাবস্থাপিত হইতে পারিবে কি না সন্দেহ—কিন্তু প্রাচীন কেল্টিক সাহিত্যের বীররস, অধ্যাত্তব, ভাবুকতা, এবং ব্যক্তিবাস, "gigantic stature," বিপুল উদ্যম, "superhuman prowess" ইত্যাদি লক্ষণময় আইরিশ জাতির মজাগত হইতে চলিয়াছে। প্রাচীন ভাষা কিরিয়া না আদিলে প্রাচীন সাহিত্য ইতিমধ্যেই কিরিয়া আসিয়াছে।

আইরিশের বদেষ্টা আম্মোলনে ইউরোপে

কাঠিক—২

কেল্টিক আদর্শের পুনরুদ্যম হইল। ভারতীয় ভাবুকগণও আইরিশকে মপতে নবদুগ অনিরনের সহযোগী পাইলেন।

### ১০। বিলাতের জনসাধারণ

সম্প্রতি পার্লামেন্টের এক সমিতি হইতে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের কৃষিবিষয়ক অহুসানদের ফলসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত—১৫০০ পৃষ্ঠায় "সম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অহুসানকারীরা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলে বিলাতের কৃষিকারী ও শ্রমজীবীগণের চরিত্র ও হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশেষ্যেরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "ভারতীয় জনসাধারণ নিত্যন্তই দুর্ভ, নিরক্ষর এবং শিক্ষালাভে উদাসীন ও অনিচ্ছুক। নূতন নূতন কৃষি-প্রণালী, শিল্প-প্রণালী, ও ব্যবসায় প্রণালী ইহারা অবলম্বন করিতে চাহে না। মাট্রি পথ পরিত্যাগ করা ইহাদের স্বভাব-বিকল্প।" এই সকল কথা ভোতা। পানীর মত মুখস্থ করিয়া ভাবি যে বোধ হয় পাক্ষাত্য সমাজে জনগণ সর্বদা নব নব আবিষ্কার বাজে লাগাইবার ক্ষমতা ব্যগ্র। কিন্তু পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত Report of the Land Inquiry Committee (vol. I, Rural, Vol. II, Urban) পাঠ করিলে এতুল বিশ্বাস থাকিবে না।

অহুসানকারীরা হৃৎপ করিয়াছেন— "ইংল্যান্ডের নিরক্ষরতার লোকেটা শিক্ষার মর্যাদা এখনও বুঝে নাই। ইহাদিগকে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করান বড় সহজ ব্যাপার নয়। কৃষিকর্মে কো-অপারেটিভ নীতির অবলম্বন ইংল্যান্ডে শীঘ্র সফল হইবে না। পুরাতন প্রথাগত প্রতি ইংরাজ নর-নারীগণ এত আসক্ত যে নূতন পথে প্রবেশিত করাইবার ক্ষমতা গবর্নমেন্টের হৃৎপয়োনাতি অর্থ-ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।"

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দ্বিভাষীল বৈজ্ঞানিক (!) ভারতবাসীতে এবং পণ্ডিতল বিজ্ঞানাবলম্বী পাক্ষাত্য নরনারীতে বিশেষ প্রভেদ বুঝা যায় কি? বস্তুতঃ, চোখ কাপ

যদিও বিশ্বশক্তির পরিচয় লইলে বুঝিব  
যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে  
ভারতবাসী বাহা কিছু শিখিবার সুযোগ  
পাইয়াছে প্রায় সকলই একবেশ দলী, এক-  
চোখো, অসম্পূর্ণ, হুতরাং মিথ্যা।। বিশেষতঃ  
প্রাচ্য এবং পশ্চাত্য সভ্যতার প্রভেদ সৰ্ব্বদে  
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট যে জ্ঞান  
লক্ষ্যিরাছে তাহা নিতান্তই অবজ্ঞের। বিশ-  
শতাব্দীতে আমাদিগকে বুজন করিয়া বদেল  
ও বিশেষের প্রাচীন এবং বর্তমান তত্ত্ব  
বুঝিতে হইবে।

• •

### পশ্চাত্য ইতিহাসে অনৈক্য ও পরাধীনতা

একটা কথা আমরা শুনিয়া শুনিয়া হুতরাং  
হইয়া গিয়াছি। কথায় কথায় আমাদিগকে  
বলা হয়,—“ভারতবর্ষের ইতিহাস অনৈক্য ও  
পরাধীনতার কাহিনী। ইউরোপের ইতিহাস  
ঐক্য এবং স্বাধীনতার বৃত্তান্ত।” এই বচন  
বর্তমান আমাদেব নিকট অতঃশিদ্ধ বলিয়া  
বোধ হয়। ব্যাপারটা কি তলাইয়া দেখিবার  
প্রবৃত্তি পর্যন্ত নাই।

সত্য কথা, ইউরোপের ইতিহাস ভারত-  
বাসীকে আদৌ শিখান হয় নাই বলিলেই  
চলে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস ত ইউ-  
রোপীয় পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত তথ্যাবলির  
তালিকা মাত্র। ইহাও বর্তমান ভারত-  
শাসন ও ভারতীয় সভ্যতা সৰ্ব্বদে বাহা  
কল্পনা করিয়া থাকেন ভারতেতিহাস লিখিতে  
হইয়া তাহা সঙ্গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হন।  
কাহ্নেই আমরা ভারতেতিহাসে কোন শি-  
ক্ষা-প্রদ বস্তু পাই না। বাহা কিছু শিখি তাহার  
চরম কথা—“অনৈক্য এবং পরাধীনতা—  
অর্থাৎ পশ্চাত্য বীরভাতীয় নরনারীর জীবন-  
বৃত্তান্তের বিপরীত।”

অথচ ইউরোপের ইতিহাস সভ্যতাবে  
আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাইব ?  
এত অনৈক্য, এত পরাধীনতা, এত লাঠালাঠি  
এবং এত রক্তাশ্রুতি ইউরোপীয় পণ্ডিত  
লিখিত ভারতেতিহাস এতেরও ত্রিসীমানার  
পাইব না। ইউরোপের ইতিহাসই অনৈক্য

এবং পরাধীনতার চরম দৃষ্টান্ত। ইউরোপে  
ও ভারতবর্ষে এ সৰ্ব্বদে তুলনা করিলে  
ইউরোপেরই হীনতা প্রমাণিত হইবে। অথচ  
ইউরোপের দেশভাগি প্রত্যেকটাই ভাৰতীয়  
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যথেষ্ট সূত্র।

• •

### বর্তমান ইউরোপ ( ১৪৫০- ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ )

বর্তমান ইউরোপের কথা আর কি বলিব ?  
নব্য জাৰ্মানি, নব্য ফ্রান্স, নব্য ইতালী—  
ইহারা ত ১৮৭০ সালে গঠিত হইয়াছে।  
ইহাদের ভিত্তর পরাধীনতা এবং অনৈক্যের  
বীজ এখনও সন্মূলে উৎপাটিত হইয়াছে কি ?  
জাৰ্মান সাম্রাজ্যে বর্ধাৎ ঐক্য এখনও স্থাপিত  
হয় নাই। জাৰ্মান-হাঙ্গারীর আভ্যন্তরীণ  
অনৈক্য এবং পরাধীনতা-নীতি সৰ্ব্বদে কে না  
খবর রাখেন ? বন্ধন অকলে সাক্ষীরা ও  
তুহক জাতিবাদের পরস্পর মারামারি আর  
স্ববিধিত। পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ এখনও  
হুনিয়মিত হইল না। পোলিশ জাতি ভিন্ন  
ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত। বেলজিয়ারের  
দুইজাতি বিশেষ নাই—মিশ্রিত কি না সৰ্ব্বদে ?  
ফরাসীর দুই জেলা জাৰ্মানির অধিকৃত।  
বিশাল কশিয়ার যে কত জাতির অনৈক্য ও  
পরাধীনতা এক সৰ্ব্বদে বর্তমান তাহার ইহুতা  
কে করিতে পারে। আরল্যান্ডের বরাক-  
আম্বোলান কি পরাধীনতার প্রতিবার নয় ?  
আরল্যান্ডের আলুটার আম্বোলান কি অনৈ-  
ক্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত নয় ? কত জাতীয় লোকেরা  
এখনও ইংল্যান্ডবিশেষী কলসাজের ব্যানক-  
বার্ষ বৃদ্ধিবলে “জাতীয়” উৎসব সম্পন্ন করে।  
ফলতঃ বর্তমান ইউরোপে জাৰ্মান ঐক্য এবং  
স্বাধীনতার চিত্র বেশী উজ্জল ? না অনৈক্য,  
বিভিন্নতা, পরস্পর বিদ্বেষ, হুকাবৃষ্টি, এবং  
পরাধীনতা, পর-পীড়ন ও অত্যাচারের চিত্র  
বেশী উজ্জল ?

তাহার উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের অত্যাচারের  
মলাদলিগুলি বিবেচন করিলে অনৈক্য ও পর-  
পীড়নের চিত্র আরও স্পষ্ট হইবে। ভিমক্রেসী  
বা প্রম্বাড্রশাসন বলিয়া কোন পার্শ্ব বাস্তবিক  
পক্ষে ইউরোপের সূজাপি নাই। সে কথা

সম্প্রতি না তুলিয়ায়। ঐতিহাসিক ভাবেই ইউরোপের “ঐক্য ও স্বাধীনতা” তত্ত্ব বুঝা যাউক।

১৪১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ পৰ্য্যন্ত ইউরোপের যেদিকে তাকাই দেখাও স্বাধীনতা ও ঐক্য নাই। এক জাতি অপর জাতির উপর অত্যাচার ও অধিকার করিতেছে, এক ধর্মাবলম্বী অপর ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতেছে, ধর্মসংস্কারের নামে রাজ্যীয় অটনৈক্য এবং মনোমালি পুটে হইতেছে, ব্যবসায়ে লাভবান হইবার জন্য রাজার রাজ্য, রাজার প্রজাতি, প্রজাতি প্রজাতির স্বয়ং ও কলহ ঘোরতর জটিল আকারে দেখা দিতেছে। এই গেল আধুনিক ইউরোপের চিত্র। Cambridge Modern History, কিম্বা, Foreign Statesmen Series গ্রন্থাবলী, কিম্বা Periods of European History Series গ্রন্থাবলীর কোন পৃষ্ঠায় ঐক্য বা স্বাধীনতার কথা মাত্র পাই নাই। স্মেনের ফিলিপ হইতে কার্ণারের হিস্টোরিক পন্থায় ইউরোপীয় ইতিহাসের এক বাহী—পরম্পর রেখারেখি, পরজাতি-পীড়ন এবং ঘরোয়া বিবাহ। যাক্বিনি গ্যারি-বন্ডির কথা বলিতে চাহ? ইউরোপের ভিতর আরো ঐক্য ছিল না বলিয়াই অস্ট্রিয়া কাবু হইয়াছিল এবং ইতালীর বীরস্বরের কাণ্ড। হাসিল হইতে পারিয়াছিল!

যথাস্থানের চিত্রেই বা স্বতন্ত্র দৃষ্টাবলী আছে কি? সে যে Feudal যুগ—ফিউডালিজমের অর্থই অনৈক্য—সে ত আরও অন্ধকারময় গহন বন। পাঠাতোয়া স্বার্থই তাহার নিম্ন। করেন। তাহা হইলে তথ্য কথিত ঐক্য এবং স্বাধীনতার বড়াই করা হয় কেন? ভারতবাসীরাই বা এই বড়াই শুনিয়া চমকাইয়া ধান কেন?

ভারতের মাছুর ফুটিছাড়া কানোয়ার নয়—ইউরোপের মাছুরও স্বর্ণের দেবতা নয়! ইউরোপের ইতিহাস একমাত্র স্বাধীনতা ও ঐক্যের চিত্র নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তথাকথিত অনৈক্য এবং পরাধীনতার কালিমাশিপি নয়।

## ১৩। ইংল্যান্ডের ইতিহাস

ইংরাজ জাতির ইতিহাসটা ইংলিশ না কেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দুইটি প্রধান কথা নিখিঁতে পারি—হুৎ অনৈক্য, না তত্ত্ব পরাধীনতা।

এই দুই শক্তির পরস্পর যাত প্রতিযাত এবং তাহার বিভিন্ন প্রভাবে ইংরাজের জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে। পৃষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীতে ইংরাজ রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীন। তাহার তিনশত বৎসর পরে কার্ণারের “বর্নরেজা” ইংল্যান্ড নথল করিল। তখন ভারতবর্ষে সমুদ্রযাত্রার প্রবল প্রচাপ। ইংল্যান্ডের এই যুগ স্বাধীনতার যুগ না পরাধীনতার যুগ?

জারপর এই বর্নরেজা ইংল্যান্ডের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “বসেন” গঠন করিতে লাগিল। তাহার সূত্রাজ Heptarchy বা “সপ্ত-রাজ্যীয়তা” এবং Triarchy বা “ত্রি-রাজ্যীয়তা”র ইতিহাস। ইহা হইতে ঐক্যের পরিচয় পাই, না অনৈক্যের পরিচয় পাই? পৃষ্ঠীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এই ক্ষুদ্র রািপের লোকেরা “এক-রাজ্যীয়তা”র আদর্শে অস্বপ্নানিত হইতে পারে নাই।

এই আমলেই আবার দিনেমারেরা অর্ধ ইংল্যান্ডের অধীশ্বর হইলেন। ইহার নাম ইংরাজের স্বাধীনতা না পরাধীনতা? এই যুগে বাজালায় পাল সম্রাটগণ এবং ড্রাবিডে চোল রাজবংশ “বিদ্রোহ” করিতেছেন।

তাহার বেড় দুই শত বৎসরের ভিতর ফরাসী সেনাপতি উইলিয়ামের ইংল্যান্ড বিজয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সনাজে ফরাসী ভাষা, ফরাসী সাহিত্য, ফরাসী কাহদা ইত্যাদির বিস্তার। এই যুগ কি ইংরাজ জাতির গৌরব যুগ? অধিকন্তু উইলিয়ামের বিজয় ব্যাপারটাও বুঝা যাউক। ইংরাজ রাজ ফারল্ড সেন্সালের যুদ্ধে হারিলেন কেন? কারণ—সেই যুদ্ধে লোকের গৃহ কলহ, জাত্ববিদ্বেষ ও বিশাসঘাতকতা। নির বিফলদের পাঠ্য পুস্তিকাও কি এ কথা নাই? এই ঘটনার ১৩০ বৎসর পর ভারত-বর্ষে পৃষ্ঠীয় রাজ ও খানের যুদ্ধ।

ইংল্যান্ডে ফরাসী শাসন দুই শতাব্দী

চলিল। তখন আবার ঘোরতর অতৈক্য আনিয়া ছুটিল। Wars of the Roses সংগ্রামটা কি ইংরাজের জাতীয় ও রাজ্যীয় একেবারে সাক্ষী? ইংরেজ ১০ বৎসরের ভিত্তরই ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন। ধর্ম সংস্কারটা যে ইউরোপে কি পদার্থ তাহা সকলেই জানেন।

ইংল্যান্ডেও ধর্ম সংস্কারের বিষয় ফল প্রচুর পরিমাণেই দেখিতে পাই। ১৫ ও ইংরাজ আভিযয়ের কলহ ত আছেই—সঙ্গে সঙ্গে তুমুল গৃহবিবাদ, রাজহত্যা, রাজনির্কালন ও বিদ্রোহ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজ জাতির ঐক্য ছিল, না অতৈক্য ছিল? এই Civil war এবং “Glorious revolution” এর তত্ত্ব কথা কি?

বিপ্লবের পর কি বেধিতেছি? ওলন্দাজ সেনাপতি ইংরাজ জাতির রাজনিঃসারনে বলিলেন। ইহা আবার কিরূপ স্বাধীনতা? তাহার ১০ বৎসর পরে আবার আত্মপিতৃ হানোভার বংশীয় লোকেরা ইংল্যান্ডের রাজা। প্রথম দুই রাজা ইংরাজী ভাষার কথা পর্য্যন্ত বলিতে জানিতেন না! এইরূপে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ করিলাম।

উনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীনতা নূতন আকারে আর আসে নাই। নেপোলিগান ইংল্যান্ড দখল করিতে আসিতেছিল—টাকালুগারে তাহার ধ্বংস হইল। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থাটা আলোচনা করা যাউক। পার্লামেন্টের সভানির্বাচন-রীতি ধনী নির্ধনের সম্বন্ধ, House of Lords এবং House of Commons এর বিবাহ ও প্রতিষেধিতা ইত্যাদি বৃত্তিতে পার্লামেন্টে দেখিব বর্তমানের ইংরাজও ঐক্য অথবা বজাতিপ্রিয়তা বড় বেশী দেখাইতেছেন না।

ইংরাজের যে বৃত্তান্ত, ইউরোপের অন্তঃ জাতি সম্বন্ধে সেই বৃত্তান্তই প্রযোজ্য—আরও কমতম্ব। অতৈক্য ও পরাধীনতা কি ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া?

..

১৪। বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—

উদ্যোগ পর্ব

বিগত দুই মাসে একজন সার্ভ হুক

আফ্রিকা-হাফারীর ভাবী সম্রাটকে হত্যা করিয়াছিল। অফ্রিকার গবর্নেন্ট অফ দক্ষিণ ক্রিয়া বৃত্তিলেন যে, সার্ভিগ রাষ্ট্রে যে সকল গুপ্ত ও প্রকৃত সমিতি আছে তাহার সঙ্গে এই হুক সমিতি। সার্ভিগা সকল সাতনীর জাতিকে একত্রীকৃত করিবার জন্য অফ্রিকার সার্ভ প্রজাতন্ত্রকে তাহার সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং সার্ভিগাকে জখ না করিলে অফ্রিকার শান্তি নাই। এইরূপ বৃত্তি অফ্রিকার সম্রাট সার্ভিগা রাজকে পত্র লিখিলেন যে, ৪৮ ঘণ্টার ভিতর সম্রাট-জনক মরবে না নিলে সার্ভিগার বিরুদ্ধে হুক ঘোষণা করা হইবে।

এই ultimatum পত্র পাইয়া সম্রাট ইউরোপ গুপ্তিত হইল। সার্ভিগা কনিয়ার ক্ষত্র বজাতি। সার্ভিগাকে যেভাবে অপমানিত ও গদগদিত করিবার উদ্ভোগ হইতেছিল কনিয়া তাহা নীরবে সহ করিতে অসমর্থ। এদিকে আর্দ্রাণিও অফ্রিকার জাতি—কাজেই সকল বিষয়ে অফ্রিকার সহায়ক। আর্দ্রাণি বলিলেন—“অফ্রিকার ও সার্ভিগায় যে পত্র ব্যবহার হইতেছে তাহাতে তৃতীয় জাতীয় হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। যদি কেহ হস্তক্ষেপ করেন তাহার বিরুদ্ধে আমি কামান্দ্রাপিগা বসিরা আছি।”

ব্যাপার মধ্য নহ। আর্দ্রাণি কনিয়ার সম্রাট শত্রু একটা লড়াই করিবার জন্য বড়ই উদগ্রীব ছিলেন। এই জন্য অফ্রিকার সম্রাটকে দিগা সার্ভিগার রাজ্যায় নিকট এই কঠোর ও অপমানসূচক পত্র লিখান হইল। আর্দ্রাণির বিবাস—“কনিয়া অফ্রিকার এই দুর্ক্যাবস্থার কখনই সহ্য করিবেন না। কনিয়া গায়ে পড়িগা সার্ভিগার পক্ষ লইতে বাধ্য হইবেন। তখন কনিয়ার আর্দ্রাণিতে মনমুগ্ধ চলিতে পারিবে।”

কার্য্যতঃ তাহাই হইল। এদিকে ইংরাজ ত ব্যার সম্বরের পর হইতে লগতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাস্তব। লগতের কোথাও কিছু মাত্র নড়ন চড়ন হওয়া ইংরাজ গৃহস্থ করেন না। কিন্তু আর্দ্রাণি ও কনিয়ার মনমুগ্ধ হইতে দেখা ইংরাজের পক্ষে কোন যত্নেই সম্ভবপর রহিল না। কারণ এই মনমুগ্ধ

আন্তর্জাতিক এমন অনেক ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে তাঁহাকে একপক্ষ অবলম্বন করিতে হইল। নিত্যক অনিচ্ছায় ইংরাজ আসরে নামিলেন।

যাহা হউক, নেপোলিয়ানের যুগ ইউরোপে কিরিয়। আসিয়ায়। ১৮১৫ সালে ফরাসী বিপ্লব প্রমত্ত সমরারি নির্বাপিত হয়। ১৮১৫ সালে লড়াই পূর্ণ হইতে না হইতেই ইউরোপের দ্বিতীয় কৃকক্ষেত্র হ্রস্ব হইল। রাষ্ট্রীয় বীরেরা এই কৃকক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়া বহুকাল হইতেই করিতেছিলেন। হস্তশাস্ত্র বিচক্ষণেরা কেহই বিম্বিত হন নাই।

..

### ১৫। লড়াই-বিজ্ঞান

রাষ্ট্রযুদ্ধের লক্ষ্যতা মিত্রতা বাহির হইতে বৃদ্ধা কঠিন। প্রতি যুদ্ধে লক্ষ্যতা মিত্রতার আকার পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আজ যে তোমার সহায় কাল সে তোমার বাধা। আজ যে তোমার লক্ষ্য কাল সে তোমার সম্পদে বা বিশেষ উদ্যোগী। ইহা দুনিয়ার নিয়ম।

এই ঘটিলতায় রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন যুগ স্বতঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কি? নিশ্চয়ই যায়। তাহা এই যে, প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বার্থ রক্ষা ও পুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

লড়াই বাধিয়াছে তুমি। লোকেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করে—“যুদ্ধের কারণ কি? কাহার সর্বনাশকে করিয়াছে যে লড়াই হ্রস্ব হইল?” আশ্রয় বলি—লড়াইয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে নাই। বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার যত লড়াই হইয়াছে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। একটা সোজা কারণ সর্বস্বই দেখিতে পাইবে—স্বার্থনিষ্ঠির আকাঙ্ক্ষা। ‘কথামালা’র সিংহ ও মেঘ শাবকের গল্প সকলেরই মনে আছে। প্রাচীন মিশরের ক্যারাওমিসের আদম হইতে বিস্মাকের উত্তরাধিকারী নব্য নেপোলিয়নের যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত সেই এক কথা “আমি সিংহ, তুমি মেঘশাবক—সুতরাং যুদ্ধমুখি।” ইহা ছাড়া লড়াইয়ের অন্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না তাহা বুঝিবার জন্য International Law বিষয়ক ভাড়া ভাড়া গ্রন্থ খাতিয়া লব্ধ হইয়া পড়িবার।

প্রত্যেক লড়াই সম্বন্ধে একটিমাত্র প্রশ্ন করিবে—“কে সিংহ, কে মেঘ শাবক?” কারণ আজ যে মেঘ, কাল হইত সে সিংহ।

শাচবৎসর পূর্বে আমার স্বার্থনিষ্ঠি কতকগুলি উপায়ে হইতেছিল। আজ আমি সেই সকল উপায় বর্জন করিয়াছি—এক্ষণে যে নতুন সমস্তা হইতে উপস্থিত হইয়াছে। হওয়াই বাস্তবিক। কারণ আমার বিপত্ন সফলতার প্রভাবে যুগান্তের লোকেরা আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎগতি নতুন দৃষ্টিতে দেখিতেছে। যাহারা পূর্বে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা করিত না তাহারা হইতে আমার সফলতার জীত হইয়া উঠিয়াছে। অথবা আমায়ই সফলতার প্রভাবে নতুন উদ্যোগী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই পুরাতন ভিন্নমতী, পুরাতন রাষ্ট্রবন্ধন, পুরাতন আদান প্রদান এক্ষণে বর্জন করিতেই হইবে। নতুন অবস্থা অনুসারে নতুন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতিগত সম্বন্ধে সর্বত্র এইরূপ পরিবর্তন ঘটতেছে।

“স্বর্গ-স্বিতি-প্রলয়ে” রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্ব-শক্তির অভ্যন্তরেই এই পরিবর্তন-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

“কাদে গ্রহ কাদে তারা  
জ্বল দেহে কাদে রবি,  
জগৎ হইল শান্তি হীন,  
চারিদিক হইতে উঠিতেছে  
আত্মল বিশ্বের কণ্ঠস্বর,—  
‘জান’ ‘জান’ ‘জান’ মহাসেব  
কবে মোরা পাব অবসর।”

.. . . .  
যুগান্তের আশ্রয় কহে কানি  
আমাদের নতন দেহ দাও ;  
প্রতিদিন বাড়িতেছে স্বয়ং,  
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,  
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,  
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।  
দাও দেব যরণ সঙ্গীত  
পাব মোরা নতুন জীবন।”

এই যরণসঙ্গীতে নির্ভর করিয়া নব্য ইউরোপের নেপোলিওন-অর্থুণ-সিংহ দুনিয়ার পাশতারা করিতেছিলেন। কিন্তু দিন পূর্বে

ইনি নিজেই একটা মেঘ শাবক মাত্র ছিলেন—সম্প্রতি মেঘশাবক অধঃপতন ইহার বধন্য। এই উপায়ে যুগে যুগে “সিংহ ও মেঘ শাবক”-নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাট।

• • •

### ১৬। বিস্মার্ক-ম্যাজিনি- মেটার্নিকের ইউরোপ ( ১৮৭০- ১৯১৪ )

আমরা গত বলকান সমরের সময় পাক্‌ভায়া রাষ্ট্রমণ্ডলে অট্টো-হাঙ্গারীর স্থান লব্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে বলিয়াছিলাম—“এখন দেখিতেছি অট্টো-হাঙ্গারীকে লইয়াই ইউরোপে গোল ঘাটবে। • • • অট্টো-হাঙ্গারীর একটা রক্ষা করিয়া লইবার মন্ত্র পাক্‌ভায়া রাষ্ট্র-বীরেরা পরামর্শ দিতেছেন।”

কবাতা স্ট্রিক্সে বৃষ্টিবার মন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাস বিস্তৃতভাবে জানা আবশ্যক। উহার শেষার্ধ্বে পাক্‌ভায়া রাষ্ট্রসম্রাট যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার ফলেই বিংশশতাব্দীর নেপোলিয়নের আধিকার দেখিতে পাইতেছি।

ইউরোপে বিশূল একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল ১৮১৫-১৮৭০ সালের ভিতর। তাহার পরেও দুই একটা বড় বড় ঘটনা হইয়াছে। তাহার দ্বারা তুর্ক এবং বস্কিন-পূর্ব ইউরোপের ভাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর ইউরোপের মানচিত্র ১৮৭০ সালের সীমানাভাগ অংশাংশেই এখনও অক্ষিত হইয়া থাকে।

সেই সময়ে ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানি এবং অট্টো এই চারিটি নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উহা ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, বিস্মার্ক মেটার্নিকের যুগ। সেই সময়কার প্রধান ঘটনা প্রণিহার এবং ফ্রান্সে লড়াই, কিন্তু প্রণিহা এবং অট্টোয়ার বধ ও প্রতিযোগিতাই সেই যুগের ইতিহাসের কেন্দ্র-বিন্দু। যদ্য ইউরোপে প্রণিহা কর্তা থাকিবেন কি অট্টো কর্তা থাকিবেন তাহার সীমানা বহুকালাবধি হইতেছিল। ১৮৭০ সালের ঘটনার জার্মান ভাষাভাষী নয়নাঙ্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল।

এক খণ্ডের কর্তা হইলেন প্রণিহা—তাহারই নয় জার্মান সাম্রাজ্য। বিগত ৪৪ বৎসরে ইহার সমগ্র জগতের আনন্দাঙ্কল হইয়া উঠিয়াছেন। এইমন্ত করিয়া ও ইচ্ছাও ইচ্ছাদের প্রবল ক্ষত্র।

আর এক খণ্ডের কর্তা থাকিলেন অট্টো। অট্টোকে নানাভাষাভাষী এবং নানা বর্ণা-বলবী সমাজের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইল। এরূপ অনৈক্যপূর্ণ বিভিন্নভাষাযুক্ত রাষ্ট্র ইউরোপে আধুনিককালে আর নাই। নানাপ্রকার গৃহবিবাদ যীমান্দা কর্তা ইহার ভাগ্যে ছুটিয়াছে। সম্প্রতি এই রাষ্ট্র অট্টো-হাঙ্গারী নামে পরিচিত। ইহার ফলে হাঙ্গারীর মাজিগার জাতি অনেকটা সন্তুষ্ট রহিয়াছে। অথচ ইহার প্রভাবানুসারে বহু সংখ্যক লোকই স্নাতনীয জাতিগণিত। তাহার কারণে জাতি ও স্ত্রী—বন্ধন জাতীয়-নিগেহও আত্মীয়। ইহাদিগকে দাবিয়া রাখিতে অট্টো-হাঙ্গারী বধন্য।

• • •

### ১৭। অট্টোয়ার বেদনা

এতগুলি পরস্পরবিরোধী সমাজের সমন্বয়-সাধন করিয়া উঠা সহজ কথা নয়। তাহা না পারিলে জার্মানির বিরুদ্ধেই বা প্রতিহিংসা লওয়া হইবে কি করিয়া? কাজেই অট্টো-হাঙ্গারী আর মাধা তুলিয়া জার্মানির বিপক্ষে পাড়াহাটে পারেন নাই। অবিকল ফ্রান্সকে গেলোনের যুদ্ধে ধর্য করিয়া জার্মানি ইউরোপের প্রবলতম শক্তি হইয়া পড়িলেন। স্তম্ভরূপে অট্টো জার্মানির সঙ্গে শত্রুতার পরিবর্তে দ্বিত্বতা রক্ষা করাই শেষজ্ঞান করিলেন।

এদিকে অট্টো-হাঙ্গারী বস্কিন ও পূর্বদিকে হান্স বাড়াইয়া চলিলেন। এই ধান্দেই স্বাধীন স্নাতনীযদিগের সঙ্গে বিরোধ। কোন সময়ে অট্টো কোন-স্থর স্নাত-রাষ্ট্রের বন্ধু—কোন সময়ে তাহার ক্ষুর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহায়ক। স্নাতনীযও দুই একবার অট্টো-হাঙ্গারীর সাহায্য পাইয়াছেন। এই উপায়ে স্নাতনীয-দিগকে নানা স্বাধীন অথচ নগণ্য রাষ্ট্রে বিভক্ত রাখা অট্টোয়ার সাম্রাজ্যনীতির লক্ষ্য থাকিল



ফলতঃ স্নাতকোত্তরদের ভিতর কিয়দংশ সাম্রাজ্যের বিজিত প্রজা বাকিল, কিয়দংশ ইহার protected বা রক্ষিত রাষ্ট্র হইল, কিয়দংশ দূরে পড়িয়া ইংল্যান্ডে ছাড়িয়া বাঁচিল। ঘোড়ের উপর স্নাতকোত্তর স্নাতকদের দুর্দশা বাড়িতে লাগিল।

অদিকন্ত, তুরস্ক হইতে বাণীবন্দী স্নাতকদের আকাজক্ষা এবং তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করার প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নাতকরাষ্ট্রের অন্তরে সর্বগায়ে বিরাটমান। তাহার চরম দেখা গিয়াছে সেদিনকার বন্ধন সময়ে।

সেখা বাইতেছে যে, ১৮৭০ সালের ব্যবস্থার ক্ষুদ্র স্নাতকরাষ্ট্র সমূহের প্রথম শত্রু অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারী এবং দ্বিতীয় শত্রু তুরস্ক। এই দুয়ের মধ্যে ইহাদের জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে। অথচ ইহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না। এই অনৈক্য গৃহীত করা অস্ট্রিয়া এবং তুরস্ক উভয়েরই স্বার্থ। কাজেই বিপত্তি বন্ধন সময়ে তুরস্কের একমাত্র বৃষ্টান বন্ধ ছিলেন অস্ট্রিয়া এবং তাহার আত্মীয় ও বন্ধ জাতিগণ। অল্প প্রকৃত্ত ভাবে জাতিগণেরা মূলসমান-বিগত সাহায্য করেন নাই—কিন্তু সকলেই তাঁহাদের সহায়ত্ব দ্বিত্তে পারিষাছিলেন।

স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধন সময়ে স্নাতকরাষ্ট্রেরা এক চিলে ছুই পাখী মাঝিতেছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা যুক্ত-স্নাতকরাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করিয়া তুরস্ককে পরাজিত করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার দ্বারেরও ইহারা মহা ভয় সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন। এখনও যুক্ত-স্নাতকরাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নই আনন্দকালকার যুক্ত স্নাতকদের প্রাণ।

১৮৭০ সালের সেলমালে ইউরোপে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হইল—তাঁহাই ম্যাজিনির ইতালী। একটি নবগ্য রাষ্ট্র সাম্রাজ্যে পরিণত হইল—এবং সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ ইহারই কপালে আসিল। তাহার নাম জাৰ্মানি। ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সের কোন কোন জেলা জাৰ্মানি কাড়িয়া রাখিলেন। এইখানেই ভবিষ্যৎ গোলযোগের বীজও বাকিয়া গেল। ফরাসী স্নাতকদের চূড়ান্ত অযোগ্যতা সাক্ষিত হইল—নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য গৌরব হইতে

ফ্রান্স ইউরোপের ‘পতিত’ স্নাতকদের পদে অবনত হইল।

সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইল অস্ট্রিয়ার। প্রথমতঃ প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী চির-গোলান ইতালীর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।—দ্বিতীয়তঃ ইহারা ‘হঠাৎ বড়’ স্নাতক প্রাণিয়ার নিকট পরাজিত হইয়া ম্যাজিনির, স্নাতকীয়, কোন্সটান্টিন ইত্যাদি অর্ধস্নাতক স্নাতকদের সঙ্গে সমতাগো প্রাপ্ত হইলেন। একে অপমান ও লোভ-সান—তাঁহাদের উপর নতুন সাম্রাজ্য গঠনে অনুরোধ বিস্তৃত। গত ৪৪ বৎসর ধরিয়া অস্ট্রিয়ায় এই ‘ট্রাজেডি’ চলিতেছে। বর্তমানে আমরা এই ‘ট্রাজেডি’রই মীমাংসার প্রয়াস দেখিতেছি। বস্তুতঃ অস্ট্রিয়ার বেন্দনাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়—স্নাতকদের সঙ্গে সময়ে অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইতেছে। ১৮৭০ সালের ব্যবস্থা নিতান্তই অস্বাভাবিক—তাঁহা স্বাধী হইতে পারে না।

-

## ১৮। নব্য নেপোলিয়ন

### ও বর্তমান রাষ্ট্রমণ্ডল

বন্ধনের স্নাতকরাষ্ট্রেরা তাঁহাদের যুক্ত-স্নাতকরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন এবং প্রয়াসে একজন বন্ধুও পাঠিয়াছেন। যে সে বন্ধু নন—সমগ্র ইউরোপের আশঙ্কামূলক প্রবল পরাজিত কণ। কণ এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে কনিষ্ঠ স্নাতকদের দ্বারা বিবেচনা করেন। ইনি ইহাদের অতিভাবক ও সংরক্ষক।

তুরস্কের কন্ট্রোলিনোপল দখল করিয়া প্রাচ্য ভূমধ্যসাগরের কর্তা হওয়া কনিয়ার জীবন-ব্যাপী সাধ—পিটার দি গ্রেটের আশ্রয় হইতে এই আকাজক্ষা। কিন্তু এই আকাজক্ষা চরিতার্থ হইলে কনিয়ার প্রত্যাপে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রই বাঁচিবে না। এই ভয়ে ইউরোপীয়েরা প্রথম হইতেই কনিয়ার বিকল্পে তুরস্ককে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়া আগিয়াছেন। অল্প তুরস্ককে বড় হইতে না দেখাই ইহাদের ইচ্ছা। তুরস্ক কোন যত্নে জীবনধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেই কনিয়ার দ্বার বন্ধ করা বাইতে পারে।

একত্ব ভূত্বকে যেন তেন প্রকারেণ জানেল  
অভাইয়া বাচাইয়া যাগা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবীরেরা  
নীতির মধ্যে পণ্য করিয়াছেন। ইহার নাম  
Eastern Question.

বলা বাহুল্য, প্রথমতঃ রক্তের টানে  
কনিয়ার সঙ্গে স্কট স্নানদীর্ঘদিগের বন্ধুত্ব।  
কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় টান পার্থের টান।  
কারণ বন্ধানের স্নানদীর্ঘেরা ভূত্বকে সর্বদা  
তাক্ত বিরক্ত করিয়া রাখিলে কনিয়ার কার্যই  
সত্য সাধা হয়। এমত বৃত্ত-স্নান-রাষ্ট্র  
পন্থের প্রদানে কনিয়া বিশেষ সাহায্য  
করিতেছেন। ইহার ফলে কনিয়া আজ  
অগ্নি হা ও জাখাঁবির প্রবল শত্রু, এবং ইহাঁরা  
ভূত্ব ও মূল্যমান জাতির সহায়ক।

যাতবিক পক্ষে অগ্নি হা ও জাখাঁনি বর্তমান  
রাষ্ট্রমণ্ডলে একান্ত পড়িয়াছেন। ইউরোপের  
এই নব্য নেপোলিওনের বিরুদ্ধে সমস্ত জগৎ  
ব্রতবদ্ধ। কারণে কলমে ইতালীর সঙ্গে  
বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু ইতালীর সহায়তার উপর  
কি অগ্নি হা নির্ভর করিতে পারেন? প্রথমতঃ  
গোলাম ইতালী অগ্নি হার দখল ছাড়াইয়া  
সেদিন মাত্র স্বাধীন হইয়াছেন। অগ্নি হা  
প্রতিদ্বন্দ্বী লইবার জন্য সর্বদাই চেষ্টিত।  
তাহা ছাড়া, সাম্রাজ্যিক সাগরে বন্দর ও  
বাণিজ্য লইয়া অগ্নি হার সঙ্গে ইতালীর নূতন  
মান্দা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগ্নি হার ও  
ইতালীতে যে একটা "বন্ধুত্ব" হইতে  
পারিয়াছে তাহাই আশ্চর্যের কথা!

ফ্রান্সের ত কথাই নাই। ১৮৭০ সালের যা  
খাইয়া ফরাসী নিত্যও নীরব রহিয়াছেন। সে  
আঘাত তুলিয়া থাকা বড়ই কঠিন। কারণ  
ফরাসী ভাষাতারী দুইটি বেলা জাখাঁনি ফ্রান্স  
হইতে কাড়িয়া রাখিয়াছেন। এনিগারু শোক  
ফরাসী কোন দিন তুলিতে পারিবেন কি?  
কিন্তু কোন উপায় নাই। কাজেই ফ্রান্স  
জাখাঁনি-পক্ষ কলের বন্ধ হইয়াছেন।

রক্তের টানে জাখাঁনের একমূলভূক্ত, এবং  
স্নানদীর্ঘেরা আর এক মূলভূক্ত। এই দুই  
হলের শত্রুতাই বর্তমান রাষ্ট্রমণ্ডলের প্রধান  
কথা। ফরাসী আশ্চর্যকার জন্ত কনিয়ার  
সাহায্য ও ইংল্যান্ডের সাহায্য ভিক্ষা  
করিয়াছেন। এদিকে ইংল্যান্ডের বন্ধু জাপান

এবং পর্তুগাল। আমেরিকা, চীন এবং  
আফ্রিকাও ইহাদের সকলেরই ছোট বড়  
উপনিবেশও রহিয়াছে। কাজেই লড়াই বাধিলে  
একমুখে ত্রিভূবনে বণভেরী বাজিবার কথা।

..

### ১৯। রাষ্ট্রমণ্ডলে ওলটপালট

যটনাচক্রে জাপান আজ কনিয়ার মিত্র  
হইলেন! কনিয়াও আজ ইংল্যান্ডের বন্ধু!  
এবং ইংল্যান্ডও কনিয়ার সহায়ক! কিন্তু কনিয়া,  
জাপান, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মিলন অতি  
বীভৎস ব্যাপার নহে কি? এ মিলন-চক্র কত  
দিনের সৃষ্টি? ১৯০০ সালের এশিয়া  
আগরণের পর। প্রকৃত প্রস্তাবে মাত্র ৩৪  
বৎসর হইল এই জাখাঁনি শত্রুগণ মিত্রতা-  
পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই অল্পকালের  
ভিতর যথার্থ মিলন ঘটিয়াছে কি? কাজেই  
এর উত্তরে—“ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলের  
জাতিবিভাগগুলি আর বেশী দিন বর্তমান  
অবস্থায় থাকিতে পারিবে কি?” বর্তমান  
লড়াইয়ের ফল বাহাই হউক না কেন,  
রাষ্ট্রমণ্ডলের ভারবন্ধে থাকা পূর্ণ তথা পর  
থাকিবে না—অন্তিমের ভবিষ্যতেই বিশ্বশক্তির  
নূতন সমাবেশ ঘটিতে বাধ্য।

যাও হউক, সম্রাতি স্নানদীর্ঘ ও জাখাঁনি  
প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল মাত্র এই দুই জাতির  
ভিতরই আবদ্ধ থাকিল না। ফ্রান্স এবং  
ইংল্যান্ড এই পাকের ভিতর আসিয়া  
পড়িলেন।

ইংরাজ নিত্যও অনিচ্ছায় বৃত্তক্ষেত্রে  
অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের রাষ্ট্রবীরেরা  
মহাসমস্ত্রায় পড়িয়াছিলেন। জাখাঁনির  
বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও কনিয়াকে সাহায্য করিলে  
কনিয়া বন্ধানে বদ্ধ হইবেন। ইংরাজেরা  
ইহা বেশ বুঝিতেছেন। অথচ কনিয়াকে  
বদ্ধ করিয়া ইংরাজের লাভ কি?

এদিকে ফরাসীরা ইংরাজকে মুখে ব্রতী  
করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন।  
ঊতারা পরামর্শ দিলেন—“বৃহৎ না করিলে  
ইংরাজকে জাখাঁনেরা দুর্বল বিবেচনা করিবে;  
এবং ফ্রান্স একবার জাখাঁনের হস্তগত হইলে  
ইংরাজের স্বদেশ রক্ষা কঠিন হইবে।”

ক্রান্তির কথা Times পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"It is a question of nothing less than the entire changing of the map of Europe, analogous to the change which followed the war of 1864, the war of 1866, and the war of 1870. At bottom it is not Serbia which is now at stake, it is not even Europe; it is the Balance of Power in Europe. If France, Russia, and England, forgetting history and renewing a capital error allowed Serbia to be strangled in 1914 as they allowed Denmark to be despoiled in 1864, they would be committing suicide."

অপরদিকে জার্মানিয়া ইংরাজকে পরামর্শ দিতেছিলেন—“ইংরাজেরা কিরূপ পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজপক্ষে নিজেই সুধারণা প্রস্তাব করিতেছেন। না হয় আমরা ধর্ম্ম হইলাম, এবং ক্রিয়া অলম্বিত করিল। কিন্তু তাহার পর কি হইবে? ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষা তখন অসম্ভব হইয়া পড়িবে যে!”

কাজেই ইংরাজকে গভীরভাবে ভাবিতে হইল—“কেন পথে চলি?—বশেষ রক্ষা? না সাম্রাজ্য রক্ষা?” অথচ সাম্রাজ্য রক্ষা না হইলে ইংরাজের বশেষ রক্ষাও অসম্ভব।

ইহাদের সর্বপ্রথম চেষ্টা ছিল—সান্তি-প্রতিষ্ঠা। তাহার পর ইংরাজ চেষ্টা করিলেন বাহ্যতে যুদ্ধের ক্ষেত্র ইউরোপময় ছড়াইয়া না পড়ে। দুই চেষ্টাই বিফল হইল। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের বংশধরেরা নব্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসম্ভব কঠিনতা বাধ্য হইলেন। পার্লামেন্টের রাষ্ট্র বীরগণ দেশ-বাসীকে জানাইয়াছেন—“যুদ্ধে অগ্রসর হইলেও ইংরাজের কতি, না হইলেও তাঁহাদের কতি। কাজেই ইচ্ছাকৃতকার অস্ত্র লড়াই করা বাউক।” কিন্তু ঘাত্যুগ্রিথ অথবা গ্রে কেহই কতির কারণ বিশদভাবে বুঝান নাই।

..

২০। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিবার  
যথা সময়ে পুত্রকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া পশ্চিমা সমাজের রীতি। বৌদ্ধপরিবারের

কাতিক—৩

পরিবারে স্ত্রী পরিবারই পাস্চাত্য দেশের লোকেরা পছন্দ করেন। এতদ্ব্যতীত ইউরোপ ও আমেরিকার পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গগুলিও বহুসংস্কার বিভক্ত।

উন্নতিশীল শক্তিক্রীতে পশ্চিমারা বিভাজন, ব্যবসায় ও রাষ্ট্রে শ্রম-বিভাগ-নীতির (Division of Labour) অত্যধিক প্রবর্তন করিয়াছেন। সমাজ এবং পরিবারও এই নীতির বাহিরে থাকিতে পারে নাই। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকে বহুসংস্কার বিভিন্ন বিভাগে বা প্রকারে গভীরকরণ ইহাদের বর্ধনশীল পরিণত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, শিক্ষার কথা ধরা বাউক। বিদ্যালয় ও চরিত্রগঠনের জন্য ইহারা প্রধানতঃ পিতামাতা এবং পারিবারিক প্রভাবের উপর নির্ভর করেন না। বহুসংস্কার অল্প বয়সে বালক বালিকাগণকে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দেওয়াই ইহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য। শিক্ষাদানের বাহিরে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া “বিশেষজ্ঞ”গণের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। স্ত্রীরা শ্রম-বিভাগ-নীতির প্রবর্তন এই ক্ষেত্রে বিশেষরূপে বর্তমান।

হিন্দু সভ্যতায়ও গুরুগৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সুবিধিত পায়ে। সেখানে গুরু পরিবারের ভিতর গ্রীষ্মক এক সঙ্গে পড়িয়া উঠিয়ায় যোগ্য পাথ। গোসেবা, যোগসুত্রবা ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয় চরিত্রগঠন ইত্যাদি চলিতে থাকে। পরিবারই বিদ্যালয়রূপে বিবেচিত হয়। পরিবারের ও বিদ্যালয়ের অস্ত্র দুই প্রকার বিভিন্ন কার্য হিন্দুসমাজে ‘বিরোধিত’ (differentiated) হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সেইজন্য হিন্দুর নিয়মে পরিবারই দেবালয়। সামান্য পারিবারিক জীবন-প্রবাহের ভিতরেই ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রভাব বিরাজ করে। শ্রম-বিভাগ-নীতির প্রবর্তন ভারত-সমাজে বেশী বিবেচিত পাই না। গৃহ-যেবতা, শালগ্রামশিলা, শিবমূর্ত্তি, তুলসীগাছ, আকাশ-প্রদীপ ইত্যাদি ধর্ম্ম-জীবনের নানা অঙ্গাঙ্গ পরিবারের ভিতরেই সর্বদা বর্তমান।

কিন্তু পশ্চিমসমাজে শিক্ষালয়ের বস্ত দেবালয়ও পরিবার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

“চার্ট” প্রমিতভাষ্যের নিম্নে বর্ণনীবন সম্বন্ধে বিশেষত্ব। সম্মতিত সকল কথই উচার অধীন বর্ণনায় পারিবারিক কথের বর্ণনায়। পরিবারের কার্য কথ উচার ফলে অনেকটা লভ্য ও মঙ্গল হইতে পারিবাচ্ছে।

চতুর্থতঃ, বিন্যাস ও বৈশাল্য বাস্তব পদ্ধতিমাধ্যমের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলিও এইরূপে পরিবার হইতে লভ্য ও বিচ্যুতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দরিদ্রসেবা, পশু-সেবা, জীব সেবা, লোকচিত্ত ইত্যাদি সকল প্রকার অচর্চামের ক্ষেত্রে এখানে বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সকলগুলিই পদার্থ বাবৌন, এবং সাধারণ পারিবারিক জীবন-প্রথাগণের সঙ্গে ইহাদের কোনটিই সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু হিন্দুর পরিবারই সমগ্র বিশেষ প্রতি-কৃতিত্বকণ। দুনিয়ায় সকল পদার্থই ভারতীয় পারিবারিক জীবনে স্থান পায়। দ্রুত জনগণের সেবা, ধর্মিক, অর্থনৈতিক, আত্মীয়ের পালন, গোপালন ও পোষণ, অতিথি, অতিথি-সংস্কার, উচ্চাঙ্গের ক্ষেত্রে হিন্দু পরিবারের কার্য কথ বিস্তৃত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ-সমিতির হস্তে দায়িত্ব প্রদান করেন। “পক মহাশয়” ইহাদের গৃহস্থালীর মামুলি অচর্চাম।

পাশ্চাত্য পরিবারে স্ত্রী-স্বামী এবং শিশু-সন্তান বাস্তব আত্ম কাগ্যের স্থান নাই। কাজেই অসচার বা অকথ্য আত্মীয় স্বজন অথবা দূর সম্পর্কিত বিধবা বা মাতৃপিতৃগণ বালকবালিকাগণকে পালন করিবার ক্ষমত্বের ভিতর নামাবিধ সেবাশ্রমিত স্থান করি আশ্রয়করণ। Nursing Home প্রতিষ্ঠা করিয়া রমণীমণ্ডকে লোকচিত্তকর কার্যে ব্রতী করান হইয়া থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে বিধবা রমণীরা নিজ পরিবারের ভিতরেই সেবা-প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার প্রযোগ পান। ঠাণ্ডাদিগণকে বাহিরে পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে Alms House, Work House ইত্যাদি ও আশ্রয়করণ হয় নাই।

চতুর্থতঃ, উচ্চ সভ্যতার বড় বড় অধ্যয়ন ছাত্রীরা দিলেও জীবনভাগ-নীতির অত্যধিক প্রবর্তন পাশ্চাত্যসমাজে দেখিতে পাই।

এমন কি পরিবারের ভিতর রন্ধন কার্য, চোখনালয়ের কার্য ইত্যাদিও ইউরোপে এবং আমেরিকায় নিত্যক সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চোটেল, ক্যাক, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গুলে বর্ণনোন্নতি। স্ত্রী গৃহে রন্ধন না করিলেও পরিবারের অস্থিবিধা হয় না। বরং হোটেল পেনে সস্তা উৎকৃষ্ট খাদ্যই পাওয়া যায়। কাজেই রন্ধনকার্য পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া বিশেষজ্ঞগণের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। খাদ্যের গৃহে রন্ধনাদি এখনও করিয়া থাকেন তাহারিও অনেক উন্নতির মাল চোটেল হইতে ক্রয় করিয়া আনেন। ফলতঃ রন্ধন-শালা পদ্ধতিমাধ্যমে অতি মঙ্গল।

পকমতঃ, ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহেই প্রাধান্য বা উচ্চান থাকে। পাশ্চাত্য পরিবারে তাহা নাই। নগর-সভ্যতার বিকাশ উনিশ শতাব্দীতে এত বেশী হইয়াছে যে পারিবারিক লোকালয়ে সামান্য মাত্র ফাঁকা স্থান পাওয়া হইত। কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের চিত্র মনে রাখিলেই উনিশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নগর-সভ্যতা বর্ণনায় বৃত্তিতে পারা যায়।

কাজেই গুলে “পাক”, “উচ্চান, বনকৃষি, কৃষি মসজিদ ইত্যাদি নগরের স্থানে স্থানে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এত আগ্রহ। নগরবাসীকে মুক্ত আলো ও মুক্ত বায়ুশ্বাস করিবার ক্ষমতা দিউনিসিপ্যালিটি উন্নতি পড়িয়া লাগেন।

পদ্ধতিমাধ্যমে পারিবারিক গৃহগুলি জনগণের বোঝা বা শ্রম গৃহ মাত্র। মাঠে না আসিলে open air ভোগ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। শ্রমকার্য গৃহে হইক, স্বাস্থ্য অর্জন বাহিরে হইবে, — শ্রুতগা দিউনিসিপ্যালিটিতে এবং পরিবারে প্রম-বিভাগ সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি।

ভারতবর্ষের লোকেরা খরে বসিয়াই স্বাস্থ্যকর প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিতে পার। এক্ষেত্রে মুক্ত বায়ু আকাজ্য। এখানে উৎকৃষ্ট ভাবে দেখা দেয় না। পাশ্চাত্যদেশেও বর্তমান পট্টাভ্যাস ছিল ততদিন দিউনিসিপ্যালিটিকে একত্র ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত না।

গভীর ভাবে দেখিলে বৃষ্টিব বৈ, এক

পরিবারকে ভাঙিয়া পাঁচাত্তা দেখে ২০১০টি  
ব ব প্রধান প্রতিষ্ঠান স্থিতি করা হইয়াছে।  
ভারতবর্ষে পারিবারিক জীবনের ভিত্তর  
নিম্নাট এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য হয়।  
মানবজীবন চিন্তা বিধানই বৈচিত্র্যময়  
এবং ঐশ্বর্য পূর্ণ নচে কি ?

• •

## ২১। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম

আমরা হিন্দু। বর্ণাশ্রমধর্ম আমাদের  
সম্প্রদায়। এখন এই বর্ণাশ্রমধর্ম আমাদের  
উন্নতির পথে অস্তরায় হইতেছে কি না,  
তাঁরা অনেকই ভাবিতেছেন। কেহ বলেন  
ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম সম্পূর্ণ গোপ  
পাইলেনই, প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে।  
কেহ বলেন, বর্ণাশ্রমধর্ম আছে বলিয়াই  
ভারতবর্ষ এখনও টিকিয়া আছে। উদ্ধৃত্ত  
বিদ্বত্তীভূত ভট্ট মহাশয় 'ভারতবর্ষে' এতৎ-  
সম্বন্ধে সন্নিবেশ আলোচনা করিয়াছেন।  
তাঁহার আলোচনা হইতে আমরা কিয়দংশ  
উদ্ধৃত্ত করিয়া দিতেছি।

'ইউরোপীয় সমাজ আদি জাতির সহিত  
জাতির সংঘাত, সংঘর্ষে সহিত দুর্ভিক্ষের  
সংঘর্ষ, ধর্মীর সহিত নির্ধর্মের যুদ্ধ, অর্থের  
সহিত শ্রমের অভিসংঘাত,—সর্বত্র আঘাত,  
সংঘাত ও প্রতিঘাত। আমাদের প্রাচীন  
সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিয়াছিলেন যে, যদি  
ক্রমাগত এই আঘাত সংঘাতের মধ্যেই  
মাছুষের জীবন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে,  
কখন সে সেই অতিমুহুর্ত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ?  
কখন সে জীবনের দাড়া একমাত্র লক্ষ্য,  
সেই 'পরমোপশান্তি' দিকে যাইবে ? মুহূ-  
সংসারগণসংগ্রাম যদি আপনাকে উদ্ধার করিতে  
না পারে, তাহা হইলে যে তাহার কিছুই  
হইল না! তাই তাঁহারা ব্যতিরেক যুদ্ধ  
করাইবার জন্য বর্ণ-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া-  
ছিলেন। স্বার্থকে ক্ষুদ্র পণ্ডিত মধ্যে আবদ্ধ  
করিয়া পরমার্থের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।  
স্বার্থ সেই জন্য উচ্চ খল হইতে পারে নাই,  
আপনার ক্ষুদ্র পণ্ডিতকে ছাড়িয়া পরকে  
আঘাত করিতে পারে নাই—সমস্তঃ দাওয়াতে  
না পারে, সেই চেষ্টাই আমাদের সমাজ-

নিয়ামকগণ করিয়াছিলেন। বাচাতে বৈশ্বের  
ধনোপার্জন-চেষ্টা, ক্ষত্রিয়ের স্বতন্ত্র-  
প্রকৃতির আঘাত করিতে না পারে, ক্ষত্রিয়  
বাহন, ব্রাহ্মণের তাগের মধ্যে আঘাত  
করিতে না পারে, এবং ক্ষত্রিয় নিঃস্বার্থ-সেবা,  
মৌল্য মানব বলিয়া না অস্বীকৃত হয়, ইহাই  
তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আবার ক্রমাগত এক বারমাত্র থাকিলে  
মাছুষের বৃদ্ধ বার্ধক্য পানাপ্রাচীর বদ্ধ  
হইয়া অসুখাপন্ন হইবার যে ভয় ছিল, তাহা  
আশ্রম-ধর্মের দ্বারা প্রতিরোধিত হইত।  
বর্ণধর্মের অমিত্য মানা বাধার চেষ্টা, আশ্রম-  
ধর্মের আঘাতে ভাঙিয়া যায়। এই আশ্রম-  
ধর্মের আঘাতে বার্ধক্য পানাপ্রাচীর ভাঙিয়া  
মানবায়ু পরাধীনতার উন্মুক্ত আকাশে বিস্তৃত  
করিতে পারিত। তাহা পূর্ক—

'পৈন্যবৈভ্যত বিজ্ঞানঃ যৌবনে বিমলগিহাৎ  
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তনাং যোগানান্তে তদ্ব্যাপারঃ'

এই কথাক্রান্ত মতাক্ষরিতের কথা এই  
বর্ণাশ্রম-ধর্মী হিন্দুগণের মধ্যে হইয়াছিল।  
তাই তখন গৃহস্থগণ—'ধনীয় জীবনকেই  
পর্যবে প্রাক্কলনকৃত' মনে করিয়া আপনাদের  
গৃহ, অতিথি-আনাথের জন্য বিদ্বৃত্ত করিতেন।  
এবং সময় হইলে সমস্তই ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস  
হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। বর্ণ-ধর্মের  
ক্ষুদ্র, আশ্রমধর্মের এক আশ্রম হইতে অন্য  
আশ্রমে যাইবার চেষ্টায় বৃদ্ধের মন-জীবনের  
দিকে দৃষ্টি হইত। তাই তখন বাল্যে স্নান  
মধ্যে ও শ্রুতের দেহাধর্মের মধ্যে বিদ্বাদির  
জীব নিঃস্বার্থ পরোপকারীর ভয় হইয়াছিল।  
আশ্রমধর্ম বিশ্বাসিতাছে যে সন্ন্যাসের জীবনের  
চরমলক্ষ্য নয়, স্বার্থই জীবনের পরমার্থ নয়।  
তাই, এখনও এই সন্ন্যাসের ত্যাগীর এত মাত্র,  
সন্ন্যাসীর এত উচ্চ স্থান।

খল সেধিয়া যান তাহা অস্বাভাবিক করিতে  
হয়, তাহা হইলে বর্তমান উত্তরাংশের সংস্থা-  
ধর্মী সমাজের নিখাদপের মধ্যে বে. কোথাও  
না কোথাও ঘোর আছে, ইহা নিশ্চিত।  
যদি আঘাত প্রাচীনাটই জীবনের একমাত্র  
উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই  
স্বীকার করিতে হইবে যে আধুনিক ইউ-  
রোপীয় সমাজ নিখাদপের মধ্যে সমাজ-কল্যাণ

কোনও না কোনও স্থানে তুল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ইহার উত্তরে হয় তো বলিবেন যে, ইউরোপ তাহার সমাজ, কাহারও দ্বারা গঠিত হইয়াছে, বলিয়া স্বীকার করে না; ইউরোপীয় সামাজিক ইতিহাসে এতদূর কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অস্তিত্ব করুনও ছিল না। এবং তাহা ছিল না বলিয়াই ইউরোপীয় সমাজ একটা অস্বাভাবিক, বাবাধীন প্রাণহীন একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে। এইতদূর কোন সম্প্রদায় জন্মে নাই বলিয়া ইউরোপ একটা মন্ত বিপন্ন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ভারতে সেই বিপন্ন উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সমাজ আজ প্রাণহীন।

বাধিয়া বেওয়ার একটা আশঙ্কার কথা এই যে, অস্বাভাবিক সংস্কার নামক একটা প্রবল শক্তির প্রভাবে যাহাযের নড়িয়া চড়িয়া বিবিধ শক্তি কমিয়া আসে। কিন্তু প্রায় এই যে, ভারতে যখন বর্ণপ্রভম প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন কি ভারতবাসী এইরূপ অন্ধত্বের তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল? পৌরাণিক যুগ ছাড়িয়া বৌদ্ধযুগে ভারতবাসীর ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া, এমন কি, ভারতবর্ষের বাহিরেও রহিয়াছে। অথচ বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্বের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে গুপ্ত-অশ্বাধি রাজবংশের নবহিন্দুযুগে হিন্দুগণের প্রবল কর্তৃত্বপন্থার নিদর্শন রহিয়াছে। বর্ণপ্রভম বর্ষাই, আমাদের অংগপন্থনের একমাত্র কারণ হইলে, শক হানাদির আক্রমণের সময়েই ভারত হইতে আবাদ্য নাম লুপ্ত হইয়া বাইত।

এই কল্প আমাদের মনে হয় যে, ভারতের সামাজিক জীবনের উপর বর্ণপ্রভম কখনই কঠিন নিগড়ের দ্বারা কাঁচা করে নাই। পরন্তু

বর্ণ-ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আভ্যন্তর-ধর্মের দ্বারা তাহা মননের দিকে—মুক্তির দিকেই ভারতীয় জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এই বর্ণ-ধর্মের সহিত যদি আজ আভ্যন্তর-ধর্মের সাহচর্য থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সমাজকে মৃত সমাজ বা মরণোন্মুখ সমাজ বলিবার শক্তি কাহারও থাকিত না। আজ আমরা আমাদের সমাজ-তত্ত্বের দুইটি ক্ষেত্র — আভ্যন্তর ও বর্ণ-ধর্মের একটিকে কেলিয়া দিয়াছি। তাই আজ আমরা একস্থানে দাঁড়াইয়া লগ্নের-লগ্নের ক্রমাগত পাক খাইতেছি;— তরী আর অগ্রসর হইতেছে না। জানি না এই পাক খাইতে খাইতে কখন কোন্ আবর্তের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্তরে তলাইয়া পাইব।

বিভূতি বাবু বর্ণ ও আভ্যন্তর-ধর্ম সংস্করণের মতাবলম্বী। বাস্তবিকপক্ষে সবদিকে সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, যথোচ্ছাচারিতা নিবারণ করিতে হইলে, বর্ণধর্মের প্রবল বেগকে দমন করিতে হইলে বর্ণ ও আভ্যন্তর-ধর্ম ছাড়িয়া সমাজ হৃদয় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। চরিত্রনিহতা আভ্যন্তর-ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক কেবল মাত্র বর্ণধর্মকেই মূঢ়গর্বে আশ্রয় করেন, তাহারা অন্ধকণ্ঠাই। কিন্তু বাহ্যিক ভারতবর্ষীয় সমাজকে ইউরোপীয় আদর্শে গড়িতে চাহেন, তাহারা বড়ই কঠোর। হৃদয় বহু প্রাচীনকে অকীটন দ্বারা তাড়িত করা কখনই বিজ্ঞ বিবেচকের কার্য নহে। আমরাও সংস্কার প্রার্থী। কিন্তু যে সংস্কারের মধ্যে বেচ্ছাচারিতা প্রচ্ছন্ন, যে সংস্কার পৌরোহিত্য পুথ্যোপকরণে বিভাগ না করে, যে সংস্কার ধর্মের নামান্তর মাত্র, যে সংস্কার সর্বত্র মঙ্গল প্রদান করে না, সে সংস্কার আমরা চাহি না।



## ভূস্বামী ক,—কৃষক না জমিদার ?

জমিদারস্বত্বীয় মামলার কারণ

বাংলা দেশের প্রজাপন্থ বিদ্যক আইনের ১৮৩ দ্বারা লইয়া একটা কঠিন সন্দেহ পাড়াইয়াছে। জমিদারের অহুমতি না লইয়াও প্রজা জমি বিলি করিতেছে; যেখানে জমিদারকে দেলামী বা দর্শনী কিছু দিলেই জমিদার নূতন প্রজার নাম জারি করিবেন দেখানে কিছু গোলমালের কারণ নাই, কোর্ট দেখানে প্রজার জমিবিবির কোন আপত্তি দেখেন নাই। কিন্তু যেখানে একজন কোন প্রাদেশিক প্রজা নাই সেখানে প্রজা জমিদারের বিনা অহুমতিতে জমি বিলি করিলে জমিদার ইচ্ছা করিলে নূতন প্রজার নামজারি না করিলেও পারেন। কোর্ট একেজ্ঞে—কি করিবেন ? জমিদারের আপত্তি শুনিবেন না প্রজার জমি বিলি বদায় রাখিবেন ? বিভিন্ন কোর্ট বিভিন্ন বিচার করিয়াছে;—হাইকোর্টের এ বিষয়ে এত মতের অসামঞ্জস্য আছে যে একটা মহা গোলমাল ও অনিশ্চয়তা উপস্থিত হইয়াছে। এই অনিশ্চয়তা হাইকোর্ট বলিয়াছেন, জমি-বিদ্যক মামলার ক্ষত্র বিশেষ পরিমাণে দারী। একটা শেষ মীমাংসা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গতবর্ষেই এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার ক্ষত্র একটা নূতন আইনের বসড় প্রস্তুত করিয়া দেশবাসীর মতামত চাহিয়াছেন। নূতন আইন ১৮৮৫ সালের আগষ্টের পরিবর্তে প্রাতিবে। এই নূতন আইন অহুসায়ে জমিদারকে নূতন প্রজা কিছু দর্শনী দিলে তিনি তাহার নাম জারি করিতে বাধ্য থাকিবেন,—এই দর্শনী জমির বাৎসরিক খাজনার পাঁচ ভাগের অথবা জমির মূল্যের সিকি ভাগের অধিক না হয়।

সনাতন কৃষক

আমাদের বিশাল আবাদের কৃষকগণের আপনাদের জমি বিলি বিক্রয় বা দান করিবার স্বত্ব পূর্বে সম্পূর্ণ পরিমাণে ছিল। হিন্দু আমলে ছিল, মুসলমান আমলেও ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ পরিবারের বন্ধন খুব দৃঢ় থাকতে এই স্বত্ব বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু প্রকটিত হয় নাই বলিয়া প্রজার জমি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব ছিল না বলিলে হিন্দুর জমি বিদ্যক আইনের জরমবিক্রয়ের অব-মাননা করা হয়। ইংরাজ আমলে আধুনিক জমিদারের স্বত্ব হইয়াছে। রাজনা আবাদ করিবার স্থবিধা বিধানের ক্ষত্র জমিদারের স্বত্ব। জমিদার আসিল, কৃষকগণের জমি-বন্ধের হানি হইল। ভূইকোড় জমিদার উঠিল, সনাতন কৃষক তলাইয়া গেল। সে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বেই কথা,—১৭২৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলের কথা। কল কথা কৃষকগণ যে পূর্বে সম্পূর্ণ ভাবে জমিষত্ব ভোগ করিত তাহা তাহার। আর করিতে পারিল না, চাণক্যের অর্ধপাত্র, শুক্র-নীতি—নারদ, দ্রোণ, বৌদ্যপের স্বত্র পাঠ করিলে, আইনী আকবরীও পাঠ করিলে আবাদের প্রজার কিরণে জমিষত্বের হানি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিব। কৃষকদিগের দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য, দেশের কুড়ী সন্তান-গণ সে ইতিহাসের খোঁজ রাখ না।

ভূইকোড় জমিদার

১৭২৩ সাল হইতে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত তারিতে বৎগুলি জমি বিদ্যক আইন জারি হইয়াছে সবগুলিই প্রজা অপেক্ষা জমিদারের

হুবিধা অধিক পরিমাণে ঘেঁষিরাছে। ১৮৪২ সালের পর চইতে দর্জখেন্ট প্রকার হুবিধা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—জমিদারের অস্বাভাব্য চইতে প্রত্যেকে রক্ষা করিতেছেন। ১৯১৪ সালের এই প্রস্তাবিত আইন প্রত্যেকে জমি হস্তান্তর করিবার স্বাধীন দিতেছে, কিন্তু তবুও জমিদারের প্রভুত্ব বহিষ্কারে। প্রচার জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার ফিরিয়া আসা অসম্ভব। যদি অসম্ভব না হয় তবে বিশেষ কষ্টসাধ্য। একটা স্বাধীন বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিলে ভোগেরও পক্ষে তাহা শ্রীত ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন,—ইংরাজীতে যাহাকে বলে vested interest তাহার শক্তি বড় কম নয়।

### চালের হার বৃদ্ধি

কিন্তু এই vested interest এর প্রভাব চেষ্টা বেশের কৃষিকার্য ও ধনবৃদ্ধির কতদূর অন্তরায় হইয়াছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া যেছেন নাই? প্রত্যেক দেশেরই কৃষিকার্য কল্লের উপর চলে। কৃষক টাকা ধার করিয়া কৃষিকার্য চালায় এবং টাকা ধার করিবার তাহার একমাত্র সচায় ও লবল তাহার চনি। জমির উপর যদি তাহার সম্পূর্ণ অধিকার না থাকে তাহা হইলে সে কি করিয়া সহজে টাকা কর্জ করিতে পারে? আমাদের কৃষকের সম্পূর্ণ জমিদার নাই বলিয়া সে অল্প হুবে কর্জ করিতে পারে না। যে কর্জ ঘের সে জানে তাহার পক্ষে জমি অধিকার করা মানসা মোকদ্দমা ভিন্ন বা জমিদারকে একটা বেসী টাকার সেনামী বেওয়া ভিন্ন সম্ভব নহে। তাই আমাদের কৃষক জমি বন্ধক দিয়াও অল্প হুবে টাকা কর্জ পায় না। হুকের হার খুব বেসী বলিয়া আমরা মহাজনকে গালাগালি দিয়া থাকি, কৃষককে নিরুচ্চি অপরিণামজনী

বলিয়া থাকি,—কিন্তু বেসী হুকের কারণ মহাজনের নিখাতন অথবা কৃষকের অপরিণামজনিত। নহে, তাহার কারণ আমাদের জমির বে-বন্দোবস্ত তাহা স্পষ্ট হই।

### জমির মূল্য হ্রাস

হুপ হুবে হার যে জমির বে-বন্দোবস্ত চেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, জমির মূল্যও এই কারণে অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। যে জমি ক্রয় করে সে জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারিবে কি না তাহা অনিশ্চিত,—এই অনিশ্চয়তা জমির মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ সম্ভব নাই। যে সকল স্থানে জমিদার অপরিণামজনী ও কমতা-শালী সেখানে জমির মূল্য খুব অধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত চহ বেঝা যায়। এ ক্ষেত্রে কৃষিকার্য কিছুতেই হুস্পার হইতে পারে না। ইহা ছাড়া জমির আদান প্রদানের কোন প্রতিবন্ধক থাকিলেই ধন-বৃদ্ধি অসম্ভব। জমির অবাধ আদান প্রধান চইলে জমির যে সর্জাপেক্ষা স্খাবহার করিবে তাহার হুতে পৌছিব। একটা তর থাকিতে পারে, মহাজনের হুতে জমি হাইলে জমির স্খাবহার হইবে না, কৃষকসুল নিরাস্র হইবে। Deccan Agriculturist's Relief Act, Punjab Land Alienation Act এর মূলে এই আপত্তি। এখন এ আপত্তির কারণ নাই, আমরা বৈবহিক জীবনে একগ উন্নতি লাভ করিয়াছি যে এ আপত্তি করিয়া জমির অবাধ আদান প্রদানের প্রতি-রোধ করিলে ফলে অনিষ্ট হইবে, জমির মূল্য বৃদ্ধি ও স্খাবহার হইবে না।

### জমির অবাধ আদান প্রদান

আর জমির আদান প্রদান ত হইতেছেই। বাংলা দেশে ১৮৮৪ সালে ৪৩,০০০ একর



১৮১৩ সালে ২৪০,০০০ সংখ্যা রেজিষ্টারী পাটায় প্রজাবন্ধের আদান প্রদান হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৌজিক ও বৈজ্ঞানিকী না করিয়া যে কত জমির আদান প্রদান হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন জমির আদান প্রদান অব্যক্তভাবে তখন জমির আদান প্রদানের প্রতিরোধ না করিয়া বাহ্যতে উগা কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের সচায় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমি অধিক বিক্রয় হইয়া খুব ক্ষুদ্র হইলে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটে, এক্ষেত্রে জমির আদান প্রদান একবারে সম্পূর্ণ অব্যাহত না করিয়া একত্র একটা ব্যবস্থা রাখা উচিত যে জমি যেন হস্তান্তরিত হইবার সময়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার না হইয়া পড়ে। কৃষক আপনায় সুবিধামত জমিকে ঘত ইচ্ছা ভাগ করিয়া বিক্রয় না করিতে পারে। উক্তিস্থার নূতন প্রজাবন্ধ বিষয়ক আইনে একটা ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। আমাদের এই নূতন আইনের বসড়ায়ও এ ব্যবস্থা আছে। খরিশাম প্রজাবন্ধ বিক্রয় হইল, এখন জমিদার ক্রেতা মাত্রকেই কি আপনায় প্রজা, বলিয়া স্বীকার করিবে? নূতন আইনের বসড়ায় আছে, যদি সে প্রজা গ্রামবাসী না হয়, যদি সে কৃষক না হয়, যদি তাহাকে জমিদার কোন কারণে উপযুক্ত প্রজা বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে সে প্রজা বলিয়া স্বীকৃত হইবে না, জমি বিক্রয় বন্ধ হইবে। অল্প বেশে বেঘানে কৃষকই আপনায় জমির সম্পূর্ণ অধিকারী সেখানে এ সকল কথা উঠে না, এ সকল কথা উঠিতেছে কারণ আইন এক্ষেত্রে জমিদারের স্বাধীন স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, একবারেই কৃষককে জমির অধিকার দেয় নাই।

## ইউরোপীয় কৃষকের স্বাধীনতা

কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের জন্য সকল দেশেই কৃষকের জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার দান একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দেখা গিয়াছে। আয়ারল্যান্ডের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিব, কৃষকের জমি-স্বত্বহানি সেখানে কৃষিকার্যের কতদূর ক্ষয়ব্রূণ হইয়াছিল। আয়ারল্যান্ডের কৃষক জমির উপর আপনায় দাবী আদায় করিয়া লইতেছে। এক্ষণে আয়ারল্যান্ডের কৃষি অনেক বিষয়েই জগতের আদর্শ হইয়া গিয়াছে—কৃষক আপনায় দাবী অধিকার লাভ না করিতে পারিলে ইহা কি কখনও হইতে পারিত? গত বালকান যুদ্ধের সময় রোমানিয়ার অর্থ ও লব্ধির বিবেচনায় অনেকের নজর পড়িয়াছিল। রোমানিয়াতে কৃষি বৎসর পূর্বে একটা আইন ছিল, সে আইন অনুসারে জমি সমাজের একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, জমির হস্তান্তর হওয়া অসম্ভব ছিল। সে আইন রদ হইয়াছে,—সে আইন রদ হইবার পরই রোমানিয়া কৃষিকার্যে বিপুল উন্নতি লাভ করিয়াছে—ক্ষণ-পূর্বে ইউরোপে রোমানিয়ার কৃষকের অবস্থা সর্বাঙ্গতঃ ভাল।

## ভারতের ভূস্বামী কৃষক

তাই বলিতেছি, যতদিন না আমাদের কৃষক জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারে ততদিন কৃষিকার্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। দৌঃ-স্বপ্ন-বান-প্রণালী প্রচার করিলে অবস্থা আইন দ্বারা পরিবর্তন হইবে না। কম্বাইয়া নিলেও কৃষিকার্যের দাবী উন্নত হইবে না। মহা বলিঘাছেন, জমি তাহা হইবে যে সকল পরিষ্কার করিয়াছে ও বনের হাণিককে মারিয়াছে। জমি যে চাষ করে সে-ই সনাতন জমিদার—সমাজ নূতন

জমিদার সৃষ্টি করিলে, জমিরও অবনতি হইবে চাষেরও অবনতি হইবে,—সকল দেশের ইতিহাসে এই কথাই সাক্ষ্য দিয়াছে। বিশেষতঃ, আমাদের ইতিহাসে, কৃষক ভিন্ন অন্য কোন কৃ-ষামী ছিল না। রাজাই হউক বা সমাজ-তন্ত্রই হউক কৃষকের সনাতন শ্বশুর উপর কেহই আপনার অধিকার বিস্তার করে নাই। তখন খাজনা আদায় ছিল না,—“বলি”—দান ছিল।

“প্রজানামেব কৃত্যর্থং স তাত্তো বলিগ্রহীৎ।  
সহস্রগুণমুৎকৃষ্টমাসত্তে হি রণা রবিঃ ৫”

বর্জমানের প্রস্তাবিত আইন জমিদারের কৃষাবীজ বন্ডায় রাখিয়াছে। পূর্বে জমিদারের অহমতি ভিন্ন জমি হস্তান্তর করা প্রজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এক্ষণে—জমিদারকে তাহার প্রাপ্য দিলেই জমি হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে। কৃষকের জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল,—পূর্বের শ্বশুর বংশসামান্য পরিমাণ তাহাকে এক্ষণে কিরিয়া দিবার কথা উঠিয়াছে। পূর্বের শ্বশুর সবটুকু কিরিয়া না পাইলে কৃষকের পূর্ক অবস্থা কিরিয়া আসিবে না এই বিবেচনায় এত কথা বলিলাম। বর্ত্তমান আমাদের কৃষক সম্পূর্ণ শ্বশুর না কিরিয়া পায় ততদিন এ সকল ছোট বাট আইনের ব্যবস্থার দ্বারা কৃষকের উন্নতি-সাধনচেষ্টা চলিত কথায় ‘গর মেরে জুতা দানে’র মত ঠেকিবে।

#### কর্তব্যব্যবোধহীন জমিদার

কথাটা অনেকটা রূঢ় শুনাইতেছে নিশ্চিত। আমাদের অবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। আমাদের সমাজ জমিদার বাবু আমাদের প্রবোধ বিলাস আলস্রকে এতই প্রব্রয় দিয়াছে, কর্তব্য বোধহীন জমিদার বাবুকে এতই সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছে, যে কৃষকের শ্বশুর আলোচনা

করা বা জমিদারের কর্তব্য ইহীত করা সকলেরই পক্ষে রূঢ় শুনায়। ইংলেণ্ডে লয়েড জর্জ জমিদারদিগের সম্বন্ধে ব্যাক করিয়া বলিয়াছিলেন, একটা ভিউক বাইলে একটা স্ট্রেন্ডনট হইবে সেত ডালই ভিউকদের রাষ্ট্র অধিকার কমাইয়া দাও, তাহাদের আবার পলিটিক্স কি, তাহাদের পলিটিক্স,—পার্বী—প্যাট্রিক। লয়েড জর্জ ইংলেণ্ডে কৃষকের শ্বশুর আলোচনা করিয়াছিলেন, সমাজে ভিউকদিগের স্থান নির্ণয় এবং কৃষকদিগের নিকট তাহাদের কর্তব্য ইহীত করিয়া ছিলেন। এদেশে লয়েড জর্জকে আমাদের সমাজ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না।

#### পালক জমিদার

আমাদের সমাজকে ইহার অল্প বোঝা সাব্যস্ত করা অসুচিত। সমাজ-জীবনের নিয়মই এই কিছুদিন একটা কোন ব্যবস্থা চলিলে তাহার উপর এমন একটা দায়া বসে যে তাহাকে ত্যাগ করা হুকটিন হয়,—সুধু দায়া নহে, সমাজের সহিত তাহার অনেক-দিনের একটা পরিচিত উপকারী বন্ধুর সম্বন্ধ লগ্নায়, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। জমিদার জুইফোড হইলেও তিনি এতকাল সমাজের কি হিতসাধন করেন নাই? কৃষকের শক্তিতে তাহার হইয়াছে,—এক পুঙ্খ দুই পুঙ্খ কৃষক আপনার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া জমিদারকে তাহার শত্রু ভাবিয়াছিল নিশ্চিত, কৃষকের শক্তিতে জমিদার কীভাবে হইয়াছেন, কৃষক তাহার সহিত কোঁকের তুলনা দিয়াছিল নিশ্চিত; কিন্তু পুরাতন প্রথার একরূপ মহিমা সে পুরাতন বলিয়া সর্ব্বজন প্রিয়। কৃষক কয়েক পুঙ্খ পরে আপনার শ্বশুর কথা তুলিয়া গেল, জমিদারকে জমির সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতে লাগিল, জমিদার

কৃষকের মা-বাপ হইলেন, কৃষক তাঁহার মেহ ও ঘরে পালিত হইতে লাগিল। আমাদের দেশে প্রকার সহিত জমিদারের সম্বন্ধ ইউরোপের মত শুধু অর্থের সম্বন্ধ হইতে পারে নাই।—ইহা আমাদের সমাজ, আমাদের চরিত্রের গুণ। জমিদার সমাজের মত প্রত্যেক পালন করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী হইতে হয়। জমিদার শোষক হইয়া সমাজে লজ্জাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, সমাজের গুণে তিনি পালক হইয়া পাড়াইলেন। কৃষকের জমিদারের লোপসাধন করিয়া জমিদারকে নষ্ট করিয়া এবং একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারই হাতে প্রকার রক্তবাহেষ্ণুর ভার অর্পণ করিয়া এক্ষণে এখন তিনি পালক হইয়াছেন—যদি তাঁহাকে শোষক ভাবিয়া দণ্ড দেওয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত অস্বাভাবিকের মত কাজ হয়। একশত বৎসর ধরিয়া সমাজ জমিদারের শক্তির পুষ্টি-

সাধন করিয়াছে, সে শক্তি লোকসাধারণের একান্ত প্রতিকূল নহে, এক্ষণে সে শক্তির লোপসাধন করা, এবং যে কৃষক তাঁহার স্বাধীনতা হারাষ্টা এক্ষণে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া দান করা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কৃষকের কৃষকের হানি কখনই কৃষিকাখ্যের উন্নতির অগ্রকূল নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে, অপরাধকে জমিদারশ্রেণী কৃষকসমাজ করিয়া সমাজে এককাল যে একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে এবং সে অভাব যে জন-সমাজের প্রতিকূলে পড়িয়া নাই ইহাও মনে রাখিতে হইবে। কৃষকবিষয়ক আইন প্রণয়ন করিবার সময়ে দুইদিকেই নজর রাখা কর্তব্য, তাহা না রাখিলে উপকার করিতে পারিবে না।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ.  
অধ্যাপক, কলকাতা কলেজ, বহরমপুর।

## ভারতের একত্ব

‘কণ্ঠামণ্ডল ইউনিট অফ ইণ্ডিয়া’ নামে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বাবু যে পুস্তক বিলাতে ছাপাইয়াছেন, মিটার নামে ম্যাকডোনাল্ড নামে তাহার কুমিকা লিখিয়া বিয়াছেন। ঐ কুমিকায় সাহেব বলিয়াছেন যে, এই ঐতিহাসিক গবেষণার অনেক ব্রাহ্মণৈতিক কথা মনের মধ্যে উঠে এবং ভারত যে শুধু হিন্দুর দ্বারা আধাবৃত নহে তাহা মনে পড়ে। ভারতে মুসলমানও অনেক করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমলিন্দ্রনাথ ঠাকুরের “পাহাড়াগানের বৃত্তা” চিত্র পারদিক শিক্ষার প্রভাব দেখায় ইত্যাদি। বলার উদ্দেশ্য এই যে হিন্দুর মধ্যে একতায়

সমগ্র ভারত-সমাজের একতা স্থাপিত করে না। কিছু কে বলিতেছে যে মুসলমান ভারতের অস্থিভাঙ্গার যথেষ্ট নহেন? তবে মুসলমানের ভারত নয় যে আরবদেশ হইতে হয় নাই—ভারতেরই অন্তর্গত পাকিস্তানের প্রদেশের “মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভারতের এক প্রদেশ বাসীরা” ঘরাই হইয়াছিল এবং সেই উপলক্ষ্যে কিছু লৈয়খ ও কিছু যোগল বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর কৃত-মুসলমানদিগের সহিত যথার্থ সমা ও মৈত্রীর আবেগে যথার্থভাবে অনেকটা মিশিত হইয়া গিয়াছেন “তাহা” সকলের

মনে থাকে না। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানের ভারত জয়, মুসলমান “ধর্মী” বলদী ভারত-আসামীর স্বাধীন ঘটিয়াছিল বিশেষের দ্বারা ঘটে নাই। যেমন হুদুদবিষয়, বিরুদ্ধাচারিতার, চন্দ্র গুপ্তের, অশোকের সময় সাম্রাজ্য স্থাপনে এবং পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থানে ভারতের প্রদেশ বিশেষের অধিবাসীরা বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল। সন্তান রাজ্য স্থাপনে গাঙ্গার-বাসীরা (তখন মুসলমান—যেমন অশোকের সময়ে মগধ বৌদ্ধ ছিল) বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছিল। ফলতঃ সাধারণতঃ বলা যায় যে ভারতবাসী মুসলমান অনেকেরই হিন্দুর ত্রাণের পাত্র স্বভাব সম্পন্ন এবং গ্রামবাসী ও পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহিত প্রবণ। এক কথায় কোমলতর মনোভাব সম্পন্ন।

ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান প্রকৃতই ভাই ভাই। “দেশের কথা ভাব ভাইরে দেশ আমাদের বাতায়ি। হিন্দু মুসলমান এক মার সন্তান পৃথক কেন করজী হুতাবেতে দুয়ার বেঁধে একই দেশে বসতি।”

—অতি প্রকৃত কথা। একট মার সন্তান যদি এত পর বৎসরের পরেও পুরোঁক করে লক্ষ আঙ্গুল দেখে ও সৈয়র মোগল সবেছে কেহ বলিতে না চাহেন তাহা হইলেও “বুধভাই” বলিয়াত স্বীকার করিতেই হইবে।]

সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে “মুসলমানের সাম্রাজ্যাধিকারে ভারতের চির অভিলক্ষিত সম্মিলন ভারতের কেন্দ্রীকৃত হিন্দী ভাষার প্রসার দ্বারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।” ফলতঃ আজ চট্টগ্রাম হইতে পেনসোয়ার পর্য্যন্ত এবং শুভা হইতে সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত মুসলমান যাকেই হিন্দী ভাষা করিতে পারেন বলিয়া ভাষাধর্মের সর্ব্ব প্রমোদের প্রতিবাসী অনেকেরই হিন্দী বুঝিতে পারেন।

ভারতবর্ষের একতা সবেছে সম্মিলন ইংরাজ লেখকদের সর্ব্বদা লাগান সাহেব। সাম্রাজ্যের প্রতি যে নিখুঁত দৃষ্টি বিচারে এবং প্রচারে পোষণে তাহা তুলনা; গিয়া এই সকল কুট রাজনীতিজ্ঞেরা মনে করেন যে “ভারত কখন এক ছিল না, এক চাইবে না” এই বলিলেই বুঝি লক্ষণে তাই ভাবিবে এবং তাহা হইলেই ইংরাজ রাজ্যের কি একটা বিষয় বিপদ কাটিয়া যাইবে। ভারত এক,—বিধা-ভারত স্বীকৃতি। উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে সমুদ্র ইহা এক দেশ।

মল ভক্তির মতে

“গণেশ বহুনে চৈব গোমাযরি পরমতি নর্থমে সিদ্ধ কাবেরি জলেনিন্ সন্নিকি হুহ।” ভারতের একমু সিদ্ধ হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত স্রবণ করাইয়া প্রত্যাহই দিতেছে।

বাচ্যরূপী সম্মিত ভারতভূমির লম্বগ্রন্থী সতী মেঘে নির্ধিত—ইহা তীর্থ যাত্রার সময় সকল শিকিত তক্তিমান হিন্দুই যেন প্রত্যেক হইয়া থাকে। জননী ভক্তভূমি, গোমাতা ও অগ্ন্যাতা সকল হিন্দুর চক্ষেই এক। ইহা সকল হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতে পারিবে। ভারতের পরম ভক্ত সন্তানের উক্তির বাধ্যার্থ্য্য সকল ভক্ত সন্তানই স্ব স্ব রূপে অজ্ঞতব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।—

“মাতর্গামি সাক্ষাৎ সত্যমেব তপাৎ।

মাতর্গামি বহুধাতল পুণ্য তীর্থ।

মাতর্গামি পদ বৃক্ষ ধাতাৎ সমুদ্রেঃ।

মাতর্গামি হিয গৌর কিরীট ভূষাৎ।”

মহাল সাহেব ভারতের সর্ব্ব প্রেমবাসী হিন্দুর দ্বারা গঙ্গানদীর বাহাঙ্গ্য্য কীর্তন পদ্ধতি করেন নাই। উমাতে ভারতীয় হিন্দুর কোন এক বিবরণেও মিল যেবিয়া তাহার ক্ষোভ হইয়াছে। তিনি উমাতে কোনরূপ রাজ্য-

নৈতিক বিপদের আশঙ্কা (?) করিয়া" মা গন্ধাকে একেবারেই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। "শত্নুনিতে গন্ধা লয়ে করে পলায়ন।" মাতালের গানেই স্তনিয়াছিল। সাহেবের ছাপা পুস্তকে সে ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন যে ভক্তিময় হিন্দু বাহাকে গন্ধা বলিয়া অনেক প্রকাশ করেন সে নদীর প্রথমটা অলক নন্দা; তাহার পর এলাহাবাদ হইতে উহা প্রকৃত পক্ষে যমুনা; তাহার পর ঘর্ষা!! অলক নন্দীর সহিত সংযোগের পর হইতে আর গন্ধা নাই। ৮গন্ধার দৈর্ঘ্য যখন অলক নন্দার সহিত সংযোগ স্থল পর্যন্ত অলকনন্দা হইতে কম তখন প্রয়াগ পর্যন্ত নদীটা কালেই অলকনন্দা নামে ব্যাভ হওয়া আবশ্যক! তাহার পর যমুনার দৈর্ঘ্য বেশী! গঙ্গোত্রী পিতা তব গন্ধাবর্ধন পাওয়া যাইবে। ভারতে সমস্তল এসেছে গন্ধা নাই!!

এই সকল বাতুলের কথাই ইজিতে রামজোয়াক্তোনাথ সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সাহেবের বিষয় ভয় এই যে "গর্জান রাইন" গানের কায় "গন্ধার" জোজে হিন্দু উত্তেজিত এবং স্বার্থে একত্র না হয়। কিন্তু ৮গন্ধার জোজের কি অবদি আছে? শত শত গন্ধাতব ও জোজ প্রচলিত। ভারতের সর্বত্র লোকে কুপের, পুষ্করিণীর ও সাধারণ নদীর জলে স্নান করার সময় "গন্ধা গন্ধা" বলে। বৃত্ত কালে সর্বত্র "গন্ধা" নারায়ণ ব্রহ্ম উচ্চারিত হয়। কলভ: গন্ধার নামে হিন্দু পবিত্র, সংঘত, শান্ত ও পরোক্ষপুষ্টি হইয়া থাকেন। গন্ধার নামে হুঙ্কার কথা শুনি নাই। এই নামে হিন্দু উত্তেজিত হয় না। গন্ধার জলে যে বড় বড় ভ্রুনের মহলা জল পড়ে অবশ্য তাহাতে হিন্দু একটু ক্ষুব্ধ হয় এবং

আমাদের এই বিশ্বাস যে জখন, মাকিন, ও ফরাশি ভাস্করেরা দেশ ভ্রমণে আসিয়া ঐ ব্যবহার উপর তীব্র গালি দিলে এবং টংলটায় উচ্চ জ্বনয় মহাস্বারা একথা বেশ জানিতে পারিলে একদিন ব্যবস্থা পরিবর্তনও কতকটা হইবেই হইবে। যখন গন্ধা জল "পবিত্র" বলিয়া কোটি কোটি লোক উগাপান করে এবং করিবেই তখন উহা স্থাপন্যব বিতর্ক রাগার চেষ্টা করা রাজার একটা অবশ্য কর্তব্য। নতুন কারখানা দ্বারা উহাতে মহলা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া একান্তই অসুচিত। আমরা মধ্যে মধ্যে একথা বলিয়া থাকি এবং বিশ্বাস করি যে এই উচিত কার্য লম্বে কোন তীব্র আন্দোলন বাতিরেকেই আইন প্রণীত হইবে। ভারত গবর্ণমেন্ট অনেক বিষয়েই প্রজার ক্ষোভের কথা জানিতে পারিলেই প্রতিকার করিয়াছেন। এ বিষয়েও একদিন করিতে পারিবেন।

ঐহুক রাধাকৃষ্ণ বাবু বৈদিক সাহিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্য হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতের সর্বাংশের কথাই এই জাতীয় সাহিত্যে রহিয়াছে। বৌদ্ধ শিলালিপিও ভারতের এক সাম্রাজ্যে গ্রথিত হওয়ার কথা সাব্যস্ত দিতেছে। অনবদ্য, রাজস্ব, বাজপের প্রভৃতি বস্তু ভারতে সার্বভৌম রাজ্য গঠনের যে সহায়ক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের ভৌগোলিক একতা নৈসর্গিক; আর্থী সভ্যতার ও বংশের বিচ্ছিন্নিতে উহা অধিবাসীদিগের মধ্যেও ঘটিয়াছে; মধ্যে মধ্যে সার্বভৌম সাম্রাজ্যও ঘটিয়াছিল। এক্ষণে উহা গুচ্ছভাবেই বিধি প্রেরিত ইংরাজের দ্বারা ঘটিয়াছে।

ঐহুক রাধাকৃষ্ণ বাবু একটা কথা বড়ই ঠিক বলিয়াছেন। পূর্বে পদব্রজে বা শকটে

তীর্থ যাত্রার পথের দু'ধারের গ্রামের লোকের  
রীতি নীতি অনেকটা তীর্থযাত্রার দৈর্ঘ্যে  
পাইডেন। এখন ১২ দিনে ৮ঘণ্টা হইতে  
কলিকাতা। যোনার স্থিতি। যেমন হইয়াছে  
তেমনি মাঠের ভিতর দিবা রেল গাড়ীর দিন

রাতি দৌড়ে বহুধর্মন অনেক কম হইয়া  
যাকে।

এই পুস্তকের স্থল সংকরণ হইলে ভাল  
হয়। বিশেষে পুস্তক বিক্রয় ভাল। অধেষে  
স্থলে জ্ঞান-প্রচারও চাই।

(রায় বাহাদুর) মুকুন্দদেব এম্ এ।

## বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র

### ১। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রায়শ্চিত্ত

বিগত ছয় মাসে একজন স্নাতক যুবক  
অগ্নি-হা-হাকারীর ভাবী সভ্যতাকে হত্যা  
করিয়াছিল। তাহার এক মাসের ভিত্তর  
সমগ্র জগৎ ভরিয়া ভীষণ armageddon  
এর সূত্রপাত হইল। এই পরম্পর ধ্বংস-  
সাধনকারী কুরুক্ষেত্র সময়ে ঊনবিংশ  
শতাব্দীর বিজ্ঞান-শক্তি তাহার হৃৎকল কুফল  
একসঙ্গে প্রকটিত করিতেছে। এই সংগ্রামের  
শেষ বহুকাল চলিবে সম্ভ্রান্তি একটা সন্ধি  
স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সেই সন্ধিতে  
প্রতিশোধনের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় সমতার মীমাংসা  
হইবে না। তবে এই সংগ্রামের ফলে  
পাশ্চাত্য মানবের চোখ খুলিয়া বাইবে।  
ইহারা তাঁহাদের সভ্যতা সম্বন্ধে ধোরতর  
সন্দেহ করিতে থাকিবেন। পাশ্চাত্য  
জীবনদর্শন এবং সমাজবন্ধনের একটা কঠিন  
পরীক্ষা এক্ষণে চলিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে  
ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যম ইউরোপ আজ  
তাহার কার্যাবলীর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।  
কলত: বিংশশতাব্দীর বিবে ইউরোপীয়  
রাষ্ট্র-শক্তি এবং সভ্যতা-প্রবাহ কতটুকু স্থান  
অধিকার করিবে তাহা অগম্যাসীর বৃত্তিতে  
বিলম্ব হইবে না।

বিজ্ঞানের ক্ষমতার বর্তমান মানব সমগ্র  
জগৎকে একটি কৃত্রিম পরীর জাঘ বিবেচনা  
করিতে সমর্থ। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, এলিন-  
চালিত সমুদ্র পোত, টেলিফোন এবং সংবাদ-  
পত্রগুলি যেন পোটা পৃথিবীকে একটা  
ছোটখাট মানবলব্ধ পরিণত করিয়াছে।  
সেদিন নিউইয়র্কে একটা কল টিগিয়া যুক্ত-  
রাষ্ট্রের সভাপতি ৫০০০ মাইল দূরবর্তী  
প্যানামা খালের দ্বার উন্মোচন করিলেন।  
মাহুব তাহার পরীরটাকে হেঁচপ নিষেধ  
অবীন বিবেচনা করিতে পারে সমস্ত পৃথিবী-  
টাই যেন আজ সেইরূপ বিজ্ঞানাবলম্বী বীজ-  
গণের অধীন। পরীরের কোন অংশে  
পাঁচড়া হইলে সমস্ত অন্তই অর্জবিত্ত হয়।  
আজকাল পৃথিবীর কোন এক স্থানে সামান্ত  
নাত্র নড়ন চড়ন হইলেই ছুনিয়ার সর্বত্র  
তাহার প্রভাব আদিয়া পৌছে। প্রাকৃতিক  
জগতে ভূমিকম্পের প্রভাবও এত দূর  
জগতের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে না।

একটি নাবালক স্নাতক প্রজা অগ্নিয়ার  
কতি করিল। তাহার প্রতিশোধ লইবার  
জন্ত সন্মতি তাহার সমীপবর্তী অধীন স্নাত-  
রাষ্ট্রের বিক্ষেপে হুড় ঘোষণা করিলেন।  
এরূপ বিশ্ববর্জনক ঘটনা জগতের ইতিহাসে

অন্যথাবার ঘটনা। ইহা নতুন ব্যাপার নয়। বরং দুনিয়ায় এইরূপই সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর ছোট বড় সকল নেপোলিয়ানই যুগে যুগে এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন।

বর্তমান কুরুক্ষেত্রে পলকের মধ্যে অচিন্তনীয় পরিবর্তনসমূহ সাধিত হইল। ইহাই প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ-বোষণা শুনিতে না শুনিতেই নিউইয়র্ক হইতে টোকিও পর্যন্ত ভাল কটর দর চড়িয়া গেল। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, সেন্টপিটার্সবার্গ, রাইওডিজেনিরো, বুনে। অমর ইত্যাদি সকল স্থানে সোণারূপার টাকা কমিতে লাগিল। ইংল্যাণ্ডে ডিম, মাখন, চিনির অভাব হইল। কলিকাতা, বোম্বাই, আলেকজান্দ্রিয়ার আমদানী রপ্তানী স্থগিত থাকিল। একলক্ষ আমেরিকাবাসী নয়নারী ইউরোপের নানাদেশে আটকাইয়া গেলেন। তাঁহাদের পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকার চেক বহি রহিয়াছে অথচ ১১০ মূল্যের জিনিষ ক্রয় করিবার উপায় আর নাই! কোড়পতি মহাজনেরা লণ্ডন, প্যারিস, ভেনেডিস, ব্রেন্সেল্‌স, বার্লিন ইত্যাদি স্থানের হোটেলে বাস করিতে অনর্থক হইলেন—চেকের টাকা না ডাঙাইয়া দিলে কোন হোটেলের কর্ত্তাই তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিবে না। এক সপ্তাহের ভিতর এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার কুরুক্ষেত্রে, শিল্পকারখানায়, টাকার বাজারে এবং ব্যবসায়ী-সমসারে, একদণ্ড গোলযোগ উপস্থিত আর কখনও হইয়াছে কি? এই দৃশ্য পূর্বে অনেককই করনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বখাশিচিত্তি ব্যর্থতার অতীত ছিল। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই ত্রিভুবনব্যাপী বৈশ্বিক বিদ্রোহ ঘটিল।

এদিকে কামান ধাপায় খটাই বা কি অস্বস্ত! অষ্ট্রিয়া চাহেন সার্করাষ্ট্রের কেন্দ্র দখল করিতে। কিন্তু ডাব্লিন রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ ব্যস্ত হইলেন। হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড নিম্ন নিম্ন স্বতন্ত্রতা রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইউরোপে পুনরায় হাত বাড়াইবার আকাঙ্ক্ষা তুরক্ষে জাগিল। জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়ার দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ পোলিশ নয়নারীর দ্বন্দ্বের স্বাধীন পোলরাষ্ট্র গঠনের সুযোগ আলোচিত হইতেছে। চীন হইতে ইউরোপীয়গণকে তাড়াইয়া দিবার আরোহন পাশ্চাত্য মহলে আশঙ্কা করা বাইতেছে। জাপানে আমেরিকায় দ্বন্দ্ব বাড়িবার সম্ভাবনা। প্রশান্ত-মহাসাগর, ভারত-মহাসাগর, আটলান্টিক-মহাসাগর সকল মহাসাগরেই রণতরী ভাসিতেছে। কুম্ভ-সাগরের ভিতর দিয়া জাহাজ চালান অনন্তর হইয়া উঠিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার চিরশত্রু জার্মানি অথচ আজ তাঁহার ঐক্যবদ্ধ। আবার ইংল্যান্ডের চিরশত্রু রুশিয়া—অথচ আজ রুশিয়া ও ইংল্যান্ড ঐক্যবদ্ধ। রাষ্ট্রমণ্ডলে একদণ্ড অথচ আর কখনও ঘটিয়াছে কি?

ঘটিয়াছে—মানব জাতির ইতিহাসে সর্বদা অথচনই ঘটয়াছে। অচিন্তনীয় ঘটনারাশিই রাষ্ট্রমণ্ডলের একমাত্র তথ্য। করাসী-বিপ্লবের যুগে এবং নেপোলিয়ানের যুগে এশিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার এইরূপ অথচন ঘটয়াছিল। সকলেই ইহা জানেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সকল যুগেই এইরূপ ঘটনা আসিতেছে। নেপোলিয়ানী কর্ত্ত-ক্ষেত্রে ইহা বিশেষতঃ নয়। কোন যুগে কর্ত্তের গভীর কিছু বড়, কোন যুগে কিছু ছোট এই বা প্রত্যেক। অথবা কোন যুগে কিছু

অল্পকালের মধ্যে ওলট পালট বেশী দেখা যায়—কোন যুগে হঠাৎ বিরাট ওলট পালটের অস্তিত্ব খোঁজি সময় লাগে। তাহা ছাড়া যুগে যুগে রাষ্ট্রমণ্ডলের ভিতর আর কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে আমরা নেপোলিয়ানী কুরুক্ষেত্রেরই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। কৰ্ম্মবৃত্তি অথবা কৰ্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে সামান্য মাত্র প্রভেদ পাই না। তবে পূৰ্ব্বযুগে এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রত্যাব পৌছিতে বিলম্ব হইত—একণে নিষেধের মধ্যে দুনিয়ার সৰ্ব্বত্র নড়ন চড়ন সাধিত হইতেছে। নেপোলিয়ানী যুগে নব্য বিজ্ঞান, নব্য ভাষ্য, নব্য শিল্প ইত্যাদি ছিল না। বিংশশতাব্দীতে এই সমুদয় প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। এইজন্য অষ্ট্রিয়ার কামান লাগা হইতে না হইতেই আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সকল কোণে বাজার-দরের উঠা নামা হইয়া গেল; এবং সাদা জাতি, কাল জাতি, পীত জাতি ও লাল জাতি সকলেই লড়াইয়ের জন্য পায়তারা করিতে লাগিলেন।

অষ্ট্রিয়া সার্বভৌমকে জয় করিতে চাহেন। কিন্তু বলত: সমস্ত ইউরোপের মনোভিজ বদলাইয়া যাইবে—এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রমণ্ডল নতুন আকার ধারণ করিবে। উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ছোট বড় স্বরাজ, যুক্ত-রাষ্ট্র, উপনিবেশ ও বিভিন্ন প্রদেশগুলির চতুঃসীমা নতুন ধরণের হইবে। কোন কোন স্বাধীন জাতির কিয়দংশ পরাধীনতাপৃথলে আবদ্ধ হইবে—আবার কোন কোন পরাধীন জাতিও স্বাধীনভাৱে লাভ করিবে। আজ বাহ্যিক ছোট তাহাদের কেহ কেহ মাথা তুলিতে

পারিবে—আবার এতদিন বাহ্যিক অগতির হস্ত: কষ্টা বিধাতা তাহারা “হেঁড়ে পে মা কৈলে বাচি” বলিয়া ঘর মান্দুলাইতে বাধ্য হইবে। বর্তমান সময় বাহ্যিক বিজ্ঞানকে পত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান তাহারাও পরস্পর কামড়া কামড়ি করিতে থাকিবেন। যে অছিলায় “আর্থগেভেন” আরম্ভ হইল যুদ্ধা-সানে তাহা: হঠাৎ কাহারই মনে থাকিবে না। তখন নিত্যন্ত অশ্রুত-পূৰ্ব্ব অভাবনীধ সমস্তার মীমাংসা হইতে থাকিবে। দুনিয়ার এইরূপ হাজার হাজার ঘটনা—বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। অগতে কেবল একটি মাত্র নিষেধের কার্য্য হয়—“চক্রবৎ পরিবর্ত্তে স্থানি চ স্থানি চ।” তবে কখন কাহার কপালে যুব কখন কাহার কপালে দুঃখ তাহা পূৰ্ব্ব হইতে আশঙ্ক করা অসম্ভব নহ। অধিকন্তু কোন্ কোন্ ঘটনা-চক্রের প্রভাবে কোন জাতির যুব বা দুঃখ ঘটবে তাহাও বিচক্ষণেরা পূৰ্ব্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ।

গত কয়েক বৎসরের ভিতর ইউরোপীয়েরা জাতিতে জাতিতে মিলিয়া কতই না সম্মিলন ( International Conferences ) করিয়া-ছেন। আজ লর্নবার্গের আলোচনার জন্য ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকান, ফিন্‌ল্যান্ড, জাপানী, মুলসমান কত জাতিই তাহাদের বিশেষজ্ঞগণকে রোম, জেনেভা, চিকাগো, সেটপিন্টার্সবার্গ, লণ্ডন ইত্যাদি নগরে পাঠাইতেছেন। কাল শাস্তির আন্দোলন দৃঢ় করিবার জন্য অগতির জাতি-পুঞ্জ এক বিরাট বৈঠকে বসিতেছেন। এরূপ আন্তর্জাতিক সম্মিলনের সংখ্যা নত্যাধিক হইবে। আজ তাহারা কোথায়? পাণ্ডিত্যের মন্ডলে নাকি কোন কল বিদ্রোহ বা বিংশশতাব্দীর



নাই—সেই ক্ষেত্রে শান্তি, কাল, লাল, গীত চাম-  
ড়ার প্রভেদ নাকি লক্ষ্য করা হয় না। কোথায়  
আজ সেই সমুদ্র খুৎখর মতলী? Inter-  
national Congress of Universities,  
International Conference of Histor-  
ians, Universal Races Congress,  
Congress of Religions, Interna-  
tional Congress of Trades Unions,  
International Conference of Socia-  
lists এই সকলের নাম আজ শুনিতে পাই  
না কেন? অধীশ্বর আজ নির্ভীক বে!  
বিংশশতাব্দীর মানব, এই ভুলিই না তোমার  
বর্তমান সভ্যতার গৌরব সামগ্রী।

তাহার পর International Law  
এবং ইউরোপের রাষ্ট্রসম্মিলন বা "Concert  
of Europe." ইউরোপীয়েরা কিছুকাল  
হইতে ঢাক পিটাইতেছিলেন যে, সমগ্র  
ইউরোপ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীই বর্তমান  
যুগে ঐক্যবদ্ধ হুক-মানব-পরিবারে পরিণত  
হইতে চলিয়াছে। "মানবসমাজের ভিতর  
আর কোন বিরোধ থাকিবে না—সামাজিক  
বিরোধ উপস্থিত হইবা মাত্র সকল যুগের  
প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসিয়া শালিশী করিয়া  
দিবেন। এই পকারভী, অথবা বায়োইথারী  
কিবা ছত্রিশী বৈঠকে যে ব্যবস্থা করা হইয়া  
পাকে তাহার নাম International Law.  
এই সকল শালিশীর বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র  
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—মারামারি কাটাকাটি  
থাকিবে না—দুনিয়ার সর্বত্রই এক মানব-  
পরিবার (Federation of Mankind)  
বিরাজু করিবে।

নাম জানা রাষ্ট্রবীরেরা লম্বা পলম করিয়া  
এই আশা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।  
কেবল আশা মাত্র নয়। ওঁহারা অনেককেই

বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন যে ইতি-  
মধ্যেই "ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মিলন" স্থাপিত  
হইয়া গিয়াছে—আর অল্পকালের ভিতরই  
"মানবীয় রাষ্ট্রসম্মিলন" (Parliament of  
Man) স্থাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু  
সত্য ঘটনা কি? বেশী অতীত যুগের কথা  
আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিছু  
কাল হইল অষ্ট্রিয়ার সম্রাট বসনিয়া এবং  
হার্জিগেভিনা নামক দুইটি রাজরাষ্ট্র দখল  
করিয়াছিলেন। তখন হইতেই লাভিয়া  
অষ্ট্রিয়ার প্রবল বিদ্বেষী হন। কিন্তু ইউরোপীয়  
রাষ্ট্রমণ্ডল তখন কোন উত্ত বাচা করিয়াছিলেন  
কি? তাহার পর আফ্রিকার উত্তর পূর্ব  
অঞ্চলে আর্মিনিয়া নির্ভবিয়া ইত্যাদি  
প্রদেশের স্বাধীনতা জনগণে ইংরাজ ও  
ফরাসীতে একটা দাড়া হয়। সে দাড়া  
মিটাইবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসম্মিলন হাতে  
ভুলিয়াছিলেন কি? সেদিনকার বন্ধান-  
সম্মেলনই বা কি দেখিলাম? তুরস্ককে টুকরা  
টুকরা করিয়া দিবার জন্য যখন সূত্র মাতরাষ্ট্রেরা  
বহুপরিচর তখন Concert of Europe  
কোথায় ছিল? ইংল্যান্ড ও অন্যান্য পণ্ডিত  
কপিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করিয়া  
আসিয়াছেন। তুরস্কের সেই চির মুকলি  
ইংরাজ ও রাষ্ট্রসম্মিলনের বৈঠক ডাকিয়া  
ছিলেন কি? এমন কি, বন্ধানের সূত্র রাষ্ট্র-  
গুলি তুরস্ককে হঠাৎ দিবার পর নিজেরা  
নিজেরা মারামারি করিতে লাগিলেন। তখনও  
কি "ইউরোপীয় রাষ্ট্রসম্মিলন" ঐক্যবাদের  
যরোয়া বিবাদ মিটাইবার জন্য পণ্ডিতের জনতা  
আহ্বান করিয়াছিলেন? দেখিতেছি, লড়াই  
ও কোন ক্ষেত্রেই বন্ধ হয় নাই। রাষ্ট্রসম্মিলন  
সকল স্থলেই দূর হইতে "গোচা, আপন বাচা"—  
নীতির অঙ্গুলিগণ করিয়াছেন।

হায় রাষ্ট্র-নীতি, তুমি চিরকালই মিথ্যাকথা বলিয়া আসিতেছ ভবিষ্যতেও তাহাই করিবে। “স্বখে বল ভালবাসি, অন্তরে সরলমাথা”—ইহা ছাড়া তোমার অত অজ্ঞতা কোন দিনই ছিল না। “জোর বার ঘৃণ ক্তার”—ইহাই তোমার একমাত্র বাণী। তবে,—“স্বযোগ ও সময় বুঝিবা জোর প্রয়োগ করিও”—এই উপদেশ প্রচার করিয়া তুমি তোমার শিষ্য ও ভক্তগণকে সৰ্বদা সাবধান করিয়া রাখ। ম্যাকিহাভেলিনীতি এবং চাপকানীতি ছাড়া রাষ্ট্রমণ্ডলে আর কোন নীতি নাই। অথচ ম্যাকিহাভেলি এবং চাপকাকে গালি দেওয়াই সকল রাষ্ট্রবীরের একটা ‘ফ্যাশন’। যে নীতি অবলম্বন করিয়া তুমি কার্য করিতেছ সমাজে বৈঠকে সন্মিলনে বক্তৃতায় সেই নীতির বিকসেই পলাবাকী করার নাম রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতা ও ভিন্নমতী!

হায় বিজ্ঞান, আজ তোমার কি দুর্দশা। উনবিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে তোমার প্রসাধ লাভের মন্ত কত সহস্র সাধকই না তাঁহাদের প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভই কি কম করিয়াছে? বিজ্ঞান তুমি, পৃথিবীর দূরত্ব কমাইয়া ফেলিয়াছ—সমস্ত ভগৎকে একটি পল্লীর আকার ও বিকৃতি প্রদান করিয়াছ। কিন্তু আজ একদিনের কর্কশল কি দেখিতেছি? ৫০। ৭৫। ১০০ বৎসরের সকল আবিষ্কার এক নিমেষে ধুলিসাণ হইয়া পেল।

ভারতীয় বার্তাবহকে আমরা নব্য বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার বলিয়া জানি। কিন্তু তাহাই এই কুরুক্ষেত্র সমরে মহাবিপ্লবজনক বস্তু। কাল পর্যন্ত বাহার সাহায্যে নিউইয়র্কের লোকেরা বাসিনের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন আজ তাহাই পরম্পরের চলাকোর প্রতিবন্ধক।

কেন্দ্রাষ্ট্রে—কখন কোথায় কত দৈন্ত সন্নিবেশিত হইল তাহা যদি পরম্পর জানিধা-কেনে তবে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন। পরম্পরের মধ্যে সংবাদ বন্ধ করাই পরম্পরের বার্থ। কারণই ভারতীয় বার্তাবহ তুলি ডাকিয়া চুরিয়া ফেল। বর্তমান সংগ্রামকারি-দিগের নিত্যকর্তব্য। কোথায় ব্যবসায়ীরা ভাবিতেছিলেন লওন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত স্থলপথে সোজা রেললাইন বদান হইবে—এদিকে যুদ্ধ ঘোষণার পরক্ষণ হইতেই হেরিভেডেই ইংল্যান্ডের লোকজন ফ্রান্সে ঘাইতে পারিবে না, ফ্রান্সের রেল পাজী ইতালীতে হইবে না। জার্মানির সঙ্গে কশিয়ার রেল-পথ, ফ্রান্সের রেলপথ, দুইজার্ম্যান্ডের রেলপথ, সবই বন্ধ করা হইয়া পেল। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া রেলপথ, সেতু, তারতর, পোষ্টঅফিস, ইত্যাদি নির্মাণ করা হইয়াছিল। আজ সকলে নিজ নিজ সম্পত্তি নির্দয়ভাবে নিজ হাতেই নষ্ট করিতেছেন। যখন রেল ছিল না, তাড়িত বার্তাবহ ছিল না, কলের জাহাজ ছিল না, সংবাদপত্র ছিল না তখন-কার ভগৎ কিরূপ ছিল আজকাল তাহা অসম্ভব করা অসম্ভব। কিন্তু এই যুদ্ধঘোষণার সময় হইতেই অসম্ভব সম্ভব হইল—সেই যুগের দূরত্ব আজ আমাদের চোখের সম্মুখেই উপস্থিত। আমরা ১০০ বৎসরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ভিন্নহিয়া সেই প্রচলন শতাব্দীর ভগ্নস্তম্ভে আসিয়া পড়িয়া ইংল্যান্ডের সংবাদ জার্মানি পাইতেছেন না—জার্মানির সংবাদ জাপান পাইতেছেন না। ভারতবর্ষের সংবাদ জার্মানি পাইতেছেন না। তুরস্কের সংবাদ আমেরিকা পাইতেছেন না। বাতায়ান্তের ছবিধা, সংবাদপত্র, জাহাজ, রেল তার ইত্যাদি সম্বন্ধে আজ পৃথিবী সেই

মদ্যপূর্ণের অবস্থার বর্ণনামাত্র। ইচ্ছা কি বিজ্ঞানের কন্ম 'ট্রাজেডি'! তার উন্নতি-শতাব্দী, কোন্ পাপের ফলে আত্ম-নিপে-শতাব্দীতে হোমার এট nemesis, এই প্রাশস্তিত? নবা বিজ্ঞানের নীল-নিবেশন ইউরোপের মানব, ইহার ধোঁধ উত্তর দিতে পার কি?

২। শত্রুতা কাহাকে বলে?

হাট্টবত্তের মামুলী অবস্থার মিথ্যা কথা বলা দৃশ্যের বিবেচিত হয় কি না জানি না। লড়াইয়ের সময়েও মিথ্যা কথা বলাই ধর্ম বিবেচিত হইতেছে দেখিতেছি। লক্ষ-পক্ষীরেরা পরস্পর গালাগালি এবং ঘোষারোপ করিতেছেন, এবং সত্যবাদিতা বোধ হয় মনবসংসার হইতে নির্মূলাস্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রে যে সকল তথ্য প্রচারিত হইতেছে তাহার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস রাখা হাঁতে পারে না। ইংরেজেরা জার্মানির কাপুরুষতা ও পলায়ন ঘটাইতেছেন এবং জার্মানদের ইংরেজের ভীকতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রচার করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনাবলিও জার্মান সম্রাট যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইংরেজ মহিষগণ ঠিক, জাগর বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন্ পক্ষের তথ্যগুলি সত্য-ভাবে গ্রহণ করা হাঁটবে? চোখের সম্মুখে একটা লড়াই হইতেছে তাহার কারণগুলি এক এক পক্ষ এক এক আকারে প্রচার করিতেছেন, এট সমুদয় বাক্যজাল এবং রাষ্ট্রীয় কারচুপী ভেদ করিয়া সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব। কাজেই অতীত ইতিহাসের ঘটনা-বলী আলোচনা করিতে হাঁটরা সত্যমিথ্যা বিশ্লেষণ করা হুসাধা নহে কি?

তাহার পর রোজট সংবাদপত্রে যুদ্ধের ধবর বাহির হইতেছে। কিন্তু এগুলির ভিতর

সত্যতা ১০ অংশ পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য কি না সম্বন্ধে: এক পক্ষ বলিতেছেন "আমর বিহিংসিত।" লক্ষপক্ষ ঠিক সেই ঘটনা সম্বন্ধেই বলিতেছেন যে জাগরাই জিতিয়া-ছেন। এটিকে লক্ষ লক্ষের পত্রিকা-সম্পাদকেরা জাগরের লক্ষপক্ষীর সম্পাদক-গণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ত্রিহস্তার করিতে-ছেন। অস্ত্রযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাকযুদ্ধও কম চলিতেছে না। অস্ত্রযুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ ত কেহই পাইতেছেন না। অধিকন্তু বাকযুদ্ধের ফটিলতা এত বেধী যে জাগর ভিসব কে কলটা মিথ্যাবাদী বুলিয়া উঠা কঠিন। মিথ্যাবাদী সকলেই—সকলেই যথাসম্ভব নিজের দিকে টানিয়া কথা বলিতেছেন—পরাক্রমের সাংঘ্য চাপিয়া রাখিয়া জয়লাভের সংবাদ ছাপিতেছেন, এমন কি পরাক্রমের ঘটনাবলীকেই জয়লাভের সংবাদরূপে প্রচার করিতেছেন। এট মিথ্যাবাদের আবেষ্টনে কোন্ পক্ষ বেধী মিথ্যাবাদী জাগর প্রমাণ কোন দিনই বাচির হইবে না। যখন লড়াইয়ের ইতিহাস রচিত হইবে তখন এই মিথ্যাবাদি প্রমাণকারে স্বাধী হইয়া হাঁটবে। অধিকন্তু জাগরা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের শ্রবণালীতে ঘটনাবলী বাখ্যা করিতে বলিবেন জাগরা পরজাতীয় ধোঁধ প্রচারের চোঁট করিবেন। ফলতঃ, একে অসত্যতা তথা, জাগর উপর তথ্যসমূহের একচোখো বাখ্যা—ইটার নাম ইতিহাস। জার্মানির প্রতিজ্ঞা বাচা লিখিবেন জাগর এই দুই দোষে দুই থাকিবে—ইংরেজেরাও যে ঘর লিখিবেন জাগরও এই দুই দোষ সম্পূর্ণরূপেই থাকিবে। নিরপেক্ষ ইতিহাসিকের ভ্রম কোন উপকরণই থাকিবে না। এট ভ্রমই নেপোলিয়ান ইতিহাস এর পাঠ করিতে

চারিলে তাঁহার কণ্ঠচরীদ্বিগকে আশ্রয়  
করিতেন "Bring me my liar !" লড়াই  
ইতিগাম দিবা। তবোর অন্ত্য বৃত্তান্ত ।

লড়াই শুরু হইবার পরই প্রত্যেক বেশে  
নৃতন নৃতন কবিতা রচিত হইতে লাগিল ।  
প্রত্যেক সংবাদপত্রেই উদ্দীপনামূলক বহুশৈ  
লঙ্গীত দেখিতে পাইলাম । ইংলণ্ডের রাজ-  
কবি রবার্ট ব্রিজেস্, ডার্বান কাউন্সিলের সচিব  
ইংলান্ড জাতিব তুলনা করিতেছেন—

"The monarch Ambition  
Hath harnessed his slaves  
But the folk of the ocean  
Are free as the waves."

যার একজন বিলাতী কবি যুদ্ধে মারাত্মক-  
বার মরণ বসতিতে ঠাট্টা করিতেছেন :—

"I am a little English boy  
My spirits can't be damped  
For Nelson's on his monument  
And father's card is stamped.

• • • • •  
They say that England ought  
to help

The Froggies and the Bear  
England will show "a solid front"  
And "mediate" and "prepare."

• • • • •  
Believe me, War's a brutal thing  
And makes good men ashamed,  
Oh let us never draw the sword—  
We might get killed or lamed !

• • • • •  
Now, friends, 'tis time I made  
my bow,  
Don't let yourselves be scared,  
Remember, if the worst should  
come

The Navy is prepared,  
The finest Army in the world,  
All man'd and cleared and  
oiled  
Proudly it looms along the waves  
We must not have it spoiled.  
I am a little English boy,  
There are no flies on me  
The English do not "want to fight"  
They have learnt to "wait and  
see."

উৎসাহের প্রাথমিক লড়াই-র মধ্যস্থিত  
ছিল । "নাং অগম্যম লজ কলিঙ্গ ইত্যাদি"  
লড়িতে অগ্রসর হন নাট । "এই শান্তিপ্রিয়তা  
এক ক্ষুদ্রতমতাব বিজয় পূর্ণোৎসব করি-  
তাবি তীর প্রতিবাদ ।

উৎসাহমত্তে উদ্দীপনা এইরূপ । ডার্বান  
পক্ষ চাইতেও অতি ভীষণ ধারণার কবিতা  
বাণীর চটপট । ডার্বানেরা নিরুপ অশে-  
ভাবে ও অনধা ডার্বান উৎসাহের দ্বারা  
গলাব্র হিতেছে তাহা নিরুৎসাহ কবিতা  
দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে ।

"What, hast thou then the Teuton  
kinship broken,  
Perfidious Albion !  
And sett'st thyself to deeds of  
shame unspoken,  
All for what Judas won !

• • • • •  
Our strength is in the truth of  
God eternal,  
The truth that shall not end.  
Launch, England launch thy  
fleets of might infernal,  
We stand strong to defend !  
We, too, are lords of Ocean, nor  
can pardon

Thy people's bartered troth  
Our heart and will to victory  
shall harden,  
Staunch to our word and oath.  
Putt'st thou thy trust in cunning  
calculation  
That we are few, ye more ?  
Learn that the spirit of the  
German nation  
Makes hosts on sea and shore.  
\* \* \* \* \*  
Storm on with Slavs and  
strangers in alliance  
Vile-hearted nation, on !  
Thou shalt not set God's judgment  
at defiance,  
Perfidious Albion !

বলা বাহুল্য, একবার শত্রুতা আরম্ভ হইলে ভয়ভাষা ব্যবহার করাও আবশ্যিক বোধ হয় না। অকথ্যভাবে ইংরাজে আর্দ্রাণে বাক্য-বুদ্ধ চলিতেছে। লণ্ডনের রাত্তার রাত্তার আর্দ্রাণ সম্রাটকে “নাগ্লা কুইন” ভূষণে বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞাপন বিলি ও বিক্রয় হইতেছে।

### ৩। লড়াইয়ের ধরন

বর্তমান যুগে লড়াই করা একটা যুদ্ধের কথা মাত্র নয়। আধুনিক সমরের ব্যবস্থা নির্বাহ করিয়া উঠা যড়ই কঠিন ব্যাপার। পূর্বকালে লড়াই অনেকটা সালাসিধা ছিল। ক্রমিকভাবে সৈন্যের লক্ষ্যলাভ হইত। যুদ্ধের স্বভাব কতকগুলি সৈন্য সর্গদা প্রস্তুত থাকিত। কিছুকাল ধরিয়া উভয় পক্ষের সৈন্তেরা শক্তি পরীক্ষা করিত। যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত দেশের অন্তর কোনরূপ অশান্তি বা উপদ্রব বেশী হইত না। সাধারণ জনগণ অনেকটা নির্বি-

বাদে গৃহস্থালী কৃষিকার্য্য, গোপালন ইত্যাদি চালাইতে পারিত।

কিন্তু উনবিংশ ও বিশশতাব্দীতে প্রাচীন সমরের সরলতা নাই। এক্ষণে সমরের একদিকে টান পড়িলে সকল দিকেই আঘাত লাগে। পূর্বে সহস্র সহস্র লোক যুদ্ধ করিত—এক্কে সৈন্য সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। আজকাল কৃষিকার্য্যের পরিবর্তে শিল্প কারখানা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই জাতীয় ধন-সম্পদের আকর। অথচ যুদ্ধের সময় সকল আত্মত্যাগী ও মজুর লড়াই করিতে বাধ্য। কাজেই একদিকে ধনাগমের পথ মারা যায়। অপর দিকে লক্ষ লক্ষ সৈন্তের খোরাক পোষাক ঝোগাইতে হয়। আজ কাল যুদ্ধ করা কি যে সে কথা ?

নিত্যান্ত দরিদ্র ও হতাশ জাতিরাই বিশশতাব্দীতে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত হইতে পারে। কারণ তাহারা জানে যে তাহাদের ক্ষতি আর বেশী কি হইবে ? তাহারা যে দরিদ্রতা দুঃখের চরমলীলায় অবস্থিত। আর যুদ্ধে উৎসাহী হইতে পারে অতিশয় ধনী জাতীয় লোকেরা। তাহাদের ঘরে অভুলিত ধনসম্পদ মজুত অ. ৬ তাহারা সহজেই যুদ্ধ সাহসী হইয়া থাকে।

বর্তমান যুগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগকে ধরনের ভয় ভাবিতে হয় নাই। কারণ আমেরিকার ধনসম্পদ অশীম। তাহা ডাড়া ইংরাজ যখন যুয়ারদিগের সঙ্গে লড়াই-ছিলেন তখন তাঁহাদিগকে টাকার কথা ভাবিতে হয় নাই। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রিটন সাম্রাজ্য ত টাকার খনি বলিলেই হয়।

সেদিন বলকান অঞ্চলে একটা লড়াই হইল। এখানেও টাকাপয়সার ভাবনা বেশী ছিল না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কারণ বহুতর।

ইহারা নিত্যই সজিত। ধনসম্পত্তি নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কাই নাই। ইহাদের আছে কি যে তাহারা রক্ষা করিবার জন্য অগ্র-পক্ষাৎ জাবিধা দেখিতে হইবে? কাজেই ইহারা "মোরিয়া" ভাবে মুক্ত লাগিয়াছিলেন। অবশ্য জলের মত রক্ত খরচ করিতে ইহারা প্রস্তুত ছিলেন। আধুনিক কল কারখানা-চালিত শিল্প ইহাদের বিশেষ কিছু ছিল না—কৃষি কর্ণই প্রধান জীবিকা কাজেই কোনমতে লড়াইটা চালাইতে পারিলে তাহার পর নতুন করিয়া জীবন আরম্ভ করা ইহাদের পক্ষে অতি সহজ। লড়াইয়ের ফলে লোকস্বয় মাত্র হইবে—কিন্তু যদি জয়লাভ হয় তাহা হইলে হুসে আললে সকলই উত্তিয়া আসিবে। আর যদি পরাজয় হয় তাহা হইতে বা বিশেষ ক্ষতি কৈ? মামুলি চাচাবাসে লাগিয়া যাওয়া ত হাতের পাচ।

কিন্তু, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির লড়াই এই সমুদায় লড়াই হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অন্তঃপরদের। এজন্য লড়াইয়ের খরচ অত্যন্ত বেশী। রক্তপাত, লোকস্বয় এবং নগদ টাকা খরচ ও আছেই। অবিকৃত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, শিল্প, কারখানা, বাড়ীঘর, কারবার, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য, জাহাজ, রেল ইত্যাদি কতকিঞ্চি কত অনিষ্ট হইবে তাহার গণনা করা অসম্ভব। কাজেই লড়াইয়ের বর্ষাৎ খরচ অনীম—লড়াই ধামিয়া দাই-বার কতবৎসর। পরে ইহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা পূর্ববৎ হইবে তাহা আশঙ্ক করা কঠিন। এমন কি এই যুদ্ধক্ষেত্রের পর ইহারা নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করিতে সমর্থ হইবেন কি না তাহাও সন্দেহ করা অন্তঃপর নব। ইরাকের লড়াইয়ের সুবাসে

হয়ত নতুন নতুন ক্রান্তিরা ইহাদের শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি হাত করিয়া বসিবেন। লড়াইয়ের বেগনা সারিতে এত সময় লাগিবে যে সেই অবস্থার নতুন প্রতিপত্তিগণকে ব্যব-সায়ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা অসম্ভব হইবে। এট ভাবী কতিপয়মুহুর লড়াইয়ের খরচের ভিতর গণ্য করা উচিত।

১৮৭০ সালে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার লড়াই চটাইছিল। তাহার পরে নব্য ফরাসী রিপাব্লিক, নব্য জার্মান সাম্রাজ্য, নব্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারী এবং ঐক্যবদ্ধ বাধীন ইতালী এই চারিটি দেশ গঠিত হয়। এই লড়াই মাত্র ৬ মাস ধরিয়া চলিয়াছিল। দুই পক্ষে সর্ব-সমেত ১৫ লক্ষ লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের খরচ ৪০ কোটি টাকা! এতদ্ব্য-তীত ফরাসী জাতি জার্মানগণকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩০০ কোটি টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মোটের উপর এই যুদ্ধ যুদ্ধে নগদ ৭৫০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

ব্যার যুদ্ধের ব্যয় বুজানও এইরূপ। কোন কোন সময়ে ইংরাজেরা ৪ লক্ষ লোক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রাখিয়াছিলেন। আড়াই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। খরচ হইয়াছিল ৪৫০ কোটি টাকা।

আজকালকার বাস্তব দর বেতন তাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রের আধুনিক সরঞ্জামসহ ১০ লক্ষ লোক সম্মিলিত রাখিতে হইলে সম্ভ্রাহে ৭৫ কোটি টাকা আবশ্যিক। বিলাতী রণশক্তিতেয়া এইরূপ বিবেচনা করেন। বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্র-সময়ে সকল পক্ষে অন্ততঃ এককোটি লোকের সরঞ্জাম করিতে হইতেছে। যদি ৬ মাস যুদ্ধ চলে তাহা হইলে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের কমপক্ষে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হইয়া দাইবে।

এই ত গেল নগদ খরচ। তাহার উপর ব্যবসায় বানিজ্য, শিল্প ও কারখানা সবই বন্ধ থাকিবে। এক্ষণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোকসান কি কম? বেঁচেছি যিনিই জয়লাভ করুন বিজয়ের মূল্য অত্যধিক। এই তাওবলীলার পর ঠাচিয়া উঠিলে কোন আশিই ইউরোপের পুরাতন মূর্তি চিনিতে পারিবেন না। ইউরোপীয়েরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া ব্যর্থপর্যন্তই ঘরান হইয়া পড়িবেন। ইহাদের শক্তিক্রম এত বেশী হইবে যে জগতের অস্তিত্ব জাতি সকল ইহাদিগকে আর বেশী সম্মান বা ভয় করিয়া চলিবে না। এই উপায়ে অগতে নতুন শক্তিপুঞ্জের সন্ধান হইবে। বিশ্বের ভিত্তিকল্প কোন মতেই আর বর্তমান অবস্থার থাকিবে না। বলবান্দিগের শক্তিক্রমের ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনসমাজসমূহ জগতের কর্তৃত্বক্ষেত্রে প্রকৃত শক্তিশালী জাতির-স্তায় বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। পুরাতন জাতিরা ইহাদিগের উপর জুলুম বা চোখ-রাধান স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইবেন। এই-রূপেই অগতে নতনের আব্দার হয়।

৪। যুদ্ধকালে টাকার বাজার ব্যাঙ্কে বড় লোক টাকা অর্থাৎ রাখিয়াছিলেন সকলেই এক্ষণে টাকা তুলিয়া লইবার অস্ত্র ব্যস্ত। হাজার হাজার লোক প্যারিস-নগরে ব্যাঙ্কের দরজায় দণ্ডায়মান। দোনা-রপার টাকা আর খুঁজিয়া পাওয়াই যায় না। ফ্রান্সে কাগজের নোট মাত্র বর্তমান। নোটের টাকা কেহ দিতে পারে না। বাজারে ১০০ আনার তরকারী কিনিতে সেলে মহা বিপদে পড়িতে হয়। কারণ ক্রেতায় হাতে এক পয়সাও নাই—যাহা কিছু সবই ৫১০০ টাকার নোট!

বেদশিয়ারদেরও সেই অবস্থা। ব্যাঙ্কের

টাকা তুলিয়া লইবার অস্ত্র সকলেই ব্যস্ত। অঞ্চল ব্যাপ্ত সকলকে টাকা দিবে কোথা হইতে? নোট দিয়াই সকলকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে।

এমন কি আমেরিকারও টাকার বাজার বড়ই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিউ-ইয়র্কের বিনিময়-বাজারে টউরোপের Bill of Exchange গুলি বেচিবার অস্ত্র মণ্ডলেরা ফুঁকিতেছে। এই উপায়ে নিউইয়র্ক হইতে কাঁচা টাকা বাচির হইয়া বাইবে—তাহার পরিবর্তে কতকগুলি কোম্পানীর কাগজ মাত্র পড়িয়া থাকিবে। ব্যাপার সুবিধাজনক নয় বিবেচনা করিয়া নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়-পুথ-বেরা Stock Exchange বন্ধ করিয়া দিলেন। কাজেই কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া টাকা আর এখানে পাওয়া বাইবে না। টাকা না পাইয়া কেবলটা কোম্পানী কেল হইয়া গেল।

লণ্ডনের অবস্থাও এইরূপ। অনেকগুলি কোম্পানী হেউলিয়া হইল। কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া দালালেরা টাকা হাতে চায়। কিন্তু এত লোক কাগজ বেচিতে চাহে যে কাগজের বাজার নিত্যই নরম হইয়া পড়িল। এই ধরে কাগজ বেচা অপেক্ষা না বেচিয়া দেউলিয়া হওয়াই ভাল—অনেক ব্যবসাদারই এইরূপ ভাবিতেছেন।

এদিকে ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লইবার অস্ত্র সহস্র সহস্র লোক খুঁজিয়াছে। তাহা ছাড়া নোটের বদলে টাকা সঞ্চয় করিতেও সকলেই ব্যস্ত। ব্যাঙ্কের উপর টাকার চাহিদা এত হইলে ব্যাঙ্কগুলি শীঘ্রই কেল য়ারিবে। আবার দালাল ও ব্যবসাদারেরা টাকার বাজারে যার না পাইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য অন্ধ হইয়া পড়িবে।

লড়াইয়ের সময় ইহাই বর্তমান যুগে সর্গ কর্তিন সমত্যা। টাকার বাজার স্থির না থাকিলে দেশ অরুণালের ভিতরই শিল্পশৌন ব্যবসায়শীল হইয়া যায়। কারণেই আগে টাকার বাজার হইতে হুজুপ ও উৎসেগ নিবারণ করা সকল রাষ্ট্রবীরের কর্তব্য। আবার নরুণক্ষীরেরাও চেষ্টা করিয়া যেমীয়া ব্যবসাদি-ম্বলে-এবং ব্যাঙ্ক-মহাভার ও বিনিময়-বাজারে একটা গুণগোল সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। হুজুকে মারকাট অপেক্ষা বেশের ভিতরই নরুণকে পরাধিত করা অসম্ভব নয়। কোন উপারে ব্যাঙ্কগুলিকে ফেল করা হইতে পারিলে সমাধের সকল অর্থই বিকল করিয়া তোলা যায়। তাহার ফলে দেশের ভিতর ধনী মহাজন, শ্রমজীবী, বণিক, কৃষক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক হুজু বা বিপ্লবের বিপক্ষে ঠাড়াই। এই অবস্থার ঘরোয়া বিবাহ অথবা আভ্যন্তরীণ কষ্ট এত বেশী হয় যে তাহা সামুদ্রিক বিদেশীয় নরুণের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এইজন্য রাষ্ট্রবীরেরা হুজুর বা বিপ্লবের সময়ে “টাকার বাজার”কে বখাস্তব পাশ্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হন। বর্তমান ক্ষেত্রেও ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী, আমেরিকান সকলেই নিজ নিজ টাকার বাজার রক্ষা করিবার উপায় আলোচনা করিতেছেন।

লয়েড জর্জ পার্লামেন্টে বলিলেন :—  
“বেশিতেছি হুজুপে পড়িয়া আমাদের দেশের লোকেরা নিতান্তই অশেষশোচনিতা অচরণ করিতেছেন। সকলেই নিজ তহবিলে নগদ টাকা রাখিবার জন্য উৎস্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহার কারণ বেশের মগা নরুণ। ইহার কারণের সেনাবিতাপে প্রবেশ করিয়া অশেষের বস্ত অনিষ্ট করিতে

পারেন তাতা অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট এই উপারে করা হইতেছে। আমি আপনাদিগকে এবং দেশবাসীদিগকে সহায় দিতেছি—ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া অনিতে ব্যয় হইবেন না।”

টাকা যদি ব্যাঙ্ক থাকে তাহা হইলে জন-সাধারণের দৈনন্দিন কার্যচলিবে কি করিয়া? তাহার জন্য প্রথমেন্ট এক পাউণ্ডের নোট এবং ১০ শিলিংয়ের নোট বাহির করিতে প্রস্তত। এই আশ্বাস পাইয়া লোকেরা শান্ত হইল।

এদিকে বিলাতের ব্যাঙ্ক পৃথিবীর সকল স্থান হইতে টাকা খার লইবার জন্য অতি উচ্চ-হারে মূল ঘোষণা করা হইয়াছে। গতকরা ১০-২ হুজুর মোতে সকলেই বিলাতকে টাকা খার দিবে—শওন ব্যাঙ্কের কর্তারা এইরূপ হুজুরাছেন। বিলাতের টাকা বাহিরে ত ঘাইতে পারিবেই না—বহু বিদেশের টাকা ওয়ালা লোকেরাও বিলাতের ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে উৎসাহীত হইবে।

তাহা ছাড়া ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিলাতে প্রথমতঃ বিনিময় বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দালালেরা আমদানী রপ্তানীর কাগজ কেনাবেচা করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্ত, সকলকে বেউলিয়া-আউন হইতে বাচাইবার জন্য অহিন করা হইল যে ৩৭ শোধ করিবার নির্দিষ্ট দিনের এক মাস পরে টাকা দিলেও তাহা গ্রাহ্য করা হইবে। তাহা হইলে ব্যবসায়ীদেরা শান্তি-জাবের সহিত ঠাহাদের বাসুলি কারবার চালাইতে সক্ষম হইবেন। লয়েড জর্জ বলিতেছেন :—

“These decisions had been taken with a view to restoring the normal in business as quickly as possible,



and they were confident that the bankers and traders would with the patriotic assistance of the public resume business, and there would be no necessity, which otherwise might arise, for closing mills and factories and throwing hundreds and thousands of people out of employment."

টাকার বাজার এবং বাজের কারবার মন্থনরূপে চালাইতে অসমর্থ হইলে দেশের ভিতর ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। এই ভয়ঙ্কর প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষের দ্বারা জন-বিজ্ঞান এবং ব্যক্তি-বিজ্ঞানকে লড়াই-বিজ্ঞানেরই অগ্রতম অঙ্গ বিবেচনা করেন। Finance, Commerce ও Banking বিশ্বাস্য পায়দারী না হইলে কোন রাষ্ট্রবীরই সমর্থ নীতির পরামর্শ-দাতা হইতে পারেন না।

লক্ষ্যে অশেষ বাদী দেশের সর্বত্র স্পষ্ট-চারিত হইল :—

"In this tremendous struggle finance is going to play a great part, because it is one of the most formidable weapons in this exhausting war. Any one who for selfish motives of greed or excessive caution or cowardice goes out of his way and attempts to withdraw sums of gold and appropriates them to his own use, let it be clearly understood that he is assisting the enemies of his country and is assisting them more effectively than if he were to take up arms for them."

এইরূপ সম্মিলন, বক্তৃতা, আলোচনা এবং উপদেশ প্রচার চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আইন দ্বারা ৪৫ দিনের জন্য বিলাতের সকল ব্যাংকের কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহার ফলে এ কয়দিন কেহই ব্যাংক হইতে টাকা বা চেক কিছুই আনিতে পারিলেন না।

ফলতঃ বিলাতে এমন একটা স্থপ পেল যে সময়ে না ব্যাংক কার্য চলিতেছে, না বিনিময় বাজারে কার্য চলিতেছে। বিলাতের ইতি-হাসে বোধ হয় এরূপ ৪৫ দিন আর কখনও আগে নাই।

৫। খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের হুজুগ

লড়াই বাধিখামাত্র জাপানি, বেলজিয়াম ও ভেনেজুয়েলা, আইন জারি করিলেন যে, দেশ হইতে কোন খাদ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না। ইংল্যান্ডেরও কাগজে কলমে এবং পার্লামেন্ট সভায় প্রচার করিতে লাগিলেন—"কোন ভাবনা নাই। আমাদের খোরাক যাহার সাধ্য কার? আমাদের বাহালা আছে কি করিতে?"

সর্বমোট ত আশার বাণী প্রচার করিবেনই—কিন্তু জনগণের মন ত প্রবেশ মানে না। লড়াইয়ের কথা শুনিতেই নর-নারীগণ বিচলিত হইয়া পড়ে। সকল দেশেরই এই দৃশ্য। বাহারা লড়াই করিতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বা বাহালা চলিয়া পেল তাহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত। তাহাদের কোন দুর্ভাবনা নাই। যখনই নাচ পান করিয়া এবং মদ খাইয়া তাহারা বিভোর হইয়া থাকে। এই মত্ততার মধ্যে ঘরবাড়ী পরিবার দেশ কিছুই তাহাদের মনে থাকে না। কিন্তু পরিবারের বাহারা গৃহে থাকিতে বাধ্য তাহাদের চিন্তাই অসংখ্য প্রকার দুর্ভাবনা আদিয়া ছুটে। প্রাণ ভয়, যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়, স্বাধীনতা

লোপের ভয়—ইত্যাদি বড় বড় আশঙ্কার কারণ ত থাকেই, অধিকন্তু সৈন্যসিন সীমিত বাপনেও তাহারা শক্তি হ্রাস করিতে পারে না। চিন্তা সূক্ষ্মা অস্থির ও উদ্বিগ্ন থাকে। এই সকল লোক panic বা হুজুগ তৃপ্ত করিয়া দেশের কর্মবীরগণের কার্যপ্রণালীর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। সুতরাং ইহাদিগকে শান্ত, সংযত, ও হুস্থির রাখা এবং ঐরূপ থাকিতে উপদেশ দেওয়া রাষ্ট্রবীরগণ সর্বদা তাহাদের প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করেন। আহাছে নাবিক পাঠান, এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে রতস পাঠান যেরূপ অত্যাবশ্যক সেইরূপ দেশের টাকার বাজার ঠাণ্ডা রাখা এবং দেশের জনসাধারণের মাথা ঠিক রাখাও সমর-নীতিজ্ঞদিগের অত্যাবশ্যক কর্ম।

যে যে দেশে লড়াই বাধিয়াছে সকল স্থানেই ঘেঁষিতেছি জনগণ খাতি ভ্রম সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। যেমন ব্যাচ হইতে টাকা তুলিয়া লওয়া একটা হুজুগ সেইরূপ নিজ নিজ গৃহে ২৪ মাসের রতস মজুত রাখিবার মত সাধারণ গৃহস্থেরা প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে। ক্রাণ্ডে, আর্থাগিতে, ইংল্যাণ্ডে সর্বত্রই এই দৃশ্য।

মূল্য বৃদ্ধির ভয়েই লোকেরা প্রথম হইতে সস্তায় রতস সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের হুজুগ বেশ প্রবল ভাবেই উঠিয়াছে। লণ্ডনেও কম নয়। দরিদ্র গৃহস্থগণের ত কথাই নাই। মধ্যবিত্ত এবং ধনী জনগণও ৯৭ মাসের খোরাক ঘরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এ করদিন শাকসবজীর বাজারে, মাছ মাংসের দোকানে, সুদীর্ঘানার এবং কুটি-বিক্রেতার কারখানার সর্বদা অসংখ্য গরিবদার

আসা পাওয়া করিতেছে। দোকানে ভিড় লাগিয়াই আছে। কোন কোন জিনিষ ক্রয় করিতে হইলে অন্ততঃ আশংক্য ক্রেতা-দিগের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। দোকানদারেরা এই অর্ডারগুলি সববরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু ইহাদের নিকট টেলিগ্রাফেও অনেক অর্ডার আসিয়াছে। কোন কোন দোকানে এত অর্ডার জমিয়াছে যে দোকান এক সপ্তাহ বন্ধ করিয়া কেবল সেই ভলি সববরাহ করিলেও যথেষ্ট কার্য করা হয়।

মূল্য বৃদ্ধির ভয়ে লোকেরা বেশী বেশী অর্ডার দিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এত বেশী অর্ডার দেওয়া হইয়াছে যে, দোকানদারেরা বাধ্য হইয়া মূল্য বাড়াইয়া দিবে। অথচ এখন পর্য্যন্ত বিলাতে যুদ্ধের কোন প্রভাবই পৌছে নাই।

কোন কোন সংবাদ পত্রের লোক লণ্ডনের নানা পাড়ায় বেড়াইয়া দোকানদারগণের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। দোকানদারেরা বলিতেছে—বড়ই দুঃখের কথা দেশের ধনী লোক গুলাই হুজুগ বাড়াইয়া তুলিলেন। ইহারা কেহ এক বৎসরের মাল কেহ ছয় মাসের রতস ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন। ইহারা এত স্বার্থপর যে, দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের অবস্থা কি হইবে তাহা বুঝিতেছেন না। ইহারা যে রোজ আনে রোজ খায়। কিন্তু বড় লোকেরা যদি দোকানের সকল জিনিষই কিনিয়া রাখিলেন এবং বাজার নিঃশেষ করিয়া দিলেন তাহা হইলে দরিদ্রজনগণ কোথা হইতে খাদ্যদ্রব্য পাইবে? অধিকন্তু বড় লোকেরা সস্তায় মাল লইতে বাইরা গরীব লোকদিগকে বেশী দামে লইতে বাধ্য করিতেছেন না কি?

একজন দোকানদার বলিল, “মহাপদ, এমন অনেক পরিবার জানি যাহারা সাধারণতঃ ২০ টাকার বাহার বস্ত্র একে প্রাহারা ১০০ টাকার বাহার ক্রিতেছে। ইহা অজ্ঞান নয় কি?” কোন কোন দোকানদার বরিনদারদিগের অর্ডার দেখাশুধ করাইয়া মাল সরবরাহ করিতেছে। ১০ সের মটর ভুট্টির স্থানে এক সের দেওয়া হইতেছে—দুই বস্তা আটার অর্ডার পাঠিলে তাহার ৬ অংশ সরবরাহ করা হইতেছে।

কাণ্ড কারখানা বেশিরা নবন হই যেন লণ্ডননগর পক্ষ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে—খাদ্যব্যা আর পাওয়া যাইবে না। সমস্ত থাকিতে যে যেমন পারে তেমন রসদ সংগ্রহ করুক। এইরূপ হুজুগের কালে মূল্য সকল দিকেই বাড়িতেছে। একদিন একটা দোকানে এমন দাঙ্গা হইয়া গেল। প্রায় ১৫১২ জন স্ত্রীলোক দোকানদারের উপর চটিয়া তাহার টেবিলের সামান মালপত্র রাত্ৰায় ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। পুলিশের সাহায্যে ইহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইল—কিন্তু সেইদিন দোকান আর খোলা হইল না। লণ্ডনের নানা পাড়ায় দোকান আক্রমণ প্রাধই ঘটতেছে।

লন্ডেজ অর্জ্ব যেমন টাকাওয়ালা লোক-বিগকে অহরোহ করিয়াছেন, “মহাপদগণ, আপনারা ব্যাধ হইতে টাকা তুলিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইবেন না। চেক এবং নোটের কাল পারিতে থাকুন।” সেইরূপ পান্ডিত্র্য সংগ্রহ সম্বন্ধেও বিচক্ষণ জনস্বাক্ষরকণ এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা উপদেশ দিতেছেন—

“Keep cool. To lay in stocks of provisions is to put an abnormal

strain on the market and to force up prices to the detriment of the poor. If food becomes scarce—and there is a hint of this at present—its distribution will be taken over by the State, and all private supplies will become public supplies to this end. Be economical by all means but do not try to hoard either food or gold.”

অধিকন্তু বাবাসম্বন্ধে বিলাসের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য সকলেই উপদেশ দিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন—“নূতন ধরণের বাহ্য পাইরা জীবন ধারণ করিতে অভ্যস্ত হউন। ডিম, মাগুন, মাংস, মাছ ইত্যাদি যদি না জুটে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমাদের দেশে যে সুদৃঢ় কিনিম উৎপন্ন হয় তাহাতেই বেশ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইতে পারে।” তাহা ছাড়া দেশীয় কৃষকগণকে অর্থ-সাধাৰ্য্য করিয়া ভূমি চাষে প্রবৃত্ত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যে সকল ভূমি পতিত-ভাবে রহিয়াছে অথবা যেখানে অহর্য্যকর বলিয়া ঘাস মাত্র উৎপন্ন করা হয় সেই সকল স্থানে চাষ করা হইবে। খরচ অল্পসারে কৃষক-দিগের লাভ বৃদ্ধ হইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের “সংরক্ষণ-নীতি” অবলম্বিত হইলে কৃষক-দিগের ক্ষতি হইবে না। বেশী বরচে গোধূম বা অল্প দল্য উৎপন্ন হইবে। একেবারে ছুড়িক অশেষ। বেশী নামে বাবা ত্রা পাওয়া মন্দ কি?

গোধূম চাষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি লইতেছেন এবং কৃষকগণকে বশাস্তব সাধাৰ্য্য করিবেন। ইতিমধ্যে Royal Horticultural Society বা রাজস্বীয়

কৃষিসমিতির দৃষ্টান্তক এবং পরিচালক ডুই  
মনে মিলিত হইয়া দেশের সাধারণ গৃহস্থগণকে  
পরামর্শ দিতেছেন—“দেশের নানা স্থানে  
কৃষক গৃহস্থ কর্তব্যবোধে কৃষি পণ্ডিত্য রহিয়াছে।  
সেগুলি পণ্ডিত থাকে এক্ষণে কোন মতেই  
বাহ্যী হইবে না। দিনকাল যেতপ বেধা  
বাইতেছে শীতই আমাদের কি হইবে অসুখ  
করা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু আমরা  
সকলেই যদি নিম্ন শক্তির অসুখেরে কৃষিকর্মে  
লাগিয়া যাই তাহা হইলে অভাবের সময়ে  
অন্ততঃ কিছু উপায় সাধন করিতে সমর্থ হইব  
এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। পণ্ডিত জমিদারি  
চাষ করিয়া বর্তমান কতর উপযোগী বীজবপন  
করা এখনই কর্তব্য। কালবিলম্ব করিলে  
ভবিষ্যতে কষ্ট হইতে পারে।”

এদিকে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ  
করিয়া সংবাদ পত্রের পাঠক পর্যন্ত সকলেই  
ধনীদিগকে বলিতেছেন “মহাপ্রলয়, আপনারা  
মাছ মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যাদি কয়  
ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হউন। আপনারা  
মিতব্যয়ী না হইলে দরিদ্রেরা খাদ্যাদি  
পাইবেই না।” ধনবান কেন, সমাজের সকল  
স্তরের লোককেই মিতব্যয়ী হইবার জন্য  
স্বাস্থ্যকর অহুতোষ করিতেছেন।

এক ব্যক্তি “টাইমস্” লিখিয়াছেন—

“In the terrible visitation of war  
I venture now to claim the most  
earnest personal attention of every-  
one, rich and poor alike, to the  
cardinal importance of curtailing  
to the utmost within reason, in  
each household and elsewhere,  
our usual demands on the food  
supply of the kingdom. I suppose

that there are few households in  
which some diminution, great or  
small, cannot be made without  
any prejudice to health or  
strength

### ৬। লড়াইয়ের সময়ে জনজীবী সম্প্রদায়

চারি কোটি লোকের দেশে দুই বাবিলে  
প্রকৃত বৃত্তক্ষেত্রে চতুস্ত ৫০০ লক্ষ মাত্র শোক  
নিবৃত্ত হয়। সেনাবিভাগের কার্যে দেশের  
সকল লোককেই ব্যাটিতে হয় না। কিন্তু  
সাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের অল্পসংখ্য  
অতি সহজেই হওয়া আবশ্যক। ধনী লোকেরা  
অবশ্য ষাণ্মাস্যের কষ্ট বেশী ভোগ করেন  
না। তাহাদের টাকা আছে—বেশী দামে  
জিনিষ খরিদ করা তাহাদের পক্ষে সহজ।  
নিতান্ত প্রয়োজন হইলে উচ্চ অর্থের বিলাস  
সামগ্রী তাহারা বর্জন করিতে বাধ্য হইতে  
পারেন। এইটুকু মাত্র তাহাদের অসুবিধা।  
কিন্তু সাধারণ জনগণ রোগে আক্রান্ত হইয়া  
শতকরা ৮০। ৯০ জন লোকেরই এই অবস্থা।  
চারি কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ কোটি  
লোককে মাংসের দাম পায়ে ফেলিয়া কেবল  
মুগ বা কৃষকভাবে আর সংগ্রহ করিতে হয়।  
লড়াইয়ের সময়ে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য  
অবস্থা হইবার কথা। তাহাই হইলে ইহাদের  
চাকরী, বেতন, সাহায্যনা সবই বন্ধ হইয়া  
যাটতে পারে। এট অবস্থার অনাগারে মর্যাই  
জনসাধারণের ভাগ্যে ঘটবার আশঙ্কা।

দেশের শতকরা ৮০। ৯০ জন লোক না  
খাইয়া মরিতে থাকিলে কি শত্রুর সঙ্গে লড়াই  
করা সম্ভবপর হয়? একপক্ষের তিতরই  
মহা বিপ্লব ও ধরোহা মারামারি উপস্থিত

হইবে যে। কাজেই রূপ-প্রতিভা, বুদ্ধির  
অল্প প্রস্তুত হইবার সময়ে কেবলমাত্র জাতি-  
জের নাবিক লম্বা) এবং লৈনিকঃষের পোনা-  
বালক ইত্যাদির হিলাব করিয়া ক্ষান্ত হন না।  
জাতিগণকে দেশের অমলীয়া ও কৃষিকারী  
এবং বণিক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা। বিশেষ  
রূপেই সহজ সরল ও স্বাভাবিক রাখিবার চেষ্টা  
চেষ্টিত হইতে হয়। আবার এই অল্পই শত্রু-  
পক্ষীয় লোকেরা গুলুচর রাখিয়া দেশের কৃষি,  
শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তির নানা প্রকার  
গোলযোগ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। তাতে  
মারিতে পারিলে শত্রুপক্ষকে বুদ্ধক্ষেত্রে পরা-  
জিত করিবার চেষ্টা বিশেষ বেগ পাইতে হয়  
না। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শত্রুর  
আওতা হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে  
বুদ্ধের আগের অবতীর্ণ হওয়া ছেলেমাছুরী  
মাত্র।

জাখানি, কলিগা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সকলেই  
নিজ নিজ মজুর সম্প্রদায়কে তাহাদের চিরা-  
ভ্যন্ত বর্ণে নিম্নরূপ রাখিবার চেষ্টা প্রাণপণে  
চেষ্টা করিতেছেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের  
অসুস্থতানজাল এক এক দেশে এক এক  
প্রকার। কাজেই বর্তমান কুরুক্ষেত্রসময়ের  
প্রতিদ্বন্দ্বিপন নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে  
ব্যবস্থা করিতেছেন।

ইংরাজের প্রথম আশঙ্কিত বিশেষ হইতে  
খায়া জ্রব্য এবং শিল্পোপকরণের আমদানী।  
এই আমদানী নিষিদ্ধতরূপে না হইলে প্রথমতঃ  
সকলকেই না বাইরা মরিতে হইবে, এবং  
দ্বিতীয়তঃ শিল্পের কার্যবানাজিল উপকরণ-  
ভাবে বন্ধ থাকিবে, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ নর  
নারীকে "জবাব দেওয়া" হইবে।

বুদ্ধের সময়ে মাল আমদানী কথা ত সহজ  
কথা নয়। বিশেষের মহাপ্রবলতা নাহি না

পাইলে মাল ছাড়িবেন কেন? শান্তির সময়ে  
বুদ্ধের কথার ও কোম্পানীর কাগজে বিশ্বাস  
করিয়া জিনিসের লেনদেন চলিয়া থাকে। কিন্তু  
এখন নগর টাকা চাই। নগর টাকা না পাইলে  
মাল কেহই বেচিবে না। অবশ্য বর্তমান  
ক্ষেত্রে ইংরাজকে খারে বেচিতে কোন দেশের  
লোকই বেশী আগ্রহী করিতেছেন না।  
কোম্পানীর কাগজ, বিল অব এক্সচেঞ্জ  
ইত্যাদির মোহেরই মাল ছাড়া হইতেছে।  
কিন্তু মাল বিলাত পথ্যস্ত পৌছিতে কি  
করিয়া?

কতকগুলি মালের জাহাজ বুদ্ধবোববার  
সময়ে সমুদ্রের মধ্যে ছিল। শত্রুপক্ষের রণ-  
তরী তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিল।  
তবে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র নিকটবর্তী উনাদীন বা  
neutral রাষ্ট্রের বন্দরে প্রবেশ করিল।  
এইরূপে শত শত মাল বোতাই জাহাজ  
উনাদীন বন্দরে আটকা পড়িয়াছে। এইরূপ  
আশ্রয় গ্রহণ বা আটকের নাম internment.  
বর্তমান যুদ্ধের রণ-নীতি অনুসারে কোন  
উনাদীন রাষ্ট্রের বন্দরে মালের জাহাজ আশ্রয়  
লইলে তাহাকে শত্রুপক্ষের রণ-তরী আক্রমণ  
করিতে পারে না। জাখানি মালের জাহাজ  
ইংরাজ মালের জাহাজ এই নিয়মের প্রভাবে  
নানা উনাদীন বন্দরে আশ্রয় লইয়া বাটিল।  
কিন্তু বাটিয়া লাভ কি? সেণে ত শীঘ্র  
আগিতে পারিবে না।

জাখানির কোন কোন মালের জাহাজ  
শাহস করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে  
লাগিল। কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই শেতলি  
ইংরাজ রণ-তরীর দখল হইল এবং prize of  
war নামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্দরে বন্দরে  
পাঠান হইল। কতকগুলি গ্রেপ্তার করা  
জাহাজ কলিকাতায়ও বন্দী হইয়া রহিল।

সমুদ্রপথে হেপ্টার হইবার আশঙ্কা ইংরাজ  
আহাজ কোম্পানীর বড় বৈশিষ্ট্য করিতেছেন।  
নতুন কোন মালের আহাজ আনাইতে বা  
পাঠাইতে হইলে বীমা কোম্পানী অত্যধিক  
হারে মাহুল চাহিতেছেন। ১০০০ টাকার  
মাল বীমা করিবার জন্য ৮০ মাহুল দিতে  
হয়। বীমার মূল্য এত বেশী হইলে আহাজে  
মাল পাঠান একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইবে  
আহাজ আশঙ্কা কি? সত্যি marine insur-  
ance এ কয় দিনের ভিতর সম্পূর্ণরূপেই  
স্থগিত প্রতিঘাটে বলা যাইতে পারে। আহাজ-  
খানায়, পোতাশ্রয়ে, তরেক কাম একপ্রকার  
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সমস্ত স্থানী মজুর  
কয়লার খাদ্যের লোক একপে কর্তৃহীন হইয়া  
পড়িতেছে। তাহা ছাড়া লোহালব্ধের বড়  
বড় ক্যান্ট্রীও'স চালাইবার টাকা পাওয়া  
যাইতেছে না। এই কারণে অসাধ্য জমজীবী  
ও কেরানী 'বেকার' হইয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থার গবর্নেন্ট দুটটি নিয়ম প্রচার  
করিলেন। প্রথমতঃ শিল্পী, মহাজন ও  
ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দিবার জন্য ব্যাঙ্কের  
কমতা দেওয়া হইল। যদি কিছু লোকসান  
হয় গবর্নেন্ট দায়ী रहিলেন—সমস্ত কতি পূরণ  
ষ্টেট হইতে করা হইবে। বিতরিতঃ আহাজ  
কোম্পানীগুলিকে রক্ষণ হইতে রক্ষা করিবার  
জন্য গবর্নেন্ট নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।  
সকল কতি পূরণ গবর্নেন্ট করিবেন—এই  
সর্বো বীমা-বিভাগ খোলা হইল। স্তরায়ঃ  
মালের আহাজ নির্মিয়ে সমুদ্রপথে চলা ফেরা  
কলক। ইংরাজেরা তাহাদের বণিকের পক্ষ  
সমক্ষে এত বিশ্বাসবান্ যে এই গুরুতর দায়িত্ব  
গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতিদেরা বিস্ময়াজ ভীত  
নন। এমন কি, তাহারা বলিতেছেন, "যদি  
আমাদের শত করা ৪০ খানা আহাজও পক্ষ

দখল হয় তাখাপি ভাবনা নাই। অবশিষ্ট  
আহাজে খাদ্য ও শিল্পের উপকরণ আসিতে  
পারিবে। দ্বিত তিনগুণ মূল্য বাড়িবে।  
তাছাড়াই ব্যক্তি কি? দেশের লোক ত  
খাইয়া বাঁচিবে, এবং কারখানাগুলির কাজ ত  
চলিতে থাকিবে। জমজীবীসমাজকে শান্ত  
রাখিতে পারিলে আমরা নির্মিয়ে সক্ষমকের  
সঙ্গে লড়াই চালাইতে পারি। এই মুহুর্তে  
আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হই-  
তেছে কাজেই ব্যবসায় হিসাবে লাভ কতি  
বিবেচনা করিবার ইং সময় নয়।"

আমদানি রপ্তানি সংরক্ষিত করা হইল।  
এদিকে বন্দোবীশ শিল্প কৃষি-কর্ম ও গবর্নেন্টের  
আইনানুসারে ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইতে  
থাকিল। কাজেই কেরানী, স্থানী, মজুর  
ইত্যাদির সমস্তা অনেকটা নরম হইতে  
চলিল।

সে দিন Daily News পক্ষে এক ব্যক্তি  
জমজীবী সমস্তা বিশদরূপে আলোচনা করিয়া-  
ছেন। তাহার মতে মুহুর্তের সময়ে দরিদ্র  
স্থানী মজুর ও শিল্পী জনগণকে কাজে লাগাইয়া  
রাখা বিশেষ কঠিন নয়। চিন্তাশীল রাষ্ট্র-  
যৌরো প্রথম হইতে দর লইলে জনগণের  
অবস্থা কোন মতেই শোচনীয় হইতে  
পারে না।

Westminster Gazette বলিতেছেন—

"If credit is secured, so that the  
flow of working capital continues  
the first great step is taken, and  
the evil is at once reduced to a  
minimum. Industries which can  
keep going will get orders to  
replace foreign supplies, and  
gradually find new opportunities in

colonial and neutral markets. Then the problem will be narrowed down to those industries which cannot replace their foreign trade or which are threatened with stoppage for lack of raw material supplied in normal times from enemy countries."

অর্থাৎ ব্যাকগুলি যদি সাহস করিয়া করিত-  
কর্ম্য পূরকরগণকে টাকা ধার দিতে থাকেন  
তাহা হইলে কোন গণগোল উপস্থিত হয় না।  
সেই মূলধন লইয়া অনেক নতুন শিল্প স্থাপিত  
হইতে পারে। তাহার ফলে বহু নতুন  
লোকের কর্মক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। এই সকল শিল্প  
উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমশঃ উদ্যোগী দেশে রপ্তানী  
করা যাইতে পারে। ফলতঃ দেশের আর্থিক  
অবস্থা উন্নত হইবার সম্ভাবনা। তবে  
ইংল্যান্ডে এমন কতকগুলি শিল্প আছে যাচাও  
জস্ত জাখানি এবং অগ্নিহা হইতে উপকরণ  
আসে। বলা বাহুল্য সেই সকল শিল্প এক্ষণে  
চলিবে না। এতদ্ব্যতীত দূর উপনিবেশ হইতে  
কৃত্রিমভাবে মাল হস্তান্তর শিল্প দেশে পৌঁছিতে  
না। এই সকল উপকরণের উপর যে সমুদ্রার  
কায়বাহের অতিশয় নির্ভর করে সেগুলি কিছু  
কাল বন্ধ থাকিতে বাধ্য। তাহার ফলে  
অসংখ্য লোকই কর্মহীন হইয়া পড়িবে। এই  
সকল বেকার লোকের জন্ত কি করা যাইতে  
পারে ?

একজন বলিতেছেন :—

"Some of them will be absorbed by the army, some by armament firms and war contractors, and a good many more, we trust, by useful public works."

গবর্নেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড  
ইত্যাদির অধীনে নানা প্রকার Public works  
খোলা আবশ্যক। অবশ্য ইহারা সর্বদাই  
নানা প্রকার কারবার চালাইয়া থাকেন।  
তাহার সাহায্যে বহু নর নারীর প্রতিপালন  
হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ে সেই সকল কার-  
বার পুরাণমে চালান উচিত। এখন কি,  
আরও কতকগুলি নতুন নতুন কার্য, শিল্প,  
বাণিজ্য, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, উদ্ভান, রেলগথ  
ইত্যাদির জন্ত তৈরী হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্র-  
বীরগণকে সর্বদা মনে রাখিতে হয় যে—

"Prolonged unemployment is a condition from which some of the best men can never recover, and homes broken up can never be put together again. By keeping the nation at work we fortify its morale and reduce the waste of war to a minimum."

কতকগুলি ব্যবসায়িক-কোম্পানী তাহাদের  
কারবারের লাভ প্রকাশ করিয়াছেন।  
বৎসরে ২।৫ বার এইরূপ করা ব্যবসায়  
মহলের রীতি। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে কোম্পা-  
নীর কর্মক্ষমতা বলিতেছেন "আমরা অংশী-  
দারগণকে লাভের কথা জানাইলাম বটে।  
কিন্তু লড়াইয়ের ছল্লাপ না কমিলে তাহারা  
প্রাপ্য টাকা পাইবেন না। এই টাকা এক্ষণে  
আমাদের ঘরে মজুত রাখা আবশ্যক। কারণ  
ব্যাক হইতে টাকা ধার না পাইলে এই গচ্ছিত  
লাভ খরচ করিয়া কারবার চালাইতে পারিব।  
তাহা না হইলে হঠাৎ কেল যারিবারও  
আশঙ্কা আছে।"

কিন্তু কোম্পানীদিগের এই কার্যপ্রণালীর  
বিষয়ে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ প্রত্যেক সংবাদ পত্র

বাহির হইতেছে। প্রধান কথা এই যে বহু মহাবিশ্ব পরিবার এই লাভের টাকা চাহতে পাইলে বিপদের সময়ে অনেক কষ্ট এড়াইতে পারিবে। একজন জানাইয়াছেন—

"Think of the small holders to whom the keeping back of their little incomes at this critical time may mean almost poverty."

আর একজন বলিতেছেন—

"The receipt of these dividends would probably be a Godsend in many homes ; in many cases the money has been relied upon to relieve the present financial pressure, if not to provide present needs."

কতকগুলি কোম্পানী ব্যবসায়ের কার্য করিয়া যথেষ্ট লাভ অর্জন করিতেছেন। যুদ্ধের দ্বারা অবলম্বীয়া ভাঙ্গিয়া হইতেছে যেহেতু মহাশয়েরা তাহাণিপের পরিবারের ভরণপোষণের ভার লইতেছেন। মদ্র ও শিল্পীরা এই ব্যবহার চতুর্ভুজ উৎসাহে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভাঙ্গিয়া গেল কারবারের কঠোর আশ্রয় দিলেন যে "যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তোমারিগকে কাছে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা হইব। ইতিমধ্যে তোমাদের বেতন নিয়মিতরূপে তোমাদের প্রীপ্তির নিকট পাঠাইতে থাকিব। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও।" কতবারের মালিকেরা এইরূপে অনেক কতিমাত্র পাতিয়া লইলেন। রেল কোম্পানী, হোটেল কোম্পানী, তেল কল, গমকল এবং কাগজের কলের কারবার, বড় বড় বোকারের স্বত্বাধিকারী, ভাঙারখানার মালিক, ট্যাক্স কোম্পানী ইত্যাদি ইত্যাদের পক্ষ পক্ষ

মতামত-মতনী এই জাতীয় বিপৎকালে প্রয়োজ্য সমাধের বন্ধু হইয়া গবেশিত ও জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। একদম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আজকাল বিশালি সমাধে অসংখ্য। এই জগৎই অবলম্বী সমগ্রা এখানে বেশী ভীতিজনক নহে।

৭। আমদানী রপ্তানী ও দালালি  
ব্যবসার কারবার না হইলে এবং বিনিময় বাজারের লেন দেন না হইলে বর্তমান জগতের কারবা কারখানা বুঝা অসম্ভব। কাগজের নোট, কোম্পানীর কাগজ, হতি, চেক, বিল অব্ এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাপত্র ও আদেশপত্রগুলি আজকালকার দিনে কোটি কোটি লোণাত্মক টাকার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অথচ তাহারই সাহায্যে ছিন্দিয়ার এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের ব্যবসায় অতি সহজে চলিতে থাকে। কুবিবল, শিল্প বল, বাণিজ্য বল—সকলই এই কাগজের সাহায্যে চলিতেছে বলা বাইতে পারে। ইউরোপের বড় বড় কারবারে নব টাকার ব্যবহার হয়ই না। ভারতবর্ষেও এই কারবা বেশ প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। জগতের কোন স্থানেই আর এই কাগজের প্রভাব ছাড়াইয়া থাকিতে পারে না।

এই কাগজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার কলে আবহা প্রধানতঃ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাই। প্রথমতঃ জগতের কোন এক স্থানে ব্যবসায়ের সামান্য মাত্র এতদিক ওদিক হইলে সকল স্থানেই তাহার প্রভাব আশ্রিতা পৌছে। দ্বিতীয়তঃ, আমদানী রপ্তানীর পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বিনিময়-বাজারের সঙ্গে টাকার বাজারের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান। টাকার বাজারে অর্থাৎ ব্যাংক পাড়ার কোন গোলাঘোণ উপস্থিত হইলে বিনিময় বাজারে অর্থাৎ দালাল-পাড়ার



তৎকালীন ব্যাপার কি বৃত্তিতে পারা যায়।  
আবার আমদানী ও রপ্তানীর পর্যায়ের মধ্যে  
কোনরূপ নূতন ঘটনা ঘটিলে ব্যাঙ্ক মংলেও  
হৈ চৈ উপস্থিত হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ  
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির কোন বিভাগে  
সামান্য মাত্রা নড়ন চড়ন হইলেই সকল বিভাগে  
তাড়াতাড়ি কল বৃত্তিতে কোন সময় লাপে না।  
যুদ্ধের সময়ে এই সকল তত্ত্ব সর্বদা মনে না  
রাখিলে রাষ্ট্রবীরেরা ঈশ্বরই পরামিত হইবেন।  
লোহালতড় গোলাগুলি আচাৰ্য কামান  
ইত্যাদি বৃত্তিতে পারিলেই বর্তমান যুদ্ধের দুই  
চালান যায় না। টাকার বাজার এবং  
বিনিময় বাজার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলে  
রপণপণ্ডিতগণ নিত্যন্ত অকৰ্ম্মণ্য হইয়া  
পড়েন।

মনে করা যাউক, কলিকাতার দে, দত্ত  
গাও কোম্পানী আমেরিকার ব্রাহ্মণ  
কোম্পানীর নিকট জাহাজ বা রেলগাড়ি  
সংক্রান্ত কলকল্যাণ লোহালতড় ইত্যাদির অর্ডার  
দিয়াছেন। এই অর্ডারকে *indent* (ইণ্ডেন্ট)  
বলা হয়। ব্রাহ্মণ কোম্পানী এই অর্ডার  
পাইয়া আমেরিকার নানা কারখানাঘ ঘুরিয়া  
মাল খরিদ করিলেন। তারপর মাল  
কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।  
এই ব্যবস্থা করিতে জাহাজ কোম্পানী,  
বীমাকোম্পানী, রেল কোম্পানী ইত্যাদি নানা  
কোম্পানীর সাহায্য আবশ্যক। সমস্ত ঠিক  
হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ কোম্পানী থরচের  
তালিকা প্রস্তুত করিবেন। সাধারণতঃ নিম্ন-  
লিখিত বাবদে থরচ লেখা হইয়া থাকে :—

- ১। মালের দাম
- ২। ডকের ভাড়া
- ৩। জাহাজ ভাড়া
- ৪। রেল ভাড়া

৫। সহস্র বীমার মাসুল

৬। বীমা কাছের অন্তর্গত ষ্ট্যাম্প থরচ

৭। কুলী ভাড়া

৮। খুঁচরা থরচ

৯। ব্রাহ্মণ কোম্পানীর কমিশন

এই নয় হিসাবে দত্ত থরচ হইল সমস্তটাই  
মিলাইয়া একটা মূল্যপত্র প্রস্তুত করা হইবে।  
এই বিল বা মূল্য পত্রের নাম Bill of Ex-  
change। ব্রাহ্মণ কোম্পানী দে দত্ত  
কোম্পানীর নিকট এই বিলের টাকা পাইবেন  
—এই মধ্যে বিলের উপর লেখা থাকে।  
দে দত্ত কোম্পানীকে এই মূল্য আদেশ করা  
হইবে যে অল্প দিন তাহার ব্রাহ্মণ কোম্পা-  
নীকে টাকা দিবেন।

“বিল অব এক্‌চেঞ্জ” এই হিসাবে একটা  
“আদেশ-পত্র” স্বরূপ। কাগজের নোটগুলি  
গবর্নমেন্টের বা ব্যাঙ্কের “প্রতিজ্ঞাপত্র।” সেই  
সমুদয়ে লেখা থাকে যে গবর্নমেন্ট বা ব্যাঙ্ক  
জনসাধারণের নিকট অন্ত টাকা ধারেন—  
সুতরাং অন্ত টাকা যে কোন সময়ে ফিরাইয়া  
দিবেন।

নোটের উপর গবর্নমেন্টের বা ব্যাঙ্কের কর্তা  
লিখিয়া থাকেন—“I promise to pay the  
bearer on demand” কিন্তু বিল অব  
এক্‌চেঞ্জের উপর লেখা থাকে—“Pay to our  
order” চেক বহিতেও এইরূপ আদেশ লিখিত  
হয়। বলা “Bank of Bengal, pay to—”  
কারণ ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখিবার পরেই  
ব্যাঙ্কের চেকবহি পাওয়া যায়। গচ্ছিত টাকা  
ফিরাইয়া পাইবার অন্ত ব্যাঙ্ককে ত আদেশ  
করিতে হইবে। এইমূল্যে ব্যাঙ্ক টাকা ধার-  
লইয়াছিল বৃত্তিতে হইবে। আদেশ-পত্র এবং  
প্রতিজ্ঞাপত্র দুই-ই টাকার সমান মূল্যবান,  
বাছারে দুইয়ের সাহায্যেই কাজ চলিয়া যায়।

তকাল এই যে, আদেশ পত্রের লেখক উত্তমর্ণ অথবা বিক্রেতা অথবা রপ্তানী-কারক। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পত্রের লেখক অধমর্ণ বা ভণ-এরীতা।

বাহ্যহটক ব্রাহ্মণ কাম্পানী আদেশ-পত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ইহার। এই পত্র বেচিবার বা ডিসকাউন্ট করাইবার চেষ্টায় ঘুরিতে থাকিবেন। পত্র না বেচিলে টাকা আসিবে কোথা হইতে? তাহা না হইলে ইহার। বিক্রেতাকে দাম দিবেন কি করিয়া? ভবিষ্যতে নূতন কারবার চালাইবেনই বা কি করিয়া?

টাকার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ব্যাধপাড়ার আদিবেন। ব্যাধপাড়ার অধেনী বিশেষ অনেক ব্যাধের কারবার চলিতেছে। ব্রাহ্মণ কলিকাতার কোন ব্যাধের নিউইয়র্কস্থিত শাখাব্যাধের শরণাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি এই শাখাব্যাধের কারবার পূর্ণ হইতে চলিয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে ব্রাহ্মণ “আদেশপত্র” অহুলায়ে টাকা পাইবেন। এই আদেশ পত্র বেচা হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ টাকা লইয়া ঘরে ফিরিবেন। তাহার পর হইতে নিউইয়র্কস্থিত শাখাব্যাধ ঐ “আদেশপত্র” এবং তাহাতে নির্দিষ্ট মালের মালিক হইবেন। কারণ আদেশ-পত্র টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া শাখাব্যাধ মাল গুলিই খরিদ করিয়াছেন বৃত্তিতে হইবে।

ইতিমধ্যে মাল আনিয়া কলিকাতার পৌছিলা। তাহার দুই এক সপ্তাহের ভিতরেই শাখাব্যাধ কলিকাতা ব্যাধের নিকট ব্রাহ্মণের আদেশপত্র পাঠাইলেন। আদেশপত্র পৌছিবা মাত্র কলিকাতা ব্যাধ দে দত্তকে সংবাদ দিলেন। দে দত্ত টাকা দিয়া “আদেশ পত্র” স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহার ফলে

নিউইয়র্ক ব্যাধ অথবা তাঁহাদের কলিকাতা শাখাব্যাধ বিল অব-এক্সচেঞ্জ এবং মালভণির স্বত্ব দে দত্তকে প্রদান করিলেন।

অতএব দেখাগেল যে, দে দত্ত কোম্পানী আমেরিকার কোন কারখানা হইতে মাল আনাইলেন। সেট কারখানার সঙ্গে ইহারের কোন কারবার হইত নাই। ব্রাহ্মণ কোম্পানী এডেন্ট কর্তৃক মাল কিনিয়া দিলেন। কিন্তু মাল ক্রয় করিবার অল্প কলিকাতা হইতে নিউইয়র্ক টাকা পাঠান হইল না। ব্রাহ্মণ কোম্পানী নিউইয়র্কের ব্যাধে টাকা পাইলেন। এদিকে দে দত্ত কোম্পানী কলিকাতাব্যাধে টাকা জমা দিলেন। তাহার পর নিউইয়র্ক-ব্যাধে এবং কলিকাতাব্যাধে বুঝা পড়া চলিবে। যদি দুই ব্যাধেরই কর্ত্তা এক কোম্পানী হন তাহা হইলে ত কোন পোল-যোগ নাই। কিন্তু দুই ব্যাধের কর্ত্তা যদি দুই কোম্পানী হন তাহা হইলে কলিকাতা ব্যাধ হইতে নিউইয়র্কব্যাধে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা একদিন না একদিন করিতেই হইবে। এই টাকা পাঠাইবার নিয়ম বড় বিচিত্র। বাহ্যহটক ব্যাধের সঙ্গে অমহানী রপ্তানীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝাগেল।

প্রায়ই একতর দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ কোম্পানী নিজে ব্যাধে বাইরা টাকা আনেন না। তাহার। আদেশপত্রগুলি দালালদিগের নিকট বেচিয়া ফেলেন তাহার পর ব্যাধের সঙ্গে দালালদের কারবার চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, আমদানী রপ্তানীর কারবার প্রত্যেক দেশেই এতবেশী যে দালালের সংখ্যা অসংখ্য প্রায় এবং প্রতিদিন অসংখ্য আদেশ পত্র দালাল মতলে কেনা বেচা হয়। দালালের। আবার কাণ চালাইবার অল্প শেষ পর্যন্ত ব্যাধের উপরই নির্ভর করেন।

### ৮। যুদ্ধারম্ভে নগরদৃশ্য

যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার রেলপথগুলি সামরিক নিয়মে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। সেনাবিভাগের অত্যাবশ্যকীয় করিবার অল্প যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহা করা হইবে—রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরা জনসাধারণকে জানাইয়া দিলেন। জনসমূহের ব্যস্তাঘাত এবং সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের বিকে কোন লক্ষ্য রাখা হইল না। অতিরা, জার্মানি এবং ফ্রান্স এই তিন দেশেই রেলপথ সম্বন্ধে কঠোর আইন জারি করা হইল। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন সম্বন্ধেও এই নিয়মের কাছ হইতে লাগিল। জনসাধারণের ব্যক্তিগত অভাব মোচনের ভিত্তি এইগুলি ব্যবহৃত হইতে না পারিলে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না—এই মর্মে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বলা বাহুল্য এক দেশ হইতে অল্প দেশে আসা বাওয়ার উপায় সম্পূর্ণরূপেই নষ্ট করা হইয়াছে।

ইংল্যান্ডেও রেলপথ, তারত্ব, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি গবর্নমেন্টের শাসনাধীন হইল। এখানকার ‘রেলকোম্পানীগুলি তাহাদের সময় ও পাড়ীর নির্দিষ্ট গবর্নমেন্টের পরামর্শ অনুসারে বদলাইতে আরম্ভ করিলেন। জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা প্রচুর হইল। কিন্তু “আত্মের নিয়মো নাস্তি।”

জুন জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপের লোকেরা নানা দেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। কাজেই ক্রান্ত, জার্মানি, ইতালী, বেলজিয়াম, হাইডেলবার্গ ইত্যাদি দেশের নগরে এবং পলীতে বহু-সংখ্যক আমেরিকান, ইংরাজ, জার্মানি,

ফরাসী ইত্যাদি বাস করিতেছিলেন। বিনামধ্যে ইংল্যান্ডের উপর বজ্রাঘাত হইতে চলিল। অকস্মাৎ যুদ্ধের ডেরী বাজিয়া উঠিল—চারি দিকে mobilisation অর্থাৎ সৈন্তের চলাচল আরম্ভ হইল কোন নগরে বা পলীতেই রেলপাড়ী বা মোটরকার পাইবার উপায় থাকিল না। সকলই গবর্নমেন্টের হস্তগত। সেনাবিভাগের কার্য ছাড়া অল্প কোন কার্য রেল বা মোটরকারে হইতে পারিবে না হুম্ব হইয়াছে। কাজেই পর্যটকেরা interned হইলেন—অর্থাৎ থানাহানে আটকাইয়া গেলেন।

কেহ কেহ যুরিগা কিরিয়া নানা কৌশলে স্বদেশে কিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন। অধিকাংশই বিদেশে পড়িয়া রহিয়াছেন। একব্যক্তি যুদ্ধ ঘোষণার দিন জার্মানিতে ছিলেন—তখনও ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানির লড়াই শুরু হয় নাই—কেবল বচসা চলিতেছিল। ক্রাফোর্ট নগর জার্মানির একটি প্রধানতম ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এখানকার ব্যবসায়ীরা হোটেল ক্যাফেতে এবং সন্ধ্যাবেলা গাড়িয়ার বিক্রেতা বেশ গরম গরম কথা বলিতেছিল। অস্ত্রিয়ার স্বপক্ষে যুদ্ধের সন্ধ্যা ঘেখানে সেখানে শুনা যাইত। হস্তেলবার্গ বিভাগ-কেন্দ্র। এখানেও সেইরূপ উদ্দীপনা এবং আন্দোলন। কয়েকদিন পরে এই ব্যক্তি একটি ধনিগণের বিলাসনগরে যান। সেখানে একটি হুম্বর প্রমোদ কানন আছে। এই বাগানের জনতারও পর্যটক অস্ত্রিয়া ও জার্মানির জাতীয় সন্ধ্যা গুলিতে পাইলেন। তারপর সেনাকেন্দ্র কোরেন্স নগরে আসিয়াও সেইরূপ উদ্দীপনার দৃশ্য দেখিলেন। অস্ত্রিয়া ও সন্ধ্যা যুদ্ধ বাধিতে না বাধিতেই জার্মানির সকল কেন্দ্রে যুদ্ধের বাসনা প্রবলভাবেই আগিয়া উঠিয়াছিল।

আত্মাণির নানা স্থানে এইরূপ উদ্দীপনাময় গান শুনিয়া পর্যটক বিম্বিত হইতেছিলেন। তিনি বলেন—“Let me hear a people's songs, and I will tell you their minds.” সামগ্রিক দীর্ঘ সাহিত্যে সাহিত্যে আত্মাণেরা বক্তার মূর্ত্ত কল্পনা করিতেছিল। পর্যটক একটি হোটেলে রাত্রি কাটাইতে ছিলেন। তাঁহার নিকট একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। তাহাকে পাঠ করিতে দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি মহাপুত্র, আদর্শগেহের বরাজ আত্মাণনের খবর কিছু আছে কি? দেখা যাইতেছে ইংরাজেরা আদর্শগেহের গোলমালে বড়ই বিব্রত। ইউরোপের বিরাট ব্যাপারে ইংরাজ একদে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন কি? এখন যে ইংল্যাণ্ডে Civil War চলিতেছে।”

এক ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ার সমুদ্র উপকূল হইতে ইতালীতে যাইতেছিলেন। ইনি বলেন যে সার্তিয়ার বিকক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে ট্রিয়েষ্ট নগরের স্নাতদিগকে অষ্ট্রিয়ার কর্ণ-চারীরা বড়ই নির্ধাতিত করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়ার সর্বস্বাই সম্বেহ আছে যে, হ্রবোগ পাইলেই তাঁহার বিম্বিত স্নাতেরা সার্তিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে।

ইনি ভাফাত্তি ইংল্যাণ্ডে ফিরিতে চেষ্টা করিলেন। কৃৎ কোম্পানীর লোকেরা ইহাকে বলিল “বোধ হয় হুইল্লগেহের পথে প্যারি পর্য্যন্ত যাওরা। বেশী কষ্টান হইবে না। তবে passport সর্ব্বা। বাহিরে রাখিবেন।” পর্যটক মিলান নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিলেন। সেখানে তাহাকে বলা হইল যে ত্রেসপথে ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালীর সখ্যোগ ছিন্ন করা হইয়াছে। নানা কিস্তির করিয়া

ইনি ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর ইনি ফরাসী সেনাপতির সঙ্গে দেখা করিয়া কলে বুকাইয়া দিলেন—আমি ইংরাজ। বেশে ফিরিয়া গেলে ডলান্টিগের সঙ্গে দুকিতে পারিব। তাহার পর ত ফরাসীদের সঙ্গেই একত্রযোগে শত্রুর বিকক্ষে লড়াই করিব। এত কথা শুনিয়া ফরাসী কর্ণ-চারীরা ইহাকে প্যারিতে আসিবার গাড়ী দেখাইয়া দেন। এখানে পৌছিতে ইহার সাধারণ অপেক্ষা ৪ গুণ সময় বেশী লাগিল। ২২।১৪ বার গাড়ী বদলাইয়া অবশেষে প্যারিতে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ৪০০ ইংরাজ হুইল্লগেহের লন্ডান-নগরে আটকাইয়া গিয়াছেন। হাতে টাকা পরশা নাই—কেবল চেক মাত্র সল। কাঙ্খেই মহা কষ্ট। হুইল্লগেহে কোন লড়াই নাই—কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য mobilisation শুরু হইয়াছে।

ফ্রান্সের সকল কর্ণক্ষেত্রেই সামগ্রিক আইন জারি করা হইয়াছে! দেশের সকল সৈন্যই আত্মাণ সীমার নিকে পাঠান হইতেছে—এথিকে রেগপথ হুড়ল সেতু ইত্যাদি সবই সৈন্য কর্তৃক হরক্ষিত। পরীগ্রানে কেবল মাত্র বৃদ্ধ, বালক ও রমণী মটলা করিতেছে। শত্রু সল লোক মাত্রই সেনাবিভাগে নিযুক্ত।

ফ্রান্সের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি বন্ধা করিবার জন্য সবিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শত্রুর পর কেহ নগরের বাহির হইতে পারেন না। বাহির হইলে তাহাকে সার্তি দেওয়া হইবে—এই আদেশ প্রচারিত। ইংল্যাণ্ডের খবর ফরাসী পাইতেছেন না। ফরাসীর খবরও ইংরাজ পাইতেছেন না। এমন কি প্যারি নগরের লোকেরাও যুদ্ধের কোন খবর

পান না। ভূমধ্যসাগরের রণতরী সম্বন্ধে এবং বেলজিয়ামের আশ্রাণ সেনা সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্র সংবাদ—তাহাও উড়ু উড়ু—ক্রান্তে প্রচুরিত।

ক্লাসের নানা স্থানে নাকি অনেকগুলি জর্জার গুল্লির নানাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে ঘেঁষার করিবার ক্ষমতা অশেষ চেষ্টা। হইতেছে—তথাপি কোন ফল নাই। ইহারা রেলপথ এবং সেতুগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আশ্রাণ সেনাদাতক কর্তৃক আনিষ্ট। কাৰ্বেই ক্লাসের অগ্নিগণি। হাট বাজার, হোটেল দোকান, রেল, নৌকা সবই কঠোর সামরিক আইনে শাসিত হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে ক্লাসের প্রত্যেক আবার বৃদ্ধ বনিতাই বৃদ্ধসংক্রান্ত কোন না কোন কাৰ্কে লাগিয়া গিয়াছে। গমগ্র জাতিই সহস্র বলা বাইতে পারে। মাটির কেরানী উকীল মন্ত্রী, ডাক্তার, কৃষক, মিস্ত্রী, মজুর, কৃষক, মেঘপালক, শাসনকর্তা, নাকি, ইত্যাদি সকল জীবেরই সবল লোকই অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রুমীরা হালপাতালের কাৰ্কে লাগিতেছে। বৃদ্ধ আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষা করিবার ক্ষমতা ইহারা শিক্ষা পাইতেছে। আফিস, কার্যালয়, রেলওয়ে ইত্যাদি কর্তৃক হইতে পুরুষেরা বৃদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের স্থানে কার্য করিবার ক্ষমতা সহস্র সহস্র রুমী নিযুক্ত হইয়া গেল। ইহাকেই বলে "A nation in arms."

ইংল্যান্ডেও হেঁচ, হুজুগ, গল্প শুদ্ধ কথ নহ। রেল, ডাকঘর, ডাক, টেলিফোন সবই গবর্নমেন্টের শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছে। বাজার দর হইতে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা পর্যন্ত

সকল দিকেই গবর্নমেন্ট দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। ইংল্যান্ড রটলাও ও আয়ারল্যান্ডের সর্বত্রই নথাদাধ্য দেশতকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। নগরে নগরে শোকেরা যুদ্ধের সংবাদ পাইবার ক্ষমতা ব্যস্ত। সকল স্থান হইতেই দেশসেবার ক্ষমতা অসংখ্য প্রকার প্রস্তাব ও আলোচনা প্রত্যেক কাগজে ছাপা হইতেছে। নানা উদ্দেশ্যে মুষ্টিভিক্ষা, রানো-ভিক্ষা, টাকাতিক্ষা, গৃহভিক্ষা ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে। দিনে ৮.১০ বার কঠিন কোন কোন সংবাদপত্রের নতুন নতুন সংস্করণ বাহির হইতেছে। যুদ্ধের বাটী খবর থাকুক বা না থাকুক গল্প শুদ্ধ, গোমহর্ষণ কাণ্ড, অসমসাহসিকতার কাহিনী ইত্যাদিতে কাগজ-গুলি পরিপূর্ণ থাকে। তাহাই আবার দেশের শিক্ষিত অনিচ্ছিত সকলেই অতি সাবধানতার সহিত পাঠ করে। এদিকে আয়ারল্যান্ড বেলজিয়ামের প্রায় অর্ধেক দখল করিয়া ফেলিল—তথাপি এখানকার কাগজে প্রকাশ যে বেলজিয়ামের সৈন্যেরা যথেষ্ট কতিব দেখাইতেছে!

দে দিন লণ্ডনের এক রাস্তার একটা আওদাছ হইল—অমনি গুল্লব রটনা গেল যে, আয়ারল্যান্ডের একটা আকাশবান হইতে বোমা পড়িয়াছে। ইয়র্কশায়ারের ছেলেরা গল্প প্রচার করিবারে যে, তাহারা সমুদ্রে মাছ ঘরিবার সময়ে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের তীর্থ যুদ্ধের দৃশ্য ভুলিয়াছে। তাহা ছাড়া ডোভারের অনতিদূরে টেম্‌সনদীর মোহনার নিকটেই নাকি কায়ান দাগা স্থল হইয়াছে। ইত্যাদি নানা প্রকার কাহিনী প্রচার করিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা টাকা রোজগার করিতেছেন।

একটা অদ্ভুত কথাও শুনা যাইতেছে।

করেকটা। কাগজে প্রকাশ যে বেলজিয়ামের লীজ নগরে যে লড়াই হইতেছে তাহার শব্দ হাওয়ার উড়িয়া আনিয়া ইংল্যান্ডের পূর্ন কুল পর্যন্ত পৌছিতেছে। এই সংবাদে অল্প একটা সংবাদপত্র বলিতেছেন—“অসম্ভব নয়। কারণ ১০০ বৎসর পূর্বে প্রায় ঐ স্থানেই ওয়াটসন বৃত্ত হয়। সেই সময়েও ইংল্যান্ডের পূর্নকুলবাদী লোকেরা যুদ্ধের আওয়াজ শুনিতে পাইত। আজকালকার কমান্ডের শব্দ অবশ্য তখনকার অপেক্ষা বেশী।”

ইতিমধ্যে সরকারী সংবাদবিভাগ স্থাপিত হইয়া গেল। কংগ্রেসীরা বলিতেছেন—“আমরা যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনাগুলি জনসাধারণকে জানাইয়া দিব। সাধারণ কাগজে যে সমুদয় সলীক গল্প বাহির হয় তাহা বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রতিদিন সংবাদ দিতে পারিব কি না সম্ভব। কারণ ঘটনা জানিবার উপায় বড়ই অল্প।”

এই সরকারী বিভাগের ভাষ্য স্বতন্ত্র “Times” বলিতেছেন,—“অবশ্য এমন অনেক বৃত্ত ঘটিবে যে তাহার বর্ণনা বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত করা চলিবে না। বন্ধ-বাছবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও মৃত লোকের নাম জানিতে বড়ই উৎসুক। তাহা বৃত্তিতে পারিতেছি। কিন্তু যে সকল বিভাগে বা জাহাজে বড় বড় সেনানায়ক বা ক্যাপ্টেনেরা রহিয়াছেন তাহারা কখন কোথায় কি ভাবে রহিয়াছে এ সংবাদ প্রচার করা কখনই উচিত নয়। অধিকন্তু ইহাদের ভিতরকার কোন ব্যক্তি কখন আহত বা মৃত হইল তাহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা জানাইলে প্রধান প্রধান সেনাপতি ও পোতা-বাসকন্দের গতিবিধি এবং প্রকৃত অবস্থা প্রচাতিত হইয়া পড়িবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সকল

অবস্থা বিবেচনা না করিয়া অল্প পরাক্রমের ঘটনা প্রচার করা অসম্ভব। কাগজেই বেশ-বাসীরা যৈধ্য অবলম্বন করুন। বাতাসের হস্তে যেন রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে তাহাদের অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র জানিবার অল্প উদ্গ্রীষ হইবেন না। যথা সময়ে সকল কথাই প্রচার করা হইবে।”

লওনের রাত্তার ও মাঠে আজকাল নৃতন মূল্য দেখিতে পাইতেছি। কয়েক দিন পূর্বে লোকেরা যখন চলাকেরা করিত তখন তাহাদের মুখে চোখে যে ভাব লক্ষ্য করিতাম এখন তাহা করিতেছি না। সন্ধ্যার ভিতরেই একটা উৎসেগ, চিন্তা ও গাঢ়ীর্ণ বিস্তমান। একটা প্রকাণ্ড সমস্তা ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র পূর্বেকার চিন্তাহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায় চলিয়া গিয়াছে বলা যায় না। কাগজে বক্তৃতার সকলেই প্রচার করিতেছেন—“Tremendous struggle” “problem of life and death” “যয়ের সাধন কিবা শরীর পতন” “নেপোলিয়ানী যুগের বিভীষিকা অপেক্ষা এ যাত্রায় কঠোর-তর বিপদ উপস্থিত।” ইত্যাদি। এই সকল চিন্তা ও আলোচনা করিয়া লোকেরা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। এক ব্যক্তি Daily News পত্রে এই অবস্থা আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—

They are like children to whom every inch of the world is startlingly real. \* \* \* It is simply that people having been brought face to face with the fact of life and death, have been reborn into simplicity and seriousness.”

লওনের রাত্তার বাহির হইলেই দুই প্রকার

লোক দেখিতে পাই। এক প্রকার লোক যুদ্ধ-জীবনের কোন না কোন কাজ করিতেছে—অপর প্রকার তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আত্মকাল সৈন্তদিগের চেহারার মধ্যেই দর্শকেরা যেন কি অপূর্ণ ভাব বৃদ্ধিতে পারিতেছে। বাড়ীঘর স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিবার জন্য আত্ম ইহারা ততী। হুতরাং ইহারা ত আত্ম বীর—যথার্থ Martyr. এত দিন দাতার লোকের কত সৈন্ত দেখিয়াছে। কিন্তু তখন যেন হুত সৈন্তগুলি রাষ্ট্রের শোষাকী আসবাব মাত্র। সবমুঠে নানারূপের কাপড়চোপড় পরাইয়া এক দল বরকন্দাজ পুসিতেছেন—আর অল্প অল্পব্যয় হইতেছে। আত্ম কিন্তু সামান্য থাকী-পরা যুদ্ধ মাত্রকে দেখিয়া ইহারা নব-নারী বিচিত্র আবেগে পূর্ণ হইতেছে। ইহারা ই বে যথার্থ স্বদেশ-সেবক—ইহারা ই বে রক্তদিয়া দেশ রক্ষা করিবে !

লণ্ডনের বাগানে বাগানে আত্মকাল সৈন্ত তৈয়ারী করা হইতেছে। ইংল্যান্ডের নিম্নে সকল লোককে যৌবনকালে সামরিক জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয় না। Conscription প্রথা এদেশে প্রচলিত নাই। কাজেই লড়াই করা কাহাকে বলে কোন ইংরাজ তাহা জানেনা বলিলে চলে। হুতরাং এই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোককে যুদ্ধবিদ্যায় প্রস্তুত করিতে হইতেছে। ইহারা পূর্বে কখনও এ বিষয়ের ক, খ পর্যন্ত জানিত না। বাহাইউক, দরকার পড়িলে অনেক জিনিষই সহজ হইয়া পড়ে।

এক ব্যক্তি লণ্ডনের বর্তমান অবস্থা অতি হৃদয় তাহার বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"London has become a city of

Drill, a camp, a barrack yard. Everything else rather seems irrelevant. It is a world in which the civilian has an uneasy feeling that he has lost his bearings. He is a little bewildered like a sheep in the traffic. He buys innumerable papers in the hope that they will enable him to understand it all. He has simply lost his way. He is merely filled with wonder. As yet he feels neither depressed nor boastful. Perhaps he buys a union Jack from a hawkers and sticks it in his buttonhole, but that is only because he is afraid of looking unpatriotic if he resists the hawkers' appeal: "A penny wear your English flag, a penny, all made of Silk." He smiles refusal as another hawkers offers him what he describes as "the Kaiser's memorial card"—a humorous "in memoriam" insult to the Kaiser, relating how he became so inflated with conceit that he bursts."

লণ্ডনের সরকারী ভবনগুলির সম্মুখে সন্ধ্যাকালে হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের সম্মুখে, পার্লামেন্ট গৃহের সম্মুখে, হোয়াইটহল গৃহগুলির সম্মুখে, ট্রাফালগার স্কোয়ারের বীরমুর্তিগুলির সম্মুখে অগণিত লোকসমাগম হইয়া থাকে। সকলেই নিকর্ষা—প্রত্যেকের হাতেই গাং থানা করিয়া কাপড়। কোন বৈ চৈ নাই—কিন্তু এই

সকল স্থানে লোকেরা গাঁড়াইয়া হুখ পাথ কেনে বুকা কর্তন নহ। পবমেষ্টি বল, স্বরাজ বল, কনস্টিটিউশন বল, ডিমক্রেসী বল—এই সকল শব্দে সাধারণ নরনারীর পেট ভরে না। তাহারা সরল সজীব বস্তু চাহে। এই সমুদ্রই রাজ্যের বাড়ীর নিকট গাঁড়াইলে তাহাদের চিত্ত আবেগে ভবিয়া আসে। সমস্ত-ভবনের সমুখে গাঁড়াইলে স্বদেশ রক্ষার জীবন্ত মূর্তি দেখিতে পায়। পার্লামেন্টের নিকট গাঁড়াইলে স্বদেশভক্ত ব্যবস্থাপকগণের নিকটবর্তী বোধ করে। আবার ট্রান্সলমার ভোয়াতে আসিলে প্রাচীনকালের দেশরক্ষাকারীদিগের আবেগে ধাক্কিতে পায়। এই সমুদ্রই সংগ্রহ সংগ্রহ লোক অজ্ঞাতদারে এই সকল স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হয়। জনসাধারণ দার্শনিক তত্ত্ব চাহে না, কট মট রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধিরি যুঝে না—তাহারা ব্রহ্ম মাংসের মাছ চাহ—ধরা ছোঁয়া বার একদম বস্তুর সংসর্গে থাকিতে চাহ। মাছ মাছেরই ইহা স্বভাব।

## ৯। শত্রুপক্ষীয়গণের সামরিক ও সাধারণ

এখন পঞ্চম অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির বিরুদ্ধে সান্তিয়া মন্টেনেগরো, ক্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড সমবেত ভাবে লড়িতেছেন। এক পক্ষে দুই জন অপর পক্ষে ছয় জন। দুই শত্রু পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিভাষায় Belligerents বলে। এই লড়াই যুদ্ধের বহির্ভূত সকল রাষ্ট্রই neutral অর্থাৎ উদাসীন। ইতালী, হল্যান্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, জাপান ও চীন ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলি উদাসীন পরবাচ্য।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যুদ্ধের অন্তর রাষ্ট্রের লোকজন বেড়াইতে আসে অথবা কার্যোপলক্ষে বাস করে। জার্মানিতে

এবং অষ্ট্রিয়াতে ইংরাজ, ফরাসী, রুশ, সার্ব ইত্যাদি সকল জাতীয় নরনারীই রহিয়াছে। আবার ক্রিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রেও জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ান জাতীয় নরনারী বাস করিতেছে। লড়াই বাধিবাধায় যে যে লোক সেনাবিভাগের কর্ম করিতে বাধ্য তাহারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে চলিয়া গেল। লওন হইতে ফরাসী, জার্মান, রুশ, অষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি কত লোক যে চলিয়া গেল তাহার সংখ্যা নাই। সেইরূপ বার্লিন, প্যারিস, শেট-শিটার্শবার্গ ইত্যাদি নগর হইতেও অন্তান্ত রাষ্ট্রের সেনাবিভাগের লোক স্বদেশে ফিরিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু বিলাত হইতে সকল জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ান চলিয়া গেল না। বার্লিন হইতেও সকল ফরাসী, ইংরাজ, রুশ, এবং অন্তান্ত শত্রুপক্ষীয় নরনারীগণ চলিয়া গেল না। কেহ হুত সপরিবারে দশ বৎসর বার বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। বিশেষেই হয় ত তাহাদের অন্নপান হয়। একদিনের কথা কি তাহারা চলিয়া যাইতে পারে? অবশ্য বাহাদের উপর রাষ্ট্রের তাক পড়িবে তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য। তথাপি হুত বাধিবার পরও ১০।১২ হাজার শত্রুপক্ষীয় নরনারী প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বাস করিতে লাগিল। জার্মানিতে বহু ইংরাজ ফরাসী ও রুশ প্রভা থাকিয়া গিয়াছে। সেইরূপ ইংল্যান্ডেও বহু জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান প্রভা রহিয়া গেল। ক্রিয়া ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও এই অবস্থা। অনেক নিম্ন নিম্ন বেশে ফিরিয়া যাইতে চাহেন—কিন্তু বাইবার পাড়ী আহাজ বা মোটরকার পাইবেন কোথায়?

ইংল্যান্ডে এবং জার্মানিতে ও লড়াই বাধিয়াছে। তাহা বলিয়া কি ইংল্যান্ডের যে কোন



লোক আত্মাণির যে কোন লোককে শত্রু-জ্ঞানে নিধাত্তিত বা হত্যা করিতে পারে? আত্মাণির যে কোন লোকই কি ইংল্যান্ডের যে কোন লোকের উপর অত্যাচার ও জুলুম কিম্বা দাখা করিতে পারে? দুই belligerent বা শত্রুদ্বয়ের মধ্যে লড়াই বাধিলে কোন কোন পন্থা বা কোন কোন ব্যক্তিকে শত্রু-জ্ঞান করা উচিত? এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের রণনীতি কতকগুলি সহজ নিয়ম মানিয়া লইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে তদনুসারে কার্য হয় কি না সন্দেহ।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোক যুদ্ধকালে দুইভাগে বিভক্ত। বাহারা যুদ্ধবিগ্রহে পেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র আক্রমণের ক্ষমতা নিযুক্ত তাহাদিগকে Combatant বা সামরিক লোক বলা হয়। এতদ্ব্যতীত সকল লোককে Non-combatant Civilian বা জনসাধারণ বিবেচনা করা হয়। নব্য রণনীতি অল্পসংখ্যক লড়াইয়ের সময়ে "সামরিক" "সামরিক" শক্তি পরীক্ষা হওয়া উচিত। একপক্ষের "সামরিক" অপর পক্ষের "সাধারণের" সঙ্গে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলে নিষিদ্ধ হয়। আবার একপক্ষের "সাধারণ" লুণ্ঠনাদি অপর পক্ষের "সামরিক"কে বিব্রত করিলে তাহা বিপক্ষেও তৎপন্ন করা হয়। বলা বাহুল্য অপর পক্ষ ইহা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে "সামরিক"র অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু মোটের উপর দুই পক্ষের এই non-combatant বা সাধারণ জনগণ যুদ্ধের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পায়।

এই লড়াই আর লওনে প্রায় ৩০,০০০ আত্মাণ বাস করিয়াও ইংরাজবিশেষ কোন অত্যাচার সহ্য করিতেছে না। আবার

বাগিনেও বহুসংখ্যক ইংরাজ নগরনারী বহুক্ষেপে ও নিরাপত্তাে জীবন বাপন করিতেছে। ইংরাজ শত্রুদ্বয়ের কেন্দ্রস্থলে বাস করিতেছে সত্য—কিন্তু শত্রুদ্বয়ের একটি অস্ত্রও ইংরাজের বিরুদ্ধে তোলা হইতেছে না।

শত্রুপক্ষীয়দিগের "সামরিক" ও "সাধারণ" বিভাগ সম্বন্ধে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। International Law বিষয়ক যে কোন গ্রন্থে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং বর্তমান অবস্থা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কি নিয়ম ছিল তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে বিবৃত আছে। সে গুলি সংলগ্ন করিলে হিন্দু রাষ্ট্রনীতির আন্তর্জাতিক বিভাগের বিশদ চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রদ্বয়ে সামরিকেরা যুদ্ধকালে "সাধারণ" উপর জুলুম করিত। বিগত ১০০ বৎসরের ভিতর নূতন নীতি প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য কার্যে পরিণত না করিলে কাহাকেও বাধ্য করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই।

Lawrence তাহার গ্রন্থে "সাধারণের" বিষয়ে আধুনিক রীতি দিগ্বিদিক করিয়াছেন।

১. Now Combatants are exempt from personal injury, except in so far as it may occur incidentally in the course of the lawful operations of warfare, or be inflicted as a punishment for offences committed against the invaders.

২. The inhabitants of captured towns are not to be abandoned to the violence of the victorious soldiery.

3. Special protection is granted to those who tend the sick and wounded.

বতহুর দেখা বাইতেছে এখন পর্যন্ত শত্রু পক্ষে "সাধারণ" সশস্ত্র নীতিগুলি সম্মান করিয়াই চলিতেছেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই জাৰ্মানদিগকে অসভ্য নির্ধৰ বর্জিতরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। ফ্রান্স, ব্রিটিশ এবং ইংল্যান্ডের কাগজে কাগজে প্রকাশ যে জাৰ্মানদেরা তাহাদের শত্রুগণকে রাষ্ট্রদ্রোহকেও অপমান করিতে ছাড়েন নাই। বেলজিয়ামের শান্ত শিষ্ট civilian গৃহস্ব ও কৃষকদিগকে জাৰ্মানদেরা নাকি হত্যা করিয়াছে। অথচ জাৰ্মান কাগজে ঠিক উল্টা খবর প্রচারিত। তাঁহারা বলেন—বেলজিয়ামের সাধারণ লোকজন জাৰ্মান সামরিকগণকে নানা উপায়ে বিব্রত করিতেছিল। কাজেই তাহাদিগকে Non-combatant বিবেচনা করা অসম্ভব।

কোন কোন ব্যক্তিকে শত্রু বা combatant বিবেচনা করা বাইবে তাহার আলোচনা The Law of War with regard to Enemy persons নামক অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। Hall, Lawrence, Oppenheim ইত্যাদি প্রণীত গ্রন্থসমূহে বিপদ বিবরণ আছে। সেইরূপ কোন কোন বস্তু বা সামগ্রীকে শত্রুর দখল বোধ্য বিবেচনা করা উচিত তাহার আলোচনা The Law of war with regard to Enemy property নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

"সাধারণ" সম্বন্ধে বর্তমান যুগে অনেকটা নরম ও শান্তিময় আচরণই চাইয়া থাকে। কিন্তু "সাধারণ" সাজিয়া কতলোক spy বা গুপ্ত চরের কার্য করিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠা

সম্ভব নয়। লওনে, প্যারিতে, বার্লিনে সর্বত্রই গুপ্তচর পাকড়াইবার হুজুগ দেখিতে পাইতেছি। যখন তখন যাহাকে তাহাকে গুপ্তচর জানে নির্ধাতিত করা হইতেছে। এইরূপে বহু ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ "সাধারণকে" গুপ্তচর বলিয়া জাৰ্মান রাষ্ট্র প্রেষ্টার করাইতেছেন। ইংল্যান্ডেও প্রায় প্রতিদিনই ১০১২ জন করিয়া জাৰ্মানকে প্রেষ্টার করা হইতেছে। কাহাকে কোন দুর্গ বা বন্দরের নিকট পাকড়ান হইয়াছে। কাহাকেও বেলগণ সেতু ভারবহর জলাশয় ইত্যাদির নিকট পাওয়া গিয়াছে। কাহারও গৃহে বোমা বসুক, ইংল্যান্ডের মানচিত্র ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। এইরূপ ২৪ ঘন্টা সম্বেদজনক মাল পাওয়া বাইবার ফলে জাৰ্মান মাজকেই ইংরাজেরা সম্বেদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। বলা বাহুল্য, সাধারণ সশস্ত্র নীতি জানিয়া কার্য করা সহজ আর সম্ভবপর হইবে না। দেশের লোক কেপিয়া উঠিলে শত্রুগণকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

এই সকল কারণে পার্লামেন্ট একটা নতুন আইন প্রচার করিলেন। আইনের নাম Abens Restriction Bill বা বিদেশী-প্রতিবন্ধক আইন। বিদেশী মাজকেই বিব্রত করা ইংরাজ উদ্দেশ্য নয়। শত্রুগণকে সকল সাধারণকেও এই আইনের দ্বারা বিরক্ত করা হইবে না। কেবলমাত্র দেশের অনিষ্টকারী বিদেশীয় সাধারণগণকে ইংরাজ দ্বারা জঘন্য করা বাইতে পারিবে। এইরূপ লোককে undesirable aliens বলে। অবশ্য এইরূপ আইন এক্ষণে লড়াই যুগের অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রেই জারি করা হইয়াছে।

এখিকে সকল রাষ্ট্রেই তাহার বিশেষদ্রষ্ট

প্রভাববাহক খবরাখবর লইতে চেষ্টা করিতেছেন। সকল রাষ্ট্রেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থাকেন। উৎসাহের সাহায্যে সেই রাষ্ট্রে নিজ নিজ প্রভাগপত্রের অবস্থা জানিতে পারা যায়। কিন্তু যখন লড়াই বাধে তখন শত্রুপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশে চলিয়া যান। এক্ষণে অট্টোয়া এবং জার্মানির রাষ্ট্রদূতগণ এখন হইতে চলিয়া গিয়াছেন। জার্মানি এবং অট্টোয়া হইতেও ইংরাজ, রুশ, ফরাসী ইত্যাদি মিত্ররাষ্ট্রসমূহের দূতগণ চলিয়া আসিয়াছেন। কোন রাষ্ট্রের দূতগণকে বিদায় বেণুয়াই আনকাল বৃদ্ধ ঘোষণার সূত্র প্রথম লক্ষণ। অমুক রাষ্ট্রের সঙ্গে অমুক রাষ্ট্রের পত্র ব্যবহার এবং দোতা ব্যবহার বন্ধ হইলেই লড়াই পাকাপাকি আরম্ভ হয়। বর্তমান সময়ে জার্মানি এবং অট্টোয়া ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংল্যান্ডের পত্র ব্যবহার চলিতেছে এবং দোতা ব্যবহারও চলিতেছে। অবশ্য আর কাল লড়াইয়ের অন্ত সাধারণ খবরাখবর বেশী দাওয়া আসা করিতেছেন না। তথাপি ইংল্যান্ড তাঁহার প্রভাবশালী সত্বে স্বকীয় দূতগণের নিকট সংবাদ লইতেছেন।—এ সম্বন্ধে Foreign office নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন :—

Every effort is being made to assist financially and otherwise. British subjects on the continent. Arrangements are also being made for financial, railway and steamship facilities to be afforded as soon as conditions render such a step possible.

It is quite impossible to make special inquiries either by post or

telegraph, as to the safety or whereabouts of any particular private individuals. This applies even to cases where expenses are guaranteed. The Foreign Office also unable to undertake the transmission of money to private individuals.

It must be remembered that all postal and telegraphic communication with the continent is either fatally interrupted or greatly delayed. All direct communication with British subjects in Germany is, of course quite out of the question."

এই ত গেল শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের সামরিক ও সাধারণ জনগণের সম্বন্ধ। লড়াই নগরের বহিকৃত উদাসীন রাষ্ট্র এবং তাহাদের প্রভাববাহকের কথা বস্তুতঃ। শত্রুপক্ষীয়গণের "সাধারণ" হইতেও "উদাসীন"গণের অবস্থা বিভিন্ন। প্রধানতঃ দুই অধ্যায়ে উদাসীন রাষ্ট্রের কর্তব্য ও অধিকার আলোচিত হইয়া থাকে—(১) Duties of Belligerents towards Neutrals (২) Duties of Neutrals towards Belligerents. বর্তমান কুরুক্ষেত্রে আমেরিকার মূলরাষ্ট্র নানা কারণে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাদের দুই একটা কার্য আলোচনা করিলেই উদাসীন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী বুঝা যাইবে।

### ১০। লড়াই-মণ্ডল ও আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র

ঐযকালে আমেরিকার অনাংগ লোক দেশ বিদেশে বেড়াইতে বাহির হন। এই বৎসর একলক লোক ইউরোপে আসিয়া-

ছিলেন। তাহার মধ্যে দুই বাহিরের পূর্বে ২০,০০০ লোক স্বদেশে ফিরাই গিয়াছেন। এখনও ৮০,০০০ পর্যটক ইউরোপের নানা স্থানে পড়িয়া বহিরাছেন। শীত বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম।

ইংলণ্ডেই প্রায় ২০,০০০ আমেরিকান আটকা পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে জাৰ্মানির দুই বাহিরের দুইকদিন আগে ইহাদের মধ্যে ৪।৯ হাজার লগুন উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে কাপড় চোপড় বাস্তবিকভাবে কিছুই নাই—সবই বিদেশে পড়িয়া বহিরাছে। গাড়ীতে এবং জাহাজে এত ভিড় ছিল যে কর্তৃপক্ষেরা ২০ জনের জাহাজে ২০ জনকে বসাইতে বাধ্য হইয়াছেন। মালপত্র বহিরা আনিবার ভিলমাত্র স্থানভাব। নগদ টাকা কাহারই নাই—অনেকের পকেটে চেক মাত্র স্থল। বহু নরনারীর নিকট চেকও নাই। স্তন্যপায়ী স্ত্রীরা নাই।

পর্যটকগণের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, ব্যাভার, শিল্পী ও মহাজন আছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া একটি “আমেরিকান সমিতি” গঠন করিয়া লইলেন। এই সমিতি আমেরিকাবাসীদের ‘চেক’ ভাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন—বিদেশ হইতে মাল ও লাগের আনিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্তমান সম্ভব লোকজনকে স্বদেশে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছেন। এত সমিতির কার্য উপলক্ষ্যে একটা ছোট খাট রাস্তা পণ্ডিত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। বসন্তকালে কাল করিবার সম্ভাব আমেরিকাবাসীদের পক্ষে নূতন নব। কাজেই অতি কম সময়ে স্বপুঙ্খলাব সহিত এই বিশব্রহ্ম নরনারীর সাহায্যের

জগৎ সকল প্রকার কাঁচা দ্রব্য হইয়া বাইতেছে। অবশ্য এই সমিতি যুক্ত-রাষ্ট্রের লগুনস্থিত Embassy বা দৌতা-বিভাগের সহযোগিতাবে কথ্য করিতেছেন। অবিকল প্রত্যেক যুক্ত-রাষ্ট্রবাসীর সকল প্রকার অবস্থা জানিবার জগৎ ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বড় বড় হোটেলের একজন করিয়া লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে যুক্ত-রাষ্ট্রের লগুনস্থিত কংগ্রেসের নিকট আনিয়া সরকারী জাহাজ ও নগদ টাকা লগুনস্থিত স্বকীয় দৌতা-বিভাগে পাঠাইয়া দিলেন। ১২ জন ধনী পর্যটক মিলিত হইয়া একখানা নুতন জাহাজ ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। মূল্য দেড়লক্ষ টাকা। ইহার ভিতর ৩০০ আমেরিকান একবারে বাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া আরও অনেক জাহাজ আমেরিকার দিকে চলিল। সাধারণতঃ নিউইয়র্ক পর্যন্ত যত ভাড়া লাগে একগুণে তাহার ৩০ গুণ বেশী দিতে হইতেছে। তথাপি জাহাজ বোঝাই লোক ইংল্যান্ড ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। কিন্তু যাহারা স্কটল্যান্ড, জাৰ্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাহাদের অবস্থা বড়ই পোচনী। তাহাদের জগৎ ব্যবস্থা করিতে এখনও বহু সময় লাগিবে।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বর্তমান দুই ‘উপাধীন’ থাকিবেন ততদিন ইংল্যান্ড পক্ষ এবং জাৰ্মান পক্ষকে নিয়মিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে :—

(১) যুক্তরাষ্ট্রের সীমার ভিতর কেহই যুক্ত-সংক্রান্ত কোন কার্য করিতে পারিবেন না।

(২) সমুদ্রের ভিতর যুক্তরাষ্ট্রের যতগুলি ভূখণ্ড বার্তাবাহ আছে সেগুলিকে কেহই

কাটিতে ছিঁড়িতে পারিবেন না। কিন্তু এই নিয়ম বন্ধ করা বড়ই কঠিন। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ডের স্বপক্ষে কিম্বা জার্মানির স্বপক্ষে তাহার তার ব্যবহার করিতেছেন— এই সম্বন্ধে শত্রুপক্ষীগণের সজ্ঞানাই থাকিবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে কোন পক্ষ যুদ্ধের আয়োজন ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের কৃষির উপর দিবা কোন পক্ষ তাহার মৈত্র চালাইতে পারিবেন না। তাহার বন্দরের ভিতরেও শত্রুপক্ষীয় জাহাজ ২৪ ঘণ্টার বেশী থাকিতে পাইবে না। রূত ও আহত ব্যক্তিগণকে লইয়া ঘাইবার ক্ষমতা প্রদানকারী চিকিৎসক ও শ্রেয়সেবকগণ উদ্যমান রাষ্ট্রের ভিতর দিবা ঘাইতে পারিবেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় মৈত্রগণ প্রবেশ করিলেই উদ্যমানরাষ্ট্র তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে অধিকারী। শত্রুমৈত্রগণের এই অবস্থাকে internment বলে। সেইরূপ ২৪ ঘণ্টার বেশী কোন উদ্যমান বন্দরে কাটাইলে শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে নিরস্ত্র করা হইবে। শুনা যাইতেছে বর্তমান সময়ে জার্মানির প্রসিদ্ধ রণতরী গরবেন কন্সট্রাক্টি-নোপলে ২৪ ঘণ্টার বেশী কাটাইয়া ছিল। তুরন্ত এই স্থলে উদ্যমান রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, তুরস্ক ইত্যাদি উদ্যমান রাষ্ট্র সমূহের কতকগুলি কর্তব্যও আছে:—

(১) ইহারা জার্মান পক্ষ অথবা ইরান-পক্ষকে কোনরূপ সাহায্য সহায়তা দিতে পারিবেন না। মৈত্র সাহায্য, অর্থ সাহায্য, জাহাজ সাহায্য, অস্ত্র সাহায্য ইত্যাদি সকল প্রকার সাহায্যই নিষিদ্ধ। কিন্তু উদ্যমান

রাষ্ট্রসমূহের জনসাধারণ কোনরূপ সাহায্য কোন পক্ষকে করেন তাহার ক্ষমতা রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্র হইবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী যদি জার্মানরাষ্ট্রকে সাহায্য করেন তাহা বাধা দিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং রাষ্ট্র হইবেন না। যদি ইংল্যান্ড রাষ্ট্র এই সাহায্যের সংবাদ পাইয়া অর্ধপথে টাকা, মোকজম অথবা অন্ত্রাদি প্রেরণ করিতে পারেন, ভালই। না পারিলে ইহারা যুক্তরাষ্ট্রকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না।

(২) যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, তুরস্ক এবং অন্যান্য উদ্যমান রাষ্ট্র বর্তমান যুদ্ধের সময়ে কোন পক্ষকে তাহাদের চতুঃসীমার ভিতর যুদ্ধ করিতে, যুদ্ধের ক্ষমতা হহতে, যুদ্ধক্ষেত্রে মৈত্র রসদ অস্ত্র মন্ত্র পাঠাইতে এবং বৈদেশিক পত্রবাহিনী দ্বারা যুদ্ধে অস্ত্রাদি দিতে পারিবেন না। এই সমুদয় কাৰ্য্য বন্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের স্বাধায্য চেষ্টা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন পক্ষ যদি এই সকল দেশে তাহাদের সংবাদ বিভাগ রাখেন তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(৩) যদি ইংল্যান্ড কিম্বা জার্মানরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইতালী কিম্বা অন্য কোন উদ্যমান রাষ্ট্রের সাহায্য খানাতালাদি করিতে চাহেন তাহা ইহাদিগকে সম্বন্ধ করিতে হইবে। যদ্যপি কোন কোন জাহাজের মাল ও আরোহী-দিগকে একত্র অপেক্ষ কর্তৃত্ব করিতে হইবে। শত্রুপক্ষীয়েরা এই সকল জাহাজকে দৃষ্টদৃষ্টি বিবেচনা করিলে নিজের বন্দরে প্রেরণ করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে নিষেধ ব্যবসায়ী এবং আরোহীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তখন উদ্যমান রাষ্ট্র উচিত বিবেচনা করিলে শত্রুপক্ষীয়দিগকে আন্তর্জাতিক আইনের সাক্ষ্যভাৱেই অপরাধী জন

করিতে পারেন। যদি ইংরাজরাষ্ট্র আমেরিকার জাহাজ বিনা দোষে গ্রেপ্তার করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। যদি ক্ষতিপূরণ করা না হয় তাহা হইলে আমেরিকার ও ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধ বাধা অবশ্যই নর।

লড়াইমণ্ডলের সঙ্গে উদাসীন রাষ্ট্রসমূহের সম্বন্ধ খানিকটা বৃত্তা গেল। কিন্তু উদাসীন রাষ্ট্রের জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই-মণ্ডলের সম্বন্ধ কিরূপ? পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বা ইতালীর জনগণ যদি ইংরাজ পক্ষ অথবা জার্মান পক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের রাষ্ট্র দায়ী নন। এই মন্তব্যেবিত্তি যে ইতালীর সংবাদ পত্রে কেহ ইংরাজদিগকে গালি দিতেছেন কেহ বা জার্মানদিগকে গালি দিতেছেন। আবার আমেরিকার সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণও নিজে নিজে বতলব অল্পসারে এক এক পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। আবার ইংল্যাণ্ডের সংবাদ পত্রের কর্তারা জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালী এবং আমেরিকাকে উত্তেজিত করিতেছেন। জার্মানির সম্পাদকেরাও ইংরাজের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রবাদিগণের লোকমত তৈয়ারী করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইতালী ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেই জার্মান মতাবলম্বী এবং ইংরাজ-মতাবলম্বী সম্পাদক, লেখক ও প্রচারক নিজে নিজে পক্ষে আন্দোলন স্থপ্তি করিতেছেন। এই সকল লোকমত বদ্ধ করিবার জন্য ইতালী বা আমেরিকা বাধ্য নন—ইংরাজ বা জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিরাও এই সকল উদাসীন রাষ্ট্রকে তাঁহাদের প্রকাশ্যের মূখ বদ্ধ করাইতে বাধ্য করিতে পারেন না।

উদাসীন রাষ্ট্রজনগণের আরও অনেক দ্বিবিধা আছে। ইহারা দুইপক্ষের সঙ্গেই

সাধারণ ব্যবসায় চালাইতে পারেন। অবশ্য মাঝে মাঝে বানাতাজাদির বিড়ম্বনা এবং অনর্থক নির্যাতন সহ করিতেও হইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর বলা বাইতে পারে যে বর্তমান রণনীতি অল্পসারে লড়াই-মণ্ডলের কোন অস্থিবিধাই উদাসীন জনগণের ব্যবসায় নষ্ট করিতে পারে না। প্রধানতঃ দুইটি নিয়ম ১৯০৭ সালের আন্তর্জাতিক বৈঠকে সত্যাপ্ত হইয়াছে :—

(১) Free, ships, Free goods. The Neutral flag covers the enemy's goods (with the exception of contraband of war). জাহাজ যদি উদাসীন রাষ্ট্রীয় হয় তাহা হইলে ইহার ভিতরকার সমস্ত মালই উদাসীন পদব্যাচ্য জান করিতে হইবে। যদি শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যবসায়ীর মালও এই জাহাজে থাকে তাহা অপরাধক গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই জাহাজের ভিতর যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম থাকে তবে সেগুলি গ্রেপ্তার হইতে পারে।

(২) Neutral goods (with the exception of Contraband of war) are not liable to capture under the enemy's flag. যদি শত্রুপক্ষীয় কোন জাহাজের ভিতর উদাসীন রাষ্ট্রীয় মাল থাকে তবে বানাতাজাদিকারী রাষ্ট্র জাহাজ গ্রেপ্তার করিবেন কিন্তু মাল গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না। কিন্তু উদাসীন রাষ্ট্রীয় মালের ভিতর যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম থাকে তবে সেগুলি গ্রেপ্তার হইবে।

অতএব দেখা বাইতেছে বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িগণের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। বানাতাজাদি এবং অনর্থক গ্রেপ্তারের জন্য কিছু সম্বন্ধ নষ্ট হইতে

পারে। কিন্তু মোটের উপর বেশী লোকমান হইবে না। কিন্তু ইহারা যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম লইয়া ইংরাজের সঙ্গে ব্যবসায় করেন তাহা আশ্বাশি আশ্বিনিতে পারিলে লোকমান হইবে। অথবা আশ্বাশি পক্ষকে যদি যুক্ত-রাষ্ট্রেরেরা লড়াইয়ের সরঞ্জাম জোগাইতে থাকেন তাহা ইংরাজ বানাতাম্রাসকাত্রীদিগের গোচর হইলে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা থাকিবে।

আশ্বাশির রণতরী এবং ইংরাজের রণতরী সর্বদা সকল সমুদ্রে পাহারা দিতেছে। যুক্ত-রাষ্ট্র বা ইতালীর জাহাজ চোখে পড়িলে ইং-দিগকে খাধান হইবে। কাপ্তেনেরা বলিতে পারেন “আমরা উষালীন রাষ্ট্র—আমাদের নিশানেই তাহা বুঝা যাইতেছে।” কিন্তু ইংরাজ কিংবা আশ্বাশি এইটুকু মাত্র জুনিয়া সমুদ্র হইবেন না। তাহার সন্মত জাহাজ তর তর করিয়া অহুগুহান করিবেন। যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম থাকে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইবে—না থাকিলে জাহাজকে নিকরে গন্তব্যস্থানে বাহিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু লড়াইয়ের সরঞ্জামগুলি লুকাইয়া পাঠান নিত্যক অসম্ভব নয়। উষালীন রাষ্ট্রীয় অনেক জাহাজেই হস্ত অস্ত্র মাল পক্ষপক্ষীয়গণকে সরবরাহ করা হইতেছে। তাহার সন্ধান কোন পক্ষই হস্ত পাইতেছেন না।

হুস্তরাজ উষালীন রাষ্ট্রীয় জনগণধারণ বাধীন-ভাবে লড়াইয়ণ্ডলের যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে। শুনা যাইতেছে ইতালীর অনেক লোক ইংরাজ সেনাবিভাগে ভক্তি হইয়াছেন। দেহরূপ আশ্বাশি সেনাবিভাগে কোন আমেরিকান বা ইতালীয়ান সাহায্য করিতেছে কি না কে বলিতে পারে? এই সাহায্য প্রকাজভ্যবে করিলেও কোন আপত্তি নাই। উষালীন রাষ্ট্র অথবা লিগ না হইলেই

হইল। ইহার প্রজারা যাহা ইচ্ছা করুক—যাণা দিবার কেহ নাই।

### ১১। বিলাতে স্বদেশ-সেবার আন্দোলন

লড়াই হুক হইয়াযাত্র ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ড করিয়া স্বদেশ-সেবার নানা আয়োজন হইতে লাগিল। বিলাতের প্রত্যেক কাগজে প্রতিদিন ৩০।৪০ বাণা হুস্ত বৃহৎ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। সম্মানক মহাশয়গণও নানা প্রবন্ধে সমাজ-সেবার উপায় নির্দেশ করিতেছেন। নেপোলিয়ান-বিত্তীষিকা অপেক্ষা আশ্বাশি-বিত্তীষিকা ইংরাজ-সমাজকে প্রবলতররূপে আক্রমণ করিয়াছে। একত্র প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সাতার সুলী পর্যন্ত সকলেই সেনাবাগিনগকে তাহাদের বর্তমান কর্তব্য বুঝাইতেছেন। ধনী কর্তব্য, নির্ধনের কর্তব্য, ব্যবসায়ীর কর্তব্য, কৃষকের কর্তব্য, শিক্ষকের কর্তব্য, ছাত্রের কর্তব্য, বালকের কর্তব্য, বৃদ্ধের কর্তব্য, রমণীর কর্তব্য, দর্জীর কর্তব্য, যোদ্ধারের কর্তব্য, খেলোয়াড়ের কর্তব্য, হোটেলওয়ালার কর্তব্য, বিহেটার ওয়ালার কর্তব্য—ইত্যাদি নানাবিধ কর্তব্য সহস্র সহস্র প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে।

আজকালকার সংবাদপত্রে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হয়—(১) হুস্ত সংবাদ (২) টাকার বাজার (৩) স্বদেশ-সেবার উপায়। স্বদেশ-সেবার উপায় আলোচনা করিয়া এত লোকে এত কথা লিখিয়াছেন যে তাহার পরিমাণ ভাবিতে গেলে অভিভূত হইতে হয়। অবশ্য একমাত্র প্রচার ও ব্যাখ্যা এবং আলোচনা কার্ণেই সকল আশ্ম পর্যাবসিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে সম্মানিক সেবার অহুস্তানও আরম্ভ হইয়া

দিয়াছে। পল্লিতে পল্লিতে, নগরে নগরে, পুণে পুণে আশ্রয়ভিক্ষা সাধন করিয়া দেবের অস্ত্র নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতেছেন। জনপদ, অগ্ৰহাণ, বনুহাণ, ঔষধহাণ, অর্থহাণ, প্রাণহাণ—সকলেই এক সঙ্গে সকল প্রকার দান করিবার অস্ত্র প্রস্তুত যোগ্য হইতেছে। দেবের অনির্দিষ্ট ও অর্ধনির্দিষ্ট লোককে বুড়াইবার অস্ত্র এবং সাহস ও আশা দিবার অস্ত্র এক সঙ্গে হাজার হাজার কর্ম ও বস্তা লাগিয়া গিয়াছেন। এই বিপুল সেবার আন্দোলন দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছে। দেখিতেছি—সেনাবিভাগে ও রণতরীবিভাগে কর্ম করাই বশেষ সেবার একমাত্র উপায় নহে। বরং অস্ত্রান্ত কর্মক্ষেত্রেই কর্মসাধা প্রচুর পরিমাণে আবশ্যিক। দেবের ভিতরে নানা শ্রেণীর বহুসংখ্যক কর্মভংগের লোক না থাকিলে কেবল দৈনিক বিভাগের দ্বারা বশেষ বন্ধা করা অসম্ভব।

বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক প্রবাস্তঃ ১০টি নিয়ম পালন করিবার অস্ত্র সকল ইংরাজকে অগ্ররোধ করিতেছেন :—

(১) মাথা ঠিক রাখিও। পাছচাবে সাধারণ কাজ কর্ম করিয়া যাও। নিরর্থক হুজুং বা আন্দোলন করিও না।

(২) পরের কথা আশ্রয়কাল কিছু বেশী ভাবিও। প্রতিবেশীর খাওয়া পরা চলিতেছে কি না বুঝের সময়ে তাহার বিশেষ অঙ্গদান করিও। মানুষি অবস্থায় বশেষ ও শসমাজের কথা দত্ত ভাবিয়া থাক তাহা অপেক্ষা এক্ষণে বেশী ভাবিও।

(৩) নিজ নিজ গভী ও কর্মক্ষেত্রে ভিতর থাকিয়াই বহানুভব নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাও। অনধিকার চর্যা বা নিরর্থক আন্দোলন সমস্ত কাটাউন না। সকল বিষয়ে

সংযত ও নিয়মাবলী হইও। খাওয়া পরা সম্বন্ধে হিলাপের মাত্রা কমাইয়া দাও।

(৪) নীচাশয় ও কাপুসকের স্ত্রাব বাস্তব্য হুতা। জামা কাপড় চোপড় ইত্যাদি বেশী বেশী কিনিয়া ঘরে রাখিও না। এতল করিলে দেবের ভিতর শীতল হুতিক আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং দরিদ্র জনগণ মহা কষ্টে পড়িবে।

(৫) নগর টাকা ঘরে জমাইয়া রাখিও না। টাকার চলাচল বন্ধ করিও না। বরং মানুষি অবস্থায় বেতন ভাবে লেনদেন করিয়া থাক এই সময়েও সেতরুণ করিও।

(৬) তোমা অপেক্ষা দরিদ্র জনগণের আর্থিক অবস্থা সর্বদা মনে রাখিও। মূলী, ঘোণা, মজ্জী, কেরিওয়াল, কয়লাওয়াল, মাছওয়াল ইত্যাদি সকলের ঘেনা শোধ করিয়া দিও। জিনিষপত্র ঘরে কিনিও না। গরীব দোকানদারের স্ত্রাবা মূল্য শীত শীত প্রদান করিও।

(৭) তোমার অধীনে যদি মজুর বাটে তাহারের বেতন নিয়মিতরূপে দিতে থাকিও—কিছুই বাকী রাখিও না। কারবার হইতে লোক জবাব দিও না। কাজ বন্ধ রাখিও না। যদি দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ চালাইবার উপযুক্ত মূলধন ও উপকরণ না থাকে তথাপি মজুরদিকে প্রত্যাহ কাজে লাগাইয়া রাখিও। নিত্য প্রয়োজন হইলে প্রত্যাহ ৮ ঘণ্টার স্থানে ৩ ঘণ্টা কাজ চালাইও—তথাপি কারবার বন্ধ করিও না।

(৮) জুহি যদি কোন মহাজনের কারবারে মজুর থাক, তাহা হইলে মহাজনের বর্তমান চুঃসময় বৃত্তিমা কাৰ্য্য করিও জুহি তোমার নিয়মিত খোরাকপোষাক পাইতেছে না দেখিয়া বিবস্ত হইও না। সর্বদা মনে রাখিও কোমার



অশেখা সংস্কারণ কঠোর জীবন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের  
দৈনিকেরা বহন করিতেছে।

(২) দেশের সৈন্যগণকে উৎসাহিত  
রাখিও। তাহাদের প্রসূরতা যেন কোন  
উপায়ে না কমে। সৈনিকদিগের ব্রত ও  
বাহ্যের অস্ত্র দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গঠিত  
হইতেছে। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যে  
সাহায্য করিও।

(৩) নাবালক ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে  
যুদ্ধের কথা প্রচার করিও। যুদ্ধের কারণ  
এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা সব্বদে সকলকে  
শিক্ষা দিও।

এই পত্রটি অল্পদিনের মধ্যে কালের “নিতা-  
কর্মপদ্ধতি” বিবেচনা করা বাটতে পারে।  
সকল দেশেই যুদ্ধের সময়ে এই নিয়মগুলি  
পালনীয়।

পার্লিমেণ্টের একজন সভ্য বলিতেছেন—  
“যেদের ভিতর অনেক যুদ্ধ লোক আছেন।  
তাহারা যুদ্ধ বাইবার ভয় ভগাতিবার হইতে  
পারিবেন না। কিন্তু তাহারা আগামী ৭৮  
সপ্তাহ ধরিয়া কুরুক্ষেত্রে কর্ম করিলে দেশের  
মহৎ উপকার হয়। কুরুক্ষেত্রের অনেকই  
চাপ আবাদ ছাড়িয়া লড়াই করিতে চলিয়া  
গিয়াছে। কিন্তু আর কিছুদিন পরেই যুদ্ধ  
কাটিবার সময় উপস্থিত হইবে। এই কার্য  
করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত যুদ্ধ লোকেরা  
অগ্রসর হউন।”

একজন ধর্মিক্তা সংবাদ পত্রে লিখিয়া  
পঠাইলেন—“যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল দৈনিক  
জীবন রান করিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহাদের  
প্রতি পুত্র কল্যাণের অর্থ যত্ন কে কোপাইবে ?  
তাহাদের জন্য একপেই সমিতিগঠন করা  
হউক। প্রত্যেক মহাত্মার সমিতির পাখা  
স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক। এই সমিতির

অধীনস্তায় চোরা ও অস্ত্রাস্ত্র ধরপের সাগাধা  
তুলিবার চেষ্টা করা বাটক। দেশের ধনী  
রমণীগণ যশের শেবার কার্যে ত্রুটি হউন।  
আমি আমার সম্পদ দান করিতে প্রস্তুত  
আছি। শাস্ত্রবিক পরিভ্রমেও আমার কোন  
অপত্তি নাই।”

আর এক জন রমণী বলিতেছেন—  
“সাধারণতঃ আমাদের গৃহস্থালীতে প্রত্যহ  
অনেক বায়ু ভ্রম্য নষ্ট হইয়া থাকে। এই  
অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্য গৃহের কঠোর  
বস্ত্র গ্রহণ করুন। জুটি তরকারী মাখন চিনি  
হুন ইত্যাদি সকল জিনিষই মাগিয়া শুণিয়া  
ব্যবহার করা কর্তব্য। কোন জিনিষ পাতে  
পড়িয়া থাকিলে তাহা সব্বদে তুলিয়া রাখিতে  
হইবে। সামান্য নাজ জিনিষ নষ্ট হইতে  
দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক গৃহের কঠোর  
ভাণ্ডার খয়ের চাবী নিজ হাতে রাখুন।  
নিজের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন খাদ্য ভ্রম্য  
বাহির করিয়া দিতে থাকুন, তাহা হইলে  
অপব্যয়ের মাত্রা কমিতে পারিবে।”

একজন ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক ভগাতিবার  
হইবার জন্য সেনাবাহিন্যের নিকট গমন করে।  
তাহার পরীক্ষণ ও বাহ্য পরীক্ষা করিয়া অধ্যক্ষ  
বলিলেন—“তোমার দাঁত ধারণ—ধাতের  
উন্নতি না হইলে সেনাবাহিন্যে প্রবেশ  
করিতে পারিবে না।” সে ইহাতে বড়ই  
দুঃখিত হইল। সংবাদ পত্রে দেখা দেখি  
চলিতে লাগিল। একজন পরামর্শ দিলেন—  
“গবেষণা কি এই যুবকের দাঁত পরীক্ষা  
করাইয়া সারিরা লইতে পারেন না ? নতুন  
দাঁত দাঁতাইতে কতই বা ব্যয় ? তাহার  
পর নিয়মিত রূপ দাঁত বাহিলেই বাহ্য রক্ষা  
হইতে পারিবে।”

বোড়বোড় বস্ত্র রাখিবার জন্য কর্তব্য

দ্বিধা করিলেন। অধনি নানা পত্র সংবাদ-  
পত্রে বাহির হইতে লাগিল :—“এই দুঃসময়ে  
অনেক লোক অস্বাভাবে মারা যাইবে।  
দোঁড়দোঁড় নিঃশব্দে চলিতে থাকিলে  
বহুসংখ্যক সহস্র, দ্বাপওলালা, খোড়সোয়ার  
ইত্যাদির কার্য বন্ধ হইবে না। শতশত  
পরিবারের অসংখ্যান সংজ্ঞেই হইতে  
পারিবে। সুতরাং দোঁড়দোঁড় বন্ধ করা  
উচিত নয়।”

একজন সেনানায়ক লিখিযাছেন—  
“শুনিতোছি দেশের রক্ষণগণ আমাদের  
সৈনিকদিগের হুঃখ নিবারণ করিবার জন্য  
শোবাক ভৈরবী করিতেছেন। তাঁহাদিগকে  
বলিতেছি যে, সৈন্যদের পক্ষে টুপি অপেক্ষা  
জুতা এবং মোজা ও পেজি বেশী আবশ্যিক।  
এই বুদ্ধিমা তাঁহারা যেন কর্ষ করেন।”

কেহ কেহ বলিতেছেন—“যুদ্ধের সময়ে  
আমোদ প্রমোদ বর্জন করা নিত্যকর্তব্য।  
নাচগান, খিচোর, দোঁড়দোঁড়, ব্যায়াম  
ইত্যাদি এই দুঃসময়ে বন্ধ করিয়া দেওয়া  
আবশ্যিক।” কিন্তু মোটের উপর বিচক্ষণ-  
গণের মত এই :—“আমোদ প্রমোদ নৃত্য  
স্বভাবাত্মক উপসব ইত্যাদি বন্ধ করা কোন  
মতেই নীতিসঙ্গত নয়। তাহা হইলে বহু  
লোকের কাজ নষ্ট হইবে—তাহারা না খাইয়া  
মরিবে। অধিকন্তু ক্ষুষ্টি করিবার উপলক্ষ্য  
না থাকিলে দেশের লোকেরা হারতাপ  
করিয়া মারা যাইবে। ২৪ বর্ষী লড়াইয়ের  
হুঃখ থাকিলে মাথা গরম হইয়া উঠিবে।  
ক্ষুষ্টিতা ও উবেগে শরীর অবলম্ব হইবে।  
অনেকে হরতাপ পাপল হইয়াও যাইতে  
পারেন। কালেই যুদ্ধের সময়ে আমোদ  
প্রমোদ বন্ধ রাখা বুদ্ধিমানের কার্য নয়।  
তবে সকল লোকেরই “সর্ব মত্যজং পঠিতং।”

বিশেষতঃ জাতীয় বিপত্তির যুগে অত্যধিক  
বিলাসপ্রিয়তা বা ছায়ালাসি ও উচ্ছৃঙ্খলতা  
কোন মতেই প্রশংসনীয় দেওয়া উচিত নয়।  
তাহা হইলে কঠোরতা এবং কঠোরতা কথা  
জুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সংযত-  
ভাবে আমোদ প্রমোদে যোগদান করাই  
প্রশস্ত।

কোম্পানি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক  
জানাইতেছেন—“কিন্তু গেল দেশের কোন  
কোন ধনী যুগ্ম তাহাদের চাকর চাকরান্নাকে  
“জবাব দিতেছেন।” ইহা বড়ই অসুভাবের  
বিষয়। বেচারারা এই বিপদের সময়ে  
কোথায় যাইবে? যুদ্ধের কিছুকালের  
জন্ত কষ্টে জীবন যাপন করিলে চাকর  
চাকরান্নার তরপপোষনের ব্যয় বহন করিতে  
অসমর্থ হইবেন না। ভৃত্যগণের বেতনাদিতে  
বত খরচ হয় তাহা ইহারা মিতব্যয়ী হইলে  
প্রতি সপ্তাহেই জমাইতে পারেন। তবে  
আর দরিদ্রগণকে কর্ষহীন ও আশ্রয়হীন  
করা হইতেছে কেন?”

বিলাতের আর কোন লোকই যুদ্ধবিভাগ  
পারদর্শী নয়। কালেই বর্তমান ক্ষেত্রে  
অনেকে হুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইহারা  
যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া লড়াই করিতে চান—  
কিন্তু সেনাবিভাগে ইহাদিগকে ভর্তি করা  
হইতেছে না। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতে-  
ছেন—“আমাদের প্রাচীন নবীন সকল  
লোকেরই এই অবস্থা। অথচ উৎসাহী  
কৃতবিদ্য যুদ্ধদেহ লোক অনেক সাহায্য যদি  
শেষ রক্ষার কার্যে লগ্না না যায় তাহা হইলে  
বড়ই দুঃখের কথা। ব্যারিটার, ইঞ্জিনিয়ার,  
শিকারী, হুটবল-ওতা, ক্রিকেট-ওতা, এবং  
অস্ত্রাভ্যাস লোকদিগকে সেতু, রেলপথ,  
তারদর, জলপথ, জলের কল, মালগুদাম

ইত্যাদির রক্ষার নিযুক্ত করা নায না কি ?  
কতিপয় লোককে সাধারণ কেরান্টিসিরির  
কাজেও লাগান হাইতে পারে ।”

কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলিতেছেন—  
“বুয়ার সময়ের সময়ে আমাদের দেশে মৃত  
আহত ও শীড়িত ব্যক্তি ও তাহাদের  
পরিবারগণের মঙ্গল নানা সেবা সমিতি  
স্থাপিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেশরক্ষার  
উদ্দেশ্যে বহুবিধ কৰ্মক্ষেত্র এবং মিশনও  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের কথা  
সকলগুলির কার্যপ্রণালী একত্রণ ছিল না।  
প্রত্যেক সমিতিই নিজ নিজ প্রণালীতে কৰ্ম  
করিয়াছিলেন। তাহার ফলে দেশভিত্তিক  
কোথাও হয়ত দুইবার সাহায্য করা হইল,  
কোথাও হয়ত সাহায্য একবার মাত্র  
শৌছিল না। কোন সমিতি হয়ত অর্থভাবে  
বেশী কাজ করিতে পারিল না। আবার  
কোন সমিতির হাতে টাকা ব্যতিত গেল।  
কোন প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত কৰ্মাভাবে বোধ  
করিল—আবার কোনটার হয়ত কাজের  
চাপ অত্যধিকই ছিল। আশা করি সেই  
সকল অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলার কথা  
অনেকেরই মনে আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে  
যেন প্রথম হইতেই সুশ্চলান্বিত ভাবে কার্য  
আরম্ভ করা হয়। এবার দেশের চারিদিক  
হইতে বেতরণ সেবা প্রস্তুতি দেখা হাইতেছে  
তাহার বথোচিত সম্ভাবনার পরিবার মঙ্গল  
বুদ্ধিমান কৰ্মবীরেরা অবতীর্ণ হউন।  
বীরাঙ্গা পূর্বে নানাবিধ সেবাসমিতিতে কৰ্ম  
করিয়াছেন তাহারাই এক্ষণে কর্তব্য ককন।  
শাপনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে জ্ঞান ও অস্ত্রাস  
না থাকিলে এই বিরাট সেবার আন্দোলন  
হুচাকল্পে নিরস্ত্রিত করা অসম্ভব।”

একটি বিভাগের শিকড়িতী বলেন—

“গ্রীষ্মাবকাশের পর স্থলভূলি খুলিলে সাধারণ  
লেখাপড়া বন্ধ করিয়া সেখান আবৃত্তক।  
তাহার পরবর্ত্তে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা বিষয়  
বালক বালিকাগণকে শিখান কর্তব্য।  
বালিকাধিককে প্রধাপনতঃ শুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-  
বিজ্ঞান, রন্ধন-কার্য, ব্যাত্তজ বাধা ইত্যাদি  
শিখান হাইতে পারে। বালকেরা প্রধান  
ভাবে তাঁনুপাটান, রোগী বহন করা, হাই  
সাইকেল চড়া ইত্যাদি শিখিবে। উভয়েরই  
মস্তুরণ শিক্ষা করাও প্রয়োজন।”

অনেক স্রীলোকের মত নিয়ে প্রদত্ত  
হইতেছে—“ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, বাস, মোটর-  
কার ইত্যাদি আমাদের চালাইতে শিখা  
আবশ্যক। পুরুষেরা লড়াই করিতে গেলে  
এইগুলির কার্য আমাদিগকেই করিতে  
হইবে। তাহা ছাড়া রেলওয়ে শিফালিং,  
তারখরের কাজ, পোষ্টাফিসের কাজ, শিয়রের  
কাজ ইত্যাদিও স্রীলোকদিগের আরম্ভ করা  
কর্তব্য। অধিকন্তু সৈনিকগণের মস্ত, জুতা,  
মোজা, গেটি, প্যাণ্ট, টুপি, ইত্যাদি প্রস্তুত  
করিয়া বড় বড় দোকানে পাঠাইতে চেষ্টা  
করাও আবশ্যক।”

বিলাতের রমণীসমাজ একটি বিরাট  
সেলাই-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছেন। ইহা  
নূতন প্রতিষ্ঠান নয়—ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও  
আইরল্যাণ্ডের নানা কেন্দ্রে ইহার বহু শাখা  
আছে। স্বামী বরং ইহার তত্ত্বাবধায়ক এবং  
পৃষ্ঠপোষক। সম্ভ্রান্তি তিনি এই সেলাই-  
পরিষদের প্রত্যেক শাখা-সমিতির সভাপতির  
নিকট নিবেদন করিয়াছেন :—

“মহিলা শ্রী শ্রী বহুগণ্যক পোষক  
তৈয়ারী করিতে পারিলে ভাল হয়। বিলম্ব  
কর্তি হইবে। সৈনিক, নাবিক, ডলান্টিয়াও  
এবং তাহাদের স্রীপুত্র কস্তার মঙ্গ প্রয়োজনীয়

কাপড় চোপড় তৈয়ারী করা আবশ্যক। এইজন্য অংশদানের সমিতির সভাপনকে উৎসাহিত করুন ফ্রান্সেল শার্ট, মোজা, গরম গেজি, পাখতান, ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্ত্রবৈ প্রয়োজন আছে।”

অনেক বডলোসের মেয়েরা খেজুর সেবকের কাষো ত্রুটী হইয়াছেন দেখিয়া একব্যক্তি লিখিয়াছেন—“ধনী কল্লাদিগের স্বার্থভাগ গ্রহণদানীয় সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহাদের কাষাকলে দরিদ্র প্রমজীবিদিগের স্ত্রী ও কল্লারা কান পাটতেছেন না। আর কাল সংযাতীত স্ত্রীলোক কার্যভাবে যুবিয়া বেড়াইতেছে। হাঙ্গাদিগের দ্বারা চিঠি পত্র লেখনি, পেনাট করা, টাইপ করা, কেরানীর কার্য, হিসাব রাখা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ করান যাঠিতে পারে। ধনী কল্লারা এট সকল কাজ নিজে না করিয়া যদি অর্থদান করেন তাহা হইলে এই কল্লারী সমাজিককে যেমন দিয়া নিব্বুক্ত করা যায়।”

গ্রিক এই কথাই Timesও বলিতেছেন:—

“Among the suggestions which continue to pour in from our readers an ever-increasing number concern the dangers of indiscriminate work by unskilled, if charitable, hands. It is a matter that deserves consideration. The needs of our sailors and soldiers, of their wives and families, and of those in distress, may be simple, but simple things are not always the easiest to make. On the other hand, there are many great shops, thoroughly familiar with such work,

which are keeping their doors open almost entirely for the benefit of employees whom they do not wish to dismiss; and there are also, and there will be, hundreds of professional needle women out of work. We suggest therefore, to those of our readers who are naturally and charitably eager to do something for their country, that there may be cases in which it would be a truer and more useful charity to spend money on having things made than time on making them.”

নিম্নে বাড়িয়া উপকার করা অপেক্ষা টাকা দান করিলে অনেক সময়ে বেশী ফল লাভ হয়।

## ১২। বর্তমান কুরুক্ষেত্রের

যুযুৎস

বিদেশভাষীর এই বিরাট লড়াইযুদ্ধে দুনিয়ার ছোট বড় সকল রাষ্ট্রই লক্ষ্য মিত্র অথবা উদাসীনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিব যে বাঙালী মিত্রভাষানে বহু ঊধারা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থই দেখিতেছেন—অপর পক্ষের সঙ্গে ইহাদের পক্ষতার কারণ একতরফ নয়—ভিন্ন ভিন্ন। আবার বাঙালী উদাসীন রহিয়াছেন বা রহিবেন বলিয়া প্রচার করিতেছেন ঊধারাও ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই যুদ্ধের সহিত্বিত রহিয়াছেন। এই কুরুক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত জাতিগণের হুম্মার, অষ্ট্রিয়ার বেহনা, সার্বিয়ার ভাবুতা, কশিয়ার গৌ, ইতালীর স্বাধীনতা, ইংরাজের আশ্বরক্ষা, কলারীর ক্রন্দন, ফ্রান্সের হুম্মার, আশ্বরক্ষা, আশ্বরক্ষা, আশ্বরক্ষা এবং

আনুগত্যের পণ্ডিতমূৰ্খতা প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এক যুদ্ধ রাষ্ট্রমণ্ডলও এতগুলি 'বড়ির শক্তির সম্মুখ ঘটিয়াছে। এই শক্তিসমূহের কথন কি আকার বিকশিত হয় বলা যায় না। তবে সময়ের ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রমণ্ডলের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

বিগত ৪০ বৎসরের ইউরোপীয় ইতিহাস অল্পকাল এই বিপুল ঘটনার পথ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার পূর্বে তুর্ক-সম্রাট প্রাচ্য ইউরোপের প্রধান জীভিকনক বাণীর ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর হইতে অষ্ট্রিয়া সম্রাটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপের কটিকাঙ্কুর স্বরূপ রহিয়াছে। ইতিমধ্যে জাৰ্মানি বিজ্ঞানবলে এবং সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে অগতির ভারকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইয়াছে। কনিয়া ও জাৰ্মানির স্রাব লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে সময়ের তাহার নৌবল নষ্ট হইয়া যায়—একদম ব্রিটিশ-দিশের রূপ বিভীষিকা অনেকটা কমিয়াছে। ফলতঃ ১৯০৫ সালের পর হইতে অষ্ট্রিয়া-সম্রাট এবং ইংল্যান্ডের জাৰ্মান-বিভীষিকা ইউরোপীয় ইতিহাস নিঃশ্রুতি করিয়াছে। বিগত বসকাল সময়ে অষ্ট্রিয়া-সম্রাটাই মীমাংসা হইতেছিল। তাহার কিছুদিন পূর্বে (১৯১১ সাল) মরক্কো এবং আলজিরিয়া লইয়া জাৰ্মানি বিভীষিকার জলজন্মী প্রকটিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা থামিয়া যায়। এতদিন পরে জাৰ্মান-বিভীষিকা সত্যসত্যই দেখা দিল—উপলব্ধ অষ্ট্রিয়া-সম্রাট। সুতরাং ইউরোপের প্রধান দুইটি শক্তিই বর্তমানক্ষেত্রে হস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকেই এক একটা

কুরুক্ষেত্র হইতেই বর্তমান সময় ১৯১৪  
মধ্য কুরুক্ষেত্রেই উদ্যোগ হইয়াছে

এই অষ্ট্রিয়া সম্রাট কি? প্রথমতঃ, ইংগর আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অষ্ট্রিয়া এবং অলান্ড। দ্বিতীয়তঃ কুমারসাগর ও কক্সসাগরের 'দিকে ইংগর আক্রান্ত। সুতরাং তৃতীয়তঃ কনিয়ায় সঙ্গে যথ।

তুরস্কের জলবাহী স্থলবাহী ইত্যাদির বহুরা লটখাই কনিয়ায় এবং অষ্ট্রিয়ায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ধ্বংস কারণ। অধিকন্তু কনিয়া আর একটা নতুন উপলব্ধ। পাইয়াছেন। ইনি বলেন "অষ্ট্রিয়া কনিয়ায় বহুতীরের স্রাভ-দিশকে নির্ধারিত অথবা বিস্তৃত করিতে প্রস্তুত। এই প্রদর্শনে আমি বাধ্য হইতে পারিতঃ বাধ্য।" অষ্ট্রিয়া-সম্রাট এইরূপে স্রাভ-বিভীষিকার পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং বলা যায় যে, বিংশ-শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে প্রাচ্য ইউরোপের স্রাভ-বিভীষিকা, মধ্য ইউরোপের জাৰ্মান-বিভীষিকা এবং পশ্চাত্য ইউরোপের ইংল্যান্ড-প্রাচ্য এই তিনটি শক্তির খেলা চলিতেছে। ঘটনাচক্রে সম্রাট স্রাভ-বিভীষিকা এবং ইংল্যান্ড প্রাচ্য জাৰ্মান-বিভীষিকার বিরুদ্ধে একাবধ।

অষ্ট্রিয়া ও কনিয়ায় 'মীমাংসা' প্রাচ্য হইয়া থাকে। অষ্ট্রিয়া-রাষ্ট্র রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী—কনিয়া গ্রীক মতাবলম্বী খ্রীষ্টান। অষ্ট্রিয়া তাহার স্রাভ প্রাকৃতিককে রোমান ক্যাথলিক মতে দীক্ষিত করিতে চাচ্ছেন। কনিয়া তাহার স্বাভাবিকের ধর্মত্যাগ কখনই সন্ম করিতে পারেন না। ধর্ম ও জাতি লটখাই অষ্ট্রিয়া ও কনিয়া বহুদিন হইতে কলহ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচ্য ইউরোপের জনগণের মধ্যে স্রাভ সত্যতার বুদ্ধি হইবে কি টিউটানিক

সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে—এই সমস্ত। সর্বদা বিদ্যমান। অগ্নিয়ার বিজিত এবং পার্বত্যী সাতের। সকলেই গ্রীক মতাবলম্বী হইলেন। ইহার। একটা। স্বাধীন যুদ্ধ সাত-সাত গড়িতে চাহেন। বলা বাহুল্য এই খানেই ইহাদের সঙ্গে অগ্নিয়ার বিরোধ এবং কনিয়ার সৌহার্দ্য। আবার এইখানেই অগ্নিয়ার ও কনিয়ার স্ব-বৃদ্ধির সুযোগ। অগ্নিয়ার যে ভাবী সম্রাটকে হত্যা করা হইল তিনি গোড়া রোমান ক্যাম্প-লিক সাত-নিপীড়নকারী রাজপুরুষ ছিলেন। ইহাকে হত্যা করিয়া সাতের। তাহাদের পরম-শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। এই সম্রাট অগ্নিয়ার ও তাহার চরম অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

আক্রমণের বিষয় এই যে, ট্রিষ্ট বধন অগ্নি-সমস্ত। কঠিন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে দৈবক্রমে তখনই জাতি-বিভীতিকা ও তাহার প্রবলতম আকারে দেখা দিয়াছে। ১৮৮৭ সাল হইতে জাতি-একটি প্রকাণ্ড বাল কাটিয়া বাটিক সাগরের সঙ্গে উত্তর সাগরের সংযোগ স্থাপন করিতেছিলেন। এক মাস হইল ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফলে জাতি-গণের জাহাজগুলি অতি কম সময়ে এক সমুদ্র হইতে অপর সমুদ্রে আসিতে পারিবে। এই বাল না থাকিলে ডেনমার্কের পার্বত্যী সতীর্ণ প্রাণালীর ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকিতে হইত—অধিকতর সময়ও অত্যধিক লাগিত। এক্ষণে ঐ সকল অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। জাতি-গণের জাহাজগুলি নিরাপদভাবে চলাফেরা করিতে সমর্থ। বিস্ফারকের ভবিষ্যৎগামী অঙ্গ-সারে কীল খালের (Kiel Canal) দ্বারা জাতি-গণের রণতরীবিভাগ বিশেষ প্রতাপশালী হইবে। অনেক রাষ্ট্রবীরের বিদ্যমানও ছিল যে

এই বাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জাতি-গণের হত্যা ছাড়িবেন না।

এই বাল সম্পূর্ণ হইবার এক মাসের ভিতরেই সাতব্রহ্ম অগ্নিয়ার ভাবী সম্রাটকে হত্যা করিয়া অগ্নি-সমস্ত প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে জাতি-গণ স্বাধীন শক্তি পরীকার সুযোগ পাইলেন।

১৩। লড়াই-মণ্ডলের নিয়ম

লড়াই বাধিবার পূর্বে পর্যন্ত ইংল্যান্ডের লোক জাতি-গণের বিরুদ্ধে “বন্ধু” জাতি-সম্মানিত হইতেন—জাতি-গণের লোকেরাও ইংল্যান্ড-সম্মানে alien friends নামে অভিহিত হইতেন। শান্তির সময়ে ইউরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে পরস্পর লেনদেন লহকই সাধিত হয়। জাতি-গণের প্রতি ইংল্যান্ডের কর্তব্য এবং ইংল্যান্ডের প্রতি জাতি-গণের কর্তব্য সাধারণ আইনকাহন অঙ্গ-সারে পালিত হয়। তাহা ছাড়া জাতি-গণের ইংল্যান্ডে বসতি করিলে কতকগুলি অধিকার পান। ইংল্যান্ডের বসেন্দী লোকদিগের যে সমস্ত অধিকার এই জাতি-গণ জনগণেরও প্রায় তদ্রূপই। সেইরূপ জাতি-গণের প্রতি জাতি-গণ নরনারীর যে সমস্ত অধিকার, বসেন্দী বন্ধুগণেরও প্রায় তদ্রূপই অধিকার। বাস্তবিক পক্ষে, কিছুদিন পূর্বে লেন দেন, আচার ব্যবহার, সৌজন্য শিষ্টাচার, শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য, আবেদন প্রমোদ, চলাফেরা, আত্মীয় ব্যায়াম পর্য্যটন ইত্যাদি কোন বিষয়েই ইংল্যান্ডবাসী ইংল্যান্ড ও জাতি-গণ জনগণের প্রভেদ বুঝা যায় না, আবার জাতি-গণবাসী জাতি-গণ ও ইংল্যান্ড নাস্তিক-দিগের পার্থক্যও জানিতে পারিতাম না। শান্তির সময়ে রাষ্ট্রমণ্ডলে “বসেন্দী” “বসেন্দী” পার্থক্য প্রায়ই চোখে পড়ে না।

কিন্তু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন লড়াই বাধে তখন রাষ্ট্র-মণ্ডলের রূপ অল্পপ্রকার হয়। তবে লড়াইয়ের সময়ে রাষ্ট্র-মণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি নিয়মকানুন বীতিনীতি কর্তব্য আদিকার ইত্যাদি স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরকে যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না। লড়াই-মণ্ডলের নিয়মকে বিলাতি ভাষায় The Law of War বলে। এই নিয়মগুলি লক্ষণকৌশল যদি মানিতে ইচ্ছা করেন ভালই, কিন্তু যদি তাঁহারা এইগুলি ভাঙিয়া কাব্য করেন তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে কে? কেহই না। কোন পক্ষ এটাই আইনগুলি অসম্মান করিলে তাঁহাকে দ্বন্দ্ব করা একপ্রকার অসম্ভব। যদি অপর পক্ষ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন তবেই এই আইন কাছন অসম্মান করিবার প্রকৃত শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে নতুবা নয়। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা না করিয়া কোন রাষ্ট্র লড়াই-মণ্ডলের আইনগুলি সম্মান করিতে চাহেন না। জাৰ্মানি যদি দেখেন যে ঐ সকল না ভাঙিলে তাহার অসুবিধা হয় কঠিন তিনি প্রথমেই ঐ সকল আইনগুলি ভাঙিতে বসিবেন। আইনগুলি ভাঙিবার লগ্নে ইংরাজ, ফরাসী বা যুক্ত-রাষ্ট্রের চোখ রাজধানিতে ভব পাইবেন না। জাৰ্মানি যদি বিবেচনা করেন যে ঐ সকল আইন ভাঙিয়া তিনি সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে একাকী লড়িতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি কতকগুলি কাগজে লেখা সন্ধিপত্রের গোহাই সম্মান করিবেন না। আবার ইংল্যান্ড যদি বুঝেন যে, ঐ আইনগুলি সকলে সম্মান না করিলে তাঁহার স্বদেশ রক্ষা বা সাম্রাজ্য রক্ষা বা কোন প্রকার স্বার্থ রক্ষার ব্যর্থতা হয় তাহা

হইলে তিনি ঐ আইনগুলি মানিয়া চলিতে সচেষ্ট থাকিবেন; এবং লড়াই-মণ্ডলের সকল রাষ্ট্রকেই ঐ সকল নিয়ম সম্মান করিতে বাধ্য করিবেন। যদি জাৰ্মানি ইংরাজের অগ্ররোধ গ্রাহ্য না করেন তাহা হইলে হয় ত ইংরাজ যুক্ত-রাষ্ট্র, জাপান, ইতালী ইত্যাদি উদাশীন রাষ্ট্র-সমূহকে ডানাইবেন—“জাৰ্মানি রাষ্ট্র-মণ্ডলের আইনগুলি অস্বীকার করিয়া অলভ্যতা ও বর্ধিততার চূড়ান্ত করিতেছেন। আপনারা ঐ সকল কথা মনে রাখিবেন।” এই কথা। দুই পক্ষই নিজস্ব স্বার্থে অগ্রসরে আইনগুলি মানা না মানা সাব্যস্ত করিয়া থাকেন।

ব্যাবহিক পক্ষে আন্তর্জাতিক আইনগুলি সবই কাগজে লেখা সন্ধিপত্র মাত্র। জগতের অনেক রাষ্ট্রই হয় ত শান্তির সময়ে বৈঠকে বসিয়া নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ঐ সকল নিয়মের গোহাই বড় বেশী কার্যকরী হয় না। অবশ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির উপর এই নিয়ম সমূহ জোর করিয়া চাপান অসম্ভব নয়। কিন্তু ইংল্যান্ড, জাৰ্মানি, কশিয়া ইত্যাদি বড় বড় রাষ্ট্রে গোলযোগ বাহিলে ঐ আইনগুলি হাওয়ায় উড়িয়া যায়। ইহারা বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রের চরম আবশ্যকতাহুসারে নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিতেছেন। সকলেই জানেন যে যুদ্ধে অর পরাজয়ের পর যখন সন্ধি হইবে তখন আবার দেখা যাইবে—ঐ সুস্থিরাই সকলে সম্মতি লড়াই-মণ্ডলের নিয়মাবলী স্বকীয় স্বার্থ অগ্রসারে কাজে লাগাইতেছেন।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন লড়াইয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন এক পক্ষের সকল লোকই অস্ত্র পক্ষীর সকল লোকের পক্ষ বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই রাষ্ট্র আনাগোনা, চিঠিপত্র, ব্যবসা

বাণিজ্য, আদান প্রদান সবই বন্ধ হইয়া যায় ছুই জাতির পোকের ভিতর কোন প্রকার চুক্তি, পরামর্শ, আশোচনা চলিতে পারে না। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের প্রত্যেক নরনারীকে স্বকীয় আইনের বর্হীকৃত বিবেচনা করেন। শান্তির সময়ে ইংল্যওবানী জাতিগণেরা ইংল্যজ বিচারালয়ে যে সমুদয় অধিকার ভোগ করিতেন এক্ষণে তাহার একটি মাত্রও ইহারা ভোগ করেন না। বলা বাইতে পারে যে আইনের সম্বন্ধে বর্তমানে দুয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ মাত্র নাই।

তবে কতকগুলি সহজ নিয়ম সকল রাষ্ট্রই ন্যূনতম পরিমাণে স্বীকার করিয়া থাকেন। এগুলি সাধারণতঃ নীতিসঙ্গত ও সভ্য মানবের ধর্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। লড়াইয়ের দুঃখকষ্টবরণা বাহাতে বৈধলোকে না পায় সেমিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি মানিয়া চলা হয়। নিয়মগুলির মধ্যে অনেকটাই এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। কতকগুলি মাত্র আন্তর্জাতিক বৈঠকে বসিয়া স্থিরীকৃত ও প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। মোটের উপর এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাঁহার চিন্তাভাব প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

লড়াই মওলের নীতিসঙ্গত নিয়মগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা বাইতে পারে :—

(১) নক্ষত্রপক্ষীয়গণের রাষ্ট্রের যে সকল নরনারী যুদ্ধকক্ষে নিযুক্ত নহে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে না তাহাদিগকে রক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য। এই সকল লোককে Non-Combatant, Civilian বা "সাধারণ" বলা হয়।

(২) কণ, আহত ও যুত সৈন্য এবং নাবিকগণের সেবাকর্মী, স্থগিধান ও সংস্কার করা উত্তরণকারী আবৃত্তক।

(৩) সরকারী বাড়িঘর, দুর্গ, জাহাজ, হাবঘর, ডাকঘর, হেলপথ এবং অন্যান্য সম্পত্তি অক্রমণ করা বাইতে পারে। এষ্ট সমুদায় Public ঘরবাড়ী ছাড়া জনসাধারণের চাট বাজার গৃহ মন্দির ইত্যাদি private property হবারস্তব বাচাইয়া চলা অক্রমণকারী-নিষেধ উচিত।

(৪) রাষ্ট্রের যে সকল অংশে কোলা, কামান, গোলাগুলি, জাহাজ, সেনানিবাস ইত্যাদি নাই—অর্থাৎ যে অংশে "সাধারণ" লোকজন বাস করে সেই সমুদায় স্থান অবরুদ্ধ ও বিপর্য না করা নীতিসঙ্গত।

(৫) লড়াইয়ের দাঙ্গা হাকামা হারকাট লুটপাট ইত্যাদি বিষয়ে নিত্যন্ত নির্দিষ্ট ও পশ্চৎভাবোচিত ব্যবহার না করা বাহুদীয়।

বলা বাহুল্য নিয়মগুলি নক্ষত্রপক্ষীয়গণের মহাত্মবৃত্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দ্বার মাত্র। কতগুলি চাইবে তাহা যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা না বৃত্তি কোন সেনাপতি বা ক্যাপ্টেনই বলিতে অসমর্থ। অধিকন্তু তুমি আমার যে আচরণকে নির্দিষ্ট ও বর্জন বলিতেছ আমি হয় ত সেই আচরণকে অতিশয় নরম ও সভ্য ভাবোচিত বলিতেছি। তাহা ছাড়া, লড়াইয়ের প্রয়োজনানুসারে যখন বাহা অবশ্য কর্তব্য বিবেচিত চাইবে সেনাপতিরা তখন তাহাই করিতে বাধ্য। তাহা না করিলে দুর্বৃত্ততার ফলে বেগের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে। সত্যেই লড়াইমওলে দ্বা প্রকাশ সম্বন্ধে সকল নিয়ম কার্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন।

বর্তমান সময়ে জাতিগণের আচরণকে নক্ষত্রপক্ষীয়েরা নিষিদ্ধ করিতে ছক করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এতদূর নিষিদ্ধ ভাবনা ও পালাপালি যুদ্ধের সময়ে পরস্পর পরস্পরকেই করিতে



ছেন। এবিষয়ে সত্য উদ্ধার কোন দি-ট হইবে না। আত্মকাল ইংরাজী সংবাদপত্রে লড়াই-মণ্ডলের নিমোবলী কিছু কিছু আলোচিত হইতেছে। আলোচনার তর দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর আলোচনার বেষ্টিতেছি লোকেরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন “জাৰ্মানি লড়াই-মণ্ডলের কোন নিয়মই মানিতেছে না—সমগ্রগণ্যে জাৰ্মানির মুখ দেখান অসম্ভব হইবে।” ইনি বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ দখল করিয়া আত্মক্ষাতিক শক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন—গরবেন জগতের মুখেও সময়ে তুরক্ষকে বেঁচিয়া লড়াই-মণ্ডলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন—আমেরিকার দোণা বিভাগকে অপমান করিয়া উদাসীন রাষ্ট্র-স্বত্বীয় আইন অধীকার করিয়াছেন—এবং বেলজিয়ামের “সাধারণ” জনগণের উপর জুলুম করিয়া বর্ষরত্নের প্রদান দিয়াছেন! এই অবস্থায় ইংরাজেরা আত্মক্ষাতিক আইন মানিয়া চলিবেন কেন? ইহারা উদাসীন জাহাজের জাৰ্মান মালগুলি গ্রেপ্তার করিলেই ভাল হয়। ১৮৬৭ সালের বৈঠকে স্থির হইয়াছিল যে Free ships, Free goods, অর্থাৎ জাহাজ যদি উদাসীনরাষ্ট্রের সম্পত্তি হয় তাহা হইলে তাহার ভিতরকার কোন মালই গ্রেপ্তার করা যাইবে না। এই নিয়ম-অনুসারে ইংরাজের রণতরীসমূহ আমেরিকার জাহাজবহিত জাৰ্মান মাল গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এই নিয়ম ইংরাজের আর সম্মান করা উচিত নয়। উদাসীন জাহাজের জাৰ্মান মালগুলি দখল করিয়া ইংল্যান্ড জাৰ্মানিকে “ভাঙে মারুন” তাহা হইলে জাৰ্মানির মুষ্টিপাশা শত্রুই মিটবে।”

আর এক প্রকার আলোচনার বৃত্তিতে—  
“জাৰ্মানিয়া যদি ইংল্যান্ড আক্রমণ করে তাহা

হইলে ইংরাজের “সাধারণ” জনগণ রক্ষা পাইবে কি? সাধারণতঃ শত্রুগণকে লৈঙ্গেরা কেবলমাত্র আমাদের লৈঙ্গগণকে ধ্বংস করিতে যত্নকারী। আমাদের সাধারণ পৃথিব্যগণের উপর জাৰ্মানিগণের চাত তোলা অহুচিত। তারপর আর একটা কথা। জাৰ্মানিয়া দখল ইংল্যান্ডের কোন কোন অংশ দখল করিয়া যদিও এবং অপরাপর অংশে লড়াই চলিতে থাকিবে তখন ইহারা আমাদের সাধারণ জনগণকে জাৰ্মানির পক্ষে লড়াই করিতে বাধ্য করিবেন কি? জাৰ্মানি যদি বর্ষর হন তাহা হইলে এতদূর করাও অসম্ভব নয়। দেখা যাউক, কতদূর সত্য। ইংরাজ “সাধারণেরা” যদি জাৰ্মান লৈঙ্গগণের সঙ্গে মিলিয়া ইংরাজ “সামরিক”গণের বিক্ষেপে লড়াইতে বাধ্য হন তবে দুর্দশা ও হীনতার সীমা থাকিবে না। জাৰ্মানির প্রতিনিধি বিগত আত্মক্ষাতিক বৈঠকে এই ব্যবহারের প্রতিকূল ছিলেন। কিন্তু তাহার মতে ইংরাজ সাধারণকে ইংরাজ সামরিকগণের প্রতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।”

আজ কাল লগনে এবং ইংল্যান্ডের সমুদ্র-কূলস্থিত পরী নগর ও বন্দরে একটা নতুন আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিছু-দিন পূর্বে আত্মক্ষাতিক রাষ্ট্রমণ্ডলের একটা বৈঠকে নিম্নলিখিত আইন প্রচাৰিত হইয়াছিল—  
“Undefended ports, towns, villages, dwellings or buildings are not liable to bombardment—bombardment being interpreted to include aerial attack by balloons.”  
এই নিয়ম অনুসারে জাৰ্মানির রণতরী, আকাশযান অথবা বাল লৈঙ্গগণ ইংল্যান্ডের

সাধারণ পরীক্ষায় শাস্ত্র জনগণের গৃহ অরক্ষিত বন্দর ও নগর এবং দুর্গহীন লোকালয় আক্রমণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুর্গহীন বা অরক্ষিত স্থান কাহাকে বলে? লগুন নগরের কথা ধরা যাউক। নগরের চারিদিকে কেছা বা দুর্গপ্রাচীর বা সামরিক উদ্দেশ্যে কোন খাল নাই মত;। কিন্তু অস্ত্র শস্ত, কামানবন্দুক, তাহাজখানা ইত্যাদির ত অভাব নাই। কাজেই লগুনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এইরূপ ভাবিয়া লগুনবিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানাদ্যাপক Daily Newsএ পত্র লিখিয়াছেন।

### ১৪। দুর্ভিক্ষ-নিবারণের প্রয়াস

লড়াই বাধিবা মাত্র মামুলি নিয়ম বাণিজ্য বোকানদারী সব হঠাৎ বসিত হইয়া গেল। অসংখ্য প্রমজীৱী শিল্পী বোকানদার ও মজুর কর্মহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এদিকে বড় লোকেরা ছদ্মবেশে পড়িয়া বেষ্ট বেষ্ট ভিনিয় পত্র কিনিয়া রাখিতে থাকিলেন। এই কারণে বোকানে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া চলিল। অধিকতর সেনা বিভাগ, রণতরী বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী বেশ রক্ষা বিভাগের সস্ত্র সহস্র সহস্র বেছাসেবকের প্রয়োজন হইল। ইহার দলে দলে তাহাদের চাকরী/ছাড়িয়া বেশ উদ্ধারের কাজে লাগিয়া গেল। ফলতঃ তাহাদের গ্রী-পুত্র-পরিবারের অন্ন কষ্ট ঘটিল। একে মূল্য বৃদ্ধি, তাহার উপর কর্তৃত্ব, তাহার উপর আবার গৃহের উপার্জনকারী লোকেরা রাষ্ট্রের কণ্ঠে বেছাসেবক। যুদ্ধ যোগ্য এক সম্রাটের মধ্যে ইংরাজ সম্রাট যোগ্যতর আশঙ্কা এবং নৈরাশ্র দেখা দিল। যুদ্ধের বিপর্যয় অপেক্ষা এই বিপর্যয়ই অধিকতর ভীতিপ্রদ। কাজেই

সরকার এই বিপর্যয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উক্ত শিক্তি ব্যক্তিগণও সরকারের প্রয়াসে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

যে সকল লোক যুদ্ধ করিতে গেল তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহারা যে সমুদয় কার্যবারে কর্ম করিত তাহাদের মালিকেরা এই ভার লইলেন। যুদ্ধরত নিশ্চিন্ত ভাবে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। কোন কোন স্থলে পত্নী ও নগরের শিক্তি ও খননান লোকেরা চাফা করিয়া স্থানীয় গ্রন্থ পরিবারগণকে পালন করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া গবর্নমেন্ট অরই কর্মহীন রোগপ্রসারহীন লোকজনকে নিযুক্ত করিবার জন্য নতুন নতুন কার্যবার খুলিলেন। দেশের কোন পত্নীতে কোন কোন তাত্ত্বী, দল্লী, ছাত্র, মিস্ত্রী বা ফুলী কণ্ঠাভাবে বসিয়া আছে তাহার তালিকা গবর্নমেন্টের নিকট পৌছিতে দেয়ী হয় না। কারণ এসেতে টেন্ড ইউনিয়ন বা প্রমজীৱী-সমিতি এবং সোশ্যালিষ্ট-সমিতি অসংখ্য। তাহাদের নিকট হইতে গবর্নমেন্টের আক্ষিপে নিরমিত রূপে তালিকা আসিয়া থাকে। এই উপায়ে পরিচালনগণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কবিয়া দেশের কর্তারা সৈন্ত তৈয়ারী ও চালান করিতে পারিলেন।

এই দুঃসময়েও বহু আশ্রয় মহাজন ও বোকানদার নিজ নিজ লাভের কথাই ভাবিতেছেন। তাহারা এই সুযোগে লাম চড়াইয়া দিয়াছেন। সকলেরই শুধু যে, বিশেষ হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া দেশে ক্রুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের চাফা হয় না। বেশজিহ্ম

ভেনমার্ক ইত্যাদি দেশ হঠাৎ ভিন্ন শক্তির মাংস ও মাশন এবং ভাষাণি ও খুঁটি হঠাৎ চিনি আশিত : সম্প্রতি আমদানী বন্ধ হওয়া সত্ত্বে—বড় বড় গোটেল ও লোকেরা চিনি, ভিন্ন, মাশন ইত্যাদি খাইতে পান না। এই সব বোধিগা ভূমিগা মধ্যবর্তী লোকেরা এবং এমন কি বড় লোকেরাও বস্ত্রা বস্ত্রের জিনিষ কিনিয়া ঘরে রাখিতেছেন। বস্ত্র প্রদত্তবীরা একসঙ্গে অস্ত্র জিনিষ কিনিবে কোথা হঠাৎ ? তাহারা ভাবিয়া আসিল। ইংল্যান্ডের নানা স্থানে ছোট বড় কতগুলি দাখা হইয়া গেল। দোকান স্টোর সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য কথাগুলি বেশী প্রচারিত না করা ই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য।

যাহাউক, বাণ্যার অতি ভোগ বিবেচনা করিয়া গবর্মেন্ট নীত্র নীত্র ব্যবস্থার পর-বরাহ সন্ধে এক কমিশন বসাইলেন। ইহার বেশে উৎসব প্রবোধ পরিমাণ বুঝিতে থাকিলেন—বিদেশ হইতে নিরাপদ ভাবে আমদানীর উপায় আলোচনা করিতে লাগিলেন—এবং বহুগণ্যক দোকানদার, আড়তদার ও মহাজনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মূল্যায়ন বন্ধ করিবার লক্ষ্য চেষ্টা হইলেন।

গবর্মেন্ট নানা কঠে প্রচার করিয়া দিলেন—“কোন ভদ্র নাই আমাদের দেশের ভিতর এক্ষণে আগামী চারিমাসের উপযুক্ত গোধুম মজুত আছে। ইউরোপের সঙ্গে সম্প্রতি আমাদের ব্যবসার বন্ধ হইল সভ্য। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আমরা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে নিচমিতরূপে গোধুম আমদানী করিতে পারিব। মাংসও আমদানীও বন্ধ চইবে না। বর্তমান আমরা সমুদ্রের উপর দিয়া আমাদের জাহাজ স্বাধীন ও নিরাপদ ভাবে চালাইতে পারিব শুভদিন

আমাদের হৃতিক হওয়া অসম্ভব। তারপর সুগৌ হান বা বস্ত্রা পানী ও ভিন্নের কথা ; এই সব আমরা আয়ত্ত হইতে পাইয়া থাকি। সুতরাং লড়াইয়ের ফলে এই সমুদ্রের ভোগদান কমিবে না।”

এইরূপে জনসাধারণকে প্রত্যেক ধাতা-প্রবোধ আমদানী সন্ধে বিশদভাবে বুঝান হইতে লাগিল। গবর্মেন্টের ইচ্ছানুসারে অনেক বড় বড় মহাজন সকলকে আনাইয়া দেন যে কাহাকেই বেশী বেশী মাল বেচা হইবে না। এই কথাও গবর্মেন্ট প্রচার করিয়া দিলেন। জনসাধারণ কিছু আশত হইল। লোকেরা আর বেশী বেশী জিনিষ কিনিতে চাহিল না। নাম অনেকটা কমিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে মাল আমদানির চেষ্টা তুলিতে লাগিল। শত শত জাহাজ মালে বোকাই হইয়া ইংল্যান্ডে আসিতেছিল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিবানাত্ম সবগুলি নিকটবর্তী কোন উপদান রাষ্ট্রের বন্দরে অথবা ক্রিটল সাদাকোর পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছে। বন্দর হইতে বাহির হইনেনই আক্রমণ রণতরীর আক্রমণ আশঙ্কা করা নিতাইহী, স্বাভাবিক। কাজেই সকলেই বন্দরে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। যুদ্ধের বিপদ হইতে বীমা করা থাকিলে জাহাজের কাপ্তেনেরা সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। কারণ তখন জানা থাকে যে যদি জাহাজ ও মাল নষ্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার হয় বীমাকোম্পানী কর্তি পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে কোন জাহাজই যুদ্ধের জন্ত বীমা করা নাই। এতদ্র জাহাজগুলি দূর বন্দরেই বহিয়া যাইতেছে। এই আশঙ্কা নিবারণের লক্ষ্য গবর্মেন্ট একটা অসমসাহসিকতার কার্য

ক'লেন। সবচেহী সাধারণ বিভাগের  
অধানে একটা নীমা বিভাগ খোলা হইল।  
প্রথমতঃ জাহাজগুলি বীমা করা হইল  
তাৎপর পর মালগুলি বীমা করা হইল  
সামগ্রণ বীমা কোম্পানীর নিয়মে যুদ্ধ  
বাবিলেই জাহাজগুলি কোন বন্দরে আসিয়া  
লটতে বাধ্য। কিন্তু পবহের্ট -একণে যে  
বান্দু: করিলেন তাগাতে যুদ্ধের সময়ও  
জাহাজগুলি নির্ভয়ে সমুদ্রপথে চলিতে  
ধাতিবে। লম্বেত জর্জ পার্লামেন্টে পদর্পে  
প্রচার করিলেন—

"What we want is a reason that  
will encourage shipping to keep  
the seas. That is vital in order  
that we should have an uninter-  
rupted supply of food and material,  
that our trade should go on during  
the time of war as it does in the  
time of peace. We are perfectly  
convinced that by the powerful aid  
of the British Navy supplemented  
by a scheme of this kind, we can  
secure that vital object to our  
people."

লম্বেত জর্জের বীমা-প্রণালী এবং আবাদ-  
বান্ধি প্রচারিত হইয়াবাত বেশ তরিয়া। অয়  
জরকার পড়িয়া গেল। আর একজন নাম-  
জাযা মন্না বলিলেন "সামরা চম্বে পড়িয়া  
যেই ভয় বাটতেছি। বাস্তবিক পক্ষে  
আমাদের ব্যাপ্ততা নষ্ট হটবার কোন সম্ভাবনা  
নাই। তবে যেনের লোক আশ্বির হটর  
পড়িতেছেন সেখিলা লম্বেত জর্জ যে বীমা-  
প্রাণী প্রবর্তন করিলেন তাহাতে আমার  
সম্পূর্ণ সন্তোষভূতি আছে।" বিপৎকালে

মাথাভাঙ্গা বিপৎকাল কীর্তিপনের কথায় যত  
উপকার হয় তার কিছুতে তত হয় না।  
পত্রিতেরা সাহস দিলে জনসাধারণ বিচলিত  
হইবে কেন? বিপাতের এখন যে কষ্ট  
যমাত্রা উপস্থিত তাগাতে প্রথম হইতেই  
সেখবাস'ধিককে আশ্বত ও উৎসাহী রাখা  
অত্যাৱশ্যক। এইরূপ বিবেচনার ফলেই  
চেম্বারলেন বলিতেছেন:—

"I myself and my friends with  
whom I have been consulting are  
of opinion that the danger to this  
country is not so much of an  
actual scarcity of food or raw  
material as of a fear of scarcity  
causing panic and raising prices.  
But there is every reason for pre-  
venting panic at the beginning, for  
allaying apprehensions and for  
making the path of commerce and  
industry as smooth as it can be, so  
as to prevent all preventable hard-  
ship and suffering to any class of  
community."

পার্লিমেণ্টে আশার কথা প্রচারিত হইয়া  
গেল। জাহাজ পর এক সঙ্গে জাহাজ কঠে  
এক কাগজে কাগজে প্রত্যাং এই সকল কথা  
প্রচারিত হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ও  
অর্ধশিক্ষিত কুলী, মজুর, কৃষক ও শ্রমজীবী-  
দগকে নির্ভয়ে জীবন ধারণ করিতে উপদেশ  
দবার জন্য বহুসংখ্যক কর্মী উঠিয়া পড়িয়া  
লাগিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক ঘাটে করা  
অলক্ষ্য এই কার্যে ব্রতী হওয়া কোন অংশে  
কম স্বপ্ন-দেখা নহ।

ইতিমধ্যে জিনিবপণ্ডের মূল্যবৃদ্ধি অত্যধিক

হটাতা উদ্ভিগা'ছিল। তাহা নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টের খাদ্যসরবরাহবিভাগ দ্বারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন ১৭০০০ মূল্যমানা এবং অল্পকাল দোকানদারগণের প্রতিনিধি এক বৈঠকে আহুত হইলেন তাহাদের সম্মুখে গবর্মেণ্ট পরামর্শ করিয়া বুঝিলেন যে মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ করা কঠিন নহে। এমন কি অনেক বড় বড় দোকানের মালিকেরা নিজেই দাম কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহারা গবর্মেণ্টকে জানাইলেন—“আমরা কোন খরিদদারকে সাধারণতঃ ঘাড়া প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহার বেশী মাল কোন মতেই বেচিব না।” কোন কোন দোকানদার বলিলেন—“আমার সমস্ত কারবার গবর্মেণ্টের হস্তে রাখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমার লোকজন কেহাণী কন্দকারী ইত্যাদিকে আপনাদের কস্তারা বেক্স আপেল করিবেন তাহারা সেইরূপেই দোকান চালাইবে—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।” এইরূপ আলোচনার পরে দোকানদারগণের প্রতিনিধি এবং গবর্মেণ্টের কন্স-টারীরা সম্মতভাবে ঘাড়াবোঝার মূল্য সম্বন্ধে একটা হার বাঁধিয়া গেলেন। চীন, মাখন, মাংস, তৈয়, ইত্যাদির দাম নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল। তাহার বেশী মূল্য কোন দোকানদার কাহারও নিকট দাবী করিতে পারিবেন না। গবর্মেণ্টে ও ব্যবসায়ীসমাজে একটা মহাছদ্মুর্তি এবং একতা ইতিহাসে বিরল। ঘাড়া বুদ্ধ চালাইতেছেন তাহারা দেশের সকল শ্রেণীর লোক হইতে একটা সাহায্য না পাইলে অতি শীঘ্রই বিব্রত হইয়া পড়িবেন। সমস্ত দেশই এত বুদ্ধ চাড়ে—অথবা সমস্ত দেশের ঘন এই বুদ্ধের অন্ত প্রস্তুত করা হইতেছে—বলিয়াই বুঝায়েরা সকলভার আণা করিতেছেন।

এদিকে ইংল্যাণ্ডের উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব, পশ্চিম হইতে কৃষিকার্যের অবস্থা, দেশের পরিমাণ, লম্বা কাটিগার উদ্যোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশিত হইতেছে। গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগ ও অর্থনীতিবিভাগ এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই দেশের চাষ আবাদ, পশু, হাল ও পশুপালন বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে শিল্প-প্রধান হংকং-সমাজ কৃষক-সমাজে পরিণত হইতে চলিল বোধ হইতেছে। চাষের উন্নতি, নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের প্রণালী, পুরাতন কৃষিতে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানে আবাদের আবশ্যকতা, নব নব কৃষিতে চাষ প্রবর্তন ইত্যাদি প্রস্তাব জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—“বিস্তৃত ৩০ বৎসরের ভিতর ইংল্যাণ্ডে ঘাসের চাষ বেশী করা হইয়াছে অর্থাৎ জমি না চাষিয়া তাহার উপর পশু বাধা স্বাভাবিকভাবে জগিতে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল জমি একে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা কষ্টসাধ্য নহে কি? কৃষিতত্ত্ববিৎ এবং বন্যজানবিৎ পণ্ডিতেরা পরামর্শ দিলে শীঘ্র শীঘ্র এত কয়েক লাগিয়া ঘাড়া ঘাঠতে পারে। কিন্তু কৃষি জলি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইলে পশুপালন এবং মাংস বৃদ্ধ ইত্যাদির অবস্থা কি হইবে তাহাও আত্মনির্ভরভাবে বিচার করা আবশ্যক।” এই সকল বিষয়ে Timesএর পরামর্শ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"The proper course for the farmer is to recast his plans on an economic basis. If he could increase the output of wheat so much the better, but he has to keep in

mind the fact that there is an interval of three years between re-cultivating wheat crops and he has to take into account the prospects for utilising to advantage the root crops, the barley or oats, and the clover or mixed seeds that complete the rotation. He could at a pinch grow wheat every alternate year, but the drain upon the land would be heavy, and he would need to be assured of consistently higher prices before the system would be warranted."

বনির কাজ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লড়াইয়ের প্রথম সপ্তাহে সংবাদ আসিল যে এক জেলাতেই ৫০,০০০ কুলী কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই লোকগুলিকে নতুন কর্ণে নিযুক্ত করিবার জন্য নানা আয়োজন চলিতেছে। কোন কোন লোক চাপের কাজে লাগিয়া গেল। আজকাল ইংল্যান্ডের সর্বত্র কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে। কৃষির মালিকেরা বহুসংখ্যক চাকী চাহেন। এই সকল চাকীর কুলীরা চাকীর কাজে অত্যন্ত হইতে লাগিল। এইরূপে অন্ত্যস্ত কর্ণে অত্যন্ত প্রবলীকৃত হইয়া কৃষকভাবে নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহা দ্বারা কর্মহীনতা কমে—সঙ্গে সঙ্গে দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণের পথও সহজ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু শিক্ষিত তত্ত্বলোকও খেজারের কাজে কৃষক ও কৃষিকারীদের কার্যে সাহায্য করিতেছেন। ইহার পলকের মধ্যে চাকী হইয়া পড়িলেন। ইহার নাম বদেল-সেবা।

১৫। মুক্ত কালে সমাজ-সেবা  
বলা বাহুল্য প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর  
সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে প্রথমেই দৈন্ত  
সংখ্যার কথা ভাবিতে হয়। ইংল্যান্ডের  
একশত শত বা সহস্র সহস্র লোকে কাজ  
চলিবে না—তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ লোক  
আবশ্যক। কাজেই বর্তমানে সেনাবিভাগে  
প্রবেশ করাই বদেল-সেবার সর্ব প্রথম  
লক্ষ্য ও কার্য।

লগনের নানা স্থানে দৈন্ত লংগ্রহের কেন্দ্র  
স্থাপিত হইয়াছে। সর্বদা ঐ সকল স্থানে  
বহুলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার  
দৈন্ত হইবার অন্য দাঁড়াইয়া আছে। একে  
এক ইহার কর্মীর কাছে ঘাইতেছে।  
শরীর ও স্বাস্থ্য হেঁয়ালি ইহাদিগকে ভগ্ন করা  
হইতেছে। বহুলোককে ফিরাইয়াও যেওয়া  
হইতেছে। দিনে ৪০০০ করিয়া দৈন্ত এই  
উপায়ে মনোনিবৃত্ত হইয়া থাকিতেছে।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, প্রমত্ত, কৃষক,  
শিক্ষক, সম্পাদক, হোকারদার, ব্যবসায়ী,  
শিল্পী, চিত্রকর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকই  
সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতেছে। লগুন,  
অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি সকল বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এমত আবেশন করি-  
য়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা বলিতে-  
ছেন:—"বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা মুক্তের সমন্ব  
থাকিতে পারিবে না বলিয়া কোন ক্ষতি  
হইবে না। তোমাদের বাহারা পরীক্ষার  
অন্ত টাকা ভদ্রা দিয়াছ তাহাদের টাকা  
ফিরাইয়া দিব। তার পর লেখাপড়া হিলাবে  
তোমাদের ভবিষ্যতে দ্বারাতে অনুবিধা না  
হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। বিশ্ববিদ্যালয়  
তোমাদের বদেল-সেবার প্ররতিতে পৌরসা-  
দিত বোধ করিতেছেন।"

প্রত্যেক ঘনীর গৃহে বহুসংখ্যক ভারবান  
কেরানী ব্যাকার সরকার ইত্যাদি প্রাতিপালিত  
হইয়া থাকে। ইহারা ভাঙ্গাদিগকে যুদ্ধে  
ঘাটনার জন্য ছুটি দিতেছেন। শকসেহ  
পুস্তকেরা কঠোর কথ্যে লাগিতেছে—ইহাদের  
স্থানে স্রীলোক নিযুক্ত হইতেছে।

শান্তির সময়ে অল্প কয়েকজন পুলিশের  
কণ্ঠচাকরী, পাহারাগুণালা ইত্যাদির দ্বারা  
কাজ চলিষ্ঠা যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে  
সরকারী কার শতভগ বাড়িয়া গিয়াছে বলা  
হাইতে পারে। মামুলী কার্ভের পরিমাণ  
ত বাড়িয়াছেই—অধিকতর অলদান হইতে  
জমি চাষ পথ্য অলংকারিক গবর্মেণ্টের  
দৃষ্টি দিতে হয়। একত্র এক্ষণে বহু নতুন  
নতুন কণ্ঠচাকরীর আবশ্যক হইতেছে। তন্মধ্যে  
লোকজন ও সম্পত্তি রক্ষা, শান্তিরক্ষা, খজি-  
জ্রব্য সরবরাহ, ইত্যাদি কার্ভের জন্য বিশ  
হাজার পাহারাগুণালা নিযুক্ত হইতেছে।  
ইহাদিগকে special constable বলে।  
ঘনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর  
লোকই শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত হইতেছে।

সেনা ও পুলিশ—এই দুই বিভাগে বেঙ্কা-  
সেবকগণ দলে দলে প্রবেশ করিতেছে  
দেখিতে পাইতেছি। রাত্ৰার আধকাল যে  
সকল পুলিশ বা দৈত্তের দল দেখিতে পাই  
তাহারা প্রায়েই ভগাটিয়ার। আর এক  
দিকে যুদ্ধের সময়ে বেঙ্কাসেবক খুব বেশী  
আবশ্যক হয়। সেটা তত্ত্বা বা ইলপাতাল  
বিভাগ।

এই কার্ভের অন্তর্গত লোক অনেক পাওয়া  
হাইতেছে। কিন্তু ইহারা দেহাকাণ্ডে  
অনভ্যস্ত। কানেই ইহাদিগকে Fris-aids,  
তত্ত্বা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি শিখাইবার  
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়,

লণ্ডন-কাউন্টি কাউন্সিল এবং অস্ত্রান্ত প্রতি-  
ষ্ঠানের সাগাথো ইহারা সহজেই এই বিদ্যা  
শিখিয়া লইতেছে। এদিকে দেশের মানা-  
স্থানে ইলপাতালের জন্য ব্যবহার যোগ্য বাড়ী  
ভিক্ষা করা হইতেছে। ইংল্যান্ডের প্রায়  
সকল ঘনী ব্যক্তিই তাঁহাদের প্রমোদ-ভবন,  
উদ্যান-গৃহ, বৈঠকখানা, গ্রীষ্মভবন, স্নানগৃহ  
ইত্যাদি এই ভক্ত সেবাসমিতির হস্তে সমর্পণ  
করিতেছেন। কেহ কেহ ইলপাতালের  
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও ক্রয় করিয়া  
দিতেছেন। বিদ্যাতের সকল ভিউক, লর্ড,  
মহাজন এবং সূচাম্বিকারীরা তাঁহাদের সম্বয়  
প্রাসাদগুলি আবেগাশালাভপে ব্যবহার  
করিতে দিতে কিছুমাত্র স্কৃষ্টি নন। এত বাড়ী  
ঘর পাওয়া গিয়াছে যে সেবাসমিতির কর্তারা  
বলিতেছেন—“আর বোধ হয় আবশ্যক হইবে  
না।” গৃহস্থান ছাড়া অর্থদানও অনেক  
করিতেছেন।

যুদ্ধের সময়ের সময়ে ইংল্যান্ডসমাজে এতদ  
সেবা-প্রকৃতি এবং কণ্ঠতৎপরতা দেখা যায়  
নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে ইহারা যদেষ্ঠীর লোকের  
আন্তরিক স্বদেশপুত্রাগের পরিচয় পাইয়া  
রোমাঞ্চিত হইতেছেন; বস্ততঃ এক কয়দিনের  
ভিতর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অলংঘ্য প্রকার সেবা-  
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সকলগুলিকে  
এক শাসনের অধীনে আনিয়া সূচনীকৃত না  
করিতে পারিলে শ্রম ও অর্থের অপব্যয়  
হইবার সম্ভাবনা। ইংল্যান্ডেরা নিজেই তাহা  
বুঝিতেছেন। যুদ্ধের সময়ের সময়ে তাঁহাদের  
অপব্যয় হইয়াছিল। সে কথা অনেকেরই  
স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কলতঃ কার্য  
পরিচালনা বাহাণ্ডে ঐক্যবদ্ধ ও নিয়মিতরূপে  
হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াস  
চলিতেছে। এই সেবাসমিতিগুলির পরি-

চালনা করিতে বাইরা ইহারা একটা বিশাল রাষ্ট্রশাসনের সাধিক মাধ্যম লট্টাভেদে বুঝিতে পারিতেছি। দেবার আন্দোলন কি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। মিরের অসম্পূর্ণ তালিকা হইতে কথ'কথ বুঝিতে পারা যায়।

সেনাবিভাগ ও শান্তিরক্ষা।

এই দুই বিভাগের কথের জন্ত নানা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ নিকট-বর্তী কোন কেন্দ্রে যোগদান করিতেছেন। কেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতে পারে।

(ক) সৈন্ত-সংগ্রহ (Recruiting)

(১) সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকগণকে যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত করা হইতেছে। বহুবেশ ও বলিষ্ঠ যে কোন পুরুষই। এই কার্যে যোগদান করিতে পারে। তাহাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের তার সবর্ষেক অথবা ধনীসমাজ, অথবা ব্যবসায়ীগণ অথবা পরোপকার-সামিতি গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) ডেটার্ন (Veteran) সমিতি। ঐহারা পূর্বে সেনাবিভাগে কথ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সমবেত হইয়া একটা দল গঠন করিতেছেন।

(৩) লগুনরক্ষী সভা।

(৪) ব্যাটিলিয়ার মহলের দেবরক্ষা বিভাগ।

(৫) বিশেষীর স্বেচ্ছাসেবকগণ ইংরাজের সেনাবিভাগে কথ লইতেছেন। "উহাসী" রাষ্ট্রপন্থ অবশ্য ইংরাজপক্ষ কিবা আত্মপক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না। কিন্তু আবেহিকা, ইতালী, স্পেন ইত্যাদি দেশের অসামান্য যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরাজের পক্ষে এ বাজার অনেক ইতালীর স্বেচ্ছাসেবক কথ করিতেছেন। তথা হালা ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক, অষ্ট্র-

লিয়ার স্বেচ্ছাসেবক, বাসনিয়ার স্বেচ্ছাসেবক এবং অ'চ'ব'গ স্বেচ্ছাসেবকও নিযুক্ত হইতে-ছেন। ইহারা সাম্রাজ্য রক্ষণী সভার অন্তর্গত। ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র, পণ্ডিত এবং ব্যবসায়ীগণকে সাম্রাজ্যবক্ষার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা নিজ নিজ যোগ্যতা অহুপারে কথ প্রাপ্ত হইতেছেন।

(খ) পুলিশ বিভাগ। এই কার্যের জন্ত নিম্নলিখিত বিভাগপন বাহির হইয়াছে।

*The Volunteer Civil Force*  
(in war time.)

The country demands that every patriot, who is not under military obligations, should join this Force for the purpose of assisting the Police as special constable in the protection of life, property and food supplies, against lawlessness, and in the maintenance of the Public services. Enrol at once.

(গ) ব'স্কাউট্‌স্ (Boy Scouts) সমিতি। বিগত ৫৭ বৎসরের ভিত্তর বিশ্বেতে ছাত্র ও যুবকসম্প্রদায়কে সমাজ-দেবার মানবিক কথ লাগাইবার জন্ত একটা মহাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রতি-ষ্ঠানের কথ শান্তির সময়েও নিরমিতরূপে চলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময়ে এই সেবকগণের কার্য অত্যধিক বাড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঐহারা একগু বৌবন অথবা অতিক্রম করিয়া যুদ্ধবর্ধ পালন করিতেছেন তাহারা বর্তমান ক্রক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র দল গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শকটদান ও দৌধান

ধনবান্ পুহুহেরা এবং মহাজনগণ সকলেই



গবর্নেন্টকে নিজ নিজ গাড়ী, মোটর, সাইকেল ইত্যাদি ধার দিতেছেন অথবা দান করিতেছেন। নানাবিধ কার্খার অল্প একপে যাতায়াতের সুবিধা বিশেষরূপে করা যাবতক — অল্প সময়ে যেই কার্য কথিতা হইল। প্রয়োজন। লোকজনদের গমনাগমন, খাল ও সংবাদ পাঠান ইত্যাদি কার্য ক্ষুদ্রতরূপে সাহায্যে না পারিলে যুদ্ধে অসমর্থ হইতে পারিত। এই ক্ষুদ্র সেবার অনুসরণে নিজ নিজ সম্পত্তি গবর্নেন্টের হস্তে সমর্পণ করিতে উৎসাহী হইয়াছেন।

(১) মোটর গাড়ী-সমিতি। শান্তির সময়ে কুট ওয়ালা, মাখন ওয়ালা, দুধ ওয়ালা, লকী ওয়ালা ইত্যাদি দোকানদারেরা নিজ নিজ গাড়ীতে করিয়া গৃহস্থের ঘরে যান পৌছাইয়া দিয়া হাট। কিছু একপে গাড়ীর টান পড়িয়াছে—গবর্নেন্ট দোকানদারদিগের গাড়ী বিশেষ রক্ষার কাজে লাগাইতেছেন এই ক্ষুদ্র সরকারী সমর বিভাগ হইতে দ্বিতীয় গৃহস্থগণকে বলা হইতেছেঃ—“আপনারা নিজ নিজ যোগ্যতার দোকানদারগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনারদের মোটর-গাড়ীগুলি তাঁহাদের কার্খার অল্প দান করুন। তাহা হইলে স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্তিগত বয়সসময়ে তাঁহাদের ড্রিম, কুটি, মাখন, তরকারী ইত্যাদি পাটবেন।” তাহা ছাড়া সৈন্ত-সংগ্রহ (Recruiting) কার্খার অল্পও মোটর গাড়ীর ব্যবহার। বিশেষতঃ অনেক নগরী পল্লী হইতে বহুসংখ্যক শ্রীত কৈত্র সংগ্রহ আনিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেছে না মোটর কার্খার মাধ্যমে দেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে নিঃসংশয় গাড়ীগুলি দান করিতেছেন। কর্তৃপক্ষ এইগুলি ব্যবহার করিয়া গ্রাম হইতে সৈন্ত-সংগ্রহ করিতে পারিতে-

ছেন। যদিও স্বাধীন কুরুক্ষেত্রেও সহ মোটর গাড়ীর প্রয়োজন। বড় বড় সেনাপতিরা সংবাদবাংক ও দুতগণ, রতন-নরবাহকরা এবং সেনাপতিবাহকরা পায়ে হাটিয়া কাত করিলে বহুকাল বুঝা নষ্ট হয়। এক্ষণে শত শত মোটর গাড়ী কুরুক্ষেত্রে পাঠান হইতেছে। এই সকল প্রকার কার্খা লাগিয়া করিবার ক্ষুদ্র মোটর গাড়ী ওয়ালা ধনিসম্পন্ন নানা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

(২) মোটর মোটর ও সাইকেল। নদী ও সমুদ্রপথে শান্তিরক্ষার ক্ষুদ্র ছোট ছোট ক্ষুদ্রগামী তরঙ্গী প্রয়োজন হয়। গবর্নেন্ট দ্বারা গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীদের নিকট এই সকল জলযানের ক্ষুদ্র অহরোধ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক motor-boat, yacht ইত্যাদি গবর্নেন্টের হাতে পৌছিয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি কুরুক্ষেত্রে এবং সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) পাগাড়া সমিতি (Cyclists touring Club)। বলা বাহুল্য সংবাদ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল পাঠাইবার ক্ষুদ্র যন্ত্রাঙ্গিত পাগাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন। বাহারা সাইকেল চালানিতে বিশেষ ওজ্ঞান তাঁহাদের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশয় সুসাহায্য। এক্ষণেই মাধ্যমিক এবং অধ্যায়গামী সৈন্যগণের মাঝে সাইকেলচালার সৈন্যশিক্ষা ব্যবহৃত হয়। অতীত কালীন গোলা বন্দুকের দ্বারা পাগাড়ী ও বস্ত্রযানকালে পাগাড়ীর সংখ্যা বিবেচনা করা হইতে পারে। এই ক্ষুদ্র গবর্নেন্টের নিকট বহু পাগাড়ী প্রেরিত হইতেছে এবং সাইকেল ও ওয়াসেলও নিজ জীবন উৎসর্গ করিতেছেন

অর্থ-সাহায্য

ছোট বড় নানা প্রকার চাঁদা জুলিয়ার ক্ষুদ্র

সাম্রাজ্য হুজিরা অলংঘ্য কেন্দ্র স্থাপিত হই-  
রাছে। প্রত্যেকটার উদ্দেশ্য নগদ টাকা  
সংগ্রহ করা। ষ্টিক কোন্ ধরনের সেবা-  
কার্যে টাকা খরচ করা হইবে তাহা এখনও  
সকল স্থলে স্থিরীকৃত হয় নাই। কোন্  
কোন্ সমিতি হাসপাতাল বিভাগের কার্যে  
টাকা খরচ করিবেন—কোন্ কোন্ সমিতি  
দ্রুত সৈন্তগণের পরিবারপালনের জন্য ব্যয়  
লইবেন—কোন্ কোন্ সমিতির টাকা কণ্ঠ-  
হীন রোগগারহীন শ্রীপুরুষদিগের অভাব  
মোচনে প্রয়ুক্ত হইবে—কোন্ কোন্ কেন্দ্র  
হইতে নৃতন নৃতন শিল্প, কৃষি বা ব্যবসায়  
মূল্যবান শ্রমজীবীদিগের কর্মসংস্থান  
করা হইবে। কতকগুলি কর্মক্ষেত্রের নাম  
নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) জ্ঞানভান্ডার ত্রিভীক কাণ্ড। এই ধন-  
ভাণ্ডারের কর্তা বয়ঃসুবরাহ। এই ভাণ্ডার  
পরিচালনার জন্য কর্মচারী ইত্যাদি নিয়োগ  
করিতে দ্রুত ব্যয় হইবে সমস্তই সুবরাহ বয়ঃ-  
বহন করিবেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে এই  
ভাণ্ডারে তিনকোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।  
সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে অর্থ সাহায্য  
আসিয়াছে। কত কোটি টাকা যে সমিতে  
পারে তাহার স্থিরতা নাই : টাকা খরচের  
প্রণালী এখনও সাব্যস্ত হয় নাই।

(২) ব্রিটিশ রেডক্রস্‌ সোসাইটি—  
ইহারা হৃৎকালে আহত ও দ্রুত ব্যক্তিগণের  
পর্থাবেক্ষণ, সেবাশুশ্রূষা এবং সংস্কারাদির  
ব্যবস্থা করেন। ইহাদের ভাণ্ডারে টাকা  
জমা হইতেছে।

(৩) সৈন্ত ও নাবিকগণের পরিবারদিগকে  
সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি সমিতি  
আছে। কর্মহীন, দ্বন্দ্ব, দ্রুতগতির রোগশীর্ণ  
অথবা কষ্ট করিতে অসমর্থ সৈন্ত ও নাবিক-

গণ এবং তাহাদের শ্রীপুত্র কন্যা এই সমুদয়  
সমিতি হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে।

(৪) যশেন-সেবা ভাণ্ডার, নামে কতক-  
গুলি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে—নানা স্থান  
হইতে এই সমুদয় ভাণ্ডারে টাকা জমা  
হইতেছে।

(৫) ইউরোপের নানাস্থানে ইংরাজ-  
সাম্রাজ্যের পথটিকেরা আটকা পড়িয়াছেন।  
সেই বিব্রত ব্রিটিশ নরনারীকে সাহায্য করি-  
বার জন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন হইতেছে।

(৬) বেলজিয়াম ও ফরাসী সৈন্ত এবং  
তাহাদের পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার  
জন্যও টাকা তোলা হইতেছে।

#### শুশ্রূষা-সমিতি

ইংল্যান্ডের নানা স্থানস্থিত স্থানে অলংঘ্য  
গৃহ পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয়ে রোগী ও  
মুহূর্ব্বদিগকে রাখিয়া শুশ্রূষা করা হইবে।  
এই সেবা-কর্মের জন্য গৃহ-দান, বস্ত্র-দান,  
ঔষধ-দান, আশ্রয়-দান ইত্যাদি নানাবিধ  
দান সংগৃহীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অর্থ-  
সাহায্যও পৌছিতেছে।

(১) সোলট সমিতি (Queen Mary's  
Needle-work Guild)। ইহা নৃতন  
কোন প্রতিষ্ঠান নহে। পূর্বে হইতে ইহার  
কাৰ্য চলিতেছে। সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের  
রমণীগণ এই সোলট সমিতির কার্যে সাহায্য  
করিয়া থাকেন। সম্ভ্রুতি হাসপাতালদ্বারী  
সংলগ্ন সংলগ্ন আহত ও মুহূর্ব্বজনগণের জন্য  
পাখিমা ফ্রান্সে লার্ট, গেরি, মোনা, টুপি  
ইত্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত  
সৈন্ত ও নাবিকদিগের শ্রী পুত্র ও কন্যাগণের  
জন্যও নানাপ্রকার বস্ত্র তৈরি করা হইতেছে।  
বস্ত্র বস্ত্র কাপড় চোপড় ইতিমধ্যে রাষ্ট্র  
আফিসে জমা হইয়াছে।

(২) হাঁসপাতাল, সেবাস্থল, শুশ্রূষাগৃহ ইত্যাদি।

\*(৩) চিকিৎসা-শিক্ষালয়—যেচ্ছাসেবকগণকে শুশ্রূষাবিদ্যা শিখাইয়া লইবার জন্য দেশের নানাস্থানে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। রোগী বহন করা, ক্ষত পরিষ্কার করা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি লব্ধে শিক্ষা-প্রদান এই সকল কেসের উদ্দেশ্য।

#### মহিলা সমিতি

ইংরাজ রমণীরা নানা কার্যে লাগিয়া যাইতেছেন। সেবা, সেলাই, টাঙ্গা আনাধ, বস্ত্র সংগ্রহ, ঔষধ সংগ্রহ, সত্যায় পাক-প্রদানী শিক্ষা দেওয়া, যেচ্ছাসেবকগণকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে পারদর্শী করা, ইত্যাদি বহুপ্রকার কর্ম ত্রীলোকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল মহিলারা এতদিন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পাণ্ডা ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। কয়েকজন রমণী কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—“যুদ্ধের সময়ে বহিঃ পরিবারের অর্থকষ্ট এবং আর কষ্ট হইবে। একজন প্রথম হইতে সত্যায় গৃহস্থালী চালাইবার জন্য চেষ্টিত হওয়া কঠিন। আমি নানা উপায়ে খরচ কমাটয়া স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর খাদ্য রন্ধনের নিয়ম অবগত আছি। আমার নিকট পত্র লিখিলে শাকশাকী, কুটিতরকারী সত্যায় ব্যবহার করিবার উপায় জানাইয়া দিব। আমাদের এখন এক কাঁচা ভ্রব্যও অপব্যয় করা চলিবে না। মোটা কটিতেই অনেককে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু খাদ্যসম্বন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করাও আবশ্যক। একজন নৃতন খরচের রন্ধনপ্রণালী জানিয়া রাখা ভাল।” এইরূপ অনেক পত্র “টাইম্‌স্” “ভেল-লিউন্স্” “ওয়েষ্টমিন্টার গেজেট” ইত্যাদি কাগজে বাহির হইয়াছে। কেহ

কেহ বলিতেছেন—“কটির বদলে তাত খািতে অশাস্য করা প্রয়োজন।” কেহ কেহ বলিতেছেন “মাংস না খাইলে কি চলে না?” দেবিতেরি—আবশ্যক হইলে সকলেই বলিয়া থাকেন—

“মাগের দেথা মোটা কাপড় মাথায় তুলে  
নেরে ভাই।

দীন দুঃখিনী মা যে মোমের এর বেশী আর  
সাধ্য নাট।”

#### সরকারী কার্যালয়

জনসাধারণ-কর্তৃক পরিচালিত সেবাসমিতি এবং সাহায্য কেন্দ্র বাস্তবীভূত গবর্নমেন্টের নানা কার্য বিভাগ খুলিতে হইয়াছে। এবং পুরাতন বিভাগগুলির কার্যভাঙ্গিকা বাড়াটরা-মিতে হইয়াছে। কারণ শেষ পর্যন্ত গবর্নমেন্টই যুদ্ধের জন্য এবং দেশ বক্ষার জন্য দায়ী। স্বতরাং দেশের কোথাও কি উপায়ে জনগণ সেবাকার্য করিতেছেন তাহা গবর্নমেন্টের সর্ব্বথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত দেশের লোকেরা নানাপ্রকার সংবাদের জন্য গবর্নমেন্টের নিকট সর্ব্বথা পত্র লিখিয়া থাকে। অতি সস্তর উত্তর না পাইলে তাহার ভীত ও অস্থির হইয়া উঠে। যুদ্ধকালে এই অস্থিরতা, আশঙ্কা ও panic নিবারণ করা গবর্নমেন্টের একটা প্রধান কর্তব্য। নিম্নলিখিত বিষয়ে গবর্নমেন্ট জনসাধারণকে পরামর্শ ও সাহায্য অথবা সংবাদ দিতে সর্ব্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন :—

(১) আমদানী রপ্তানী, টাকার বাজার, মালালী, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি

(২) কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের অবস্থা

(৩) বাজার দর, অমলীকী নিয়োগ ইত্যাদি

(৪) কৃষি কার্যে যেচ্ছাসেবক নিয়োগ—  
নৃতন নৃতন জুমি প্রয়োগ ইত্যাদি

(৪) দেশজাত খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ ও ভবিষ্যৎ অবস্থা।

(৬) বীমা কার্খা—(ক) জাহাজবিভাগ  
(খ) মালবিভাগ।

(৭) সকল প্রকার বেঞ্চাসেবকগণের তালিকা ইত্যাদি।

(৮) সৈন্য ও নাবিক এবং তাহাদের পরিবারসমূহের অবস্থা।

### ১৬। ত্রিধা বিভক্ত পোলাও

পোলিশ জাতির নিত্য চরমপন্থী বশেষ-সেবকেরাও বাধীনতার স্বপ্ন প্রকাশভাবে প্রচার করিতে সাহস পান না। আজ ঘটনাক্রমে তাহাই পোলাওর অত্যাচারিণী-কর্তৃক অতি বিরূপভাবে পোলিশজাতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। পোলাওর অস্ট্রিয়ান প্রভুগণ বলিতেছেন “কনিয়াবাসী পোল, তোমরা তোমাদের অস্ট্রিয়াবাসী পোলদিগের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কনিয়ার বিক্রেতা হইও। তোমাদের বাধীনতা ও ঐক্য আমি প্রদান করিব।” পোলাওর জার্মান কর্তারাও তাহাই বলিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যে দিন রাষ্ট্র বড়লোক করিয়া পোলিশ জাতিকে তিনটুকরা করিয়া-ছিলেন আর তাহারা প্রত্যেকেই পোলাওর ঐক্য ও বাধীনতা ঘোষণা করিতে উত্তম। প্রত্যেকেই বলিতেছেন “তোমরা উঠিয়া আমার শত্রুর বিক্রেতা হইও।” অসম্ভবও সম্ভব এই উপায়েই ঘটনা থাকে। ভগবতের ইতিহাস আসাগোড়া। এইরূপ অসম্ভবের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ।

পোলাওর প্রতি কনিয়ার ভ্রাতৃত্ব ভেদিত। হস্ত সংরক্ষণ করা করিম। অস্ট্রিয়া তাহার পোল প্রজাতন্ত্রকে তাহাদের জাতীয় ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি রক্ষা করিতে

দিয়াছেন। এমনকি খানিকটা স্বরাষ্ট্র এবং স্বাধীনতাসনও অস্ট্রিয়ার বিধানের বিধিত পোলেয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কনিয়া এতদিন কি করিয়াছেন? কনিয়ার দাসনে পোল প্রজা তাহাদের মাতৃভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। আজ সেই কনিয়ার নিকট পোলেয়া বাধীনতার প্রস্তোভন পাইতেছে। কেবল তাহাই নহে—কনিয়া তাহার বিধিত পোলদিগের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার পোল প্রজা এবং জার্মানির পোল প্রজাগণকে সম্মিলিত করিয়া একটা ঐক্য-বিশিষ্ট পোল-রাষ্ট্র গড়িয়া দিবেন। এই বাধীন পোল-রাষ্ট্রের তিনি অভিভাবক যাত্রা থাকিবেন। পোলিশ জাতির সমাজ সভ্যতা সাহিত্য ধর্ম শিল্প শিক্ষা সকল বস্তই খাটি স্বদেশীভাবে চলিতে পারিবে। ইহা ১৫০ বৎসর হইতে পোলিশ জাতির স্বপ্ন রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কনিয়ার নিকট হইতে এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াই বিশেষ বিষমজনক।

কনিয়ার প্রস্তাব নিয়ে প্রবন্ধ হইতেছে :—  
“পোল জাতগণ,

এতদিন পরে তোমাদের পিতামহগণের স্বপ্ন কার্যে পরিণত হইবার সময় আসিয়াছে। বেড়শত বৎসর পূর্বে তোমরা এক অথও জাতি ছিলে। সেই সময়ে তোমাদিগকে তিন টুকরা করা হয় তথাপি তোমাদের জাতীয় চেতনা বিনষ্ট হয় নাই। তোমরা চিরকালই আশাবিত রহিয়াছ যে একদিন না একদিন তোমাদের জাতীয় জীবনের অকৃত্রিম সাধিত হইবে। তোমরা সর্বদাই ভাবিয়াছ যে, একদিন না একদিন তোমরা কনিয়ার সঙ্গে সাক্ষ্য সম্বন্ধে যুক্ত হইবে।

আজ আমরা জার্মান শত্রু নিশীড়ন করিবার

মানলে পোলাওর চতুঃসীমার ভিত্তর দিয়া কনসৈন্ত লইয়া যাইতেছি। এই কন সৈন্তগণ তোমাদিগকে তাহারদের সখ্য ও আত্মভাব জ্ঞাপন করিতেছে। এস তোমরা ইহাদের সঙ্গে মিলিত হও।

পোলিশ জাতির কন-সীমা, অস্ট্রিয়ান-সীমা, ও আর্থাগ-সীমা ধ্বংস হইয়া ঘাউক তাহার পরিবর্তে এক অথও পোলাওর নূতন চতুঃসীমা নির্ধারিত হউক। এস তোমাদিগকে পরাক্রান্ত কনিয়ার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দিতেছি। কনিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে নবপ্রসূত পোলজাতি তাহার ধর্ম, সাহিত্য ও স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনভাবে বিকাশ করিতে পারিবে। পোলজাতির জীবনে নূতন স্পন্দন দেখা দিবে।

প্রথম কনিয়া তোমাদিগকে তাহার সন্তেহ আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক বীর্য প্রদর্শন পূর্বক কনসৈন্তের সাহায্য করিতে অগ্রসর হও।

আজিকার প্রভাতে “নূতন তপন নূতন জীবন করিছে বপন” এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন” এসেছে সেদিন এসেছে।

নৃত্যরং কাল বিলম্ব না করিয়া তোমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর। বন্দ-পরম্পরাব্যাপী স্বার্থভ্যাগ এবং জীবন উৎসর্গের অন্তে তোমাদের উপর বীজধিষ্টেব বদল কর প্রসারিত হউক!”

কনিয়ার এই আয়ত্নণে ঐতিহাসিকগণ বিম্বিত হইবেন না। তাহার্য্য জানেন যে রণ-নীতির এবং রাষ্ট্র-নীতির পুরোহিতদিগের চতুঃলক্ষ্য নাই। দেহুশত বৎসরের ভিত্তর কনিয়া একদিনের জন্তও পোলকে মাহুকের মধ্যে গণ্য করেন নাই। তাহাতে কি হইল? আচ্ছ কনিয়া তাহার বার্ষিকির জন্ত এই

পদনলিত সমাজের পদলেহন করিবেন— ইহাই ত রাষ্ট্র-নীতি, ইহাই ত সাম্রাজ্য-নীতি। মধ্য ইউরোপের মানচিত্র দেখিলেই কনিয়ার এই আত্মভাবের কারণ বুঝা যাইবে। আর্থাগি আক্রমণ করিতে হইলে কনিয়াকে নিজের পোল প্রজার ভিত্তর দিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর আবার আর্থাগির পোল প্রজার ভিত্তর গিয়া পড়িতে হইবে। আর্থাগির পোল প্রজাদিগকে কনিয়া যদি শত্রুজ্ঞানে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাহার বিজিত পোল প্রজাবল্লভকে শাস্ত রাখিতে পারিবেন কি? কনিয়ার পোল-সমাজে বিদ্রোহ বাধিয়া উঠা ত এক মুহূর্তের কাব্য। কনিয়া যদি অস্ট্রিয়া আক্রমণ করিতে চাহেন তাহা হইলেও তাহাকে প্রথমে অস্ট্রিয়ার পোল প্রজাবল্লভের সঙ্গে নজি পরীক্ষা করিতে হইবে। এখানেও নিজ পোল প্রজাগণের বিদ্রোহ আশঙ্কা করা অতি স্বাভাবিক। কলতঃ, বিজিত পোলগণের বিদ্রোহ তহু কনিয়াই কনিয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের অন্তঃস্থ স্বভাবগণকে স্বাধীনতার আশা দিতেছেন। এই জন্তই তিনি আর্থাগির পোলদিগকে বলিতেছেন “তোমরা আর্থাগির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হও— আমার পোলদিগের সঙ্গে মিলিয়া যাও। তোমরা আর্থাগির ক্ষমতার তীত হইও না। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।” অস্ট্রিয়ার পোলগণকেও কনিয়া বলিতেছেন—“অস্ট্রিয়ার দাসত্ব ছিন্ন করিয়া তোমরা স্বাধীন হইয়া পড়। আমি তোমাদের ত্রিধাবিত্তক পোলজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দিব। এবং অস্ট্রিয়া ও আর্থাগির বিরুদ্ধে সর্বদা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।” সমগ্র পোলাও কনিয়ার সহায়তা না করিলে তিনি আর্থাগি

ও অট্টোয়ার বিক্রেতা নিত্যন্তই নতুন। কাজেই পোলাণ্ডের স্বাধীনতা ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করাই কশিয়ার সর্বপ্রথম চাল হইল। ইহার নাম Military necessity. ইহার উত্তরে উচ্চভাব, জাতীয়তার সন্ধান, স্বাধীনতার গৌরব প্রচার ইত্যাদি বিস্মৃত্যে নাই।

কশিয়ার এই কাণ্ড বেবিয়া ঐতিহাসিকেরা বিস্মিত হইবেন না। অথচ তাঁহার আবেগময় প্রেমালিঙ্গন হেনিয়া কেহই হাত্ত সংবরণ করিতেও পারিবেন না। কারণ পোলাণ্ডের বর্তমান দুর্ভাগ্যের মূল প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ কশিয়ারই দ্বারী। কশিয়ারই পোলাণ্ডকে বণ্ডা করিয়া লইবার কৌশল দেখাটয়া ছিলেন। তাঁহার দেখাযেখি অট্টোয়া এবং প্রুশিয়া (বর্তমান জার্মানির মূল) এই ভাগ বাটোয়ারায় যোগদান করেন। আর এক কথা এই ভাগবাটোয়ারা কাণ্ডে কশিয়ারই সর্বোপেক্ষা বেশী অংশ লাভ করিয়াছেন। সর্বদমেত তিনবার এই রাক্ষসী দীলা খটিয়াছিল। তিনবারই কশিয়ার হস্তায় “সিঃচের ভাগ” পড়িয়াছে।

অধিকন্তু তাহার পর ফেড্রপত বৎসর চলিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে অট্টোয়া পোলদিসকে অনেকাংশে স্থগী করিয়াছেন— তাহারের জাতীয়তা সন্ধান করিয়া চলিয়াছেন। জার্মানীও পোলদিসের শাসন-কার্য্যে উচ্চ সত্যতার পরিচয় দিয়াছেন—বিস্মিত পোলদিসের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু কশিয়া কোন বিষয়েই পোলাণ্ডের কৃতজ্ঞতাতাৎপর হইতে পারেন নাই। জার্মানি ও অট্টোয়ার পরাধীনতা অপেক্ষা কশিয়ার পরাধীনতাই এতদিন বিশেষরূপে ক্ষুব্ধবিহারক ছিল। আজ সেই কশিয়া বলিতেছেন— “পোল ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার বন্ধু—

তোমরা অট্টোয়া ও জার্মানির বিক্রেতা বিক্রোহী হও। অগ্রে সত্য সত্যতার বিচার হউক।”

কশিয়ার এই অত্যাচার কাহিনী ইংরাজী সাহিত্যে তিরকাল লিখিত হইয়াছে। পোলবীর কসিউস্কে (Kosciusko) দেশমাতার ঐক্যবিধান এবং স্বাধীনতা রক্ষা করলে যে বিকল প্রয়াস করিয়াছিলেন (১৭৯৩ খৃঃ অঃ) তাহা ইংরাজ কবিগণের চরম প্রশংসালোভ করিয়াছিল। ইংরাজেরা কসিউস্কেকে যেতপ সন্মান করিয়াছেন টমাসের স্বাধীনতা-প্রচারক ম্যান্লিনিকেও বোধ হয় ততদূর করেন নাই। বারম্বার বলিতেছেন—

“Kosciusko's name  
Might scatter fire through ice  
like Hecla's flame.”

টেনিসন কশিয়ার পোল-নীতি উল্লেখ করিয়া কাদিয়াছিলেন—

“Lord, how long shall these  
things be,

How long this icy hearted  
Muscovite  
Oppress the region?”

কবি ক্যাথেলও তাঁহার “Lines on Poland”এ লিখিয়াছেন (১৮০১ খৃঃ অঃ) :

“Poles ! with what indignation  
I endure

The half-pitying mouths that  
call you poor.

Poor ! is it England mocks you  
with her grief,

That hates, but dares not  
chide, the Imperial thief ?

States, quailing at the giant  
overgrown,  
Whom dauntless Poland grapples  
with alone ?  
No, ye are rich in fame even  
whilst ye bleed  
We cannot aid you—we are poor  
indeed."

এই 'icy hearted Muscovite' এবং 'Imperial thief' এক্ষণে পোলাণ্ডের জ্যোতিষ্মতা সান্নিধ্যেছেন! ইহা হাতাশ্রম সম্বন্ধে নাই—কিন্তু রাষ্ট্রদণ্ডনের সনাতন রীতির বিরোধী নয়।

পোলাণ্ডের এই অলঙ্ঘন ব্যাপার বুঝিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে হইবে। তাহার ১০১০ বৎসর পূর্বের কথক্কে হইতে করাসী সম্রাট চতুর্দশ সুইডেনের বিরোধে হইয়াছে। সেই প্রবল প্রতাপ নরপতির পরে স্থান অথবা শেনে কোন পরাক্রমশালী কণ্ঠবীরের বিজয় কাণ্ড অদৃষ্টিত হয় নাই। ইংল্যান্ড তখনও সামান্য একটি রাষ্ট্র মাত্র। তারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের প্রভাব অত্যন্তিত হয় নাই—সুইডেন ওয়াগেন হেলিং ইত্যাদি ধীরে ধীরে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন মাত্র। এই যুগে উনবিংশশতাব্দীর দুইটি বিশ্বশাস্ত্রাঘাত ভিত্তি স্থাপিত হইতেছিল—একটি রুশিয়া অপরটি প্রুশিয়া (জার্মানি)।

জার্মান-শাস্ত্রাঘাত ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা বীর-পুরুষ ফ্রেড্রিক দি গ্রেট (১৭৫০-১৭৯৬ খৃঃ অব্দ) প্রুশিয়ার চতুঃসীমা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। রুশিয়ার সম্রাট্রী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন (১৭৬২-১৮০০ খৃঃ অব্দ) তাহার পিতা রাষ্ট্রবীর

পিটার দি গ্রেটের (১৬৮২-১৭২৫ খৃঃ অব্দ) পন্থা অনুসরণ করিয়া উত্তর দাক্ষিণ ও পূর্ব-দিকে রুশশাস্ত্রাঘাতের বিস্তৃতিসাধন করিতেছিলেন। তখনকার ইংরেজেরা ফ্রেড্রিক এবং ক্যাথেরিনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। ইহারা যথেষ্টভাবে ইংরেজের মানচিত্র বহলাইতে আরম্ভ করিলেন। ইংল্যান্ডকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা ইংল্যান্ডের ছিল না। আমেরিকার স্বাধীনতা সেই সময়ে ইংরেজের হাত হইতে রক্ষা পাইতে ছিল। ফ্রান্স তখন বিরাট বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থায় এবং আন্তঃরাজ্য অশান্তিতে টলটলারমান। কাজেই ইউরোপের বৃহৎ ভূমি বলাইগা প্রাণিধারার এবং রুশ-রাণী ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অষ্ট্রিয়ারক বর্ধা করিয়া প্রুশিয়া বড় হইতে লাগিলেন—সুইডেন ও তুরস্ককে ঠাইয়া ক্যাথেরিন রুশশাস্ত্রাঘাতকে বার্টিক ও রুশশাস্ত্রাঘাতের সূত্রাভিষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন এই দুই দিগ্বিরোধী মধ্যস্থলে হস্তশাস্ত্রা পোলাণ্ড বেশ অবস্থিত ছিল। রুশিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে এবং প্রুশিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই রাষ্ট্রকে অন্তরায় বিবেচনা করিতেন। কাজেই এই মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) কে বিতর্ক করা আবশ্যিক বোধ হইয়াছিল।

এই সময়ে পোলাণ্ড একটি সুবৃহৎ রাষ্ট্র ছিল। আজকালকার ফ্রান্স, জার্মানি এবং অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা সেই রাষ্ট্র আকারে ক্ষুদ্র ছিল না। এতদ্ব্যতীত উত্তরে বার্টিক সাগর এই দেশের সুবৃহৎ বিস্তৃত উপকূল দ্বীপ করিত। দক্ষিণে ইহার সীমা প্রায় রুশ সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিত। লোক সংখ্যাও মন্দ ছিল না। কিন্তু বহুশতাব্দী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনি প্রবিলম্বিত

স্বার্থ রাজনৈতিক ঋণাত্মক ও দুর্বল করিতেছিলেন। রাষ্ট্রশাসনে কোন প্রকার সুখলা বা শান্তি ছিল না। ক্যাথেরিং এই ব্রহ্মোৎপাদে পোলাণ্ডের রাজা এবং রাষ্ট্রশাসন বিভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রিক তাবিলেন “দেখিতেছি—কশিয়া ক্রমশঃ প্রাশিয়াও দখল করিয়া বসিবে—অন্ততঃ আমার বাণ্টিক সাগরস্থিত জনপদ রক্ষা করিতে পারিব না।” এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার অস্বপ্নকল্প অষ্ট্রিয়ায় সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুইজনে মিলিয়া ক্যাথেরিংকে তহ নোহাই-লেন। কাজেই ক্যাথেরিং একাকী সব লুট করিতে পারিলেন না—অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়াও কিছু কিছু পাইলেন (১৭৭২ খৃঃ অবঃ)। এই বৎসর ভারতশাসনের ক্ষত্র ওয়ারেন রেগুলাস গবর্নর জেনারাল নিযুক্ত হন। Regulating Act জারি করিয়া বিলাতী পালারামেন্ট ভারতীয় রাজ্যগুলির তত্ত্বাবধান হুক করিলেন।

পোলাণ্ডের জনপদ বেশী আন্দোলন করিতে ছাড়িল না। তাঁহাদের কর্মবীরেরা তুরস্কের সাহায্য পাইলেন। তুরস্কের ক্ষমতা তখনও খুব বেশী। কিন্তু তুরস্কের সাহায্যে পোলিশদের উপকার ত হইলই না—কশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য জনপদ কাড়িয়া লইলেন। কশিয়ার এই বিভাগে ইয়োরোপ অন্তর্ভুক্ত হইল (১৭৯৩ খৃঃ অবঃ)।

পোল স্বদেশসেবকগণ তথাপি আশা ছাড়িলেন না। কসিউস্কো আন্দোলন হুক করিলেন এবং দুই একটা স্ক্রু জিতিলেন কিন্তু আবার তাঁহাদের বেশ লুট হইল। এইবার অষ্ট্রিয়া কোন ভাগ পাইলেন না। তাহার

পর কমিউনো দ্বিতীয় চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এই ব্যাঘাত কশিয়া, প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া সমবেত হইলেন। পোলাণ্ড ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডল হইতে অন্তর্ভুক্ত হইল—তিন ঘন দুর্জনকারী সমস্ত ভাগ করিয়া লইলেন (১৭৯৪)।

তিনবারের বটনকলে কশিয়া সর্ক্সাপেকা বেশী অংশ পাইল তাহার পর প্রাশিয়া—অষ্ট্রিয়া সর্ক্সাপেকা কম পাইলেন। রাকসী ক্যাথেরিং সুবিশাল পোলাণ্ডদেশের প্রধান ভাগ উদ্বলনা করিলেন। তুরস্ক আর পোলিশকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। এমিকে করাসী বিশ্রব আরম্ভ হইয়াছে। সেই আন্দোলনে সকলে একগুণে বাস্ত। কাজেই পোলাণ্ডের কপাল কিরিল না।

### ১৭। অসমজীবী-সমস্তা

প্রত্যেকে দেশের লোকেরা সাধারণতঃ দুই জেগীর ব্যবসায় ও বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। প্রথমতঃ দেশের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন জেলার মধ্যে আমদানী রপ্তানি হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিজের দেশ ছাড়িয়া দূর বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান হয়। প্রথম আদান প্রদানের নাম বহির্কর্মাণিয়া, দ্বিতীয় আদান প্রদানের নাম বহির্কর্মাণিয়া।

বর্তমান কালে কশিয়ার এবং আশেরিকার মুকুরাষ্ট্রে অসমজীবীরাই প্রধান। বহির্কর্মাণিয়া অতি সামান্য মাত্র। এই দুই দেশের লোকেরা বিদেশ হইতে বেশী মাল আনেনও না, বেশী মাল পাঠানও না। ব্যবসায় হিসাবে ইহারা আত্মকেন্দ্র ও আত্মনির্ভর। আত্ম-প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ—এই দুই দেশের বিশাল আয়তন ও বহুবিধ প্রাকৃতিক উপকরণ। ইহাদের লোক সংখ্যা অত্যধিক, কৃষিকাজ অথবা এবং শিল্পের



উপকরণও প্রচুর। মাহুঘের বাগা কিছু আবহক সবট মৃত্যুপ্রাপ্তবানীর এবং কপের অনেকট প্যারা যায়। কাজেই বহির্জাণিয়ার উপর ইহারা আদৌ নির্ভর করেন না। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশ এবং আন্তর্জাতিক দেশও ব্যবসায় হিসাবে এই প্রকার আদ্য-কেন্দ্র ও আবলম্বী।

কিন্তু হাইজলিও, বেলেজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ঘাস, পশুগাল, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশে মাহুঘের জীবন-ধারণোপযোগী সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় না। জলবায়ু কৃষি বন খনি ইত্যাদি হইতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ উৎপন্ন হয় না। কাজেই ইহারা বিদেশ হইতে আমদানীর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আবার এষ্ট আমদানীর বিনিময়ে যথোচিত মূল্য দিবার জন্য ইহাণিবন্ধকে বিদেশে বহু পরিমাণ মাল রপ্তানী করিতেও হয়। কাজেই বহির্জাণিয়া এই সকল দেশীয় জন-গণের জীবন স্বতন্ত্র। অন্তর্জাণিয়া ইহাদের অতি সামান্য মাত্র—ইহারা কোনরূপেই ব্যবসায় হিসাবে স্বাধীন ও আবলম্বী হইতে পারেন না। ইংরাজেরও সেই অবস্থা। বহির্জাণিয়ার তুলনায় ইংল্যাণ্ডে অন্তর্জাণিয়া নগণ্য বলিলে অতুক্তি হইবে না।

লড়াই বাধিলে এই অন্তর্জাণিয়া ও বহির্জাণিয়ার প্রভেদ এবং প্রভাব বিশেষ-রূপেই বুঝা যায়। আজ জার্মানিতে ও ইংল্যাণ্ডে লড়াই চলিতেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাণিজ্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট। অন্তর্জাণিয়া রক্ষা করা তত কঠিন নহে। ব্যাঙগুলিকে রক্ষা করিতে পারিলে মহা-জনেরা কারবার চলাইবার জন্য মূলধন

পাইতে পারেন। তখন সহজেই গাড়ী চলাইয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে মাল সরবরাহ করা সম্ভব। ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ রক্ষার সকল প্রকার দাড়ি মইয়া টাকার ব্যাজার খোলসা করিয়া দিয়াছেন। কাজেই দেশের ভিতর টাকার আদান প্রদান অনেকটা সহজ ও মামুলি হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ইংরাজের অন্তর্জাণিয়া বণ্যরাতি চলিতে পারিতেছে।

কিন্তু অন্তর্জাণিয়া ইংরাজের ত খর্ববায় মধোই নহে—ইংরাজের ধন ও প্রাণ সবই বহির্জাণিয়ার উপর নির্ভর করে। এই বহির্জাণিয়া রক্ষার জন্যই আজ সকলে চিন্তিত। বিদেশ হইতে ইংল্যাণ্ডে প্রাধানতঃ দুই প্রকার মাল আমদানী হইয়া থাকে—খাদ্য দ্রব্য এবং শিল্পের ক্রিয়াক্রান্ত উপকরণ। বলা বাহুল্য খাদ্য দ্রব্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার অবশ্যস্বাভাবী। আর, ক্রিয়াক্রান্ত উপকরণের অভাবে ইংরাজের কল কারখানা-গুলি সবই বন্ধ থাকিবে—তাগার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী কর্মহীন হইয়া রাতার দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া রপ্তানীর কথা। তুলার মতা, তুলার কাপড়, পশমের বস্ত্র কয়লা ইত্যাদির কারবারে ইংরাজের সর্বাপেক্ষা অধিক টাকা ও লোকজন ঘাটে। এই কারবারগুলি এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিলে সমস্ত দেশের শিল্পী, মজুর ও কুলী মহলে অনশন ও অনর্ধশন এবং অনাশ্রি ও বিব্রোহ ঘটিতে বাধ্য। সুতরাং আমদানীর পথ অবরুদ্ধ হইলে ইংরাজ শ্রমজীবী সমাজে যে কণ্ঠাভাব এবং রোজগারাতাব ঘটে রপ্তানীর উপায় বন্ধ হইলে শ্রমজীবী সমাজে বিপদ তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ও পোঁচ-নীর আকারে দেখা দেয়। বিদেশীয় ব্যবসায়-

বাণিজ্যের উপর প্রভাবতঃ ইংরাজ-জাতির  
খাদ্যস্বাদ সংগ্রহ এবং বন্যপংখ্য নির্তর করে ;  
ষিড়ীযন্তঃ ইংরাজ বনিগণের ঘটনপথ্য নির্তর  
করে ; তৃতীয়তঃ ইংরাজ মজুরগণের জীবন  
নির্তর করে। এই মজুর সমস্তাই ইংরাজ  
রাষ্ট্রে সর্বাঙ্গপেক্ষা ভীষণ সমস্ত।

ইংরাজের আমদানী সম্প্রতি আমেরিকা,  
নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশ হইতে সহজেই  
চলিতেছে। এতদুপ সত্ত্বেও চলিবে কি না সেই  
সম্বন্ধে এখনকার মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে,  
এবং কলকারখানার মালিকেরা কারবার  
মূল্যে বা বন্ধ করিতে প্রস্তুত হন। যতদিন  
ইংরাজ-রপ্তানী আটলান্টিক মহাসাগরে  
একাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ততদিন  
এই আমদানি চলিতে থাকিবে। কিন্তু  
আমদানী হইলেই কি হইবে? কৃষিজাত  
উপকরণসমূহ না হয় কল কারখানার মাল  
শ্রমাদে আদিয়া জমা হইল। কিন্তু এই  
উপকরণগুলি ব্যবহার করিয়া শিল্প সামগ্রী  
প্রস্তুত করা হইতে পারিবে কি? কাপড়  
চোপড়, এমিন, লোহালকড়, যন্ত্র ইত্যাদি  
প্রস্তুত করিয়া কারখানার মজুর করিলে লাভ  
হইবে না। এগুলি বাজারে বেচিতে পারা  
চাই—অর্থাৎ রপ্তানী করিতে পারা আবশ্যক।  
কিন্তু ইংরাজের বাজার প্রধানতঃ দুইটি—প্রথম  
ভারতবর্ষ, দ্বিতীয়, ইয়োয়োগের দেশসমূহ।  
এই বাজারে মালগুলি পাঠাইতে না পারিলে  
এবং পাঠাইবার সুযোগ না থাকিলে ইংরাজ  
মহাজনেরা কখনই আমেরিকা বা নীউ-  
জিল্যান্ড হইতে শিল্পের উপকরণ ক্রয় করিবেন  
না। এই বাজারগুলি খোলা না থাকিলে  
ইংরাজ ব্যবসাদারেরা তাঁহাদের শিল্প-কার-  
খানায় মাল প্রস্তুত করিবেন না। অর্থাৎ  
ইয়োয়োগ এবং ভারতবর্ষে আশিবার পথ

সকলপ্রকার অবাধীন না করিতে পারিলে  
ইংরাজের কাস্ট্রী ও কারখানাজাল খালি  
পড়িয়া থাকিবে—কাজেই প্রমজীবী সমস্তের  
ইংরাজরাষ্ট্র বহির হইয়া পড়িবেন।

যে সকল দেশের লোকেরা বহির্বাণিজ্যের  
উপর নির্ভর করেন, লড়াইয়ের সময়ে তাঁহা-  
দের সর্বাঙ্গপেক্ষা কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়।  
কিন্তু যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত  
দ্রব্য শিল্পের উপকরণ অতি সহজেই পাওয়া  
যায়, এবং যাহাদের নরনারীগণের সংখ্যা  
কোটি কোটি তাহারা যুদ্ধের সময়ে কিছুমাত্র  
বিব্রত হইয়া পড়ে না—তাহারা অতি সহজেই  
লড়াই চালাইতে পারে।

ইংরাজের পক্ষে লড়াই চালান এই জন্যই  
অতি কঠিন ও কষ্টকর। বর্তমান সময়ে  
ইংল্যান্ড ইয়োয়োগীয় রাষ্ট্রসমূহের বাজারে  
মাল পাঠাইতে পারিতেছেন না। কাজেই  
বহু কারবার বন্ধ রহিয়াছে অসংখ্য প্রমজীবীর  
কর্মজীবন ঘটিয়াছে। কিন্তু ইয়োয়োগীয়  
বাজার বন্ধ থাকিলে ইংরাজের বিপদ মাত্রাণ্ডক  
হইবে না। কারণ ইংরাজের সর্বাঙ্গপেক্ষা  
বড়বাজার ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বাজার  
যতদিন ইংরাজের হস্তগত ততদিন রপ্তানী  
বা মাল বেচা সম্বন্ধে ইংরাজ চিন্তিত নহেন।  
ইয়োয়োগীয় বাজার বন্ধ থাকায় যে কতি  
হইতেছে তাহা সামান্য বেশী কঠিন হইবে  
না। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজার যদি কোন  
মতে ইংরাজের হাতছাড়া হইয়া যায় তাহা  
হইলেই ইংল্যান্ডের সর্বনাশ। ভারতের  
বাজার মপলে রাখিবার জন্যই ইংরাজের  
ভারত শাসন অত্যাশঙ্কক। ভারতসাম্রাজ্য  
না থাকিলে ইংরাজজাতির কারবারগুলি  
বন্ধ হইয়া যাইবে—প্রমজীবীমূল্য ভাঙে যাত্রা  
যাইবে। এই জন্য বর্তমান মুক্কেত্রে

ভারতবর্ষের বাজার নিয়োগ রাখিবার চেষ্টাই ইংরাজ রণনীতির সর্বাঙ্গেক্ষা প্রধান সমস্ত। প্রমজ্জ-বি-সমস্তা এবং ভারত সমস্তা ইংরাজের পক্ষে একটি জিনিষ।

যুদ্ধ বাধিবামাত্র ইংল্যান্ডে অনন্যে সেবা-সমিতি, সাহায্যসমিতি, পরোপকার সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। তবে হৃৎপে গোলাঘালে যে দাড়া পারিতেছে সে সেইরূপ সাহায্য করিতেছে। অল্প টাকা পয়সা উঠিতেছে। ক্রমশঃ সমস্তা গাড়াইল—কোন প্রকার লোকের উপকার করা বাইবে? কোন ধরনের উপকার করা বাইবে? নানা কেন্দ্রে টাকা উঠিতেছে ঘেঁষিমা ইংল্যান্ডের দরিদ্র কর্মগীন অকর্মণ্য বা গুস্তার দল পালে পালে তীর্থের কাকের মত নগরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের এক মহা হুযোগ উপস্থিত। তাহাদের আশা—কিছু না কিছু ধান ভাগ্যে জুটিবেই! এদিকে বাহারা টাকা দিতেছেন তাঁহারা ত মেন-সেবার নামে ধনভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন—টাকার দ্বারা কি করা হইবে কিছুই জানেন না। বাহারা বেজ্ঞাসেবক হইয়া কাণ্ডসংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারাও বুঝেন না—টাকা দিয়া কি করা কর্তব্য। লড়াইয়ের হৃৎপে কতকগুলি ধনভাণ্ডার খোলা হইয়াছে মাত্র। অবশ্য—যে সকল সৈন্য ও নাবিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তাহাদের রোগ শোক এবং পরিবারের জন্য অর্থস্বায় সর্বাঙ্গপ্রদেই করা হইবে। তাহার উপর যে টাকা বাচিবে তাহা খরচ করিবার প্রণালী সম্বন্ধেই আলোচনা আবশ্যক।

যুদ্ধের সময়ে ২০০,০০০ সৈনিক পরিবারস্থ নরনারীর সেবা প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। এই দুই কোটি টাকা তুলিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছিল বর্ধমান

বিশদের সময়ে রাণী তাহার বৃত্তান্ত প্রচার করিয়াছেন :—

“I take this opportunity of registering my grateful thanks to the Press generally throughout the country, India, the colonies and abroad, who have so kindly supported the Association in the past to the public who have so liberally provided us with funds; to the employers of labour and working men, who render similar circumstances, set aside part of their weekly earnings; and to the ladies and gentlemen, over 12,000, who have voluntarily devoted so much time and labour to carry on this work.”

যুদ্ধকালে সৈনিক বিভাগের লোকজন এবং তাহাদের পরিবারের অন্নবস্ত্র ও স্বচ্ছন্দ্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা স্বদেশ-সেবকগণের প্রধান কর্তব্য সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই সময়ে Civilian বা “সাধারণ” লোকজনের দ্বংধ কইও যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। কারবার বন্ধ হইবার ফলে কর্মগাণবই তাহার প্রধান কারণ। যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ সমাজে এই চরবদ্বাই বেশী। এইজন্য কর্মগাণবই নিবারণ করিবার লক্ষ্য বিচক্ষণ ইংরাজেরা প্রথম হইতেই লাগিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধকালে অর্থনীতিবিদগণের দ্বংধ নিবারণ দুই উপায়ে করা বাইতে পারে। প্রথমতঃ বাহাতে কর্মগাণবই উপস্থিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে দ্বংধ উৎপন্নই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ দ্বংধ নিবারণের লক্ষ্য চেষ্টা করা অনাবশ্যক হয়। দ্বিতীয়তঃ, কর্মগাণবই যদি

সভ্যসভাই ঘটিয়া থাকে তখন তাহারে কুফল—  
অনাহাৰ, চরিত্রহানি, অকালদা, অশান্তি ও  
বিজ্ঞোভ—ইত্যাদি হইতে দেশবাসীদিগকে  
বক্ষা করা প্রয়োজন। ইংরাজ কর্তব্যবীরগণের  
মতে প্রথম উপায় অবলম্বন করাই সৰ্ব্বোপায়  
কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত নতুন নতুন কারবার খুলিয়া  
এবং পুরাতন কারবারগুলি পুরানমে  
চালাইয়া শ্রমজীবী মজুরগণকে কাজে  
লাগাইয়া রাখিবার আয়োজন অত্যাৱশ্যক।  
তাহা হইলে কর্তব্যভাব এবং কর্তব্যভাবজনিত  
দুঃখ উপস্থিত হইতেই পারিবে না। হুতরায়  
দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবার প্রয়োজনই  
হইবে না। কিন্তু ইয়োরোপীয় ব্যাকার যতক্ষণ  
বন্ধ রহিয়াছে ততক্ষণ ইংল্যান্ডের বহু কারবার  
বন্ধ থাকিবেই—হুতরায় তাহাদের মজুরেরা  
কৰ্ম্মভাবে কষ্ট পাইবেই। তাহার উপর যদি  
কেনে কারণে ভারত-ব্যাকার ইংরাজের পক্ষে  
হোলা না থাকে তাহা হইলে অগণ্য নয়নাগ্নী  
অনাধারে মরিবে। এই সকল লোককে  
ত্যাগাত্যাগি নতুন কোন শিল্প কর্ণে নিযুক্ত  
করা অসম্ভব; কারণ নতুন নতুন শিল্প অত  
কম সময়ের ভিতর গড়িয়া তোলা যায় না।  
কিন্তু এই অসংখ্য লোকের কর্তব্যভাব ও অর্থ-  
ভাব ঘাটতিতে বাধ্য—এইরূপ বিবেচনা করা  
ইংরাজ স্বদেশসেৱকগণের পক্ষে আত্মবিক।

দেখা গেল যে, শ্রমজীবী-সমাজের কর্তব্য-  
ভাবজনিত দুঃখ নিবারণের পূর্বে কর্তব্যভাবটা  
নিবারণ করাই আবশ্যক। ইংরাজেরা  
কর্তব্যভাব নিবারণের দ্রুত লাগিয়া গিয়াছেন।  
এতদ্ব্যতীত নতুন নতুন কারবার খোলা হইতেছে  
—এবং কোন কোন পুরাতন কারবারে বেশী  
লোক লাগান হইতেছে। কারবার খোলা  
বলিলেই কারবার খোলা যায় না। কোন  
কারবারে খুলিব? কোন কারবারে বেশী

লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে? কোন  
কারবারে ভবিষ্যতের উপকার হইবে? এই  
সকল কথা আলোচনা করা নিত্য আবশ্যক।  
হজুগে পড়িয়া যে কোন একটা ব্যবসায়  
খুলিয়া দিলে কোন লাভই হইবে না।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধকালে ইংরাজ বহি-  
রীকরণের উপযোগী কোন কারবারই খুলিতে  
পারেন না। তাহা পারিলে কর্তব্যভাবই ঘটিত  
না। কাজেই অন্তরীকরণের দ্রুতই একশ্রেণী  
সকল প্রকার শ্রমজীবী নিযুক্ত করা হইতেছে।  
স্বদেশের অভাব ও প্রয়োজন বিচার করিয়া  
ব্যৱসায়েরা এবং গবৰ্ণমেন্ট কতকগুলি কার-  
বারের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।  
অধিক্যমই বাড়ী ঘর হাওয়া ঘাট বাগান মাঠ  
তৈয়ারী করা বিভাগ বা Public Works  
এর অন্তর্গত। বিদ্যাতের Fabian Society  
নামক বিখ্যাত শ্রমজীবী-স্বার্থপ্রচারিণী সভা  
একটা ইতিকর্তব্যতার তালিকা দিয়াছেন।  
নিচে কিরূপে উদ্ধৃত হইল :—

1. Keep up the volume of  
Employment

2. Increase all Municipal Enter-  
prises Don't think yet of "relief  
works," think of the following

(i) Elementary schools, pro-  
vided and non-provided, that need  
to be enlarged, remodelled for  
smaller class rooms, improved or  
built (don't forget equipment and  
school furniture).

(ii) Additional secondary  
schools, training colleges, hostels,  
domestic economy centres, techni-  
cal institutes & that are required

(iii) Further buildings and equipment for University Colleges, Science laboratories &c.

(iv) Roads, bridges, foot-paths etc. that need bringing up to the standard of the Road Board

(v) Tramways called for to complete the local system :

(vi) Housing enterprises, including the improvement of slum areas the erection of additional cottages etc.

(vii) Hospitals for all diseases

(viii) Street improvements, paving works, main-drainage schemes, extensions of the water supply or of the gas and electricity works and plant.

(ix) Afforestation of the municipal water catchment area or other waste lands;

(x) Additional parks and open spaces—now is the time to move to lay them out.

(xi) Waste lands, whether in public or private ownership, for the reclamation or planting of which the Development Commission might be asked for grants.

(xii) Harbour improvements, improvement of sea walls and other coast defences, prevention of floods &c.

এই সকল প্রকার কার্যে প্রমজীৱী নিয়োগের অল্প গবর্ণমেন্ট ১৫০ কোটি টাকা মজুত রাখিয়াছেন ! ইংরাজের পক্ষে লড়াই চালান সংলগ্ন ব্যাপার নয় !! যে সময়ে যুদ্ধ চলিতে থাকিবে সেই সময়ে জনসাধারণকে শান্তিবিধান ও অন্ন-সংস্থান করিবার অল্পই গবর্ণমেন্টকে এই পরিমাণ অর্থব্যয়ের সাধ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। "সাময়িক" শোক-অনের খোরাক পোষাক এবং পরিবার পালন করিতে পারিলেই যুদ্ধে অগ্রসর করা হাতের পাচ নয়। লক্ষ লক্ষ "সাধারণের" ঘরে হাড়ি চড়াইবার আয়োজন করাও নিত্য কৰ্তব্য। স্বত্তরাং লড়াইয়ের খরচ বলিলে প্রমজীৱী নিয়োগের খরচও গণনা করিতে হইবে।

যাহা হউক লড়াইয়ের সময়ে দেশের কৰ্মা-গার নিবারণ করা সৰ্বপ্রধান কৰ্তব্য। যে স্থলে কৰ্মাতার নিবারণ করা অসম্ভব সেই স্থলে দুঃখীদিগকে কাচা টাকা ও খাদ্য প্রদান করিতেই হইবে। এই দান সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক। তাহা না হইলে আবার মহা অনর্থ ঘটতে পারে। এ বিষয়ে বিলাতী মত—

"Don't give food or doles of money until you are face to face with actual want—and even then don't advertise it ! Rather hire people to do some work—that you want done—invent a service if you have it not—without any assumption of giving relief."

যাতারা দান-ভাতার খুলিয়া বসিয়াছেন কৰ্মহীন যজ্ঞবেরা যেন এ কথা শুনিতে না পারে।  
বিনয়কুমার সরকার।

## গুরুগৃহ

আমার ভূমি আছে, আমাকে চাষ করিতে হইবে; কিন্তু ভূমির অবস্থা সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, পূৰ্ণসজ্জিত উপকরণস্বত্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, পূৰ্ণপ্রচলিত ও পরীক্ষিত প্রণালীর কথা না ভাবিয়া, এবং নিজের বীজের সাহায্য বিচার না করিয়া যদি কেবল অপর চাষীকে সৰ্ব্বপ্রকারে অহুকরণ করিয়াই চাষে লাগিয়া যাই, তাহা হইলে অনেক সময়েই গোলাগুলি পূৰ্ণ না চইয়া দেখিতে দেখিতে রিক্ত হইয়া উঠে। ভূমি-অহুলায়ে বা বীজ-অহুলায়ে অস্ত্রে যখন জল বাহির করিয়া দেয়, আমাকে তখন হস্ত জল লইয়া আসিতে হইবে। কোন চাষী বড় বড় এতিন চালাইয়া চাষ করিতেছে দেখিয়া আমিও যদি সেই আশায় নিজের বল চইটাকে চালাইয়া ভূমি চাষ না করি, তাহা হইলে শত সমুদ্র চওরা ত জ্বরের কথা,— হুই না, বরং বা কিছু পুঁজি থাকে তাহাও দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাব। আমরা শিব পড়িতে বাঁধর পড়িয়া তুলি! অদ্বত কলাইতে বিব কলাইয়া বসি! বিভ্রাজ্ঞমকে আমাদের চোখ বাঁধিয়া গিয়াছে, আমরা যথাযথরূপে বস্তুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কিয়ৎকাল হইতে ভারতের সমস্ত লক্ষ্য কেবলই কবিবলয় সমুদ্রের এই গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশ্চর্যবিস্মত হইয়া আশ্চ-সত্যকে অস্বীকার করিয়া অন্তকে অহুকরণ করিয়াই মনে করিতেছি আমরা চরিতার্থ হইলাম। আর যদি তাহাতে কোনোরূপ ত্রুটি থাকে, তাহা হইলেই মনে হয় আমরা রাসতলে গিয়াছি।

ভারতভূমি সহসা আকাশ হইতে পড়ে নাই, বা সমুদ্র হইতেও উঠে নাই। ইহা আশ্চর্য্যম বা নিকোবর দ্বীপ নহে, অবশ্য এই কয়েক শত বৎসর পূর্বে কোন বলয়ল আদিদ্বীপ ইহাকে আবিষ্কার করিয়া দেখে নাই যে, ইহা বস্ত-বর্করে অধুদিত রহিয়াছে। ইংরাজ-শাসন সময়েও ইহা জন্মে নাই, বা মুসলমান-আমলেও ইহার উৎপত্তি হয় নাই। যতদূর পারা যায়, যতদূর সম্ভব, ইতিহাস হইতে ইংরাজ ও মুসলমান রাজ্যের কথা-পূৰ্ণ পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিরা অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উন্টাইয়া পড়িয়া যাও, ভারতভূমির স্বরূপ দেখিতে পাইবে। তাহার উজ্জল নৃষ্টি তোমার নয়ন-গোচর হইবে। ভূমি দিবা-চন্দ্রে দেখিতে পাইবে, যখন পশ্চিমী প্রভাতের সমুদ্র পাইবার এখানে কোন সম্ভাবনা ছিল না, যখন তাহার অম্মগ্রহণই হয় নাই, সেই অম্মবস্তীর কালে ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পূৰ্ণত লক্ষ্যন করিয়াছে, নৌ পরিচালনা করিয়াছে, সমুদ্র উত্তরণ করিয়াছে, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, দেশা চালাইয়া, দেশ অর করিয়াছে, সৌখ নির্মাণ করিয়াছে, সেতু বন্ধন করিয়াছে, সাহিত্য আলোচনা করিয়াছে, বিজ্ঞা বিস্তার করিয়াছে, ধর্ম প্রচার করিয়াছে, শাস্তি স্থাপন করিয়াছে। যেনে আদর্শ রাজা আদর্শ প্রজা অদ্বিয়াছে, আদর্শ পুত্র-জননশে আদর্শ পৌর জননশেবা “উরে পুতে নজেন্দা”—বৃকের উপর ছেলে নাচাইয়া দরমা খুলিয়া পরম লুখ-শান্তিতে নিকষেণে রাজি বাপন করিয়াছে।

বর্ষভিত্তিক, ঈশ্বরভিত্তিক, সৃষ্টিভিত্তিক আলোচনা করি-  
 য়াছে; রাজনীতি, সমাজনীতি অধ্যয়ন করি-  
 য়াছে; বাস্তববিজ্ঞা, পূর্ববিজ্ঞা, শিল্পবিজ্ঞা, কৃষি-  
 বিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা, রসবিজ্ঞা, খাত-  
 বিজ্ঞা, আবহুবিজ্ঞা, বস্তুবিজ্ঞা, জ্যোতির্বিজ্ঞা  
 ইত্যাদি কত কত বিজ্ঞার ভাণ্ডার খান্ড  
 করিয়া নোকে প্রচার করিয়া গিয়াছে; বর্ত-  
 মান বিজ্ঞানবৃক্ষের এত উৎকোণ-আয়োজনের,  
 এত বহু উপকরণসমৃদ্ধির কোন সুযোগ লাভ  
 না করিয়া কত লক্ষ-লক্ষতর বিষয় চিন্তা  
 করিয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন পবিত্র  
 গ্রন্থসমূহের এক একটি পৃষ্ঠা ইহার সাক্ষ্য  
 প্রদান করিবার জন্য এখনো টিকিয়া আছে  
 এবং “বাবলুসদিবাকরো” সেইরূপ থাকিবে।  
 পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির অনালোকিত কালে  
 ভারত কি প্রকারে এই সকল বিজ্ঞার  
 গভীরভাবে আলোচনা ও প্রচার করিল?  
 কোন ইন্সল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-  
 গণকে অব্যয়ন করা হইত? কোন ইংরাজী,  
 ফরাসী বা ফ্রেঞ্চ ভাষার শিক্ষা প্রদান করিত?  
 কি প্রণালীতে ছাত্রগণকে পরিচালিত করিত  
 বাহ্যতে তাহার। হুস-সবল-উৎসাহী থাকিয়া  
 দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিত  
 “পত্রেম শ্রমঃ শতম্, জীবেন শ্রমঃ শতম্।”  
 কি প্রকারে তাহাঙ্গিকে চিত্ত ও মেহে  
 উত্তরভূই তেজস্বী করিয়া জীবন-সংগ্রামের  
 উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিত? তাহার  
 বিভাধিসমূহের সকলেই কি জটিলর ওপস  
 হইয়া আরণ্যকবৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক বাস  
 করিতেন? সকলেই কি লঙ্ঘন-লঙ্ঘেই সন্ধ্যাসী  
 হইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন? আরণ্যক,  
 মৌনী, সন্ধ্যাসী তাপসের প্রয়োজন আছে,  
 বাহ্যারা ইহা লঙ্ঘন না করেন, না বুকুন, কিন্তু  
 সেই সকল ছাত্রের অধিকাংশই কি আদর্শ

পৌর-জ্ঞানপন্থের জীবন ধাপন করিতেন না?  
 ভারতের শিক্ষার আদর্শ কি ছিল? কি  
 উপায়ে সে উচ্চ-উচ্চতম আদর্শভাবে  
 লক্ষ্যবিষয়েই মনন করিয়া দৈবভাবে  
 অল্পশ্রাণিত করিয়াছিল। ভোগকে সংযত  
 করিয়া ত্যাগকে বরণ করিয়াছিল? প্রেয়কে  
 পরিত্যাগ করিয়া জ্যেয়কে আলিঙ্গন করিয়া-  
 ছিল? কোন্ শিক্ষার প্রভাবে ইহার  
 সম্ভাবনা? বৃত্তিতে পারিয়াছিল যে, ঈশ্বর  
 নামে, ধর্ম্যনামে, তপস্তু নামে, সত্যন নামে,  
 তত্ত্বন নামে সত্য-সত্য এক একটা জিনিস  
 আছে, যাহা তাহাঙ্গিকে জীবনের ব্রত  
 করিয়া, অল্পসরণ করিয়া চলিতে হইবে,  
 এবং বস্তুতঃ তাহার। সেইরূপই করিবার  
 যোগ্যতা ও সামর্থ্য লাভ করিতে পারিত?

শিক্ষার সোড়াত এই সকল কথা  
 পর্যালোচনা না করিয়া আমরা দিগ্বিদিশ-  
 জ্ঞানমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি, প্রবাহে গা  
 ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি। কোথায়  
 দিয়া উপস্থিত হইব বা হইতেছি তাহা  
 আমাদের জানা নাই, অথবা মোহবিজ্ঞান  
 চিত্তে তাহা জানিয়াও আমরা জানিতেছি না।

প্রতিদিন ১০টা ৪টা ইন্সল-কলেজে পড়িয়া,  
 বছরে বছরে ছোট বড় নানারূপ পরীক্ষা  
 পাশ করিয়া হাজার হাজার ছেলে সংসারে  
 প্রবেশ করিতেছে। প্রতি বৎসরই ইহাদের  
 সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহারা  
 প্রায়ই অন্ধর পরিচয় ও কেবলমাত্র অর্থো-  
 পার্থক্যের কণ্ডকগুলি সত্য-মিথ্যা কোমল  
 জ্ঞান ভিন্ন বস্তুতঃ কিছু নিশ্চিতহে কি?  
 আমি বিভ্রান্ত। কি ইহারা ঐ শিক্ষার  
 প্রভাবে স্মৃতিশক্তি ত্যাগ করিয়া সরল হইতেছে  
 না সরলতা ত্যাগ করিয়া স্মৃতিশক্তি হইতেছে,  
 তাহার। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্যকে আদর

করিতেছে, না সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যাকে প্রসন্ন হইতেছে? তাহার নাটকতা ত্যাগ করিয়া আত্মিক হইতেছে, না আত্মিকতা হারাইয়া নাটক চইয়া পড়িতেছে? উচ্ছৃংখলতা ত্যাগ করিয়া সংযত হইতেছে, না সংযম পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃংখল হইয়া উঠিতেছে? অধিক আর কত বলিব! তাহার দেশের অশান্তি দূর করিয়া, যৌবরাজি পরিত্যাগ করিয়া, সর্বত্র শান্তিস্থাপন করিতেছে ও বিবাহে বৈধী তাবনা করিতেছে অথবা অশান্তি উৎপাদন করিয়া বৈরতাবনা করিতেছে? আর এতটি প্রশ্ন করিব। যে দেশের শিক্ষার আদর্শে আমাদের বাগবেরা শিক্ষা করিতেছে, সেই দেশেরই জনগণ ভগ্নস্ত শান্তিস্থাপন করিয়া বিবাহাসীর সম্বন্ধে বৈধী তাবনা করিতেছে, অথবা অশান্তি উৎপাদন করিয়া বৈরতচিত্ত করিতেছে? মহাত্মা উপাযে, সে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের ধর্ম উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, প্রতিদিনই নির্জায়া নির্জায়া, ইচ্ছলে ইচ্ছলে কলেজে কলেজে তাচা অধ্যয়ন করিয়া, সে দেশের অবিবাসীরা নিজেরের মধ্যে শান্তি স্থাপন ত করিতেই পারিল না, অশান্তির আগুন জালিয়া বসিল কেন? ঐরূপ ধর্মোদ্ভূত-ধারার দ্বারা হইয়াও তাহারি এতদূর মলিন হইয়া উঠিল কেন—বাহাতে দুঃসংসার, ব্যর্থতাপ্রাপ্তক, আসনাদি প্রদানে সংসারের কথা দূরে থাক, সওহতে বহিষ্কৃত করিবার ভয় সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে?—বাহাতে তাহারি দেশান্তরের জনগণকে দারুণ বলিয়ারি আর বীকার করিতে প্রস্তুত নহে? পথে পথের জন হয়, বিশেষ বিশেষ মহামতিগণের কথা স্মরণ। কিন্তু সমগ্র ভগ্নস্ত অশান্তি বলিয়া পরিচিত মাকিন দুস্কৃত এই গতি

হইল কেন? কেননা করিয়া এই আদর্শ রাজসংসার প্রকটভাষে হিন্দুবিহারবিধি (Hindu Exclusion Bill) প্রণয়ন করিতে পারিল? কেননা করিয়া তাহাতে লিখিতে পারিল যে, "All Asiatic labourers, all idiots, imbeciles, feeble-minded persons?" কেননা করিয়া তাহা এই বিধানতাবীর সময়েও হিন্দু বিচারবিধানের সেখানে দিয়া বিভা-অর্জনের পথ বন্ধ করিয়া দিবার ভয় উদ্বাহ হইয়াছে? কত আর উল্লেখ করিতে হইবে? দক্ষিণ আফ্রিকা, ভোম্বার, কেনেডা ও ব্রিটিশ কলোনিয়ার হিন্দুবিহারের কথা কোন সংসার-পত্র পঠকের অজ্ঞাত রহিয়াছে? ইংরাজ, না পিনাচ, না পণ্ডর ব্যবহার? শিক্ষার এই আদর্শইত ভারতে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আদর্শে পরিচালিত হইয়া তাহার শিক্ষার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহাদেরই যখন এই পরিণাম, তখন ঐ পথে প্রচলিত ভারতসম্প্রদায়ের ভিন্ন পরিণাম হইবে কেন? আবার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, ঐ মহামতিগণের ধর্মোদ্ভূত কি এইরূপ ব্যবহারের কোন উপদেশ দেওয়া আছে? অথবা তাহারি ধর্মোদ্ভূত অধ্যয়ন করেন না? খ্রীষ্টীয় সমাজের ন্যায় আর কোন সমাজে ধর্মোদ্ভূতের এত দৃষ্টি, এত বিচিহ্ন, এত প্রকৃত সংসার, বিতরণ ও বিক্রয় ত দেখা যায় না। তবুও এ অসামঞ্জস্য কেন? চিন্তা ও কর্মের সম্বন্ধ ইহাদের মিল নাই কেন? ইহারা যদি সু-নির্লোভ অজ্ঞানদের থাকিতেন, তাহা হইলে এ প্রশ্ন উঠাইতাম না; কিন্তু তাহা ত নহে, ইহারা যে বিজ্ঞানসম্মত অগ্রা আসন লাভ করিয়া থাকেন। কেন তবে ইহাদের এই লশা হইল? ভারত সমাজেরাও কি ঐ আদর্শে



পঠিত হইবে? তাহার কি Anglicized Americanized চট্টা উঠিবে? তাহা যদি হয়, তবে ইংলণ্ডের “মহতী বিনষ্ট্রিঃ” অনুবর্তিনী ভারত নিজে যেন্দু পাচ্ছাতা অর্শন ও পাচ্ছাতা ভাব কর্তৃক গ্রন্থ-জীর্ণ না হইয়া পড়ে; উহা-কেই গ্রন্থ-জীর্ণ করিতে চাইবে। চিরকালই ইহা ঐক্য করিয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে যাহা হ, যাহা কল্যাণ তন্মাত্র লইয়া অসমিষ্টকে ‘নিম্নোভিতালককং’ ভাগ করিতে হইবে। চিন্তার ও কর্ণে নিজের স্বাতন্ত্র্য চিরদিনই ইহা বক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং কথকিত রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই এখনও বসিয়া আছে। এই স্বাতন্ত্র্য তাহাকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। যতদিন ইহা সেইতপই ছিল, ততদিন শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, সাধন-ভজন ইত্যাদি সর্গ বিসর্গেই ভারতের উত্তরোত্তর বিলক্ষণ অজ্ঞান ও অসাধারণ প্রভাব পরিলুপ্ত হইয়াছে। আর যখনই ইহা এই দিকে নেত্র নিমীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্য-লক্ষীরও নয়ন মুদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই নব মুখে দেশ-দেশান্তরে কত শত নৃতন তথ্য, নৃতন তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে, এই সকলকে পরিভ্যাগ করারই নাম কি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা? ইহা মূর্খের উক্তি। ঐ সকলকে পরিভ্যাগ করিতে হইবে না, যত্নের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু গ্রহণ করিয়া ঐক্যপভাবে রাখিয়া দিলে চলিবে না, ঐ কুলিকে একবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। বিভিন্ন ভাষা ব্যব্যকে গ্রাস করিয়া, জীর্ণ করিয়া যেমন তাহাকে রস-রক্তাদিভাবে নিজ নিজ নরীরের উপযোগী করিয়া একবারে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হয়, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না; আবার যেমন

যাহা কিছু সমুদ্রে বেধা যায়, সমগ্রই ভোজ্য হয় না, বহু ভাগ পরিভ্যাগ করিতে হয়, অন্তর্থা অনর্থপাত অবশ্যস্বামী আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে ঠিক এইতপট করিতে চাইবে। বিশেষজ্ঞেরা জানেন ভারত বহু বিষয়ে ঐক্য করিয়াছে। না করিয়া পারে না। কেনল ভারত নহে, সর্গদেশেরই এই রীতি। যে ভাষা ঐক্য করিতে পারিবে, তাহার একটা পৃথক্ সত্তা থাকিবে, নতুবা সমুদ্রে জলবিন্দুর প্রায় মিশাইয়া যাইবে।

ইংগাই যদি হয়, তাহা হইলে বোঝাতেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। সকলেরই গোড়া শিক্ষা। শিক্ষাপদ্ধতিতে আমাদেরকে অতি সাবধান হইতে হইবে। ‘সত্য বলিবে,’ ‘সংযত হইবে,’ ইহা ভিন্ন, এ দেশ, ও দেশ, সে দেশ কোনও দেশেই শিক্ষা বেধ না যে, ‘তুমি মিথ্যা বলিবে,’ বা ‘অসংযত হইবে’ কিন্তু সেবা যাহা শিক্ষার্থী মিথ্যা বলিতে সঙ্কল্পিত হয় না এবং যোর অসংযত হইয়া উঠে। কেন এতপ হয়? কারণ শিক্ষার সহিত শিক্ষিত বিষয়ের বেগ নাই। যতদূর শিক্ষার্থীর কর্ণে যাহা প্রবেশ করিতেছে, কর্ণ-রূপে তাহা তাহার নিকট প্রকাশ পাইতেছে না। তাহার নিকট চক্ষু কর্ণের নামক্স নাই, সে যাহা গনে কাছে তাহা করিয়া দেখে না, এবং অন্তর্কেও সেইরূপ করিতে দেখিতে পায় না। তাই উপদেশ শব্দ, কীক। শব্দ, চিরকাল তাহার নিকট ঐ ভাবেই থাকিয়া যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উদ্দীপ্ত প্রকৃতি যে দিকে তাহাকে দ্বিষ্ট করায় সেই দিকেই দ্বিষ্ট হয়। তাই ইচ্ছা-কলেজে Religious class খুলিয়া অভিলবিত কল পাওয়া যায় না। অতএব, শিখরিয়া উঠিলে চলিবে না, ভয় নাই, আমাদের আ চা র চাই, আচার

শিক্ষিত হইবে, শিক্ষার সহিত আচারের যোগ রাখিতে হইবে। এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে, শিক্ষার্থীকে যদি শিক্ষা দেওয়া যায় 'সংযত হইবে,' তাহা হইলে সে যেন তাহাই ভাবিয়া সংযত আচরণ করিতে পারে, তাহাকে এমন ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে তাহার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি সেই প্রকৃতি লাগিয়া উঠিতে পারে। ইমানী ইন্স-কলেজ প্রভৃতিতে আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শানী দেখিতে পাইতেছি, তাহার সহিত ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির এই ধানই প্রধান পার্থক্য।

প্রাচীন ভারতে জনক-জননী শিক্ষার মত বালককে হুলে পাঠাইতেন, এমন কথা, বহু দৃষ্টবাচি, কোথাও পাই নি। ইন্সলের মত একটা পদার্থের সত্তা সেই সময়ে কেহ লক্ষ্যণ করিয়া দিলে আদি তাঁহার নিকট চিৎ কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিত। তবে তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিতেন কোথায়? আচার্য্যহুলে, আচার্য্যের গৃহে,—যাটীর মহাপুর, পণ্ডিত মহাপুর, বা শিক্ষক মহাপুরের গৃহেও নহে—ইহাদের নিকটেও নহে। পুত্রেরা ১০টা—৪টা হুলে যাটীর মহাপুরে, নিকট থাকিয়া, কলেজ কাল পারিয়া লইয়া, যেন নিজে চাকরী বজায় রাখিয়াই অবশিষ্ট সময় বেশ-বোঝা নামক অল্পত বালগৃহে আগমন পূর্বক পকটবৃত্ত বন্দীবর্ধের দ্বারা উদ্বার উদ্ধৃখন ভাবে অভিবাহন করিত না; তাহাদিগকে অহোরাত্র অ ভে বা নী হইয়া আচার্য্যের নিকট থাকিতে হইত, সর্ব্বকথই তাহাদিগকে তাঁহার নিকট থাকিত। তাঁহার প্রতিচরণ-সকালনে প্রতিমনননিরুপে, প্রতিভ্রমণীতে আচার শিক্ষা করিতে হইত। পুঁদী পড়িয়াই তাহার ক্তার্থমত হইত না; পুঁথিতে

বাগ পড়িত নিজের জীবনে কার্যের দ্বারা তাহা পার্থক্য করিবার মত, উপলব্ধ করিবার চেষ্টা করিত, তাহার যোগ্যতা অর্জন করিত। শিক্ষার সহিত শিক্ষিত বিষয়ের কোন অর্জনতা তাহার দেখিতে পাইত না। যিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন তাঁহার আচারের সহিত, তাঁহার কার্যের সহিত শিক্ষিত বিষয়ের কোন অদ্যমকত তাহাদের নমনগোচর হইত না। যিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন তিনি যে আ চা র্য়্য! তিনি যৎ আচরণ করিয়া, কার্য্যতঃ অহুষ্ঠান করিয়া বিজ্ঞান করেন বলিয়াই ত তাঁহার নাম আ চা র্য়্য। যিনি বিজ্ঞ হান করিবেন তাঁহার বর্শ সেই বিজ্ঞার সহিত আচারের ঐক্য না থাকে, তাহা হইলে সেই বিজ্ঞা বিজ্ঞার্থীর কল্যাণ আনয়ন না করিয়া ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই শুদ্ধটাই হুষ্টিভাবে বুঝাইবার মত ধর্ম্মি বিদান করিয়াছেন আ চা র্য়্য স্ন নিকট বালককে লইয়া হাইতে হইবে আ চা র্য়্য হুলে আচার্য্য-গৃহে তাহাকে রাখিতে হইবে—পণ্ডিত যাটীরের বাড়ীতে নহে। আর বিদ্যার্থীকে ত্র স্না চা র্য়্য হইতে হইবে; ত্র স্না চা র্য়্য করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানরাশিরূপ বেদের লাভের মত বিদ্যানুশাসনে ত্র আচরণ করিতে হইবে; শুক পক্ষীর ন্যায় কেবল পাঠ করিতে হইবে না। ব্রতচরণ করিতে হইবে। ব্রতচরণই তাহার মূখ্য কার্য্য। ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী, ও আচার্য্য এই পদ্ধতিতে (✓ চর) ইগতি বুঝাইয়া দিতেছে। বর্ত্তমিন শিক্ষাভাষ্যের এই ব্রহ্মচার্য্যপদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত না হইতেছে ততমিন National Council of Educationই কর বা Hindu

University ইংরেজ বা Residential ইংলিশ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থাপন কর, অথবা Religious class ইংরেজ ধর্মাবলম্বী করিয়া বলাও বা দীক্ষা পড়াও কিংবা গান্ধী গান্ধী Hindu Theology র কেতাব পড়াও, কিছুতেই কিছু হইবে না। কেননা, পড়া একটা জিনিষ, আর তদনুসারে কার্য করা—সেই কার্য করিবার শক্তিতেই করা আর একটা জিনিষ। এই যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা বিজ্ঞানের মধুর গাথায় আরও তোমার আমার জনম নাড়িয়া উঠে, হে বন্ধু, গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যই তাহার মূল। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যপূর্বক শিক্ষালাভ করিয়াই ভারত তাত্পন অনুদান লাভ করিতে পারিয়াছিল, যদিও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। আর

বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগস্ববিধা ও শিষ্ট-বিদ্যা লইয়া তুমি যদি সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে গুরুগৃহ স্থাপন করিতে পার, “কুলং প বত্ৰং” ও “জননী কৃতার্থা” হইবে। ভারতবাসীর উপযুক্ত কার্য করা হইবে, দেশ ধনা হইবে, ভারতের ধর্মার্থ লক্ষী প্রসন্ন বদনে কিরিয়া আসিবে, আহুতী সম্পন্ন পরাভূত হইবে। বৈদী সম্পন্ন বিজয়মালা ধারণ করিবে। শিক্ষা তখন ধর্মার্থ কল্যাণ আনয়ন করিবে। উচ্চ জ্ঞান আর পথ নাই, হে বন্ধু, যে ভারতের শিক্ষাসংস্কারক, একবার গভীরভাবে ভাবিয়া দেখ, “নান্য পথ্য বিদ্যাতেহহমার।” সমুদ্রে তোমার “মহতী বিনষ্টাঃ।” গুরুগৃহই তোমাকে ইহা হইতে রক্ষা করিবে। গুরুগৃহই তোমাকে ইহা হইতে রক্ষা করিবে।

শ্রী বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী

## নিগ্রোজাতির কর্মবীর \*

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় বিশ্বশক্তি

আমি সমগ্র জগৎকেই মানুষের বিজ্ঞান মনে করি। এমনটা টাঙ্কেলী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সংসারের সকল প্রকার কাজ করিতে বাধ্য করিতাম। আমাদের বিদ্যালয়টা এইরূপে একটা ছোট বাট পুন্ড্রীর মত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই এই শিক্ষালয়ের আব্বাওরাহ স্থান পাইত। উৎসব বাবোষের ভিতর দিয়া, পণপালন, অতিথিসেবার ভিতর দিয়া,

লোকহিত পরোপকারেও ভিতর দিয়া। টাঙ্কেলী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মানুষ হইতে থাকিত। এমনকি আমি ছাত্রাবাসের সকল গৃহস্থালীর কাজই ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দিবা করাইতাম।

ছাত্রাবাস খোলা হইবার অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক হইয়া বাড়িয়া গেল। ইহাদের ভোজন পরনের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা বিরত হইয়া

আমেরিকার শিক্ষা প্রচারক যুগ্ম গুয়াপিটনের “আফ্রিকান-চরিত” গ্রন্থের প্রকাশনা।

পড়িলাম। পূর্বেই বলিযোছি আমাদের কাহারও গৃহস্থালীজ্ঞান ছিল না, সচল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। তাহার উপর অর্থাভাব। এখন স্থানাভাবও বেশ ভোগ করিতে হইল। কাজেই স্থলের নিকটে নতুন ছাত্রদের অল্প কতকগুলি কাঠের কামরা ভাড়া করিয়া লইলাম। এগুলির বড়ই জীর্ণ অবস্থা। শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাসে ছেলেরা অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল।

আমরা ছেলের নিকট মাসিক ২৪ ক্রিয়া লইতাম। ঘরভাড়া, খাওয়া, প্রানের জল, ঘর পরম পরিবারের সমস্ত কামলা ইত্যাদি সকল বস্তুই এই টাকায় চলিত। এই সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, মাত্র ২৪ টাকায় কুলাইত না। খরচ আরও বেশী পড়িত। কিন্তু অনেক ছাত্রই স্থলের নানা কাজ করিয়া দিত। একজন তাহাদের বেতন না দিয়া আবশ্যক বস্তু হইতে কাটিয়া রাখিতাম। বিদ্যালয়ে পড়িবার খরচ বার্ষিক ১৫-। এই টাকাটা আমরা নানা স্থান চেষ্টাতে সংগ্রহ করিয়া দিতাম। সুতরাং এই বিদ্যালয়কে ছাত্রদের পক্ষে অবৈতনিক বলা যাইতে পারে।

শেখা পেল, জরুরের নিকট মাস মাস নগদ ২৪ মাত্র আদায় হইত। সকলের টাকা একত্র করিয়া একসঙ্গে খরচ চালাইতে কিছু সুবিধাই পড়িত সম্বন্ধে নাই। কিন্তু হাতে কিছুই বাড়িত না। অথচ পুঁতি বা মূলধন না থাকিলে ছাত্রদের হোটেলখানা ভাড়া করিয়া চালান কঠিন। আমরা শুইবার ঘরে খাট, পদি, তোষক ইত্যাদি কিছুটা গোপাইতে পারিতাম না। শীতকালের রাতে ছেলেরা কষ্ট পাইত। রাতে উষ্ণতা

অনেক সময়ে আমি তাহাদিগকে সাতনা দিতে বাইতাম। দ্বুষ্টিভাবে আমরা ঘুম হইত না। কোন কোন ঘরে ঘাইয়া দেখিতাম—তিন চারজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া আগুন গোহাইতেছে। সকলের পীঠের উপর দিয়া একটা কঞ্চল বেলা আছে। কেহই ঘুমাইতে পারে নাই। একদিন রাতে খুব বেশী শীত পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে দ্বন্দ্ব মন্দিরে ঘাইয়া ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কাল রাতে তোমাদের কার কার হাত পা অমিমা গিয়াছিল?” অমনি ৩ জন ছাত্র হাত তুলিয়া বুকাইল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ছাত্রেরা কখন বিরক্তির ভাব দেখায় নাই। তাহারা দেখিত যে আমরা যথাসাধ্য তাহাদিগকে স্বখে রাখিতেই চেষ্টা করিতেছি। বরং তাহারা শিক্ষকদিগেরই কষ্ট বাহাতে না হয় তাহার জন্য উৎসাহিত হইত। শীত সহ করা তাহাদের ছাত্র জীবনের অন্ততম ক্রান্ত স্বরূপ হইয়াছিল।

আমেরিকার শেভাক মহাশয়ের সাক্ষাৎ। বলিয়া থাকেন, “নিগ্ৰোজাতি শাসন কর্ণে স্বায়ত্ত বিধান চাহে কেন? আমরা উহাদের উপর কর্তৃত্ব করি বলিয়া উহাদের মধ্যে লংঘন, শাস্তি, শৃঙ্খলা থাকে। আমরা ছাড়িয়া দিলে উহাদের সমাজে অশান্তি, অত্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি বিরাগ করিবে। এক নিগ্ৰো অন্ত নিগ্ৰোর অধীন থাকিতেই চাহে না। উহারা কখনই নিজে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর্ণ করিতে পারিবে না। আমাদের শাসনেই উহারা স্বখে আছে।” আমি পূর্বে একথা কিছু কিছু বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু টাঙ্কেজী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায় একথা আর আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

টাঙ্কেজী বিদ্যালয়ের পরিচালনা একটা

রাষ্ট্রশাসন অপেক্ষা নিত্য ক্রম ব্যাপার নয়। অথচ এখানে একজন বেতাদেশেরও কিস্কিন্দ্র্য আবিপত্য নাট ইহা একটা পুরাপুরি নিগ্রোজাতির কর্মক্ষেত্র। কৃষ্ণাঙ্গসমাজে ব্যর্থ শাসন অসম্ভব নয়—এই প্রতিষ্ঠানে তাহার অলম্ব প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত ১২ বৎসরের ভিতর এখানকার কোন ছাত্র শিক্ষক বা অস্ত্র কর্মচারীকে অপমান বা নিষ্পন্ন করিবারে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ছেলে মাহুদীগুলি খরা উচিত নয়। আমাদের অধ্যাপক, কেরানী এবং পরিচালকেরাও কখন অত্যাচারী হইয়াছেন—একথা শুনি নাই। বরং ছাত্রের শিক্ষকে, কেরানীতে পরিচালকে সর্বদা শ্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ঐক্যের বন্ধনই লক্ষ্য করিয়াছি। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিয়া চলে। একজনের হুঁহু ধুংধুং অত্যাচার অভিযোগে অন্তস্ত্র সকলেই সাড়া দেয়। এই প্রকাণ্ড নিগ্রোশস্যারের সকল কাজই হৃদয়ঙ্গার সহিত চলিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ সনাত্ত কি সত্য সত্যই ব্যর্থ শাসনের এবং ঐক্য-এখনের অল্পপক্ষ? টাকেরী বিদ্যালয়ের পরিচালনা দেখিলে কেহই নিগ্রো-জাতি সম্বন্ধে আর মিথ্যা অপবাদ রটাইতে পারিবেন না। আজ আমি সাহসভরে একথা বলিতে প্রচার করিতেছি।

নিগ্রো যুবকেরা তত্ত্বি জানে—শুষ্কজনকে জ্ঞা করিতে পারে। আমি কতবার দেখিয়াছি—কোন শিক্ষক বা পরিচালক বহুতে পুতক, ছাত্র বা আর কিছু বহিয়া লইতেছেন দেখিলে ছাত্রেরা তাহাদিগের নিকট আসিয়া সেইগুলি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাইতে চাহে। শিক্ষকগণকে হুদী রাখিতে তাহারা কি বড়ই না করে? বৃত্তি পড়িতেছে এমন সময়ে কোন শিক্ষক যদি ঘরের বাহিরে

যাকেন, ছাত্রেরা তৎক্ষণাত্ ছাত্রা লইয়া তাহার মাথার বহিতে আসে। নিগ্রো-সন্তানও মাহুদ—তাহাদেরও জ্ঞদ্য আছে—তাহারা গুরুকে তত্ত্বি করিতে পারে।

আজকাল বেতাদেশ মফলে নিগ্রো সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বেতাদেশের আমাদিগকে বর্ষের পত্র অলম্ব তিহু কন মনে করিতে দেখিতেছেন। টাকেরীর বেতাদেশেরা সকলে আজকাল আমাকে সম্মান করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে গায়ে পড়িয়াও জ্ঞা দেখাইতে বৃত্তিত চন না। টাকেরীর বাহিরেও নিগ্রোজাতির প্রতি হৃদয় পড়িয়াছে। আমি এখন নানান স্থানে বেতাদেশসমাজে হইতে আমার আপ্যায়ন পাইয়া থাকি। সেদিন টেন্ডাস গ্রামে রেলগাড়ীতে বাইতেছিলাম। প্রত্যেক টেননেই দেখি কত বেতাদেশ পুষ্ক ও রমণী আসিয়া আমার সঙ্গে “থেষ্ট” আলাপ করিলেন। আমি তাহাদিগকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু তাহারা আমার নাম শুনিয়াছেন। সকলের মুখেই এক কথা “আপনি আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে যে সংকার্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহার জ্ঞদ্য আমরা সকলেই গৌরবান্বিত। আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।”

আমি আর একবার বেতাদেশিগের “ডাল-বাসার অত্যাচারে” পড়িয়াছিলাম। ইহারা আমার সঙ্গে অনেক সময়ে গায়ে পড়িয়া আলাপ করেন, সম্মান করেন, ভোজ দেন। আমি তাহাতে বড়ই বিব্রত বোধ করি। একদিন উত্তর অঞ্চলে রেল বাইতেছিলাম। অত্যন্ত ক্রান্ত থাকার বেশী পর্যা দিয়া শুইবার কামরার জন্ত টিকিট করিয়াছিলাম। রেল-গাড়ীর এই কামরাকলিকে “পুলমান স্লীপার”

বলে। গাড়ীতে উঠিয়াই বেধি ছইজন ইহাঙ্কি রমণী। ইহাদিগকে আমি চিনিলাম। ইহারা বোষ্টন-নগরের বড়বরের মেয়ে। ইহারা আমাকে তাঁহাদের কামরায়ই রাখিয়া দিলেন। আমি তাবিলাম—ইহারা বোধ হয় লক্ষণ অঙ্কনের আসব কাছাকাছনেন না। দায়া হউক, তাঁহাদের উপরোধে সেই কামরাতেই পেলাম। পরে দেখি, ইহাদের আশেপাশে গাড়ীর হোটেলওলা বানা আনিয়া হাঙ্গির করিল। আমি বড়ই লজ্জিত হইতেছিলাম। গাড়ীর মধ্যে অনেক বেতাল পুঙ্খ ছিলেন। তাহারা আমাদের দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং কাণাঘুমা করিতে লাগিলেন। আমি রমণীদ্বয়ের নিকট বিদায় চাহিলাম। তাহারা কোন মতেই ছাড়িলেন না। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে এক টেবিলে নৈশভোজন করিতে হইল।

কেবল তাহাই নহে। তাঁহাদের একজনের ব্যাগে নুতন ক্যাননের একপ্রকার উৎকৃষ্ট চা ছিল। তিনি জানিতেন হোটেলের বাবুওচি সে চা কখনও বেখে নাই। সুতরাং তাহারা উহা ভাল করিয়া তৈয়ারী করিতে পারিবে না। একজ্ঞ তিনি নিজেই উঠিয়া গিয়া হোটেল হইতে চা তৈয়ারী করিয়া আনিলেন। আমার ভ্রত বেতালদিগের এত আয়োজন! প্রায় ১১-২ ঘণ্টা ধরিয়া রক্ত করিতে করিতে থানা বাওধ্য শেষ হইল। জীবনে আর কখনও আমি এতক্ষণ ধরিয়া থানা পাই নাই। বাওয়ার পরই আমি ঘুমপান করিবার ভ্রত ওখান হইতে ভ্রত ঘরে উঠিয়া পেলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা গেল। কিন্তু সেইখানে দিয়াই বেধি বেতাল পুঙ্খদেয়া আমাকে চিনিয়া কেলিয়াছে। সকলেই আমার সঙ্গে আসাশ করিল। আমার টাকেকীর কথা

তুলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতে লাগিল।

আমার ছাত্রদিগকে আমি সকলাই বুঝাইয়া থাকি, "দেখ, এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমি সত্য। ইহার শিক্ষক ও পরিচালকগণ সকলেই আমার বন্ধু বা পুরাতন ছাত্র এবং নিজ হাতে তৈয়ারী করা লোক, ইহাও সত্য। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। আমরা সকলেই ইহার সেবক ও তৃত্য মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, এই বিদ্যালয় তোমাদের, তোমরাই ইহার সুনাম কুনামের ভ্রত দাখী। ইহার উন্নতি অবনতিতে তোমাদেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বা অন্ধকার। তোমরা আমাকে তোমাদের শাসন-কর্ত্তা মনে করিও না। তোমাদের একজন প্রবীণ বন্ধু বা অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করিও। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে তোমাদিগকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।" আমি এগুলি কেবল কথা কথ। বলিতাম না—নানা উপায়ে ছাত্রদিগকে দ্বারিষের মধ্যে কেলিতাম। এমন সব ঘটনাক্রম স্মৃতি করিয়া তুলিতাম বাহাতে ছাত্রেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কলাইবার সুযোগ পাইত। তাহারা স্মৃতিতে পারিত যে, সত্যপত্যই তাহারা বিদ্যালয়ের ভ্রত দাখী।

আমি সরলভাবে ছাত্রদিগের সঙ্গে মিশি। তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করি—তাহাদের মতামতের কাণ্ডাও করি। তাহাদের সঙ্গে আলোচনা না করিয়া বিদ্যালয়ের ছোট বড় কোন কাজেই আমি হাত দিই না। বৎসরে ৩৫ বার ছাত্রেরা আমার নিকট পত্র দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতির ভ্রত প্রস্তাব লিখিয়া পাঠায়। এই নিয়ম আমিই করিয়া দিয়াছি।

এই সকল প্রত্যাব পড়িয়া আমার নিজের অনেক সময় নষ্টিতে পারি—এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা সবচেয়ে আরও সতর্ক হই। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাই। খোলাখুলি অনেক বিষয় আলোচিত হয়। আমাদের কুল এবং অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করিবার উপায় নির্ধারিত হয়—পরে সেইগুলি কাঁধে পরিণত করিয়া থাকি। অধিকন্তু, ছাত্রদিগের অনেক আলোচনা-সমিতি আছে। সেখানেও বিদ্যালয় সবচেয়ে নানা তর্কশ্রম উঠে। তাহাতে আমি যোগদান করিয়া অনেক নূতন কথা শিখিতে পারি।

ছাত্রদের পরামর্শ অল্পস্বারে কাজ এখন হইতে থাকে তখন তাহারা হারপার নাই আনন্মিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দাতিবজ্ঞানও বাড়িতে থাকে। তখন আবল তাবল বকিতে অথবা বিশেষ চিন্তা না করিয়া যাওয়া তাহা বলিয়া কলিতে তাহারা পারে না। বাহাদের কথার দায় নাই তাহারা অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু টাংকীতে ছাত্রেরা যে কথা বলে সেই কথা অল্পস্বারে সভা সভাই কাজ হইয়া থাকে। কাজেই তাহারা সংঘত বীর ও গভীরভাবে সকল বিষয়ের নীমাংসা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে দাতিবজ্ঞান কার্য করিতে করিতে ভবিষ্যতের মন্ত্র দাতিবজ্ঞান সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ তাহারা বড় বড় কাজ করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারে।

যত লোকের মধ্যে এই কর্তৃত্ববোধ জাগান যায় ততই সমাজের মঙ্গল। স্কল মাস্ককেই বুঝান উচিত “তুমি মাস্ক। তোমার নিজের মাথা খাটাইয়া কাজ করিবার ক্রমতা আছে, তোমার স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি

আছে। তুমি পরের সাহায্য না লইয়া কাজ ও চিন্তা করিতে থাক। তুমি কর্তৃত্বপে নানা অন্তর্ধানের সৃষ্টি করিতে লাগিয়া যাও। তুমি কি সর্দধা অপর লোকের কেরাষ্ট্রমার থাকিবে? তুমি কি পরকীর চিন্তার অধু-বালক মাত্ররূপে জীবন কাটাইবে? না। তুমিও লোকজন পাটাইতে শিশু, তুমিও মশরুনকে কাজে নামাইতে চেষ্টা কর। তুমি মাস্ক, তুমি কর্মকর্তা হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার মন্ত্র উন্মোচী হও।”

আমার বিশ্বাস, কুলী ও মজুর মহলে যদি এইরূপে কর্তৃত্ববোধ এবং দাতিবজ্ঞান জাগান যায় তাহা হইলে সমাজে বহু ধর্মঘট, কুলী-বিভ্রাট, অপব্যয়, উৎসীড়ন ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ধনবান্ মহাজনেরা এবং কলকারখানার মালিক মহোদয়েরা তাহাদের কর্তৃত্বাধী কেরাষ্ট্রী এবং অ্রমজীবীদিগকে এই কথা বলিতে অন্ত্যস্ত হইবেন না কি? একবার যদি তাহারা নিজেদের অহংকার ত্যাগ করিয়া কুলী মজুর কেরাষ্ট্রী ও কর্তৃত্বাধীদিগের সঙ্গে মিশিতে পারেন তাহা হইলে সমস্ত কারবার ও কারখানার মধ্যে একটা নূতন প্রাণ সৃষ্টি হয়। মালিকেরা বেতনপ্রাপ্ত কর্মীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিলে আপনা আপনাই ইহারা কারবারটিকে কৃতকার্য করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইবে। তাহারা ইহাকে আপনার নিজের বলিয়া জ্ঞান করিবে।

এই আত্মবোধ জাগাইবার উপায় আর কিছুই নয়। কেরাষ্ট্রী কুলী সকলেরই কর্তৃত্ব-বোধ ও দাতিবজ্ঞান জাগিলে এই কার্য সবচেয়েই শিষ্ট হইবে। এমন ইহাদের সঙ্গে মালিক মহোদয়দিগের সরল আলোচনা, কথাবার্তা, পরামর্শ গ্রহণ এবং তাবের আদান

প্রদান আব্রহ্মক : অল্প টাকা খরচ করিয়া যে কললাভ না হয় সত্ত্বরতার দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, মুগের কথাও তাতা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, বিশ্বাস করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়। আমি যদি কখনও কালাকে বিশ্বাস করি সে কখনই আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না। সে যদি বুঝে যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি কোন কাজে নামিয়াছি, সে যথাসাধ্য সেট কাজে লাগিরা থাকিবে। বিশ্বাস সর্বত্রই ছরলাভ করে—অবিশ্বাস ও সন্দেহ চিরন্তন কখনও কাজ হয় না। বিশ্বাসের ক্ষমতা সকল সমাজেই দেখা যায়। নিম্নোক্ত বিশ্বাস কর, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। কুলী মজুরিগের উপর ঘণাভাবে নির্ভর কর, তোমার কারবার কখনই বিফল হইবে না। এই বুঝিয়াই আমি আমার ছাত্রগণকে এত বিশ্বাস করিতাম—তাহাদের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতাম—তাঁহাদিগকেই বিভাগের কর্তা বিবেচনা করিতাম। তাহাদেরও কৰ্ত্তব্যে আমরা হুসুই পাইরাছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার ছাত্রেরা বিভাগের ব্যতীত সবই প্রস্তুত করিয়াছে। এখন বলিতেছি যে তাহারা তাহাদের ব্যবহারোপযোগী টেবিল চেয়ার আদমারি তেজ ইত্যাদিও প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। প্রথমে আমাদের ছাত্রাবাসে খাট ছিল না। একখানা করিয়া খাট ছাত্রেরা তৈয়ারী করিতে লাগিল। ততদিন তাহারা মাটিতেই শুইয়া থাকিত। এদিকে গদি বা তোষকও ছিল না। তাহাও নিজ হাতে তাহারা করিয়া গেল। কতকগুলি সজা কাপড়ের বস্তা কিনিয়া আনা হইয়াছিল। তাহার

মধ্যে শালপাতা তরিয়া গদি তৈয়ার হইত। প্রথম প্রথম এগুলি বড় অপরিষ্কার ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল। গদির ভিত্তর হইতে গোল বাহির হইয়া থাকিত। শুইতে গেলে এগুলি গায়ে লাগিত। ক্রমশঃ গদি তৈয়ারী ব্যবসার আমরা বেশ দক্ষতালান করিয়াছি। আজকাল টাকেরী বিভাগের গদি তোষক তৈয়ারীর কাজ খুল ভাল রকমই চলে। আমাদের গদির কারখানার স্থান্যও বেশ প্রচারিত হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের একটা বড় আয়ের উপায় এই গদি খানা হইতে দেখিতে পাইতেছি।

এইরূপে ছাত্রাবাস, বোতাম গৃহ, ভোজনালয়, বস্ত্রখানা ইত্যাদি সকল ঘরের জন্য সকল প্রকার আসবাবই আমাদের ছাত্রেরা নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লইল—প্রথম অবস্থার প্রায় সবই বিক্রি ও কল্যায় হইত। পরে কারিগরিতে উন্নতি হইয়াছে। এখন সব নিনিবেই উক্ত অঙ্কের শির জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হুত্তরা বিভাগের আবহাওয়ার মধ্যে দৌলদার বেশ আছে। অধিকন্তু এই সকল কারবার হইতে ব্যবসায়ও চলিতেছে—তাহাতে বিদ্যালয় চালাইবার খরচ কিছু কিছু উঠিয়া থাকে।

আমি ছাত্রাবাসের প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগের বাহ্য সজ্জা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতাম। তাহাদিগকে প্রায়ই বলিতাম, “আমরা গরিব—বালাবাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই। আমাদের চেয়ার টেবিল, গদি খাট ইত্যাদি সবই বিক্রি ও কোন রকমে চলনশই। লোকে এগুলি দেখিরা হুশিত হইতে পারে—কিন্তু কেহই নিন্দা করিবে না। তাহারা জানে, পরমা থাকিলেই আমরা বেশী দামে চক্চকে নিনিব তৈয়ারী করিতে বা কিনিতে পারিতাম। কিন্তু



পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। পয়সার জিনিস নয়। উহা আমাদের যার যার নিজের হাতে। ইহার জন্য আমরা নিজেরাই দাখী। আমরা যদি অপরিষ্কারভাবে গুণস্থানী চালাই, বা চলিফিরি তাহার জন্য লোকেরা আমাদেরকে নিন্দা করিবে, তিরস্কার করিবে। এ-নিন্দা ও তিরস্কার এড়াইবার কোন উপায় থাকিবে না। আমাদের স্বভাবই ইহার জন্য দায়ী। অতএব লোকে যেন আমাদেরকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে।”

এই শরীর পালন ও স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কে আর একটা কথা বলিব। আমি দাতা রাজার গুণ সব্বদে ছাত্রদিগকে সর্বদা উপদেশ দিয়া থাকি। আমি আমার গুরুদেব আর্মস্ট্রংয়ের নিকট দাতা রাজার উপকারিতা

সব্বদে বিনেব লিখা গাইয়াছি। তিনি বলিতেন ‘দাতা রাজা একটা পৃথিবীশেষ’। আমি টায়েন্সবীর ছাত্ররাসে এই দর্শ্য প্রচারে কোন ভ্রুটি করিতাম না। তাহার পর হুঃটা চব্বেরের মধ্যে কেমন করিয়া শুইতে হয় চাত্রদিগকে তাহাও শিখাইতাম। আমার ছাত্রাবস্থায় এ বিষয়ে যে জুড়না হইয়াছিল আমার বেশ বনে আছে। তাহা ছাড়া আমি পরিষ্কার রাখা, কোটে বোতাম লাগান ইত্যাদি বিষয়ও ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইত। এতরূপে উৎকর্ষ আন্দোলন কর্মবীরের দ্বিত ভোগ, যাওয়া পরা চলা কেবল লেন বেন ইত্যাদি জীবনের নিত্যকর্ম পদ্ধতির ভিতর দিয়া ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। (ক্রমঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

## ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি

### শ্রী শ্রীমান্ ভারত-সম্রাটের সম্ভাষণ

(বেঙ্গল পর্বশেষট ইইতে গ্রাণ )

মানবজাতির সভ্যতা ও শাস্তির বিকশে যে অকৃতপূর্ব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রতি-কণ্ড ও পন্থায়িত করিবার ক্ষম, পত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমার স্বদেশ ও সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাপণ, একমনে ও এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন। এই সর্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত পূর্ণাপরই শাস্তির অঙ্গুলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল বিবাদের কারণ ও বিশৃঙ্খলের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিপণ সর্বাঙ্গকরণে সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই সমস্ত বিশৃঙ্খল

প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিজ্ঞাতি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল সেই সকল প্রতিজ্ঞাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন বেঙ্গলিয়ম আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিলম্ব হইল, যখন করাদি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঐক্যবান অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে আত্মমর্ধ্যাদা বিলম্বন দিতে হইত ও আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মহাব্য-জাতির স্বাধীনতা ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ আমার সহিত

একমত জানিয়া আমি যানমিত হইছি।  
 নৃপতিপণের ও কান্তিনমূহের কৃত সন্ধি, ও  
 উগাদেব প্রদত্ত আশাস'ও প্রতিশ্রুতির প্রতি  
 ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ইংলও ও ভারতের সাধারণ  
 জাতিগত ধর্ম। আমার সমগ্র প্রজাবর্গ  
 আমার সাম্রাজ্যের একত্ব ও অগণ্ড। স্বাক্ষর  
 লভ একপ্রাণে অত্যাখান করিয়াছেন। যে  
 কয়েকটি ঘটনায় ঐ অত্যাখানের পরিচয় পাওয়া  
 যায়, তদ্বোধে আমার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয়  
 প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্ত নৃপতিবর্গ  
 আমায় সিংহাসনের প্রতি যে প্রণাম অমুরাগ  
 প্রকাশ করিয়াছেন ও সাম্রাজ্যের দল  
 কামনাধ স্ব স্ব ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিবার যে  
 বিরাট সজ্জা করিয়াছেন, তাহাতে আমি  
 বেতন মুগ্ধ হইয়াছি এমন আর কিছুতেই হই  
 নাই। যুদ্ধে সর্কাগ্রসামী হইবার লভ তাঁহার।  
 একবাক্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা

আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; ও যে শ্রীতি ও  
 অমুরাগের সূত্রে আমি ও আমার ভারতীয়  
 প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই শ্রীতি ও অমু-  
 রাগকে প্রকটীকৃত কললাভের নিমিত্ত অমু-  
 প্রাণিত করিয়াছে। দিল্লীতে আমার  
 অভিযোক্তাংসবার্ণ মহাপ্রমোদে যে দরবার  
 আহুত হয়, সেই দরবারের অবসানে ১৯১২  
 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ইংলণ্ডে  
 প্রত্যাবর্তন করিলে পর ভারত ইংরাজজাতির  
 প্রতি অমুরাগ ও সৌন্দর্য্যবৃত্তে যে শ্রীতিপূর্ণ  
 সম্ভাষণবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অধ্য  
 আমার দরপণথে উদয় হইতেছে। গ্রেট-  
 ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভাগ্য পরস্পর অচ্ছেদ্য  
 বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া আপনাতা আমাকে  
 যে আশাস দিয়াছিলেন, এই সঙ্কট সময়ে আমি  
 যেথিতোছি যে তাহা প্রচুর ও সুমহৎ ফল  
 প্রদব করিয়াছে। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

## মফঃস্বলের বাণী

### ১। শ্রীধামবুদ্ধাবন

(আচার্য্যকুল)

শ্রীধামবুদ্ধাবনে, 'আচার্য্যকুল' বাসকমিষের  
 তরুণশোবাণি সুরবরাহ করিয়া, বিজ্ঞানিক  
 দান করিতে সম্মত তৎপর। বর্তমান সময়ে  
 'আচার্য্যকুলে' প্রত্যাহই অন্ততঃ বিংশাদিক  
 ব্যক্তি চই বেলা অন্ন পাইয়া থাকে। তদ্বোধে  
 অষ্টাশন ব্রহ্মচারী ও দুইজন ভৃত্য। ঈশা  
 ব্যক্তীত 'আচার্য্যকুলে' একটি বিজ্ঞানর স্থাপিত  
 আছে, এবং তাহাতে পাচটা বেতনভোগী  
 শিক্ষকও নিযুক্ত আছেন। এতদ্বিত্ত অস্ত্রান্ত  
 বায়ও আছে। 'আচার্য্যকুল' পরিচালন ও  
 তত্ত্বাবধান করিবার জন্য চারিটা সহকারী

মন্ত্রী ও একটি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন।  
 পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণগোষাধী মহাশয়  
 ইহার প্রধান মন্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত মনমোহন  
 গোষাধী, শ্রীযুক্ত বিষয়কৃষ্ণ গোষাধী, শ্রীযুক্ত  
 কৃষ্ণচৈতন্যগোষাধী ও শ্রীযুক্ত দামোদরগোষাধী,  
 গোষাধীসহকারী মন্ত্রীর পদ এবং শ্রীযুক্ত  
 রাধাচরণ গোষাধী উপসভাপতির পদপ্রাপ্ত  
 করিয়াছেন। ইহার সাধ্যমতে কারিক  
 মানসিক ও আর্থিক সাহায্য করিয়া আচার্য্য-  
 কুলের অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

'আচার্য্যকুলের' মাসিক আয় বায় ও  
 বন্দোবস্তাদি সাধারণ কমিটীর আজ্ঞাধারী  
 নিশ্চয় করা হয়। ইহাতে ব্রহ্মচারিবর্গকে

বেদাধ্যয়ন ও সনাতন হিন্দুশাস্ত্রাদির আলোচনা করান হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত বিভাগদেহ অলংকার বাহিরের ছাত্রদের সহিত প্রত্যহ ব্রহ্মচারীদিগকেও নিম্নমন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিভাগদেহের বালকদিগের নিকট হইতে কোনরূপ বেতনাদি লওয়া হয় না। বাহ্যিক বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা অন্যভাবে শ্রীধাম বুদ্ধাবনে আশ্রয়। এই 'আচার্য্যকূলে' বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন।

'আচার্য্যকূলের' মাসিক অথবা বাহ্যিক খরচ, চানার উপর নির্ভর। ইহার নির্ভারিত কোন পুঁজি অথবা আয় নাই। যদিচ 'আচার্য্যকূলের' মাসিক অথবা বাহ্যিক সহায়তাপ্রার্থী কতক টাকা চান। অল্প আদায় হয়, কিন্তু তাহাতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কলন না হইয়া বরং ল্প হইয়া থাকে সেই ল্পও উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ সহবরাহ করিয়া 'আচার্য্যকূল'কে দক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আচার্য্যকূলে বহুবাসী ছাত্র অনেকগুলি আছে এবং আরও বৃদ্ধির আবশ্যক। ইহার উপর আমাদের বহুবাসীরা কৃপাদৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আচার্য্যকূল দ্বাৰাতে উন্নত হইয়া নিত্য শতাব্দিক ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করিয়া বেদাধ্যয়ন করাইতে পারেন সে বিষয়ে সৰ্বসাধারণের বিশেষ চেষ্টা করা কর্তব্য।

আচার্য্যকূল পয়স বৈকল্য। আচার্য্যকূলের ছাত্র অথবা ব্রহ্মচারীরা নিত্য শ্রীমদ্রাধন্যবের ত্রোজ পাঠপুর্কক বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া থাকে। যে ত্রোজ শ্রীমদ্রাধন্যবের আচার্য্যকূলে নিত্য পাঠ হইয়া থাকে তাহা বাক্যের চূড়ামণি। এই ত্রোজ বেদান্তর্গত অতএব সমগ্র বঙ্গদেশবাসীরাই ইহা বিশেষ আদরের বস্তু, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই ত্রোজ নিত্য

অভ্যাস করা উচিত। 'আচার্য্যকূল'ও সকলকে জানাইবার জন্য প্রস্তুত। ইহাদের আবশ্যক হইবে তাহারা আচার্য্যকূলের মন্ত্রী মতামতের নামে পত্র লিখিলে আচার্য্যকূলের (নিয়মাবলী) সহ সমস্তই জানিতে পারিবেন; তদ্ব্যতীত অনেকগুলি বৈকল্যগ্রস্তও এখানে পাওয়া যায়, সমগ্র বঙ্গদেশবাসী তাকা প্রজা ভবিষ্যৎ ইত্যাদির নিকট আমার সকল প্রার্থনা এই যে তাহারা কৃপাদৃষ্টিপাতে আচার্য্যকূলকে উন্নত করেন। আমাদের প্রিয় বৈজ্ঞানিক শ্রীমহাশয় জ্ঞানার মহিমানির্ভর চক্রবর্তী মহাশয় যথেষ্ট আত্মকূল্য করিয়াছেন কিন্তু তাহারা আবশ্যকজ্ঞাচারী সাহায্য আচার্য্যকূল এখনও পায় নাই। আশা করি তিনিও ইহা পাঠ করিয়া আচার্য্যকূলকে উন্নত করিতে তৎপর হইবেন। হে প্রিয় বঙ্গবাসীগণ একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আচার্য্যকূলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি তোমাদের সনাতন আচার্য্যকূলের প্রতি স্পৃহা থাকে যদি তোমাদের ব্রহ্মচারীদিগের ভরণপোষণ করা ও সাধারণে শিক্ষাদান করা মহন্ত বলিয়া বোধ হয় তবে আর নিষ্কল থাকিও না। উঠ সত্ত্বর আচার্য্যকূলের তত্ত্বাবধান কর এবং এই আচার্য্যকূলকে পরোপকার ব্রতসাধনে উৎসাহিত করিয়া বর্তমান লগ্নের হিতসাধন কর ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা পঞ্চদশে 'ব্রজলীলা' নামক একখানি পুস্তক ছাপা হইতেছে। আশা করি শীঘ্রই ইহা সম্পন্ন হইবে এবং এই আচার্য্যকূলেও ইহা পাওয়া যাইবে পাঠকগণ সত্ত্বর হউন আর বেশী বিলম্ব নাই।

বীরভূম বার্তা

২। অমৃতের অনুসন্ধান

আমাদের শায়েও শাখিক ধানের নীতি

ব্যবহৃত আছে। কিন্তু কাচাকালে আমরা তাহা ভুলিয়া বাই। আমি জানি, আমার একজন চক্ৰিভাজন অধিক বয়স ১২৫ টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু কোন স্থানের ছুটি-কের কথা শুনিয়া, 'a friend' নাম উল্লেখে তাহা হইতে নিঃসৃত বয়সের অল্প ২৫ টাকা মাত্র রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট টাকা ছুতিকা-কণ্ডে মাস মাস প্রদান করিতেন। আমরা তাহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট এই সংবাদ অবগত হইলাম। বিষয়টি অল্পসন্ধান করি ও কথার সত্যতা দৃঢ় বিশ্বাস করি। এতাদৃশ মহাত্ম্যব ব্যক্তি অতি বিরল। আমাদের দেশে ঢাক ঢোল বাজাইয়া দানের ব্যবস্থা প্রচলিত, ইহার দৃষ্টান্ত অল্প দৃষ্টিগোচর হয় না। সভ্যসমিতিতে টাকা দিতে হইলে আমরা সাবিক দানের কথা ভুলিয়া বাই। মাহুশের মূলের দিকে চেয়ে চাঁদার খাতার দৃষ্টান্ত করি। সময় সময় পরীক্ষণে চাঁদার খাতার দৃষ্টান্ত করি। দানের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রাণ না থাকে উহাতে জগতের উৎকর্ষ সাধিত হয় না—অনিষ্ট হয়। বিশ্বের নীতি কেমন মনোহর। তুমি বাহা দিবে তাহা যেন কেহই জানিতে পারে না। স্বতঃস্ফূর্ত সভ্যসমিতি একটা সৌরগোলপূর্ণ থাকে, প্রাণেশ্বর খ্যাতির তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ আমরা মুগ্ধ হই। প্রাণেশ্বর সঙ্গে গান আমরা কই করিয়া থাকি? বিশ্বর এই অহেতুক দানের ব্যবস্থা আধ্যাত্ম্য আছে বটে কিন্তু তাহার ব্যবহার বড় বিরল।

উপাসনা সম্বন্ধে বিত্ত বলিয়াছেন :—“যখন উপাসনা কর শূন্যের দ্বার কল্প করিয়া বলিবে এবং অতি সন্ধ্যাপনে বলিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিবে। তবেই ঈশ্বর যিনি যন দেখেন, প্রকাশ্য ভাবে তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।”

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন, “যান করবে মনে, বনে আর কোথায়?” এই বাক্যটির সহিত বিশ্বর বাক্যটির কেমন সাম্যত্ব। যিনি অন্তরের দ্বার নির্বন্ধেই তাহার সাধনা প্রাপ্ত। যে স্থান শান্তিপূর্ণ, অনকোলাহলশূন্য সেই স্থানে অতি গোপনে সেই চিরন্তন ধনের উপাসনা করিবে। সাধক যখন নির্বন্ধে বলিয়া তাহার চিন্তামুক্তি ধ্যান করিতে করিতে আত্মনিবেদন করে, তখন প্রেমাত্মক বিগলিত হইয়া তাহার প্রাণকে অন্তরতরে শিথিল করে। তখন সাধক বৃত্তিতে পায়—“রসো বৈ সঃ।” তিনি অন্তরের উৎস ও আনন্দধন। আমাদের যে বান-প্রস্থ ধর্মের বিধান ছিল, বোধ হয় এই নির্বন্ধ উপাসনাব নীতি তাহার মধ্যে নিহিত ছিল।

বিত্ত বলিয়াছেন—

“Be ye perfect even as your father which in Heaven is perfect”

তোমরা ঈশ্বরের মত পরিপূর্ণ হও, অর্থাৎ ঈশ্বর তোমাদের আদর্শ হউক।

উপনিষদ বলিয়াছেন—“ব্রহ্মসিৎ ব্রহ্মবৎ ভবেৎ।”

যাত্রাবিক ঈশ্বরই আমাদের আদর্শ। তিনি আমাদের উপায় ও উপাত্ত; আমরা তাহার সন্তান, অন্তরের পুত্র। আমরা যদি জীবনের এই গুরুত্ব ও একত্ব একবার উপলব্ধি করিতে পারিতাম তবে কি আমরা এইরূপ ভাবে অবস্থিত করিতে পারিতাম! শোক মোহ কি আমাদের গকে কখনও অতিক্রম করিতে পারিত? উপনিষদ বলিয়াছেন—“তত্র কে মোহ কঃ শোকঃ একমহাপ্রপত্তঃ।”

তত্ত্ব সাহিয়াছেন।—

“যিনি মহাত্মা হিব বীর প্রজা  
জাননায়ে যন আমি পুত্র তাঁর।”

বাস্তবিক তিনি আমাদের পিতা, লক্ষ্য ও আমাদের জীবনের জীবন। যদি এই জীবনের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাই, তবে আমাদের মানবজীবন সার্থকতা লাভ করিবে।

তিনি পরিপূর্ণ, আনন্দ্যঃ। তিনি চিত্ত-মনরূপে প্রাণের মধ্যে লক্ষ্য পাইলে আমাদের প্রাণের মধ্যে শ্রেয় ও পুণ্যের পবিত্র হিলোল প্রবাহিত হয়।

### বিগ্ন-বার্তা

#### ৩। ছাত্রদিগের জ্ঞাতব্য কথা

১। সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। শরীর মন তোমার দাসাদাস। শরীর মন উভয়কেই বলিতে হইবে “আমি তোমাদের প্রভু—আমার কথা শুনিতে হইবে—মতেন তোমাদের নিষাদ নাই। তোমাদের কথা শুনিয়া আমার সর্ব্ব হারাইতে বসিয়াছি। তোমাদের কথা আর শুনিব না। এবার তোমরা আমার কথা শুনিবে।”—এইরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধনের পথে দ্বিগুণে চলিতে হইবে।

প্রতিদিন সকালে দ্বিগুণ আনন্দে বসিয়া শরীর এবং মনকে শাসন করিয়া দিবসের কার্যে নিযুক্ত হইবে—এবং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে।

#### ২। কৃতিতা দূর করিতে হইবে—

(ক) সর্বপ্রকার কৃতিয়া ছাড়িবে—এবং কৃপণ ভ্যাগ করিবে।

(খ) প্রীত্যন্তিকে যাতুরূপে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে। যখনই কোন প্রীতলোক দেখিবে তখনই মনে মনে বলিবে “ইনি আমার দাস।”

(গ) চক্ষুকে সর্ব্বদা সযত্ন করিবে—কারণ যাহা আমরা দেখি বলিয়া মনে করি, তাহা

বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেখি না—আমাদের মন যে প্রবোধ দৃষ্টি গ্রহণ করে আমরা তাহাই দেখি। অতএব যখনই আমরা কোন বস্তু দেখি, আমাদের মন তৎক্ষণাত্ সেট দৃষ্টি ধারণ করে। মনকে এইরূপ দৃষ্টি গ্রহণ করিতে দিবে না।

(ঘ) মনকে সর্ব্বদা সংযত রাখিবে। ঈশ্বরের নাম বা কোন ধর্ম্ম লক্ষীত মনে মনে আরতি করাই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়। নামের একটি শক্তি আছে, যাহা তোমার উক্তি বা একাগ্রতার উপর নির্ভর করে না। নাম জপ করিতে করিতে ভক্তি, শক্তি, বিশ্বাস এবং একাগ্রতা আসিবে। ইচ্ছা আসিলে তবে নাম জপ করিব—এইরূপ মনে করিয়া বসিয়া থাকিও না। তোমার কার্য তুমি করিয়া যাও। ‘নাম’ তাহার কাজ করিবে। জানিও ‘নাম’ এবং নামীতে প্রভেদ নাই। বলপূর্ব্বক নাম করাই—নামে কচি হইবার প্রধান উপায়। রমনা নাম করিতে চাহিবে না—মন বিরত হইবে। সে সব গ্রাহ্য করিও না, দৃঢ়চিত্তে নাম করিয়া যাও। মনে মনে বীরে বীরে জপ করিবে। না পারিলে মনে মনে ক্ষত জপ করিবে। তৎক্ষণে নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে। মনকে তাহার ইচ্ছা মত মনন করিতে দিবে না—তাহাকে সর্ব্বদা সংযত বা জপ করাইবে। অভ্যাস হইলে তোমার অজ্ঞাতসারেও মনে মনে কল্লু নদীর জার নাম জপ চলিবে—এমন কি নিশ্চিত অবস্থাতেও মন জপ করিতে থাকিবে।

(ঙ) প্রাতঃকালে মুক্ত বাহুতে পাঁড়াইয়া বীরে বীরে নিশ্বাস গ্রহণ করিবে—ঘণ্টা পার বায়ু গ্রহণ করিবে। যাহা লোকের বরিধা রাখিবা বীরে বীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে।

এই নিখাস প্রবাসের কাহা অতি ধীরে ধীরে হইবে। ইহাতে বন্ধ প্রণত হইবে—রক্তে অরক্তানের ভাগ বেশী হইবে। আলস্ত এবং ক্ষুধা চলিয়া যাইবে। তৎপর মুক্ত বাহুতে কিছুক্ষণ নাম জপ করিতে করিতে পদচারণা করিবে। রাত্রিতে শয়নের পূর্বে এইতপ করিবে। দিবসে নিস্ত্রা যাইও না।

৪। যন্ত্রে মৎস্য ব্যক্তিরের ছবি রাখিবে যেন ঘুম হইতে উঠিয়া তাঁহাদের প্রীমুখ বর্ণন করিতে পার। জামিও মনে তাঁহাদের পূণ্য শুদ্ধ বৃত্তি গ্রহণ করার নাম তাঁহাদের দেবা।

৫। নাটক নভেল কখনও পড়িবে না। সাধুসক সঙ্গী মিলে না। তাঁহাদের ভীষনী পাঠ করিবে। ইতিহাস, বর্ণন বা ধর্মপুস্তক পড়িবে এবং তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজস্ব করিয়া লইবে, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া লইবে। মনে রাখিও, যে পুস্তকে ভগবানের নাম আছে তাহা ভাগবত—যিনি ভাগবত পাঠ করেন তিনি ভক্ত, বেগানে ভক্ত ভাগবত পাঠ করেন সেখানেই ভগবান আছেন।

৬। সন্ধ্যা হইলে শীতল জলে স্নান করিবে। কোপিন পরা ভাল, তবে খুব বেশী আটিবে না, তাহাতে ক্ষতি হইবে। দূঢ় করিয়া মালকোচা দ্বারা বরং ভাল, তবে রাত্রে শুইবার সময় ঐরূপ মালকোচা মাখিয়া শুইবে না। রাত্রে কখনও ডরা পেটে শুইবে না। বরং কম করিয়া যাইবে। প্রভাতের বেগ ধারণ করিবে না। রাত্রে ঘুম তাহিলে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিয়া তবে শুইবে। তাহাতে স্নায়বিক উত্তেজনা কমিবে। পা এবং মাথা দুইয়া শুইবে। কখনও চিৎ হইয়া শুইবে না। চীৎ হইয়া শুইলে মেরুদণ্ড ঊর্ধ্ব হইয়া স্নায়বিক উত্তেজনায় বৃদ্ধি করিবে।

যোজ্য পরিচা শুইবে না। গায়ে কাপড় কম রাখিবে। বরং একটু শীত শীত করা ভাল।

৭। শুইবার পূর্বে মুক্ত বাহুতে নাম জপ করিতে করিতে একটু বেড়াইবে। ইহা করিতে তুলিও না।

৮। শুইয়া শুইয়া নাম জপ করিবে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হইবে। তাহা গ্রাহ্য করিও না। অভ্যাস করিতে থাক।

৯। হাঙ্গ, ভিম, পেঁহাষ ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ না খাওয়াই ভাল। চা, কফি ইত্যাদি পান করা ভাল নয়। ঘুমপান করাও ভাল নয়। সুবিধা হইলে প্রত্যহ সকালে খালি পেটে একটু মাখন মিলি দিয়া যাইবে। সুবিধা হইলে সাক্ষাৎসমূহের পর একটু মিলি পান পান করিবে। যদি নাসা পান করা অভ্যাস থাকে তবে শয়নের ২৫ ঘণ্টা আগে নাসা পান করিবে। তাহাতে যন্ত্রিক শীতল থাকিবে এবং স্নায়বিক উত্তেজনা দূর হইবে। নাসা পান করা শক্ত নহে। একটি ছোট চেনা মাসীর চার কেটলিতে শীতল জল লইয়া নলটি কোন এক নাকে প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে জল টানিয়া পান করিবে।

১০। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কৃমি রোগ বড় অনিষ্টকর। এই দুইটি রোগ দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

১১। সন্ধ্যা হইলে সকাল বিকাল স্নান করিবে। অবগাহন স্নান ভাল। স্নান করিবার সময় ভাবনা করিবে যে, সর্ব্ব স্বেচ্ছ মন শুদ্ধ পবিত্র হইয়া গিয়াছে।

১২। উপবাস ত্রিপুরা জর করিতে অনেক সাহায্য করে। কিন্তু বাহ্যাদী হাজারকে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে রাত্রিতে ভাত না খাইয়া কটি খাওয়া উচিত।

১৩। শরীর এবং মনকে কখনও অঙ্গ রাখিবে না, কারণ আল্লাহই পাপের প্রধান সৎকার। ভাল বই পড়া ভাল।

১৪। চিন্তা বা নাম রূপ করতে মনকে ব্যস্ত রাখিবে। কিছু না করিতে পারিলে বেড়াইতে বাহির হইয়া যাইবে। শক্তিমত ব্যায়াম করিবে। দুর্বল শরীর এবং মন যিপুর উত্তেজনা সামলাইতে পারে না। "আজ্ঞা দেওয়া" সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে।

১৫। বাহ্য আহার করিবে তাহা প্রথমে ঈশ্বরের নামে নিবেদন করিবে। বলিবে "এই অন্ন তোমার ঐশ্বর্যে নিবেদন করি, তুমি তৃপ্ত হও, তোমার সঙ্গে সারা জগৎ তৃপ্ত হউক। সর্গ জীবের কল্যাণ হউক। এই অন্ন শুদ্ধ পবিত্র হোক, শাক্ত এবং তেজ পূর্ণ হোক। তুমি প্রসন্ন হও।"<sup>৬</sup>

১৬। যখন কোন সূচিন্তা আসিবে তখন ঈশ্বর চরণে নিবেদন করিয়া দিও। বলিও "আমার বাহা ভাল তাহা তোমার ঐশ্বর্যে নিবেদন করি, বাহা ব্যাথাপ তাহাও তোমার চরণে নিবেদন করি। তাহা তোমার ঐশ্বর্যে স্পর্শে মুক্ত হোক, আমিও বক্ষা পাই।" যখন কোন নারা মূর্তি মনে আসে তাহাকে ঐ ভাবে নিবেদন করিয়া দিও। বলিও "তুমি আমার না আমি তোমার সন্তান। তুমি ঈশ্বরের চরণে দাও, সেহাযনে যাক্ মূর্তিতে ছুটে গঠ" এই বলিয়া নিবেদন করিয়া দিও।

১৭। নিজেকে ছোট বা দুর্বল মনে করিও না। মনে এইরূপ ধোর রাখিও যে, আমি ভগবানের নাম লইয়াছি। আমাও অবার পাপ কি? উপাসনা এবং প্রণাম করিতে অভ্যাগ কর। উপাসনা অর্থে নিকটে বসি অর্থাৎ নিম্নস্থিত কোন সময়ে স্থিরভাবে

বসিয়া ভগবৎ চিন্তা করিও। প্রাণে প্রাণে অহুত্ব করিবে যেন তোমার দেহতা হোমারি অন্ন তোমার সম্মুখে আদীন। জানিও তিনি অদেহকৃষ্ণ-নিম্ন তীর কাছে ছোট বড় নাই। এইরূপ জানিয়া এবং তাঁহার সান্নিধ্য অহুত্ব করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাখুল ভাবে প্রার্থনা করিও এবং আত্মনিবেদন করিও। প্রতি কাণ্ডে তাহাকে প্রণাম করিয়া কাঁথা করিও। তৎপর আশ-চিন্তা করিও স্থির চিন্তে একাত্ম মনে নিজেকে বলিও, "আমি শিব, আমি সত্য, আমি শাক্ত। সমস্ত ও অন্ত আমায় স্পর্শ করিবে না; আমায় বিচলিত করিতে পারে এমন কাহা-কেও যোগ না। আমি তেজোময়, আমি শক্তিময়, আমার সমগ্র দেহ মন প্রাণ, শক্তি ও তেজে পূর্ণ, ভয়ের লেশ যাক্ আমাতে নাই। আমি শুদ্ধ, আমি পবিত্র, আমি উচ্ছিন্নতা বিমোহিত, আমি সর্গ সাগর হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, একটীও কলঙ্ক আমায় স্পর্শ করিবে না।" এইরূপ আশ্চিন্তা করিয়া ওগবানের নিকট "তুমি সত্য হও, তুমি প্রসন্ন হও, তুমি কৃপা কর" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে। নিরামিত এইরূপ অভ্যাগ করিও।

নিষ্কর জীবনের উপর বিশ্বাস রাখিও। জানিও যন অস্তকাক্ষর অরণ্য এমন একটী পত্রও বৃক্ষচূড়াত হই না, বাহার পত্রাভে ওগবানের উদ্দেশ্য নিহিত নাই। তোমার জীবনেরও একটী উদ্দেশ্য আছে, তোমার এই জীবনী বুঝা সঠিক হই নাই জানিও—ওগবান চির-মঙ্গলময়। তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সৃষ্টিও মঙ্গলময়। ইহা বিশ্বাস করিয়া নিজ জীবনীকে কল্যাণে পূর্ণ করিয়া লইও।

সঞ্জীবনী

৪। পূর্ববঙ্গে শিল্পশিক্ষালয়

১৯০৭-০৮ হইতে ১৯১১-১২ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের পূর্ববক ও আসামের শিক্ষাবিভাগীয় কার্য সম্বন্ধে সরকার পক্ষ হইতে যে পাক-বার্ষিক কাৰ্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববকের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঐ বিবরণীতে ৬টি শিল্পশিক্ষালয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

কার্শিকপোর স্কুল :—এই স্কুল ১৮৯০ খ্রিঃ অব্দে ময়মনসিংহ জিলাতে রামসোপালপুরের জমিদার রাজা বোমেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরার অর্থে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা এই স্কুল প্রতিষ্ঠাৎ ২৪০০০০ নান করিয়াছিলেন, ইহার পরিচালন ভার সাক্ষাৎ ভাবে জিলা বোর্ডের হস্তে র্ত্ত। এখানে শিক্ষার্থীরা হস্ত-ধরের কার্য, কণ্ঠকারের কার্য এবং বেতের কার্য শিক্ষা করিয়া থাকে। ১৯০০-০৬ সনে এখানে একটি বন্দোবস্তকার শ্রেণীও খোলা হইয়াছিল, কিন্তু উক্তভাতির ছেলেরা এতদেক মন দিতে না পারায় হঠাৎই পরবর্তী বৎসরই ক্লাসটি উঠিয়া যায়। উপর্যুক্ত ছাত্রদ্বয়কে উন্নয়নী ব্যক্ত বেওয়া হইয়া থাকে, ৭ হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তের পারিশ্রম্য। এই ১২টির মধ্যে ১০টি বৃত্তি মূল্যমান ছাত্রদ্বয়কে দেওয়া হয়। এই স্কুলে ১৯১২ সনে ছাত্রসংখ্যা ২৭ ছিল, কিন্তু ১৯১১ ও ১৯০৭ সনে যথাক্রমে ছাত্রসংখ্যা ৪০ ও ৬১ ছিল। এই স্কুলের মোট ব্যয় ১৯১২ সনে হইয়াছিল ৮৮১৭, কিন্তু পূর্ব বৎসর হইয়াছিল ৪০২৪ টাকা।

বগুড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল :—এটি গবর্ণমেন্ট স্কুল, ১৯০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে শিক্ষার তিনটি বিভাগ আছে,—হস্ত-ধরের কার্য, কণ্ঠকারের কার্য ও বস্ত্র বয়ন।

প্রত্যেক বিভাগে তিন বৎসর শিক্ষা করিতে হয়। ১৯১১-১২ সনে এই স্কুলের মোট ব্যয় ৪২২৮ টাকা হইয়াছে। এখানেও বয়ন শিক্ষার ক্লাস চাড়াভাবে উঠিয়া গিয়াছে।

সাহাজাপুর স্কুল :—পাবনা জিলার সাহাজাপুর গ্রামের জমিদার মুল্লমহান জমিদারী এই স্কুলটি সংস্থাপিত করিয়াছেন। ১৯১২ সনে এখানে ২২ জন শিক্ষার্থী ছিল।

ভিক্টোরিয়া টেকনিকেল স্কুল :—এটি একটি প্রাইভেট স্কুল, এখানে উক্ত ভাতির বালকদ্বয়কে বর্ণকারের কাজ, চুস্তারের কাজ ও টিনের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। এটি স্কুলে শিক্ষাবিভাগ হইতে মাসিক ৩০০ টাকা সাহায্য ও উৎকৃষ্ট ছাত্রদ্বয়কে প্রাথমিক রাজস্ব হইতে পারিতোষিক প্রদান করা হইত। কিন্তু উপর্যুক্ত শিক্ষক ও ঘর বাড়ী না থাকায় ১৯১১ সনে হইতে গবর্ণমেন্ট সরকারি সাহায্যদানে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, স্কুলও একত্রপই উঠিয়া গিয়াছে।

রামপুর নোভালিয়র রেশমিকার্য্য শিক্ষালয় :—এই স্কুলটি প্রথমতঃ রামপুর নোভালিয়র টেকনিকেল স্কুলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯০৭ সনে ইহা স্বতন্ত্র স্কুল হইয়াছে। এখন ইহা কৃষি বিভাগের ডিমেট্রির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতেছে। ইহার সংজ্ঞা একটি তুতের বাগান আছে। এই স্কুলে তুতের চাষ, অস্থলীকণ বস্ত্র সাধারণ বীজ পরীক্ষা, এবং রেশম পোকার পক্ষতপী কীট ধ্বংসের উপায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

মালদহ বনবিদ্যালয় :—এটি স্কুলটি মালদহ জিলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, এখানে ২০টি ছাত্র আছে। বড় স্তরের কথা যে এখানে কণ্ঠ শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা পরবর্তী



ভীষণ তাহা কার্যে প্রয়োগ করিতে পারিতেছে।

### বিশ্ববাস্তি

ও। যুদ্ধে ভরতের ভাঙি

ইউরোপের নিম্ন-গ্রামী যুদ্ধে ভরতবর্ষের লাভ এ কথাটা স্মরণ্য পাঠকগণ যেরূপে প্রথমে অভিনয় বিম্বিত হইতেন। কিন্তু এই কথাটা একটু তদন্তের বৃত্তিতে সে বিশ্বাসের কারণ থাকিবে না, এই ভীষণ যুদ্ধে আপাততঃ আমাদের বিষম ক্ষতি দেখা দাঁড়াইতেছে তাগণ্ডে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের ভয় দেখে বালিকা ব্যবসায়ের বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং সে ভয় বঙ্গদেশের ক্ষতি যোগ দর সন্ধানার্থে অধিক হইয়াছে এবং হইবে। এ বৎসরে পাটের ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়াছে। পাটের ব্যবসায় বন্ধ হওয়াতে কেবল যে পাটের মফঃস্বলগণের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে। বঙ্গের কৃষকজনের মধ্যে এবার ভীষণ হাহাকার উঠিয়াছে। তাহারা সমস্ত বৎসর আগার বুক বাঁধিয়া পরিশ্রম করিয়াছে। মফঃস্বলের নিকট হইতে টাকা কর্তৃক করিয়া যে লাভের গুণ আপা করিয়াছিল তাহার বিনাম হওয়াতে তাহারা পূর্ববর্তী অকস্মিকের দৈবিত্তি। পাট বিক্রয় করিয়া তাহারা সমস্ত বৎসরের দেনা পোষ করিবে আগামী বৎসরের খাজ সংগ্রহ করিবে পুণ্ডার সময়ে পুত্র কন্যা পরিবারের নতুন বস্ত্র কিনিবে ইত্যাদি কত স্থলের কল্পনা করিতেছিল কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধ রাক্ষস তাগণের সমুদয় আপা ভরসা একেবারে নিশ্চল করিয়াছে। পাটের দর না হওয়াতে তাহারা কসীবারের বাজানো দিতে পারিতেছে না মফঃস্বলের গণ শোষ করিতে পারিতেছে না পুণ্ডার সময়ে নতুন কাপড় কিনিয়া পুত্র কন্যার মনস্তুষ্টী কারণে দূর থাকুক কি দিয়া তাগণের যুগে অল্প দিব্যর ব্যবস্থা করিবে তাহাও ঠিক করিতে না পারিয়া বাজুল হইতেছে। কৃষকদিগের ধন এই ব্যবস্থা তখন কসীবারগণের অবস্থা অন্যায় সেই কল্পনা করা বাইতে পারে। কৃষকের অজ্ঞিত অর্থই তাহাদের ভরসা। কৃষকেরা ধন

ধনতীন তখন কসীবারগণেরও ধনাগমের পথ কণ্ঠ বসিতে হইবে। কৃষকগণের নিরস্ত্র অবস্থার ভয় ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় লুপ্ত। কৃষকের গৃহে ধন না থাকিলে দেশের কোনও অংশের লোকের অর্থাগম হইতে পারে না। উকাল, মোকাদ্দ, ডাক্কর প্রভৃতি লোকলুট এক কৃষকের অর্থের উপরে নির্ভর করিয়া থাকেন। দেশের ধন এইরূপ অবস্থা তখন যুদ্ধ যে দেশের লক্ষে ক্ষতিজনক তাহা আমরা বিবেচনাপূর্ণে বৃত্তিতে পারিতেছি। কিন্তু এট অধিক ক্ষতি আমাদের লক্ষে অতি গুরুতর হইলেও অল্প ভাবে আমাদের দেশের যে পরম লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় এ ক্ষতিক-আমরা ক্ষতি বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা যদিও সার্থী নতাদিক বঙ্গের দ্বারা প্রকৃত ক্ষয়তালী পূর্ববর্তী ভাঙি সমুদ্রের অগ্রগণ্য ইংরেজ রাজত্বের প্রজা (কিন্তু আমরা আমাদের রাজার নিকট অবস্থা রাজার জাতের নিকট সে আমর বা স্নেহ পাই নাই। ভারতবাসীরা বহুই শিক্ষিত হইক না কেন তাহাদের সভ্যতা বহুই প্রাচীন হইক না কেন ইংরেজ জাতি তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ-ভেদিত নিদার বলিয়া ঘৃণা করিতে ক্রোধ করে নাই। ইংরেজ রাজপুত্রগণের মধ্যে বাহারা ভারতবাসীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহাদের সংখ্যা অতি কম ছিল।

বহু ভয় এবং বশেষী আশোলনের পথে ভারতবাসী বিবেচনা: বাঙ্গালী জাতিকে অধঃগত ইংরেজেরা ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। আমাদের রাজপ্রতিনিধি কসী তাহারা বিশ্বাস করিতেন না। ইংরেজ ভীষণতা কপটতা বলিয়া মনে করিতেন। এমনও যে কেহ কেহ না করেন তাহা নহে। কিন্তু আমাদের মফঃস্বল ভারত দখলি ও সম্রাজী এখানে আগমন করিয়া বসেছে এখন ভারতবাসীর মস্তজিম রাজপ্রতিনিধি এক অবিচলিত শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া লেখা প্রকাশ করিলেন তখন হইতে ইংরাজেরা ভারতবাসীকে শিক্ষিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতে নিষিদ্ধাছেন আমাদের সমুদয় রাজ প্রতিনিধি মহাশয় এই ভাব-মোড়ের পরিবর্তনের মূল কারণ। এখন দিকটা সবে

তাঁহার নিজের জীবন বিপদাপন্ন হইয়াছিল তখনও তিনি ভারতবাসীর প্রতি আস্থাশীল হইবেন নাই। তিনি সৰল প্রাণে ভারতবাসীর রাজত্ব ও সৰলতাকে বিধান করিতে শিখিতেছেন। তাই তাঁহার মস্ত ভাবত-বাসীর প্রাণ সৰ্ব্বদা স্বেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতার ভাবে অধীন। তাঁহার শোকে ভারতবাসী মুহূর্যমান তাঁহার বিশদে ভারতবাসী সম্বন্ধ। এই মণ্ডপুত্রের সহ্য চেষ্টায় ইংরাজ জাতির মনোমতি অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় যে বীর অজুগুপ্ত হইয়াছিল এই ভাবে মুক্তের বিপন্ন ভাবের তাহা বন্ধিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। মুক্তের সংবাদ শুনিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে রাজত-কর যে প্রবল জ্যোতঃ প্রসারিত হইয়াছে তাহা দেখা ইংরেজ জাতি বিশিষ্ট স্তম্ভিত এবং পুলকিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজ্য প্রজা সমভাবে সাম্রাজ্যের সমান স্বাকার মস্ত আপনাদের ঘন জন এবং প্রাণ অকাতরে সমর্পণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের সেনাগণ সাত সমুদ্র ভেদ নদী পার হইয়া মৃত্যু দেখে মুক্ত ভারতের মস্ত সমন করিয়াছে। ভারতের বনো নির্ধন সকলেই স্বীয় স্বীয় ক্ষমতামুগারে এই মুক্ত ইংরেজ রাজের সাহায্যার্থে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রান্তবিন সস্ত্র সহস্র পত্র ও তাহের সংবাদ দ্বারা ভারত-বাসীরা রাজ প্রতিনিধির নিকট আপনাদের ধনপ্রাণ সমর্পণ করিতে অস্বস্তি প্রার্থনা করিতেছে। যে বাগানী জাতি, ভীক বনিয়া স্বদিত হইত সেই জাতির দুঃকণ্ড মুক্ত কোরে প্রাণ দান করিবার মস্ত প্রস্তুত হইয়া রাজ আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। ভারতে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশান্তির বিশেষণ চাইয়াছে। সকলেই এক মন প্রাণে ইংরেজের পৌত্ত্ব স্বাকার মস্ত উদ্ভাব হইয়াছে। একদা অশ্রুতপূজী এবং অদৃষ্ট-পূজী রাজতন্ত্রের বিশুল তৎক্ষণাতঃ হইতবলি অস্ত কোন কোন কোন মনো দুই হয় নাই। ইহা দেখিয়া ইংরেজ জাতি মুগ্ধিত পারিয়াছেন যে ভারতবাসীর রাজ-ত্ব নৌবিক নহে। যৌবিক রাজত্বকিতে

লোকে প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয় না। ভারতবাসীর প্রাণে ধর্ম আত্মপত্তা না থাকিত তবে এ সময়ে তাহারা নৌব থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। সুদূর সাগর পারে মুক্ত চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসীর মণা মণা হইবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতবাসী অকৃতজ্ঞ নহে। ইংরেজ শাসনের স্বকলে ভারতের স্বয়ং ও শান্তি বুদ্ধি পাইয়াছে প্রকাশ্য ঘন ও প্রাণলীলা হুখে ইংরেজ রাজ্যে বাণ করিতেছে। তাহারা কোন ইংরেজের স্বপালনই তাহাদের সর্বপ্রকার উন্নতির সোপান। তাই ইংরেজের বিশদে আপনাদের বিপন্ন মনে করিয়া ইংরেজের সম্মান তৎকারে ভারতবাসী বহুপরিষ্কার হইয়াছে। এই অজাবনীয স্বাধীনতা এবং মনোমর্মে কেবল ইংরেজ জাতি নহে সমগ্র মনো বিশিষ্ট হইয়াছে। আজ ইংরেজের চক্ষু ভারতবাসী মনো ও দৌরবাসিত। ইংরেজের মুখে ভারতবাসীর প্রশংসা ঘরে না। ইংরেজ সংবাদ-পত্র ভারতবাসীর জগৎপানে পূর্ণ। যে সকল ইংরেজী সংবাদপত্র চারদিন ভারতবাসীর নিশা করিয়াছে তাহারাও আজ প্রশংসা করিতেছে। শ্রদ্ধাগের পাই পাত্রকা এখনও ভাবুত বিবেক কুলিতে পারে নাই। যখন বিলাতে ও ভারতে সকল শ্রেণীর লোকে ভারতবাসীর এই মহত্ত্বের দর ঘোষণা করিতেছে তখনও এই সর্ব প্রকৃতির সংবাদপত্র নিজ নিজ আবাসস্থলে বাসিরা বিব উপলব্ধ করিতেছে। কিন্তু আমরা ইহা ছাড়া উড়াইয়া বিতে দূর্য। যখন বহু সস্ত্রাটি সিংহাসনাঙ্ক হইয়া ভারতবাসীর মনো ঘোষণা করিয়াছেন, পালিমায়েট সভাপন সকলে সম্মুখে ভারতের জগৎপান করিতেছেন, রাজ প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীর এই আস্থাভাবের কথা উল্লেখের কৌশল করিয়া-ছেন, তখন ভারতবাসীর আনন্দ করিবার কারণ আছে। এ মুক্ত তাহাদের পাণে বহু হইয়াছে এই ভাবে মুক্ত ভারতের পরম লাভ হইয়াছে। ইংরেজ জাতি ভারতবাসীকে স্বেচ্ছা করিতে শিখিয়াছে।

জাগরণ।

# ମହତ୍ତ୍ୱ



“ସାମ୍ରାଜ୍ୟେ ଯେ ମହାମେଶ ନୃପତି ପତିତେଷୁ ଓଷା ଅତି ପୁଣ୍ୟଭୂମି । ଏହି ଦେଶ ସିନ୍ଧୁ  
ଗଙ୍ଗାସନ୍ଧ୍ୟଜାତ । ଓଷା ମହାମୁନି କପିଳଦେବର ଉପତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର.....ସାଧ୍ୱାସୁତ୍ର-  
ଅଗ୍ନେତା କପିଳଦେବ ଅଞ୍ଚଳ ସକଳ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରିয়া ଏହି ଦେଶେ ଆସିଯା ବସତି କଲେନ,  
ଓଷାହରଣି ଅଞ୍ଚଳାବତାରଣ ଯାହାଦର୍ଶନ ସାଧ୍ୟାର ଗପୋପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୁଝିଯା । ଏହି ଦେଶେ  
ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟେନ ଏବଂ ଶ୍ରୀତିନୀୟମପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦଗୀତିଓ ଏହି ଦେଶେ ସଂଗୀତ ହୟ ।.....  
ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗର ପ୍ରକୃତ ବେଦ୍ୟାର ଏହି ଦେଶେହି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅଇଛି । ଏହି ଦେଶ ପରମ  
ପବିତ୍ର ବୈଦ୍ୟବ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟର—ସୁସମାୟୁକ୍ତାୟା ତାତ୍ପରିକବର୍ଗର—ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ-  
ମାର୍ଗାବଳମ୍ବୀ ଶକ୍ତିସମୁପାସକଦିଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହାଙ୍କର ଗୋବେଦୀ କଳିକାଳେଓ  
ଦେବଭାଷା ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ରରୂପେହି ଅଧିକାରୀ ହୁଅଇ ଆଛି ।

କଳ କଳ, ସତ୍ୟଯୁଗେ ସରସତୀ-ସନ୍ତାନ ଉଦ୍ଧର୍ମିଗଣ ଯେ କାଳୀ ସମ୍ପର କରିଯାଉଥିଲେନ  
ଏହି ଯୁଗେ ଭାଗୀରଥୀ-ସନ୍ତାନମିଗର ଅତିଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ତାର ସମର୍ପିତ ରହିଯାଛି ।  
ଓଷାଦିଗରହି ଦେଶେ ପୂର୍ବ ପିତୃଗଣର ପୁନରୁତ୍ଥାର ସାଧିତ ହୁଅଇବ ।”

ଓଷାଦେବ ଯୁଗୋପାଧ୍ୟାୟ ( “ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି” )

ଓଷା ଶତ

ଓଷା ବର୍ଷ

ଅଗ୍ରହାୟଣ, ୧୭୨୧

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ।

## ଆଲୋଚନା

### ୧ । ଯଥାଯୁଗର ଇୟୋରୋପ

ଯଥାଯୁଗେ ଇତାଳି ଶ୍ରଦ୍ଧେନ ଭିତ୍ତ ଭିତ୍ତ ସାଧୀନ  
ନଗର-ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭକ୍ତ ହିଲ । ଏହି ସକଳ ନଗର  
ବାସନାସ, ବାସିନୀ ଇତାଳିର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟ  
ହୁଅଇଛି । ସାଧନ ହୁଅଇ ପଦ୍ୟନ ନତାନ୍ତୀ  
ପଦ୍ୟତ ଇତାଳିର ଶ୍ରେୟସ, ଶ୍ରେୟସ, ପେଦ୍ଦାସ ।

ପାଣି, ଡେନିଶ ଇତାଳି ନଗରସବୁ ଇଡି-  
ରୋପିୟ ନତାନ୍ତର ସଦାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ହିଲ ।  
ତଦନଓ ଇତାଳି, ଶ୍ରୀଳ, ଡାହେଲି ବିଶେଷ କୋନ  
ଧାତି ଲାଭ କରେ ନାହି । ଇତାଳିୟ ନତାନ୍ତର  
ପ୍ରକୃତ ପଦ୍ୟେ ଏହି ଯୁଗର ଇୟୋରୋପିୟ ନତାନ୍ତର  
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଇୟୋରୋପେର ଦେଶେ ଦେଶେ

ইতালির নগর সমূহকেই সকল বিষয়ে অগ্র-  
করণ করা হইত। এখানকার সাহিত্যই  
পাশ্চাত্য ভগবতের সর্বত্র চিত্রার আদর্শও  
বিতরণ করিত। ইয়োরোপের Renais-  
sance বা নব্যজ্ঞানদর ইতালী হইতেই স্ব-  
ক হইরাছিল।

ইতালীয় চিত্র কলা বলিলে আমরা এই  
যুগের চিত্রকলাই বুঝিয়া থাকি। আধুনিক  
ইয়োরোপীয়েদের সাধারণতঃ যে সকল চিত্রশিল্পী-  
দিগের গৌরব করেন তাঁহারা এই যুগের  
ইতালীয় ভিন্ন ভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে প্রাদুর্ভূত  
হইরাছিলেন।

## ২। ইতালীয় চিত্র কলার কেন্দ্র

ইতালীয় চিত্রকলার প্রধান প্রধান তিনটা  
স্রোতির ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।  
এই তিন শিল্পস্রোতি ভিন্ন ভিন্ন তিন কেন্দ্রে  
বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই তিন কেন্দ্রের  
বিখ্যাত ওস্তাদগণের নাম বটী সেলি, রেফেল  
এবং টিশিয়ান।

ইহারা সকলেই ধর্মবিষয়ক চিত্র অঙ্কন  
করিতেন। তখনও বৃষ্টান-ধর্মের সংস্কার  
আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। তখনও রোমান  
ক্যাথলিক নিয়মে বৃষ্টি-পূজা, মেরি-পূজা,  
ঈশ-প্রেম, শাশু সেবা, মালা-সঙ্গ, মন্ত্র-পাঠ  
ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন নতুন প্রচাৰিত হয়  
নাই। ইতালীয় নগরগুলি সবই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন  
ছিল এবং পরস্পর-বিরোধী ছিল সত্য; কিন্তু  
ধর্ম মত বা ধর্ম কথ্য লইয়া তখনও বিশেষ  
কোন গোপনোপ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই  
এই তিন কেন্দ্রেই চিত্রের কলিত বিষয় এক-  
রূপই ছিল। এই চিত্রগুলি দেখিলে হিন্দু-  
নরনারীও একতঃ ধর্মভাব, তত্ত্বতত্ত্ব, মাতৃ-

দেবা, ভগবৎপ্রীতি অনাদ্যনেষ্ট শিখিতে  
পারেন। হিন্দু ও বৃষ্টানের চিত্র সেই যুগে  
অনেকটা এক ভাবেই অস্থাপিত হইত;  
এবং প্রায় একই প্রকার অলঙ্কার ও প্রতি-  
ষ্ঠানে উভয়ের চরণ গঠিত হইত।

মধ্যযুগের এই ইতালীয় তত্ত্বচিত্রগুলি  
হিন্দুর মনে তাহার বর্ষধর্মই ভাগাইয়া যায়।  
তবে এই চিত্রকলার শারীরিক সৌন্দর্যের  
প্রতি লক্ষ্য বেশী রাখা হইয়াছে। অনেক  
গুলিতে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হয়  
নাই।

বটীসেলি যে শিল্পক্ষেত্রে চিত্র অঙ্কন  
করিয়াছেন তাহাতে চিত্রকরণ সম্বন্ধে লবল  
স্বাধীনভাবে স্বকীয় প্রতিভা দেখাইতে  
পারিতেন না। তাঁহারা অনেকটা পরকীয়  
প্রভাবের অধীন ছিলেন। অবিকল্প তাঁহাদের  
শিল্পে পারিপ্রেক্ষিক বা perspective-এর  
পরিচয় নাই। ইহাদের চিত্রগুলি ইতালীয়  
চিত্রকলার প্রাথমিক যুগ। এটী গুলি দেখিলে  
মূলমানী অলঙ্কার-স্রোতি কথঞ্চিৎ মনে  
পড়ে।

পারিপ্রেক্ষিকের জ্ঞান রেফেল এবং টিশি-  
য়ানের কাণ্ডে যথেষ্টই বৃদ্ধিতে পান্না যায়।  
টিশিয়ানের শিল্পস্রোতিতে আমরা রক্তবর্ণের  
প্রাধান্য অত্যধিক দেখিতে পাই। ইনি এবং  
ইহার শিষ্যবর্গ চিত্রে এই রং খুব বেশী ঢালিতে  
চেষ্টা করিতেন। এই রক্ত ইহাদের কাণ্ডে  
লালটুপীযুক্ত ধর্মবাহকগণের বৃষ্টি কিছু  
বেশী। প্রকৃত প্রভাবে যখন হইতে পারি-  
প্রেক্ষিকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল তখন হইতে  
শারীরিক গঠন, মাংসপেশীর আকৃতি ইত্যাদি  
বাহ্য বস্তু চিত্রে প্রধান স্থান পাইতে লাগিল।

### ৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হুকুমার শিল্প

এই যুগে ভারতবর্ষে যে চিত্র শিল্প বিকশিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে এই শিল্পের তুলনা অনেক বিষয়েই হইতে পারে। এমন কি মধ্যযুগে চীন এবং জাপানে যে চিত্রশিল্পের অধ্যয়ন হইয়াছিল সেগুলিও এই সঙ্গে এক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কর্তব্য। চীন ও জাপানী শিল্পের কতকগুলি নিবর্নন বৃটিশ মিউজিয়ামের কোন কোন প্রকোষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়। Victoria এবং Albert Museum-এর Indian Section & National gallery-এর Italian Section এবং বৃটিশ মিউজিয়াম-এর Chinese and Japanese ornamented illustrated books নামক আলমারীগুলি এক সঙ্গে দেখিলে দর্শক মাত্রের বৃত্তিতে পারিবে যে, এই চারি জাতির চিত্রশিল্পের মধ্যে উচ্চ নীচ স্থান বিতরণ করা বড়ই কঠিন। ক্রমশঃ ভাব-ভাব বুঝাইবার জন্য এক এক জাতি এক এক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার জন্য জাপানী হস্ত ইতালীর চিত্রাবলীর অর্থ বৃত্তিতে না পারেন, ভারতবাসী হস্ত জাপানী চিত্র-পন্থা বৃত্তিতে কষ্ট পাইবেন, এবং পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ ভারতীয় চিত্র কলার অর্থ হ্রস্বত্ব করিতে অসমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু এই জাতিগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যগুলি তুলিয়া দিয়া সমালোচনার প্রবৃত্ত হইলে সকলেই বৃত্তিতে পারিবে যে জাপানী, চীন, হিন্দু-স্থানী এবং ইতালীর সকল চিত্রকরই জীবনের এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। \*অধিকন্তু সকলেরই প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রায় এক প্রকার। রেখাপাত করিতে প্রত্যেক জাতিই প্রায় সমান দক্ষ। এক রকমের দৃষ্টি

অপর রকমের সংযোগ ও সমাবেশ সাধন করিতেও সকলেই সমভাবে পারণ।

প্রভেদের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটা। প্রথম যুগে ইতালীর চিত্র-কলায় পারি-শ্রেক্ষিক ছিল না। ক্রমশঃ তাহার চিত্র-শিল্পকেই এই লক্ষণ-সম্বিত করিতে শিখিয়া-ছেন। মূর্তিচित्रনে শারীরিক নৈসর্গ্য সৃষ্টি ও পরবর্তী যুগের ফল। কিন্তু বোধ হয় ভারতীয় চিত্রকলায় এই লক্ষণের চর্চ্চা ও সাধনা একেবারেই হয় নাই।

• •

### ৪। সমাজ ও চিত্র-কলা

এতদ্ব্যতীত চিত্রকরগণের প্রেরণা এবং জীবনগাণনও অনেকটা এক প্রকার। সকলেই রাষ্ট্রের সাহায্যে অথবা ধর্ম গুরু এবং ধর্ম মন্দিরের সংশ্রবে জীবন বাগন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজসরকার কিংবা দেবালয়ের সম্পত্তি হইতে ইহাদের শিল্প কর্মের জন্য অর্থ ব্যয় করা হইত।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন নগরে এইরূপে “সংরক্ষণ-নীতি” প্রবর্তনপূর্ব্বক দেবালয়, মন্দির, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, কারুকার্য সকলেরই পুষ্টি-সাধন করা হইত। কেবল মাত্র রাজপুতানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বাহীন ও পরম্পর-লক্ষ্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইতালীর নগরগুলির তুলনা করিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। বোধপুত্র, উদয়পুর, অরুণ ইত্যাদি স্থানের চিত্রশিল্প ক্রয়ের ভেনিস, জেনোয়া ইত্যাদি নগরের চিত্র শিল্পের জ্ঞান সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবই পুষ্টি-লাভ করিয়াছিল।

অধিকন্তু বুটান শিল্পগণের অনেকেই বর্ধাঙ্গ সাধক ও তত্ত্ব ছিলেন। কোন কোন চিত্র-

কর উপাশনা না করিয়া চিত্র আঁকিতে বসিতেন না। তাঁহারা গুটানবর্ণবিষয়ক চিত্রাঙ্কনকে সত্যপণ্যই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের শিল্পীরাও এই তত্ত্বভাষেই অহুগ্রাণিত হইতেন। বিশ্মিত শিল্পশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করিলে তাহা বুঝা যায়।

• •

৫। ভারতের পুরাতন শিল্পকেন্দ্র হুতরা ইতালীর রীতিসমূহের স্ভাষ ভারতীয় রীতিসমূহও জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু দুঃখের কথা আমরা আমাদের শিল্পের পরিচয় কখনই পাই নাই। আমাদের কোনও শিল্প আছে তাহাও জানি না। পাশ্চাত্য জগত প্রত্যেক নগরের নামে প্রত্যেক ওতাদের নামে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতি প্রচার করিয়া পৌরবাচিত হয়। আমরা সমগ্র ভারতের ভিতর কোনও একটা মাত্র শিল্পরীতি ছিল কি না তাহাও জানিতে পারি না। কাজেই জাতীয় পৌরববোধ জাগিবে কোথা চটতে? অথবা জাতীয় পৌরববোধ জাগিলে আমরাও জেলায় জেলায়, অন্ততঃ প্রদেশে প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতি প্রচার করিতে শিখিব। সম্রাতি ঐক্য কুমার-স্বামী প্রাণে 'রাজপুত' 'পাহাড়ী' ইত্যাদি নাম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ঐক্য কুমার-কুমার নৈজের গোড়ী শিল্পরীতির আভাস দিতেছেন। বহুবর্ণে ওড়ার বীতপাল এক-বীমানের নামে স্থাপত্যবিদ্যা পূর্ণরূপে চলিত। তাঁহাদের আমলে চিত্রকলার অবস্থা কিরূপ ছিল? এখনও যথেষ্ট অজ্ঞানত্ব এবং সংগ্রহ হয় নাই।

৬। ওলন্দাজ চিত্রশিল্প ইতালীর শিল্প বর্ণশিল্প। বর্ণশিল্পবনের আত্মবলিক ভাবেই এই শিল্পের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু ওলন্দাজদিগের চিত্রকলার বর্ণমগ্নত বিশেষ স্থান পায় নাই। তাঁহারা কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, গৃহস্থালী, সামাজিক জীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদিই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের একজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম রেব্রুও। রেব্রুও আলোকের পার্থেই অন্ধকার দেখাইতে বিশেষ ভাল বাসেন। ইহারা চিত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক অংশ অতি নিখুঁতভাবে আঁকিয়া থাকেন। দুই চারিটা রেখা টানিয়া সজ্জতে বুঝাইতে ইহারা চেষ্টা করেন না। চিত্রে কোন বৃক্ষ আঁকিলে তাহার প্রত্যেকটী পত্র ইহারা দেখাইয়া দেন। এক একটা চিত্রের অস্ত ইহারা যথেষ্ট সময় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন। চিত্র দেবীরা ইহাদিগকে কষ্টদহিষ্ণু জাতি বলিয়া অজ্ঞান করিয়া যায়।

ইতালীয় বর্ণ, সাহিত্য ও শিল্পের সুগমত হইলে স্পেন ও ফ্রান্স, ইয়োরাপের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়। বোড়ন ও লুদন শতাব্দীতে এই দুই প্রদেশের লোকেরই ইয়োরাপে ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, ধন-সম্পদ, নৌশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে অগ্রণী।

তখনও ফ্রান্স এবং ইংলও মাথা তুলিয়া ধাক্কাইতে পারেন নাই। অনতিদূর ভবিষ্যতেই ফ্রান্স ইয়োরাপের হর্তা কর্তা বিধাতা হইবার পথে অগ্রসর হইতেছিল—ইংলওর কাল তখনও বহু ভবিষ্যতে।

কনষ্টান্টিনোপল মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে ইতালির ব্যবসায়-পৌরব নষ্ট হয়। জুব্বালাপরের পথ ত্যাগ করিয়া ইয়োরাপীয়েরা নুতন পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন।

ফলতঃ আঘেত্রিকা, এবং ভারতে আসিবার নতুন পথার আবিষ্কার। এই নবযুগের নতুন উদ্ভবে স্পেন এবং হল্যান্ডই পথপ্রদর্শক। এই ক্ষুদ্র মহাদেশের অবস্থানে এই দুই জাতির প্রাধান্ত দেখিতে পাই।

তখনও বিদ্যমান। তাঁহাদের চিত্রকলায় প্রধানতঃ মেরিতত্ত্ব এবং বীণতত্ত্বই বৃথিতে পাতা যায়।

### শিল্পিগণের মৌলিকতা ও পার্থক্য

৭। ধর্মসংস্কারের প্রভাব  
ইতিমধ্যে ইথোরোপে ধর্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে। ধর্মসংগ্রামে রক্তপাত প্রবাহিত হইয়াছে। ইথোরোপের রাষ্ট্রসমূহ নতুন নতুন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার ভিতর স্পেন রহিয়া গেলেন। প্রাচীন ক্যাথলিক যতাবলম্বী হল্যান্ড ও নতুন সংস্কারবাদীদিগের মত অবলম্বন করিলেন। এই নতুন মতে দেবদেবী, মূর্তি, উপাসনা, ভক্তি, সাধু ইত্যাদি সকল বিষয়েই ধারণার পরিবর্তন হইয়া গেল। কালেই হল্যান্ডের চিত্রকলায় ইতালীয় ধর্ম-শিল্প বা ভক্তিতত্ত্ব পাই না। তাঁহারা নাগরিক আঁকিয়াছেন, নাবিক আঁকিয়াছেন, প্রেমিক আঁকিয়াছেন, কৃষক আঁকিয়াছেন। আদর ওলন্দাজদিগের ঘোড়ার সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজদিগের আর্থিক ও বৈশ্বিক অবস্থা বেশই বৃদ্ধিতে পারি। তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব কিছুই বৃদ্ধিতে পারি না। একত্ব প্রভাবে তাঁহারা যে নতুন ধর্মতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ক্ষুদ্র রোমান ক্যাথলিক রীতির মূর্তিপূজা আবশ্যক হয় না। এমনকি তাঁহাদের শিল্পে মেরী, বীণ, সাধুপুত্র, মহাপুরুষ, ক্রুশ, বলিধান ইত্যাদির পরিচয় নাই। কিন্তু এই যুগের স্পেনীয় চিত্রে কি দেখিতে পাই? সেই ইতালীয় ধর্মশিল্প স্পেনে

মেরিতত্ত্ব, বীণতত্ত্ব, সাধুতত্ত্ব ইত্যাদি সব্বই ইতালীয় ও স্পেনীয় অনেক চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এট সকলের মধ্যে অবশ্য একটা সাধারণ ঐক্য ও সমতা নিশ্চয়ই আছে। সকল জাতির শিল্পী এক বাইবেল-বর্ণিত কাহিনীই চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু কল্পনার সকলেই কোন এক আদর্শের নকল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইতালীয় গুস্তাভেরা পরস্পর নকল করিতেন না। স্পেনীয় গুস্তাভ ভেলস্কেয়েজের (Velasquez) রচনা ও ইতালীয় শিল্প হইতে অগ্রকল্পন নহ। বিষয়ের পরিকল্পনা আকৃতির সৌষ্ঠব বিधानে, মুখশ্রীর ভাববিকাশে এক একজন এক এক প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। হৃতয়া বেরীমূর্তি অনেক প্রকার, বীণ মূর্তি অনেক প্রকার, মহাশয়গণের মূর্তিও অনেক প্রকার।

আমাদের হিন্দুধানেও শিবমূর্তি, কালীমূর্তি, বৃষ্ণমূর্তি, কৃষ্ণমূর্তি এবং রামমূর্তি সকল প্রদেশেই কি কোন এক আদর্শ অচুসারে অঙ্কিত গঠিত বা খোদিত হইয়াছে?

ভিন্ন ভিন্ন কারিগরের হাতে আমাদের প্রসিদ্ধ দেবদেবীগণ কথকিং ভিন্ন ভিন্ন আকার পাইয়াছেন। অবশ্য মোটের উপর এই বিভিন্নতার মধ্যেও একটা শাস্ত্রীয় ঐক্য লক্ষ্য করা কঠিন হইবে না।

## ৯। অক্সফোর্ড-কেব্রিজেয় মায়া

কেব্রিজ ইত্যাদির নামে আমাদের জিজ্ঞাস্য ভাল পড়ে কেন? প্রধান কারণ এখানকার শিক্ষকেরা সকলেই নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে ধ্যানভাব বিশেষত্ব হইয়া থাকিতে চেষ্টা করেন। ইহাদের সমগ্র সুযোগ ও অর্থ বেশী। অধিকক্ষণ ব্যয় করিয়া, অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অধ্যাপকেরা বক্তৃতা প্রস্তুত করেন? ছাত্রেরাও অধিক অর্থব্যয় করে বলিয়া তাহার মূল্য আদায় করিয়া লইতে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকে। উন্নত শিক্ষার আর কোন লক্ষণ এখানে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

চিত্তাশীল ও পরিশ্রমী ছাত্রেরা কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসত। শিক্ষা করে ওখানকার ছাত্রেরা তার চেয়ে বেশী কিছু শিখে বা বুঝে তাহা অসম্ভবান করিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের ভাল ছেলে এবং ওখানকার ভাল ছেলে প্রায় একপ্রকার।

সুতরাং অক্সফোর্ড কেব্রিজে ভারতবাসী ছাত্রের আদিলেই যে পণ্ডিত হইয়া পড়িবে তাহা না জাবাই ভাল। যে সকল ছাত্র ভারতবর্ষে ভাল কণ দেখাইতে পারে তাহারা ই এখানে বাইরাও কৃতিত্ব দেখাইবার উপবৃত্ত। তাহারা পূর্বেও ভাল পণ্ডিত, ওখানেও ভাল শিখে। পাখা পিটাইয়া মাছ খরিবার ব্যবস্থা কোথাও নাই। বরং পাখাছাত্র ওখানে পাখা থাকিয়া বাইবারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ ছাত্রেরা ওখানে সকলেই স্বাধীন। লেখা পড়া না করিলেও কেহ কিছু বলেন না। কোন অধ্যাপকের কোন বক্তৃতা না শুনিতে গেলেও কেহ বাধা করেন না।

## ১০। তথা কথিত রেসিডেন্সিয়ালে বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক ও ছাত্রের যোগাধান অতি অল্প। অধ্যাপকগণের সহবাস কোন ছাত্রই পায় না বলা ঘাটতে পারে। Residential বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সমান্তর 'গুরুগৃহ' ও 'ছাত্রগৃহ' হইতে কত সম্পূর্ণ বস্তু তাহা কেব্রিজেয় সকল ভারতীয় ছাত্রই স্বীকার করিবেন। চরিত্র গঠন, জীবন বিকাশ, ভবিষ্যতের আদর্শ স্থিতি, বর্ধমান ইত্যাদির পুষ্টিসাধনে ছাত্রেরা অধ্যাপকের কোন সাহায্য পায়ই না। এমন কি লেখাপড়া, গ্রন্থপাঠ মানসিক শিক্ষা ইত্যাদি সযত্নেও ছাত্রে এবং শিক্ষকে আদান প্রদান ও ভাববিনিময় অতি অল্প। অধ্যাপকগণের কোন প্রভাবই কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পায় না বলিলে কোন অত্যাক্তি হইবে না।

কাজেই ভারতীয় ছাত্রেরা কেব্রিজে আসিয়া বিশেষ উপকৃত হইবে না। অবশ্য দৈবক্রমে সুযোগ অনেক আসিয়া জুটতে পারে—তাহার ফলে হয়ত কোন ছাত্র কোন অধ্যাপকের সাহায্য বেশী লাভ করিল। কিন্তু তাহার উপর ত নির্ভর করা যায় না।

• •

## ১১। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে

## ভারতীয় ছাত্রের

## লাভালাভ

কিছু বিলাতী ছাত্রদের কথা বস্তুত। তাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মেই যত শিখিতে পায় ভারতীয় ছাত্রেরা তত শিখিতে পায় না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহাদের অল্প নূতন কোন সুযোগ বা অধিকার স্থগিত করা হইয়াছে তাহা নহে।



প্রথমতঃ ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে অনেক শিখিবা থাকে। সাধারণ পাঠশালায় ইহারা জগতের সকল পন্থার সম্বন্ধে শিক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের কাণ্ডজ্ঞান বেশী বিকশিত হয়। আমাদের বিএ উপাধি-ধারী ছাত্রেরা মোটের উপর বৃত্তমিকে দৃষ্টি ফেলিতে হুযোগ পায় ও ধানকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে তদপেক্ষা বেশীদিকে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু ইহাদের বহু পদ চক্ষু কর্ণ সকলই ন্যূনাত্মক শিক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা সরল সজীবভাবে জ্ঞান অর্জন করে। ফলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা দূতর বিত্বতর এবং গভীরতর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে কেবল বা অস্বচ্ছন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ভারতীয় ছাত্র অপেক্ষা বিলাতী ছাত্রই বেশী উপকার লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ বিলাতী ছাত্রেরা যদেই আব-হাওয়ায় বসিয়া পাক্যাত্ত বিজ্ঞান সাহিত্য বেশী শিখিবে আর হিন্দুস্থানী ছাত্র বিদেশীয় সমাজে থাকিয়া তত শিখিবে না তাহাত বৃত্তঃসিদ্ধ। অধিকন্তু ছাত্র ছাত্র ভাববিনিময় এবং কর্তব্যবিনিময় বিলাতী ছাত্রসমাজে বৃত্ত ঘনিষ্ঠ ভারতীয় ছাত্রসমাজে সেরূপ হইতেই পারে না। ইংরেজ ছাত্রেরা ইউনিয়নের বক্তৃতায় ২৪ ঘণ্টা রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করে। সামাজিক উৎসব, ক্রীড়া কোর্সক নাচগান, নৌকা বিহার, ক্রিকেট পোলো ইত্যাদি ইহাদের অববরণত চলিতেছে। এই সকল কার্যে ভারতীয় ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে যোগদান করিতে পারে। কিন্তু করিতে গেলে যথেষ্ট অর্থব্যয় আবশ্যক। অতঃপরচ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহা ছাড়া করিয়াই বা লাভ কি? বিলাতী ছাত্রেরা এই

সকল ব্যায়াম, উৎসব, সন্মিলন ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য-পালনে দৃঢ় হইয়া থাকে। এই শিক্ষা ও খরচ তাহাদের বৃথা যায় না। ভবিষ্যতে তাগারা দেশের নাগরিক, সমাজের কর্তা, ক্রীড়াস্থলের কাপ্তেন, সমরবিভাগের সেনাপতি, সন্মিলনের সভাপতি ইত্যাদি হইবার হুযোগ পায়। কাজেই এখন হইতে তাহারা সেজন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আমাদের ছাত্রেরা এখন এমন শিখিবা ভবিষ্যতে কি করিবে?

তাহাদের সকল পথই অবরুদ্ধ। একমাত্র ব্যারিষ্টারি বা শিক্ষকতা তাহাদের সম্ভল। এই অবস্থায় অল্প কোনরূপ কর্ণের আন্দোলনে যোগদান করিবার হুযোগ তাহাদের ঘটে না। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে ভারতীয় ছাত্রেরা যোগদান করিতে সাধারণতঃ উৎসাহী হইব না। যোগদান করিলেও বিশেষ উপকার বোধ করে না। কিন্তু ইংরাজ ছাত্রেরা এই সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। তাহারা ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাগারা বেশী পটু ও কর্ণ-কাণ্ডে জ্ঞানশীল হয়।

• •

## ১২। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের ছুরবস্থা

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের অবস্থা গুনিয়া অল্প ফেলিতে হয়। প্রথমতঃ হিন্দু মুসলমান বিরোধ, তাহার উপর বাধ্যতা, পাণ্ডাবী যাত্রাটা বিরোধ। এই সকল বিরোধের মূলে ব্যক্তিগত প্রণয়সাক্ষ্য, অহংকার ও পরস্পরাত্তরতা।

আজকালে বিলাতী ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ভারতীয় ছাত্রগণকে ভাল চোখে দেখেন না।

ভাষ্যের সঙ্গে আমাদের ছাত্রেরা সন্ধান ভাবে বা বন্ধু ভাবে মিশিতে পার না। এই বিশেষ বিচ্ছেদের আবুগাওয়া আনা করা যায় যে ভারতীয় ছাত্রেরা মলবন্ধ ভাবেই থাকিবে। কিন্তু ঠিক যে উট। শুনিতেছি। আমাদের ছাত্রমহলে নাম করিবার ইচ্ছা নিজে কব্ধ করিবার ইচ্ছা অত্যধিক। এই স্বার্থপরতা এবং নীচ পরস্পরতারই প্রধান কারণ ছাত্রদের পরস্পর বিবেচনা ও অনৈক্যের কারণ।

কিন্তু এই অল্প প্রকৃতি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ইহারা অল্প উপায়ে এবং অল্প আকারে মল পাকাইয়া থাকে। কেহ বলে 'বাকালীরা বড় অহঙ্কারী, তাহাদের সঙ্গে মিশা অসম্ভব।' কেহ বলে 'মাত্রাজীরা বাকালীর সঙ্গে মিশিতে চাহে না।' এইরূপে পাজাবী এবং মাত্রাজী ছাত্রের পরস্পর গোলাবোম বাধিয়া থাকে। ব্যক্তিগত কলহকে জাতিগত রেখাবিহীন আকার প্রদান করিবার জন্য অহঙ্কারী ও স্বার্থপর ছাত্র-নায়েকেরা বড়বড় সৃষ্টি করিতেছে। মোটের উপর একটা বিষয়ের ফল বলিতেছি। দেশের জননায়কগণ প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন কি?

গণদায়ক ভারতীয় ছাত্রেরা নিজের কথাই বেশী ভাবে—দেশের কথা ও সমাজের কথা এবং জাতীয় ভবিষ্যতের কথা আমো ভাবে না। যে চুহু ভাবে তাহা অলীক বাগাড়ম্বর-পূর্ণ ও নিরর্থক। তাহার মূল্য অতি সামান্য মাত্র। এ অন্তই নিজ নিজ সম্মানের কোন জ্ঞানই হইলে ইহারা সঙ্করিতে পারে না। তাহার বখেই কারণও আছে। ইহারা প্রায় সকলেই ধনবানের পুত্র—ইহাদের পরস্পর অভাব নাই। বাহ্যিক টাকা খরচ করিয়া ব্যক্তিগত শিখিতে বাহ তাহাদের পক্ষে

ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত মান সম্মানের কথা তুলিয়া থাকে অসম্ভব। কাজেই কাহাকেও ক্ষমা করা এবং নিজের কতি বীকার করা ইহাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

ভারতবর্ষে আমাদের জননায়কদের যেরূপ পরস্পর বিবেচনা ও অনৈক্য তাহাদের সম্মান-গণের মধ্যেও সেইরূপ ভাব থাকিবে তাহার আর আশঙ্ক্য কি? ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধিত্ব কথা ভাবা অতি সহজ। জাতিগত, সমাজগত এবং দেশগত চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু একবার সেই আদর্শ হৃদয়ে স্থান পাইলে মানুষের সামর্থ্যগুলি মাগে, নিজকে তুলিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মে। তখন নিজকে ছোট করিয়াও সমষ্টিগত কর্ণে লিপ্ত থাকা যায়। ছাত্রের কথা সে আদর্শ ভারত সমাজে এখনও বেশী পরিমাণে সৃষ্ট হয় নাই। কাজেই ব্যক্তিগত বিরোধ তুলিয়া জাতিগত সম্মান পুষ্ট করিবার প্রবৃত্তি এখনও বিকশিত হয় নাই।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র-সমাজের এই শোচনীয় চিত্র দেখিয়া বুঝিতেছি ইতিহাস ভ্রাম্যন্তাল কংগ্রেসেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও চলিতেছে। বিলাতের এই ছাত্রগণই কবেক বংসর পরে নিজ নিজ প্রদেশের জননায়ক হইয়া বসিবেন।

• •

### ১৩। স্বায়ত্ত-শাসন

স্বায়ত্ত-শাসনের সংজ্ঞা দিয়া কোন সাত নাই। ক্ষুদ্র আকারে ইহার প্রকৃতি সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। গ্রাম্য পঞ্চায়ত-সমিতি স্বায়ত্ত-শাসনের অতিমাত্র সরল দৃষ্টান্ত। এই পঞ্চায়ত-সমিতি এবং আমেরিকার ক্ষুদ্র

মহারাষ্ট্রের সিনেটের এবং "হাউস অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস"র মধ্যে প্রতিনিধিত্ব পার্থক্য কিছুই নাট।" গ্রাম্য পদ্ধতিতে সমিতি গ্রাম-বাণিজ্য কৰ্ত্তৃক নির্ধারিত হয়। গ্রামের সাধারণ মঙ্গল সাধনই ইহার কৰ্ত্তব্য। গ্রাম হইতে গ্রামমণ্ডলীর জন্ত, গ্রামমণ্ডলী হইতে প্রদেশবিভাগের জন্ত, প্রদেশবিভাগ হইতে সমগ্র দেশের এবং ক্রমে মহাদেশের জন্ত ও ভিন্ন ভিন্ন স্বায়ত্ত-শাসন-সমিতি গঠিত হইতে পারে। কৰ্ত্তব্যের পরিমাণের এবং জটিলতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কৰ্ত্তৃপক্ষের নির্ধারনপ্রণালীর ইত্যবিশেষ হইতে পারে সত্য। কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসনের স্বভাবগত ঐক্য সৰ্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে।

গ্রামেই হউক আর প্রদেশেই হউক যাবতীয় অধিবাসিগণ কোন মতেই সাক্ষ্য সঞ্চয় শাসন-কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। জীবনের নিতাইনমিত্তিক কাজ, প্রকৃতির বিভিন্নতা এবং শাসনকার্যই বিশিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা হেতু সৰ্বসাধারণ কৰ্ত্তৃক সাক্ষ্যসঞ্চয় শাসনকার্য নির্বাহে অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার শাসনপ্রণালী এবং শাসন-কার্যের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণ লক্ষ্য না রাখিলে কালে সৰ্ববিধ মঙ্গলেরই হানি অবশ্য-জ্ঞাত। কাজেই সৰ্বসাধারণে মিলিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে শাসনকার্য ও তত্ত্বাবধানের জন্ত নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তিগণ সাধারণ স্বার্থের অভিবাচক স্বরূপ হন। যতদিন না তাঁহারা এই অভিবাচকতার অসম্ভাবহার করেন অধিকাংশ স্থলেই ততদিন তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে থাকেন।

প্রতিনিধি কৰ্ত্তৃক শাসনই স্বায়ত্ত শাসনের বিশিষ্ট প্রকৃতি। প্রতিনিধি নির্ধারন প্রণালীর এবং প্রতিনিধির ক্ষমতার বিভিন্নতা অল্পদূরে

মান্য প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের আলোচনা স্থানান্তরে হইবে। এখন দেখা যাক স্বায়ত্ত-শাসন ভিন্ন অঙ্গের যে যে শাসনপ্রণালী আছে তাহাদের সঙ্গে স্বায়ত্ত-শাসনের সম্বন্ধ কিরূপ এবং স্বায়ত্ত-শাসনের বা উপকারিতা বা অল্পপকারিতা কতদূর।

• •

### ১৪। শাসন-তত্ত্ব

শাসন যেচ্ছাচারিতাত্ত্ব (despotic) হোক, বা মুষ্টিমেয় কৰ্মচারী কৰ্ত্তৃক হোক (Bureaucratic) বা কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবার কৰ্ত্তৃক (aristocratic) হোক, জনসাধারণের সহায়ত্ব এবং সম্মতি পাইবার জন্ত সৰ্বত্রই শাসনকৰ্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকে। চুরাচার যেচ্ছাচারী, মুখ কৰ্মচারী, অভিমাত্রী সম্ভ্রান্ত শাসনকৰ্ত্তা কিসে নিজ অধীনতা জনসাধারণকে ভূত রাখিবে তচ্ছত্র বিচারাজি সচেত। লোকসাধারণকে ভ্রান্ত বা অশ্রান্ত ভূমিতে রাখা সকল শাসনকৰ্ত্তারই মূখ্য উদ্দেশ্য। কেন? লোক সাধারণের সম্মতি এবং সহায়ত্ব ভিন্ন কোন শাসনই দ্বারী হইতে পারে না।

স্বায়ত্ত ও অস্বায়ত্ত শাসনে প্রভেদ কি এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অস্বায়ত্ত শাসনে জনসাধারণের শাসনকার্যে অধিকার স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু শাসন কার্যে সাধারণের সম্মতির প্রয়োজনীয়তা একটা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই শাসনকৰ্ত্তৃপক্ষের মঙ্গলের জন্ত এই স্বতঃসিদ্ধটা প্রচ্ছন্নভাবে শাসনবিধির সূচীভূত করা হয়। কিন্তু জনসাধারণের সহায়ত্ব এবং সম্মতি ভিন্ন শাসনকার্য নির্বাহ হইতে পারে না ইহা স্বায়ত্তশাসনবাহীর

সর্বাধিকার কথা। স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণপোষকেরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন এবং জনসাধারণের অধিকার কার্যবিধির শ্রেষ্ঠ অংশে পরিণত হয়।

স্বায়ত্ত-শাসনে, জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা এবং স্বার্থ সিদ্ধি করিতে না পারিলে শাসন-কর্ত্তা স্বাধী হইতে পারেন না। কাজেই জনসাধারণের স্বার্থ ও শাসনকর্ত্তাদিগের স্বার্থ একীভূত হইয়া থাকে। তার ফল স্বশাসন। অথাতঃ শাসনে, জনসাধারণ ও শাসনকর্ত্তার স্বার্থের এই ঐক্য প্রায়ই ঘটে না। একদল লোক যদি শাসনকার্যের তার পায় তবে অতি সম্বরেরেই তাহাদের মধ্যে একটা আত্ম-ক্ষমতার জ্ঞান উদ্ভব হয়। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার খেচ্ছাতার ব্যবহার আসিবেই আসিবে। আবার একদল লোক যদি শাসন-কার্য নির্বাহ করে, ক্রমে ইহাদের মধ্যে একটা আত্মসহায়ভুক্তি এবং সমস্বার্থজ্ঞান আসিবেই। ব্যক্তিগত স্বার্থ এই আত্মজ্ঞান কোনমতেই দূর করিতে পারে না। কালে শাসনকর্ত্তাদিগের স্বার্থ এবং জনসাধারণের স্বার্থ এই দুইটি স্বার্থের উৎপত্তি এবং সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ক্ষমতাবাদ শাসনকর্ত্তৃগণই অবশ্য অগ্রী হন। কিন্তু জনসাধারণের হিত কোন মতেই সম্বব হয় না।

## ১৫। শাসন-বিজ্ঞান ও

### মানব-প্রকৃতি

নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইতে দেখা যায় যে লোকে নিজের স্বার্থ নিজে যতদূর বোঝে অস্ত্র কেহই সেত্বপ পারে না। আরও দেখা যায় নিজে নিজের কাল করিলে সর্বা-পেক্ষা বেশী সম্ভাব্যজনক হয়। এমন কি

নিজে করিলে যদি ভুলও হয়—তথাপি পরিণামে তার উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী। এ সব সামান্য কথা সত্য। কিন্তু শাসনকার্যেও যে এই একই কথা খাটে একথা সহজে উপলব্ধি কেন হয় না? শাসন-কার্যে ও নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যে কোন মতেই স্বভাবগত প্রভেদ নাই। যাহাতে দৈনিক কার্য নিয়োগে নির্বাহ হয়, তার ফল সর্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং সমভাবে উপভুক্ত হয়, ইহাই শাসনকার্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের দ্বারাও পূর্ণ হইতে পারে। কাজেই অস্ত্রাত্মক নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যের পক্ষে যা সত্য শাসন-কার্যের পক্ষেও তাই সত্য কেন হবে না?

এ কথা বলা যাইতে পারে যে শাসনকার্য কোন মতেই অটলতা বিহীন নয়। এ অটলতা বৃষ্টিবার ক্ষমতা সকলের নাই। শাসনকার্যে পারদর্শিতার ভ্রম যে পরিমাণ শিক্ষার প্রয়োজন তার সুযোগও অনেকের নাই। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত-শাসন থাকা না থাকা সমান। কারণ বহুবলে স্বায়ত্ত-শাসন থাকা স্ববেও একদল শিক্ষিত এবং দক্ষ লোক যাত্র শাসন কার্য নির্বাহ করেন। সাধারণ লোক তাদের কথার লায় দিয়া চলে যায়। একবার উত্তর অতি সহজেই বেওয়া যায়।

শাসনকার্য দূরত্ব হইলেও শাসনের ফলাফল উপলব্ধি করা কোন মতেই দূরত্ব নয়। সামান্য শিক্ষার বিভাগে এবং স্বাধীন মূল্যবোধের সাহায্যে অতি দূরত্ব শাসনবিষয়ক সমস্যা-গুলিও সহজেই সাধারণের উপলব্ধিতে আনা যাইতে পারে। কাজেই শাসনকার্য দূরত্ব হইলে উহার ফলাফল বিচার কোনমতেই সাধারণের অধোদগম্য নয়। আর স্বাধিক-

শাসনেও সাধারণ হইতে কোন কার্যের সমর্থনাদমর্থনের যেই কিছু প্রয়োজন হয় না। কাজেই শাসনকার্য্য-নির্বাহী হুত্ব একথা কোন মতেই বাতুলপাণনের প্রতিফল নয়।

নিজ নিজ মঙ্গলসাধনে স্বাধীনতা সকলেরই থাকি আবশ্যক। নিজ নিজ মঙ্গল প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ, সাধারণের মঙ্গল লোক-সমগ্রীর পক্ষে ঠিক সেই রূপ। কাজেই এক পক্ষে স্বাধীনতা উচিত হইলে অপর পক্ষেও ইহা সমান উচিত সম্বন্ধ নাই।

• •

### ১৬। শিক্ষা ও শাসন

স্বাধীন-শাসনের অন্য সামান্য শিক্ষার প্রয়োজন বলা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা না হইলেই যে স্বাধীন-শাসনের সুত্রপাতও করা যায় না একথা ভুল। গ্রাম্য পদ্ধান্তে সমিতির দ্বারা পুরাতন জিনিষ পৃথিবীতে কথ আছে। আমরা বাহ্যিক সাধারণ শিক্ষা বলি তাহার সুত্রপাতের অন্ততঃ চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই পদ্ধান্তে সত্যের নীতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যাজিত ছিল। আত্মশাসন-ক্ষমতা মানুষের মঙ্গলপত গুণ। জীবন-লব্ধকণের প্রগতির দ্বারা আত্মশাসনও মানুষের প্রকৃতিগত। ইহা নূতন করিয়া দেখাইতে হয় না।

স্বাধীন-শাসনের অন্য শিক্ষার প্রয়োজন—আবার স্বাধীন-শাসন নিজেও শিক্ষাদাতা। সীতার শিথিলে যত সীতার বেওয়া যায় দক্ষতা ততই বাড়ে। সেই দক্ষতার স্বকল শুধু সীতার বেওয়াই নয়—কিন্তু অস্ত্রাত্ত নানা-বিধ শারীরিক প্রবেশও সাধায়া করাও। স্বাধীন-শাসন মানুষকে শাসন করার

বহুবিধ পান্থিক সমর্থন কার্যে নিপুণতা দান করে। দায়িত্বজ্ঞান মানুষের অতি দ্রুত-কারী গুণ। যে মানুষ কোন বিষয়ে আপনাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিয়াছে সে সেবিষয়ে পটুতার সহিত কাজ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। স্বাধীন-শাসনের প্রভাবে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে শাসনে সম-অধিকারী এবং সম-দায়িত্বশীলী বিবেচনা করিতে পারে। শাসনে যে তাহার ভাগ অংশ সকলেরই সমান এবং এমন কি কর্তৃপক্ষেরও যে তাহারই মত অঙ্গপারে কর্তৃপক্ষ হইয়াছে, এ কথা যে ভাবিতে পারে পৃথিবীতে অনেক হুত্ব মঙ্গল সাধনেও তাহার উৎসাহ ও শক্তির বিকাশ হয়।

### ভারতের চরম লক্ষ্য

বহুদৈর্ঘ্য ফলে আমাদের দেশে কর্তৃ-প্রবণতা আদিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেকই একটা না একটা কর্তৃ-লব্ধ গঠন করিয়াছেন বা করিতেছেন এবং তাহার উন্নতির দক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টারও জট করিতেছেন না। এই স্তর দুইটো আমাদের কতকগুলি বিষয় বেশ ভাল করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক।

আমরা দেখিতেছি তাহার কর্তৃ নানিচ্ছা-ছেন, তাহার মনে করিতেছেন তাহারের পথই সর্বমুখ্য এবং লক্ষ্যে পৌছাইবার এক-মাত্র উপায়। ফলে পাড়াইয়াছে, তাহার অস্ত্রাত্ত পথকে গ্রাহ্যই করিতেছেন না, এবং যেনটা যে কেবল তাহারের পথের দিকেই, উন্নতির অন্ত, হাপুশনমানে তাকাইয়া আছে, ইহাই তাহার ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন।

উদাহরণে এই তত্ত্বসমূহ খুবই প্রাথমিক হইত। যদি উদাহরণে অক্ষতা ও পরীক্ষিতরস। না থাকিত। আমরা এই তত্ত্বসমূহকে 'আমাদের আটখানা হওয়া' মতই মনে করি। এবং তাহার দ্বারা কুল তাহাই দেখিতে পাই। আমাদের একটু নৈরাজ্য বা ভীতি উপস্থিত হইয়াছে।

সত্যনি প্রস্তুত হইবার পর তাহার শিক্ষা, নীতি, ন্যায়িক, মানসিক সর্গাৎকরিত বাহ্যতে সমভাবে উন্নতি হয়, সুশিক্ষা, সুশিক্ষা, সিদ্ধি বাহ্যতে কুলক্ষারনা হয় শৈথিল্যে পরদৃষ্টি রাখিতে হয় না কি? বর্তমান সমাজে মুখো-ক্ষমকারী হইয়া মানুষ না হয় ততদিন নিশ্চিন্ত থাকি যায় কি? প্রস্তুত সমাজকে যেভাবে গঠিত করা যায় তাহাই হয়, লম্বাই সতর্কতা ও শিক্ষার গুণে দেওয়া করিয়া তুলিতে পারা যায়, আবার তত্ত্বসমূহ উচ্চতর অবস্থায় সমতা-নেও পরিণত হইতে পারে। আমাদের উপস্থিত ক্ষেত্রের অবস্থাও সমাজ পালনেরই মত, যেমন স্থানের কেবলি কঠিন। প্রতিপদে জাতি আদিতে পারে; ভীষণ দায় থাকে পড়িয়াছে।

চারিদিক ঘেঁষিয়া মনে হয় এই তত্ত্বসমূহই আমাদের আশির্বাদে, ক্রমশঃই সতর্কতা হারাতে চলিয়াছে। যে যে পথে কার্য করিতেছি তাহাতে গুণ বর্ধিত উন্নতি বর্ত-নিশ্চয় করিয়া আনন্দে দিনাহারা হইতে চলিয়াছে। এটা শতবার স্বীকার্য উন্নতি বৃদ্ধিতে সর্গাৎকরিত উন্নতিই বুঝা, সম্যকপুষ্টিই বুঝা। আবার এটাও ঠিক চাও, পা, নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি সকল অতি স্বন্দর ভাবে গড়িতে পারা যায় কিন্তু বস্তুত তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইতেছে ততক্ষণ তাহা পুতলিকাই থাকে। আমরা মানুষ হইতে চাই অথচ আমাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোথায়?

একটা লোকসমষ্টিতেই কিছু ভাঙি বলা যায় না, যে লোকসমষ্টির একটা চরম লক্ষ্য আছে তাহাকেই ভাঙি বলা যায়। চরম লক্ষ্যই জাতির প্রাণ। জগতের যে কোন জাতির বিবেক নব্বয় করিলেই দেখা যায় তাহার একটা চরম লক্ষ্য আছে এবং যে জাতি প্রতি কাঁধে, প্রতি ব্যবহারে নিজ চরম লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার্যে বসটি রাখিতে পারিয়াছে সে ততই উন্নতিরপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম। Organisation ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, আবার চরম লক্ষ্য ঠিক না হইলে organisationএর চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র।

আমাদের অবস্থা এখন কি? চারিদিকেই জীবনের চিহ্ন দেখা যায়। তাহাতেই সত্য, যে যে পথে ধরিয়াছে সেই পথেই অগ্রসরের জন্ত প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছে তাহাও সত্য তথাপি কোন সূক্ষ্মতা নাই, কেহ কাহারও দায় ধারেনা, নিজ নিজ পথ ছাড়া অন্য পথে বিশ্বাসী নহে ফলে মিলিত শক্তির বিকাশও নাই অধিকন্তু বিন্দু-খলা ও বিচ্ছেদই দিন দিন বাড়িতে চলিয়াছে। কারণ কি? Organisationএর অভাব। চরমলক্ষ্য এখনও ঠিক নাই তাহারই প্রমাণ। বর্তমান না আমাদের এই লক্ষ্য ঠিক হইতেছে ততদিন আমরা, বর্তাই উন্নতি করি না কেন, মানুষ পড়িতে পারিব না, বড় হোর সর্গাৎ-স্বন্দর পুতল পড়িতে পারি; আমাদের অবস্থা কাটা খুঁড়ির মতই থাকিবে। কোথায় পড়িবে ঠিক নাই। হাতে মৃত্যু নাই, খুঁড়ি বলে আদিবে কি? বেকশওবিহীন মানুষ যেমন অসম্ভব, চরমলক্ষ্য ব্যতীত জাতির অস্তিত্বও তদ্রূপ।

অনেকে ভারতের চরম লক্ষ্য বুঝিয়া না পাইয়া পাকিস্তান রাজনৈতিক আন্দোলনকে,

ভোগকেই চরম লক্ষ্য দাঁড় করাইতে চান।  
অন্য পক্ষে আমরা এতদূর আশ্চর্য্য হইখাছি  
যে আমাদের কি আছে না আছে,  
কি ছিল কি তারাইয়াছি, কেন পতন  
হইয়াছে তাগা বিচার করিবার, অসুস্থমান  
করিবারও ক্ষমতা নাই। ভাড়াভাড়ি  
সমূহে যে আদর্শ পাইতেছি তাগাই আমরা  
করিতে প্রস্তুত, ফলাফল বিচারের অবধি সময়  
নাই : যোগ ত সাম্প্রতিক হইয়াছে কিন্তু  
কি নিষে ছাড়াই। নরিতে বলিয়াছে, তাহা  
নির্দোষ না হইলে প্রতিবেদক দেওয়া যাইবে  
কি করিয়া ? আত্মা কি কতকগুলি ঔষধ  
প্রয়োগেই কি ফল ফলিবে ? ফল ফলিবে না  
ফলিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে ? ভারত  
আজই না হয় পতিত কিন্তু এমন একদিন ছিল  
যে দিন সময় অগতকে তাহার নিকট মৃত্যু  
নত করিতে হইয়াছিল, অথচ এই পতিত  
ভারতই এক সময়ে সময় অগতকে জানা-  
লোকে উদ্ধারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল,  
তখন তাহার পুষ্টিকর চরম লক্ষ্য ছিল না  
বলা যায় না, বলিলে অবৈজ্ঞানিক কথা বলা  
হয়, এখনও যে নাই তাহাও বলা যায় না,  
না থাকিলে এতদিন ঘরের বাহিরের উৎপাত  
সহিয়া, ভাল ভাবেই হোক আর মন্দ ভাবেই  
হোক, বাঁচিত না। যতদিন ভারতের চরম  
লক্ষ্য ঠিক ছিল ততদিন ভারত উন্নতির পি-  
ছনের অধিকারী ছিল, যে দিন হইতে লক্ষ্য-  
ভ্রষ্ট হইয়াছে সে দিন হইতেই পতনেরও  
স্বপ্নপাত আরম্ভ হইয়াছে এবং যতই লক্ষ্য  
হইতে দূরে যাইতেছে ততই পতনের দিকে  
অগ্রসর হইতেছে। এখনও যখন ভারত  
ঘরের বাহিরের উৎপাত সহিয়া ভাল ভাবেই  
হোক আর মন্দ ভাবেই হোক বাঁচিয়া আছে,  
এখনও যখন জাতি নামে আমরা অভিহিত

হইতেছি, তখন বুদ্ধিতে হইবে আমরা চরম  
আদর্শ হইতে বহুদূরে দিয়া পড়িলেও সম্পূর্ণ  
বিচ্ছিন্ন হই নাই, হইলে লক্ষ্য হইয়া যাউতাম।  
অতএব দেখা যায় ভারতের একটা চরম  
আদর্শ ছিল এবং এখনও আছে। ঘরেই  
আদর্শ থাকিতে অস্ত্র দ্বারা করিতে যাইবার  
প্রয়োজন কি ?

উক্তিগান আলোচনায় দেখা যায় ভারতের  
চরম লক্ষ্য সব, রত্ন নহে, ত্যাগ, ভোগ নহে।  
ভারতে রত্নভাব কখনই চরম লক্ষ্যরূপে স্থান  
পায় নাই। রত্নভাব ক্ষত্রিয়ের। যতবার  
ভারত ক্ষত্রিয় পরিচালিত হইয়া রত্নভাবকেই  
চরম লক্ষ্যরূপে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে তত-  
বারই কে যেন ক্ষত্রিয়লজ্জা মখল করিয়া তাহার  
কবল হইতে ভারতকে রক্ষা করিগাছে।  
রত্নভাব ভারতে ছিল না একথা বলা যায় না,  
খুবই ছিল, কিন্তু কখনই সর্ব্বের উপর প্রভুত্ব  
পায় নাই, যখন সর্ব্বের উপর প্রভুত্বের চেষ্টা  
করিগাছে তখনই দলিত হইয়াছে। পরন্তরায়  
কর্তৃক ভারতের নিকজিহব এবং ভগবান  
বুদ্ধের আধিভাবই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।  
ভগবান বুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া,  
প্রবল রত্নশক্তির ও ভোগের অধিকারী  
হইয়াও বহুনির্ব্বোধে প্রচার করিলেন ভারতের  
মুক্তি ত্যাগে, ভোগে নহে। ভারতের লক্ষ্যে  
ভোগের বীজ টাঁকিবে না।

বিনিই ভারতকে সম্যক পাঠ করিতে  
পারিগাছেন, তিনিই আধ্যাত্মিকতাই  
ভারতের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া-  
ছেন। আচাৰ্য্য দ্বারা বিবেকানন্দ বলিতে-  
ছেন—“To flood India with  
politics, first flood India with  
religion” অর্থাৎ ভারতকে রাজনৈতিক  
বতায় ভাসাইতে গেলে আগে ধর্মের বতায়

প্রাবিত্ত কর। অনেক এই কথাই পিতৃবিরা  
উঠেন—যেমন “যথ ধর্ম কথিষ্যই ভারত  
বলাতলে দেশ।” তাঁহারা যদি একটু ভাল  
কথিয়া অকথাবন করেন তাহা হইলে দেখিবেন  
ধর্মের অভাবেই ভারত রপাতলে ঘাইতে  
বসিযাচ্ছে। যতদিন ভাগ্যের মাপকাঠিতে  
ধর্মের উন্নতি ও পতন মাথা হুঁত, ততদিন  
ভারতের ক্ষতি ছিল। যেদিন হইতে এই  
ভাগ্যের মাপ কাঠী হইতে ভারতের ধর্ম দূরে  
দিরাচ্ছে, সেদিন হইতে পতনও আরম্ভ  
হইয়াছে। আধুনিক ধর্ম ভাগ্যবিহীন, কেবল  
মেশাচার ও বড়বড় কথাই বিস্তারিত, ইহাকে  
কি ধর্ম বলা যায়? ঠিক ঠিক ধর্ম বলিতে  
পূর্ণ ভাগ্যই বুঝায়। অবশ্য রক্ত: গুণের  
আবশ্যকতা নাই একথা কেহ বলে না, বস্তুতঃ  
রক্তগুণ আধ্যাত্মিকতাকে পুষ্টিলাভন করিতে  
ততক্ষণ তাহার উন্নতি কিছু যেদিন তাহাকে  
মনন করিয়া নিজে বড় হইতে যাইবে সে দিন  
তাহার ধর্মও অনিবার্য। রক্ত: কখনও  
ভারতের প্রাণ হয় নাই হইবেও না, ভারতের  
প্রাণ আধ্যাত্মিকতা, সত্য। রক্ত: অবশ্যের মধ্যে  
পরিগণিত। কথা উল্লিখিত পায়ে আধ্যা-  
ত্মিকতা বাধ দিয়া রক্ত:কেই যদি ভারতের  
চরম লক্ষ্য),—প্রাণ করা যায়, তাহাতেই বা  
আগতি কি? আগতি এই যে ভারতের  
তাহা হইলে ধর্মই হইবে। অবশ্য বদলান  
চলে, প্রাণ বদলান চলে কি? আমগাহকে  
আমগাহ রাখিয়াই তাহাতে কাঠাল ফলান  
যায় কি?

অতএব ভারতকে ভারত রাখিয়া রাজ-  
নৈতিক বা রক্ত: আদর্শে গঠন করা অসম্ভব।  
যতদিন ঐ আদর্শকে চরম লক্ষ্য ধরিয়া ভারতের  
নবজীবন গঠনের চেষ্টা করিব ততদিন আমাদের  
পুণ্ড্রম হইবে। যতদিন ভারতের প্রাণের

দিকে নজর না করিয়া তাহার অবশ্য লইয়াই  
যাত্রা থাকিব ততদিন পুণ্ড্রমই গড়িব, মাহুধ  
গড়িব না। যতই ভারতের প্রাণ বদলাইতে  
চেষ্টা করিব ততই তাহাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া  
লইয়া যাব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমাদের কণ্ঠকণ্ঠা  
এই চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছেন কি?  
সাময়িকে মৃত্যু হইয়া চিরন্তনের কথা মনে  
রাখিতেছেন কি? আমাদের যতদূর জানা  
আছে, তাহাতে প্রস্তাব রক্ত, অনেক স্থলেই  
তাঁহারা তাহা রাখিতেছেন না। সেইজন্য  
তাঁহাদের কণ্ঠ-প্রাণী ভারতীয় বিশেষত্ব  
বল্জিত। এবং সেই জন্যই তাহা ভারতের  
পক্ষে কখনই চিরন্তন ও মঙ্গলসাধক বল  
প্রদান করিতে না।

• •

### ১৮। কাম্বীর বয়নবিদ্যালয়

কাম্বীর বোলাদিগকে বয়ন-বিদ্যার পাঠ-  
দানী করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন  
করা হইয়াছে। ছাত্রগণ স্থানীয় বয়ন-বিদ্যালয়ে  
শিক্ষিত হইবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ  
করিতেছে। ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া  
যাইতেছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সে দিন  
স্থানীয় এক বৃহৎ সভায় তাহাদের কৃতিত্বের  
পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত  
নুতন নুতন জীত এবং ঘোষা বুনিয়ার  
কল দেখিয়া অনেকেই প্রশংসা না করিয়া  
থাকিতে পারেন নাই। কিছপে বারা-  
ণসী সাতী প্রভৃতকরণে পরিভ্রম লাঘব  
হয় অথচ কোনরূপ লোকদান না পড়ে,  
তাঁহারা অন্য ছাত্রগণ এক উপায় উদ্ভাবন  
করিয়াছে। উপায়টী বড়ই স্মারক এবং



সামান্য। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ তাহা দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইয়া গিয়াছেন।

আমাদের দেশে বাহাদুরের যে ব্যবসা! জাত-ব্যবসা, তাহার। সেই ব্যবসায় আধুনিক উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে, তাহাদের কর্তৃপটুত্ব আরও বাড়িয়া যাইবে। বংশ-গত অধিকারী হইয়া তাহারা তৎ তৎ ব্যবসায় সফল হইবে। সহস্র ও হাজার কোশল উদ্ভাবন করিতে পারিবে। তাহাদের দ্বারা বৃত্ত শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

• •

### ১৯। শিল্প-জগতে পরীবাণী

আমাদের একটি দাবী আছে যে সহস্রই শিল্পের প্রধান আত্মা; সহস্র ভিন্ন ভিন্ন কোথাও নব নব শিল্পের উদ্ভাবন ও প্রচার তত কি-প্র-গতিতে চলিতে পারে না; সহস্রই শিল্পের প্রধান প্রেরণনী স্বরূপ। কাজেই সহস্রবাণী লোকগণ শিল্পক্ষেত্রের আবেষ্টনের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকায় শিল্প সফল হইতে পারে না। তাহা আদৌ কল্পনা করিতে পারে না। সহস্র পরীবাণী শিল্পবিষয়ক আর্থিক স্বরূপ, পরীবাণী সহস্রবাণীর নকলনবীণ; পরীবাণী লোক-গণের আমোদ আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই।

অবশ্য সকলেই নিরাপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইবেন যে পৃথিবীর ব্যবসায়ী লোকে আবিষ্কারক হইতে পারে না। কিন্তু পরী-বাণী লোকগণের মধ্য হইতেও যে জগৎ ও সমাজের কল্যাণকর নানাবিধ আবিষ্কার উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং ইহার ফলে ধন ও সম্পদের পত্তী সৃষ্টি, সময়ের হ্রাস, পরি-জ্ঞানের লাভবানতা অথচ পটুতা খুব বেশী হইতে

পারে তাহা আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়া থাকিলেও ভাবিতে পারেন না। ইহার প্রধান কারণ, পরীবাণীর শিল্প বিষয়ক শিক্ষা দ্রব্য। যেখানে যেখানে পরীবাণীগণ শিল্প-শিক্ষালাভে বৈশ্বকাল হইতে মনো-নিবেশ সংযোগ করিয়া থাকেন সেখানে জ্ঞানের প্রয়োগও বেশিতে পাই। এবং এই জ্ঞানের প্রয়োগ যে শুণু সেই স্তর পত্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহা নহে, অতিশয়ই ইহার বিজ্ঞাপন ও ব্যবহার দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। আমরা আমেরিকাকে এই বিষয়ের-সাক্ষী স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি।

তথ্য কি সহস্রবাণী, কি পরীবাণী, কি আপাততঃ জনসাধারণ সকলেই নিজেদের পারিপার্শ্বিক বৈঠনীপত্ত জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট সহায়তা ও সহযোগ পায়। পরে জ্ঞানলাভ করিয়া নিজেদের অভাব অভি-যোগাদি, যদি কোন কিছু থাকে বা বাতির করিতে পারে, অতি সহস্রই সারিয়া কলে। যদি অভাব আবিষ্কারের জনহিতা এ কথা সত্য হয়, তবে আমরা পরীবাণীদের মধ্যেও অনেক আবিষ্কারক দেখিতে পাইব। বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকায় ত অনেকটা তাহাই দেখিতে পাই

আমাদের দেশেও এককালে পরীবাণী অনেক আবিষ্কারকের বসতিবাণ হইয়াছিল। তাহাদের আবিষ্কৃত বিষয়ের আশাতীত ফল পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য স্থবীমণ্ডলীও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীল ও বেগুন লইতে পারি। যে কারণেই হউক, সে সকল বিভা আমাদের অনভ্যাত হইয়া পড়া ও পরে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার আমরা উত্তরোত্তর-অগ্রগতির হইতে পারি নাই।

অগ্নির হইতে পারি নাই বলিবারে এখনও অগ্নির হইতে পারি না বা পারিব না। একপ কথা স্বীকার করিব কেন? অগ্নির হইবার পথ আমাদিগকেই বাহির করিয়া লইতে হইবে।

আমাদের দেশেও শিল্প-প্রচারণার কত সাধারণকে শিল্পী করিয়া তুলিবার কত প্রত্যেক জেলায় জেলায় শিল্প-প্রদর্শনী মেলায় স্থলী ও অস্থিষ্ঠান হইয়াছে, উহা ব্যতীত নানা-বিধ পক্ষ ও উৎসব উপলক্ষে কত শত মেলা হয় এবং তাহাতে কত শত প্রদর্শনী আসে, তবুও আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি তেছি না কেন? আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি উপযুক্ত প্রচারকের অভাব; বিবিধা তুলিয়া দিবার দক্ষ উপযুক্ত কন্ডরের অভাব; আর অধিকৃত রাবিবার দক্ষ উপযুক্ত মলমের অভাব; এবং কার্যকরী করিবার দক্ষ দ্বাবিহীন অভ্যাসের অভাব।

আমেরিকায় দেখিতে পাই কতশত পল্লী-প্রচারক ও 'শিল্পীপাত্রা' গ্রীষ্মের প্রথমে গ্রোভে গা ভাঙ্গাইয়া সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৪টা পর্য্যন্ত অনবরত প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। পল্লীর যে কোন এক স্থানে টামোয়া খাটাইয়া শিল্প-সজ্জার সাজাইয়া

দর্শকগণের চিত্তবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোড; করিয়া ফেলিবেন-বলিয়া আদৌ প্রত্যাশী হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা ৩৫৫ কতক নমুনা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া গৃহকর্ত্তা বা কর্মীর সঙ্গে নমুনার গুণাগুণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যান। তাঁহারা বুঝাইয়া দেন, এই নমুনার কত কম খরচে কাপ্তা চলে, উগাতে কত সময় সংক্ষেপে হয়, পরিভ্রম কত কম লাগে, উহা কত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। প্রচারকগণ এইরূপে পল্লীর প্রত্যেক লোকের সংস্পর্শে আসিয়া শিল্প-প্রচার-কাণ্ডের ক্ষুদ্র ও সাক্ষাৎ সফলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রচারক ও ক্রোডা উভয়েই লাভবান হন। প্রচারক-গণ আর কেহই নন, কলেজের ছাত্র। ইহারা গ্রীষ্মের মধ্যে বাহা তিন মাস স্থায়ী থাকে, এই কার্য্যে প্রতী হন; এবং জিনিষ-গুলি বিক্রয় করিয়া কলেজের সাংসদগণের পরচ তুলিয়া ফেলেন। ইহা কি ভাজ-জীবনের দৌরবেহ কথা নয়? তা ছাড়া; জাতীয় চিত্ত-বোধের পত্রী ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশে একদম প্রচারকের দৃষ্টি হইবে না কি?



## নিগ্রোজাতির কর্মবীর \*

অঃদংশ অধ্যায়

আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ?

পোটার চল নির্ধৃত চটবার পর চাত্র এ ছাত্রী সংখ্যা খুব বাড়িতে লাগিল। একমুখ আমানের চতুঃশীমার বাহিরে কতকগুলি কাঠের কুঠুরী ভাড়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতেও ফুলাইল না। অসত্য্য আমরা আর একটা গৃহ নির্মাণের জন্য উদ্যোগ হইলাম।

এই গৃহের আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয় হইয়া গেল। দেগিলাম ৩০,০০০ টাকার কমে কোন মতেই এ ঘর তৈয়ারী হইতে পারে না। সুতরাং এবার পোটার হল অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

প্রথমেই আমরা বাড়ীটার নাম ঠিক করিয়া লইলাম। সকলে মিলিয়া মাঝামাঝি করিলাম— ‘আলাবামা-ভবন’ নাম হিলে ঐ প্রদেশের সকল অধিবাসীর সহায়কুতি আকর্ষণ করা যাইবে। সুতরাং আলাবামা-ভবনের জন্য আমরা উদ্যোগ পড়িয়া লাগিলাম। ছাত্রেরা মাটা খুঁড়িয়া জমি পরিষ্কার করিতে লাগিল— নেওয়ারলের জন্য ভিত্তির গর্ত খুঁড়া হইতে থাকিল। অথচ আমাদের হাতে তখনও পয়সা নাই। শ্রীমতী ভেভিভনসন আবার টাকেকীর পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষার কুলি লইয়া বাহির হইলেন।

অর্থাভাবে আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি এমন সময়ে আবার শুকসেব মহাপ্রাণ

আমিষ্টকের একপান্না টেলিগ্রাম পাঠিলাম। তিনি লিখিয়াছেন “আমার সঙ্গে উত্তরপ্রান্তের ইন্ডিয়ানলে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাতির হইতে পারিবে ? একমাল লাগিবে। যদি পার শ্রীমতী হ্যাম্পটনে চলিয়া এস।” তৎক্ষণাৎ আমি হ্যাম্পটনে চলিয়া গেলাম। বাইরাই দেখি আমাদের ভিক্ষা আদায়ের জন্য আর্মট্রুকের সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি উত্তর প্রান্তের স্থানে স্থানে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে আমরা টাকেকী বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইব। হ্যাম্পটনের পায়কবলের দুই চারিজন আমাদের সঙ্গে লকের বাহির হইল। এই অভিযানের সমস্ত ব্যয় হ্যাম্পটনের বিদ্যালয় হইতে বহন করা চাইবে তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

আর্মট্রুকের দুইটি উদ্ভেদ ছিল। তিনি এই উপায়ে আমাকে ইন্ডিয়ানলে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন ভাবিয়া ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলাবামা-ভবনের জন্যও টাকা উঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। আর্মট্রুকের উদারতা ও ত্যাগবীলতা আমাদের জন্য আরও কতবার দেখিয়াছি।

উত্তর প্রান্তে বক্তৃতা করিবার সময়ে আর্মট্রুকের একটা উপদেশ আমি সর্বদা মনে রাখিতাম। তিনি বলিতেন “টাকা কথা

\* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বৃদ্ধার ওয়াশিংটনের “আফ্রিকান-ওরিস” গ্রন্থের বহানুবাদ।

কখনও বলিবে না। প্রত্যেক লোকই যেন একটা নতুন বস্তু, নতুন তাব মনের মধ্যে আসে। শ্রোতার তা যেন বুঝে যে কতকগুলি কাজের কথা বলিতেছে।" বক্তৃতা করিবার নিয়ম ইহা অপেক্ষা আর কি ভাল চইতে পারে?

মিউ-ইথর্ক, ক্রকসিন, বোষ্টন, ফিল্যাডেল্ফিয়া এবং অন্যান্য বড় সহরে টাঙ্কেটীর ভ্রম সত্য হইল। সত্য অনেক লোক আসিত। আমরা দুই জনেই বক্তৃতা করিতাম। টাঙ্কেটী নিম্নালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বিবৃত হইত। সঙ্গে সঙ্গে আলাবামাতবনের ভ্রমও তিকা করা হইত। লোকেরা সন্তুষ্ট হইত বৃত্তিভাষ। একমাস এইরূপ সত্য করিয়া যক্ষ টাকা উঠে নাই। আমাদের প্রচার কার্যও খুব ভাল হইয়াছিল।

পরে আমি অনেকবার একাকী তিকা করি লটয়া উত্তর অকলে বাটরি চইয়াছি। বলিতে কি, গত ১৫ বৎসরের ভিত্তর অধিকাংশ কালই আমি টাঙ্কেটীর বাটরিতে বাহিরে কটাইয়াছি। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বেশী রাখিতে পারি নাই। আমাদের নতুন নতুন বিভাগের উন্নতি করিবার ভ্রম অর্থাত্যে দূর-রাজ্যের প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। এই ব্যয় আমার অর্থসংগ্রহের অভিজ্ঞতা পাঠক-গণকে কিছু বলি।

পরোপকারী এবং লোক-হিত-ব্রতধারী ব্যক্তি যাদেরই অর্থ সংগ্রহে বাহির হইতে হয়। বিদ্যালয়ের ভ্রম, অথবা পরিব্রাজকের নিষায়ণের ভ্রম—যে ভ্রমই হউক, তিকা না করিলে বড় কাজ কখনই সমাধা হয় না। এক্ষণ বহু "ভিক্টুকে"র সঙ্গে কার্য-

ক্ষেত্রে আমার দেখা হইয়াছে। তাঁহারা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "সংগ্ৰহ, আপনি এত টাকা পান কোথা হইতে? লোকেরা আপনার কথা কান দেয় কেন? তাৎপরিগণকে বুঝাইবার ভ্রম আপনি কিরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন? আপনার অর্থসংগ্রহ কার্যের কোন নিয়ম বা প্রণালী আছে কি? আমাদের প্রদর্শন দিলে বড় উপকৃত ও বাধিত হইব। কারণ আমরাও দুই একটা কাজের ভার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। লোকের সংস্কৃতি কোন মতেই আকৃষ্ট করিতে পারিতেছি না। আপনার সঙ্গে যৈবক্রমে দেখা হইল ভালই হইয়াছে। আপনার প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলে আমাদের অর্থ-সৈন্ত বোধ হয় ঘুটিতে পারিবে।"

পরোপকার ও মানবসেবার উদ্দেশ্যে তিকা বৃত্তির ভ্রম কোন নিয়ম আছে কি না বলিতে পারি না। আমি সঙ্গারে ঘুরিয়া "তিকা বিজ্ঞানের" দুইটি পুস্তক মাত্র আবিষ্কার করিয়াছি। প্রথমতঃ তুমি যে কাজটা করিতেছ তাহা অগণ্য প্রচার করা আবশ্যক। এই প্রচার কার্যে ভ্রম হইয়া যাওয়া প্রয়োজন। নিম্নের সংগ্রহ চিন্তা এই প্রচারে প্রয়োগ করা কর্তব্য। অধিকন্তু কেবল মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বিপ্লবের নিকট কার্যের পরিচয় দিলে চলিবে না। সাধারণ জনগণও যেন তোমার আরত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানিতে ও শুনিতে পার। এক্ষণ দেশের মধ্যে বহুগুলি কণ্ঠকেন্দ্র, সভা সমিতি, পরিষৎ, প্রতিষ্ঠান বা সম্ম বর্তমান আছে সকলগুলির ভিতরই তোমার কণ্ঠের আঙ্গোলন পৌছাইবার চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রচারের কল কি হইতেছে

তাঁহার জন্ত উদ্বিগ্ন হইও না। ধর্মভাবে প্রচারকার্যে লাগিয়া যাও। টাকা না পাইলেও দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। উৎসেগে শরীর আনন্দ হয়, চিত্তবিক্ষিপ্ত হয়—কার্য্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসে।

ভিক্ষাবিজ্ঞানের এই বিতীর্ণ সূত্র কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়ে দ্বার করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি। পাওনা-দারের বিল উপস্থিত—টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। সেই সময়ে রাজ্যে বিধানায় পড়িয়া এপাল ওপাল না করিয়া থাক। অসম্ভব আমি অনেক বুলেই আমার চিত্তের শান্তি-রক্ষা করিতে পারি নাই—বহুবার জিলা ঘুরাইয়া কাটাইয়াছি। রাজ্যের বা বারান্দায় পাদলের মত ছুটাছুটি করিতে চাইয়াছে। অবশ্য এত ঘুরবন্ধার মধ্যেও আমার বীরতা এবং শাস্তীর্থা অনেকটাই ছিল। তাহা না হইলে এতদিন সহ্য করিয়া এককালে লাগিয়া থাকিতে পারিতাম কি ?

সংসার দেখিয়া আমার জ্ঞান প্রস্তুত হইয়াছে। যৎ, জগতের যত বড় বড় কাজ সবই এইরূপ স্থিরচিত্ত সহিষ্ণুতাপূর্ণ শাস্তীর্থাবিশিষ্ট কথ-বীরগণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মাথার বোকা বড় কম থাকে না। অসাধ্য সাধনেই তাঁহারা ত্রুটি হইয়াছেন—নিত্যক 'না'কেও তাঁহাদের 'হা'তে পরিণত করিতে হইয়াছে। নৈরাশ্র বিফলতা এবং দৈন্ত-দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহাদিগকে বহু ব্যালাপেক্ষ বিশালকর্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তাহাপি তাঁহারা শান্ত গভীর, এবং লোকপ্রিয় ও সৌজন্যবান্ রহিয়াছেন। এই চরিত্রবলেই অগণ্যক পয়নত করা যায়—বিশ্বশক্তিকে স্বপ্নে আনা যায়।

যখনই কোন মহৎকর্ম আরম্ভ কর, তখনই

উহাতে তুম্বর হইয়া যাইবে—সেই কক্ষের মধ্যে নিজকে ডুবাঁইয়া ফেলিবে। নিজকে এই উপায়ে তুলিতে না পারিলে অর্থাৎ কাহারো তোমার কৃত্ত্ব অপেক্ষা বেশী ভাল না বাসিলে তুমি স্থগ পাইবে না—চিত্তের উৎসেগও কমিবে না। তোমার জীবনের লক্ষ্যকে আন্তরিকভাবে ভালবাস, নিজের অহংকার তুলিয়া যাও,—দেখিবে কক্ষের হুকলাভাবেও তুমি দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছ। কিন্তু যদি নিজকে সম্পূর্ণরূপে তুলিতে না পার, তাহা হইলে তোমার কক্ষের বিফলতায় তুমি পাপল হইয়া পড়িবে।

অন্তএব নিজকে তুলিতে শিখ—নিজের অহংকার বিদর্জন দাও। যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে নিজের অন্তিম বিন্দুত হইয়া যাও। তবেই দেখিবে, অল্পমাত্র ফললাভেও চিত্তে শান্তি থাকিবে। চোখের সম্মুখে তোমার আরম্ভ কর্তৃ নষ্ট হইয়া গেলেও তুমি আনন্দে থাকিতে পারিবে, এবং প্রয়োজন হইলে নূতন উৎসাহে নব নব কর্ম আরম্ভ করিতে পারিবে।

আমি ট্যাক্সীর জন্ত ভিক্ষায় বাতির হইয়া দেখিয়াছি অনেক লোক ধনী লোকদিগকে ভিন্নভাষা করেন। তাহারা বলেন "কি বলিব মহাশয়, এই বড় লোকতলা যদি মালুম হইত তাহা হইলে আমাদের একটা। দুইটা অছটান কেন, একলগে ৫০টা কর্তাই অনায়াসে চলিতে পারিত। ইহার বিলাসপাগরে নাঁতার কাটিতেছেন—নিজ স্বভোগে অর্থের অপব্যয় করিতেছেন—অথচ ধনের কাজে এক পয়সাও দিতে নারাজ।" ইহার সকলেই মহা-দুঃখে এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ইহাদের উদ্বেগ ভালই—কারণ ইহার লোকহিতব্রতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস,

ইহাদের বিষয়টা একটুখু গভীরভাবে না বুঝিবার ঘোষ আছে।

আমি এইরূপ পরোপকার ব্রতধারী লোক-সেবক ভিক্ষুকগণকে বলিয়া থাকি, "মহাশয়, মনে করুন, বেশে একজনও ধনী লোক নাই। মনে করুন বড়লোকদিগের টাকাকড়ি সবই সন্সারের সকল লোকের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ভাবিয়া দেখুন ত, তখন বেশের অবস্থা কি হইবে? এই যে এত বড় বড় কারবার, কারখানা, ফ্যাক্টরী, জাহাজ কোম্পানী, চাষ বাস ইত্যাদি কত কি দেখিতেছেন—এই সমুদ্রের একটাও থাকিবে কি? এই গুলি না থাকিলে এত সুনীমজুর কেরানী কর্মচারীর অন্নসংস্থান হইবে কি? বেশের দারিদ্র্য ছুঃখ ছড়াইয়া পড়িবে যে! দেশের ভবিষ্যৎ, বাণিজ্য সবই মূগ্ধ হইয়া যাইবে যে! সমাজের লক্ষ্যত্রি কোথায়ও থাকিবে না। বড় লোকেরা কি সত্য সত্যই সমাজের পাপ ও কলঙ্কবস্ত্র?"

ধনীলোক সম্বন্ধে আমার আরও অনেক বক্তব্য আছে। আমি আমার 'ভিক্ষুক' বন্ধু-গণকে বলিয়া থাকি, "কত লোক ধনী মহাশয়দের দ্বারা প্রতিপালিত হয় আপনারা তাহার খবর রাখেন? প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিইই ভগ্নদান অসংখ্য আছে। সকল দানের স্বরূপই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। আপনি হয়ত একজনদের নিকট কিছু পাইলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়াই তাঁহাকে আপনি নির্দয়, বিলাসী বা স্বার্থপর বিবেচনা করেন কেন? আপনার অজ্ঞাতদ্বারে তিনি হয়ত কত দরিদ্রের অন্ন বস্ত্র সংস্থান করিতেছেন?"

আমি সত্য কথা বলিতে পারি, আমেরিকায় ধনী ব্যক্তিগণকে প্রতিদিন অন্ততঃ ২০১২২ জন নূতন নূতন লোকের সাহায্য করিতে

হয়। আমি বড় বড় সহরের নামজাদা লোকদের বাড়ীতে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দেখিচ্ছি—আমার মত আরও ১২ জন লোক তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থাবলি লইয়া হাজির হইয়াছেন। এইত গেল সাক্ষাতে ডিম্বের কথা। তাহা ছাড়া চিঠিপত্রের দ্বারা কত দুঃখ দুঃখ স্থান হইতে লোকেরা বড় লোকের নাম শুনিয়া ডিম্বপ্রার্থী হয় তাহার সম্বন্ধ কে রাখে?

তার পর সংকল্পের নীরব বন্ধু আমেরিকায় কত আছেন তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। তাহাদের নাম গুণতে কেহই জানিতে পার না। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া তাঁহারা দরিদ্রের সুখবিস্তার করিতেছেন। আমি ১-১২ ব্যক্তির সম্বন্ধ পাইয়াছি—তাঁহারা লোকসমাজে বড়ই অর্থপিপাস, লোভী, দ্রুত-হীন বলিয়া গ্যাত। অথচ প্রাপ্তি বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাঁহারা অল্প টাকার সম্ভার করিতেছেন। নিউ ইয়র্কেই এইরূপ পরদুঃখে দুঃখী অর্ধ নীরব হাতা ছই জনকে আমি জানি। ইহার ইহাতি রমণী। তাঁহারা গত ৮ বৎসর দরিদ্রা আমাকে টাকেন্দ্রী-বিভাগের গৃহ-নির্মাণ-তহবিলে এবং অস্ত্রান্ত কাজে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের অস্ত্রান্ত দানও আছে।

আজ আমি একটা কথা খোলাখুলি বলিব। অনেক কোটি টাকা আমার হাত দিয়া টাকেন্দ্রীর জন্ত অনেক মত খরচ হইয়াছে—একথা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু আমি বলিতে চাহি—ইহা আমার "ভিক্ষা" লক্ষ টাকা নহে! আমি কখনও 'ভিক্ষা' করি নাই—আমি 'ভিক্ষুক' নহি! আমার অর্থসংগ্রহ কার্য্যকে আমি কোন মতেই 'ভিক্ষা,' 'ভিক্ষুকবৃত্তি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতে পারিব না।

আমি জানি, 'ডিম্বা' করিলে টাকা পাওয়া যায় না। দিনরাত্রি বড় লোকের দরবারে বসিয়া অর্থ সাগরোদার কথা পাড়িলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। বাহারা একত্র করিয়া থাকেন তাঁহারা আশ্বাসমানবোধহীন—শত শতাই ভিক্ষুক। কিন্তু আমার আশ্বাসমান-বোধ সূর্য্যবাহী থাকে—আমি নিজকে কখনও কাহার নিকট ছোট করি না। আমি বৃষ্টি, মাছ মাছেরই কর্তব্য জান আছে, মাছ মাছেরই সেবা-প্রবৃত্তি আছে, মাছ মাছেরই লোকের উপকার করিতে পারিলে সুখী হয়। সুতরাং কোন স্থানে একটা ভাল কাজ হইতেছে—একথা জানিতে পারিলেই সকলে পেরিকে দৃষ্টি দেয়। বাহার যে কলমতা সে সেই উপায়ে তাহার সাহায্য করে। ধনী ধন দান করিতে উৎসাহী হন। বিদ্বান্ তাহার জন্য লোক-সমাজে সগাছকৃতি স্মৃতি করিয়া আশ্বাসদান লাভ করেন। বাহাদের শারীরিক শক্তিই একমাত্র সমল তাহারা সেই কণ্ঠের জন্য হাতে পায়ে ব্যটিয়া আনন্দিত হয়। আমি আরও বৃষ্টি যে, দাতা সংসারে অনেকেরই আছেন, কিন্তু দান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকই খুব মল্ল। টাকা পাওয়া খুব সহজ—কিন্তু টাকা পাইয়া তাহার সদ্যবহার করাই বড় কঠিন। হাথ, বাহারা বড় লোকের নিকট টাকা আদায় করিতে দান তাঁহারা ঘর এই কথাগুলি মনে রাখিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও হতাশ হইতেন না, এবং বড়লোকদিগকেও তিরস্কার করিতেন না।

আমি অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিদাছি। টাকার কথা লোকজনকে যেম্নী বলি না—কার্যের কথাই যেম্নী বলি। কোন কার্যের স্বকল কুল, এমিক ওমিক, কণ্ঠ প্রশালী, সমাজের অস্বাস্ত কার্য ও চিন্তার

সঙ্গে আমার আরও কণ্ঠ ও চিন্তার সম্বন্ধ, আমার জীবনের লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয়েই আমি লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করি। এষ্ট উপায়ে ধনী নির্জন সকল সমাজেই আমি প্রচারকের কার্য করিয়া থাকি। এইরূপ নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে দৃষ্টতা ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ডিম্বা করিতে বড়ই মারাত্মক। আমি কোন দিনই ডিম্বা করি নাই। আমি ডিম্বুক নটি। আমি কণ্ঠের উপাসক—আমি কণ্ঠের প্রচারক। আমি সূর্য্য সন্ধ্যাবেগ বিস্তারই করিয়াছি—আমি সকল মহলেই শিক্ষা-প্রচারক রূপে পরিচিত। আমার অর্থসংগ্রহ এই লোক-শিক্ষা-বিস্তারের আত্মবিক কল মাত্র।

অর্থসংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত থাকিলে পরোক্ষ ভাবে একটা মন্ত লাভ হয়। সামসারিক জ্ঞান খুব বাড়িয়া যায়—লোকচরিত্র বৃষ্টিতে পাওয়া যায়। অনেক লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়—নানা কথা বুঝা যায়—নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। তাহা ছাড়া জগতের অনেক গুপ্ত মহাপুঙ্খ এবং চরিত্র-বান্ নরনারীর সাক্ষাৎ লাভ হয়। বাহাদের নাম খবরের কাগজে উঠে না অথচ বাহারা পরহিত করিতে পারিলেই সুখী হন এক্ষণ অনেক মহাত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। এষ্ট সকল লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কথা বলিতে পারাও মহা সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এক্ষণ দাতা ব্যক্তির সংশ্রবে আসিয়া বহুবার জীবন বস্ত্র করিয়াছি। আমি বোষ্টন-নগরের দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এক বাড়ীতে গৃহস্থানী বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষা নিকট আমার সংবাদ পাঠান হইল। ইতিমধ্যে বামী আসিয়া উপস্থিত।

আমাকে দেবিগাই বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি চাই?” আমি আমার উদ্দেশ্য বুঝাইতে গেলাম। তিনি আরও কেশিয়া উঠিলেন। আমি আগ্রে আরে শরিয়া পড়িলাম। এই বাড়ীর নিকটেই আর একজন ভহলোকের কাছে গেলাম। আমার কথা শুনিবামাত্রই তিনি বেশ মোটা টাকা আর মস্ত একটা চেক সহি করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদদিবারও অবসর পাইলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন “আপনি আমাদেরই কার্য করিতেছেন। মহাপ্রভু, আপনাকে সাহায্য করিবার হযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।”

আমি বলিতে পারি যে, সংসার হইতে প্রথম শ্রেণীর লোক কথিয়া আসিতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যাই বাড়িতেছে। ধনী লোকেরা পরহিতভ্রতধারী ব্যক্তিগণকে আর “ভিক্ষুক” বা উৎপাত স্বরূপ মনে করেন না। তাঁহারা আমাদের মত লোককে সংকর্ষের বস্ত্র ও উপলক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই কঠব্য কণ্ঠের কিয়দংশ আমরা করিতেছি—এইরূপই আমকালকার ধনী মহাপ্রভুর ধারণা ঘনিষ্ঠত্বেছে।

বোষ্ট্রনগরে বাহারই বাড়ীতে আমি প্রার্থী হইরাছি তিনিই আমাকে বলিগাছেন, “আপনার এই মহৎকণ্ঠের মস্ত আমার নিকটেও আসিগাছেন, এইরূপ আমি আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার অগ্রগ্রহে আমিও একটা সংকর্ষ্যে আমার ক্ষুদ্রপণ্ডিত প্রবেশের হযোগ পাইলাম। এ সকলে তবিত্তে আসিলে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।” ধনী ব্যক্তরা ধনবানের উপযুক্ত হযোগ স্থগিয়া থাকেন—এই বিশ্বাসই আমার দিন দিন বাড়িতেছে।

প্রথম প্রথম অবশ্যগ্রহের বাহির চাইয়া বড় কষ্টেই পড়িতাম। মনে আছে তখন উত্তর অকলের সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে দিনব্যস্ত খাটিয়াও একটাকা মাত্র পাইতাম না। অনেক লোকের নিকট বড় আশা করিয়া যাইতাম কিন্তু প্রার্থায় এক পরলাও না দিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে নিফল ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিত। হঠাৎ যেখান, বাহার নিকট কখনও কিছুমাত্র আশা করিতে পারি নাই সেই ব্যক্তিই সাহায্য দান করিয়া ভয়ভয় আমায় আলোক বিকিরণ করিতেন।

একদিন নানা লোকের পরামর্শে কনেষ্ট্রি-কাট প্রবেশের এক পল্লীতে ধনী ব্যক্তির পরপাশ হইলাম। সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে তাঁহার গৃহ। সেই পানে শীতে ঝড়ে হাটিয়া গিয়া দেখা করিলাম। তিনি কত কথাই পাড়িলেন—অনেক প্রশ্ন হইল। কিন্তু একটি পরলাও দিলেন না। আমি বুঝিলাম ইহার নিকট প্রচার করাও কর্তব্য ছিল। তাহাই করিরাছি। নাই বা পাইলাম কিছু সাহায্য।

কিন্তু দুই বৎসর পর এই ব্যক্তি আমার নিকট টাকেকড়ীর ঠিকানায় পত্র লিখিলেন; “মহাপ্রভু, এই পত্রের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ব্যাঙ্কের উপর আপনার নামে একখানা চেক সহি করিয়া দিলাম। চেকের মূল্য ৩০,০০০। আমি এই টাকা আপনার বিদ্যালয়ের মস্ত উইল করিয়া রাখিরাছিলাম। শেষে তাবিরাছি বাচিয়া থাকিতে থাকিতেই ইহা দিয়া যাওয়া ভাল। আপনি দুই বৎসর পূর্বে আমার বাড়ীতে অগ্রগ্রহ পূর্বক পদার্পণ করিরাছিলেন সে কথা আপনার মনে থাকিতে পারে। সেদিনকার কথোপকথন আমি বেশ মনে রাখিরাছি।”



এই ৩০,০০০ টাকা আমার নিকট এক অতি দুঃসময়ে পৌঁছিয়াছিল। ইহা না পাইলে আমাদের যথেষ্ট কষ্টই হইত। পাইয়া আমাদের ঘাড়ের বোঝা অনেকটা হালকা হইয়াছিল।

ঐযুক্ত কলিন্স হাষ্টিংসকে বেল-বিভাগের কে না চিনে? তিনি আজ সমগ্র আমেরিকার হুগ্রানিষ্ট। তিনি আমাকে প্রথম সাহায্য করেন মাত্র ৩ দিন। মৃত্যুকালে আমা-  
নিককে ১৫০,০০০ দিয়া সিঁধাছেন। এই দুই দানের মধ্যে আমরা ইহার নিকট ক্ষু-  
ব্রহ্ম আরও অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

অনেকে বলিয়া থাকেন “টাঙ্কেজীর বরাত ভাল—তাই ১৫০,০০০ পাইয়াছে।” আমি তাঁহানিককে বলি “তাঁহা নহে—কপালের গুণে টাকা একবার আসিতে পারে, দুইবার আসিতে পারে। কিন্তু বার বার আসে না। স্থিরভাবে নিযমিতরূপে কৰ্ম করিয়া উন্নতি না দেখাইতে পারিলে সংসারের লোক মগ্নে না।” হাষ্টিংসের কথা বলিলেই বুঝা যাইবে। তিনি প্রথমে ৬ দিয়াই মনে করিয়াছিলেন—“টাঙ্কেজীওয়ারা আর বেশী পাইবার যোগ্য নয়। আমি তাঁহার নিকট এত কম কোন মতেই আশা করি নাই। যাহা হউক আমি তখনই স্থির করিলাম যে, আমাদের কাছ্য কলে ইহাকে খুসী করিবই, এবং তখন তিনি উদারতার সহিতই রান করিতে বাধ্য হইবেন। সত্যই তাহা ঘটয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে লাগিলেন যে, টাঙ্কেজীর কাজ কৰ্মে উন্নতি হইতেছে, ইহার মধ্যে নিত্য নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে—ইহারা কোন এক আয়গার বসিয়া নাই। ঠিক সেইরূপই তিনি তাঁহার দানের খাজা বাড়িয়াছিলেন। এই অল্পপাতে ৬ হইতে শেষ পর্য্যন্ত

এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছি।

একবার সাহস করিও বোষ্টন-নগরের ট্রিনিটি-ধৰ্ম্মমন্দিরের প্রচারক রেভারেন্ড উইন্-  
স্টোয়ার ডোনাল্ড মহোদয়কে টাঙ্কেজীতে নিম-  
ন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট ধৰ্ম্মোপদেশ পাইবার উচ্ছাস এইরূপ করা হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে লোক জন অনেক আনিবে বুদ্ধিতে পারিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া বিজ্ঞা-  
নদের মধ্যেও মহানুমারোহে পড়িয়া গেল। কাজেই আমাদের ক্ষু-  
দ্র ধৰ্ম্মমন্দিরে বক্তৃতার স্থানাভাব বিবেচনা করিয়া সামিয়ানা পাটাইয়া একটা ঘর তৈয়ারী করা হইল। লতাপাতা ফুলপত্রের গুহ স্থলভিত্ত করাও হইল। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পরক্ষণ হইতেই মহা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ডোনাল্ড মহোদয় ভিজিতে লাগিলেন। আমাদের একজন আনিয়া তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিল। অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি থামিলে আবার বক্তৃতা হইল। শেষে সভা হইয়া গেলে পোষাক পরিবর্তন করিতে করিতে ডোনাল্ড মহোদয় বলিলেন—  
“ওয়ার্মিংটন মহাশয় টাঙ্কেজীর যে বিরাট ব্যাপার দেখিতেছি, এখানে একটা বড় ধৰ্ম্ম-  
মন্দির থাকা আবশ্যিক।”

একথা অবশ্য প্রচারিত হইবার সময় ছিল না। মহা বিন্দ্রের কথা—পরদিন সকালেই ইটালী হইতে একখানা পত্র পাইলাম। দুই জন রমণী লিখিয়াছেন তাঁহারা আমাদের ধৰ্ম্ম-  
মন্দিরের জন্য সকল অর্থব্যয়ের ভার বহন করিবেন।

সম্মতি দ্ব্যাপ্ত কর্ণেলি মহোদয়ের নিকট আমি ৩০,০০০ টাকা পাঠিয়াছি। এই টাকার দ্বারা গ্রন্থালা নির্মাণ করিতে হইবে—  
—তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা। এতদিন আমাদের

গ্রন্থালা ছিল না বলিলেই চলে। সেই পোড়োবাড়ীর এক কোণে কতকগুলি আল-মারী ছিল। তাহাকেই গ্রন্থালা বলিতাম। ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র—১২ ফিট লম্বা এবং ৫ ফিট চৌড়।। আজ কার্ণেলির রূপার আমাদের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থালা নির্মিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু কার্ণেলি মহোদয়ের অহুগ্রহ পরিলাম কি করিয়া? একদিনে তিনি আমাদের প্রতি রূপা করেন নাই। তাহার অহুগ্রহ লাভ করিবার জন্য আমাদের মন বন্দর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। ১৮৯০ সালে আমি তাহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি আমার কার্যে কিছুই সহায়ত্ব দিতে দেখাইলেন না। মন বন্দর কঠোর পরি-  
শ্রমের পর আমি তাহার নিকট নিয়মিত পত্র লিখি।—

“টাকেনী আলাবামা,”

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯০০।

সবিনয় নিবেদন,

করেকদিন পূর্বে আপনার ভবনে আমার সঙ্গে আপনার বে কথাবার্তা হই তৎক্ষণাত্রে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। আপনি আমাদের গ্রন্থালায় আবশ্যকতা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। এখন জানাইতেছি যে,—

১। আমাদের বিভাগে সম্প্রতি ১১০০ ছাত্র এবং ৮৬ জন শিক্ষক ও কর্ম-চারী এই গ্রন্থালা ব্যবহার করিবেন। অধিকতর শিক্ষক ও কর্মচারীগণের পরিবারস্থ লোকজন এবং আমাদের বিভাগের সমীপস্থ প্রায় ২০০ নিম্নোক্ত পুরুষ ও রমণী এই গ্রন্থালা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

আমাদের এক্ষণে ১২,০০০ গ্রন্থ, সংবাদপত্র ইত্যাদি রহিয়াছে। এগুলি

বন্ধুগণের দানে সংগৃহীত। স্থানভাষে ইহাদিগকে রক্ষা করা ঘাইতেছে না। পাঠাগার না থাকায়ও গ্রন্থ-ব্যবহারের অসুবিধা ঘটিতেছে।

আমাদের বিভাগে হইতে গ্রান্ডগ্রেট হইয়া অনেক ছাত্র বাহির হইয়াছেন। ইহারা দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক প্রদেশেই কর্ম করিয়া থাকেন। গ্রন্থালা প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাদের সাহায্যে সমগ্র নিম্নোক্তমাঝে সংসাহিত্য প্রচা-  
রিত হইতে পারিবে।

৪। আমাদের প্রয়োজনীয় গৃহ-নির্মাণ করিতে ৬০,০০০ টাকা লাগিবে। ইট গড়া, মিস্ত্রির কাজ, সূত্রের ও কর্মকারের কার্য ইত্যাদি গৃহ-নির্মাণ বিষয়ক সকল ব্যাপারই আমাদের ছাত্র-গণ সহজে নিষ্পন্ন করিবে।

সুতরাং আপনার দানে এক সঙ্গে তিন কার্য হইবে। প্রথমতঃ, গ্রন্থালা ত নির্মিত হইবেই। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা গৃহ-নির্মাণের সুযোগ পাইয়া কতক-গুলি নুতন শিল্প শিখিয়া ফেলিবে। অধিকতর, এই কার্যে যোগদান করিয়া তাহারা যে পারিশ্রমিক পাইবে তাহার দ্বারা ইহাদের বিভাগিকার ব্যয় সংগ্রহ হইবে। এক দানে এত ফল ফলিবার সুযোগ সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না।

অত্যন্ত সুখের আবশ্যক হইলে পরে দিতে পারি।

ইতি নিবেদক—

বুকার টি ওয়াশিংটন,

পরিচালক, টাকেনী শিল্প-বিভাগ।

টিকানা :—

ঘাটু, কার্ণেজি

৫, এস্টেট ৪১নং স্ট্রীট,

নিউ ইয়র্ক।

বধা সময়ের উত্তর আসিল। “আমি আপনার মতই উদ্বেগে আরও সত্যসত্যি প্রকাশ করিতেছি। আপনার সংকল্পে আমি যোগদান করিবার স্বেচ্ছা পাইয়া পুলকিত হইলাম। গৃহ-নির্মাণ ব্যাপারে যে ধরত পড়িবে তাহার বিলগুলি আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি ৬০,০০০ পর্যন্ত আপনার পাওনাদারদিগকে টাকা শোধ করিয়া দিব।”

এতক্ষণ বড় বড় দানের কথাই বলিলাম। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্যের মাগিয়া কম নয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকসমাজ হইতে ছোট ছোট দান টাক্তেজীর জন্ত আমি অসংখ্য পাইয়াছি। এই ক্ষুদ্র দানগুলির প্রভাবই টাক্তেজীর নাম সর্বত্র সুপ্রচারিত হইয়াছে। এই সমুদয়ের সাহায্যেই সহস্র সহস্র নরনারীর সহায়কৃতি এবং অল্পরাগ আমার শিক্ষা-সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার মতে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুষ্টিলাভেই অল্পচানগুলি ‘আতীত’ এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রগুলি গণ-পন্ডিত উপর দাঁড়াইয়া যায়—দেশের জন-সাধারণ এইগুলিকে আপনার নিজের সম্পত্তি বলিয়া গৌরব অহভব করিতে পারে।

দরিদ্র লোকেরা এক পরশা, দুই আনা, চৌপঞ্চাশ, বা একটা আদা, চটা, আলু, একটা শূকর বা খানিকটা চিনি ও ছন দাত দান করিতে পারে সত্য। কিন্তু এইগুলির সম্বাধে কম অর্থ সঞ্চিত হয় না। অধিকন্ত, এই নগ্ন দানের অল্পবিধ দ্বারাও অসীম।

কারণ ইহাতে নিরম, বিজ্ঞানীন, অনিশ্চিত অর্জনশীল অথবা নিভান্ত দরিদ্র লোকের পূর্ণ জন্মই থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সঙ্গে আমরা অনেকগুলি জন্ম ও প্রাণ আমাদের কর্মক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাভ করি। এতগুলি জনের রাজ্য হইতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা? এই দ্বারা বাস্তব জনগুলিকে ভবিষ্যতে সংকল্পের জন্ত চালিত করিতে পারিলে কি সমাজের কম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানগুলিকে আমি চির-কাল ভক্তিতেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এই গুলিকেই আমি টাক্তেজী-বিদ্যালয়ের ভিত্তি বিবেচনা করিয়া থাকি। ইহাদের সাহায্যে ‘চটক’ দেখাইবার উপযুক্ত, বা লোক দেখান বড় কিছু গৃহ বা আসবাব ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে পারি নাই সত্য। কিন্তু জন-সমাজের আগেগরে থাকিরা,—আমাদের অর্থনৈতিকভাবে জনসাধারণের এই সদয়বক্তা ও এই সহায়কৃতি আমাদের বিদ্যালয়ের জীবনীশক্তিরূপে কর্ম করিতেছে। ইহারই ফলে টাক্তেজী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকগুলি আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃষাকর্মহলের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র দান উপলক্ষ্যে আমার আর একটা কথা বলাও আবশ্যক। আমাদের বিদ্যালয় হইতে দাখরা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহার সময়ের সময়ে অথবা নিয়মিতরূপে আমাদের কাছে সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের পুরাতন ছাত্রেরা এইরূপে আমাদের সঙ্গে জীবনব্যাপী সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে।

প্রথম তিন বৎসরের কার্যকালে আমরা আলাবামা প্রদেশের রাষ্ট্র হইতে বড় হারে সাহায্য পাইয়া আসিতেছি। প্রথমে আমরা

৬০০০ টাকা মাত্র বার্ষিক পাইতাম। ইহার এক্ষণে ৯,০০০ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পরে ইহার ১৩,৫০০ করিয়া দিয়া আসিতেছেন।

আর একটা মোটা সাহায্য আমরা “স্টেটার-ভাণ্ডার” হইতে পাইয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম এই ভাণ্ডারের কর্তৃকর্তারা ৩০০০ করিয়া দিতেন—ক্রমশঃ আমাদের কাজে সঙ্গষ্ট হইয়া ধানের হার বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ৩৩,০০০ করিয়া পাঠিতেছি।

তৃতীয়তঃ, “সীলভি-ভাণ্ডার” হইতেও

আমরা সাহায্য পাইয়া থাকি। প্রথমতঃ ১৫০০০ পাইতাম—এক্ষণে বার্ষিক ৪৫০০০ পাঠিতেছি।

এই দুই বন-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার উপলক্ষ্যে আমি কয়েকজন সঙ্কল্প যেতাৎ ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ইহার বড় বড় ব্যবসায়ের খুবছয় অথবা প্রকাণ্ড কর্তৃকেন্দ্র-সমূহের পরিচালক। এত দাবিদপূর্ণ কণ্ঠে লিপ্ত থাকিয়াও ইহার কি দরিত্রের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতে সমর্থ পান! নিঃশ্রোণমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় ইহার আমার লগ্নে কত সময়ে কত আলোচনা করিয়াছেন!

## অস্বোদয় অধ্যায়

### ২০০০ মাইল দূরে ৫ মিনিটের বক্তৃতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে ‘গোটাং হল’ নির্মিত হইবার পর টাকেন্দ্রী বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য অনেক ছাত্র ও ছাত্রী দরখাস্ত করিতে লাগিল। এই সকল নুতন ছাত্রদের জন্য ‘আলাবামা-গবন’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইলাম। কিন্তু নিঃশ্রব ছাত্রও অনেক ভক্তি হইতে চাহিল। তাহারা নিজ খরচের কিয়ৎংশও ঘর হইতে আনিতে পারিত না। একজন আমরা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিভাগের প্রতিষ্ঠার তিন বৎসরের মধ্যেই একটা নৈশ-বিভাগ খুলিতে বাধ্য হইলাম।

আমি ইতিপূর্বে হ্যাঙ্গটনে একটা নৈশ-বিভাগের খুলিয়া আসিয়াছি। সেই নিয়মেই টাকেন্দ্রীতেও নৈশশিক্ষা প্রবর্তিত হইল। ১২ জন ছাত্র লইয়া কার্য আরম্ভ করা গেল। তাহাদিগকে দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া আমাদের

কোন কৃষিকার্যে বা শিল্পে বাটিতে হইত। রাজিকালে মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়া ইহাদিগকে পড়ান হইত। কাজের বেতনস্বরূপ খাওয়া খরচের অতিরিক্ত কিছু নগদ টাকা তাহাদিগকে দিতাম। এই টাকা তাহারা বিভাগে লইয়া রাখিত। এইরূপে দুইবৎসর নৈশ-বিভাগের ব্যক্তিব্যয় পর তাহাদিগকে দিবা-বিভাগের ভক্তি করা বাইত। তখন তাহাদিগের পুঁজি টাকা হইতে খাওয়া খরচ চলিত। এই উপায়ে নৈশবিভাগের কার্য গত ১৫ বৎসর চলিয়াছে। আজ ইহার ছাত্রসংখ্যা ৪৫৭।

আমি নৈশবিভাগের খুব পক্ষপাতী। কারণ ইহার নিম্নে ছাত্রের অগ্র-পরীক্ষা হইয়া যায়। বিদ্যালয়িকার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকিলে কেবল এত হাড়কাটা

পরিশ্রম করিয়া এইরূপে জীবন চালাইতে পারেন না।

দিবা-বিভ্যালয়ে ভগ্নি চটবার পরও এট ছাত্রদিগকে কোন ব্যবসাবে লাগাইয়া রাখিতাম। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন তাহা-দিগকে কাজ করিতে হইত। সপ্তাহের অপূর্ণ ৪ দিন তাহারা সাধারণ ছাত্রের দ্বাৰা লেখা-পড়া শিখিত। তাহা ছাড়া গরমের ছুটির সময়ে তিন মাস পূৰ্বাপুরি তাহাদিগকে খাটিতে হইত। এইরূপে নৈনবিভ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এবং পরে দিবা-বিভ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া অনেক নিগ্রো পুরুষ ও রমণী 'মাস্টার' হইয়া গিয়াছে। আজ নিগ্রো-সমাজে বহু লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও ব্যবসায়ী দেখিতে পাই। তাহাদের অনেকেই এই নৈনবিভ্যালয়ের অধ্যাপকীয় ভিতর দিয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের নৈন-বিভ্যালয়ে জীবন বাপন করিলে কেহই ভবি-ষ্যতে কর্মঠ চাৰী বা কারিগর না হইয়া যায় না।

কৃষি শিল্প ব্যবসায়ের কথা এত বলিতেছি। কেহ যেন না ভাবেন যে আমরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিত্যন্ত অমনোযোগী। খুট খুটের প্রচার টাক্ষেপীতে যথেষ্টই হইয়া থাকে। আমরা কোন গলের বা সম্ভ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহি—কিন্তু সাধারণ ভাবে খুটখুট নানা উপায়ে আমাদের শিক্ষালয়ে প্রচারিত হইয়া থাকে। আমাদের ধর্ম-বক্তৃতা, ধর্মসভা, যবিবারের বিদ্যালয়, খুটপ্রচারসমিতি, খুটানুযুক্তসমিতি, ইত্যাদি নানা অস্ত্রাধার ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই ইহার প্রমাণ।

অনেকেই আমাকে আমার বাগ্মিত্যের কথা দ্বিচ্ছাসা করিয়াছেন। আমি কি উপায়ে বক্তৃতা দিতে শিখিলাম কেহ কেহ জানিতে

চাহেন। সত্য কথা, আমি বক্তৃতা করিয়া জীবন বাপন করিব ইচ্ছন্ত আমার কোন দিনই ছিল না। আমার জীবনের সাধ—কাথা, কথা নহে। কথা বলিয়া কণ্ঠের প্রচার করা অপেক্ষা নিজে কর্ম করিয়া প্রয়োজন হইলে অন্তরে তাগা প্রচারের ভার দেওয়া—এই রূপই আমার ইচ্ছা চিরকাল রহিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার গুরুদেব আর্ম-ষ্ট্রংয়ের সঙ্গে আমি উত্তর অঞ্চলের ইয়াকি মহলে টাক্ষেপী বিদ্যালয়ের "আলাবামা ভবনে"র ভ্রম প্রচারকার্য করিতে-গিয়া-ছিলাম। সেই যুগে সর্বত্র আমার খ্যাতি রটে—আমার বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া লোকেরা আনন্দিত হই।

যুক্ত-রাষ্ট্রের জাতীয়পরিষদের সভা-পতি অনারেরবল জীহুস্ত টমাস বিক্লেস মহোদয় আমার কোন বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি আমাকে উইঙ্কলিন প্রদেশের ম্যাডিসন-নগরে একটা বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। সেই পিন্ধাপরিষদের এক অধিবেশনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হইল। প্রায় ৪০০০ লোক উপস্থিত ছিল। আলাবামা প্রদেশেরও কোন কোন বেভাঙ্গ, এমনকি টাক্ষেপী নগরেরও কেহ কেহ সভায় আসিয়াছিলেন। এই বেভাঙ্গেরা বক্তৃতার শেষে আমাকে বলিলেন, "ওয়ারিংটন মহাশয়, আপনার উদারতা দেখিয়া আমরা বড়ই স্ত্রীত হইয়াছি। তাইয়াছিলাম, আপনি উত্তর অঞ্চলে অবির আপ্যায়ন পাইয়া আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের বেভাঙ্গদিগকে যার পর নাই গালি দিবেন। কিন্তু আপনার বক্তৃতার বিষয়ের লেশ যাত্র নাই। আপনার চরিত্রবস্তুর আমরা অনেক শিক্ষা পাইলাম।"

আমি দক্ষিণ অঞ্চলের খেতাবদিগকে  
তিরস্কার করিব কেন? আমি যে তাহা-  
দিগের নিকট সত্য সত্যই গুণী। আমার  
বক্তৃতার সারমর্ম একটি খেতাব রমণী কোন  
সংবাদ পড়ে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ  
করিয়াছেন “ওয়ারিশিপটনের বক্তৃতা অত্যন্ত  
দৃশ্যগ্রাহী এবং উদারতার পরিচায়ক। তিনি  
দক্ষিণ প্রান্তের খেতাবদিগকে কিছুমাত্র গালি  
দেন, নাই—বরং টাক্সেজী বিভাগঘরের পক্ষ  
হইতে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।”

আমার এই ব্যাভিমন বক্তৃতাই সর্বপ্রথম  
কৃষ্ণ-খেতাব সমস্তার আলোচনা করি।  
ইহার পূর্বে এ সকল কথা কোন প্রকাশ  
সভায় কখনও তুলি নাই। শিক্ষা বিষয়ক  
বক্তৃতাই এতদিন দিয়া আসিয়াছি, এবং  
টাক্সেজী বিভাগঘরের কার্যপ্রণালীই সকলকে  
জানাইয়া আসিয়াছি। এইবার সত্যসত্যই  
রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিলাম। আমার  
আলোচনার রীতি দেখিয়া প্রায় সকলেই ধূনী  
হইয়াছিলেন। আমার রাষ্ট্রীয় মতগুলি প্রচা-  
রিত হইলে ভাতি-বিষেব অনেকটা কমিবার  
সম্ভাবনা—কেহ কেহ ইহাও বুঝিলেন।

আমি জানি, গালি দিয়া কখনও কাহাকে  
ভাল করা যায় না, অথবা তাহার চরিত্র  
পরিবর্তন করা যায় না। বরং তাহার।  
যতটুকু প্রশংসাযোগ্য কর্তব্য করিয়াছে সেই-  
টুকুর জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত।  
এজন্য উত্তর অঞ্চলে বক্তৃতা করিতে গাইয়া  
আমি কখনই দক্ষিণ অঞ্চলের নিম্না করি  
নাই। আমি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকদিগকে  
মুখের উপর যে সকল কথা বলিতে না পারি  
সে কথা তাহাদের পক্ষাতে আমি কখনই  
বলিতে ইচ্ছা করিতাম না। আমি সরলতা  
ভালবাসি।

আমি অবশ্য স্রাব্য তিরস্কার করিতেও  
ছাড়ি না। যখন সভাসভাতে বৃষ্টি যে  
খেতাবেরা অস্বাধ করিতেছে তাহা আমি  
তাহাদিগকে সামুনা সামনি বলিতে ভয় পাই  
না। বরং আমি দেখিয়াছি, যে, অনেক  
লোক এইরূপ স্পষ্টবক্তাদিগকে ভালবাসে।  
নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সমালোচনার প্রভাব  
অস্বীকার করা কঠিন। আমার সমালোচনা  
অস্বাভাবিক দক্ষিণ প্রান্তের লোকেরা কার্য  
আরম্ভ করিতে অনিচ্ছুক থাকিতে পারেন।  
কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলে আমার  
কথাগুলি এবং বক্তৃতাগুলি তাহার। মানিয়া  
লইতে বাধ্য।

এজন্য আমি নিয়ম করিয়াছি যে, দক্ষিণের  
দোষগুলি আমি দক্ষিণবাসীদিগকেই বলিব।  
তাহাদের দোষ উত্তর অঞ্চলে রটাইয়া লাভ  
কি? দক্ষিণের লোকজন লইয়া আমাদের  
কারণভার। দ্বতরং তাহাদের মতিগতি  
পরিবর্তন করিবার মন্ত্র তাহাদের সঙ্গেই  
সর্বদা বুঝাপড়া, বাক্-বিতণ্ডা ইত্যাদি হওয়া  
আবশ্যক।

ব্যাভিমনের বক্তৃতায় আমার প্রধান কথা  
ছিল—“নিগ্রো ও খেতাবে সন্তান বৃদ্ধি করা  
অত্যন্ত আবশ্যক। যত উপায়ে সম্ভব এই  
ছই সমাধে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতেই  
হইবে।” নিগ্রোদিগের কর্তব্যও আমি  
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মতে  
কেবল ক্ষমতা বা অধিকার পাইবার জন্য চেষ্টা  
করিলে চলিবে না। নিগ্রোর। সর্বাঙ্গ দৃষ্টিতে  
স্বার্থপর ভাবে কেবলমাত্র নিজ সমাজের কথা  
ভাবিলেই চলিবে না। তাহাদিগকে নির-  
পেক্ষতা এবং ‘ভ্রাতৃত্ব’ অর্জন করিতে  
হইবে। সমগ্র আমেরিকার স্বার্থ তাহাদিগকে  
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের

‘জাতীয়’ বার্ষিকির সমস্ত কেবলমাত্র যেতাজ বা কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাধের কথা ভাবিলে চলিবে না। এক সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের কথা যিনি ভাবিতে অক্ষম তিনি তাহার কর্মব্যাপারনের অযোগ্য। এট সকল কথা বলিয়া আমি আমার স্বজাতিগণকে তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিচ্ছি।

এই গেল আমার বক্তৃতার রাষ্ট্রীয় অংশ। সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রোলমায়ের উন্নতির উপায়ও আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম আমাদের উন্নতির প্রধান উপায় দুইটি—প্রথম শিক্ষা, দ্বিতীয়, শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়। আমার বক্তৃতার খানিকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—“ভাই নিগ্রো, মনে রাখিও তুমি আমেরিকা-জননীর কনিষ্ঠ সন্তান। মনে রাখিও তোমাকে যেতাজ জাতীয় সন্মান হইবার সমস্ত বর্ষমানে কঠোর সাধনায় স্তম্ভী হইতে হইবে। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি মার্জিত হওয়া আবশ্যক—তোমার চরিত্র গঠিত হওয়া আবশ্যক। নানা সদুপায় অর্জন করিয়া তুমি আমেরিকার জনসমাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গে পরিণত হও—যেখানে কেহ তোমাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবে না। যেখানে কেহই তোমাকে অবনত পদবলিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।

আমি বলিতেছি তোমার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে তুমি অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। তুমি নানা উপায়ে তোমার কমতা দেখাইতে থাক—যেতাজ তোমাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইবে। তোমার কার্য-করী শক্তির পরিচয় দাও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে যেতাজের কষ্ট হইবে। তুমি যে আমেরিকার অভাব ঘোচন করিতে পার, তুমি যে আমেরিকাকে ধনে ধাঙে ভরিয়া

ফেলিতে পার—তাহা যেতাজকে বুঝাইবার সমস্ত কি করিতেছ? এখনই তাহার। বুঝিবে যে, তোমাদের বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও চরিত্রে আমেরিকার ঐশ্বর্য বাড়িতেছে এবং আমেরিকা জগতে উন্নত হইতেছে তখনই তাহার। তোমাদিগকে মাথাধ করিয়া রাখিবে। আমি বলিতেছি তোমার কাল চামড়া ও তোমার বাপবাহার গোলামী তোমার ভবিষ্যৎ সম্মান লাভের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না।

আমি জানি একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো নিজ বিস্তারলে তিনবিধা ভূমি চরিয়া ৬৬ বৃশেল শস্যরক্ষণ আলু পাইয়াছিলেন। অথচ তাহার পল্লীর সমস্ত যেতাজ চান্দীরা ও বৃশেল মাত্র পাইত। তিনি উন্নত কৃষিবিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন এবং নতুন কৃষি-প্রণালী জানিতেন—যেতাজেরা জানিত না। কয়েকই পল্লীসমাজে এই কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সকলেরই পূজার পাত্র হইয়া পড়িলেন। বুঝিয়া দেখ—কেমন? যেতাজেরা বুদ্ধিত যে, এই ব্যক্তি সমাজের একটা সমৃদ্ধির উপায় বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তোমরা কৃষিকর্মে অভ্যস্ত হইতে থাক, মনোযোগের সহিত শিল্প কর্মে লাগিয়া যাও, এবং এইরূপ কাধ্য করিতে করিতেই চরিত্র ও বুদ্ধি গঠিত কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।”

আমার এই সকল মত আমি আত্মীবন পোষণ করিয়াছি। এইবার প্রথম প্রচার করিলাম। পরেও আমি কখন এইমত পরিবর্তন করি নাই।

যৌবনকালে আমি নিগ্রোজাতির নিপীড়ন-কারী ব্যক্তিদিগকে বড়ই ঘৃণা করিতাম। আজকাল ইহাদিগকে আর ঘৃণা বা নিন্দা করি না—ইহাদিগকে দেখিয়া হৃৎখিত হই মাত্র।

অল্পলোককে দাবিয়া রাখিতে পারিলে অনেক খুশী হয়। নিজের ক্ষমতার বড়াই করিবার মত বহু ব্যক্তি অপর ব্যক্তি বা জাতিকে চাপিয়া রাখিতে চাহে। অপর লোকের যথোপায়ে ও উন্নতিতে ইচ্ছার বৃদ্ধি চড় চড় করে এবং চোব টাটায়। কিন্তু ইহারা কি মূর্খ! ইহারা একলক্ষে সফলতা এবং বুদ্ধিমানতার পরিচয় দিতেছে। এইরূপ স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, চরিত্রহীন লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি অনেকসময়ে যগত বলিয়া থাকি,—

“ওহে ক্ষুদ্রচেতা পরপীড়নকারী ব্যক্তিগণ, তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, যে সকল সুযোগ পাইয়া তোমরা পানিকটা উন্নত হইয়াছ, সেই সকল সুযোগ সংসারের অল্প কোন পোক কখনই পাইবে না? তুমি আমাকে বা উহাকে বা দণ্ডন ব্যক্তিকে চাপিয়া রাখিয়া কি করিবে? তুমি কি সংসারের সকল কণ্ঠক্ষেত্রগুলিই একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছ? দেশের সর্বত্রই কি তুমি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছ? অত ক্ষমতা তোমার নাই। এই বিশাল মানবজগতের মধ্যে তুমি এক নগর ফীট রাজ। বিরাট কণ্ঠক্ষেত্রের এক কণামায়ে পাড়াইয়া তুমি আশ্বাসন করিতেছ।

বিশে প্রতিনিব কত নতন নতন শক্তি প্রদী হইতেছে—কত নতন নতন সুযোগ পাইয়া কত নতন নতন কণ্ঠবীরের অভ্যুদয় হইতেছে—অসং প্রতিনিব বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই নিন্তানুতন বিকাশকে রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যে নিয়মে তুমি বড় হইয়াছ, ঠিক সেই নিয়মেই সংসারের লক্ষ লক্ষ নরনারী বড় হইতেছে ও হইবে। তাহাদের উন্নতি দেখিয়া তোমার কষ্ট হয়—

তুমি নিকোপ। তুমি তাগাদিগকে তোমার সমান দণ্ডী হইতে দিতে চাহ না—তুমি মূর্খ। ঐ দেখ, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে অস্বস্তি করিয়াই নতন নতন কণ্ঠ ও চিত্তাবীর জগতে মাথা তুলিয়া পাড়াইতেছেন। চিরউত্তীর্ণশীল সংসারের প্রবল প্রবাহের মধ্যে তোমার মত কত ফীট তুণের জায় অহরহ ভাসিয়া বাইতেছে।

যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পারিতো। যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে লক্ষিত হইতে। যদি মাহুষ হইতে, তাহা হইলে নিজের অহংকার খর্ব করিতে শিখিতো, এবং নিরীক্ষণমূলক সমগ্র সমাজের উন্নতি-বিধানের অল্পতম ক্ষুদ্র বস্তুরূপ বিবেচনা করিতে পারিতো; তখন আপামর জনসাধারণের পরিপূর্ণ বিকাশলাভের সাহায্য করিতে যত্ববান হইতে। যদি বর্ণজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে অপরকে তোমা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ করিবার সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক জীবন ধন্য করিতে উৎসাহী হইতে।”

আমার ম্যাগিসনের বক্তৃতায় উত্তর মহলে একটা হৈট পড়িয়া গেল। এই তোলা-পাড়ার হুগুপে বহুদান হইতে বক্তৃতা করিবার মত নিয়ন্ত্রণ আসিতে লাগিল। আমি বোষ্টন-নগরে থাকিয়া ইচ্ছা করিলেই মহলের নানা স্থানে আমার মত-প্রচার করিবার সুযোগ পাইলাম। কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা—যদিও প্রান্তে যাইয়া এই কথাগুলি প্রকাশ্যভাবে বলিয়া আসি। আমি একজন সুযোগ সৃষ্টিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে একটা সুবিধা পাওয়া গেল।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বর্জিয়া প্রদেশের আইল্যান্ড নগরে একটা বিরাট খুদান মহাপ্রভাব আয়োজন হইতেছিল। এই সময়ে বোষ্টনেও



আমার অনেক কাল ছিল। তথাপি জর্জিয়ার কর্তৃকর্তাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। বোটন হইতে আটলান্টা ২০০ মাইল। এতদূর যাইতে হইবে। অথচ বক্তৃতা করিবার মাত্র ৩০ মিনিট পূর্বে পড়াহলে আমার গাভী পৌঁছিবে। এখানে ৫ মিনিট মাত্র বক্তৃতা করিতে সময় পাইব। আটলান্টায় সর্বসমেত একঘণ্টা মাত্র থাকিয়া পুনরায় আমাকে বোটনে আসিতে হইবে। আমার কালের ভিত্তি এত। বাহ্যে হঠক দক্ষিণ অক্ষের এই মহাপন্থিলনে বক্তৃতা করিবার সুযোগ ছাড়িলাম না।

এখানে যেতাম ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সমাজেরই গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সর্বসমেত ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আমার শিক্ষাপ্রণালীর বিবরণ দিলাম—নিম্নশিক্ষা-নীতি বুঝাইয়া দিলাম এতদ্ব্যতীত নিগ্রো-সমাজের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলিলাম। অধিকন্তু যেতাকর্দিগের বধোচিত সমালোচনা করিতেও ছাড়িলাম না। আটলান্টার সংবাদ পত্রগুলি আমার বক্তৃতার দূর তারিফ করিতে লাগিল। আমার কার্যোদ্ধার হইয়া গেল—দক্ষিণ প্রান্তের যেতাম মহলে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলাম।

ইহার পর হইতে কৃষ্ণাঙ্গ ও যেতাক সকলেই আমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মীড়-মীড়ি করিতেন। টাঙ্কেজীর কার্যকর্ম হইতে বিবাহ লইয়া আমাকে এই বক্তৃতাকার্যে লাগিয়া থাকিতে হইত। উত্তর অঞ্চলে আমি টাঙ্কেজীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতাম। নিগ্রোমহলে আমার স্বজাতির বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎউন্নতির উপায় আলোচনা করিতাম।

এইবার আমি আমার জীবনের একটা

বিশেষ স্মরণীয় দিনের উল্লেখ করিব। সেট দিন হইতে আমি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। তখন হইতে আমার যশ কেবল মাত্র নিগ্রোমহলে অথবা আমার জাতি-কারী যেতাক বন্ধুসমূহেরই আবদ্ধ থাকিল না। আমার নাম জেলা হইতে জেলায়, প্রদেশ হইতে প্রদেশে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। আমি কোন প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের কর্তব্যীর মাত্র থাকিলাম না। সকল প্রদেশের লোকট আমাকে সমগ্র 'জাতির' অন্ততম নেতৃত্বপে গ্রহণ করিল। আমেরিকা ভূখণ্ডের একজন জন-নায়ক বা কর্মীপুত্র অথবা একজন যুক্তরাষ্ট্র-বীররূপে আমি সম্মান পাইতে লাগিলাম।

১৮২৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আমার জীবনের এই স্মরণীয় দিন। এদিন আটলান্টা নগরে এক বিপুল প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনীতে আমি আমার শিক্ষানীতি এবং রাষ্ট্রীয় মত প্রচার করিবার জন্য বক্তৃতা করিতে সুযোগ পাই।

এই প্রদর্শনীর বিষয় সবিশেষ বলা আব-  
শ্যক। আটলান্টার খুটান মণ্ডলসভায় বক্তৃতা  
করার কলে ঐ অঞ্চলে আমার খ্যাতি প্রতি-  
ষ্ঠিত হয়। তাহার কিছু কাল পরে ১৮২৫  
সালে ঐ নগরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তলোক  
আমার নিকট টেলিগ্রাম করেন, "আটলান্টার  
এক বিরাট প্রদর্শনী ও পন্থিলনের আয়োজন  
হইতেছে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ধনসচিবের  
নিকট হইতে অর্থসাহায্য আবশ্যক। আমা-  
দের নগরবাসী কয়েকজন এই কার্য উপলক্ষ্যে  
ওয়াশিংটনের যুক্তরসবারে যাইয়া অবস্থান  
করিবেন। 'জাতীয়' মণ্ডলসমিতি কংগ্রেসের  
সম্মুখে ইহারা আবেদন অভ্যর্থনা জানাইবেন।  
আপনাকে এই প্রতিনিধিগণের সঙ্গে

আমাদের পক্ষ হইতে যোগদান করিতে হইবে।”

লর্ডিয়ার প্রবেশের ২৩জন বিচক্ষণ খেতাব এই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিনিধি-সভায় তিনজন নিগ্ৰোয় স্থানও ছিল। আমি তাহাদের একজন হইলাম। দুকুরাষ্ট্রের ‘জাতীয়’-দরবারে তিন চারিজন বক্তৃতা করিলেন—আমাকেও বক্তৃতা করিতে হইল। আমি আটলান্টার পক্ষ হইতে সেই জাতীয় মহাসমিতিতে নিবেদন করিলাম, “দক্ষিণ-প্রান্তের খেতাব ও কৃকালসমাজে। আকৃতাৎ বর্জন করা অত্যাবশ্যক। একত্র আপনারা বহুপরিকর হউন। ইম্মই ঐ সকলের সর্ববিধ প্রিয়ত্ব সাধনের ব্যবস্থা করুন। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বারা উন্নতির আর্থিক ও মানসিক উন্নতির সাহায্য করিলে এই কার্য সহজেই সিদ্ধ হইবে। সমগ্র আটলান্টার প্রদর্শনী উপলক্ষে মহাসংযোগ উপস্থিত। ইহাতে গোলাবীনিবারণের যুগ হইতে বিগত বিশবৎসরের মধ্যে উন্নয়নশক্তির উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই প্রদর্শনীর দ্বারাই আবার উন্নতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে।”

আমি প্রায় ২৪২০ মিনিট কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতা করিলাম। আমার বক্তব্যের শেষ অংশ এই—“নিগ্ৰোরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতেছে সত্য। কিন্তু কেবল মাত্র ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকিলে কি হইবে? তাহাদের বনসম্পত্তি নাই। এক্ষণে তাহাদের সম্পত্তির মালিক হওয়া আবশ্যক। একত্র তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে শিল্প ও ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। এই সকল বিষয়ে দুকুরাষ্ট্র তাহাদের সাহায্য হইতে

পারেন। তাহাদের লব্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অচিরেই তাহাদের চরিত্র গঠিত হইবে—এবং তাহারা বিশ্ববনস্পত্তির অধিকারী হইয়া যথার্থ দায়িত্বের সহিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে। আটলান্টার সম্মিলনে কংগ্রেস এক মহাসংযোগ পাঠবেন। উত্তরপ্রান্তে ও দক্ষিণপ্রান্তে সচিৎ স্থাপিত হইবার পর কংগ্রেস একত্র সংযোগ আর পান নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলে এইবার আমেরিকার নবজীবন প্রবর্তনের হস্তপাত করিতে পারেন।”

আমার কথা বলা হইয়া গেলে আমার প্রতিনিধি বক্তৃতা আমার খুব সুখ্যাতি করিলেন। কংগ্রেসের সভ্য মহোদয়গণও আমার প্রশংসা করিলেন। কংগ্রেসের মহাসভা হইতে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করা হইল। আটলান্টা প্রদর্শনীর ব্যয় দুকুরাষ্ট্রের ‘জাতীয়’ কোষাগার হইতে পাওয়া যাইবে—আশা পাইলাম।

তারপর প্রদর্শনী সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। কর্তৃকর্তরা স্থির করিলেন নিগ্ৰো-সমাজের লব্ধ বিশেষ এক বিভাগ বেলা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের পর ২০ বৎসরের মধ্যে নিগ্ৰোরা শিল্পে, কৃষিক্ষেত্রে, শিক্ষায়, নান্য ক্রটিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সেই গুলি একস্থানে জমা করিয়া দেখান কর্তব্য। আটলান্টা প্রতি প্রদর্শনীতে তাহার লব্ধ বস্তুর আয়োজন করিবার প্রস্তাব হইল। নিগ্ৰোবিভাগের দরবাড়ী সাজসজ্জা আসবাব পত্র সবই নিগ্ৰোরা নিজেদের দ্বারাই করিগা সহিবে—ইহাও স্থির হইয়া গেল।

প্রদর্শনীর নিগ্ৰো-বিভাগের লব্ধ একজন কর্তা নির্বাচিত হইল। লর্ডিয়ার পদসেবাসী আমাকেই চাহিলেন। কিন্তু টাকেক্কর কালে

আমি ব্যস্ত—একজ্ঞ সেই পদ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার প্রত্যবে অস্ত্র একজন নিগ্রোকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হইল।

নিগ্রো-বিভাগের মধ্যে দুইটা কামরাই সকলের দৃষ্টি সঙ্গীপে। যেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রথমতঃ ছাশ্চটন বিভাগের ডাএ-বের কাজকর্ম্ম, দ্বিতীয়ে: টাশেজী বিভাগের ছেলেদের হাতেও কাজ। বলা বাহুল্য, সঙ্গীপে যেই বি'ম্মত হইয়াছিল, সঙ্গীপ প্রান্তের খেতাবগণ।

আটলাণ্টা-মহাপ্রদর্শনীর দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিবার জন্য কার্যপ্রণালী আলোচিত হইল। এই প্রদর্শনীতে নিগ্রোদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ কার্য কর্ম্ম প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই তিন জন নিগ্রো ওয়াশিংটন পর্ষাদ যাইয়া 'জাতী' মহাপ্রদর্শনের নিকট আবেদন করিয়া আদিয়াছেন—এবং নিগ্রোদিগকে প্রদর্শনীর কার্যে ও নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই প্রদর্শনী খুলিবার উৎসবে যে সম্মিলন হইবে তাহাতে নিগ্রোর আগমন থাকাও বাঞ্ছনীয়। নিগ্রোর পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধির সেই সম্মিলনে বক্তৃতা করা আবশ্যক। কোন কোন খেতাব আপত্তি করিলেন; বলিলেন "অতবড় বিরাট ব্যাপারে কৃষ্ণাঙ্গের স্থান দিবার প্রয়োজন নাই।" শেষ পর্য্যন্ত সাবাস্থ হইল, একজন নিগ্রো প্রতিনিধিকে বক্তৃতার জন্য নিয়োগ করা হইবে। কয়েকদিন পরে আমিই সেই নিয়োগ পাইলাম।

আমি বিষয় সমস্তায় পড়িলাম। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি পোলাম ছিলাম।

আমার মনিবেরা কেহ কেহ হৃদয় এই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহাদের সম্মুখে আমি স্বাধীন ভাবে কেমন করিয়া বক্তৃতা করিব ?

তারপর নিগ্রোজাতির পক্ষে খেতাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার সুযোগ এই প্রথম পাওয়া গেল। এই ঘটনার উপর নিগ্রোদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এই সভাপ্রসঙ্গে, আমার, কৃষ্ণাঙ্গ ও অনেক থাকিবেন এবং উত্তর অঞ্চলের খেতাব ও অনেকে আদিবেন। সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গের উচ্চ মহাপ্রদর্শন বলিলে কোন অভ্যাসি হয় না। এই সঙ্গীপ-সমাপনের আগরে, এই 'জাতী' সভাপ্রসঙ্গে দাঁড়াইয়া সকল প্রবেশ ও সকল সম্মুখাঙ্গের মস্ত বক্ষা করিয়া কথা বলা কি সহজ ?

আমার স্বজাতির প্রতি কর্তব্য আছে। তাগা পালন করিতেই চাইবে। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেই চাইবে—অথচ তাহাদের দোষের কথা উল্লেখ না করিলেই বা চলিবে কেন ? এনিকে উত্তর অঞ্চলের ইয়াংগন তাঁহারাও আমার বক্তৃতা শুনিয়া সমগ্র আমেরিকার নিগ্রোমস্তা হুহিতে চেষ্টা করিবেন। দক্ষিণ-প্রান্তের নিগ্রোর ও খেতাবে সম্বন্ধ কিন্তু দাঁড়াইয়াছে তাহারা আমার বক্তৃতা হইতেই তাহার পরিচয় লইবেন। সুতরাং আমার দায়িত্ব অতি গুরুতর—সমগ্র আমেরিকা জাতি আমার পরীক্ষক ও বিচারক। এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমি এতদিন লাভ করিয়াছি কি ? এই সময়ে আমার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর।

আমার মবার কত কথাই আদিতে লাগিল। আমি নানা উপায়ে সমস্তাটা

তলাইয়া মজাইয়া বৃত্তিতে চেঁচা করিলাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি আমাকে প্রকাশিতভাবে পরামর্শ দিতে লাগিল। কেহ লিখিল—“আমার অমুক অমুক বিষয় আলোচনা করা উচিত, অমুক অমুক প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাট ভাল।” কোন সম্পাদক সন্ধ্যায় পরামর্শ দিলেন—“ওয়ারিংটন এই এই কথা যেন বলেন।” ইত্যাদি। আমার স্বাভা-  
গণ এবং হৃদয় প্রাণের যেতাক্ষেয়াও আমাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না। যাগা হউক আমার নিজের বক্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। ১৮ সেপ্টেম্বর সভা হইবে—  
তাহার পূর্বেই আমার বক্তৃতা লেখা হইয়া গেল। টাক্সেজীর শিক্ষকগণকে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম। তাহাদের আলো-  
চনা অল্পাধারে বক্তৃতার কিয়দংশ মার্জিতও করিয়া লইলাম।

১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাক্সেজী হইতে আটলাণ্টার সম্মিলনে রওনা হওয়া গেল। টাক্সেজীতে রেল চড়িতে যাইতেছি, এমন সময়ে একজন যেতাক চাবী আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল,—“কিহে ওয়ারিংটন ভায়া এতদিন তুমি উত্তর অঙ্গলের ইয়াকি মহলে বক্তৃতা মারিছ। অববা তোমার স্বাভা-  
গণকে তাহাদের কর্তব্য শিখাইয়াছ—এবং কখনও কখনও হৃদয়ের যেতাক মহলেও আমাদের উপর সলাবাজী করিয়াছ। কিন্তু এবার তোমাকে এক সঙ্গে সকল মহলেই কথা বলিতে হইবে। দেখিতেছি তুমি এবার নক পাল্লায় পড়িয়াছ। এবার উদ্ধার পাইলে বৃত্তি ওয়ারিংটন সত্যদত্যই একজন যাহুৎ,” চাবী আমার মনোভাব ঠিক বৃত্তিতে পারিয়া-  
ছিল—সত্যই আমার তখনকার অবস্থা বড় কঠিন।

আমি রেল চলিলাম। ট্রেনে ট্রেনে কত যেতাক কৃৎসাক আমার সম্মুখে পাঁড়াইয়াই আমার সম্মুখে আলোচনা করিতে লাগিল। আমার দিকে অনেকে আগ্রহ দিয়া অন্তর্ভুক্ত দেখাইয়া দিল। গাড়ী চড়িতে আটলাণ্টায় পর্যায় করিবামাত্র একত্রু নিয়োগ আর একজনকে বলিল “ঐ লোকটা কালকার সভায় আমাদের স্বাভাতির পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিবে। আমি সভায় শুনিতে যাইবই স্থির করিয়াছি।”

আটলাণ্টার সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি, দর্শক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীর সমাগন হইয়াছে। সেনাবিভাগের লোকজন আসিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষী এবং রাষ্ট্রীয় দূতগণও সমবেত হইয়াছেন। আটলাণ্টার সেদিন বিশ্বের মহাবাজার বসিয়াছে বোগ হইল।

সমস্ত রাজি আমার ঘুম হইল না। সকালে উঠিবামাত্র ভগবানের নিকট আমার বক্তৃতার সফলতার কৃত্ত প্রার্থনা করিলাম। সকল বক্তৃতার পূর্বেই আমি ভগবানের ককণা তিক্ষা করিয়া থাকি।

তারপর আমাকে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবার জন্ত কয়েকজন লোক আমার গৃহে আসিলেন। সভাশুলে যাইবার পূর্বে এক বিশাল শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই শোভাযাত্রায় কৃৎসাকসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং কয়েক ঘল কৃৎসাক সৈন্যও বোগ নান করিয়াছিল। ভিন্ন বটী ক্রমাগত চলি। সেই লোক-প্রবাহ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরমে আমার পরীর বর্দাক হইয়া গেল। একে আমার মানসিক উৎসেগ তাহার উপর এই ক্রান্তি। আমি

ভাবিলাম—আমার বক্তৃতা বেওয়া হইবে না। অবশেষে সম্মিলন-গৃহে প্রবেশ করিলাম।

সভামণ্ডপ অতি হৃদয়তাপ্ত ও গোলাকার। বীচ হইতে উপরিভাগ পর্যন্ত কোথাও নূতন লোক বসিবার হিন্দুমাড় স্থান নাই—সকল আগুনই পূর্ণ। আমি গৃহে প্রবেশ করিলামাত্র রুকায়েয়া জব্বারনি করিতে লাগিল। কোন কোন বেতাঙ্গও সেই ধরিতে যোগদান করিলেন। আমি শুনিয়া-ছিলাম যে অনেক বেতাঙ্গই আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিবেন। কাহারও উদ্দেশ্য কেবল শুনা মাত্র। কেহ কেহ অবশ্য আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন আর অধিকাংশ লোকই মনো-ধেবিতে আসিয়াছে।

ভাড়াহের বিশ্বাস আমি সকল অজ্ঞানটাই পণ্ড করিয়া ফেলিব! তাহা হইলে আমাদের লইয়া হানি ঠাট্টা করিতে পারিবে।

আমার একজন সহচর বেতাঙ্গ বন্ধু ব্যাপার দেখিয়া সভাগৃহেই প্রবেশ করিলেন না। আমি যদি হৃদয় লাভ না করি তাহা হইলে বড়ই লজ্জা ও নিম্মার বিষয় হইবে। এই ভাবিয়া তিনি অস্থিরভাবে সভাগৃহের বাহিরে 'পাথচারি' করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই বক্তৃতা সবেশে পূর্ণ হইতে নানা লোকের মনে নানা সম্মেহ উদ্ভিষ্টাছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

## হিন্দু ট্যাঙ্ক

দরিদ্র ঈশ্বর

ঈশ্বর সবেশে অনেকের অনেকতপ করেন। বা আদর্শের সহিত আমবা হুপরিচিত কিন্তু হিন্দু বাতীত আর কেহ কখনও দরিদ্র ঈশ্বরের ধারণা বা উহাকে আদর্শ জানে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইছেন কি?

ঐশ্বর্যশালী পুরুষই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ। যিনি শক্তি হীন, তিনি সকলেরই নিকটে লবণও উপেক্ষীয় ও পরিত্যক্ত্য বিবেচিত হইবেন না কি? কামনা-পূরণে ধারার শক্তি নাই তাহাকে উপাসনায় ফল কি? সত্তত অজ্ঞানপ্রাণ বা নিষ্ঠ উপাসকের নিকট, উপাস্য ঈশ্বরের পক্ষে ঐশ্বর্যশালী হওয়াটা একান্ত আবশ্যকীয় গুণ।

এবং বাবিলেই কেহ বড় লোক হয় না, সঙ্গে সঙ্গে অভাবের অতীত হওয়া আবশ্যক। শুধু আর দেখাই কে করুণ বড় লোক কখন ঠিক করা যায় কি? সঙ্গে সঙ্গে ভাঙার ব্যয় কত সেটাও দেখিতে হয়। তবেই ভাঙার প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। এই মস্ত মানসিক একশ টাকা আরও কেহ দরিদ্র এবং মশ টাকা মাত্র উপার্জন করণ কেহ বা বড় লোকের সামিল হইতে পারে। ঐশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে যিনি যে পরিমাণে অভাবের অতীত, তিনি সেই পরিমাণে বড় লোক বা ঈশ্বর পদ-বাচ্য।

শ্রীশ্রীমহাক্ষ কথ্যুতে আছে, একদা

কোন ককির সাহায্য প্রার্থী চেয়ে, আক্কেবর বাগদার নিকট উপস্থিত। বাগদার তখন নমাজে বসেছিলেন। ককির দেখিলেন নমাজ শেষ করে বাগদার তাঁর উপাস্য ভগবানের নিকট ধন দাও, দৌলত দাও, শত্রু ক্ষয়কর ও এইরূপ আরও কত প্রার্থনার হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিলেন। ককির তাই দেখে উঠে চলেছেন, এমন সময় বাগদার তাঁকে বলতে বললেন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ককির বললেন, “বাবা, তোমার নিকট কিছু ডিন্দা করুতে এসে-ছিলাম, কিন্তু এসে দেখি তুমি আমায় চেয়েও একটি প্রকাণ্ড ভিখারী, অতএব তোমার নিকট আর না চেয়ে, যিনি সকলের ভিক্ষাপূর্ণ করেন তাঁহার নিকটই ভিক্ষা ভাস ভেবে চলে যাচ্ছিলাম। উত্তর শুনে আক্কেবর বাগদার খুসী হয়ে ককিরকে তুষ্ট করে বিদায় দিলেন।

একদশালী হয়েও এইরূপ অভাবগ্রস্ত रहा যায়। অভাবের বশ রহিলে তিনি ছোট খাট ভাবে অনেকের নিকট উপাস্য বা ঈশ্বরকল্প হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরে ও তাঁহাতে অনেক প্রভেদ। যিনি প্রকৃত উপাস্য বা পরমেশ্বর তিনি শুধু একদশালী নহেন, সর্বোত্তমভাবে পূর্ণরূপে একদা সম্পন্ন নবুবা অভাবের অতীত হইবেন কিরূপে? তিনি কর্কশল, প্রাকৃতিক নিম্ন প্রকৃতির অধীন নহেন পরন্তু এ কর্কশল প্রাকৃতিক নিম্ন প্রকৃতি তাঁহারই একদা বা ইচ্ছার বিকাশ বস্তু। যিনি সর্বৈশ্বর্যের সমীক্ষিত বস্তু তিনিই প্রকৃত পক্ষে সর্বশক্তিশালী এবং এই ভাবে ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন একদা, কোন কিছুই থাকিতে পারে না। যিনি এইরূপ সর্বৈশ্বর্যের সমীক্ষিত

দৃষ্টিতে ও সর্বশক্তির আধাররূপে বিদ্যমান তিনিই আমাদের দেউ পরম উপাস্য মহেশ্বর।

একদা পক্ষে ঈশ্বরতীর্থ শক্তি ঈশ্বরতীর্থ প্রার্থনীর্থ বিষয় ব্যাটীয়া থাকে। বীর্ঘা, ধন, ঐ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অবধি ইহার অন্তর্ভুক্ত। যিনি ভগবান্ তিনি এইরূপ বৈভবসম্পন্ন, সর্বশক্তিশালী, সকল বিষয়ের বা প্রকৃতির পতি। তিনি প্রকৃতির পতি কারণ প্রকৃতির তিনি আধার বা আশ্রয় বস্তু এবং তিনি আপেক্ষ্য ও অভাবের অতীত হুতরায় প্রকৃতিব প্রভু।

একটু ভাবিলেই বুঝা যায় শক্তি ও শক্তি-মানে বস্তুতঃ ভেদ নাই। সাধিকানক্তির নামই অগ্নি, সাধিকানক্তিই হু গাড়াইলে অগ্নির আর অংশের থাকে কি? “আমি” শব্দের অর্থই আমাতে নিহিত শক্তিসমূহের সমষ্টি-রূপে যিনি বিদ্যমান। প্রকৃতি ও প্রকৃতিপতি, তাও বস্তুতঃ সত্ত্ব মহেশ্বরী এবং শবাকারে অবস্থিত নিম্ন মনোর উভয়ে এইরূপ চিরমিলিতভাবে বিদ্যমান এবং বস্তুতঃ ভেদ রহিত।

দেখা যায়, দুঃখকে জয় করিয়া এবং দুঃখস্পর্শ সম্ভাবনার অতীত হইয়া এই দুই উপায়ে অভাবের অতীত হওয়া যায়। প্রকৃতিমার্গ আশ্রয় করে কামনার পূরণে দুঃখ হয় এবং নিরুত্তি মার্গাবলম্বী হয়ে কামনা সংঘনে কৃতকার্য হলেও অভাবের অতীত অবস্থা ঘটে। মহামায়া মায়ের আমায়ের তাই ঐ বিবিধ দৃষ্টি। একভাবে তিনি বাহ্য কিছু আছে সকলের সমষ্টি বস্তুপা সর্বশক্তির আধারকৃত। তাও বস্তুতঃ সত্ত্ব ঈশ্বরী আবার অন্ত ভাবে তিনি ঐ নিরুত্তির পূর্ণদৃষ্টি সাক্ষ্যরহিত শবাকারে অবস্থিত সত্ত্বেশ্বরক

আমারশুভ্রঙ্গী অনন্তমুষ্টি পরম বোম বা মধে-  
বহ। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু দুয়ে মিলিয়া এক।

যিনি আমাদের উপাত্ত ঈশ্বর, মগাওকল্পে  
তিনি এইরূপ দুই ভাবে তাঁহার উপাসক  
সম্মানকুলকে গড়িয়া তুলিতেছেন। একভাবে  
অতি কোমল ঘেহশীলা মাতৃমুষ্টিতে তিনি  
তাঁহাদের কামনা সকলের পূর্ণতা সাধন  
করিতেছেন, আর এক ভাবে নিত্যমুষ্টি-  
হীনের স্তায় দরিদ্রের স্তায়, আমাদের  
প্রার্থনাসমূহ অপূর্ণই রাখিয়া দিতেছেন।  
অথবা এক ভাবে তিনি কখন কখনের জঘ ও  
অধর্ষের ক্ষয় ঘটাইয়া বিপদের উদ্ধার সাধন  
করিয়া নিজের ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিতেছেন  
আবার কখন বা নক্তিহীন শবের স্তায় নিজকে  
বেন দুছিয়া কেলিয়া দুয়ে দাঁড়াইয়া পতিতের  
পুনরুত্থান নিরীক্ষণ করিবার জন্য অপেক্ষা  
করিয়া থাকেন। যে পাপপথে প্রবৃত্ত, সে  
শাসন ভয়ে নহে পরন্তু বইছাড়, শুধু সত্য  
শিব হৃদয়ের উপর অহুয়ানবশে প্রত্যাভূত  
হউক ইহাই বেন অভিপ্রায়। হাশ আল্লা  
পেলে কত সাধু চোর হয়, কত চোর সাধু  
হয়, কে কতদূর খাটি কেমন বাছাই হয়ে  
যায়। এ সব দরিদ্র ঈশ্বরের কাজ।

কুমিষ্ট হইবার পর মাঘের সহিতই আমা-  
দের প্রথম পরিচয় ঘটে। অগতের অধিকাংশ  
উপাসকেরও এইরূপ শৈশবাবস্থা। নক্তিহীন  
দরিদ্র ঈশ্বরের উপাসক তাই নাই বলিলেই  
হয়, এটা বয়োবৃদ্ধ উপাসকের লক্ষণ।  
বয়োবৃদ্ধি সহকারে কিন্তু পিতৃস্বভাবে  
আমিরাই সত্যানের শিকার ও প্রকৃতির  
পূর্ণতা সাধিত হয়, আর একভাবে সে দুঃখ-  
মুক্তির সম্মান পায়, নিষ্কাম কৰ্মাচ্ছান জনিত  
আনন্দ উপভোগের, অহৈতুক অহুয়ানের দ্বা-  
লাতে তাহার সামর্থ্য আছে। বেধ নাই কি,

যে শিশু শৈশবে নিজেই চিন্তাচেতই সদা  
বিস্তৃত, ভাল পানার ভাল কাপড় ইত্যাদি  
নিজের ভোগে লাগাতেই বাস্তু, সেই কেমন  
আবার বড় হয়ে নিজের চিন্তা (অন্ততঃ বহু  
পরিমাণে) তুলে গিছে, তার ঐ কাল বশে  
নক্তিহীন মগাওকল্পের, তার বহু স্নেহের  
আমরের স্রীপুত্র পরিজনদের স্রীভার্যকিত্ব করিতে  
পারিলে কেমন কৃতজ্ঞগুণ হয়? আধ্যাত্মিক  
জীবনেও ঐক্য জানিবে। যিনি দরিদ্র ঈশ্বরের  
উপাসনায় সমর্থ, জানিবে তাঁহার আধ্যাত্মিক  
শৈশবাবস্থা ক্রমেই কাটিয়া যাইতেছে।

মরার বাড়ী গাল নাই। সব আশা ঠাণী-  
কৃত প্রায় হয়ে জনম যখন প্রায় অশান ক্ষেত্রে  
পরিণত হয়, কে তখন সেই ঘোর অশানে  
শিব সংকীর্ণ হয়ে অত্যা ও বরদা মুষ্টিতে  
অনৃত শিকন করে দুমুখ সাধক অন্তরে নব  
প্রাণ সকার করেন? সাধক চিনিলে কি?  
ইনি ঐ দরিদ্র ঈশ্বর।

ইনিই তখন অভয়বাণী শুনিবে আশ্রিত  
করেন, সকলের সমীকৃত বাহা আমরা যে  
তাঁই, শুধু সর্গীর্ণ চিন্ততা হেতু যেনে লই  
আমরা কোববন্ত ও হুহ, কোদের উৎপত্তি ও  
নাথের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন উৎপন্ন বা  
বিনষ্ট হই। সীমা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে  
দেশও যেমন প্রকৃতপক্ষে সূত্র বা বিনষ্ট হয়  
না, তদ্রূপ ন্যায়রূপের পরিবর্তন অধ্বংস  
ঘটিলেও সমীকৃত নক্তির ক্ষয় নাই, উপচয়  
নাই, প্রকৃত বিকারও নাই। আমাতে ও  
আমার নক্তিতে প্রভেদ নাই, অতএব  
আমরাও প্রকৃতপক্ষে ভগ্ন ও ভগ্নাধরণ  
বিবক্ষিত। মহামায়ার প্রসাধে আমিদের  
সর্গীর্ণ ধারণাটি দূর হ'লেই মুষ্টিতে পাতি,  
আমরা অন্তরের বংশধর ও অমর, আমাদের  
আবার বিনাশ কোথায়?

সব গেলেনও যিনি অবশেষে থাকেন, শাস্ত্রঃ শিবম্ অষ্টমতম্ অবিকারী অবিনাশী মৃতিতে ও সকলের পরম আশ্রয়স্থানে যিনি নিহত বর্জমান, “হস্তে মণিগণগাইব” যিনি সকলের অন্তর্লীন পরম আশ্রয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের খস্ত অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব ? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে কিছুতেই টুটে না। আমরা তাঁহা হইতে ভাত, তাঁহাতেই হিত ও পুষ্টি এবং সকলের অন্তে তাঁহাতেই লীন। তাঁহাতে ও আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, ভেদ নাই। কেবল সকলের মালিক ঐ মহামায়া রূপাকারে আমাদের সর্গীয় ভ্রাম্যাক্ষক ধারণাটুকু যতদিন না ঘুটিয়ে দেন ততদিনই আমরা বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র, ততদিনই ক্ষয় ভ্রাম্যকরণের অধীন এবং অজ্ঞান নানা মূঢ় ভ্রম বোঝে ডুবি ভাসি। যোগে প্রসঙ্গ হ, সুপ্ত ভ্রমণি হই কুমাতা কখন নয়, তোর প্রসঙ্গই সম্বন্ধের ধীবন এবং তুই প্রসঙ্গ থাকিলে সম্বন্ধের আর ভাবনা কি ?—তঃ বৈ প্রসঙ্গা তুবি মুক্তি যেতুঃ” (৫৩)।

দান দুই রকমে হয়। একরূপ দানে উপকৃত ব্যক্তির পরমুখাপেক্ষিতা কাটে না, সে চিরকাল যে ভিখারী সেই ভিখারীই থাকে। আর একরূপ দান আছে, বাহ্যর ফলে আজ যে অসহায় পরবল কাল সে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার বল পায়। আধ্যাত্মিক ধীবনে কাহার লাগনে সাধকের এই অসহায় ভাব মুছিয়া যায়, কাহার উপাসনার উপাত্তের নক্তি উপাশক মাৎসেও অল্প বিস্তর স্ফুরিত হয়, অভাবকে আর ভয়ের চক্ষে দেখিতে হয় না, জান কি ? তিনি হচ্ছেন আমাদের ঐ ভিখারী হস্তি মহেশ্বর।

ফলতঃ দুই ভাবের উপাসনাতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমাদের অভাব দূরের ক্ষণ আমাদের সর্গ অস্ত্রাবের অতীত সর্গের ধর্ম সম্পন্ন উপাত্তেরে নিকটেই চির বিদ্যমান আছে, স্তব্ধতা কিসের দৈন্ত কিসের ভয় ! এই একভাব। আর এক ভাব হইতেছে, সর্গ সম্পর্ক বিরহিত দরিদ্র ঈশ্বরের স্তায় তাঁহার উপাশক কুল আমরাও সর্গভোক্তাবে ভ্রম্যকরণের অতীত—“নৈনং হিম্মতি শ্রান্তি নৈনং হরতি পাবকঃ”—আত্মা আগুণে পুড়ে না অস্ত্রেও কাটে না—ইত্যাদি ভাবে অল্পপ্রাণিত হওয়া। উভয় ভাবের ভাবুক হয়ে একই রূপ ফল। একরূপ ত হইবেই, কারণ উপাত্তের নানা আদর্শ মধ্যে পরস্পরের সহিত বহুগত যে ভেদ নাই। “এ জগতের নিরুপা একজন মাত্র, তাকে নক্তিই বলুন, শিবই বলুন, বিষ্ণুই বলুন, বা মনে চায় তাই বলুন, তাতে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তাকে তুলিয়া থাকা কোন রকমে মুক্তি লভ্য নয়।” (পাগল হরিনাথ চর্চা ১৩৭ পৃষ্ঠা)। কালের কথাটি হইতেছে এই যার যে ভাবটি মধুর বোধ হয় সেই ভাবে কিছু কাল একনিষ্ঠ সাধনা আবশ্যক।

আমাদের সাধক-কুল রূপ-পরম্পর হয়ে আমাদের স্তব্ধ এই দরিদ্র ঈশ্বরের নানা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া সিদ্ধাছেন। আমাদের মহেশ্বর ভিখারীর চূড়ামণি, আমাদের অসম্বাস্তা মহাশেখরী কুণ্ডের ভাগ্যবান হলেও তিনি ঐ ভিখারীর সত্যী গৃহিণী, আমাদের বামন দেব বলিষ্ঠাকার দুগারে ব্রাহ্মণবেশী ভিখারী, আমাদের নন্দহলাল আমাদের স্নেহ ককণার উপর নির্ভরশীল নক্তিহীন শিশু, (এ শিশুটি কিছু দ্রুতও বটে, আপনা হ’তে স্নেহ প্রেমাদি না পায় সময় সময় চুরি বাট-



পাড়ি করেও আপনার অনেক নিকট হইতে নিজ শ্রাণ্য আদায় করিবার লব্ধি।)। দামোদরের স্মৃতির অস্ত্র নাট, যাচা কিছু করা বাধ "তৎ কুরুষ মদর্পণম্"। আমাদের এট ভিখারী ঈশ্বর শুধু ভাল জিনিসেরই ভিখারী নহেন, উদয় হইতে অস্ত্র এবং অস্ত্র হইতে পুনরুদয় অবধি যাচা কিছু "পাপমকার্যঃ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পঙ্ক্যামুরেণ শিখা" কাদ-মনোবাক্যে বস্তু কিছু কুকার্যের অহুষ্ঠান করিয়া বসি সমস্তই হানতরূপে গ্রহণ করিতে সবারই সম্মত, শুধু সম্মত নহেন একজন করিতেই আমাদেরকে উপদেশ ও আবেশ দেন। চরিত্র হরি এ কিস্তণ ভিখারী রে!

দরিদ্র উপাস্ত আদর্শবলেই ভারতীয় সমাজের মাথার ঘণি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আপা আছে কালে সমুদয় জগৎ এইরূপ দরিদ্র ঈশ্বরের আদর শিখিবে।

অভাবের অতীত বলেই ঈশ্বর আমাদের উপাস্ত নহেন, উপাস্ত হইতে হইলে আর একটি গুণ থাকি অভাবাত্মক।

এ জগতে প্রকৃত দরিদ্র পদবাচ্য কে? ভ্যাপের সামর্থ্য না থাকিলে যে বস্তু ঐশ্বর্যবান্ সে তত অধিক দরিদ্র। কথাটা হৈয়ালির বস্তু শুনাইল না কি? কিন্তু তেবে যেথ, কথাটি আর হৈয়ালি বহিবে না। ভোগেচ্ছা প্রবল থাকিলে তাহাকে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র বলিব না ত কি বলিব? ঐশ্বর্য-শালীর শক্তিচুহু তাহার ঐ যে গাড়ি জুড়ি বস্ত্র অলঙ্কার দামদাসী ইত্যাদি ঐশ্বর্যের নানা মুষ্টি ধরে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা তাহার ভোগেচ্ছার প্রাবল্যই সূচিত করে না কি? কাজেই বলিতে হয়, ঐ সব ঐশ্বর্যগুলো অস্ত্রের তুলনায় তাহাকে অধিকতর দরিদ্ররূপেই চিহ্নিত করিয়া দিতেছে। বাহার ভোগেচ্ছা

আছে অথচ তৎপূরণে শক্তি নাই সে ত হস্তভাণ্য ও দরিদ্র বটেই, কিন্তু বাহার ভোগেচ্ছার অস্ত্র নাই ঐশ্বর্যসম্বন্ধে সে দরিদ্র এবং ঐশ্বর্যবান্ হইবে সে উপাস্ত নহে।

মনে কর কাহারও শক্তির পরিমাণ যেন সাতখানি কাপড়ে পর্যাবসিত। এখন আমি যদি বেধি ঐ ব্যক্তির নিজ ব্যবহারে জন্ত দুই খানি মাত্র বস্ত্রই যথেষ্ট তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি চচ্ছা করিলে সে পাঁচখানি কাপড় অবধি দান করিতে সমর্থ। পক্ষান্তরে যদি তাহার নিজের ভোগের জন্ত ঐ সাতখানি কাপড়ই পরত হয়ে যায় কিবা ঐ সাতখানি কাপড়ের মাথা কিছুতেই যদি সে ছাড়িতে না পারে, তাহা হইলে ঘাচকের নিকট একজন বস্ত্রহীন ব্যক্তি যেমন উপেক্ষণীয় ঐ সাতখানি বস্ত্রের অধিকারী হয়েও সেইব্যক্তি ঠিক সেইরূপ দরিদ্র বা পরিত্যক্তা বিবেচিত হবে না কি?

এই হেতু নিজ ভোগপরায়ণ হইলে যে বস্তু ধনী সে তত অধিক দরিদ্র। ঐশ্বর্যশালী যে পরিমাণে নিবৃত্তি পথের পথিক, বৈরাগ্যাজ্ঞারী এবং পরার্থ উৎসৃষ্ট জীবন সেই পরিমাণে তিনি স্রেষ্ঠ উপাস্ত।

উপাস্তের পরম বা স্রেষ্ঠ মুষ্টিটি তাহা হইলে কিরূপ দাঁড়াইল? তিনি সর্কৈশ্বর্য-সম্পন্ন সর্কৈ অভাবের অতীত এবং নিবৃত্তি বৈরাগ্য ও দয়ার পূর্ণমুষ্টিরূপে বিরাজিত।

আমাদের মহেশ্বর ও মহেশ্বরী সেইজন্য যেন নিজেদের অস্ত্র কিছুই অবশেষ না রেখে, তাঁর ব্রহ্ম পিতৃপুত্রানগণের জন্ত সমস্ত ঐশ্বর্যই ঢেলে দিবে, নিজেরা বিগম্বর ও বিগম্বরী হয়েছেন।

স্বাধীন সাধক, এই অমানিশার অন্ধকারে তাহাঙ্গিকে নিকটে পাইয়াও যেন হারাষ্টও না।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

# প্রভু নিত্যানন্দ ও ত্বদীয় জন্মভূমির

## দুর্দশা

( ১ )

একটা ক্ষুদ্র রাজ্য একচক্রা। উৎসর  
প্রাচীন রাজধানী বর্তমান কোটাহরের পশ্চিম  
প্রান্তে অবস্থিত ছিল। এই রাজধানীর ৩.৪  
কোশ উত্তর পূর্বে প্রাচীন খলংপুর। এই  
খলংপুরে হাড়াই পণ্ডিতের বাস। চাড়াহের  
স্রীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী রাজকন্যা।  
একচক্রার রাজা মুকুটনারায়ণের হৃদিতা।  
হাড়াই উক্ত রাজার সভাপণ্ডিত। তৎকাল  
তাঁহার প্রকৃত উপাধি বিলুপ্ত হইয়াছিল।  
উঁহাকে সকলেই পণ্ডিত নামে ডাকিত।  
কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত রাজকুমারীর  
সহিত হাড়াহের বিবাহ হইয়াছিল। পদ্মা-  
বতীর পিতা রাজা মুকুটনারায়ণ জামাতাকে  
নিজ খলংপুর ও তৎসংলগ্ন কয়েকখানি গ্রাম  
জমিদারী দান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তি  
দ্বারা উঁহাদের সুখে সংসার চলিত। অনেক  
বয়সেও পদ্মাবতীর সন্তান হয় নাই। স্ব-  
কঠোর সেবারাধনার পর তাঁহার একটি পুত্র  
জন্মে। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ ভূমিষ্ট  
হইয়া পদ্মাবতীর প্রাণে অতুল আনন্দরাশি  
ঢালিয়া দিলেন। তিনি অতি শান্ত স্বভাবাপন্ন  
ও মধুর প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। সন্ন্যাসী-  
দ্বিগের সেবাশুভার তাঁহার সম্বন্ধে আগ্রহ  
ছিল। একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া নিত্যা-  
নন্দের নব বৈরাগ্য-বীজ বপন করিলেন।  
তাঁহার উপদেশে নিত্যানন্দ অল্প বয়সেই  
গৃহত্যাগ পুরিত্যাগ করতঃ বেশ অল্পে  
বহির্গত হন। কথিত আছে তিনি ভারত-

বর্ষের সমস্ত প্রধান তীর্থগুলিতে পদার্থ  
করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের  
সহিত তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে। উভয়কে  
উভয়ে চিনিতে পারেন। এবং পরস্পরে  
একপ্রাণে সুপবিত্র বৈষ্ণবধর্ম প্রচার আরম্ভ  
করিয়া দেন। হুমধুর হরিনামের উচ্চনিদান  
চতুর্দিক প্রাণিত করিয়া তোলে। চৈতন্যের  
মনে যিগ্মত ভেজ ও সৃষ্টির বিকাশ হয়।  
তিনি এক প্রাণ এক জগৎের স্রষ্টা নিত্যা-  
নন্দের সহিত সংমিলিত হইয়া সুপবিত্র  
হরিনামের প্রবলভরদে বঙ্গদেশ প্রাণিত  
করেন। ক্রমে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও  
শ্রীলঙ্কায় ধামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়।  
সুদূর দাক্ষিণাত্যেও হরিপ্রেমের প্রবল বস্তা  
উৎখলিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকগণ  
চৈতন্যের আদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হরিনাম  
প্রচারের আদেশ প্রাপ্ত হন। প্রভু নিত্যানন্দ  
বঙ্গদেশে ভাগীরথীর উত্তর তীরে ও সুবর্ণপ্রাণে  
হরিনাম প্রচারের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।  
ইনি এই স্থানের অনেককেই বৈষ্ণবধর্মে  
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুখে হরিনাম  
স্তবিতা অতি পানী তপসীরও জবাব পলিয়া  
হাইত। নিত্যর পাণ্ডা বাগার তাহাদেরও  
জবাবে প্রেমপুলক উপস্থিত হইত। স্রবশক্ত  
জগাট মাধারের উচ্চর তাঁহার জীবনের  
একটি প্রধান ঘটনা। উক্ত পাণ্ডার কলসীর  
কাণা কেলাইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত  
করিয়াছিল। উক্ত আঘাতে তাঁহার মস্তক  
কণ্ঠিত হইয়া প্রবলবেগে কথিরদ্বারা পড়িতে

লাগিল। কিন্তু তিনি এই নিরাক্ষর অত্যাচারে বিরক্ত না হইয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ হরিনাম শুনাইতে পারেন। হরিনামের এমনি মতিমা, ভক্তের এমনি আকর্ষণ, পাণ্ডিত্য প্রভৃ নিত্যানন্দের মূলে পুনঃ পুনঃ হরিনাম শ্রবণ করি। একেবারেই মুগ্ধ হইল। উৎসাহের পাখি জগৎ ও জীবীকৃত হইল। পরে উহার উভয় আত্মা তাঁহার পরমাপর ও স্বাধী প্রাপ্যপদে সুস্থিত হইয়া স্বাধীর শিষ্য স্বীকার করিয়া স্থাবর হরিমতে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ প্রধান বৈষ্ণবভঞ্জে পরিচিত হইলেন। নিত্যানন্দের কঠোর পরিশ্রম ও জম্বুয় হরি-সংকীর্ণন প্রভাবে অঙ্গহিনের মধ্যেই বক্তের অনেক স্থলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইল। শোকাঙ্গা শতীমাতাকে প্রবোধ দিবার ক্ষমতা তিনি নবদ্বীপে গমন করেন। স্বাধীর স্তম্ভগমনে সমগ্র ভক্ত-বৃন্দ একত্রিত হইয়া নবদ্বীপকে হরিপ্রেমে মাতাইয়া তোলে। বিশেষ কোন নিগূঢ় কারণবশতঃ প্রভু নিত্যানন্দকে দার পরিগ্রহ করিতে হয়। তাঁহার একটা পুত্র ও একটা কন্যা আছে। পুত্রের নাম বীরভজ, কন্যার নাম গঙ্গা। এই বীরভজের অপরা নাম বীরচন্দ্র! আমি না কি কারণে তিনি পিতার জন্মভূমি বলংপুর নগরী পরিভ্রমণ করতঃ ক্ষুদ্র ধর্ম্মার পশ্চিমতীরে নিজ নামে বীরচন্দ্র-পুর নামে একটা গ্রাম বসান। সেই সময় উক্ত স্থান বিবিধ কষ্টক বনে সমাকীর্ণ ছিল, এবং শশক ও বস্ত্র কপোত বলে দলে উক্ত স্থানে বসবাস করিত। বীরভজ প্রভু নিত্যা-নন্দের প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমুষ্টি বাহ্য একপে বক্তিমরায় নামে উল্লিখিত, উক্ত ব্রহ্মর মনোরম মুষ্টি ধানিকেও বলংপুর হইতে উঠাইয়া আনিয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত বীরচন্দ্রপুরে

স্থাপিত করেন। নিত্যানন্দের দুইটা স্ত্রী— জাহ্নবা ও বহুবা। ইহাদের স্বর্গ গমনের পর উক্ত বহুবা ও জাহ্নবার প্রতিমূর্তি দুই খানিও উক্ত বক্তিমরায়ের বামে ও দক্ষিণে স্থান প্রাপ্ত হয়। দ্বাত্মমুষ্টিময়ী বহুবা বাম দিকে ও দ্বাত্মমুষ্টিময়ী জাহ্নবা দক্ষিণদিকে আশ্রিত অবস্থিত রহিয়া রাধিকার ধামে নিত্যপূজিত হইতেছেন। এই বীরভজ বা বীরচন্দ্রের সময় হইতেই প্রাচীন বলংপুর নগরের অবনতি ঘটে। এই নগরীর অধস্তন অতি বিস্তৃত ছিল। ইহা ধর্ম্মা নারী এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উভয় পার্শ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। একপে এই নগরীর লামাক্ষ অংশে গাং ঘর বাবাজীদের আশ্রয় ও দুই একটা সাধু আশ্রম প্রতিষ্ঠিত; আর সমগ্রই দ্বাত্ম-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। হাড়াই পতিতের বাসগৃহ ইতর নির্মিত ছিল। তথাপি নিত্যা-নন্দের জম্বানে একটা ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আর একটা অর্ধভগ্ন গৃহে দৌর নিত্যের কমনীয় মুষ্টিমূল্য বিস্তারিত রহিয়া প্রাচীন ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রভু নিত্যানন্দের জন্মের পর হইতেই বোধ হয় এই বলংপুর নগরী গর্ভবাস নামে জন-সমাজে পরিচিত। প্রাচীন বলংপুরের বর্তমান নাম গর্ভবাস!!

( ২ )

একটা স্থানে দুইটা পুণ্ডরিক। একটা পুষ্পের দুইটা দল। ধর্ম্মরাজ্যে নিতাই দৌর অভিন্ন দ্বয়। যেমন লক্ষ্মণ নহিলে রামের ও বলরাম নহিলে ঐক্যের পূর্ণতা লাভ ঘটিত না সেইরূপ এই বৈষ্ণব ধর্মে নিত্যানন্দের অভাবে পৌরাতনের পূর্ণতা এবং প্রজন্মতা কখনই পরিলক্ষিত হইত না। তন্মত বৈষ্ণব-গণ নিত্যানন্দকে লক্ষ্মণ ও বলরামের অবতার

বলিয়া থাকেন। বসন্তঃ বৈকবর্ষ্য প্রচারে নিত্যানন্দ ও দৌরাত্নের দেবতা সমভাবে বিভাজিত। ভারতে বৈদিক যুগ অপসারিত হইয়াছে। বহুযুগে আর ভারতাকাল সমাবৃত নহে। বুদ্ধদেবের নির্ণায়ক নিয়মের সেই নীরসতা ভারতবাসীরা বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছে। কাপালিক ও জাদুকর সেই উদার নৃত্য ভারতবঙ্গাণের পতিসূত্র নহে। সেই পৈশাচিক অভিনয় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতে এক নববর্ষ বীরে বীরে প্রভাবিকার করতঃ নবীন ক্রমে ভারতাকাল সমুজ্জল করিতেছে। বৈকবর্ষ্যই এক্ষণে অধিকায়ন হিন্দুর বর্ষরূপে বীরে বীরে প্রভা বিকাশ করিতেছে। অনেক হিন্দু এই বর্ষের পরিপোষণ যুগে না করিলেও অন্তরের সহিত এই বর্ষের মূর্তি ও পবিত্রতার অল্পমোহন করেন। পূর্বে উক্ত হিন্দুসমাজে একজন বৈকব দেবিলে বা বৈকবর্ষ্যের কোন কথা ভুলিলে নানা প্রকার নিম্না করিতে চাড়াইত। এখন লোক হিন্দু সমাজ চাইতে সেইভাবে দূরীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ বীরে বীরে সমাজে প্রভাবিকার করিতেছে। হিন্দু যথা ও নিয়মসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি বীরে বীরে বৈকব বর্ষে দীক্ষিত হইতেছে। সুপবিত্র যুগে হরিণাম পরীতে পরীতে জনিত হইতেছে। যুগের যুগে শবে অনেক পক্ষীর প্রদোষকাল প্রতিজনিত। হুবহু হরিণাম নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া পাশ্চাত্যের ফবে হুধার ধারা ঢালিয়া দিতেছে। হিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষিত বহুবাক্তি আত্মকাল পবিত্র বৈকবর্ষ্যে দীক্ষিত। হুতরাং বলিতে গেলে এই নববর্ষ যুগবর্ষরূপে সমাজের নিরন্তর চাইতে উচ্চতর পর্যায় বীরে বীরে আগনার নবীন শক্তির জ্যোতিঃ ফুটন করিতেছে। ঐচ্ছিক ও ঐনিত্যানের

নব প্রবর্তিত বর্ষ ভবিষ্যতে সমস্ত হিন্দুরই একমাত্র বর্ষরূপে গৃহীত হইবে একত্র আসা করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে। কলির জীবনো আত্মা এবং মানসের ভোগবিলাসে ব্যাপ্ত। তাহাদের অধিকাংশই এক্ষণে উন্নত পরিপোষণ ও ভোগবিলাসে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যাপন করিতে থাকে। হুতরাং তাহারা আত্মসম্পূর্ণ বৈদিক তাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখিবেন। যখন যুগে হরিণাম মূর্তির একমাত্র মহোৎসব শুভন তাহারা আদরের সহিত এই পবিত্র হরিণাম উচ্চারণ করিয়া মূর্তিলাভের জন্য ছুটিয়া যাইবে। হুত চিন্তার অল্পমিত হইবে এই পবিত্র বৈকব বর্ষই একমাত্র ভারতের ভবিষ্যৎ ও পবিত্র বর্ষ হইবে। পবিত্রতায় পৌর নিত্যই এই নববর্ষের প্রচারক। তাহারা এই ভবপারের চুইজন নাবিক এই কথা মরণ করিলে কার জগৎ পলকে প্রাবিত ও ভাবাবেশে অধীর না হব ? এই দুই মহাপুরুষের প্রতি বর্তমান সমাজের জনগণের ক্রিয়াকর্ম ভক্তিপ্রভা তাহা একবার মনে মনে চিন্তা করা অসম্ভব নহে। নববর্ষ মহাপ্রভু চৈতন্যের জগৎমুখি, তথায় সকল হিন্দুসমাজের মহাপ্রভুর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রভা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেখানে সোনার গৌরব পদম ভক্তির সহিত পূজিত ও বন্দিত হন। হুতর যুগে এই কমনীয় হুবর্ষ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহাকে ধর্মান করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সমস্ত জাতিতে ভেট দিতে হয়। তাহার জন্ম-কৃমিতে এইরূপে তাহার আদর সম্মান যথেষ্ট। বৎসরের মধ্যে অনেক বৈকবই তথায় শুভাগমন করতঃ অধীর পূজা বন্দনাদি করিয়া থাকেন। উক্ত নববর্ষ ধামে অপরাপর বৈকবর্ষ প্রচারকগণের মূর্তি লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত

ও দেবতাবে সম্পূর্ণিত। কিন্তু গুরুদ্বারা প্রজ্ঞা নিত্যানন্দের ক্রিয়ণ আদর সম্মান ভোগপ্রাপ্তের বন্দনও আছে, কিন্তু গৃহে তিনি বাস করেন এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীগণের একান্ত কর্তব্য। আমি বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত বিষয়েরই উল্লেখ করিব।

( ৩ )

বৈষ্ণবধর্মের প্রচারণক, সৌর্য্যেশ্বর অভিশ্রাব্য, কলিযুগের নরনারীর উদ্ধার কর্তা শ্রীনিত্যানন্দের জন্মভূমির অবস্থা বর্ণন করাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে, কেবল বৈষ্ণব কেন, সমগ্র হিন্দু জাতির মধ্যে ঐ স্থান অতি পবিত্র ভাব এবং ভক্তির আধার। কিন্তু এই স্থানের অবস্থা বর্ণন করিতে লেখনী অবশর হয়। চক্রে জলধারা স্রবণ করিতে পারা যায় না। বঙ্গাভীর বন্দ্যাবলম্বী মহাপুরুষের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য দর্শন করিয়া হ্রদয়ে শত শত ব্যথা হয়। একটা ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীশ্রী গোবিন্দাচার্য্যের পবিত্র মূর্তি সংস্থাপিত। ঘরখানি অতি ক্ষীণ। ছাৎনী বৃষ্টিজন্য নিবারণে অক্ষম। চতুর্দিকের প্রাচীর ও অন্তঃস্থ গৃহাবলী সমস্তই ভাঙিয়া গিয়াছে। উহার উপর বড় বড় বট অশ্বখ বৃক্ষ প্রাচীর-মান হইয়া জলপ্রবাহের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমর দরজাটা চূর্ণ বিচূর্ণ। পূর্ণ-দিক নিবিড় জঙ্গলে লম্বাকৃত। এই ক্ষীণ পুরীখানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় ইহা যেন প্রাচীন কীষ্টির এক লম্বাখি মন্দির। ম্যালেরিয়া দীড়িত ভগ্নপ্রাচীর এক বৃত্ত পরিবারের পরিভাষ্য বাসভবন। ইহা যেন ঘোর বিবাদ ও দুঃখের বিকট তৈলচিত্র। কোন্ সময় এই বাটীটা নির্মিত হইয়াছিল

তাণ্ডা বলা যায় না। যে ভাবে নির্মিত হইয়াছিল তাণ্ডাও মহাপুরুষের অহতন নচে অতি সাধুত্ব ভাবেই। তাণ্ডাও কালের হুতীকৃত হইলে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া জগতের নন্দনের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। নিত্যানন্দ পরিবারগণ এখানে কেহ বসবাস করেন না। এখানে হইতে ১ মাইল পশ্চিমে বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র দ্বারা সংস্থাপিত বীরচন্দ্র-পুর গ্রামে বসবাস করিতেছেন প্রজ্ঞা নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত ৮ বর্ষমহাশয়ের দেবাণ্ড বীরভদ্র গুরুদ্বারা বা গঙ্গাপুর হইতে উঠাইয়া লটকা গিয়া বীরচন্দ্রপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন তাণ্ডা ইত্যাদি নির্ণিত হইয়াছে। ঐ দেবতার পূজাও তদ্ব্যবহিত উক্ত পরিবারেরা বীরচন্দ্রপুরেই চালাইয়া আসিতেছেন। এবং উহা দ্বারা তাঁহাদের অর্ধাঙ্গন হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সমধিক ভক্তি প্রজ্ঞা সম্মান। কিন্তু তাঁহারা সুদূরতর প্রজ্ঞা নিত্যানন্দের জন্মভূমি ও স্বদীয় দেবারির বন্দ্যাবলম্বী একজন বৈষ্ণবের হাতে সমর্পণ করিয়া নিত্য উদাসীনের ভায় প্রজ্ঞাভীর চূর্ণদর্শন পরিদর্শন করিতেছেন। এই স্থানের উন্নতির প্রতি তাঁহাদের একেবারেই দৃষ্টি নাই। জরাজীর্ণ গৃহাদির মেয়ামত করা বা নতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া যেহা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। কয়েক বিঘা মাঙ্গের জমির আয় হইতে প্রজ্ঞাভীর ভোগাদি কষ্টে হুটে চলিয়া থাকে। উক্ত জমির পরিমাণও নিত্য অল্প। এই স্থানে এমন একটু স্থান নাই যে বাড়ীরা তথায় গিয়া একটুখান্জ বিলম্ব করিতে পায়, বৃষ্টি হইলে একবার মাঝ পাড়াইয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। এমন একটা ভাল পুষ্করিণী নাই বাহার জলপান করিয়া পিপাসা লাভ করে। যে ছই চারিটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে

তাঁরা বহুকালের, সকলগুলিই ভরাট হইয়া  
গিয়াছে। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ,  
ভেতেরতা বৃক্ষ স্থানটা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।  
দূরবাসীরা মনে করিয়া ধার শ্রীকৃষ্ণ প্রভুজীর  
আশ্রমে গিয়া আমরা বিজ্ঞান ও শান্তিলাভ  
করিব। সংসার-জালা-বহুগাণ্ধী জীবনে  
কিৎকালের জন্তও অমৃতলেপ প্রদান  
করিব। কিন্তু তাহাদের সে আশা বুধা।  
এক বহুজীবী তদুদমাধির পরিসরনে কখনই  
মনে শান্তি আসিতে পারে না। এই নির্জন  
কষ্টকলতাপূর্ণ পট্টা পরিমর্শন করিয়া গ্রাণে  
কখন হৃৎশান্তি আসিতে পারে না। বর্তমান  
গর্ভবাসস্থিত প্রভু নিত্যানন্দ্যের অসভবনের  
অবস্থা বড়ই শোচনীয় ও জঘন্যদারক।  
তীর্থস্থানের বা কোন হুগ্রসিদ্ধ বর্ষপ্রচারকের  
আদি লক্ষ্যভূমির বাহ্যিক জাঁকজমক ভক্তগণের  
জববে অসুখী প্রভা বিকাশ করার প্রয়োজন  
আছে। ইহাতে সাধারণ ও নিরশ্রেষ্টীর  
জব্বের বর্ষভাবের সমধিক ক্ষুণ্ণ হইতে  
পারে। হীনতার তাহাদের ভয় হইতে  
মহাপুরুষের প্রতি তাহাদের ভক্তি প্রভা লোপ  
পাইতে পারে। তজ্জন্ত তীর্থস্থানগুলি সমধিক  
সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও মনোরম হওয়া নিত্য  
প্রত্যেকজনীয়। এই হেতু হিন্দুর প্রত্যেক তীর্থ-  
ভূমি বিশেষ জাঁকজমকে পরিপূর্ণ। কানী  
বল, জগদ্বাষকের বল, বুদ্বাবন বল হিন্দু-  
বিশ্বের প্রত্যেক তীর্থভূমি হৃদয় হৃদয়  
অট্টালিকা বা প্রাসাদের সমাবৃত। খুটানপণের  
গির্জা, সুপলমানপণের মসজিদ বিশেষ পারি-  
পাটের সহিত প্রস্তুত।

ইহাতে মস্তকের মনে বর্ষভাব গৃহ পায়।  
সাধারণ ও নিরশ্রেষ্টীর সাধকেরা অন্তঃ-  
সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্যে  
বিমুগ্ধ হইয়া বর্ষের প্রতি প্রসাদ আগত হইয়া

পড়ে। শিবদিগের বর্ষ মন্দির অমৃত সরোবর-  
স্থিত গুরুগবীর গৃহ কেমন হৃদয় ও অসুখী  
শোভায় শোভাবিহীন। মলে মলে শিবগণ  
এই বর্ষ মন্দিরের পবিত্র শোভায় বিমুগ্ধ হয়।  
মন প্রাণ ভরিয়া উহার অতুল সৌন্দর্য্য  
নিরীক্ষণ করিয়া শিববর্ষের প্রতি সমধিক  
আসক্ত হয়। অন্তঃসৌন্দর্য্যের প্রতি কয়মনের  
লক্ষ্য আছে? জগতের অবিকার্য্য নরনারী  
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে চিরদিনই বিমুগ্ধ। তজ্জন্ত  
ধর্ম্মালম্বিতগণও সমধিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ হওয়া  
বিশেষ প্রয়োজনীয়। হিন্দুর প্রত্যেক তীর্থ-  
ক্ষেত্র এই নিয়মে হৃদয়ভাবে ও পারিপাট্যের  
সহিত প্রস্তুত। উহা শিল্পকলার শেখ নিপ-  
র্শন, পবিত্রতার এবং পরিকৃততার পবিত্র  
আবাসগৃহ। ধূপ ধূনার মধুর সৌভে সর্ব্বদা  
আমোদিত। হুমধুর বাতাসনিতে সর্ব্বদা  
পরিপূর্ণ। এই মনোমোহন বাহ্যিক ভাব  
মদুহ অস্তঃকরণে বর্ষভাব পরিবর্তনের সাহায্য  
করে। অনেক ভক্তের মনে পবিত্রতাকে  
জাগাইয়া তোলে। হুতবাহু বলিতে গেলে  
তীর্থস্থানে বাহ্যিক পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের  
বিকাশ হওয়া সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়। এই  
নিত্যানন্দ্যপ্রসঙ্গে কিন্তু উহার কিছুই নাই।  
এত বড় একটা দেবতার পবিত্রাশ্রম নিত্যই  
হীনভাবে বর্ষকের মনে পরিপূর্ণ। হুতবাহু  
বলিতে গেলে সমস্ত বর্ষবাসীরই ইহা অতি  
জ্বরের ও অহুতাপের কারণ ভিন্ন আর কিছুই  
নয়। যত শীঘ্র হয় এই তীর্থের মলিনতা  
দূর করা প্রত্যেক হৃদয়বান লোকের কর্তব্য।  
সোন্দর্য্যী বংশধরগণকে এই বিষয়ের অগ্রাঙ্গী  
হওয়া উচিত। তাহার কারণ কি? বর্ষধরগণকে  
লইয়া ব্যস্ত। একথা ভাবিবার সময় পান না  
যে তাহার কোন মহাত্মার বংশধর? এবং  
কহা হইতে এই সব সদুৎপন্ন। অগ্রে তাহার

কীৰ্ত্তি রক্ষা করিয়া পক্ষাৎ অস্ত্রাস্ত্র কাণ্ড সম্পাদন করিতে হইবে। গোষাঘী প্রভৃতা নিজের পরিবার প্রতিপালনেই ব্যস্ত। নতুবা যখন ৮ বহিঃপ্রাচীরে গৃহস্থানি ভয় হইয়াছিল বর্ষার সময় ছান ফাটিয়া বৃষ্টিজল গৃহের ভিতর যখন তরঙ্গ খেলাত তখন তাঁহাদের শক্তিতে বা ইচ্ছায় উক্ত প্রভৃতীর মন্দির ধানি পণ্ডিত প্রস্তুত হয় নাই। মহাত্মা কৈলাসানন্দ স্বামীর শিষ্ঠ ৮ শিবানন্দস্বামী ভিক্ষালব্ধ অর্থে বর্তমান মন্দিরটী প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি একাদিক্রমে ২০ বৎসর কাল ভিক্ষা করিয়া তদন্ত অর্থে বর্তমান বিরাট মন্দিরটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। গোষাঘী প্রভৃতের দ্বারা উক্ত মন্দিরটী যে কখন প্রস্তুত হইত তাহা বোধ হয় না। হুতরাং তাহারা যে চেষ্টা করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের শক্তি নিকেতন প্রস্তুত করিয়া দিবেন তাহা অপেক্ষ অলীক বলনা মাত্র। ইহার আবশ্যকতা তাঁহাদের জন্মে অসুপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না সম্বোধেয় বিষয়। এবং বর্তমান গোষাঘী বংশের ভিতর এমন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি নাই বাহা দ্বারা এই মহৎ কার্য অচিরে সম্পাদিত হইতে পারে। এইজন্য আমি অল্প সময় বঙ্গবাসীগণের নিকট নিবেদন করিয়া পাঠাইতেছি। সমস্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উক্ত পবিত্র তাঁথের অবনতির কথা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রভু নিত্যানন্দ আজ তাঁহার বংশধরগণের সম্পত্তি নহেন। তিনি একদে বংশের অনেক বংশেরই গুরু এবং মুক্তিদাতা। তাঁহার দয়্যগ্রহে অস্ত্র বঙ্গদেশ ধস্ত হইয়াছে। এখনও পরীতে পরীতে বৃদ্ধ বাজাইয়া অনেক ভক্ত-বৃন্দ প্রত্যহ হরি সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে গাহিয়া থাকেন “কাশা কলে যেয়ে ছিলাম

আবার এসেছে। নিত্যই নইলে জাহ্নবীতীরে হরি বলে কে।” কোন কোন ভক্ত প্রেমাত্র-চিত্তে গান করেন “এমন জন্মের হরিনাম নিত্যই কোথা পালি?” আশঙ্ক ভক্তস্বরের জন্ম-নিঃস্বাসনে প্রভু নিত্যানন্দের পবিত্র মূর্তি সন্তোষে রক্ষিত হইয়া নিত্য প্রেম-সলিলে স্পৃহিত হইতেছে তাহার এইরূপ পত পত প্রমাণ দেখা বাইতে পারে। তন্মত্ৰ সকল ভক্তস্বরের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই তাহারা যেন শ্রীহই উক্ত মহাত্মার জন্মভূমির দুর্দশার বিষয় একবার চিন্তা করেন, এবং কি করিলে তাঁহাদের কলহরানি অপনীত হয় তাহার জন্য এক একবার ভাবিতা যেন। প্রাচীন কীৰ্ত্তি রক্ষার জন্য সর্বশ্রমেণ্ডে আইন প্রস্তুত করিয়াছেন। কৃতপূৰ্ণ বড়লাট কর্ত্তন বাহাদুরের ইহা একটা প্রশংসনীয় কীৰ্ত্তি!! শিক্ষিত সমাজেও ইহার চেষ্টা প্রবলভাবে চলিতেছে। সকল পরিষদেই প্রাচীন কীৰ্ত্তি রক্ষার জন্য অজবিত্তর গমনা করনা চলিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও বিশেষ কার্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে শিক্ষিত শক্তির ভিতর এই আন্দোলন হইতেই একদিন প্রবল কার্যকরী শক্তির উদ্ভব হইবে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আশাকরি উক্ত সমিতিগুলি অচিরেই এক প্রবল শক্তিশালী সঙ্ঘ হইবেন। আমি তন্মত্ৰ বংশের সকল পরিষদের সভা মহোদয়গণকে উক্ত মহাত্মার আশ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অহরোধ করিতেছি। প্রত্যেক সমিতি হইতে অশিক্ষিত কার্যকর হই একজন যেক্ষের প্রেরণ করিয়া সকলেই ইহার বর্তমান দুরবস্থা সংগ্রহ করুন। এবং কি করিলে উহার উন্নতি ঘটে তন্মত্ৰ উপায় চিন্তা করিতে বহুপরিকর হউন। আর দেশের মধ্যে বাইরা যেন যানৈ স্বর্গস্থানীয় তাঁহাদের

নিকটেও আমি এই গুরুতর কাণ্ডের দাখিল জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের যদি একবার এ বিষয়ে নৈরুপাশ্রিত হই তবে অস্ত্রের বিনা সাহায্যে একাএক এই গুরু কাণ্ডটি তাহার সন্মাপন করিবার জ্ঞানিবোধ না করিতে পারেন।

এখন এইখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুতর অজাব বিষয়মান। পৌর নিত্যের এক-খানি উক্ত বাসগৃহ, একটা ভোগমন্দির, একটা তীর্থযাত্রীর আবাসগৃহ, চতুর্দিকের প্রাচীর, এবং একটা সমস্ত দরজা নতুন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। দূরবেশ হইতে যে সকল যাত্রী আসিবে এখানে আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয় না তজ্জন্ত একটা পাখাবাসও নিৰ্মাণ করারও প্রয়োজন আছে। পুরাতন পুকুরবিশিষ্টগুলির পুকো-  
দ্ধার করা বা অভাবে এই স্থানের ভিতর বড় বড় দুইটা ইম্বারা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। প্রকৃতীয় সেবা পূজা চালাইবার জন্য কিছু ভোক্ত ভবি আছে, সকল কার্য উহার আর হইতে হইবে চলে না, তজ্জন্ত উক্ত ভোক্তের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া। এই গর্তবাসের ভিতর আরও কয়েকটা আশ্রম আছে। সে গুলিরও ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যে স্থানে বিবৰ্দ্ধন প্রকৃতি নিত্যানন্দকে পদ্মাবতীর স্নেহ-  
নাক হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক নির্জন বনস্থলীতে গাইয়া দিয়া তাঁহার কর্তব্য কি এবং তিনি কে এবং কি জন্য তাঁহার জন্য গ্রহণ এই সব গুরুতর জ্ঞাপন করিয়াছিলেন উহা এক্ষণে বিশদাকলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত স্থান বীরচন্দ্রপুত্রের মধ্যে অতি মনোরম স্থান। উক্ত পবিত্র স্থানেরও সবিশেষ উন্নতির প্রয়োজন। উক্ত স্থানে কুক বল-  
রায়ের সেবা একটা স্বতন্ত্র বৃত্তিকাপুত্রে

অতি নীমজানে ত্রিকালক তত্ত্বপ্ৰদায়ী চলিতেছে। এখানে আর একটা পবিত্রাশ্রম আছে। বৈষ্ণবপ্রবর পবিত্রচেতা মহাশয় চোদ্দাবারী বাবাজী এই স্থান উদ্ভল করিয়া বহুদিন বিরাজিত ছিলেন। বিপদ স্থান-  
যাত্রার দিবস তিনি স্মরণমন করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমটীর ও তদীয় প্রতিষ্ঠিত পিত্রি-  
বারীদেবের গৃহাদি প্রস্তুত করা একান্ত দরকার। মহাপুরুষের সমাধিস্থানও তদু-  
চ্চভাবে প্রস্তুত হয় নাই। উহাকে আরও গম্বরভাবে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আরও অনেক অজাব এই আশ্রমে বাহা বর্তমান আছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যকীয় বিষয়ের মধ্যে দিতে হইবে। এই স্থানে পাণ্ডবস্তাষা নামে একটু ভূমি এখনও অকরিতভাবে আছে, উহাই দেখে বিপ্রেস বাসগৃহ। বহুগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া পাণ্ডবেরা এই স্থানে অজ্ঞাতভাবে বাস করিয়া বহু রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন। আশ্রমযাত্রা জ্ঞানপের স্ত্রী পুত্রকে রাক্ষস কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই পুত্রপ্রসিদ্ধ স্থানটিকে এক প্রবিত্রতম স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা সংরক্ষিত করিতে হইবে। প্রকৃতিত্যানন্দ বাল্যকালে যে বহুল শুকে আরোহণ করিয়া বাল্যকীড়া করিতেন উক্ত বৃক্ষটী আজও বিদ্যমান। উহার প্রাচীন শাখাবলী বৃত্তিকা চূষন করিয়া বহুদূরে আছও হুবিদ্যত। স্বর্গীয় স্মৃতিরক্ষার জন্য এখানে একটা সেবাও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানেরও উন্নতির প্রয়োজন। এইরূপ অনেক স্থানই প্রকৃতিত্যানন্দের পবিত্র স্মৃতি বহন করিয়া আজও জীবিত আছে। সেই সকল স্থানকে আরও পবিত্রকৃত ও উন্নত করিতে হইবে।

দুর্গাবতার নিত্যানন্দের জন্মস্থির বিবরণ



তো ভিতপূর্বে উন্মত্ত করিলাম। জ্বলন্তের  
কেন্দ্রবিশ বা কেন্দ্রলী প্রাণের অবস্থার  
তরুণেরা শোচনীয়!! চতুর্দশের তো  
কথাই নাই? কাণ্ডারের তাহার দেখে আজও  
অবজ্ঞার ভাবে পতিত নাটকম্বিরের ইষ্টকথার।

প্রোপিত রহিছে। মহাপুরুষের দেহ আর  
পঞ্চাঙ্গ তথা চৈত্রে উদ্ধৃত কি তথায় একটী  
লম্বাঙ্গি মঠও প্রস্তুত হয় নাই!! ইহা কি কম  
দুঃখের কথা নয়?

শ্রীরামভট্টায় রায় ।

## কালিদাসের আবির্ভাব কাল

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও নাটক  
কালিদাসের রচনা-প্রসূত। কালিদাস  
সৌন্দর্যের কবি। তাঁহার রচনায় যত সৌন্দ-  
র্যের সমাবেশ তত লক্ষণিয়ারেও নাই। কিন্তু  
দুঃখের বিষয় ইনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ  
করিয়াছিলেন তাহা এখন পর্যন্ত স্থির হয়  
নাই। অধীশ্বর কালিদাসের জন্মকাল নির্ণয়  
বিষয়ে একমত নহেন। তাঁহারের বিভিন্ন  
মতের মধ্যে কোন মতটী সম্যকীর্ণ তাহা  
স্থির করা আবশ্যিক। আমার বিবেচনায়  
কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা একবারে  
অসম্ভব নহে কারণ ইহা সর্ববাদি সম্মত যে  
কবির কাব্য ও নাটকরূপ মুহুরে তাঁহার  
সময়ের ধর্ম, ঐতিহাসিক ঘটনা, সমাজের  
জীবনীতি প্রতিকলিত হয়। ইংরাজিতে  
আছে, "The poet is the representa-  
tive of his age."

কালিদাস ৭ম শতাব্দীর পূর্বে নিশ্চয় বর্ত-  
মান ছিলেন। কারণ বাণভট্ট তাঁহার ঐহর্ষ-  
চরিতে কালিদাসের উল্লেখ করিয়াছেন।  
কবি বাণভট্ট ঐহর্ষলিঙ্গিত্যের সভাসদ  
ছিলেন। ঐহর্ষলিঙ্গিত্যের রাজত্বকাল ৬০৬  
খৃঃ অব্দ হইতে ৬৪৮ খৃঃ অব্দ। পুনশ্চ, চালুক্য  
বংশের দ্বিতীয় পুলিকেশিনের রাজত্বকালে  
৬০৪ খৃঃ অব্দে খোদিত লিলালিপিতে বৈদ্য

কবি বনিকীর্ণি কালিদাস ও ভারতী কবিদ্বয়ের  
উল্লেখ করিয়াছেন।

আর এক কথা কালিদাস খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়  
শতাব্দীর পবে নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করিয়া  
পারিবেন। কারণ কালিদাসের মালবিকাগ্নি-  
মিত্র নাটকে পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র  
নাথক। ঐতিহাসিকগণ পুত্রমিত্রের স্বারা  
জল বাণ স্থাপনের সময় খৃঃপূঃ ১৭২ অব্দ স্থির  
করিয়াছেন।

এখন কালিদাস খৃঃ পূঃ ১৭২ অব্দ হইতে  
৬০৪ খৃঃ অব্দ মধ্যে ঠিক কোন সময়ে  
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার কোন নির্দেশ  
তাঁহার কাব্য ও নাটকে পাওয়া যায় কি না  
অসম্ভবন করা যাক।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, মানবের বৈভাবিক  
ধর্ম। পূর্বকালে কবিসমূহ কোন না কোন  
রাজার সভায় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের  
স্থান পাইতেন এবং যে রাজার আজন্ম  
পরিবর্তিত হইতেন তাঁহার গুণকীর্তন করিয়া  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। এখন দেখা যাক  
কালিদাস কোন্ রাজার গুণকীর্তনে কোন  
প্রকার বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন কি না।

আমরা দেখি, রত্নবংশের যট সর্গে ইন্দু-  
বরষার বর্ণনা। প্রতিহারীই হুনক। ইন্দু-  
মতীকে গাইয়া রাজাদিগের গুণবর্ণনা করিতে-

ছেন। সর্গ প্রথমে মগধ রাজার বর্ণনা। কবি মগধরাজার সভায় ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সর্গপ্রথমে করা স্বাভাবিক। কালিদাস মগধ রাজার নিকট সর্গপ্রথমে ইন্দ্ৰ-মতীকে লইয়া গিয়াছিলেন। মগধ রাজার গুণবর্ণনার লিখিয়াছেন যে তিনি পরপার্থীদের আশ্রয় ছিলেন; তাঁহার সৈন্যবল অপ্রমেয়; তিনি প্রজারঞ্জে অসুনিপুণ ছিলেন; তিনি সর্গলা হস্তে নিরস্ত থাকিতেন; যেমন চন্দ্ৰের দ্বারা রজনী জ্যোতিষমতী সেইরূপ এই নৃপতি-দ্বারা বহুমতী রাজবৃত্তী হইয়াছিলেন। এই নরপতির রাজধানী পুশ্পপুর প্রাসাদশ্রেণী দ্বারা সূচোচিত ছিল। ইন্দ্ৰমতী মগধরাজকে কেবল পদ্ম প্রণামদ্বারা প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে অসুমান করা যাইতে পারে কবির সময় মগধরাজ্য সর্গ-প্রধান রাজ্য ছিল এবং কালিদাস মগধরাজ্যের সভায় ছিলেন। তিনি উচ্ছ্বিনীরাজ্যের সভায় ~~কবি~~ কারণ তাহা হইলে কবি অস্বস্তি-রাজকে তৃতীয় স্থান দিতেন না।

এখন দেখা যাক পৃষ্ঠীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বে কোন ব্যক্তিনিরস্ত নৃপতির অধীনে মগধ সমগ্র ভারতবর্ষে স্বৈরস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় এইরূপ দুইজন বিখ্যাত নৃপতি মগধ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

একজন নৃপতি বিখ্যাত পুণ্যমিজ; ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মৌর্যাবংশীয় বৃহদ্রথকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থাপন করেন। অপর নৃপতি গুপ্তাবংশীয় বিখ্যাত সম্রাট দ্বিবিজয়ী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনি পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আবিষ্কার করেন।

আমাদের বিশ্বাস গুপ্তাবংশীয় রাজাদের সময় কবি কালিদাস জয়গ্রহণ করেন। এই মতের সমর্থক কয়েকটি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ পাঠে অবগত হই রঘু বননিগণকে লিঙ্গনদের কূলে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হই গুপ্ত রাজাদের সময়েই সর্গপ্রথম রণগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং রণ আক্রমণ দ্বারা গুপ্ত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। অবিকল যজ্ঞ রাজাদের সময়ে রণ আক্রমণের কোন উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

(২) কালিদাসের কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গে মহাদেবের বিবাহে সপ্তমাতৃকা ও নবকপাল-ভূমিতা কালীর উল্লেখ আছে। আমরা গুপ্ত রাজাদের সময়ে উৎকর্ষ শিলালিপিতে সপ্ত-মাতৃকা পূজার সর্গপ্রথম উল্লেখ পাই। বৌদ্ধ-ধর্মের শেখাবহায তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের উৎ-পত্তি হয়। ঠিক এই সময়ে তান্ত্রিক হিন্দু-ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল। তান্ত্রিক ধর্মের বিশেষত্ব দেবীপূজা। বৌদ্ধগণ যেমন প্রজা-পারমিতা ও ভাবানুষ্ঠিত কল্পনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঠিক সেইরূপ সপ্তমাতৃকা ও কালী সৃষ্টির কল্পনা করিলেন।

(৩) কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃতের সহিত মৌর্যরাজ অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতের তুলনা করিলে বেশ সোধ হয় যে কবি দ্বন্দ্বের সময়ে বর্তমান ছিলেন না কারণ যদি কবি দ্বন্দ্বের সময়ে জয়গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার নাটকের প্রাকৃতের সহিত অশোকের শিলালিপির প্রাকৃতের বিশেষ প্রভেদ হওয়া উচিত ছিল না। প্রাকৃত-গুলি যে কথিত ভাষা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্গপ্রথম কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত পদ্ম

বেদের ভাষা। এই ভাষা উত্তরোত্তর পরি-  
মার্জিত হইয়া ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষায়  
পরিণত হয়। এই পরিমার্জিত ভাষার  
পরিবর্তন হটতে থাকে। আমরা অপেক্ষের  
সময়ে ব্যবহৃত লৌকিক ভাষার নিদর্শন  
উহার শিলালিপিতে পাঠ। অপেক্ষের  
শিলালিপিতে ব্যবহৃত প্রাকৃত ও সংস্কৃতে  
অধিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না।

অপেক্ষের পরে ব্যবহৃত কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত  
পালিসাহিত্যে পাই। অপেক্ষের সময়কার  
প্রাকৃত ও পালিসাহিত্যের ভাষা এক নহে।  
পালিসাহিত্যের ভাষা ও সংস্কৃতে প্রভেদ  
অধিক। কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত  
যে সেই সময়কার ব্যবহৃত কথিত ভাষা ছিল  
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পালিসাহিত্যের  
ভাষা ও সংস্কৃতে যত পার্থক্য কালিদাসের  
নাটকের ব্যবহৃত প্রাকৃত ও সংস্কৃতে তাহা  
অপেক্ষা আরো অধিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।  
অপেক্ষের শিলালিপির প্রাকৃত ও কালি-  
দাসের নাটকের প্রাকৃত তুলনা করিলে দুইটী  
যে দুই সময়কার কথিত ভাষা তাহা বেশ  
বুঝা যায়।

উপরোক্ত কারণে আমাদের বিশ্বাস  
কালিদাস গুপ্তরাজাদের প্রাধান্যের সময় জন্ম-  
গ্রহণ করেন। গুপ্তরাজাদের সময়ে সংস্কৃত-  
সাহিত্যে এক নবযুগের অত্যাখ্যান হেবিত্তে  
পাই। কি স্থাপত্যো, কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে  
এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা বেশ  
বুঝা যায়। কালিদাসের কাব্যে ও নাটকেও  
এক নবযুগের আগরণ পরিলক্ষিত হয়।

কালিদাস গুপ্তরাজাদের সময়ে জন্মগ্রহণ  
করিলে কোন্ রাজার সভায় ছিলেন এখন  
তাহার অহুসন্ধান করা যাক। এদেশে  
পণ্ডিতদের বিশ্বাস কালিদাস বিক্রমাদিত্য

রাজার সভায় ছিলেন। এই প্রবাদ অমূলক  
নহে কারণ কালিদাস একটী নাটকের নাম  
বিক্রমোৎসবী দিয়াছেন। এই নাটকে পুরুষবা  
ও উর্জসীর কথা বর্ণিত আছে। বোধ  
হয় কবি বিক্রম শব্দবোধে বিক্রমাদিত্য  
উপাধিদারী নৃপতির ইচ্ছিত করিয়াছেন।

ইতিহাস পাঠে আমরা গুপ্তরাজাদের  
সময়েই বিক্রমাদিত্য উপাধিদারী নৃপতিদের  
সর্ব প্রথম সন্ধান পাই। গুপ্তরাজাদের পূর্বে  
বিক্রমাদিত্য উপাধিদারী কোন রাজার  
সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদিও  
চালুক্যবংশীয় কোন কোন রাজাদের উপাধি  
বিক্রমাদিত্য ছিল কিন্তু তাহারা ৬৮- বৃষ্টাব্দের  
পরে রাজত্ব করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস  
কালিদাস বিক্রমাদিত্য উপাধিদারী কোন এক  
রাজার সভায় ছিলেন।

যেযুতে পাঠে বোধ হয় কালিদাস  
উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন কারণ কবি যেখ-  
নুতে ঐ প্রদেশের বর্ণনা বিস্তারিত  
দিয়াছেন। এখন গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্য  
উপাধিদারী কোন নৃপতি উজ্জয়িনীতে  
গিয়াছিলেন কি না, তাহার অহুসন্ধান করা  
যাক।

আমরা গুপ্তরাজাদের ইতিহাস আলোচনা  
করিলে অবগত হই যে তীয় চন্দ্রগুপ্তেরও উপাধি  
বিক্রমাদিত্য ছিল। তিনি শক ক্ষত্রপ-বংশীয়  
শেব নৃপতি ক্ষত্রসিংহকে পরাজিত করিয়া  
উজ্জয়িনীর সিংহাসন লাভ করেন ও মালব  
জয় করেন। (See Udayagiri Cave  
Inscription of Chandra Gupta II.  
—Fleet's corpus Inscription Indica-  
rum Vol. III, No. 6.

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া  
আমরা বলিতে চাই, কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্র-

গুপ্তের সভার ছিলেন এবং তাঁহার সহিত উচ্ছিন্নীতে গিয়া অবস্থির রাজধানীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

আমাদের সিদ্ধান্তের শোষণকৃত স্বল্প নিম্ন-লিখিত আরো কয়েকটি প্রমাণ আলোচনা করা যাইতেছে। সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পিতা। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী নৃপতি। তাঁহার বিজিত প্রদেশের নাম এলাহাবাদের

এলাহাবাদ প্রাপ্তি।

১। সমুদ্রগুপ্তের নিকট দাবক ও সম-  
তট প্রদেশের রাজা পরাদীনতা স্বীকার  
করিয়াছিলেন।

২। সমুদ্রগুপ্ত যজ্ঞেশ্বরগিরিবিজিত কটুর  
দুর্গের ও পিটপুত্রের নৃপতি বাসিন্দাকে  
পরাজিত করেন। এই দুইটি স্থান কলিঙ্গ  
প্রদেশে।

৩। সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের এরুগুপ্ত,  
কাকি, অবনুত, বেঙ্গ কুলপুত্র ইত্যাদি  
প্রদেশের নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।  
এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পাণ্ড্য, চের ও চোল  
প্রদেশের অন্তর্গত।

৪। পারস্যদেশীয় সাহেনসাহী উপাধি-  
ধারী নৃপতি কর প্রদান করিয়াছিলেন।

৫। লকগণ সমুদ্রগুপ্তকে কর দিয়াছিল।

৬। সমুদ্রগুপ্ত নেপাল, কীর্তিপুর ইত্যাদি  
পার্বত্য প্রদেশ জয় করেন।

৭। সমুদ্রগুপ্ত কামরূপ জয় করিয়াছিলেন

কবি চন্দ্রগুপ্তের পিতা সমুদ্রগুপ্তের বিজি-  
জয় কামিনী অবগত ছিলেন এবং সমুদ্র-  
গুপ্তের দিগ্বিজয় অবলম্বন করিয়া রত্ন দিগ্বিজয়  
বর্ণনা করিয়াছেন।

বিখ্যাত চীকাকার য়সিনাথ মেঘনুতের  
পূর্বসূর্যের ১৪শ স্কোকে অর্থ দুইপ্রকার  
করিয়াছেন। তিনি বলেন কালিদাস উক্ত  
স্কোকে সিংহনামের স্থায় বিরুদ্ধ সমালোচক-  
দিগের সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন।  
এবিকে বৌদ্ধসাহিত্য ও Walters মহোদয়ের

অন্যেক স্তম্ভে পাওয়া গিয়াছে। কালিদাস  
রত্নবংশে রত্ন দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।  
আমাদের এ স্থলে যেন গ্রন্থ চাই বাস্তবিক  
রামায়ণে রত্ন দিগ্বিজয়ের কোন উল্লেখ নাই।  
কালিদাস বর্ণিত রত্ন দিগ্বিজয় প্রদেশের সঠিত  
সমুদ্রগুপ্তের বিজিত প্রদেশের আশ্রয়। রত্ন  
সাদৃশ্য পরিচালিত হইবে।

কালিদাসের রত্নবংশ কাব্য।

রত্ন রত্ন ও বদ বিজয় করিয়াছিলেন।

২। রত্নকে উৎকলবাসী কলিঙ্গ প্রদেশের  
পথ প্রদর্শন করে। তথায় রত্ন যজ্ঞেশ্বরগিরি  
যজ্ঞকে তাঁহার প্রতাপতপ অক্ষুণ্ণ বিজ করেন।

৩। রত্ন কেতল ও পাণ্ড্য প্রদেশের  
রাজাগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

৪। রত্ন পারসিকদিগকে জয় করিয়া-  
ছিলেন।

৫। রত্ন লকজাতীর হরণদিগকে সিংহ-  
নখের উপকূলে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৬। রত্ন কাম্বোজ ও অন্তান্ত পার্বত্য  
কিরাতগণকে জয় করেন।

৭। রত্ন প্রাগজ্যোতিষপুরের নৃপতিকে  
পরাজিত করিয়াছিলেন।

Yuan chwang (Hoen Tsiang) এর  
ভ্রমণ বৃত্তান্তের অগ্রভাগ পাঠ করিলে সিংহনাম  
ও কালিদাস যে সমসাময়িক ছিলেন তাহাতে  
কোন সন্দেহ থাকে না।

এখন আলোচনা করা যাক, সিংহনাম কোন  
সময়ের লোক। বৌদ্ধসাহিত্য আলোচনা  
করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে মনোরথের পিতৃ  
আসন ও বহুবলু ছিলেন। সিংহনাম বহুবলুর  
পিতৃ ছিলেন ও পুষ্পপুরে তাহার পিতৃব্য এবং

করেন। দ্বিভাষা নান্দিকাত্যবাসী ছিলেন তাঁহার রচিত প্রথম সমৃদ্ধ নাট্যশাস্ত্রের একটি প্রদিক গ্রন্থ। বহুবন্ধ ও দ্বিভাষা নানন্দ্য বিষয়বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। নরেন্দ্র-গুপ্ত বলাদিত্য দ্বারা বৌদ্ধ পরমার্থ মগধ হইতে চীনদেশে প্রেরিত হন এবং তথায় ৪৯২ খৃঃ অব্দে লোকান্তরিত হন। বহুবন্ধের জীবনচরিতে পরমার্থ লিখিতাছেন বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য বহুবন্ধ কন্যগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন। হোয়েন সাঙ লিখিতাছেন এই বহুবন্ধের গুরু মনোরথ ছিলেন। তিনি কন্যগুপ্তের পূর্ববর্তী নৃপতির সভায় শাস্ত্রা-লোচনা করিতে আগমন করেন ও অস্ত্রায় ভাবে পরাগ হওয়াতে আশ্চর্য্য করেন। মৃত্যুকালে বহুবন্ধকে অস্ত্রায় পরাজয়ের সংবাদটী পাঠাইয়াছিলেন। হোয়েন সাঙের বৃত্তান্ত অংশারে এই নৃপতিটি ইহার কিছু-দিন পরে শত্রুগণ দ্বারা পরাজিত ও হত হন। ঐহার সভায় মনোরথ পরাজিত হইয়াছিলেন তিনি কুমারগুপ্ত—কারণ তাঁহার পুত্রের সভায় যে বহুবন্ধ ছিলেন তাহা পরমার্থ—তাঁহার বহুবন্ধ চরিতে লিখিতাছেন। কুমারগুপ্তের সময় বহুবন্ধ ও দ্বিভাষা বর্তমান ছিলেন এবং কুমারগুপ্তের সভায় মনোরথের পরাজয়ে কালিদাস সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহুবন্ধের গুরু মনোরথের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিভাষা কালিদাসের কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় কালিদাস কুমার-গুপ্তের সভায় বর্তমান ছিলেন।

অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসি-তেছে। ঋকবেদে যথা, পূর্বকন্বনী, উত্তর-কন্বনী এবং তিষা নক্ষত্রের উল্লেখ আছে।

ঐহর্যের ও অথর্কসংহিতায় কৃষ্ণিগণি নক্ষত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে। পার্শ্বিনিক অনেকগুলি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মহুগংহিতায় গ্রহ ও নক্ষত্রের কথা আছে। ফলিত জ্যোতিষের (Astrology) অস্তিত্ব মেগাস্থিনিসের সময়ে (৩০০ খৃঃ পূঃ) পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৈদিকযুগ হইতে নাক্ষত্রিক গণনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাশি চক্র দ্বারা জ্যোতিষিক গণনার কোন নিদর্শন পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে মেবাদি যাবদ রাশির উৎপত্তি চ্যলভিদ্ভাঙে সম্পাদিত হয়। ফিলিস্তিয়ানগণ গ্রীস দেশে যাবদ রাশির গণনা প্রবর্তিত করে। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় গ্রীকদেশের নিকট হইতে বিশেষতঃ Alexandria হইতে ভারতবাসী যাবদ-রাশির বিবধ অবগত হন। উভয় দেশের রাশির নামার্থ আপোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। স্বর্গাদিছাত্র আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে লিপিত হইয়াছে। ইহাতে রাশি-চক্রের কোন উল্লেখ নাই। ইহার পরে আর্গ্যাডট্ট ৪৭৮ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্র নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি রাশিচক্রের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পরে বরাহমিহির উজ্জয়িনী নগরে ৫০৫-৫৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। তিনি ফলিত ও গণিত জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রকে অনেকগুলি গ্রীক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে দেখা যায়। যথা—ড্রেস্কোন, দ্যাক্সিড, হোরা, কেস্ট্র ইত্যাদি।

কালিদাসের কাব্য ও নাটক আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে তিনি যাবদ রাশির কথা অবগত ছিলেন। কারণ যদু-

বংশে বসুধা জন্ম কালের কথাই কবি লিখিয়া-  
ছেন যে বসুধা জন্মের সময় পঞ্চাশ উচ্চ  
সংস্থিত ছিল এখন উচ্চসংস্থের বা উচ্চ  
সংস্থিতের অর্থ কি ? মঙ্গল সিংহ রাশির ২৮ ন  
অংশে, বৃহ কন্যা রাশির ১৫ ন অংশে, বৃহস্পতি  
কর্কট রাশির ১১ ন অংশে, শুক্র মীন রাশির  
২৭ ন অংশে, মনি তুলা রাশির ২০ ন অংশে  
থাকিলে উচ্চ বা উচ্চ আছে বলা হয়।

Jacobi মহোদয় বলেন জাম্বব রাশির  
অতিশয় পূর্ব হইতে থাকিলেও জ্যোতিষে  
রাশিচক্রের পন্যার প্রথা প্রথমে Fer-  
micus Meternus এর পুস্তকে পাওয়া যায়।  
( See Weber—History of Indian  
Literature p. 254. Note 277 ). হোরা,  
ত্রেজোন ইত্যাদি রাশি চক্রের বিভাগের কথা  
উাহার পুস্তকে সর্বপ্রথমে পাওয়া যায়।  
Fermicus Meternus এর (১) সময় ৩৩৬  
খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। বোধ  
হয় ইহার পর Paulus of Alexandria  
উাহার জ্যোতিষের পুস্তক লেখেন। অনেকে  
বিবেচনা করেন পৌলিন সিদ্ধান্ত Paulus এর  
পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

কালিদাস কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গের ১ম  
শ্লোকে গ্রীক জামিত্রমণ্ড (Gk. Diametry)  
ব্যবহার করিয়াছেন। জামিত্র মণ্ড অর্থাৎ  
উদিত রাশির সপ্তম স্থানের নাম। এই সকল

প্রমাণ দ্বারা বেশ বোধ হয় কালিদাস Fermi-  
cus Meternus এর পরে অর্থাৎ ৩৩৬  
খ্রীঃ অবঃ পরে বস্তুমান ছিলেন। গুপ্ত রাজাদের  
অত্যাচার মোটামুটি ৩২০ খ্রীঃ অবঃ হইতে ৪২২  
খ্রীঃ অবঃ মধ্যে ঘটয়াছিল। কালিদাসের গুপ্ত  
রাজাদের অত্যাচারের সময় জন্মগ্রহণ করার  
বৃত্তান্ত ইহার দ্বারা আরো উত্তমরূপে সমর্থিত  
হইতেছে।

ভাউদ্যাকী বলেন কালিদাসের অপর আর  
এক নাম মাতৃগুপ্ত ছিল কারণ রাজতরঙ্গিণী-  
কার কল্লন উাহার পূর্ববর্তী সকল বিখ্যাত  
কবিগণের নামোচ্চারণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি  
কালিদাসের নাম করেন নাই। কল্লন মাতৃ-  
গুপ্তের নাম করিয়াছেন। ভাউদ্যাকীর মতে  
এই মাতৃগুপ্তই কালিদাস কারণ মাতৃ ও কালী  
এক গুপ্ত ও দাস এক পদার্থভূক্ত।

আমাদের বোধ হয় কালিদাসের অপর নাম  
মাতৃদাস ছিল। আমরা মাতৃদাস নামধের  
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার একজন পাটলীপুত্র  
বাসীর নাম Gadhwa শিলালিপিতে পাই-  
রাছি। তিনি ৪০৭ খ্রীঃ অবঃ উচ্চ স্থানে তীর্থ  
করিতে আসেন ও ১০৮৮ দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রা  
দান করেন। যদি মাতৃদাস কালিদাসের  
অপর নাম ছিল এইরূপ মানিয়া লওয়া হয়  
তাহা হইলে তিনি যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়  
বাস করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।  
যদি বলা হয় মাতৃদাস কালিদাসের নাম নহে  
তথাপি মাতৃদাস নামদ্বারা এইটুকু প্রমাণিত  
হয় যে কালিদাসের নামের অল্পরূপ নাম  
৪০৭ খ্রীঃ অবঃ ব্যবহৃত হইতে। (২)

(১) Weber—The History of Indian Literature p. 254. Note 277.

(২) Gadhwa Stone Inscription. Fleet's Corpus Ins. Indiarum, Vol. III.  
পরমেশ্বরবদন্ত মহারাজাধিরাজ ঈশ্রেন্দ্রগুপ্ত রাজা

সংস্কৃত

বিবস পূর্ণা:

ক-মাতৃদাস প্রমুখ

পাণ্ডুর্য্যবন রচিত

দা-সর সামন্তক রাজ্য

বিদ্যারূপলি:

বটকনন বটকনন...পঞ্চমহাপাণ্ডুর্য্যবদন্ত রাজা

অতঃ

...

পূজা

৭

উপসংহারে বাক্য্য রূপং ও অভিজ্ঞান  
পুণ্ড্রার রচয়িতা কালিদাস ছাড়া আরো  
দুইজন কালিদাস নামধের কবির অস্তিত্বের  
কথা বৈদ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের স্মৃতিস্মৃতিবলী পাঠে  
অবগত হওয়া যায়

একোহপি জীয়েন্তে হস্ত কালিদাসেন কেনচিত্।

পৃথগেব ললিতোদ্যানে কালিদাস এবীকিমুঃ।

একাদিক কালিদাস থাকতে সময় নির্দিষ্ট  
রণের পক্ষেও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

শ্রীমদানুরাগন ঘোষ।

## লৌকিক ধর্ম্মে শ্রীমত্যানারায়ণ

'ঐশ্বর্য তপস্বান'! পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই  
এই মহামন্ত্রের স্রষ্টা; এই মহাবাণীর প্রচারক!  
'তপস্বান তপ্তবৎসল' এ বিদ্যাপ ভারতবাসীর  
অধিমন্ত্রাগত। ক্রতি সৃতির সাধুভূত,  
পুণ্যাদ পুরাণের পবিত্র শিক্ষার অঙ্গপ্রাণিত—  
স্বপ্নের প্রতীকাকৃষ্টি, ভারতবাসীকে এই  
অমৃত বিদ্যাসের শাস্ত প্রদিত। দান  
করিয়াছে। শ্রী-পুত্রাদির বেদ পাঠে অধিকার  
নাই; অথচ বেদের বাহা সার সত্য তাহাই  
নানা ভাবে নানা আকারে পুরাণে বর্ণন করিয়া  
অগণন পুরাণ সর্গজন পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট  
করিয়াছেন। তাই পৌরাণিক 'শ্রীভা' 'বটী'  
'মনসা' 'বালী' 'সত্যানারায়ণাদি'র পুণ্য ইত্যদ  
শ্রেণীরও বিশেষ অধিকার। তবে ইত্যদ শ্রেণীর  
হাতে পড়িয়া পাছে পবিত্র দেবমুষ্টি কোন  
অবমাননা হয়, উচ্ছ্রস্ত কথিত দেবভাগ্যের  
কাহারও মুষ্টিতে, কাহার পূজার বিধি বিধান,  
কাহারও বা প্রসাদাদি গ্রহণের আচার্য্যহুঁচানের  
সম্বত বেটনে একটা বিশেষ রকমের কঠোরতা  
লক্ষিত হয়। বলাই বাহুল্য যে 'বর্গপ্রম বর্ষের  
অধিকার অনধিকার তত' ইহার মধ্যেও  
সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ভারতীয় সাধনাকে মোটামুটি তিনটা  
ধারাে বিভক্ত করা যায়। ১ম 'আমি ভোমার', ২য় 'তুমি আমার', ৩য়  
'তুমিই আমি'—সোহং। সাধনার প্রথম

অবস্থার সেই ঐড়ম্বাণীপূর্ণ ভগবানকে 'প্রহু'  
'প্রতিপালক' 'অভীষ্ট' 'ভূতান্তিহ' 'ভবান্তি-  
হারণ, এইরূপ ভাবে ভাবিয়া নিষেধে তাঁহার  
দাস কল্পনা করিয়া সেই ভাবের ভাবুক  
হইয়া সেবে 'আমি ভোমার' বলিয়া আত্ম-  
সমর্পণ করা হইয়াছে। মানবীয় সাধনার  
এই প্রথম ছুয়ার, বৈধ কাম্য কণ্ঠের এই  
সুপ্রশস্ত পথ সকলের পক্ষেই অব্যাহত।  
দ্বিতীয় ধারাটি সূক্ষ্মরূপে কান্তভাবে গিয়া পর্বা-  
বলান লাভ করিয়াছে—ভগবানকে একান্ত  
আপনার করিয়া তুমি আমার বলিয়া মাতা,  
পুত্র, সখা—এমন কি অবশেষে পতিত্বের মধুর  
গণীতে টানিয়া আনিয়া এই চিরজীবপ্রবণ  
ভারতবর্ষ সাধনাররাজ্যে এক চির অমৃত্যু-  
মান পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তৃতীয়  
ধারাটিতে 'তুমিই আমি' বলিয়া সাধক সেই  
ব্রহ্ম জ্যোতিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।  
সাধকজীবনে নানা ভাবে এই ধারাটির  
বিকাসলাভ ঘটয়া থাকে। গোপীভাবে  
বিরহের অপূর্ণ তন্ময়ত্ব, বোম্বীগনের জীবমুক্ত  
অবস্থা এইভাবে পৃথক দৃষ্টান্ত হল। কিন্তু  
বাউক সে কথা।

আমরা বলিতেছিলাম যে 'ইতঃ পূর্কঃ  
মনোবুদ্ধি বেষ ধর্ম্মাদিকারতঃ' আমি ভোমার  
বলিয়া সর্গভাস্ত্রকল্পে এখনও বহিরাহ আত্ম-  
সমর্পণ করিতে পারেন নাই, সেই সন্নত

‘বালবিলেয়াঃ’ মূল ‘আমিহি তুমি’ বলিয়া আন্দোলন করে কি বলিয়া? কামনার দান তুমি, ‘বাবলখন চাহিবে বাজবাংরে’, লক্ষ্য নিবারণের জন্য চাহিয়া থাকিবে ঘাওক্টেরে, ‘লব চাহিবে করতালী মুখের সভাক্ষেত্রে’ অথচ সেই সর্কৈ-বর্ষাপূর্ণ বাহ্যিকলভ্যের নিকট ‘তুণ্য’ দেখি জয় দেখি বেশ। দেখি দিবোজহি’ প্রার্থনার নিশা করিবে! পুঙ্খকাবের সঙ্গে দৈবের এমন সূক্ষ্ম সম্বন্ধ-একমাত্র এই ভারতেই সম্ভব হইত। তত্ত্বনিম্ন ভ্রান্ত-সংস্কার কতদিন স্থায়ী হইতে পারে। কত নব নব ধর্মের উদ্ভব বিদ্য হইল, কিন্তু কত বিপ্লব কত বজ্রবাত মাঝার সহিয়া হিন্দুধর্ম আজিও অজর! অমর!! বাহ্য বহু কালাবধি বহু ব্যাপকভাবে স্থায়ী হইয়া আছে তাহার কোনও না কোনও সার্থকতা থাকিবেই। বঙ্গের প্রায় প্রতিপত্তিতে অঙ্কিত বজ্র সীতলা মনসা প্রকৃতির পূজার দ্বায় সর্গজন প্রিয় এই ঐশত্যানারায়ণ ব্রতটীও এইরূপ বহু ব্যাপকভাবে বহুদিন হইতে সুপ্রচলিত রহিয়াছে। কালকালের বাধা থরা নিয়মের বহির্ভূত, উপকরণের বাহুল্য বর্জিত এই ঐশত্যাশ্রমে পূজা প্রত্যেক হিন্দুর আতি আদরের। ‘হামভক্ত’ ‘বিবেচক’ প্রকৃতি পাশা বচরিতাপন এই ব্রত প্রভাবেই আজিও জীবিত রহিয়াছেন। কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের নিবাণ কুমি। কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের পিতৃ মাতৃ পরিচয় কুলশীল! কিন্তু নগ্নপ্রাণা পতীর নিতৃত নিতৃত সাজে সাজাছে আজিও ধনিত হয়—

“বিজয়াম তত্ত্ব তাবে তাবি ভগবান  
আপনার দোবে ছু পাইল অজান”

ছন্দপূরণ বেবানগে এই ঐশত্যানারায়ণ পূজার মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আরও ভাগ এইরূপ, ‘একলা শৌনকাহি কথিগণ বহুত রিজাসিত হইয়া বাসগিত্ত স্তত তাঁহাবিগকে বলিলেন,—পূর্বে ভগবান কমলা-পতি দেবর্ষি নারদকে বাহা শ্রবণ করাইয়া-ছিলেন, আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন, আপনাবিগের নিকট আমি সেই পুণ্যদ ইতিহাস বর্ণন করিতেছি’। স্তত বলিলেন হে লোক-হিত-ব্রত মুনিগণ ‘তুণ্য সংকুল পৃথিবীতে ত্রিতাপ তাপিত মানবগণের ত্রেণ দ্রুতীকরণে দ্বা পূরণ হইয়া সর্গলোক পাবন পুণ্য চরিত্র দেবর্ষি নারদ একদা ঐশগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে,—

“মর্ত্যলোকে জনাঃ সর্কৈ নানা ক্রৈল সমধিতাঃ  
নানামোনি লমুংপুয়াঃ পচ্যন্তে পাণ কধতিঃ  
তৎসর্কঃ পময়েজাৎ লমুপায়েন তণ্ডম—  
জ্যোতু মিচ্ছামি তৎ সর্কঃ কৃপাত্তি বদিত্তে মদি”  
ভগবান তাই অল্প সময়ে অল্প বিত্ত লইয়া যে কোন দিনে সর্গসাধারণে যাহার অতুষ্ঠান করিতে পারে সেই ঐশত্যানারায়ণ ব্রতের উপদেশ করিলেন। ঐশগবান বলিলেন “বহিন কহিন দিনে মর্ত্যে তত্ত্ব প্রজ্ঞা সমধিত” চিন্তে ‘নিশামুখে’ ‘রজাকলং স্ততঃ কীরং গোধুমন্তঃ চূর্ণকম’। অতাবে শাপিচূর্ণ বা সর্করাং বা শুভং তথা”। এই সামান্য উপকরণ একত্রে সপাণ পরিমাণে নিবেদন পূর্ক ঐশত্যানারায়ণ দেবকে তত্ত্ব বন্দনা করিয়া বহু বাহব লহ প্রসাদ গ্রহণ করিবে। ইহাতেই মানবের হৃৎ দূর হইবে। পূর্ক-কালে কিরূপে এই ব্রত মর্ত্যলোকে প্রকাশিত হইল তাহাও বলিতেছি “কচ্চিৎ কশীপুং প্রাণে আশীষপ্রদ নির্ধন” \* কশীপুং প্রাণে

\* সত্যানারায়ণ ব্রত কণা প্রায় সকলেই অবগত হইল।

মাহেয়; তন্মত বাহুল্য ভয়ে এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত



এক দারিত্র্য ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার ছুইবেলা  
মাত্র দুইমুঠা আহার্যও জুটিত না। তাঁহার  
ছুইবে বেশিরা ভগ্নবানের দম। চইল। তিনি  
নৃপ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া সেই  
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ লগাশে উপনীত হইলেন, এবং  
প্রথম তাঁহাকেই এই ব্রতের উপদেশ  
দিলেন। ব্রাহ্মণ সত্যানুসারে ব্রত করিয়া  
সফল মনোরথ হইলেন। তাঁহার বাড়ীতে  
জলপান ক্ষুদ্র আদিয়া ইত্যর কাষ্ঠভোগ্যগণ  
এই ব্রত গ্রহণ করিয়া শেল, এবং ব্রত প্রভাবে  
তাঁহারও দারিত্র্যামুক্ত হইল। ইহার পর  
এক রাজার উপাখ্যান।

‘উদ্ধাম্ব’ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন অভাব ছিল না। তথাপি তিনি স্মৃতিষ্ক তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তবর্ষী সমুদ্রতীরে এই ব্রত আচরণ করিতেন। একদিন এক বণিক বাণিজ্য বাপবেশে সেই পথে যাইতে ছিল। সে আহুপূর্ষক সমস্ত স্তমিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়া বাড়ী কিরিয়া গেল। তাহার কামনার মধ্যে ছিল অশুভ কামনা। সত্য-নারায়ণ-ব্রত-প্রভাবে অদ্বিরকালেই তাহার এক কস্তা জন্মগ্রহণ করিল। কস্তা বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। তাহাকে পাণ্ডুরা করিয়া সাধু আপন গৃহেই রাখিয়া দিল। তাহার কিছু দিন পরেই সজামাতা চন্দ্রকেতু রাজার রাজ্যে বাণিজ্য করিতে গেল। কিছু একাবৎ কালের মধ্যে মানস-প্রতিশ্রুত শ্রীমত্যানারায়ণ পূজা করিতে তাহার আর সাবকাশ লাভ ঘটিল না। ধন-মলমত সাধুকে, পার্শ্ব-স্থ-মোহাভিভূত সত্যোপতিত সাধুকে ব্রত প্রতিজ্ঞ অবলোকন করিয়া, দেবতাকে কঁাকি দিতে উদ্যত দেখিয়া (‘বজ্র থেননে’ জাগাইবার জন্য তাহারই হিতার্থ) সত্যানারায়ণ অভিনয় দিলেন ‘অন্ত হইতে সাধু কিছুকাল কষ্ট পাইবে’।

অভিলাষ অবার্হ। অভিশপ্ত সাধু জামাতা-  
সহ চোরাপণ্ডে করাবদ্ধ হইল। এহিকে  
গৃহে তাহার কন্যা, স্ত্রীও বহুকষ্টে বিন  
কাটাঠেতে লাগিল। মহা কষ্টক গৃহস্থিত ধন  
খান্দিয় অশস্ত হইল। আদিব্যাধি প্রাণীভিত্ত  
হইয়া শেষে তাহারিগণে ভিক্ষাতে জীবন-  
ধারণ করিতে হইল। ভিক্ষাধিনী সাধুকন্যা  
একদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের কোন গৃহস্থের  
বাটীতে সত্যানারায়ণের পূজা হইতে দেখিয়া  
মানসাপূৰ্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গৃহ  
প্রত্যাগত হইল, এবং মাকে আদিয়া সমস্ত  
বলিল। মাও মেয়ে ভিক্ষালভ উপকরণে  
সেই দিন হইতে সত্যানারায়ণ ব্রত আরম্ভ  
করিয়া দিল। ইহাদের ভক্তিভক্তে সত্যানারায়ণ  
কৃপা করিয়া চক্ষুকে সুস্থ্যকৈ স্বপ্নাদেশ দিয়া  
সন্ধ্যাতা সাধুকে কারামুক্ত করাইলেন।  
বাণিজ্য করিয়া বাটী ছিড়িবার পথে আবার  
বিপদ। সত্যানারায়ণ ঐশ্বর্য বতীব্রপে আদিয়া  
প্রার্থনা করিলেন, কিছু ভিক্ষা চাই বাবা!  
উপহাস করিয়া সাধু বলিল ঠাকুর তরণীতে  
লতাপত্র আছে মাত্ৰ, টাকা কড়ি কিছুই  
নাই। বতী তথ্য বলিয়া চলিয়া গেলেন,  
তরণী লতাপত্রাদিতে পূর্ণ হইয়া গেল।  
তৎকালে শোকাহুল সাধু জামাতা কষ্টক  
প্রবোধিত হইয়া বতীব্রপে দিয়া প্রণত  
হইল। তত্বে তুই তত্ত্ববৎসল শরণ  
করাইয়া দিলেন, 'সুচ ময়পূজা পরাচুখ হইয়া  
বারবার এত কষ্ট পাইতেছ।' সাধু বতী  
সমীপে এবার পূজার অস্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।  
বতী অস্বহিত হইলেন। এহিকে তরণী-  
গুলিও পূৰ্ব্ববৎ ধনবস্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।  
সাধু তরণীতেই সত্যদেব পূজা করিয়া নৌকা  
ছাড়িয়া দিল। বাণিজ্য তরণীগুলি নদীপথে  
সাধুর নিম্ন নগরের ঘাটে গিয়া উপনীত হইল।

সাপুত্র প্রেরিত লোক সাধুগৃহে সংবাদ দিল।

যামি ও জামাতার বেশখয়ম বার্তা প্রাপ্ত সাধুপত্নী কষ্টকে পূজা শেষ করিতে বলিয়া আপনি অগ্রবস্ত্রিনী হইল। কষ্টা কলাবতীও যাত্ৰাভাবে ৮ প্রদায় পরিত্যগ করিয়াই মাতৃ-পথ্যস্বস্তিনী চইল। প্রদায় অবমাননায় ক্রুদ্ধ সভ্যদের তরঙ্গী শুদ্ধ সাধু জামাতাকে নবী-পথে নিমজ্জিত করিয়া মিলেন। অনেক বিলাপের পর কলাবতী স্বখন সন্তরপে কৃত-সংকল্প হইল, তখন সভ্যদের দৈববাণী করিলেন, শুনিবামাত্র ক্ষিপ্তগতিতে গৃহাদয়ন-পূর্বক সাধুকষ্টা তন্ত্রিতাবে প্রদায় তুলিয়া তক্ষণ করিল। এথিকে সাধুজামাতাও তরঙ্গী শুদ্ধ নবীপূর্ত হইতে উদ্বিগ্ন হইল। গৃহে প্রত্যাপ্ত হইয়া সাধু মহালয়ারোহে সভ্য-দের পূজার অসুষ্ঠান করিল। এইরূপে ইহলোকে নানা দুঃখ সন্ধান করিয়া সাধু অন্তে সভ্যলোক লাভ করিয়াছিল।

ইহার পর বংশধর রাজার উপাখ্যান আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—একদা এক বনে কতকগুলি রাখাল সত্যানুয়য়ণ পূজা করিতেছিল। সেই বনে সুগম্য সন্মগত উক্ত সুপতি পূজাকেই প্রণত হন নাই, অপিচ মদ্য হইয়া প্রদায় অবহেলন করিয়াছিলেন। তৎকাল তাহার পত পুত্র বিনষ্ট রাখানষ্ট ইত্যাদি নানা দুঃখ সমুপস্থিত হইয়াছিল। শেষে বৈবাহ্যগ্রহে নিজ স্রম বৃদ্ধিতে পারিত্য রাজা পুনরায় সেই বনে গমন করেন। এবং গোপ-বালকদের সঙ্গে একত্রে পূজাদিপূর্বক প্রদায়গ্রহণ করিয়া সন্মগত বিনিস্কৃত হন।

এইবার সংক্ষেপত ধ্যানাদির আলোচনা করিয়া উপাখ্যানটির স্বর্গগ্রহণে চেষ্টা করা যাউক। •

সত্যানুয়য়ণের ধ্যান

“ঐ ধ্যাতব্যে সত্যং গুণাতীতং গুণত্ব সমবিতং  
লোকনাথং ত্রিলোকেশং কৌন্তভ্যভরণং তরুণ  
নীতাধরং শুক্লবর্ণং শ্রীবৎস পদ্মবিতং

গোবিন্দং গোফুলানন্দং ত্র্যম্বোয়তিপুঞ্জিতম্”  
ধ্যানটির আলোচনায় বৃত্তিতে পারি ইহা অধিকারভেদে সকল শ্রেণীর সাধকগণেরই উপযোগী। ধ্যানেটিতে শ্রীকৃষ্ণের ‘লীলাস্বরূপ’ ‘কর্মমহ’ ও ‘প্রেমমহ’ এই ত্রিবিধ ভাবেরই চোতন প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে এই পূজা সেই গোফুলানন্দ গোবিন্দেরই পূজা মাত্র।

যিনি ত্রয়রাখালগণকে কাঁখে চড়াইয়াছিলেন, যশোদা জননীর বন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন, বরিত্ত বিদ্রা হুদ্যামাকে কতলা করিয়াছিলেন, বিদ্রের গৃহে অতিথি হইয়া নামান্ত ততুলকণার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন—তিনি ভিন্ন এমন অবাচিত কল্পা আর কাহার? বরিত্তের প্রতি অসুগ্রহ আর কে করিবে? ইতর কঠিনী-বী-গণের উপরেও যেমন, সমাজস্বর্গে ব্রাহ্মণের উপরেও তেমনি। তাহারই ত শ্রীমুখের বাণী—  
“বরিত্তাণ ভর ভৌত্রেয় মা প্রবচ্ছেদ্যে ধনম”  
আবার আত্মসামগণ ধীহাকে পূজা করিয়া আনন্দিত হন। উক্তাধু সুপতির মত ভোগবান অভাবশূন্য বিদ্যী তিনি ভিন্ন আর কাহার পূজা করিবে? সাময়িক কামনার উদ্ভাস্তচিত্ত বর্ণিকও বিকল মনোরথ হয় নাই। তগবানই যে নিজমুখে বলিয়াছেন ‘যে বধা মাম্ প্রপদ্যন্তে ত্বাং তুধৈব ভজা-মাচম্’ তবে সে পথ হারাইতেছিল তাই তাহার চৈতন্ত্যোৎপাদনের অন্ত একটু আঘাত দিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাও ত সেই বিবর্ণিত্যরই কাণ্ড। “বলকতি মূলীকৃত প্রকৃত মদল” তথাবর্ণিত বিজ্ঞের নিকটেই নিশ্চিনী হয়।

কথা এই যে ধন সৌলভ মাহুনের চাই। সে যদি বুঝে এই পথে চলিলে আমার হুখ আচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে তবে সে যে সেই পথেই চলিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ইহাও যদি সে বুঝিতে পারে, যে এই হুখ আচ্ছন্দ্যের মধ্যে ইষ্টচিন্তা বিস্তৃত হইলে, মানবের সহজাত স্বপত্তি পরিণোদে অবহেলা করিলে আবার বিপদেরও সম্ভাবনা; তবেই না তাহার ভয় থাকিবে। তবেই না সে সংপথে চলিতে চেষ্টা করিবে। এই একটা কথা আছে, যে কৃষক কৃষিকার্য্য করে কৃষিতে তাহার জীবিকার সংস্থান হইবে বলিয়া। এই কৃষক যদি বুঝে যে রাজার প্রতি ভক্তি না রাখিলে, রাজত্বের নিরমিতভাবে প্রদান না করিলে আমার কৃষিজাত জবা বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে সে কৃষক ত রাজভক্ত হইবেই। কৃষি প্রতি হইতেই তাহার রাজাহুস্তি জন্মিবে। এক্ষেত্রে আবুর রাজারও উচিত বাহাতে কৃষক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে— তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া; দেশে দয়া তত্ত্বের উপজব নিবারণ করা, কর্ত্তারিগণের সদাচরণ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। ইহাই সংসারভ্রমের প্রথম সোপান, ধর্মের প্রথম স্তর। এইবার উপাখ্যানভাগের একটু বিষয় করিয়া আলোচনা করা যাউক।

উপাখ্যানভাগের প্রথম কথা এক ভ্রাম্যণ বড়ই দরিদ্র ছিলেন। শিক্ষা করিয়াও তাঁহার দিনপাত হইত না। অন্যায়কীট পরীয়ে তবুও তাঁহাকে ভ্রমণের রেশ সঙ্করিতে হইত। ভ্রাম্যণের দুঃখের অবশি ছিল না। এইরূপ সময়েই অবাচিতভাবে আসিয়া ভগবান দেখা দিলেন। সত্যনারায়ণ পূজা করিয়া ভ্রাম্যণের দুঃখ দূর হইল। তাঁহারই দেখানো এক ইতর কাষ্ঠজীবীও

সত্যনারায়ণ পূজা করিয়া দারিদ্র্যাকবল হইতে উদ্ধারলাভ করিল।

পেটের দায়ে, দারিদ্র্যের বিষম শল্যে নিপীড়িত হইয়া, অতাবের তাড়নায়, মাহুখ না করিতে পারে সংসারে এমন কোন দুর্ভাগ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই উদরের আলাতেই ত কেহ বা চোখাবুস্তি গ্রহণ করিতেছে, কেহ বা অধিক দান্য জীবন যাপন করিতেছে, অনন্তোপায় হইয়া কেহ বা আত্মহত্যাভ্রম মগপাশেও লিপ্ত হইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে—মানব ধন জীবনের এই সর্বপোষক ভ্রমণের সংকটের সম্মুখীন হয়—অতাবের তীব্র তাড়নায় উদ্ভ্রান্তচিত্ত মানব ধন কাগাকাণ্ড জানহীন হইয়া পড়ে—সংসার-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আত্মীয় স্বজনকে নিকট প্রাণীয়ায় নিরাশ্রয় হুতাশে সকল আশা ভরসাই ত্যাগ করে, দেখে শুই দিপ্তব্যাপী অন্ধকার, তখন—তখন এই মহান আশ্রয়-বাণী—মক্ষক্রে অমৃত শীতল বারি ধারা—

“আমি সত্য নারায়ণ তুমি শ্রীমদ্র

আমারে ভজিলে ধন হইবে বিস্তর”

মানবের একমাত্র জীবনোপায়। এই দৈবী-প্রভাব তখন মানবজন্মে মন্ত্রশক্তির ভাৱ কার্য্য করে। ধন কেহ নাই—সংসার পুত্ত্রময় তখন অগতির গতি ভ্রমবান। আমরা বলি ইহাতেও যদি কাহারো দুঃখ দূর না হয় তাহা-তেই বা কতি কি? পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা থাকিবে কোথায়? জীবন ত ‘নিষ্কলক রহিয়া যাইবে। হিন্দু যে একজন্মে সব শেষ হয় না। এ শিক্ষা পাইলে মাহুখ যে কাদিয়া বলিতে পারে—

‘বহ্যাব্য তত্ত্ববজ্জ ভগবন পূর্জকর্মাভ্রমপ্।

বলিতে পারে ‘নিয়ালখ লখোদর জননী কংদামীনরণ’, এ যে চরম সাধনা, এ শিক্ষার

প্রয়োজনীয়তা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অন্ততঃ এই চারতবর্ষে। অধুনাতন জীবনদৃষ্টিভঙ্গির এই ঘোর সংকটকালে, এই মহামল্লভার দিনে ‘জনসাধারণের’ পক্ষে ইহার উপযোগীতা কিন্তু—‘শিক্ষিত সম্ভ্রমের’ একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে বিশেষ বাধিত হইবে।

বণিকের উপাখ্যান সূত্রে আর বেশী কথা না বলিলেও চলে। মুষ্টি ভিক্ষা দান যে দেশের সনাতন পদ্ধতি সেই দেশের একজন বহু ঐশ্বর্যালম্বী বণিক অতিথিকে মিথ্যাকথার প্রতারণিত করিতেছে, ইহার বিহিত প্রতিকার হওয়াত বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আর বণিক-কৃত্য। যেমন কথ্য করিয়াছিল তেমনি কলও পাইয়াছে। তথাপি অবলা বলিয়া অল্পেই তাহাকে মার্জনাও করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এতদপ আদর্শের একান্ত আবশ্যকতা আছে। এতদপ কঠোরতা না থাকিলে ইতর শ্রেণীর হাতে ‘প্রসাধনের’ বখেই অবমাননার সম্ভাবনা ছিল। সত্যানুসারায়ন ব্রত প্রায়ই অহুষ্টিত হয় বলিয়া এই ‘বারমেন’সে’ ব্যাপারে শোকের জাঙ্ঘল্য জন্মিতেও পারিত বলিয়া বোধ হয়। এ ব্রতের বহুল প্রচার যে সর্বভোক্তাবে বাঞ্ছনীয় এবং হইয়াছেও তাহাই, এ কথা আর না বলিলেও চলে।

পাঠালীকারগণের প্রভাবে এ ব্রতের বহুল প্রচার ঘটিয়াছে, তাহাদের সূত্রে কিছু না বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিতেছি না। ‘ককীর রাম দাস’, ‘রায় ভগপাকর ভারতচন্দ্র’, ‘বিজ্ঞ রামেশ্বর ভট্টাচার্য’, ‘লালা জয়নারায়ণ সেন’, ‘বিজ্ঞ কান্দীনান’ ‘বিজ্ঞ বিশেষ্বর’ ‘বিজ্ঞ রামভট্ট’ ‘বিকল চট্ট’ ‘শঙ্করাচার্য’ ‘কবির’ ‘বিজ্ঞ জয়দেব’ প্রভৃতি কত গাথা রচয়িতা পদী-কবিশ্রম এ বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া

দিয়াছেন আজিও তাহাদের সকলের পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। (১) ককীর রাম দাস প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। রায় সাহেব বীর্ভেন বাবু ‘বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়’ পরিচয় পাই ইনিই ‘সবী-সেনা’ নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বীর্ভেন বাবু বলেন ইহার বাড়ী বর্ধমান, জাতিতে বৈষ্ণব, ইহার উপাধি ছিল কবিভূষণ, ‘সবীসেনার’ ইনি নিজ নাম ভনিতায় দিয়াছেন

‘পরকাল হইতে ইহকাল বড়

ককীর রামদাসে বলে এই কথা মড়’

‘ককির রামদাসে বলে গুনিয়া বহুল তলে  
কোঙর হইল মনস্থির

‘ককীর রামদাসে বলে ভাবি তুমুলে’

ইত্যাদি।

(২) রায় গুণাকরের ‘সনে রত্ন চৌগুণ’ ১১৩৪ সাল—প্রায় ১৮৭ বৎসর পূর্বের কথা। (৩) বিজ্ঞরাম প্রায় বর্তমান কাল হইতে ১৬৪ বৎসর পূর্বে ১৭৫০ কৃঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন। ইহার ‘শিবায়ন’ নামক কাব্যও আছে। ইহার সত্যসীতের পুঁথি হইতেই জানা যায় যে ‘সাকিম বরদাবাণী বহুপুত্র গ্রাম’ কবির বাসস্থান ছিল। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে বীর্ভেন বাবু লিখিয়াছেন—‘ইনি বেদিনীপুরের অন্তর্গত কণগড়ের রাজা বনোমঙ্গল সিংহের সত্যসদ ছিলেন।’ (৪) লালা জয়নারায়ণ সেন ‘হরিলীলা’ নামে সত্যানুসারায়ণের এক সুবহু উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে প্রকাশ ইহার বিদ্যুৎ আত্মপুত্রী আনন্দময়ী দেবী এ বিষয়ে তাহাকে বখেই সাহায্য করিয়া ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব, নিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধপসা গ্রামে। ইনি

১৪২ বৎসর পূর্বে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে হরিদ্বার।  
রচনা করেন। (৪) বিজ্ঞ কান্দীনাথ 'শাকটে  
হ্রববদ্য' লক্ষণশিখির্নামে' ইত্যাদি ১৭০৮  
শকাব্দ—১২৮ বৎসর পূর্বে সত্যানারায়ণ  
সাধা রচনা করেন। বাকী দ্বিজ বিশেষত্ব  
প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় জানিবার উপায়  
নাই, তবে মনে হয় বিশেষত্ব পূর্ববঙ্গের  
অধিবাসী ছিলেন। 'বিজ্ঞ রামচন্দ্র' আশ্রমের  
বীরভূমের বলিয়া বিবাদ করি। 'বৈকল  
চট্টের' পুঁথিও বীরভূমে পাওয়া গিয়াছে।  
বিজ্ঞ অরুণের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বীরভূম  
সিউড়ি হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে ব্যতিকার  
গ্রামে বর্তমান ছিলেন। ইহার রচিত পত্র  
কবিতা লোকের মুখে এখন প্রবাদের মত  
বহুল প্রচলিত। কবিতা কবিত্ব সকলেই  
আপন আপন কল্পনার সাহায্যে নূতন নূতন  
রকমের 'সত্যানারায়ণের পুঁথি' রচনা করিয়া  
দিয়াছেন। বিজ্ঞরাম ও বিজ্ঞ শঙ্করাচার্য  
সত্যানারায়ণ ও সত্যপীরকে এক পিড়িতে  
বসাইয়া একত্রেই ইহাদের শিরোমুণ্ডন  
করিয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলিতেছেন—

'শঙ্করাচার্যের মত প্রবন্ধ প্রাচীন

অতঃপর বল সবে আশীন আশীন'

বিজ্ঞরাম আবার আরো এক কাঠী উপরে  
চড়িয়াছেন' তিনি ডাকিনী ঘোণ্টিনী আদি  
বন্দনা করিয়া শেষে

'কোয়ান কেতাব আর কলিমা সংহতি

হুবিধা পীরের পাথ করিয়া প্রণতি'

তবে ছাড়িয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও ক্ষমা  
নাই, লিখিতেছেন—

'অপর যতক পীর বহু তক্তি তরে

ফনীজ মনীজ ইজ কাপে যার তরে'

ইনি সত্যদেবকে যন্ত্রেয় ককীর সাজাইয়া

উহার মুখে অনেক চিহ্নী বোলচাল সন্নি-  
বেশিত করিয়াছেন।

বেবাণ্ডে নূলে আছে যে সত্যদেব রক্ত  
ব্রাহ্মণের রূপে প্রথম প্রকাশিত হইলেন।  
ককীরের অন্তরায়ণ করেন পঞ্চম কবিত্ব  
ভারতচন্দ্র—

'কলির প্রভুমে হরি, ককীর শরীর ধরি,

অবনীতে অবতরি, তরিতাবে যজ্ঞ।

দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে, দ্বিতীয় বিজ্ঞের নামে,

পঞ্চ অর্থ মোক্ষ কানে, নামে বৈকল যজ্ঞ।'

দ্বিতরামে উহার পূর্ণ পরিণতি। মুসলমানি  
ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি, মুসলমান আশ্রমে  
বাস, মুসলমানের সহ বহু প্রভৃতি প্রতিবেশ-  
প্রভাব জাহাঙ্গিরকে এতদূর রচনায় প্ররোচিত  
করিয়াছে। সত্যানারায়ণ রচনায় কেহই  
নূলের অঙ্গুলরণ করেন নাই। বেবাণ্ডেও  
আছে—

গ্রাম কান্দীপুর

বিজ্ঞের নাম নাই।

কাঠুরিয়া

নাম নাই

নৃপতি উজ্জয়িনী

ভার্যা ভক্তশীলা

নাথু বণিক

নাম নাই

পত্নী লীলাবতী

কস্তা কলাবতী

আমাতা

নাম নাই নিবাস কাকন

নগর

নৃপতি চন্দ্রকেতু

পত্নী

নাবিকগণ

ইহা হইতে দ্বিজ বিশেষত্ব লিখিলেন—

'অক্ষপুত্র কুলে জন্ম নাম কান্দীপুর

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈজ্ঞ বসতি প্রচুর

সেই গ্রামে সত্যানন্দ দ্বিজ ব্রাহ্মণ

প্রথমে প্রকাশ তথা সত্যানারায়ণ।'

পুনঃ—

‘লক্ষণতি লক্ষণতি দুই সঙ্গার

বাণিজ্য করিতে দুহে চলিয়া সফর।’

তবে ইনি বংশধর রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ‘বিজ্ঞ রামভট্ট’ লিখিতেছেন, ‘দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণজনী সত্যমেবের নিকট পরিচয় দিতেছেন—

‘অবস্তী নগরে বাণ কিরি ভিক্ষা আনে

দ্বিতীয় করিল বিধি পূর্ণ কণ্ঠ দোষে।’

বণিকের উপাখ্যান—

‘ধনেশ্বর নাম সাধু সোড়ে বসতি’

‘বাণিজ্য করিতে যায় হরষ বন্দর’

‘অস্থির নন্দিনী সত্যনারায়ণ বরে

বিবাহ দিলেন চন্দ্রকেতু সঙ্গারে’

ইহারা কেহই উচ্চাধু নৃপতির উল্লেখ করেন নাই। ‘দ্বিলালী’ এক বৃহৎ কাব্য, তাহাতে উচ্চাধুকে কোটাল বলা হইয়াছে। সাধুর কস্তার নাম সুনন্দা, জামাতার নাম চন্দ্রকান্ত ইত্যাদি। কবিবরের রচনায় বেশ মিষ্ট ছন্দ এবং প্রাঞ্জলতা পরিদৃষ্ট হয়। বাহুল্য তবে সকলের রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইহারা কেহ ‘বিজ্ঞের নাম দিয়াছেন বিজ্ঞপদ্য, কাঠুরিয়ার নাম দিয়াছেন মধন, মাদন ইত্যাদি। ইহারা সকলেই ‘বিজ্ঞ হইতে কাঠুরিয়া এবং নবীতীরে কাঠুরিয়া ও নদীপথ দ্বারা সঙ্গমসরে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। ‘বিজ্ঞ রামভট্ট ও ‘বিজ্ঞ বিবেকর ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। নানা স্থানে ইহাদের পুঁথি প্রচলিত আছে। রামভট্টের রচনার একটু নমুনা দিতেছি—

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপধারী

সত্যনারায়ণকে বলিতেছেন—

‘তুমি সত্যনারায়ণ আমি ব কেমনে

• • • • •

কৃপাকরি নিম্নতপ বর মহাশয়

তবে সে আমার চিত্তে হইবে প্রত্যয়।

নিম্ন রূপ ধরিলেন সত্যনারায়ণ

পূর্ণ অস্ত্র তপোফলে দেখিল ব্রাহ্মণ।

বিরিকি বাসব পদ না পান দেখানে

শেবেন নারদ কবি রাতুল চরণে।

বাম ভাগে কমলা গজ্ঞ আয়োহণ

সম্মুখে করয়ে স্তুতি দিষ্ট কবিগণ।

‘বিজ্ঞের ভাগ্যের কথা কহেন না বার

কমলা সেবিত পদ দেখিবারে পায়।

শম্ভুচক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ ধারী

পরিধান পীতাম্বরদ্বয়ে কণ্ঠ্যী।

অলকা তিলকা ভালে শোভে শশিকলা

মকর মণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা।

ইহা থহু জিনিয়া নখন তুচ্ছ থহু

কোটিচন্দ্র ছটা কিবা নবদন তহু।

রাতুল চরণ পদ্ম কত শোভা করে

নখর নিকরে নিম্মা করে হিম করে।’

• • • • •

দ্বিতীয় গোলোকধাম হইল সেই স্থানে

অচেতন হয়ে বিজ্ঞ পড়িল চরণে।

পদরঙ্গ দিয়া বিজ্ঞে করণ চেতন

পূর্ণের সঙ্গিনী বেশ হইলা তখন।’

ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ঐশ্যনারায়ণ পূজা, কাহার পূজা; জন-সাধারণ ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

ঐহরেকুম্ভ মুখোপাধায়।

## আয়ল্যান্ডের সমবায়পন্থী ভাবুক-কবি

### জর্জ রাসেল

কবি য়েটসের (Yeats) নাম আজকাল বঙ্গদেশে পরিচিত। কিন্তু আয়ল্যান্ডের কৰ্ম-বীর রাসেলকে বোধ হয় বেশী লোকে জানেন না।

ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক লিখিয়াছেন—

"The ablest and most interesting personality in Dublin is George Russell (A. E.). \* \* \* He is the editor of the *Irish Homestead*, the maker of Agricultural Co-operation in Ireland, and the St. John the Baptist of the Co-operative Commonwealth in which like him I profoundly believe as the only solution of our economic and moral troubles."

জর্জ রাসেল একাধারে কবি, চিত্রকর, সমালোচক, বাণনিক, জাতীয়তাবাদ প্রচারক, এবং কৃষিক্ষেত্রে সমবায়-অনুষ্ঠানের প্রবর্তক। এই সাহিত্যরসী ও কৰ্মবীর সংক্ষেপে আবে-রিকার একজন অধ্যাপক তাঁহার নবপ্রকাশিত *Irish Plays and Playwrights* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

You may think of Mr. Russell as you will, as organiser of the Irish Agricultural Organisation Society, as stimulator of the Irish Literary Revival, as economist

playwright, poet, painter, preacher, but always as you put by his books you will think of him as mystic, as stargazer, wondering as he so often tells us in his poems, on the mountains by night, with his eyes keener with wonder at the skies than ever shepherd's under the Star of Bethelhem \* \* \* you will think of him as the stargazer whose "spirit rolls into the vast of God."

এই অধ্যাত্মবাদী অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ভাবুক কবিরের শিক্ষা নিয়ে বিরক্ত হইতেছে।

"Even as a boy he could not read most English literature and so he took to reading the literature of the East, the Bhagavad Gita and the Sufis. From his reading of these, with other young men that somehow found each other out, came the Hermetic Society, at whose meetings everything mystic from the Upanishads to Thomas Taylor was discussed. From the study of the Universal, he said, they came at last to the national, to the study of the ancient folk-lore and stories of their people, which

had it not been for the Danes and Normans, would have been shaped into literary form long before now, when, he said they were only being so shaped."

রাসেল বলেন—“আমরা আয়র্ল্যান্ডে ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কার্যে পরিণত করিতেছি। আমার বিশ্বাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরী স্বয়ং ব্যতীত মানবের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণবিকাশ হইতে পারে না। লম্বা লম্বা বৃহৎকার ব্যতীত বাক্য করিয়া নগরের নরনারীগণ মহত্ববাহীন হইয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর নগর-সভ্যতার বিষয় কল বৃত্তিতে এখন আর কাহারও থাকী নাই। এক্ষণে পরীসভ্যতার প্রবর্তন না করিলে মানবসমাজে স্থখ আসিবে না।”

একজন রাসেলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“নগরসভ্যতা এবং ক্যাপিটালীজীবনের অসম্পূর্ণতা ও ছুগ্ন পারিত্র্যগুলি নিবারণ করিবার জন্য ইউরোপে নানা আন্দোলন হইতেছে না কি ? Factory Acts, Housing Acts, Feeding the Poor Acts, Sanitary Inspection Acts, Fresh Air Movements, Municipal aids ইত্যাদির দ্বারা দরিদ্র শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবীগণকে সুখী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না কি ? এই যে আজকাল ডাব্লিনে Civic Exhibition হইতেছে তাহার দ্বারা দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়াইবার চেষ্টাপাত করা হইতেছে না কি ? সরকার হইতে এত অর্থব্যয় করিয়া জনসাধারণের জীবনে অনশ্ব ও মধুরতা প্রবর্তন করিবার প্রয়াসকে আপনি কি চক্ষে দেখিতেছেন ?”

রাসেল উত্তর দিয়াছিলেন—“দূর ও ব্যতির হইতে মনে হইবে যে রাষ্ট্র ধর্মমত socialist হইতে চলিল তখন ধর্মী মহাজনদিগের উপর কড়াগারে শাসনা বসাইয়া দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থবিধানই করা হইতে থাকিবে। জনগণের জন্য হইতে মুক্তা পর্যন্ত সকল অবস্থায়ই গবর্মেন্ট অর্থ সাহায্য করিতেছেন। জলদান, অন্নদান, সস্ত্রদান, ঔষধদান, বিদ্যাদান—ইত্যাদি সকল প্রকার দানই টেট হইতে করা হইতেছে। সেমিলে মনে হইবে এত “রাম রাম্য” আর কি ? মোজালিট টেট জনগণের পিতামাতা বতরণ !

কিন্তু গভীরভাবে তলাইয়া দেখুন—এই সমস্ত “অনাথভাণ্ডার” বতরণ রাষ্ট্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। তাহা হইলে বৃত্তিধন—এই সর্বভোগমুখী অনাথভাণ্ডারের দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে ধর্মী মহাজনদিগকেই সাহায্য করা হইতেছে। দরিদ্রের ক্রমশঃ তনিয়া রাষ্ট্রবীরেরা সহস্রকৃতিসম্পন্ন হইতেছেন সত্য—কিন্তু তাহার দ্বন্দ্বের কণ্ঠপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার ফলে “ক্যাপিটালিষ্ট” ও নিয়োগ কর্তা দিগকেই “সংরক্ষণ” করা হইতেছে।

মহাজনগণ শ্রমজীবীগণকে আর অধিক হারে বেতন দিতেছেন না। আর বেতনে লোক নিমুক্ত করিবার সুযোগ ইহারা পাইতেছেন। চারিদিকে বাজার দর বাড়িয়াছে—প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের মূল্য বৃদ্ধি অত্যধিক। কাজেই শ্রমজীবীরা উচ্চ-হারে পারিশ্রমিক না পাটলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু নিয়োগ-কর্তারা মজুরী বৃদ্ধি করিলেন না। তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্র আদিরা শ্রমজীবীগণের পূহ, বাসস্থান, উদ্যানভূমি, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি



সকল জিনিষ ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথবা বাজার দর মণেকা অল্প মূল্যে জোগাইতেছেন। কলকাতা: শ্রমজীবীরা স্বপ্ন পাইতেছে কিন্তু মহাধনগণ সমুদ্রী বুদ্ধির দায় এড়াইতে পারিতেছেন। ইংরেজা সম্ভাব্য লোকজন পাইতেছেন।

দুঃখের টেট হইতে যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহার দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছেন কাহারো?—শ্রমজীবী-সমাজ না ধনীসমাজ? তেলা মাথায় তেল দেওয়া হইতেছে না কি? এ অস্বাভাবিক অবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বারিষ্ট্রা-সমাজ এ ভাবে মীমাংসিত হইবে না।

শ্রমজীবী ও মহাধন—এই দুই দ্বিতীয় লোকের পরস্পর স্বার্থ ও বিরোধিতার নিবারণ না করিলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাহার একমাত্র উপায় কো-অপারেশন (Co-operation) বা সমবায়। তাহার বিধানের প্রত্যেক ব্যক্তিই একাধারে শ্রমজীবী ও নিয়োগকর্তা, মজুর ও মহাধন, উত্তম ও অধম, ক্রেতা ও বিক্রেতা হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার বড় বড় কারবার বড় বড় ক্যান্ট্রী বড় বড় নগর হইতে না থাকিতে পারে। কিন্তু মানব সভ্যতার ঐক্য, সুবিচার এবং যথার্থ স্বার্থ উপলব্ধ হইতে থাকিবে।

রাসেলের এই মত আর্থল্যাণ্ডের ভাবুক মহলে সুপ্রচলিত। ডাব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলিতেছেন—

"I will have no dealings with the Civic Exhibition, which is merely an attempt of the sweaters and slum-landlords to whitewash themselves and put off the evil (to them) day of having to pay decent

wages and rebuild the foul slums of Dublin."

চরমপন্থী চিন্তাবীরগণ নগরজীবন-বিষয়ক প্রশ্ননীতি এই দোষে দোষিতেন। ইংরেজের দরদ ঠাণ্ডারাই বুঝেন। বাহিরের লোক গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে অসমর্থ। ইংরেজের বিশ্বাস—“ধনী মহাধনেরা এইরূপ প্রশ্ননীয় সমুদ্রান পূর্ণক জনগণকে ‘হাত’ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রমজীবী-দিগকে নানা উপায়ে বৃদ্ধান হইতেছে যে তাহাদের স্বপ্ন ও স্বাধাধিধানের লক্ষ্য ক্যান্ট্রীর মালিকেরা উত্তীর্ণ পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই-রূপে কিছুকাল পর্যন্ত আন্দোলন চালাইলে মজুরেরা বেতন বৃদ্ধির বহুগুণ সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কর্তারাও বাঁচিয়া যাইবেন। গতবৎসর ডাব্লিনের শ্রমজীবীরা বিরাট বর্ষ-খট করিয়াছিল। আবার সেইরূপ বর্ষখটের আয়োজন হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা প্রথম হইতেই চাপিয়া দিবার জন্য শ্রমজীবী-“বন্ধু” মহাধনেরা Civic Exhibition এর ব্যবস্থা করিয়াছেন।”

রাসেল বলেন,—“এ ঔষধে ব্যাধির প্রতীকার হইবে না।” ইনি প্রায়ই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বর্তমান ভারতের চিন্তাশীল লোকেরা ক্যান্ট্রী-বিজ্ঞানে মুগ্ধ হইতেছেন না দেখিয়া ইনি সন্তুষ্ট। সমবায়-নীতি-প্রবর্তিত সমাজগঠন এবং পল্লী-বরাজের দৃষ্টান্ত ইনি ভারতবর্ষ হইতে দিয়া থাকেন।

এই সময়ে বর্তমান ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালী দৃষ্টে ইহার মতও উল্লেখযোগ্য। ইহার মতে ভারতবর্ষে ইংরাজী সাহিত্য শিখাইবার প্রয়োজন নাই। “ইংরাজী-সাহিত্যে অন্ধকার এক ধনীকৃত রহিয়াছে যে তাহা হইতে

আমরা আনন্দ হয় না। এমন কি ভাবুক ওয়াডসওয়ার্থকেও হিন্দু অধ্যাত্মবাহীরা নাস্তিক মনে করিবেন না কি? বোধ হয় আমেরিকার এমার্সনেকে ভারতবাসীরা অজ্ঞাতিবৃত্ত করিয়া লইতে পারেন। ইংরাজী-সাহিত্যে ভারতবাসীর শিকড়ীয় বস্তু নাই।”

আমরা এখানে একটা কথা বলিতে চাই। যতদিন পরাধীনভাবে পরকীয় আদর্শ অঙ্গ-করণ করা হয় ততদিনই বিদেশীয় সাহিত্যের কৃষ্ণল হইতে আশঙ্কা থাকে। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুপ ভারতবর্ষে আসি যাহে। এক্ষণে উচ্চ অশ্বেরই হউক বা মধ্যম শ্রেণীরই হউক, জুনিয়ার চিন্তাসম্পদ হইতে নব নব উপকরণ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আমাদের জন্মিয়াছে। তাহার দ্বারা আমরা পরকীয়ভাবাপন্ন হইতেছি না, বরং স্বকীয় অভাবানুসারে স্বকীয় আদর্শেই জীবন গঠনের সুযোগ পাইতেছি। ইহার নাম assimilation বা হজম করা। এজন্য বিদেশীয় আদর্শের সম্মুখীন হইতে আমাদের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। জগতের কোন চিন্তাই বরকট করিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করিতেছি না। বরং বিশ্বকির সকল প্রকার অভিব্যক্তির সঙ্গে ভারতবাসী সুব্যবস্থি করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

রাসেলের একটা ভারতভক্ত হইবার কারণ আছে। ইনি বাল্যকাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্য ও ধর্মে অহরাসি। ইনি সংস্কৃত জানেন না—অথচ হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, তত্ত্ব, ব্যাকরণ, বৈকল্প-সাহিত্য ও উপনিষদের আলোচনার বহু সময় কাটাইয়াছেন। এই উপায়ে ইহার জীবনের আদর্শ অনেকটা হিন্দু আব্বাওরায় পড়িয়া উঠিয়াছে। এমন কি যোগশাস্ত্রের মর্মও ইনি কথকিৎ

উপলব্ধি করিয়াছেন। ইনি বলেন “আমি উপযুক্ত গুরুভাজ্য করি নাই—এজন্য হেনী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু হিন্দু অধ্যাত্মতত্ত্ব যে লোকজনকে প্রভাবিত করিবার কল নয় তাহা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি।” ইহার বিশ্বাস—“হিন্দু বোধী জগৎ একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগতের নিগূঢ় বিষয়ে তাঁহাদের বর্ণনা জান ছিল।”

ইনি আর্যুর্গেনেও বিশ্বাসবান। ইহার উৎসাহে কোন কোন আইরিশ চিকিৎসক এবিষয়ে অঙ্গসন্ধান করিতে ত্রুটি হইয়াছেন। ইনি স্বয়ং তত্ত্বগতের সম্বন্ধে বৃত্তিতে ভেট করিতেছেন। বর্ণমালার অক্ষর সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে যে গুঢ় ব্যাখ্যা আছে তাহাও ইনি বিশ্বাস করেন। দেববৈবর্ণের বর্ণ বিষয়েও ইনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বৃত্তিতে যত্ন লইয়া থাকেন।

রাসেলের বিবেচনায় হিন্দুসমাজ ও সাহিত্যের কোন বিভাগই নিত্য উপেক্ষণীয় বস্তু নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিল্প-বিপ্লবের সুপেও শক্তির আবিস্কার আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের আবিষ্কারগুলি যথা বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে বৃত্তিবার জন্য অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

নব্য আয়র্ল্যান্ডের অন্ত্যস্ত ভাবুকপণের মত ইনি জাতীয় বীরগণা লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই। ইহার আলোচ্য বিষয় অন্য ধরনের। ইনি বিশ্বের নিগূঢ় সত্য বিশ্লেষণে তৎপর। আইরিশ চিন্তার আধ্যাত্মিকতা কোন্ আকারে দেখা দিয়াছে রাসেলের কাব্য পাঠ করিলে তাহা বৃত্তিতে পারা যায়। আবার আয়র্ল্যান্ডের পক্ষেই আশোলনকে ইনি কোন্ পথে চালিত করিতে চাহেন

ভাষাও বুঝিতে পারি। ইহাকে এই চিনাবে আয়ল্যাণ্ডের "বাণী-মুষ্টি" বিবেচনা করা যাইতে পারে। রাসেল তাঁহার "Ireland" নামক গ্রন্থে আইরিশ জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচার করিয়াছেন :—

"We live in the invisible world. If I rightly understand our mission and our destiny, it is this To restore to other men the sense of that invisible ; that world of our immortality; as of old our race went forth carrying the Galilian Evangel. We shall first learn and then teach that not with wealth can the soul of man be satisfied ; that our enduring interest is not here, but there, in the unseen, the hidden, the immortal, for whose purposes exist all the visible beauties of the world. If this be our mission and our purpose, well may our fair mysterious land deserve her name : *Inis Tail*, the Isle of Destiny."

ইহা যে নব্য ভারতেরও বাণী ! ভারত-পিত্ত কবির আইরিশ জাতীয়তার হিন্দু আদর্শই প্রচার করিতেছেন। ভারতমাতাই ইউরোপীয় নব্য কেন্দ্রিক আন্দোলনের এবং আইরিশ ভাবুকতার মূলমন্ত্র ভোগাইয়াছেন যেহেতু।

রাসেল স্বয়ং চিত্রশিল্পী। নব্য আয়ল্যাণ্ডে চিত্রকর বেশী নাই। রাসেল বলেন "হরিত দেশে চিত্রশিল্পী বেশী থাকিতে পারে না।" ইহার চিত্রকলায় প্রকৃতি এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব

প্রধান স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক চিত্রেই একটা নিবিড়তা মাপান যোগ্য হয়। ইনি নীলবর্ণ বিশেষ পছন্দ করেন। কতকগুলি চিত্র সংক্ষেপে ইনি কোন বর্ণকে বলিয়াছিলেন—"এই মৃষ্টিগুলি আমি খানে লাভ করিয়াছি ইহাদের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা বহু সময় লাগিবে। এ সকল চিত্র আমি কল্পনাও পাই নাই। যোগে বসিয়া এই সকল দৃষ্টের সাক্ষাৎ করিয়াছি। যোগের এই সমুদ্র উপলব্ধি করেন নাই জাগ্রদিগকে বৃত্তান করিনি।" এই কথায় হিন্দু "শিষ্ট-শাস্ত্রের" নিয়মাবলী মনে পড়ে না কি ?

বিশ্বাভী রাষ্ট্র আনুগত্য জনগণের না বাপ অঙ্গণ হইতেছে। পূর্বে *Laisser Faire* নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধারণের স্বাধীন প্রয়াস বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রিত করা হইত না। লোকেরা যেহেতু শিল্প, শিক্ষা, কৃষিকর্ম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে শক্তি নিয়োগ করিত। কিন্তু Socialism-এর প্রভাবে এক্ষণে সকল বিভাগে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইতে চলিয়াছে।

রাসেল বলেন "শিল্প ও যুবকসমাজ সবচেয়ে এই নীতি প্রযোজ্য। গ্রামীণ দেশ সবচেয়ে ইহা ঝাটে না।"

এই নুতন রাষ্ট্রনীতি আয়ল্যাণ্ডেও প্রযুক্তি হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার কৃষি-সমবায় আন্দোলনকে সরকারের আয়ত্ত করিবার প্রকৃতি দেখা যাইতেছে। রাসেলের মতে, "স্বাধীনভাবে কর্ম করিবার সুযোগ না পাইলে সমবায়ের আন্দোলনে কোন উপকার হইবে না। ট্রেড পরিচালিত কো-অপারেটিভ-সমিতি জনগণের সর্বনাশের উপায়। "সমবায়" শব্দের ভিত্তর কোন মধু নাই। কি প্রাণালীতে, কি উদ্দেশ্যে, কাহার

পরিচালনায় সমবায়-অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হই-  
তেছে তাহা না দেখিলে এই আন্দোলনের  
স্বার্থ মূলা বুঝা যায় না।”

বঙ্গদেশে আন্দোলনের সমবায় আন্দোলনে  
ইটের হস্তক্ষেপ নিবারণ করিতে ধারপর  
নাই চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের “সমবায়  
পন্থী” কর্ণওয়াল্ডার Co-operation and  
Nationality নামক পুস্তিকায় বহু শিক্ষাপ্রদ  
কথার আলোচনা পাইবেন। সরকার-  
নিযুক্ত কো-অপারেশনের চিত্র বঙ্গদেশের  
ঐ পুস্তিকা হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

“As it is difficult just at present  
to lay hold of urban industries  
and urban life, the spread of agri-  
cultural co-operation has seemed to  
our Irish Mandarins ( the state )  
the very thing to begin on. Here  
were associations that could be  
disciplined so as to yield mandar-  
ins and inspectors the exquisite  
sensation of being rulers. They

could be bribed into the fold by  
loans, subsidies, certificates and  
official smiles. . . . The  
greater the movement grew the  
greater became the anxiety of the  
Mandarins to control it. . . .  
The desire of the Mandarins for  
control, this itch for overlordship  
over everything which beset the  
new school of bureacrats, is the  
greatest danger before us in our  
path to the co-operative common-  
wealth. . . . If the  
state is allowed by Irishmen to take  
control of this work, all the fire in  
it will die out. A state department  
is sterilised of all beauty of thought.  
Whoever enters the service of the  
state has to keep his heart under  
lock and key.”

## স্ব-ধর্ম

“জৈয়ান স্বধর্মো বিগুণো। পরধর্মো অহুষ্টিভাৎ ।  
স্বধর্মে নিধনং জৈয়ঃ পরধর্মে ভয়াবহঃ ।”

ঈশ্বার শ্রীভগবান বলিয়াছেন পরধর্ম সমাকৃ  
অহুষ্টিত হইলেও দোষবৃত্ত স্বধর্ম প্রতিপালন  
সর্বতোভাবে কর্তব্য। এমন কি সেই স্বধর্ম  
প্রতিপালনে যদি জীবনাশও হয় তাহাও  
প্রার্থনীয়। পরধর্ম অন্যতর ভয়ের আকর।  
ভগবৎ উপদেশ পড়িয়া মনে হয় যে, জীবের  
স্বধর্ম অবশ্য প্রতিপালনীয় এবং তাহা পালন

না করিলে মহা প্রত্যাবার হয়। সেই ধর্ম  
প্রতিপালন করিতে যদি সর্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান  
না হয় তাহাতেও বিশেষ লাভ ভিন্ন কতির  
সম্ভাবনা নাই।

স্বধর্ম বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি  
তাহা ঠিক নহে। কেহ কেহ স্বধর্ম অর্থে  
সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহারের ব্যাখ্যা  
করেন। তাহা একদেশদেপীত-গোবে দুষ্ট  
বলিয়া মনে হয়। স্বধর্ম প্রতিপালন অর্থে

হিন্দুর হিন্দুধর্ম, মুসলমানের ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট-ধর্ম পালন ইত্যাদি বুঝাইলে প্রকৃত স্বধর্ম পালনের ব্যাপার হইল না। মূলতঃ স্বধর্ম অর্থে সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহারের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা এবং যজ্ঞ দেহের উৎকর্ষ বুঝায়। জড় দেহে আনন্দ লক্ষ্য থাকে না। বস্তুতঃ বৃত্তিতে গেলে জীবের জড় দেহের উৎকর্ষ ও সম্যক প্রয়োজন। স্বধর্ম—স্ব+ধৃ—মন্ অর্থাৎ জীবকে বাহ্য ধারণ করে, বাহ্য জীবের একমাত্র জীবন উপায় এবং বাহ্য না হইলে জীবের জীবন্ত পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং পরিণামে পরম অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। স্বধর্ম বলিতে জীবের সর্গাঙ্গী উৎকর্ষ বুঝায় কেবলমাত্র অভ্যাসিকভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না।

প্রধানতঃ জীবকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। (১) জীবের শরীরভাগ অর্থাৎ পক-ভৌতিক দেহ, (২) বৃত্তিভাগ অর্থাৎ যের মমতা ভালবাসা দয়া সেবা ঘেব হিংসা কাম ক্রোধ ইত্যাদি এবং (৩) মনোবিভাগ অর্থাৎ চিন্তা ধ্যান ধারণা ইত্যাদি। এখন দেখা যাক জীবের স্বধর্ম বলিলে প্রকৃত কি বুঝা যায়। জীব যে যে ধর্ম প্রতিপালন করিলে তাহার সমস্ত বৃত্তির (মূল স্বস্থ ও জড়) উৎকর্ষ হয় তাহাই তাহার মনস্ত-প্রতিপালনীয় এবং শ্রীভগবান জীবকে স্বধর্ম-প্রতিপালনে প্রেরণা দিবার অন্ত সেই সার্বভৌম চরম উৎকর্ষ পথে দাঁড়িতে আদেশ করিয়াছেন। এবং সেই অন্তই গীতার অর্জুনকে ধোয়াজয়ের (কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি) উপদেশ দিয়াও যুদ্ধের অন্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

“সহজং কর্ম কৌন্তেয় সত্যোযমপি ন তাজেৎ ।  
সর্গায়ত্বাহি দোষেন ধূমেনাপি নিবাবৃত্তাঃ”

হে কৌন্তেয়, সহজ কর্ম (বর্ণাশ্রমের বর্ণগত

জীবের দ্বারা কর্তব্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ইত্যাদি) মোলমূল হইলেও তাচা ত্যাগ করিবে না যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি নিত্য বস্তুতঃ প্রকাশ হইলেও পূর্ণে ধূমাক্ত থাকে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্মাহুযাণী কোন কর্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিণামে সেই কর্মই পরম সুখের নিয়ানীকৃত হয় তাহাই এই শ্লোকে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন।

জীবের যেমন বৃত্তি বিশেষে বিভাগ আছে আবার তেমনি কর্মের সহিত সম্বন্ধ আছে। জীবকে কেন্দ্র করিয়া ‘জড় সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপার্ড লইয়া একটা বৃত্ত অঙ্কিত করিলে সেই গতির মধ্যে জীবের জড় সম্বন্ধীয় সমস্ত আশিষা পড়ে, আবার সেই কেন্দ্র হইতে অন্তর্জড় বৃত্তিগুলিকে ব্যাপার্ড লইয়া আর একটা বৃত্ত টানিলে সেই গতির মধ্যে জীবের দাবতীর্থ সকাম বৃত্তিগুলি আশিষা পড়ে এবং পুনরাহ সেই কেন্দ্র হইতে মনোবাহ্যের চিন্তাতীত বিবর্তনিককে ব্যাপার্ড লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে জীবের আধ্যাত্মিক জগতের সমস্তটুকু সেই বৃত্তের মধ্যে আশিষা পড়িল। ফলতঃ জীব কেন্দ্র হইতে জড় ও চৈতন্তের আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জীব তত্ত্বজন্য জগৎ ও তাহার অহঙ্কৃতি। জীবের জীবনের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয়। সেই অন্ত জীবের অন্ত জগৎ এবং জগতের অন্ত জীব। জীব ও জগৎ অনন্তসাপেক্ষ। বাহ্য কিছু উৎকর্ষ অবস্ত সাধনীয় তাহা জীবকে লইয়া অর্থাৎ জীব সমস্ত বৃত্তির সমষ্টিমাত্র। দেহ বহির্জাত আলোফ যেমন আমরা ধারণা করিতে পারি না; বস্তুতঃ জীবের সমস্ত জড় ও বৃত্তি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন “হে অর্জুন, তুমি স্বধর্ম নিরত হও এবং স্বধর্ম চরম উৎকর্ষ

প্রাপ্ত হইলে তুমি চরমে যোক্ষ যোগ প্রাপ্ত হইবে।" গুণীর পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্যক্ অগ্রহীত হইলে চরমে নির্জ্ঞান মুক্তি প্রদান করে ইচ্ছাই উপবৎ থাকার উদ্দেশ্য।

দুঃস্থ হইতে অহংসেয় ক্রিয়াবশে তত্ত্ব-নীচেরে একত্র সমবায়ে জীবের সৃষ্টি চইল। জীবের গঠনে যেমন দুঃস্থ হইতে ক্রমশঃ স্থূল-তত্ত্বের আবৃত্তক হইয়াছে তেমনই আবার তাহার সর্জ্যকোণ উন্নতির আবৃত্তক হইলে তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্যক্ পরিপূর্ণ হওয়া চাইই চাই। জীব দেহ আশ্রয় করিয়া কণ্ড করে। দেহ দৃষ্ট হইয়া দুঃস্থ পরীয়ে সে দুঃস্থ তত্ত্বে মিশিয়া থাকিতে পারে কিন্তু সে কর্তব্যগতের কোন কাণ্ডেই আসে না। কণ্ড মেধের গুণ, দেহ না থাকিলে স্থূলতঃ কণ্ড হইতে পারে না। স্থূল জীবের উৎকর্ষসাধন একান্ত আবৃত্তক। এমন কার্য্য করিতে হইবে বাহ্যতে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্মের সম্যক্ উন্নতি-সাধন হয়। হৃতরাং স্থূলদেহ কখনই উপেক্ষ-নীয় নহে। জড়ের পোষণ ও জড়কে বিশ্লেষণ হইতে রক্ষা করার নাম পরীরপোষণ। যে বস্তু লইয়া আমাদের কার্য্য চলিবে সেই বস্তু কাব্যাকরী না থাকিলে কোন কণ্ডই স্থূল হইতে পারে না। সেই জন্তই কবি বলিয়াছেন—

"পরীরমাণ ধলুধর্ম সাধনঃ"

অর্থাৎ পরীর রক্ষাই একমাত্র ধর্মসাধন।

পুনশ্চ "আত্মান্য সত্তত্ত্ব রক্ষ্যে ধর্মৈরপি

হাটৈরপি"

অর্থাৎ আত্ম রক্ষা করিতে হইলে যদি ধন ও দাত্য পর্য্যন্ত বলি দিতে চয় তাহাও করিতে চটবে হৃতরাং পরীর রক্ষা একান্ত করণীয়।

ধর্মের প্রধান অর্থ মন স্থিরীকরণ। দেহ যদি বিকল থাকে তবে মনও আধিতোক্তিক

তাপে বিচলিত হইবে হৃতরাং দেহ ও মন মিত্য স্থলবৎ ও অনন্তলাপেক্ষ একের বিকৃতিতে অপরের বিকার অবশ্যজাতী। দেহ রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া "পালোয়নী" করিতে হইবে একথাও আমি বলিতেছি না, তবে দেহকে কাব্যিকম ও ঐশ্ব্যাতপ মনশীল রাখিয়া বাহ্যতে মোহাতীত সচ্চিদানন্দ বস্তুর উৎকর্ষসাধনে অতীশ্রবণ পরিচিন্তনের বিষয় ও অন্তরার না হয় তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার জড়বস্তুর অথবা প্রাণাশ্রয় করিলে মন চকল ও ইচ্ছাত্তঃ বিকল্প হয় এবং ইষ্টসাধনের অন্তরায় ঘটায়। পাশ্বে ইঞ্জির মনন করিতে বলিয়াছেন ও তদ্বারা ঐতিগবানের সেবা করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার নাম করিবার জন্ত কোন উপদেশই গ্রহীত হয় নাই। ইঞ্জির যদি আমাদের দরকার না হইত তাহা হইলে আমাদের পক্ষ মঙ্গলময় ঐতিগবান নিচ্ছই আমাদেরকে ইঞ্জিগ্রাসি দিতেন না।

"হৃদিতেন হৃদিকেন্দ্র পূর্ণং তত্ত্বিকৃতম্"

অর্থাৎ ইঞ্জিরের দ্বারা ইঞ্জিগ্রাসিত ঐতিগ-বানের পূর্ণাই একমাত্র উত্তম তত্ত্ব। অতএব ইঞ্জিরের বিশেষ প্রয়োজন। যে চক্ৰ ভগবৎ সৃষ্টিকোণল দর্শনে বিমূখ সে চক্ৰ চক্ৰই নহে—দুর্গা গজুর মাত্র। যে কর্ণ ভগবান ভগবীর্জন প্রবণে বিরত সে কর্ণ কর্ণই নহে কেবল দুর্গা পাণ-কূপ মাত্র। যে বস্তু ঐতিগ-বানের সেবাশ্রয় নহে সে বস্তু বস্তুই নহে দুর্গা দণ্ডবস্ত্র। যে পদ পদম তত্ত্বিসমন সাধু মঠাঙ্গনদিগের অঙ্গুদরণে বিরত তাহা পাণ দেহ ধারণের তত্ত্ব মাত্র। মাহুরের বধর্ম মাহুরের কার্য্য করা, জীবদেবাদ আত্মবিশুদ্ধি করা, মন্ত্রস্তোত্র জীবের বৃত্তির অঙ্গকরণ নহে।

আহার নিশ্রা ভয় ও মৈথুন পশু ও মাছবের  
জড়বেহের বাস্তবিক গুণ।

“আহার নিশ্রা ভয় মৈথুনক

সামান্যমেতৎ পশুভিন্দবাণ্য।

জ্ঞান নবাণ্যঃ অধিবিবেশ

জ্ঞানেন হীন পশুভিঃ সমান।”

কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মাছবের জ্ঞান আছে  
বলিয়াই বিশেষত্ব। সেই জ্ঞান না থাকিলে  
মাছ ও পশুতে পার্থক্য কি ?

“জ্ঞানমতি সমস্তপুত্র জ্ঞাত্যবিবর পোচরে।

বিবরেষু মহাভাগ ব্যতি চৈব পৃথক্ পৃথক্।”

প্রাণীজগতের বিবয়জ্ঞান আছে এবং সেই  
জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে  
প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রাণীনির্জিগেনে  
বিবয়গোচর জ্ঞান থাকিলেও মহত্বের শ্রেষ্ঠত্ব  
সম্পাদক জ্ঞান সামান্য বিবয়গত জ্ঞানের  
অতীত শুদ্ধ-নির্দল-ঐশী জ্ঞান।

দুল মানবের আবরণ ভেদ করিয়া গভীর-  
ভর তথ্যে প্রবেশ করিলে আমরা দেখিতে  
পাই যে জীব বলিয়া একটা অতি সুস্থ জিনিষ  
যাহা জড়ের অতীত হইলেও জড়বেহ দ্বারা  
প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয় ও নানা কার্য  
করে। এই জীবের উন্নতিও সমাক্ সাধনীয়।  
কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন যে, সেই জীবের  
উন্নতি বর্ণালম ধর্ম কণ্ঠের মধ্য দিয়া সাধন  
করিতে হইবে—জীব সেবা করিয়া—জীবের  
মধ্য দিয়া শিবস্বপাত করিয়া তাহাকে সাধন  
করিতে হইবে। পৃথীত বর্ণালম ধর্ম ভ্যাগ  
করিয়া উপায়ান্তরে উন্নতিসাধন করিতে গেলে  
পদে পদে বিস্ত্র ও অসন্তব বলিয়া এই কার্যেই  
মনে হয়। কণ্ঠ আবার জীবের মহাবন্ধন।  
কণ্ঠ ভ্যাগ না করিলে জীবের জ্যেঃ লাভ হয়  
না কিন্তু এই কণ্ঠ পরিহারের চুইটী উপায়  
আছে। এক—কণ্ঠ না করা, আর এক

কামনামুত্র হইয়া শ্রীভগবানকে কণ্ঠ ভ্যাগ  
করিয়া কণ্ঠ করা। নিকাম হওয়া জীবের  
অসন্তব কিন্তু একেবারে কণ্ঠ না করিলে জীব  
নিকাম কণ্ঠের পদবীতে পৌছিতে পারে না ;  
কণ্ঠ না করা নিষ্কণ্ঠ নহে।

“ন কণ্ঠনামনাবত্ত নৈ কণ্ঠ ইতি কথ্যতে”

একেবারে কণ্ঠ না করা কণ্ঠভ্যাগ নহে—  
কণ্ঠ করিয়া কণ্ঠকলে আকাক্ষা পরিত্যাগের  
নামই নৈকণ্ঠ। “মা কলেষু কলাচন” শ্রীভগ-  
বানের এই মহা উপদেশ ভিত্তির উপর যে  
কণ্ঠ ভাণ্ডিত সে কণ্ঠের ফল আর জীবমুখী  
হয় না। কণ্ঠকল সমস্ত শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া  
সমাহিত চিত্তে জীব ও ব্রহ্ম সেবাপরায়ণ  
হওয়ার নাম নৈকণ্ঠ। নিকাম কণ্ঠ সযত্নে  
বর্ণিতবেব বলিগাছেন,—

“বদবৎ কণ্ঠ প্রেক্ষাকীত তদব্রহ্মঃ সমপরেৎ”  
যাহা যাহা করিবে তাহা সমস্তই সেই পরব্র-  
হ্মে অর্পণ করিবে।

তপ, শৌচ, কমা, বজ্র, সত্যনিষ্ঠা, স্মৃ,  
দম, নির্লোভতা, তেজ, বীরা, শৌবা,  
সান্তিকতা, আহার, বিহার ও সেবা প্রভৃতি  
যাহা বর্ণালম ধর্মের অবশ্য অতিপালনীয়  
কণ্ঠ বলিয়া কীর্তিত আছে তাহাই বর্ণাহুগত  
বিভিন্ন বর্ণের অবশ্য প্রতিপালনীয় এবং  
সেই ধর্ম রক্ষা করিলে যে চরমে পরমগতি  
লাভ হয় তাহাতে আর কোনই সন্দেহ  
নাই।

“কাচ পশা” জীবের পথ কি ?

অর্থাৎ জীব কোন্ পথ অবলম্বন করিলে  
চরমে পরমগতি লাভ করিতে পারে ?  
প্রচ্ছন্নবেশে বকরূপী ধর্ম বুদ্ধিগুরুকে এই প্রশ্ন  
করিয়াছিলেন। ধর্মরাজ তত্ত্বতরে বলিয়া-  
ছিলেন, পিতৃ পিতামহ মহাজনেরা যে পথে  
বিচরণ করিয়া ভগবৎ রূপা লাভ পূর্বক

কৃত্যৰ্হ ইহাচ্ছেন তাহাই প্রাপ্ত ও প্রকৃষ্ট পৰা  
ও তাহাই লক্ষ্যভাৱে লক্ষণেৰ আশ্রয়ণ।  
“যে নম্য পিতৰো যাতা যেন যাত। পিতামহা”  
ইত্যাদি শাস্ত্রবচনে পিতা পিতামহ প্রবৰ্ণিত  
বৰ্ণাশ্রমেৰ একমাত্র পথ ইহাই নির্দেশ  
কৰিতেছে। হৃতৰাৎ স্বৰ্গে বিচরণশীল  
মহুযোৰ পক্ষে বৰ্ণাশ্রম স্বৰ্গেৰ দ্বাৰ দিগ্ৰাই  
ভগবানে পৌছিতে হইবে।

এখন দেখা যাক্ জীবেৰ কিসেই বা  
উন্নতি হয় এবং কোন্ পদবীতে পৌছিলেই বা  
জীব উন্নতি লাভ কৰে। জীব সাধাৰণতঃ  
বাল্য। দ্বাৰা পরিচালিত অতএব জীবকে  
প্রথমতঃ সৰ্বম কৰ্মৰূপ আৰোগ্যদেয় অবলম্বন  
কৰিবা নিকান কৰ্মৰাজ্যে পৌছিতে হইবে।  
জীব কামনা বৰ্জনে কৰ্মকৰ না হইলে পরম  
ব্রহ্মে জীন হইতে পারে না এবং যে পৰ্যন্ত  
পৰমাত্মা জীন না হয় সে পৰ্যন্ত জীবকে দেহোক্ত  
বুদ্ধি বা অবিদ্যা। ঘোর নষ্ট কৰিতে হইবে  
ধান ধারণা ধন নিয়মাদিৰ উপায় অবলম্বনে  
ইট পথে আত্ম সমৰ্পণ কৰিতে হইবে। ইট-  
কুপা না হইলে এ ভবেৰ বীধন কাটে না।  
আবার সেই ইটকুপা একমাত্র শুদ্ধকুপা  
সাপেক্ষ—তাহাও স্বতঃসিদ্ধ সজ্জিমানন্দ পরম-  
ব্রহ্মেৰ সাধিধ্য-লাভ বে জীবেৰ একমাত্র  
আশ্রয়ণ তাহাও ক্রটি বলিরাছেন “নাশ্ৰপত্যা  
বিদ্যাতে অয়ন্য” অৰ্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত জীবেৰ  
আৰ অন্ত গুতি নাই। হৃতৰাৎ জীবেৰ ইহাই  
একমাত্র লক্ষ্য।

জীব কি চায় ?

জীব চায় কৈবল্য অৰ্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন  
আনন্দ। এই ত্ৰিতাপ আলাহ প্রীড়িত  
সম্ভাৰ জীব বে আনন্দময় ব্রহ্মেৰ “আনন্দং  
ব্রহ্মং বিদ্যা” অৰ্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র আনন্দ-  
বৰ্ণ আশ্রয়লাভে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপ-

ভোগ কৰিতে সক্ষম তাহাও শাস্ত্ৰে উপদেশ  
কৰিরাছেন। “আনন্দেন শৰ্মমানি কৃত্তানি  
জাযন্তে যেন জাতানি জীবন্তি” ইত্যাদি আনন্দ  
হইতেই এত বিশ্বচরাচৰেৰ সৃষ্টি ইহাছে এবং  
আনন্দেই বাঁচিবা আছে। শ্ৰীভগবানই যে  
আনন্দবৰ্ণ তাহা ক্রটি উচ্চকৰ্ত্তে ঘোষণা  
কৰিরাছেন। দ্বাৰা কৰিলে জীবেৰ সেই  
নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ লাভ হয় এবং দ্বাৰা  
পাইলে আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়  
না, এই বে অপূৰ্ণ নিবৃত্ত অংশ। মনেও দ্বাৰণা  
করা যায় না সেই নিত্যানন্দময় চিৰ ভাসমান  
ধাকিলে জীবেৰ আর কিছুই বাকী থাকে না  
সে অবস্থা পৌছিলে তাহাৰ আর জীবেৰ  
পৃথক্ পত্না থাকে না এবং তখনকাৰ তৎবস্থা  
ও নিজেৰ অবস্থাও প্রকাশ কৰিবাৰ ক্ষমতা  
থাকে না। তাই তাহাকে অব্যক্ত এই নামে  
অভিহিত করা হইয়াছে।

“যতোযাতো নিবৰ্ত্তন্তে অপ্রাণ্য মনসাদহ”

সেই অব্যক্তমানসগোচর মহাজীবেৰ  
ভাবসাপৰে ভূষিতে পারিলে জীবেৰ চরম  
উন্নতি লাভ হইল। তাই ভক্তবীর কবীর  
পাৰিরাছিলেন।

‘ভালাভেই চরিতবিরেই শিরকেসেই বালাই  
আব দ্বাৰা পৌছায় মায় ইসিকো কলহ না  
দায়।’

অৰ্থাৎ হরি ভুলিরাছি ভালই কৰিরাছি  
মায়াৰ বালাই কৰিরাছি এখন দেখানে  
পৌছিরাছি তাহাৰ তাহা ব্যক্ত করা যায় না।  
এই অবস্থাকে লক্ষ্য কৰিবা সাধক ব্রাহ্মসদা  
পাৰিরাছেন—

নেটা চাতরে কি ভাববো হাঁড়ি

বোঝরে মন চারে চোরে।

ব্রহ্মচাৰী শ্ৰেবব্রত



# আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ-তত্ত্ব-প্রবেশিকা

## প্রথম প্রদর্শন

### উদ্ভিদের কোষ পরীক্ষা

সজীব পদার্থের বৈহিক কণা বহুসংখ্যক কোষের সমষ্টিমাত্র। এক একটি পৃথক কোষ ক্ষুদ্রতম প্রাণাধার। এতদপ কোষ সজীব পদার্থ নাই বাহা একটি কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে পারে। বহুকোষ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ বা জন্তুর বৈহিক ক্রিয়াকলাপ বেহোপকরণ কোষ-বাহির সাড়ামাত্র। উদ্ভিদ-কোষ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার সমূহ অবধান করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমরা ক্ষুদ্রাণুগতের আশ্রয় গ্রহণ করিব। অণুবীক্ষণসংযোগে পর্যবেক্ষণ করিলে দৃষ্ট হয় প্রত্যেক কোষের সীমা প্রাচীর নিবন্ধ। প্রাচীর অতি স্থূল ত্রিভুজবিন্দিত। ক্রিমির মধ্যগত সরেণ্ড অর্ধতরল পদার্থের নাম প্রোপল্য। ইহাই ক্রিযাশীল। আচাঞ্চ হ্যাম্পলি ইহাকে প্রাণবিকালের ত্রিভুজবিন্দিত বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র পত্র প্রাধানতঃ তিন শ্রেণীর কোষ দৃষ্টিপোচর হইয়া থাকে; (১) পত্র পরিধিহ কোষ; (২) পত্রভাগস্থ কোষ; ও (৩) পত্রমেরু কোষ।

প্রাণপক কতিপয় পদার্থের সমাবেশ: (১) তরল অর্ধতরল পদার্থ। ইহার নাম সাইটোপ্লাজম। ইহা দেখিতে ভিষবস্তুর যেতাৎপের দ্রাব। কোষমধ্যে এই পদার্থ সমভাবে বিস্তৃত নয়। স্থানে স্থানে পুস্তময় অংশ সমূহের উৎপত্তি হেতু ইহা জালের দ্রাব অবয়ব বিশিষ্ট হয়।

(২) হরিৎপিণ্ড।—ইহার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছড়ান, রেখাকাণ্ডলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিথাকার থানাবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাদের

পর্জপ্রবেশ পত্রহরিৎ নামক ভুক্তিতে পরি-পূরিত। ইহা ইহেই উদ্ভিদের পত্র হরিৎ-বর্ণে রঞ্জিত হয়। পিণ্ড সমুদ্র বিশেষরূপ জ্যেষ্ঠবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে না। এলোমেলো ভাবে অবস্থিত কোষের অংশ বিশেষে ইহার ঘনসঞ্চিত; স্থানান্তরে অত্যধ ঘন সংবদ্ধ। ইহার সকলেই সনায়তন নহে। একটি পত্রকে ক্রিয়াক্ষণ জলে সিদ্ধকরতঃ হারিগ্রহর পর্যন্ত ডালকোহলে নিমজ্জিতাবস্থায় রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পিণ্ডাঙ্গত হরিৎ পদার্থ সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ডালকোহলের সহিত ইহার রাসায়নিক সংঘর্ষন ঘটয়াছে। অণুবীক্ষণ সংযোগে দৃষ্ট হইবে পত্র-হরিতের আধারতীর কোনই বিকৃতি ঘটে নাই।

(৩) কোষকেন্দ্র,—সাইটোপ্লাজমের স্থান বিশেষে জালময় অংশ বিশিষ্ট একটি গোলাকার স্থান লক্ষিত হয়, ইহার ঘনত্ব কোষের অন্ত্যন্ত্রাংশ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহার আয়তন হরিৎ-পিণ্ডের আয়তনাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার মধ্যদেশে স্থূল সূত্রবৎ পদার্থে পূর্ণ। ইহা রজনসূত্র নামে পরিচিত। সূত্রাঙ্গত অবকাশ-সমূহে কেন্দ্রপক নামধের অর্ধ তরল পদার্থ দৃষ্টিপোচর হয়। অতিপর স্থূল ত্রিভুজাকার কোষকেন্দ্র সীমাবদ্ধ।

সমগ্র কোষের স্থানে স্থানে কতিপয় সংখ্যক অথবা মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অবকাশময় স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুতঃ ইহাদিগকে চন্দ্র-কলবৎ পুস্তগত বলিয়া বোধ হয়।

অবিকার্য অবকাশই কোষরূপ নামক অলৌপদার্থে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অথবা বস্তু পরিধিবিধি।

কোষসমূহ পরস্পরের গাত্র সংসার। কিন্তু দুইটি কোষের প্রাচীর পরস্পরকে সংযুক্ত করে। প্রাচীরঘরের মধ্যে অপর একটি ভূতীয়াবরণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাকে যথাপ্রাচীর নামে অভিহিত করা হইতে পারে। এই যথাপ্রাচীরের অবস্থান হেতু যে কোন কোষের প্রাণপদ পার্শ্ব কোষের প্রাণপদ হইতে তিনটি সমান্তরাল প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত।

উদ্যম প্রদান করিলে সাইটোপ্লাজমে প্রোট উপস্থিত হইয়া হরিৎ-পিণ্ডগুলিকে গতিমান করে। একটি ক্রিয়া বা অপর যে কোন পদক্ষেপে অঙ্গ ভিন্নাঙ্গিরা দ্বিগুণে কোষসমূহ রসসমাবেশে বর্ধিতায়তন হয়। এই ক্রিয়ার নাম টার্গি ও এই অবস্থায়ুক্ত কোষরাশি টার্গিড কোষ নামে পরিচিত। এক্ষণে যদি টার্গিড কোষসমূহকে তদন্তগত রস অপেক্ষা অধিকতর ঘনত্ববিধি তরল পদার্থে নিমজ্জিত করা যায় তাহা হইলে কোষগুলি সঙ্কুচিতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার নাম প্রাক্সোমিসিস। তিনির সরবৎ যোগে এই পরীক্ষা বিশেষ সুবিধাজনক।

প্রশ্ন :—

(১) কোষ-বিভাগ ও কোষের আকৃতি পরীক্ষণ।

(ক) ক্রিয়াপথে কত প্রকার আকৃতি বিধিই কোষ দেখিতে পাইতেছ ?  
বিভিন্ন প্রকারের কোষগুলির অবস্থান বর্ণনা কর।  
ইহাদের আকৃতির বিভিন্নতা সন্থে বাহ্য বিবেচনা কর লিখ।

কোষের অঙ্গ বিশিষ্ট।

(খ) হরিৎপিণ্ড।

(ক) ইহাদের আকার কিরূপ ?

(খ) ইহারা কি সরলরেখাক্রমে সন্নিবিষ্ট ?

(গ) সকলগুলিই সমআয়তন বিশিষ্ট ?

(ঘ) অলিঙ্গ পত্রকে গ্রাসকোষের মধ্যে রাখার পর পরীক্ষা করার বাহ্য উপলব্ধি করিলে কারণসহ বর্ণনা কর।

(আ) সাইটোপ্লাজম,—

(ক) ইহা কোষাত্মক কি ভাবে বিস্তৃত ?

ইহার বর্ণ কেমন ?

(ই) কোষ কেন্দ্র।

(ক) প্রাণপদের অস্ত্রাঙ্গাংশের সহিত ইহার ঘনত্ব তুলনা কর।

(খ) হরিৎপিণ্ডের সহিত ইহার আকৃতি ও আয়তন তুলনা কর।

(ই) অবকাশ।

(ক) তুমি যে কোষটিকে পরীক্ষা করিয়াছ তাহাতে কণী অবকাশ দেখিতে পাইয়াছ ?

\* এই প্রকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বিশেষ অবধানের বিষয়। শিক্ষার্থীর কার্যশীলতা এই প্রকল্পের উত্তর উপর নির্ভর করিবে। তাহার নিকট লিখন ও অঙ্কনশীলতা কামরাশিষ্ট একখানা খাতা থাকিবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষকের উদ্বুদ্ধতায় পরীক্ষা সাধন করিয়া ছাত্র, যথাযথভাবে প্রকল্পের উত্তর তাহার খাতার লিপিবদ্ধ করিবে। উত্তরে পদ্য 'ই' অথবা 'না' লিখিয়া বাহ্যে পরস্পর সন্থবিধিষ্ট সম্পূর্ণ ভাষণগুলি প্রকাশিত রত পত্রিকায় দৃষ্টি আনিতে শিক্ষার্থী সততই যত্নবান হইবে। পুস্তক-লিখিত পত্র ও তাহার বলিষ্ঠ উত্তর এই উত্তরই প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের পূর্ণতা বিবেচনা সাধনা করিবে।

- (খ) বৃহত্তম অবকানটিকে ক্ষুদ্রতম  
অবকান অপেক্ষা কতগুন বড়  
মনে ? কর ইহার আকৃতি ও  
অবস্থান বর্ণনা কর। ইটা সূত্রগত  
না বসন্তবৃত্ত ?  
কোষাবস্থান।
- (ক) কোষের পৰস্পরের সহিত  
কিভাবে অবস্থিত ?  
পার্শ্ব দুইটী কোষের প্রাণপঙ্কেত  
যথো কয়টী প্রাচীর ?
- (গ) পঞ্চমোক্ত।
- (ক) উত্তাপ প্রদানে বাহা দেখিতে  
পাইলে লিখ।
- (গ) সাজমলিসিস।
- (ক) পরীক্ষিত কোষের অবস্থানসহ  
সাজমলিসিস প্রক্রিয়াটী বর্ণনা  
কর।  
অন্তর।
- (ক) একটি অনিচ্ছাকৃত কোষের চিত্র  
প্রস্তুত কর ও তাহাতে সমস্ত  
অঙ্গেই টুয়েপ করিতে চেষ্টা  
কর।  
উত্তাপবশতঃ পরিবর্তিত একটি  
কোষ অঙ্কন করিও। তীরটিকে  
দ্বারা পঞ্চমোক্তের গতি নির্দেশ  
কর।

### দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

#### উত্তেজক বস্তুর সংস্পর্শে উদ্ভিদের

##### সাড় প্রদান

আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে উত্তাপ  
প্রদান করিলে প্রাণপঙ্কে ঘোত উৎপত্তি হয়,  
এবং উত্তাপের প্রাণবৃত্তির সহিত ঘোতেরও  
ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। ইহা প্রাণপঙ্কের  
সাড় প্রদান শক্তির বিশিষ্ট উদাহরণ। তাপ  
বাতীত আরও বহুবিধ উত্তেজক পদার্থের  
সংস্পর্শে প্রাণপঙ্ক সাড়াদান করিতে পারে।  
আলোক, তাড়িত, শৈত্য, ধারাবাহ্য, বাতাস,  
এবং অগ্নিত নানাজাতীয় উত্তেজক জাতব ও  
উদ্ভিদ উভয়বিধ প্রাণপঙ্কেই উত্তেজিত করে।  
এই সমস্ত উত্তেজক পদার্থ দ্বারা জীবসেহের  
নানা অংশে গতি উৎপাদন ও জীবের খাদ্য  
গ্রহণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, মলত্যাগ ইত্যাদি দৈনিক  
বিষয়ে পরিবর্তন আনিত হয়। এইজন্য  
পরিবর্তন পৃথক পৃথক কোষের যথো

অস্থাপন করা বাইতে পারে। দেহের  
পরিবর্তনই হউক, মূলে কিছু প্রাণপঙ্ক।  
বহুকোষাত্মক উদ্ভিদ বা জন্তর সাড়প্রদান  
কোষবাহিত প্রাণপঙ্কীয় পরিবর্তনের ফল।  
উদ্ভিদে উত্তেজনা পরীক্ষার লক্ষ্যবস্তী অতি উত্তম  
উদ্ভিদ। লক্ষ্যবস্তীর কোনও একটি পত্র  
হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে পত্রভাগদ্বয় যে পরস্পর  
সম্মুখীন হইয়া একজ বড় হয় তাহা সকলেই  
সুপরিচিত। উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শ  
মাত্রই জীবসেহ সাড় প্রদান করিতে পারে  
না। সাড় পাইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন।  
উত্তেজনা প্ররোগ ও সাড় প্রদান উভয়ের  
যথো যে সময় টুকুর ব্যবধান তাহার নাম  
‘অনুভূতিকাল’। সময় ও প্রমাণাবধি নির্মিত  
বর্তমান আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানচর্চা

শ্রীকৃষ্ণ দশদীপচন্দ্র বৎ প্রথম বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

“বাহিরের অবস্থানস্বারে এই অহুত্ব-কালের হ্রাণ বৃদ্ধি ঘটে। বৃদ্ধ আঘাত অহুত্ব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অহুত্ব করিতে বেশী সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে দীর্ঘ আড়ষ্ট থাকে তাহার অহুত্বকাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পুনরায় আঘাত যখন স্নাত হইয়া পড়ি তখন অহুত্ব করিবার পূর্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এমন কি সে সময়ে কখন কখন একেবারেই অহুত্ব নক্তি লোপ পায়, গাছের অহুত্ব সন্দেহ একই প্রথা। লক্ষাবতীর তাহা অবস্থায় অহুত্বকাল সেককের পতাংশের ছয় ভাগ—উদ্যমশীল ডেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয়গুণ বেশী। আর একটা আশ্চর্য্য বিষয় এই যে তুলকাথ তৃষ্ণ দিবা দীর্ঘ হুয়ে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃষকারী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে।

শীতে গাছের অহুত্বকাল প্রায় বিগুন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছের প্রকৃতি হইতে প্রায় পোনের যিনিট লাগে। তাহার পূর্বে আঘাত করিলে অহুত্ব-সময় প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক স্নাত হইলে অহুত্ব-শক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না।

সময় ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। পূর্বেই বলিয়াছি, সকাল বেলা স্নাতের নিশ্চেষ্টতাক্রমে গাছের একটু ক্ষত থাকে, আঘাতের পর আঘাতে সে ক্ষত চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে। সেটা বেশী ভাগের অবস্থা। পরম অল্পে মনি করাইয়া লইলে

গাছের ক্ষততা শীত্রেই দূর হয়। অগ্রহায়ণ সময় এলব উল্টা হইয়া যায়; স্নাত বসন্ত: সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাণ হইতে থাকে। বিশ্রামের ক্ষত সময় দিলে সেই স্নাত চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে, সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এবিধে মাহুত্বের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শীতকালে যা বাইলে যেমন স্নাতিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত পাইয়া প্রকৃতি হু হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে যাহা পোনের যিনিটে স্নাতিয়া যায় তাহা স্নাতিতে শীতকালে আধ ঘণ্টার অধিক লাগে।”

উত্তেজনার প্রাণঘাতীশ্বারে উত্তেজক পদার্থ-নিচয়কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে,—(১) কীণোস্তেজক, এতদ্ব্যন্থানে দীর্ঘায়ত্তরে যে সাড়া উপস্থিত হয় তাহা অতীত অশ্রুত। (২) সামান্যোত্তেজক,—এতদ্ব্যন্থানে দ্বারা যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহা সামান্যভাবে আঘাতের বোধনময়। (৩) প্রথরোত্তেজক, এই শ্রেণীর উত্তেজনা-বেগে আঘত দীর্ঘবেগে বিক্ষুব্ধভাবে স্পন্দন উপস্থিত হয়। (৪) হুতীকোত্তেজক,—হুতীকোত্তেজক প্রদান করিলে দীর্ঘগাত্রের একাধিক অঙ্গে প্রবলভাবে স্পন্দনক্রিয়া চলিতে থাকে।

রপায়ন ব্যবহার ব্যতিরেকে মাত্র হুত চালনার তারতম্যাদ্বারা লক্ষাবতী গাছে উক্ত চতুর্বিধ স্পন্দনই সৃষ্টি করিতে পারা যায়। মাত্র দুইটা শিনিউল বা ক্ষুদ্রতম পত্রাংশের অংগমন ও সময় পত্রাংশের নিষ্পন্দন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উত্তেজনার ধূল। শেবোক্ত উত্তেজনাপ্রভাবে

পত্রটি নিম্নোক্ত উপরও নোয়াইয়া পড়ে।  
পত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সাধারণতঃ মনে  
হইতে পারে যে, পত্রাগ্রহণ ভারগত চইয়া  
অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ বলে আকর্ষিত চইয়া থিনত  
হয়। বস্তুতঃ তাহা ভ্রান্তিমূলক। পত্রবৃত্ত  
প্যারেস্কাইমেটাস্ কোণসমূহে আন্তরিক  
অসামঞ্জস্য অর্থাৎ তাকাদের ঘনত্বের ভারতমা  
উৎপাদনই লক্ষ্যবর্তী এইরূপ অবস্থার প্রধান  
কারণ।

প্রশ্ন :—

(১) স্পর্শ ও তাহার ফল।

(ক) বস্তু সাবধানে পাণ্ড একটী মাত্র  
পিনিউলের অগ্রভাগ অঙ্গুলি দ্বারা  
স্পর্শ কর। কয় ব্লোড়া পিনিউল  
নোয়াইয়া পড়িল? অসুস্থ-  
কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া  
দেখ।

(খ) সামান্ত বলের সহিত স্পর্শ করিয়া  
একটী সমগ্র পত্রের দাবতীয়  
পিনিউল একসঙ্গে বন্ধ কর।  
কতক্ষণ পরে উহারা পুনরায়  
স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়?

(গ) চেষ্টা করিয়া দেখ—মাত্র স্পর্শ  
দ্বারা একটী সমগ্র পত্রকে নোয়াইয়া  
ফেলিতে পার কি না। কতকাঁচ  
হইলে সময় লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) রসায়ন সংযোগ।

(ক) কাচের বরৎসমাত্র একটী লক্ষ্যবর্তী  
গাড়ে তুলিয়া দিয়া ক্রোরোকম্  
প্রয়োগ করিয়া দেখ দেখ পর্দায়  
কতটী পত্র ( পিনিউলের সমষ্টি )  
নত হইয়া পড়ে। এইরূপ চইতে  
কত সময়ের আবশ্যক চইল?  
আবরণ ও ক্রোরোকম্ তুলিয়া  
লঙ্ঘার পর কতক্ষণে পাছ বাতিরা  
উঠিল?

থ্যামোনিয়া বায়ু সংযোগে উক্ত-  
রূপ পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ কর।

তাপসংযোগ।

(ক) কয়েকটী পত্রবৃত্তে তিন চারি পুরু  
তাকড়া ওড়াইয়া কিছুক্ষণ গরম  
জল সিক্ত করিতে থাক। ফল ও  
সময় লিপিবদ্ধ কর।

(৪) অন্ধন—

(ক) স্থব পত্রবৃত্তের লব্ধজেন অণু-  
বীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া  
কোষাবলীর যে অবস্থা প্রতীয়-  
মান হয় অন্ধন কর।

(খ) ক্রোরোকম্ বা থ্যামোনিয়া  
প্রভাবে অস্থব বৃত্তসমূহে টিক  
ঐরূপ কর।

খ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ।

## ভারতীয় ছাত্রের বিশ্বসঙ্ঘ-গঠন

স্থাবর অস্থব, কৃৎস অলদি, অস্থব মানব  
প্রকৃতি প্রকৃতির যে কোন দিকেই নেত্রপাত  
করি না কেন—সর্বত্রই লক্ষ্যগঠনের অবিরাম  
প্রয়াস দৃষ্ট হয়। স্থাবাপুংস্ব 'নির্জীব' অণু-

পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সজীব বৃক্ষলতা,  
কীট পতঙ্গ, অস্থব মানব পর্যন্ত কোথাও এই  
নিয়মের অবচ্ছেদন নাই। ইহাই প্রকৃতির মূল  
—বিশ্বরচনা ইহা দ্বারা ইন্দ্রশ্রব হইতেছে।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দল বাঁধিয়া  
এল নাথক এক নতন ও নিত্যপ্রয়োজনীয়  
পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে; যুগ্মকিকা,  
নিগীলিকা প্রভৃতি কৌশলতৎপালি সভ্যতাই  
দলবদ্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে; অসভ্য  
জাতিরাই এইরূপেই শত্রুতাড়ন করিত; এবং  
বিশ্বশতাব্দীতে সভ্যজাতিগণ এই সজ্জগঠন  
দ্বারা ই সাম্প্রতিক ও বৈবয়িক কথক্কেজে  
অসাধ্য সাধন করিতেছে। এই সজ্জগঠনের  
কালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ভারতজয়ের সমর্থ  
হইয়াছিল এবং ইহারই বলে ভারতবাসিগণ  
একদিন সিদ্ধবক: ভেব করিয়া তিঅত,  
চীন ও জাপানে উপনিবেশ গঠন করিতে  
পারিয়াছিল। একবিশ্ব শতাব্দীতে 'যেতকার'  
ব্রটান্ মহারথিগণ এই সমবায় প্রণালীর  
সাহায্যেই বিশ্বজয়ের স্বপ্নময় কল্পনা করিতে  
ছেন। অতএব কি প্রকৃতিতে, কি সামাজিক  
ও বৈবয়িক জীবনে—সর্বত্রই সজ্জ ও সমিতির  
অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একাকী  
এই পৃথিবীতে কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না।

আর আধুনিককালে এই সজ্জগঠনের শক্তির  
অভাবেই আমাদের সমাজ এত অসুস্থ  
ও অধঃপতিত। এতদিন এক উদ্বেগ  
সাধনকরে আমরা বিভিন্ন কথক্কেজে এক-  
মন ও একচিত্ত হইতে পারি নাই বলিয়াই  
আমাদের জাতীয় জীবনে আজ এত বৈষম্য,  
এত বিচ্ছেদ, শত ভাবা, সহস্র আচার।  
এজন্যই আমরা আজ আমাদের প্রতিবেশীর  
কথা বুঝি না, তাহার মনোভাব জয়নয়  
করি না—জাতীয় জীবনের ঐক্য উপলব্ধি  
করিব কি উপায়ে? এই বৈষম্যের মধ্যে  
অনেক ভাবুক কল্পনার রণাঙ্গণে হতট  
রূপাশ্রয় করন না কেন, আমাদের মধ্যে ইহা  
বাতব জাতীয় জীবনের দৃষ্টির ন্যায়কর।

অতএব আমরা বিভিন্ন কথক্কেজে সজ্জগঠন  
করিতে চাই—শিক্ষা ও সমাজে, জ্ঞানে ও  
বিজ্ঞানে, অর্থ ও ধর্মে।

কিন্তু আমাদের সমবায়ের প্রণালী ও  
উদ্বেগে এবং পাশ্চাত্যজগতের সমবায়ের  
প্রণালী ও উদ্বেগের মধ্যে অনেক পার্থক্য  
দৃষ্ট হইবে। পাশ্চাত্য জাতিগণ সজ্জগঠন  
পূর্বে কেবল পরজাতিপীড়ন ও অশ্রাঘ যুদ্ধে  
রাণি রাণি যোগদিতপাত করিয়া তথ্য কথিত  
যোগ্যতমের উত্তমতম সাহায্য প্রদানে করিয়া-  
ছেন,—আমরা সজ্জগঠন করিতে চাই, বাচিয়া  
থাকিতে এবং বাচিয়া থাকিয়া আমাদের  
সমাজ-জীবনের বিশেষ ভাব, ধর্ম ও নীতি  
জগৎসমক্ষে প্রচার করিতে। আমাদের  
যোগ্যতমের উত্তমতম খারগাটা কিছু অস্ত  
রকমের। কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য জাতিগণ  
বিশ্ব শান্তিস্থাপনের জন্ত উত্তম করিতেছেন,  
কিন্তু বাঁহাদের সমাজোন্নতির মূলে কেবল  
জড়বাদ ও অর্থ-লালসা—আনি না, তাঁহার  
কিন্তুপে ও কতকালে পানব প্রকৃতির তাণ্ডব-  
নৃত্য হইতে নিমুত্তলাভ করিয়া শান্তির সৌম্য-  
মুষ্টির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের ক্রম  
বিশ্বাণ, ভারতবর্ষের বিশেষ আবিকার  
সর্বজনীন ত্রাপগণভাবে নিখিল বিশ্ব উচ্ছ  
না হইলে মহাশান্তির শাক্যলাভ হইবে না।

এই সব নানা কারণে আমাদের দীর্ঘস্থ  
জাতীয় জীবনকে বিবিধ উপায়ে আগ্রত  
করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের  
সমাজ-জীবন এখন বহু গণবে পরিপূর্ণ সভ্য,  
কিন্তু সাধনাবলে এই গলদরাশি অপসারিত  
করিতে পারিলেই আবার নতুন নতুন  
দিব্যালোক দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই আগ্রণে কথকিং সহায়তা করিবার  
জন্তই প্রায় তিনবৎসর হইল আমেরিকা-

প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ “আমেরিকার হিন্দু-স্থান সমিতি” নাম দিয়া এক ছাত্রসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। বিবিধ উপায়ে ভারতীয় ছাত্র-গণকে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। বর্তমানে এই সমিতির পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণ ইহার কৰ্মক্ষেত্রে অগম্যবাসী করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় ভারতছাত্রসমিতিকে এক মহাসমিতিতে পরিণত করিবার উদ্ভব করিতেছেন। হিন্দুস্থান-সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যী ও অঙ্গান্ত কর্মী আইওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃদীন্দ্র বহু এম. এ. পি এইচ, ডি মহেশ্বর ইহার সভাপতিবৃত্তিতে এই উদ্দেশ্যে সজ্ঞতি একটি নূতন প্রস্তাব দ্বিধ করিয়াছেন। বঙ্গভাষাভাষী ভারতবাদিগণের অবগতির জন্য ইহার সারমর্ম নিয়ে প্রেরণ হইল।—

“বর্তমানে প্রায় তিনশত ভারতীয় ছাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও হুনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিতেছেন। কিছুদিন হইল ইহারা “আমেরিকার হিন্দুস্থান সমিতি” নাম দিয়া একটি ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমেরিকার যে যে কলেজ ও হুনিভার্সিটিতে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই সেই কলেজ ও হুনিভার্সিটিতেই এই সমিতির দূত দূত অংশ বর্তমান। ইহাদের মধ্যে নিউ ইংক, শিকাগো, ইলিনয়, মিশিগন, আইওরা, কান-সাস, ওয়াশিংটন, অরেগন ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সংগত শাখাসমিতিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ উপায়ে ভারতবাদিগণের শিক্ষার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানই এই ছাত্রসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল ভারতীয় ছাত্র

ভবিষ্যতে শিক্ষার জন্য আমেরিকাযাত্রার ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন, এই সমিতি সেই সকল ছাত্রকে আমেরিকার শিক্ষাবিবরণ নানা প্রকার মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করিয়া থাকে এবং আন্তঃপরিচয় ও গৃহ-স্থগাভিলাষী যুক্তগণকে শিক্ষার জন্য বিদেশ-গমনে উৎসাহ দিয়া থাকে। সমিতির কৰ্মচারিগণ নবাগত ছাত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বিভাগে প্রেরণ করেন। আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের দৌত্রাত্মের ভাব বর্ধন করাই এই সমিতির অন্ততম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানের উপর কিছুই ফেলিয়া না রাখিয়া এই সমিতি বহুদৈনিকগণকে শিক্ষাবিষয়ে নানা প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য বহুপত্রিকার হইয়াছে। “হিন্দুস্থানী ছাত্র” (The Hindustanee Student) নাম দিয়া এই সমিতি একটি সাময়িক (ত্রৈমাসিক) পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছে। ইতিমধ্যেই এই সমিতি ভারত-বর্ষের ও আমেরিকার অনেক বোধ্যব্যক্তির সাহায্য ও সহায়ত্ব আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির সভাপতি, কলেজের অধ্যাপক, গ্রন্থকর্তা, পত্রিকাসম্পাদক এবং ভারতবর্ষের কোনও কোনও রাজা, মহারাজা ও নবাগত এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

বর্তমানে এই সমিতি বর্কীয় কৰ্মক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর যাবতীয় ভারতছাত্র-সমিতিকে এক মহাসমিতিতে পরিণত করিবার আয়োজন করিতেছে। পৃথিবীব্যাপী এই মহাসমিতি “ভারতীয় ছাত্রের বিশ্বসঙ্ঘ” নামে পরিচিত হইবে (The World's Hindusthan Student Federation)। নানাপ্রকারে ভারতীয়

ছাত্রপণের সাহায্য প্রদান ও উৎসাহ বর্ধন ইহার অধীন শাখাসমিতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই শাখাসমিতিগুলি প্রতিবেশীয় গ্রাম পরস্পরকে বিবিধ উপায়ে সাহায্য প্রদান করিবে ও পরস্পরের স্বার্থোন্নতির জন্য একাগ্র-চিত্তে কার্য্য করিবে—ঠিক যেমন আমেরিকার হিন্দুহানসমিতির বিভিন্ন শাখাগুলি বর্তমানে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই মহাসমিতির একটা কেন্দ্র কার্যালয় থাকিবে এবং এই কার্যালয়ের অবস্থান প্রতি বৎসর নির্ধারিত হইবে—কোনও বৎসর ইংলণ্ডে, কোনও বৎসর ফ্রান্সে, পর বৎসর আমেরিকায় এবং তৎপর বৎসর জাপান বা ভারতবর্ষে। কেন্দ্র-কার্যালয় মহাসমিতির প্রধান সভাপতি ও প্রধান সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং ইহাছাড়াই বেশবিশেষের ব্যবসায় শিক্ষাণ-ব্যয় প্রচাৰিত হইবে।

অবশ্য এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝা উচিত যে এই মহাসমিতির অঙ্গভূক্ত হইয়া কোনও শাখাসমিতির স্বার্থ কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক স্থানীয় শাখাসমিতিরই অবস্থানভেদে ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে—তবে এই মহাসমিতি গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে পৃথিবীর ব্যবসায়ী ভারতছাত্রসমিতিগুলি পরস্পরের সংবাদে, সাহায্যে ও সহায়ত্বভূক্তিতে সকলের আনন্দ, উৎসাহ ও শক্তিবর্ধন করতঃ একনিষ্ঠ জাতীয় জীবন গঠনে সাহায্য করিবে। উদাহরণ হুলে এখানে একজন একটা শাখাসমিতির উল্লেখ করা হইতেছে। ভারতভক্ত মার্কিন রমণী ভগিনী কমলা দেবী নিউইয়র্ক প্রবাসী ভারতবাসিনীগণকে নানাপ্রকারে সাহায্যপ্রদানের জন্য হিন্দুহান জীশাখাসমিতি (The Wom-

an's auxiliary of the Hindusthan Association) নাম দিয়া একটা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপন সকলেই মার্কিন রমণী। এই নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির সহিত নিউইয়র্কের প্রাচীন হিন্দুহান-সমিতির কোনও গোপনযোগ বাধিবার আশঙ্কা নাই; কারণ উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল নিয়মকানুন ও কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। এই সমিতি আমেরিকার হিন্দুহান সমিতির শাখাশ্রেণী-ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। এই-রূপ আবেদনের উদ্দেশ্য এই যে, হিন্দুহান-সমিতির শাখাশ্রেণীভুক্ত হইলে ইহা অধিকতর পরিচিতি এবং ইহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে।

হিন্দুহান-সমিতির সাধারণ সতীপতিস্বরূপে আপনায় হুথিয়াত ও বহুল প্রচারিত পত্রিকার সাহায্যে ভারতীয় ছাত্রের স্বার্থসংরক্ষনের জন্য পৃথিবীর ব্যবসায়ী ভারত-ছাত্র-সমিতিতে আমাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য সাগরে আহ্বান করিতেছি। মহাসমিতি গঠনে অক্ষমতার জন্য আমরা অনেক সময় আমাদের বিক্ষোভ মন সমালোচনা শুনিতে পাই, কিন্তু এখন আমরা দেখাইব যে আমরা আর অক্ষম নই। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এখন আমাদের সাহসী ও গঠন-শক্তিশালী বহু যুবকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভারতীয় ছাত্রের বিশ্বদল গঠন করিতে চাই।"

আমরা আশা করি ভারতের ছাত্রশিক্ষক, ধনী নির্ধন, রাজা মহারাজা উক্ত প্রস্তাবটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন এবং সমীচীন বোধ হইলে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কখনই আমাদের মৃত্তি, কণ্ঠব্যতীত পতাক্তর নাই।



যদি কেহ এ সংক্ষেপ বিশেষ বিবরণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিম্ন নামে ও ঠিকানায় অগ্রগত পূর্বক পত্র লিখিবেন।

Prof. Sudhindra Bose, M.A., Ph.D.,  
The State University of Iowa,  
Iowa City, U. S. A.

জীনবীনচন্দ্র দাস।

## জাতিভেদে সংকারভেদ

শব্দভেদের সঙ্গতির নাম সংকার—মহাশয় যজ্ঞাযুখে পতিত হইলে, তাহার পুত্রাদি আত্মীয় স্বজনগণ, তাহার প্রাণহীন দেহ বিনষ্ট বা নৃষ্টির বহির্ভূত করিবার অন্ত যে কার্য বা পদ্ধতিবিশেষের অহুষ্ঠান করে তাহাকেই সংকার বলা যায়। সংকার-প্রথা সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই প্রচলিত অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সভ্য অসভ্য, আৰ্য্য অমার্য্য প্রভৃতি হস্ত প্রকার মনুষ্যসম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়, সকলেই মৃতদেহের সংকার করিয়া থাকে। তবে এই সংকার-পদ্ধতি সকলের, সকল জাতির এক-রূপ নহে, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, জাতিভেদে সম্পূর্ণই পৃথক্ ভাষাপন্ন। এই সকল পদ্ধতি যেমন বিশেষকর, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের অন্ত কতকগুলি বিভিন্ন মনুষ্যজাতির বিভিন্ন সংকার প্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ দুইপ্রকার সংকার-পদ্ধতি প্রচলিত—অগ্নি-সংকার বা দাহন এবং মৃতসংস্কার বা সমাধি। মৃতদেহ নদীতীরে কি প্রান্তরাদি জনশূন্য স্থানে লইয়া গিয়া, কাষ্ঠাদিযোগে তন্দ্রীভূত করাকে দাহন আর শব্দেহ বা শবের মৃত্যাবশিষ্ট অঙ্গ, দণ্ড কি ভস্ম প্রভৃতি বৃত্তিকামধ্যে গজর খননপূর্বক প্রোথিত করাকে সমাধি কহে।

হিন্দুরা এই উভয় উপায়েই মৃতদেহের সংকার করিয়া থাকেন। তবে দাহন-প্রথা তাহাদিগের মধ্যে বৈষ্ণব বাহ্যভাভাবে প্রচলিত, সমাধি সৈক্য নহে। তাহারা দুই বর্ষের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগের মৃতদেহ দহ করেন না, কোনও পবিত্র স্থানে লইয়া গিয়া কি স্থানে সমাধি খনন পূর্বক বৃত্তিকাসাৎ করিয়া থাকেন। উদ্যাতিত সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ-দিগের, কি বিদ্যাদিভাষা হস্ত ও পতিত ব্যক্তির শব কি বাহারা বিস, বজ্র, জল, নৃদী, দস্তী, নদী, সর্প, চৌর, চণ্ডাল প্রভৃতির দ্বারা বেচ্ছাক্রমে আত্মঘাত করে তাহাদিগের দেহও দাহন করা হয় না। পবিত্র নদী ত্রুণাদির তীরে, কি কোনও ধর্ম মন্দির ও মঠাদির প্রাঙ্গণে সমাধি প্রদান করা হয় অথবা নদীর তলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কতিং কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাধি বা সমাজ দিবার প্রথাও প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত অপর সকল স্থলেই প্রায় অগ্নির দ্বারা সংকার ক্রিয়া নির্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অগ্নিসংস্কার কাণ্ডে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধি, নিয়ম ও মন্ত্রাদির প্রয়োগ হয় এবং দাহান্তে অশৌচোপালন, কৌর, শ্রাদ্ধ ও কুইষভোপন প্রভৃতি যে ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহার বিশেষ বিবরণ এদেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও শিক্ষিত ব্যক্তি

মায়েই পরিজ্ঞাত আছেন। হুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন বোধে, যে সকল হিন্দু সন্তানসহ বা হিন্দুস্বাধীন নী অর্থাৎ কি অহিন্দু শাস্ত্রীয় বিধির সম্পূর্ণ অঙ্গবর্তন না করিয়া ভিন্নরূপে পববেহের সংকার কাৰ্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে, মাত্র তাহাদেরই কতকগুলির সংকার পদ্ধতীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিয়ে বিবৃত করা হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের 'কাহার' জাতি, সন্তানসহ ভেবে দাহ ও সমাধি উভয় উপায়েই পববেহের সংকার সমাধা করে। তবে তাহারা স্পর্শাক্রমক কি সংক্রামক রোগে, বলন্ত বিবৃঢ়িকা প্রভৃতি পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগকেই কেবল অস্থানভাবে স্থাপন পূৰ্ণক সমাধি করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস, ওহুপভাবে সমাধি প্রদান করিলে, মৃতের প্রোতাস্বা আর পৃথিবীতে আসিয়া কাহারও কোনও অপকার করিতে পারিবে না, চিরদিনই মৃত্তিকার মধ্যে থাকিবে বা অস্ত্রতমসাবৃত পাঠাল প্রদেশে চলিবা হাটবে। কাহারেরা প্রতি কার্তিক ও চৈত্রমাংসে মৃতের উদ্দেশে গুড়, চাউল ও ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার 'হিন্দু মালেরা' নদীতীরে পবদাহন করিয়া, নদীতেই তাহার অস্থিত্য নিক্ষেপ করে। দরিদ্রেরা দাহ করে না, নদীতীরে বালুকামধ্যে উত্তর পিয়রে, উত্তানভাবে ( কেবল মৃত বালিকা-বিশেষ অস্থান ভাবে ) স্থাপন ও প্রোথিত করিয়া থাকে। তাহারা আশ্বযাতী ও অপ-যাতীর চতুর্থ দিনে এবং আর সকলের একা-দশ দিনে প্রাণকাৰ্য্য সম্পন্ন করে। বাঙ্গালী 'ভোমজাতি' বস্তাদি স্পর্শাক্রামক রোগমৃত জাতি ও তিন বর্ষের নূন বয়স্ক শিশুদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে আর অস্থ সন্ধাবহার

সকল পবকেই আগুতে দহু করিয়া থাকে। স্থান বিশেষের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভোমেরা মৃতদেহ দাহ এবং দরিদ্রেরা নদীতে নিক্ষেপ করে। দাহান্তে পবের সন্ধীরা নদীতে অবগাহন আন করে এবং প্রথমে দৌধ, তৎপরে প্রুতর ও সন্ধীপে গুড় গোময় স্পর্শ করিয়া পবিত্র হয। তাহারা গত আশ্বার উদ্দেশে অর-যাজন ও হুতা উৎসর্গ করে। অশৌচকালে মন্ত মাংস স্পর্শ করে না কিন্তু অশৌচান্তে শূকর মাংস যোগে অরযাজন ভোজন ও প্রকৃত পরিমাণে স্থাপান করে আর নিমন্ত্রিত জাতি হুঁটুধগকে উক্তরূপে ভোজনপানে পরিতুষ্ট করিয়া থাকে। ভোম জাতির অশৌচকাল স্থানভেদে কোথাও ২, কোথাও ১০ এবং কোথাও বা ১১, ও ১২ দিবস মাত্র।

বিহারের 'কালোয়ার' জাতি সপ্তবর্ষের অনধিক বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে মৃত্তিকা ও তর্ফ বয়স্কদিগকে অগ্নিসং করিয়া থাকে। কিন্তু তত্তত 'হিন্দু মাল্লারা' আট বর্ষের নূনবয়স্ক শিশু ও অকৃতদার স্থাপকৃৎ ব্যতীত অপর সকলেরই পব দেহ দাহ করে। তাহাদিগের মধ্যে নবম দিনে স্রীজাতির ও দশম দিনে পূর্ববের পিওদানের নিয়ম প্রচ-লিত। উৎকলের 'চাণা বা চান্দা' নামধারী হিন্দুরা সমাধি ও দাহ দুই প্রকারেই মৃতের সংকার করিয়া থাকে। তবে তাহারা সমাধি দিবার সময়ে পবের সহিত অরযাজন ও কল-মুলাদি প্রদান করে আর থাকের পরে দাহ-বশিষ্ট তর মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখে এবং কখনও বা কলপে করিয়া পদ্ম গোদাবরী প্রভৃতি পবিত্র নদীতে সমর্পণ করিয়া আইসে; উড়িষ্যার 'গন্ধ' বা 'কন্দ' নামক পার্বত্য জাতি অধুনা হিন্দুজাতির নিরপেক্ষের অন্ত-নিবিষ্ট। তাহারা মৃত্যুর পরক্ষণেই পবদেহ

স্থানে লইয়া গিয়া চিত্রায় ভুলিয়া দেয় এবং তাহাতে অপ্রিয়যোগ করিয়া, তাহার চারিদিকে নৃত্য করিতে ও শোকপূচক গান গাহিতে থাকে। শব কণ্ঠ্যকৃত হইলে, নৃত্য-শীতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করে। কঙ্ক-দিগের মধ্যে যদি কোনও প্রাণান ব্যক্তি কি গ্রামের যত্ন প্রভৃতি যত্নাশ্রমে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা আত্মীয়গণ চাক-অনি করিয়া নিকটবর্তী স্বজাতি এবং লোক পাঠাইয়া চিত্র গ্রাম জনপদের প্রধানদিগকে আহ্বান করে। আহূত ব্যক্তিগণ সংবাদ জ্ঞাপন মাগ্নেই মৃতের গৃহে উপস্থিত হয় এবং মৃতের পুত্রাদির সচিত্র শব লইয়া কটকুমে গমন করে। সেখানে সকলের সমবেত হইয়া অবিলম্বেই চিত্রা প্রস্তুত ও তদুপরি শবদেহ সমুজ্জ্বলিত হয় আর মৃত মণ্ডলের পুত্র অভাবে অপর কোনও অন্তরঙ্গ জাতি, ভ্রাতা, বা ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি, পক্ষাৎ দিকে মুখ করাইয়া চিত্রায় অগ্নি সংযোগ করে। মণ্ডলের পদমধ্যায়া অহুসারে চিত্রার উচ্চতা, অহুচ্চতা স্থিরীকৃত হয়। মৃতব্যক্তি অধিক সম্মান অর্থাৎ তিন চারি গ্রামের অধিপতি হইলে, চিত্রা অত্যন্ত উচ্চ করিয়া প্রস্তুত ও তাহার সম্পূর্ণ মধ্যভাগে একটি পতাকা উল্লেখিত হয় আর মৃতের ব্যবহৃত বর্ষা, তীর্থ, ভ্রমারী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র, ধর্মীবাচি প্রভৃতি বাগন এবং মৃতের পুত্রাতন বগন ও অপরাধের সমস্ত দ্রব্য আনীত ও চিত্রা-সাগ্রিধ্যে তুলীকৃত করা হয়। তখন সমাগত ব্যক্তিগণ চিত্রাখেটনে উচ্চভাবে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত পতাকাটি ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ নৃত্যে কাত্য হইয়া না। অস্ত্রশস্ত্র মৃতের অধীন সর্বারগণ, সেই সকল আনীত অস্ত্র শস্ত্রাদি, সমস্তের চিহ্নরূপে,

আপনারিগের মধ্যে বস্টন করিয়া লইয়া গৃহে ফিরায়া যায়। কঙ্ক জাতির অনৌচকালের পরিমাণ ২ দিন মাত্র। সেই সময়ে তাহার প্রাথ প্রত্যহই স্থানে গমন করে ও চিত্রা-স্থল পরিবেষ্টন পূর্বক নৃত্যশীত করিয়া থাকে। দশম দিনে কোরাধি দ্বারা শুভী হইয়া, জাতি কুটুম্বিককে ভোজ্যপানীয় প্রদান করে।

বার্মিজিং ও দিকিম অঞ্চলে 'কানী' বা 'কায়া' নামধারী এক জৈষ্ঠীর কর্তব্যকার বালককে। তাহার হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিছু মৃত-দেহ কেবলমাত্র অগ্নিসং করে না, মৃত্তিকা-সং করে এবং নদী ত্রুদিত্তে তাসাইয়াও দিয়া থাকে। যখন দাহ করে, তখন চিত্রাভঙ্গ লইয়া ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে বিসর্জন দিয়া আইসে। তাহারিগের মধ্যে অনৌচ গ্রহণ ও জাতিগণের প্রচলিত, তবে তাহার নিঃসন্তান, আত্মবাচী কি অপবাচী তাহারিগের ভ্রাতৃ নিষিদ্ধ। তাহার কোরকর্ষের সময়ে, শত্রু ও মন্তকের কেন ব্যতীত অন্য যোমও ফেলিয়া দেয় এবং একমাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক মন্তকে একখানি বেত বস্ত্র বঁধিয়া রাখে। তাহারিগের অনৌচকালের পরিমাণ ১০ দিন। তখন তাহার মদ্য, মাংস, দ্রুত ও লবণ মূত্র একাহারে দিবস এবং কখন পর্যায় শয়ন পূর্বক রাত্রি ঘাপন করে। অনৌচকালে অধিক ব্যক্তি গ্রহণ বা লোক জনের সহিত সাক্ষাৎ কি আলাপ পরিচয় পর্ষদ ও তাহারিগের মতে অকর্তব্য। অনৌচাতে অর্থাৎ একদিন দিনে তাহার প্রভূত অন্নবান্ন প্রস্তুত করিয়া, জাতি কুটুম্ব ও বন্ধ-দিগকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আইসে। সকলে সমবেত হইলে মৃতব্যক্তির পুত্র বা কোনও নিকট সম্পর্কী জাতি ছইখানি পাত্রে, প্রস্তুত অন্ন বাগনাদির কিছু কিছু লইয়া,

নিকটস্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং একখানি পায় দ্বিতীয়ার স্থাপন পূর্কক প্রজ্ঞাপ্রদেবে বৃক্ষাদির মন্ত্ররূপে অবস্থিতি করিতে থাকে। তিনৎক্ষণ পরে যদি সে দেখিতে পায়, কোনও কীট, পতঙ্গ কি মক্ষিক প্রভৃতি সেই অগ্নিদিগ উপরে উপবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সে,— যত্নের আত্মা কীটাদির রূপ ধরিয়া প্রবৃত্ত অগ্নিব্রহ্মাদি ভোজন করিতেছে মনে করিয়া, আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে এবং সেই পাত্রেব নিকটে দিগা, তাহার উপরে একখণ্ড টেক বা প্রস্তর স্থাপনপূর্কক, তদ্বৎ পাত্ৰখানি দ্বিতীয়ার স্থাপিতা, তাহা হইতে সমস্ত ত্রব্য পরিতোষ পূর্কক উদগত করিয়া কেলে। অতঃপর গৃহে প্রত্যাপন হইয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে আহ্বান করাইয়া সংকারের অন্তিম অহুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে।

বোম্বাই প্রদেশের 'জানর' জাতীয় বৈষ্ণবেরা শবদেহ দাহ করে এবং শৈবেরা সমাধি লিখা থাকে। কোনও জাতিরের মৃত্যু হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সুল-পুত্রোচিত আলিয়া তাহার মৃত্যকে পদার্পণ করেন এবং মৃতের আত্মীয়েতা তাঁহার পাণোদক লইয়া তাহার মূর্খববের চালিয়া দেয়। তারপর সকলে একত্র হইয়া এক কাঠময় সিন্দুক মধ্যে শবদেহ স্থাপন পূর্কক, স্নিত বায়াদি আড়ম্বর সহ, সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গিয়া প্রোথিত করিয়া আইসে, সমাধি দিবার সময়ে মৃতদেহ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া সমস্ত বসন কুণ্ডলাদি খুলিয়া লওয়া হয় এবং সেই সকল কব্য গুতে আনীত ও বধারীতি অর্জিত হইয়া থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে 'মানভাব' নামে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব বেগিতে গাঁওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে সংকারের প্রধান দুই প্রথাই প্রচলিত। তবে বাহারা গৃহী

তাহারা শবের অগ্নিক্রিয়া আর বাহারা যিথেকী বা ভেদধারী তাহারা সমাধি প্রদান করে। সমাধি দান কালে শবের শরীরোপরি প্রকৃত পরিমাণে লবণ নিক্ষেপ হয়। মানভাবেরা পুরুষে স্ত্রীলোকের বা স্ত্রীলোকে পুরুষের সংকার করিতে পারে না, তবে পুরুষে স্ত্রীরাতির শবদীমায়ে সমাধি ক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাহার প্রাথমিক সমাধি খনন করে না, কোনও গভীর গহ্বর মধ্যে শব দেহ উত্তর গিরে শয়ন করাইয়াই সমাধি-সংকার সমাধা করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের 'জানর' জাতি মৃতদেহের সমাধি দিগা থাকে। কোনও জনমের মৃত্যু হইলে, তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণীয় পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। তিনি আদিরাই মৃতের মৃত্যকে আপনায় পরমজ্ঞ: অর্পণ করেন। মৃত ব্যক্তি যদি বৎস পুরোহিত কি কৃতদার হন, তবে তাঁহার মৃত্যকে পদখুলি দেওয়া হয় না, অপিত্ত তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার সর্বাঙ্গে বিদূতি নেশন ও বিবিধ বসন কুণ্ডলাদি পরিধান করান হয়। অতঃপর চারিজন লোকে শবদেহ ধোলায় করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। সেখানে শবদেহের সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার উন্মোচিত ও আত্মীয় বন্ধু-দিগের মধ্যে বিতরিত হয়। মৃত্যকের বসন কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ বা উকীল প্রভৃতি মৃতের কোঠ পুত্রই পাইয়া থাকে। তার পর তাহারা একটী বলি বা স্তপের মধ্যে মৃতশরীর রাখা করিয়া, সমাধি-বিষয়ের উপবিষ্টভাবে স্থাপন করে। কিন্তু অস্তকদার বা শিতর শব হইলে, তাহাকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়াই সমাধি রাখা হইয়া থাকে। শব সমাধি মধ্যে রাখিত হইলে, পুরোহিত মহাপর সওয়া পাঁচ আনার পরমা মন্ত্রপুত করিয়া সমাধি-খনকের হস্তে

অৰ্পণ করেন। বনক পরমাণুলি লইয়া শবের শরীরোপরি ইতস্ততঃ সংস্থাপন ও তত্বপরি একখানি নূতন বস্ত্র প্রদর্শিত করে। তখন সমাগত লক্ষ্মণন বস্ত্রোচ্চারণপূৰ্ণক বিঘণত ও পুষ্প সেই বস্ত্রের উপরে ছড়াইয়া দেয়। বনক সেইগুলি একত্র করিয়া শবদেহের একস্থলে অঙ্গীকৃতভাবে রাখা করে এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মুষ্টিপূর্ণ মুক্তিকা লইয়া শবের উপরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপে সমাধি গম্যস্ত মুক্তিকাপূর্ণ হইলে, একজন লক্ষ্মণ পুরোহিতের চরণসঙ্গিত্যনে একটী নারিকেল রাখিয়া অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ড করে আর সকলে মিলিয়া ভক্তিপূৰ্ণক, তাহার চরণস্থলে নিম্নরূপে পূজন ও তত্বপরি কুম্ভমণ্ডপ করিয়া গৃহে প্রত্যাপিত হয়। তখন মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র বা কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পুরোহিতের পাদদেশক লইয়া চতুর্দিকে নিকলপূৰ্ণক গৃহের পরিভ্রমণ বা শুদ্ধিবিধান করে। লক্ষ্মণদিগের ত্রিশ দিনে অনৌচাস্ত হয়। তখন তাহারা প্রথমে পুরোহিত ও শুভাঙ্গদ্বিগকে এবং পরিশেষে আপন জাতি কুটুম্বগণকে কুবি ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া সংস্কারের পরিসমাপ্তি করে। বন্ধিপাণ্ডবে ‘ভোগপেক’ নামে এক সম্ভবাত্ত হিন্দু ভিক্ষুক দৃষ্ট হয়। তাহারা মৃতদেহ বাহ করে এবং মৃত্যুর পক্ষম দিনে অন্নবাত্তনাদি রন্ধন করিয়া প্রোক্তাত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তির সহিত অৰ্পণ করিয়া থাকে। তাহারা মৃত্যুর প্রথম মাসে মৃতের একটী মৃগদ্বীমুষ্টি সংগঠন করে এবং প্রোক্তাত্মাবোধে সেই মুষ্টির পূজা অৰ্চনা করিয়া থাকে। ‘মাক’ দার্কণাত্যের আত্মজ হিন্দুজাতি। মৃতদেহ প্রোথিত করাই তাহাদিগের সামাজিক প্রথা। তাহারা জয়োদশ দিবস অনৌচপালন করিয়া শেষে ব্রহ্মনগণসহ সমাধিক্ষেত্রে গমন ও ক্ষৌরকার্য

সমাপা করে এবং ব্রহ্মোদগম সংখ্যক শেড়নী বা গমলা সমাদিসংস্থানে স্থাপন ও তাহার উপরে জলসেচন করিয়া শুভ হয় ও বাটীতে থাকিয়া আত্ম ও কুটুম্ব ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে।

আলামের ‘মিকির’ নামা অসভ্যজাতি মৃতদেহ অগ্নিসং করে কিন্তু মৃতের জন্ত কোনওরূপ শোক বা দুঃখ প্রকাশ করে না। বালক, বৃদ্ধ, দুৰ্ব্বা বাহারই মৃত্যু হইক না কেন, তাহার জন্ত দুঃখিত বা শোকার্ত হয় না, বরঞ্চ অত্যধিক আয়োদ প্রমোদে, গীত বাণা ও নৃত্যে আর তৎসহ কুটুম্বভোজনে উন্নত, তৃপ্ত ও উৎফুল্ল হইয়া উৎসব করিতে থাকে। দে উৎসব আবার একদিনে শেষ হয় না, ক্রমান্বয়ে কয়েক দিবস ধরিয়াই চলিতে থাকে। উৎসবের পূর্বে মৃতের উদ্দেশ্যে ছাগাদি পশু বলিদেয় আর তদ্বারা মৃতাত্মা তৃপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া আনন্দে আত্মদাবা হয়। মিকিরজাতির মধ্যে বাহার্য্য ঐশ্বর্য্যপানী, প্রধান কি মণ্ডল পদব্যাচ্য তাহারা উল্লিখিত আয়োদাদিতেও সংস্কার ক্রিয়া শেষ হইল বলিয়া বোধ করে না। তাহারা মৃতের স্মৃতি প্রাগজ্ঞক রাখিবার জন্ত তাহার উদ্দেশ্যে, গৃহের সারিধো প্রস্তর রচিত শুভেরও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। আর মধ্যে মধ্যে পরলোকগত আত্মার সন্তোষবিধান মানসে সেই শুভের উপরে ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি রাখিয়া আইসে। আলামের অন্ততম অসভ্যজাতির নাম ‘মিরি’। তাহারা পক্ষিতে বাস করে এবং পক্ষিতেই মৃতদেহের সমাধি দিয়া থাকে। যদি কেহ প্রবালে বা পক্ষিত-নির্মে গিয়া কালকবলিত হয়, তাহা হইলে তাৎক্ষণিক আপনাদিগের পক্ষিতাবাসে আনিয়া পক্ষিতীয় সমাধিক্ষেত্রেই সমাধিদান করে। তবে বিমুচিকা,

বসন্ত প্রকৃতি রোগে কেহ মরিলে, তাহাকে পর্তুতে আনিয়ন করে না, সে বেখানে মরে সেই ঘায়েই তাহাকে কবর দিয়া আটসে। তাহারায় অর, ছল, বন্ধন-স্থালী, বস্ত্র প্রকৃতি ত্রয়ের সহিত শবদেহ সমাদিহ করে তাহানিগের দারপা—এই সকল পদার্থ লগ্নে না থাকিলে, হুহু বর্গপথ অভিবাহন করা প্রোতাস্থার পক্ষে কখনই সহনসাধ্য বা সম্ভব-পর হয় না।

সাঁওতাল পরগণার 'পূজাহার বা মাল-পাহাড়িয়া' নামক অসভ্য পার্শ্বতা জাতি দাহ ও সমাধি উভয় উপায়েই মৃতের অস্তিত্বকিছু সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে বাহারায় দহিত্র, দাহন ক্রিয়ার ব্যাবহিকভাবে অসমর্থ, তাহারাই কেবল মৃতদেহ প্রোথিত করে এবং অনৌচ পালন, ক্ষৌর ও স্নান প্রকৃতি কোনও কাৰ্য্যই সম্পন্ন করে না। পূজাহারদিগের মৃতশোচ পাঁচ দিনে শেষ হয় স্তব্ধতা বর্ধনেনই তাহারায় স্নান করিয়া ও জাতি বন্ধুদিগকে ভোজ দিয়া শুদ্ধিলাভ করে। এই জাতির অনৌচকালে লবণ ব্যবহার একান্ত দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত।

রাজমহলের 'মালে' নামা পার্শ্বতা জাতি সমাধির পক্ষপাতী। তাহারায় প্রথমতঃ সমাধি খনন পূর্বক তদ্ব্যপেক্ষ ভগ্নাতক বা ভেলাবৃক্ষের পত্র আতীর্ণ করে, সেবে তদ্ব্যপেক্ষ শবদেহ স্থাপন করিয়া মৃতিকায় পূর্ণ করিয়া দেয়। মৃতব্যক্তি যদি পুরোহিত সম্প্রদায়ের কোনও লোক হয়, তবে তাহাকে প্রোথিত করে না, দাহত করেই না, অপিচ দ্রবতী গভীর বন প্রদেশে, উপত্যকাস্থে কি প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারায় শবদেহশনে মৃত, অপদাভী ও আত্মদাতীদিগের সমাধি প্রদান করে না, তাহানিগের মৃতদেহ শবদেহের

বহির্ভাগে কোনও মৃতের বিজ্ঞান অরপো লইয়া গিয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়া আটসে। পাছে ঐসকল ব্যক্তির দুষ্ট প্রোতাস্থা গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কোনও প্রমাণ ঘটায় তাই ঐরূপ ব্যবস্থা। কারণ প্রোতাস্থার বহুদূর হইতে পথ চিনিয়া গ্রামে আসিতে সমর্থ নহে। মালে জাতির অনৌচকাল পাঁচ দিবস মাত্র। তাহানিগের মধ্যে দাণ্ডাসিক ও বার্ষিক স্নানেরও প্রচলন আছে।

চোটনাগপুরের 'কোল' নামক অসভ্য সম্প্রদায় মৃতের অগ্নিসংস্কার করে না, সমাধিও দেয় না, প্রকৃত্যে বনমধ্যস্থ কোনও স্থানে কি পর্তুতে গভীর গহ্বর মধ্যে মৃতদেহ নিষ্ক্ষেপ করে এবং সেই স্থান বা গহ্বর মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থাপন পূর্বক গুহে প্রোতাপিত হয়। তাহারায় মৃতের উদ্দেশ্যে কোনও স্নানের অনুষ্ঠান করে না, কেবল প্রতিবর্ষে মৃতদেহ ত্রিবিধে আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত সমাধিস্থলে গমন ও মৃত ব্যক্তির নামোচ্চারণ পূর্বক বহুক্ষণ ধরিয়া করুণময় ক্রন্দন করিয়া থাকে। তাহারায় ঐরূপ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে যে, সেই শব্দে সমস্ত বনজীবী শব্দায়মান হইয়া উঠে।

কুচবিহারে ও আসামের গারো পাহাড় 'গারো' নামে এক অসভ্য জাতির বাস। তাহারায় শবদেহ বহু করে এবং গন্ধাবশেষ তদ্ব্যপেক্ষ আনিয়া গৃহের দ্বারের নিকটে মাটিতে পুতিয়া রাখে। গারোরা মৃতের উদ্দেশ্যে কুতুর বধ করে, তাহাদের বিশ্বাস প্রোতাস্থা বহু পথ চিনিয়া প্রোতলোকে গমন করিতে পারে না স্তব্ধতা পশিপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, তাহার দুর্দশার পরিনীয়া থাকে না। সে পথভ্রষ্ট হইয়া অনন্তকাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। পথ প্রদর্শনের ও

প্রত্যেকলোকে লইয়া ঘাইবার শক্তি আছে কেবল কুসুরের আর তুল্যতাই এই কুসুর বলির নিয়ম।

‘নাগা’ নামে একশ্রেণীর অসভ্যজাতি পর্কত বা পার্শ্বভ্য অঞ্চলে বাস করে। তাহারা যুদ্ধ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারে না। কাহারও যত্ন হইলে, তাহার তাহার দেহ পরিভ্রাণ করে না, জীবিতভাবে গৃহে রাখিয়া তাহাকে খোদ্রীতি ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি প্রদান করিতে থাকে। কিছুদিন এইরূপ করিয়া যখন বুঝিতে পারে, সে কিছুই আহাৰ করিতেছে না, যেমন আহাৰ তেমনই পড়িয়া থাকিতেছে আর সে দিন দিনই কেমন বিকৃত হইয়া ঘাইতেছে ও তাহার দেহ হইতে জীবাণু প্রকারজনক পুতিগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, তখন তাহারা তাহাকে গৃহের বহির্দেশে নিক্ষেপ করিয়া আইসে। নাগারা এমন নিক্ষেপ যে যতদিন দেহ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত না হয়, ততদিন তাহাকে জীবিত বলিয়াই বোধ করে। আগামের দক্ষিণ দিগন্তী নাগাপর্কতে ‘অগামী নাগা’ নামে এক জাতীয় অসভ্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অন্ন জল, বসন জুত, অস্ত্রপত্র, স্ত্রী ও কুটু প্রভৃতির সহিত শবদেহ সমাহিত করে। সমাধির উপরে প্রকৃত বৃক্ষপত্র আতীর্ণ করিয়া তদুপরি স্ত্রী পৈতন পূর্বক প্রস্তর দ্বারা সমাধি-পঙ্খ কঙ্ক করিয়া দেয় এবং একখানি প্রস্তরে মৃতের প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া সমাধির উপরে রাখিয়া আইসে।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ‘কাফির’ নামে এক শ্রেণীর মানবজাতি বাস করে। তাহাদের আচার ও ভাষার সহিত হিন্দু জাতির কিঞ্চিৎ সৌগাৎ থাকিলেও তাহারা হিন্দু নহে, মুসলমান কিন্তু তাহাদের সংস্কার পর্কত হিন্দু, মুসলমান কাহারও অল্পরূপ

নহে। তাহারা মৃতদেহ দাও করে না, কবরও দেয় না—দিল্লীর মধ্যে পুঠিয়া, চিরদিনের মত তাল্লা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়।

নিগ্রো অশ্রুদীপ হইতে হিমালয়ের পশ্চিমোত্তর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূমিভাগে যে অসভ্যজাতির বাস, তাহাদিগের নাম ‘চীন’। চীনজাতির মধ্যে অগ্নিসংস্কার ও সমাধি উভয় প্রথাই বিদ্যমান। তবে তাহারা অস্ত্রাস্ত্র জাতির স্ত্রী শবদেহ দাহ করিলেও, প্রোথিত করে না, দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিরই সমাধি দিয়া থাকে। তাহারা মরণে শোকার্ত হয় না, বরং আনন্দিতই হইয়া থাকে। গৃহে কাহারও যত্ন হইলে, গৃহবাসীরা তৎক্ষণাত্ আত্মীয় স্বজনদিগকে আহ্বান করে এবং সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রদানে প্রমত্ত হয়। আমোদের প্রধান অঙ্গ ভোজন। অবস্থা স্বচ্ছল হইলে, তাহারা প্রকৃত অর্থব্যয় করিয়া বুধ, মতিশ, শূকর প্রভৃতি চতুষ্পদ ও কুকুটাদি নানাবিধ পক্ষী সংগ্রহ করে এবং তাহাদিগের মাংস রন্ধন করিয়া অন্নাদির সহিত খ্রীতি-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। ভোজন সমাধা হইলে একটী কুকুট আনিয়া, তাহার একখানি পা শবদেহে বা শবের একখানি পদে বা হস্তে রাখিয়া দেয় আর সেই অবস্থায় শব ছালায় পুঠিয়া কি খোলায় জুগিয়া স্বপ্নানে লইয়া গিয়া দগ্ধ করে। দাহনক্রিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে আগুন নিবাইয়া দেয় এবং দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিগুলি একে একে বাছিয়া লইয়া গৃহে আনয়ন করে ও মধ্যবোধে বিশেষরূপে প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত ও হারিত্রাচুর্নে স্নাক্ত করিয়া, পাত্ৰবিধে গৃহমধ্যে রাখিয়া দেয়। এক বৎসর সেইভাবে রাখিয়া, পেথে পেই অস্থিগুলি প্রকাত সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গিয়া দগ্ধ-রীতি সমাধি করিয়া দেয়।

তিস্রতীহদিগের মধ্যে দাহ ও সমাধি কোনও প্রথাই প্রচলিত নাই। নতুনি, গৃহিণি প্রভৃতি পক্ষীর ক্ষত পক্ষীভোণদি কি কোনও উচ্চকৃমিতে শবদেহ নিক্ষেপ করাই তাহাদের আত্মসংক্রিয়া। তবে বাতারা অবস্থাপন্ন, তাহারা কি কিং সমারোহ সহকারেই সেই কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহারা বংশাদি রচিত যক্ষ যোগে শবদেহ সমাধি-পক্ষিতে লইয়া যায় এবং অল্প প্রায়েণে শবের সমস্ত মাংস কাটিয়া কেলে আর মাংসগুলি একদিকে ও অস্থিগুলি প্রস্তরাদি দ্বারা চূর্ণ করিয়া অন্য দিকে রাখিয়া দেয়। তারপর কাষ্ঠ ও অগ্নি-যোগে ধূমোৎপাদন পূর্বক নতুনি গৃহিণি প্রভৃতি পক্ষীদিগকে আহ্বান ও সেই সকল মাংস ও অস্থিচূর্ণ তাহাদিগকে প্রদান করে। এখানে নরীতীরস্থ স্থানে দিয়া চরিকনি করিলেই যেমন কঙ্কপদল, শব সমাগত বুদ্ধিযা ভাসিয়া উঠে, তিস্রতের গৃহ-পক্ষুনিরাও তেমনই ধূম মর্শনে উপস্থিত হয়। তিস্রতের দরিদ্র লোকেরা শবদেহ কর্তন করে না, পক্ষীতাদি উচ্চস্থানে নিক্ষেপ করিয়াই গৃহে চলিয়া যায়। কিন্তু মোক্ষল ভাতি ও লামা-দিগের মধ্যে সমাধি ও দাহ দুই পদ্ধতিই প্রচলিত। উচ্চপদস্থ লামারা আপন আপন সন্তানসম মধ্যে সমাধি-গৃহ নির্মাণ পূর্বক তদ্বাথে শবদেহ সমাধিত করে কিন্তু নিম্ন-পদস্থেরা তাহা না করিয়া শবদেহের দাহ-ব্যবস্থাই করিয়া থাকে। আর চিতাত্ম শব রোগাদি দগ্ধিত আশার বা স্ত্রীর মধ্যে স্থাপন পূর্বক মন্দিরাদি পবিত্র স্থানে রাখিয়া দেয়। কোনও কোনও মোক্ষল ভাতি অগ্নিসংস্কারে এবং কেহ বা পক্ষীর মধ্যে শবদেহ স্থাপন ও তদুপরি প্রস্তরাদির আচ্ছাদন দিয়াই সংস্কার সম্পন্ন করে। তিস্রতে এক সন্তানসংস্কার লামা

আছেন, তাহার ঐশ্বর্য্যক্তি বলে কি জ্ঞান প্রভাবে স্ত্রীর সময় নির্ণয় করিতে পারেন। আর স্ত্রী আসন্ন বৃত্তিলেই শবদেহসহ আপনাদিগের পৈতৃক সমাধিক্ষেত্রে দিয়া উপস্থিত হন ও তাহাদিগের অস্থিত্বের উপর শয়ন বা অস্থিরাশি আলিঙ্গনপূর্বক বেহত্যাগ করেন। কিন্তু তিস্রতে যদি কোনও শিশু স্ত্রীমুখে পতিত হয়, তবে সে যে ভাতিই হউক, তাহাকে পথিমধ্যেই নিক্ষেপ করা হয়।

ব্রহ্মদেশে কাহারও স্ত্রী হইলে, তৎক্ষণাৎ গৃহের সমস্ত অগ্নি নির্মাপিত ও সমস্ত জলপাত্র ভগ্ন করা হয়। অতঃপর স্ত্রীর পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ মিলিত হইয়া, শবদেহকে হান করা হয়। তাহার পদাঙ্গুলিগুলি স্ত্রীর দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করে এবং মুণ্ডবিবরে একথণ্ড শব বা রোগ্য প্রদান পূর্বক তাহাকে উস্তান-ভাবে স্থাপন ও তাহার সর্বাঙ্গ বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করে আর গৃহে বাস্তবক আনাইয়া দিবারাত্র্য ক্রমাগত বারনা বাজাইতে থাকে। এইভাবে চারিদিক কাল শবদেহ গৃহমধ্যে বন্ধিত হয় আর বাড়ীর প্রধানেরা তাহার প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। পক্ষমহিনে স্ত্রীর বরনবর্গ শবদেহ গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া শবদেহে স্থাপন ও শেষে অস্থানে লইয়া দিয়া অগ্নিপাং করে। শব তস্মীভূত হইলে, সেই তম সংগৃহীত, স্বামীমধ্যে সংরক্ষিত ও পরিশেষে অস্ত্রস্থানে লইয়া দিয়া প্রোথিত করা হয়। কখনও কখনও প্রোথিত ভয়ের উপরে স্তুতিস্তম্ভ ও নির্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু দহ-দিন শবদেহ তস্মীভূত ও চিতাত্ম সমাধিত না হয়, ততদিন স্ত্রীর গৃহে কেহ অগ্নি প্রজ্জালিত করিতে পারে না। তখন অল্প গৃহস্থের গৃহ হইতে অগ্নি ক্রয় করিয়া আনিয়াই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশে



গৃহস্থানীকে সংস্কার-বাহ বহন করিতে হয় না। তাহার প্রতিবেশীরাই আপনাদিগের মধ্য হইতে চাঁদার দ্বারা, অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত বাহ নির্মাণ করিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মবাসী-দিগের মৃতদেহ কখনও কখনও পাঁচ ছয় মাস পর্যন্ত নধুমধ্যে রক্ষিত হয় এবং কোনও মন্দির বা মঠ (Pagoda) প্রাঙ্গণে সমাধি-বোহে সমাধিত হইয়া থাকে।

চীনদেশের লোকেরা মৃতদেহ প্রাণিত করে কিন্তু অপরাপর জাতির দ্বায় মৃত্যুর পরেই সে কার্য সম্পন্ন করে না। প্রধানতঃ তিন এবং সাধারণতঃ সাতদিবস আর সময়ে সময়ে কয়েকমাস পর্যন্ত শবদেহ গৃহস্থধ্যে রাখা করিয়া শেষে তাহার সমাধি দিয়া থাকে। তাহার শোকহৃৎক বেত বসনভূষণে সজ্জিত হয়, সমস্ত আবাসভবন যেতবস্ত্রে সমাবৃত করে এবং নানা উরিসহকারে বিলাপ, ক্রন্দন ও মৃতের গুণগাথা পান করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে শোক প্রকাশ করিবার জন্য অর্থ দিয়াও লোক নিযুক্ত করা হয়। চীনরা মৃত ব্যক্তিকে জীবিতের সহজ-গুণ সম্মান প্রদান করে এবং তাহার প্রতি দেবতার তুলা মর্যাদা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত কি ধনী হইলে তা কথাই নাই। তাহার অহরহগণ তাহার দেহটিকে মহার্ঘ্য বসনভূষণে সজ্জিত করে এবং একটা স্বন্দর সুরঞ্জিত শবাধার আনিয়া ও তাহার তলদেশে চাপড়, চূপ ও কার্পাসের দ্বারা শয্যাযতনা করিয়া তত্ত্বগরি পরম যত্নে শবদেহ সংস্থাপন করিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত কি উচ্চপদস্থ চীনরা প্রভূত অর্থব্যয়ে বহুলা মণি মরকতে, সুবর্ণ রতনে খচিত ও নানা শিল্পনৈপুণ্যময় সূক্ষ্মশিল্পে বিশোভিত করিয়া শব-সিন্দুক সংগঠন করেন। শবাধারের

দৌলদ্বা ও দৌলত বিধানের উদাহরণের এতাদিক দ্বায়, এতদ্বয় আদর্শ যে, পাছে মৃত্যুর পরে উদাহরণের বেদ উৎকৃষ্ট শবাধারে সংরক্ষিত না হয়, এই অশ্রদ্ধার আবির্ভাব কালেই অনেক আপন আপন শবাধার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া যান। দাগা হউক, মৃতদেহ শবসিন্দুকে রক্ষিত হইলে, স্ত্রীপুত্র বালক-বৃদ্ধ নির্দীর্ণপথে মৃতের সমস্ত আত্মীয় বন্ধু তাহার গৃহে সমাগত হয় এবং শুভ বসনে শরীর আবৃত করিয়া, কিয়ৎকাল দরিয়া কলগ-বধে তাহার ভক্ত ক্রন্দন ও তাগাব প্রতি সময় প্রদর্শন করে। অবশেষে মহাসমাধি-সহকারে তাহাকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সমাধি দিয়া আইসে। চীন দেশের প্রতি গ্রাম নগরেই এক একটা সাধারণ ও পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র বেষ্টিত পাওয়া যায়। জন-পদের অধ্ববস্তী উপত্যাকাভূমি, উচ্চ বিটপি-সমাকীর্ণ ছায়াশীতল শিখর ক্ষেত্র বা বিস্তৃত সমতল ভূমিই উপযুক্ত সমাধিস্থল বলিয়া নির্ধারিত হয়। মৃত ব্যক্তি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, সেই পরিবারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই তাহাকে সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে। তবে চীনে দীর্ঘজীবীর সম্মান অত্যন্ত অধিক বলিয়া কোনও কোনও স্থানে বয়ঃক্রম অধিক অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্ণ না হইলে কেহই প্রায় শৈতৃক সমাধিক্ষেত্রে সমাধিলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহার সমাধির উপরে কোনও স্মরণস্তম্ভও নির্মাণ করা হয় না। তাহাকে সাধারণ সমাধি স্থলে, বিনা আড়ম্বরেই সমাধিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু সমাধি দিলেই সংস্কারের পরিসমাপ্তি হয় না। চীনরা মৃতের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য, বর্ষে একবার করিয়া সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং দেশের পদ্ধতি অনুসারে

জ্ঞানাদি সমাপণ ও সমাধি-সাম্রিধো কাগজ-নির্মিত গৃহ, গৃহোপকরণ, চতুর্দোলা প্রভৃতি বান ও স্বর্ণবর্ণি কাগজ প্রভৃতি বদ্ধ করে। তাহাদিগের বিবাহ—সমাধি-নিকটে সোমানী কাগজ বদ্ধ করিলে মৃত্যুকাল পরন্তগতে অর্ধ-সম্পদ বা নগর টাকা লাভ করে এবং গৃহাদি দাফ করিলে সেটরূপ গৃহাদির অধিকারী হয়। চীনা বা মৃতের জন্ত তিনবৎসর অনৌচ গ্রহণ করে। সে সময়ে সকলকেই বিশেষতঃ মৃতের পুত্র, পৌত্র ও নিকট আত্মীয়দিগকে স্নেহ পরিচর্য্যধারী ও নিয়ামিবাঈ চইয়া বিষয়কর্ম পরিভাগ করিতে চয়। তখন জীবন ধারণোপযোগী কতকগুলি কার্য্যবাস্তীত অপর কোনও কার্য্যেই প্রায় তাহাদিগের অধিকার থাকে না।

সাপানে এক অচোরাত্রকাল শব্দবহু গৃহে রক্ষিত হয়। পুরোহিত আদিগা ধূপ, দীপ, নানাবিধ ফল ও পিষ্টক প্রভৃতি উপকরণে মৃতের পারলৌকিক স্বৰ্গ কামনার ইশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। শব্দবহু তাহার সম্মুখেই শব্দধারে বা চতুর্দোলা প্রভৃতিতে স্থাপিত, মূল্যবান স্নেহবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত ও পুষ্পগন্ধে পরিশোভিত করা হয়, মৃতের আত্মীয় পরিজনবর্গ হৃদয় বেশকৃষার কুচিত হইয়া প্রকৃতভাবে তাহার চারিদিকে সহযত হয়। জাপানীদিগের নিকটে মৃত্যু শোচনীয় বা ভীষণ বিতীৰ্ণিকার্য্য নহে। অপিকু পরম শুভকর মঙ্গলময় ঘটনা বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। এমত কোনও লোকের মৃত্যু হইলে তাহার শোক না করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, এবং পুষ্পগন্ধ হস্তে লইয়া হাতমুখে মৃতঃস্বের নিকটস্থ হয়। প্রথমে একজন জাপানী একটী কপোতপূর্ণ পিষ্টক হস্তে লইয়া গমন করে তৎপরে দুইজন বাক্য

শব্দসম্মত বচন পূর্ব্বক তাহার অঙ্গুগামী হয় আর অবশেষে মৃতের স্বর্গমবর্গ পুরোহিতের সচিত গমন করিতে থাকে। সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়া বাক্যগণ বৃক্ষদেবেষ মুক্তির পুরোহিতগে শব্দধার রক্ষা করে। বৃক্ষমুক্তির সম্মুখে অগ্নিপূর্ব্ব ধূপাত্র ও পার্বে প্রাঙ্গলিত দীপসকল স্থাপিত হয়। পুরোহিত মচাপর মুক্তির সম্মুখে প্রণত হইয়া উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আর মৃতের অঙ্গরক্ষণ ধূপাত্রস্থ অগ্নিতে ধূপ নিক্ষেপ করিয়া মৃতের কুল কামনা করিতে থাকেন। এইরূপে প্রার্থনা কার্য্য শেষ হইলে মৃতের আত্মীয় স্বজনগণ, বাক্যধিগের সাহায্যে সমাধি ধন ও ভগ্নদো উপবিষ্টভাবে শব্দবহু সমাধিত করে। কিন্তু কোনও জাপানী যদি বিবেচনা কি বাসগ্রাম ভিন্ন অঙ্গগ্রামে গিয়া কালগ্রালে পতিত হয়, তাহাচইলে তাহাকে সমাধিত করে না, সেই স্থলেই তাহাকে দাফ করে আর তাহার এক গচ্ছ কেন কি একটী মাত্র দস্ত বা চিত্তান্ত আনিয়া, তাহার ভগ্নস্থানেই তাহার সমাধি দিয়া থাকে কিংবা গৃহে লইয়া গিয়া রক্ষা করে। এমত ইহোকোগোবা প্রভৃতি অকলে শ্রমণ ও সমাধিক্ষেত্র উভয়ই দৃষ্ট হয়। জাপানীরা উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশ, বৃক্ষরাশি সমাকীর্ণ প্রণত প্রান্তর কি সাগরের অদূরবর্তী প্রাকৃতিক শোভাময় মনোহর স্থানে শবের সমাধি দিয়া থাকে। জাপানীদিগের অনৌচকালের পরিমাণ ৪১ একচল্লিশ দিন। তাহার এক-খানি কাঠে মৃত পিতা, পিতামহাদি শুভজন্মের নাম লিখিয়া গৃহমধ্যে সংস্থাপন করে এবং প্রত্যহ উভয় সন্ধ্যাকালে, সেই কাঠখণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইয়া ধূপদীপাদি উপকরণ এবং ফলমূল ও পিষ্টকাদি বাস্তব্যা সকল উৎসর্গ করিয়া দেয়। কিছুদিন সেইভাবে

কৰ্ম্য কৰিগা শেষে মাসে ও তৎপরে বর্ষে একবার করিয়া উল্লিখিতরূপে মৃতের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

তাঁহার বেশের মিনিমামোরা শবদেহ পশু-পক্ষীর তক্ষাক্রপেই পৰিত্যাগ করে। কিন্তু অধঃস্থতাগ্য করে না, বরং পশু করিয়া কাটিয়াই নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ভ্রাম বেণের অঙ্গা পোকেরাও ঐ প্রথার অঙ্গসংরক্ষণ করে বটে, তবে তাহার মৃতদেহের গতিত অংগগুলি কেবল কুকুরকেই ভক্ষণ করিতে দিয়া থাকে। আফ্রিকার কাফ্রী ও বুশমান ( Bushman ) জাতি শবদেহ সিংহ বাঘাদি পাপনের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে বা প্রান্তরাদিতে নিক্ষেপ করে।

পারস্ত্রের পূর্বজন অপিবাসীরা জোরোয়াটায়ের ( বৈবিক জরাজল্য কবি ? ) মন্তাবলম্বী এবং পামী নামে অভিহিত। অধুনা তাঁহারা ভরতবর্ষের বোখাই প্রদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সংকারপদ্ধতি অনেকটা ভিস্তাভিগিরেগেরই অতুল্য। তাঁহারা মৃতদেহ শব্দিনিগের তক্ষাক্রপেই পৰিত্যাগ করেন, উহাদিগের তক্ষণের নিমিত্ত ভবন বিশেষে দিয়া রাখিয়া আইসেন। সেই ভবন বা সমাধি-গৃহের নাম 'প্রোতপুত্রী', 'নীরব-ভবন' বা 'মৌন-মন্দির' (Tower of Silence)। পারসিক ভাষায় উহাকে "বোখ্মা" কহে। বোখ্মাই অকলে তিনটী মাত্র 'বোখ্মা' দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের মধ্যে বৃহৎ প্রস্তর রচিত এবং বিংশতি হস্ত উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সেই প্রস্তর-গৃহের ঈর্ষণে উন্মুক্ত আর সেই উন্মুক্ত স্থানের চতুর্দিকে অসংখ্য শব্দিনি গুমিনি, প্রস্তরমূর্তির ভাষা, অহরহঃই শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট থাকে। মন্দিরের সম্পূর্ণ মধ্যস্থলে একটি অঙ্গপূর্ণ প্রাকাত কূপ। সেই কূপের চতুর্দিকস্থ স্থল তিনভাগে পৃথকীকৃত। প্রত্যেকভাগ ৭২ বাহান্ত্রবর্ষানি কক্ষ প্রস্তর কক্ষকে সমাবৃত্ত। সেই তিনটী বিভাগ তিনটী সংকার-ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার প্রথম অর্ধাংশ কূপ-সমিহিত বিভাগে পিতৃ, তৎপত্নবতী বিভাগে-স্ত্রী এবং তাহার পরের বা শেষ বিভাগে পুত্রাদিগকে পরিত্যাগ করা হয়। মন্দিরের একটীমাত্র দ্বার।

সেই দ্বার-পথে শবদেহ আনীত ও স্ত্রীপুত্রস্ব পিতৃভেদে বিভিন্ন বিভাগভায়ে রক্ষিত হয়। প্রথমে শবের সচচরণ ও পরে মৃতবাক্তির শোকার্ত আত্ম-যজ্ঞন ও বহুবর্ষ প্রবেশ করেন। তাঁহারা মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া মন্তো-চ্ছারণ করিলে, শব বাহকগণ শবদেহ ভিতরে প্রবেশ করে এবং শবদেহ সম্পূর্ণ উল্লগ করিয়া নির্দিষ্ট অংশে একত্র ও কক্ষ প্রস্তরের উপরে রাখিয়া গৃহে চলিয়া যায়। তখন উপরিস্থ শব্দিনি গুমিনিগণ ধলে ধলে নিজে অবতীর্ণ হয় এবং অতঃকালে মধ্যোই কক্ষাল ব্যতীত, সমস্ত শবদেহ উত্তরণ্যত করিয়া, আবার বহু স্থানে গিয়া উপবেশন করে। তিন চারি দিবস পরে মৃতের একজন আত্মীয় 'বোখ্মা'র আশ্রয় উপস্থিত হয় এবং পতিত কক্ষালগুলি গ্রহণ ও কূপমধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক সংকারের শেষ অঙ্গ সমাধা করিয়া থাকে। 'বোখ্মা'র বাহিরে একটি উপাশনা গৃহ আছে। অগ্রে সেই গৃহে উপাশনা করিতে হয়, নচেৎ 'বোখ্মা'র প্রবেশ নিষিদ্ধ। পারসিকদিগের মতে— 'শবদেহ সমাধিস্থ করিলে মৃত্তিকা কলুষিত হয়, অগ্নিসংস্কারে তাহা হয় না বটে, তবে তাহাতে কাহারও কোনও উপকার হয় না, কিন্তু এই ভাবে পরিত্যক্ত হইলে, বহু জীবের আহাৰ সংস্থান হয়। হুতরাং এই প্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট।'।

আফ্রিকার আদোলা দেশের লোকেরা মৃত্যুকে প্রথম মঙ্গলজনক ও শ্রীতিকর ব্যাপার বলিয়া বোধ করে এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, নানাবিধ শ্রীতিগ্রন্থ অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মতে, মৃত্যুর পরেই সংকার নিষিদ্ধ। কেহ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, তাহার শব গৃহমধ্যে শব্দের উপর রাখা করে এবং বহুবাহুবধিসিক্ত ব্যাতিতে আধুনিক কক্ষ তাহাদিগের সহিত আমোদে গীত বাজা নৃত্য ও পান ভোজননে রত হয়। সপ্তাহকাল সেইভাবে আতিবাহিত হইলে, তাহারা একটি শূকর আনয়নপূর্বক, মৃতের প্রোতায়ার উদ্দেশ্যে বলিগ্রহণ করে এবং তাহার মস্তকটী নিকটবর্তী নদী, হ্রদ বা তৃণাধিতে বিসর্জন দিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করিয়া থাকে।

তার পর অত্যধিক জরাজীর্ণ হইয়া পান না, স্ত্রী করে ও বাচ্চনা বাচ্চায়। স্ত্রীর পুত্র নৌপ্রাণিও তাহাতে যোগদান করিতে সূচিত হয় না বরঞ্চ অধিক মনোযোগে উদ্ভাসের জায় আচরণ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে দৌরবাসিত বলিয়া বোধ করে। যদি কেহ তাগোনিগের সেই পান-বিহীনতার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞ বা নিম্না করে, তাগোনিগের বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয় না, অপিচ দৌরবেষ সহিত অগ্নানবধনে উত্তর দেয়— “সে কি গো, আমাদের মা, বাপ মহিমাছে না? আমরা এতপ আনন্দ করিব না ত আর কে করিবে?” আফোলোবাসীর সংস্কার কার্যে যথেষ্ট অর্থ অপব্যয়িত হয়। গৃহস্থায়ী বিষয় বহুত বিধ। কি বিক্রয় করিয়াও সংস্কারের বাহনগ্রহে সূচিত হয় না। অনেক সর্ব্বণ ব্যয় করিয়া শেষে উদভারের মস্ত পরের দারস্থ হইয়া থাকে।

অষ্টেলিয়া বীপের আদিম অধিবাসীরা বৃক্ষ-মিগকে হাং এবং আর সকলকেই প্রোথিত করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও রমণী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাখিয়া পরলোকগত হয়, তবে তাগোকে তাহার সেই পুত্রের সচিত্ত সমাধি প্রদান করে। গ্রীণল্যান্ডের এস্কিমো (Esquimaux) ও রেডস্কিন (Red skin) জাতি মৃত স্ত্রীলোকের সচিত্ত তাহার শিশু, বাবা সকল পুত্রকেই প্রোথিত করিয়া থাকে।

সেকালে মিশরদেশে এক অতি অকৃত সংস্কারপ্রথা প্রচলিত ছিল। অধুনা সে প্রথা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে, কি হান ও সম্ভার্য বিদেশের মধ্যে চলিত আছে, তাহা অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত। মিশরে শবদেহ রক্ষিত হইত। সেখানে কোনও বিধবশালী লোক বৃত্তান্তে পতিত হইলে, তাহার শব এক অভিন্ন অপরূপ কোণে অর্থাৎ মণ্ডপ, বৃক্ষ-নির্মাণ প্রভৃতি পদার্থে রক্ষিত ও একপ্রকার অগ্নির স্মৃতি বস্ত্রে আবৃত করিয়া, নিভর (Cedar) নামা কাঠে রচিত স্থম্বর, স্তম্ভায় শবদেহের মধ্যে স্থাপন করা হইত। সেই শবদেহের দৌরবেষের নীমা পরিণামা থাকিত না। উহা সময়ে সময়ে নানা শিল্পকৌশলময়

চিত্রে, বিবিধ মূর্তি ও ফলফলের বিভিন্ন প্রতি-রূপে, মণি মূর্তি ও বর্ণবস্ত্রে সুশোভিত, বিমণ্ডিত করা হইত। কেহ কেহ আবার আপন নাম অক্ষর করিবার, কি স্থূর ভাবিত্তে স্বীয় শবদেহ বা অস্ত্র স্ত্রী, স্ত্রী ও পতিত মণ্ডপের নিকটে প্রতিপন্ন হইবার মন্ত, নিজ শব-শিল্পকের উপরে, উল্লিখিত চিত্রাধি বাস্তব, চিত্রবর্ণে (Hieroglyphics) আপন নাম, ধাম, পদ-মর্যাদা, বংশ-পরিচয় ও আপন জগৎপারিত্রিক বিষয় ভুক্তি করিয়া রাখিত। এক এক সময়ে, কি ব্যক্তি-বিশেষের শবদেহে এক একখানি প্রগল্ভ (Farce) এবং অনতি-দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ নাটক শবদেহে মূর্তিত করা হইত। বর্তমানকালে মিশরের পুরাতত্ত্বের অধ্যয়নকারকে মূর্তিকা পদন করিতে করিতে, এই বিভিন্ন উপায়ে রক্ষিত, সহস্র সহস্র বর্ষের পুরাতন কত মৃতদেহ ও শবদেহ আবিষ্কৃত ও উন্মোচিত হইয়াছে। সেই সকল রক্ষিত শবদেহ “মমী” (Mummy) নামে প্রসিদ্ধ। মমী শবদেহে রক্ষিত হইলেও তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত। সেইজন্য মমী-লোকেরা মমীগর্ভ শবদেহের রক্ষার জন্য স্থূর সমাধি মন্দিরেরও গঠন করিয়া গিয়াছেন। মিশরে যে সকল অস্ত্রভেদী ও চতুর্ভোজ দার-দ্রব্যসকল (Pyramids) পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকৌশলের স্মৃতি সমাধি-ভবন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সকল সমাধি স্তম্ভাঙ্কের ৪,০০০ চারিদিকের বর্ষেরও অধিক পূর্ববর্তী। রামায়া প্রোগাদ হইতে সমাধিমন্দিরই অধিক দূর করিয়া প্রস্তত করিতেন। কারণ সমাধি আত্মা ও দেহের চির বাসস্থান। মিশরীয়দিগের বিশ্বাস—মৃত্যুর পর আত্মা ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করে এবং স্থান না পাইলে অসংস্রবে পতিত হয়। কিন্তু নিজের পুরাতন বাসভবন বা দেহ পাইলে আনন্দের সহিত তাহাতে আনিয়া বাস করে। আর তৎকর্ত্তই আত্মার চিরস্থায়িত্বের জন্য মমী আর মমী রক্ষার নিমিত্ত শবদেহ ও পিত্তা-মিত্তের স্মৃতি।

নিউজিল্যান্ডের ‘মেহরী’ জাতির সমাধি-প্রথা অতীত বিচিত্র। তাহাদের বিশ্বাস

মৃত্যুর পরে প্রত্যক্ষা তিন দিবস কাল দেহে অবস্থিতি করে। সেই কল্প তাহার তিন দিন যুগে রাখিয়া শেষে মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া থাকে। তাহারেব মধ্যে কোনও সর্দারের মৃত্যু হইলে, তাহার লব একটা মৃতদেহের উপরে রক্ষিত হয় এবং তাহার মুখে, বাহ্যতে ও বক্ষে তৈল মাখাইয়া, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করিয়া ও মস্তকে পক্ষিপালক-সমায়ুক্ত হরিৎ পত্রাবলীর উষ্ণীয় বিয়া, "ফর্মেনিয়ম্" (Phormenium) নামা তদ্বেন-জাত মূল্যবান গুহ্মবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত একটা পরম রমণীয় আবরণে তাহার সজ্জা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহার আত্মীয় পরিজনগণ, বৈদ্য সাহিবে সমাগত হইয়া, সকলে একযোগে অক্ষ-বসজ্জন ও লগ্নে লগ্নে উচ্চৈঃস্বরে চাঁৎকার, বিলাপ ও শোক-সঙ্গীত গান করিতে থাকে। পুত্রাদি নিকট আত্মীয়গণ বিরে করাঘাত করিতে ও ক্রীলোকগণ নবে মুখ অঁচড়াইতে আরম্ভ করে। যুতের পত্নী আলুলায়িত কেশে ও অসু খালু বেণে উপাখ্যত হয় এবং দায় নিবাস-সহকারে উচ্চকণ্ঠে রোদন ও সরোবনে স্বামীর কীৰ্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করে আর এক এক বার আছাড় বাইয়া মাটিতে পড়ে ও বার বার মাটিতে মাথা ঝুটিতে থাকে। সেই সময়ে একজন সর্দার লগ্না সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং একখানি মূল খণ্ডি আঘাতে তাহাকে ভূপাতিত ও নিহত করে। আরপর যুতের ক্রান্তদামলগ একে একে উপনীত হইলে, তাহাদিগকেও ঐরূপে বধ করা হয়। তখন গ্রামিকৃষ নিরুপেয়ে সমস্ত সমাগত মেঘরী, ভীরবেগে সেই দামলিগের মৃতদেহের উপরে লাফাইয়া পড়ে এবং নরমাংস লোমুপ নিহা শাদ্দের জাভ, তাহাদিগের দেহ বধ বধ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে আর সেই সকল ছিন্ন অস্থিমাংস লইয়া শব্দ্যর কাড়াকাড়ি ও মায়াযার করিতে থাকে। তখন দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি হিংস্র খাপদ নরদেহ লইয়া ঘোর বিবরণে প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর সেই নরমাংসান্নী ভীষণপ্রকৃতি মেঘরীগণ চারিদিকে আঁরি জালিয়া, সেই সকল অস্থি-

মাংস বধ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। তখনকার সেই ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ড—অস্থি চক্ষুণের কড় কড় লব্দ্য শ্রবণ ও মাংস শোণিতের, মাড়ী-ভীত চড়াছড়ি মাগমাগ দর্শন করিলে শরীর শিথরিয়া উঠে! তারপর তাহার মগলান করিয়া ত্রিঘ্নক্ষণ নৃত্যকরে, নৃত্যান্তে মৃত সর্দার ও তাহার পত্নীকে দুইখানি শিখিবাধ উপবিশ্ঠভাবে স্থাপন করিয়া শোক-স্মৃতি গাহিতে গাহিতে সমাধি-পক্ষে লইয়া যায় এবং সেই পক্ষান্তের উপরে উভয়কে পালাপালি ভাবে সমাধি দিয়া বিলাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আইলে। সমাধিভলে মৃত সর্দারের ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদ এবং উভয়ের ২০০ আড়াই মালের উপযুক্ত বাগ ও পানীয় রক্ষিত হয় এবং সর্দারের সমাধির উপরে একটা স্তম্ভ নির্মাণ পূরূক উভয় সমাধি, মৃতি খোদিত, উচ্চ ও লোহিত কাষ্ঠ দণ্ডের দ্বারা বেটন করিয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র মেঘরীরা পক্ষতগন্ধরে মৃতদেহ স্থাপন ও উৎসর্গ স্থাপি রাশি প্রস্তরের আবরণ দিয়াই সমাধিকার্থ নির্মাণ করে। তবে পিতা বা মাতার মৃত্যু হইলে কি কেহ মৃত করিতে গিয়া নিহত হইলে, তাহাকে প্রোথিত করে না, উদগৃহ করিয়া ফেলে!

নিউ ক্যালিডোনিয়া, পলিনেশিয়া, টঙ্গা ও ফিলিপীনে এবং দাকোটা, টিহুক, কাবির, বাহোমী, ও নিগ্রোভারি মধ্যে যদি কেহ কাল কবলিত হয়, তবে তাহার পত্নীকে বধ করিয়া তাহার সহিত প্রোথিত করা হইয়া থাকে। কীরান, জুলু, মিলান, প্রকৃতি অদর্শা সস্ত্রাধ মৃতের দাম দাসীদিগকে তাহার সহিত প্রেরণ করে। মধ্য আফ্রিকার বন্ধুবান্ধবদিগকে মৃতের সমভিবাগারী করা হয়। চিলুকজাতি মৃত পুত্রের সহিত তাহার জননীকে সমাধি প্রদান করে। আবিটিয়াম্ দেশে মৃতের মাতা যুগ্মমাতা ও পিতামহীকে তাহার সহিত কবর দিবার পদ্ধতী প্রচলিত। পূর্বে অনেক স্থানে অনেক জাতির মধ্যেই এইরূপ বধ নিয়ম রীতি প্রচলিত ছিল কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন সেই সকল রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপেই বহিত হইয়া গিয়াছে।

মুরোশ, আমেরিকার সমগ্র সভ্য সমার— ইংরাজ, ফরাসী, চব, জাপান, অস্ট্রি, ইতালীয়, পর্তুগীজ, স্প্যানিয়ার্ড, গ্রীক প্রভৃতি যুরোপ এবং পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান জাতিই সমাধির লক্ষণাভী। তাঁহারা সকলেই মৃতদেহ কবিনে (Coffin) রাখিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অধুনা নানা কারণে সমাধিপ্রথা অস্ববিধাজনক ও অস্বাস্থ্যকর

বিবেচিত হওয়ায়, অনেকই ক্রমশঃ ঘাঘের লক্ষণাভী হইয়া পড়িতেছেন আর শুষ্কত্ব হানে হানে দুই চারিটা কটকটম ও প্রোথিত হইতেছে। \* দেখুন লক্ষণ বেশা ঘাইতেছে, তাহাতে অল্পমান হয়, অধূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল জাতিই অস্বাস্থ্যকরের অহরহী হইয়া উঠিবে।

শ্রী অঘোরনাথ বসু কবিশেষণ।

## মফঃস্বলের বাণী

বর্তমান অবস্থায় আমাদের

কর্তব্য

প্রিয়তম মুসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারা হৃদয় সংসার পাইয়াছেন অনিবার্য কারণ বশতঃ আমাদের অজ্ঞানতার ত্রিটি গবর্ণমেন্টের সহিত তুহর রাজ্যের মুখ বাধিয়াছে। মূলতান আমাদের ভক্তির পাত্র, তাঁহার সহিত আমাদের নহামাত্র সম্রাটের কোনরূপ মনোমানিত্র বা যুক্তসংঘটন হওয়া অত্যন্ত দুঃপের ও আক্ষেপের বিষয় বটে। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ অবগত হইলে বুঝিতে পারিবেন এই অনর্থ সংঘটনে আমাদের সমাপন ত্রিটি গবর্ণমেন্টের বা তুর্কীর মাননীয় মূলতানের কোনও দোষ নাই। তুরস্কের নব্য সাম্রাজ্য প্রাচ্যমানী অস্ত্রার ও স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় বিপথগামী হইয়া সমরানলে মগ্ন প্রদান করিয়া মুসলমান রাজ্যের স্বাধীনতা ও তুহর রাজ্যের ক্ষতি করিতে উদ্ভূত হইয়াছেন। তুরস্কের মহামাত্র মূলতান ও প্রবীণ সাম্রাজ্য এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতীয় মুসলমান জাতগণ ও বৃহৎ সভাসমিতি পুনঃ পুনঃ তুর্কী গবর্ণমেন্টকে অস্বগোধ করিয়াছেন বাহ্যতে তাঁহারা এই পরীক্ষাণকারী মহালম্বরে

যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষ থাকেন। এই যুদ্ধ সংঘটনের অব্যবহিত পূর্বে আমাদের মাননীয় বড় লাট সাহেব বাহাদুর যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন মূলতানের রাজ্যের সহিত যুদ্ধ সংঘটন নিবারণের মাত্র ইংরেজ গবর্ণমেন্ট কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন। নব্য তুর্কীশলের আবিস্কারকারিতা এই যুদ্ধের মাত্র দাবী। যুদ্ধ প্রচার হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ গবর্ণমেন্ট খীর স্বাভাবিক উদারতা শুধে প্রচার করিয়াছেন যে তুর্কী গবর্ণমেন্ট যদি ভারতীয় মুসলমান স্বাভিগণের উপর অত্যাচার না করেন তবে সশ্রদ্ধান্ত লাভ ঐ সকল পাবিত্র হান আক্রমণ করিবেন না। আমাদের ভারতীয় মুসলমানগণের মনোকষ্ট না হয় ও ভারতীয় তীর্থ স্বাভিগণের প্রতি তুর্কী গবর্ণমেন্ট অত্যাচার না করেন এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধকালেও শ্রদ্ধা, মদন, মেধা প্রভৃতি পবিত্র হানগুলির সম্মান রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিশেষ অহরোধে মিত্রশক্তি ফরাসী ও কবিয়া ঐ সন্তে সম্মত হইয়াছেন।

এই যুদ্ধের সহিত যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা ধর্ম-যুদ্ধ বা জেদান নহে। ধর্ম-

\* গত ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে, লণ্ডন নগরের অনতিদূরে একটা লম্বাহার কারণে ঘাপিত হইয়াছে। কিন্তু উহার বহু পূর্বে হইতেই ইংরেজের লম্বাহার লিঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। লণ্ডনের অনেক বিদগ, বৃত্তার পরে তাহার বেহ বাহ করা হইবে বলিয়া, অভিনয় একল করিয়া যায়। তৎপূর্বপরে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার বেহ বাহ করা হয়। উহাই বোধ হয়, ইংল্যান্ডের এখন অস্বাস্থ্যকর।

যুদ্ধ কেবল মুসলমান ও খ্রিস্টীয় মধ্যে হইতে পারে। আপনারা অবগত আছেন জাঙ্গানী এই যুদ্ধের নেতা। তুর্কীর নব্য সম্প্রদায় ইহাতে যোগদান করিলেও উহার জাঙ্গানীর আবেলাহুসারে চলিতে বাধ্য। জাঙ্গানী যে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহার আপামর প্রজা সাধারণের প্রতিও অত্যন্ত মূল্য ও অত্যাচার হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আমরা যেমন যুদ্ধ স্থপ শান্তিতে বাস করিতেছি ও স্বীয় ধর্ম কথ্য নিষ্কিয়ে সম্পাদন করিতেছি তাহা স্বরণ করিলে মনে হয় আমরা যেন ইসলাম রাজত্বেরই বাস করিতেছি। বাস্তবিক ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট একটা মহতী মুসলমান শক্তি বটে। অস্ত্রাশ্রয় দেশের অধীন প্রাণাণের অবস্থার সহিত তুলনায় আমাদের স্বপ্ন, শান্তি, ধর্ম সহজে স্বাধীনতা। একটা মূল্যবান স্বপ্ন মনে করিতে হইবেক। নিত্যমাত্র বাতুল ব্যতীত কেহ এই গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তন কামনা বা আশা করিতে পারে না। এই সময় আমাদের সকলের উচিত যে আমরা খোদাতালার নিকট বর্তমান গবর্ণমেণ্টের স্বাধিক প্রার্থনা করি। “বিশ্বের সময়েই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় হয়।” এ সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এ সময়ের সামান্য সাহায্যও অনেক। মুসলমানের শত্রুর অভাব নাই। আমাদের অতি সাবধানে চলা আবশ্যিক। দুই-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ মিথ্যা সংবাদ রটাইয়া আমাদের ভ্রাতৃগণকে হুণখে চালাইতে পারে। এবং আমাদের সামান্য কার্য লক্ষ্য ক্রিয়য়া—তিনকে ভাল সাঙ্গাইয়া—মুসলমানকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। এই জাতীয় লোকের বৃত্তি ও পরামর্শ হইতে দূরে থাক। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আমাদিগকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিতেই হইবেক এবং ইহা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। অগ্রেও জ্ঞাপ্য উচিত নয় যে, জাঙ্গানী কখনও এদেশ মঞ্চল করিতে পারিবেক। তাহাদের জাহাজসকল নিজের দেশের সমুদ্রে আবদ্ধ আছে, বাহির হইতে পারিতেছেনা। যদিও

তাহাদের দুই একখানা জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে দৃষ্ট মৃগালের মত নিঃসংগর সদাগরী জাহাজ নষ্ট করিতেছে ও মহাসমুদ্রে ইংরেজ বহুরেপী আগমনে ক্ষতবেগে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে তথাপি ব্রিটিশ সিংহের সমুদ্রীয় হইবার শক্তি বা সাহস তাহাদের নাই। বিশেষতঃ জাঙ্গানীর প্রধান জাহাজ এমডেন ইংরাজের জাহাজ কর্তৃক সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে এবং কনিগলবার্গ আবদ্ধ হইয়াছে সুতরাং ভারত ও প্রাচ্য মহাসাগর সম্পূর্ণ নিরাপন্ন হইয়াছে। যদিও আমরা সম্পূর্ণ ভরসা করি কোনও মুসলমান জাহাজ কোনওরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণ কবিবেন না তথাপি উদাহরণকে হুণখে প্রদর্শন করা প্রত্যেক জাঙ্গানী মুসলমানের কর্তব্য। তৎক্ষণত সমাজের নেতৃগণকে বিশেষ অহরোধ করিতেছে যে, উদাহরণ বেন নিজ নিজ সমাজের লোকের কাথ্য কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং উদাহরণকে সঙ্গপনেশ প্রদান করিয়া হুণখে রাখেন। ঘর কোনওরূপ অস্ত্রাশ্রয় আচরণ হওয়ার সামান্য সম্ভেদ করেন তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সংবাদ দেন, আবশ্যক হইলে আমরা মকশে যাইয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতে ও সঙ্গপনেশ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা মনে করিবেন আপনাদের কাথ্যের উপর সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি, স্বপ্ন শান্তি নির্ভর করিতেছে। এ সময়েই সামান্য কাথ্যও অতি বৃহৎ ফল বা ফুল আনন্দ করিবেক। স্বাধী গবর্ণমেণ্টের বিকৃতচারণ করা আমাদের শত্রু নিষেধ আছে। আপনারা কোনওরূপ প্রতিকূলাচরণ করতঃ গবর্ণমেণ্টের বিধ-নয়নে পতিত হইয়া নিজের ও সমাজের মঙ্গল রাখিবেন না। এই আমাদের বিনীত অনুরোধ। খোদাতালা মুসলমানগণকে সকল প্রকার আপদ হইতে রক্ষা করুন। আমিন, আমিন। হুরাজ।

## ২। বাঙ্গালীর কলঙ্ক

অনেকেই বলিয়া থাকেন “বাঙ্গালী হজুগ প্রায় ও মূগ সর্দার। এ জাতি হজুগে বড় মাত, মুখে বড় বলে, কাজে ভুত বেদাশ

নাই।" এ কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ করিবার দৃষ্টি আমাদের অতি অল্পই আছে। কোন একটা কথা সৎ হউক আর অসৎ হউক যদি তাহার সহিত একটা হজুগ থাকে, আমরা যিনকর সেইটা লইয়া খুঁই মাতিয়া থাকি। "সাঁড়া ঘাটের নরবলি," "পানে পোকা," "কলিকাতার ছেলে খরা" প্রভৃতি মিথ্যা হজুগেও আমরা মাতিয়াছিলাম। আবার বহুশি আন্দোলনটা যদিও দেশের পরম কল্যাণকর বিষয়, তাহার উপলব্ধি অতি অল্প লোকেরই করিয়াছিল। তবে দেশের তাবৎ তরুণ হইয়া দেশ শুদ্ধ লোক কিছুদিন হৈ চৈ করিয়াছিল মাত্র। এই হজুগে মাতিয়া একদিন বাহারা বিলাতী বস্ত্র ভ্যাগ করিয়াছিল, সিঁদাঠী লগন খাওয়া শাস্তের প্রয়োগায়া নিষিদ্ধ করিতে বলিয়াছিল, বাহারা খাটী বদেষ্টী বলিয়া নিষেধ করিচিত করিতে ছাড়ে নাই, আজ তাহাদের কি ঘোর পরিবর্তন। বিড়াল তপস্বীর তত্ত্বামী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নরকের কীট স্বর্ণের ছবার পর্য্যন্ত ঘাইয়া আবার পাণপথে ভুবিগাছে।

আবার আমরা মুখে সব করিয়া থাকি। তিলকে তাল করিতে পারি, সৎকে অসৎ বলি, মিথ্যাকে সত্য করিয়া প্রমাণ করি, আমাদের কথার লোকে হাতে স্বর্ণ পায় এবং আমাদের কার্যের সকলতা মুখে মুখে। মুখ আছে তাই আমরা মুখের ববরগুলিকে রক্তিত করিতে কৃত্তিত নহি। দেশের কার্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করি, বাগ্মনৈতিক আলোচনাতে আমাদের মুখে কোয়ার্স বহে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন বুই তৎপর। এই যে মুখে ঘাইব বলিয়া বাগ্মানী হৈ চৈ করিতেছে; বোধহয় রণক্ষেত্রে ঘাইলে সন্মুখভাগ অক্ষত থাকিয়া পৃষ্ঠ-দেশের আঘাত হস্তগতই আমাদের অঙ্গির হইতে হইবে। কথায় কুসিদ্ধা হজুগে মাতিয়া আমরা জানদুস্ত হইয়া থাকি। যে কার্যের উপদ্রুত নই, সে কার্যেও অগ্রসর হই বটে, কিন্তু সুমোহের ছেলে কামাধের কাজ করিতে গিয়া বেতন হাত পোড়াইয়া বাকে, আমাদের কার্যের শেষ অভিনয়ও সেইরূপই হয়। বেয়ালের বশে বহু অর্থ অপব্যয় হইয়া

যায়। দেশে দেশলাইএর কল, চিনির কারখানা, কটন মিল, ট্যানারি কত কি হইল, আছে কতটা? এতদপ হইল কেন? কার্যের উপদ্রুত তত্ত্বাবধায়ক ছিল না, তাই এ মন। হজুগে মাতিয়া ব্যারেষ্টার যদি কাপডের কল চালাইতে বসেন, ডাক্তার ট্যানারির কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, হাকিম চিনির কল চালান, তাহাতে কাজ চলিবে কেন? ব্যারিষ্টার আইনে পণ্ডিত হইতে পারেন, তাঁত বুনিতে জানেন কি? যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে কার্যে কৰ্ত্তা হইলে হাত পুড়িবে না ত কি? কাজ করিতে কাজের উপদ্রুত হইতে হইবে।

কোন কাজ চালাইতে আগে কাজের উপদ্রুত লোক নির্ধারণ করিতে হইবে। উপদ্রুত লোক দেশে না থাকিলে, দেশান্তরে পাঠাইয়া তাহাকে পড়িয়া পিঠিয়া মাছুষ করিয়া আনিতে হইবে। তবে ত কাজ চলিবে। নতুবা বিদেশীয়দিগের কলকারখানা-গুলির লাভের কথা শবরের কাপড়ে পড়িয়া রাতারাতি বড় হইবার হজুগে মাতিলে কামাধের কাজ সুমোহে পারাবে কেন? হজুগে মাতিয়া বড় হইতে চাই, যে সব কাজে অধিকার নাই, সেই সব কাজে হাত দেই, এথিকে যে ঘরের অর্থ হ হ করিয়া পরের হাতে ঘাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি না। মূগধর্ষন আমরা মুখে বক্তৃতার কোয়ার্স ছুটাই বটে, কাজ করি কি? অগতের দিকে চাখিয়া দেখিলে আমাদের মত পরশ্রুত্যাশী জাতি অগতের আন নাই। আমাদের পরিধান বস্ত্র বিদেশী, সুদের আদায় বিদেশী, ঘরের উপাদান বিদেশী, পানের জুতা, মাখার ছাতা, হাতের ছড়ি, পকেটের ঘড়ি, গোবের চশমা, এমন কি পাতের লগনটুকু পর্য্যন্ত বিদেশী, তবুও আমাদের চোখ খোটে না। আমরা বড় হইতে চাই; কিন্তু দিন দিন যে কত ছোট হইতেছি তাহার মাপ কাঠি আছে কি?

বড় বড় কল কারখানা খুলিতে আমাদের খেয়াল হয় বটে, কিন্তু বেশীদূর শিল্পগুলি যে নষ্ট হইয়া ঘাইতেছে, তাহা তাবৎ কম জন? এগুলি যে সামান্য চেষ্টাইই রক্ষা হইতে পারে,



শে কুহ আমাদের আরবেই নাই। ইংলও  
বেতন চেয়েই তাহার শিল্প শিল্পগুলিকে রক্ষা  
করিয়া আর জগতের স্রোত, আমরা। তেননট  
আমাদের উন্নত দেশীয় শিল্পগুলিকে নষ্ট  
করিয়া আর জগতের চেয়ে। এক সময়ে  
ভারতভাষ্য বস্ত্রে ইউরোপের লক্ষ্য নিবারণ  
হইত, তখন ইংলও বস্ত্র বহনে অল্প বলিলেও  
চলে। ম্যানচেস্টারে যখন বস্ত্র প্রস্তুত হইতে  
লাগিল, তখন ইংলওকে ঐ শিল্প শিল্প রক্ষা  
করিতে কত বেগ সঙ্কট করিতে চেষ্টা করিল,  
ইতিহাসজ্ঞদের অবগিত নাই। আর আমরা  
হেলায় অনুমানি পায়ে ঠেলিতেছি—দেশের  
কত শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার খবর  
রাখি কি ?

দেশের উন্নতি করিতে দেশীয় শিল্প রক্ষা  
করিতে হইবে। ইংলওই নানাস্থর বদেষ্ট।  
কুহ শিল্পের আধার না করিলে বহু শিল্প  
হইতেই পারে না। ছোট হইতেই বড় হয়।  
বড় হইতে ছোট হইলে তাহাকে পতন করে।  
কুহ কুহ নিত্য নৈমিত্তিক অভাব পূরণ করিতে  
শিক্ষাই যেকোন বৃত্ত কবে কার্যে টানিয়া লয়।  
একদম বড় হইবার ভাবনা আর কলুর ছেলের  
একহাড়ী ডেল বিক্রয় করিয়া বড় চটবার  
আশা একই কথা। শেষে পায়ের আঘাতে  
ওলের হাড়ীই ভাঙিয়া থাকে। দেশের  
অভাব মোচন করিতে আগে দেশের দিকটা  
দেখিতে হইবে। পূর্বে আমরা একদম পর-  
প্রত্যাক্ষি ছিলাম কি ? যখন ইংরেজ, জার্মান,  
অস্ট্রিয়া, ফরাসী, মার্কিন, জাপান প্রভৃতি জাতি  
প্রতিদিন আবার ভরিয়া জিনিষ আনিয়া  
আমাদের অভাব পূরণ করিত না, তখন কি  
আমাদের দিন কুমে গিয়াছে ? তাহা নহে,  
অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছে। তখন  
আমাদের অভাব আমরাই পূরণ করিতাম।  
তুখু তাহাই নহে, আমাদের নিশ্চিত বস্ত্রাদিতে  
আমাদের অভাব পূরণ হইয়া বিদেশবাসীরও  
লক্ষ্য নিবারণ হইত। আমাদের কামাং,  
কুমোর, তাঁতি তাহার অকাতরে আমাদের  
অভাব পূর্ণ করিয়া দিত। আর এখন আমরা  
সুত হতার বস্ত্রও পরণতানি। আমরা দিন  
দিন বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছি

বটে, কিন্তু সত সঙ্গ অভাব আমাদের প্রতি  
অটু হার্য করিতেছে।

আমরা যে ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বিলা-  
সিতার অত্যাচার করি, সেই ইংরেজের সহিত  
আমাদের রাত দিন প্রভেদ। উহার বাহা  
জানে, আমরা তাহা জানি না। উহার বাহা  
করে আমরা তাহা পারি না। তাহাদের গুণ  
সুখ না, ধোঁহটুকুই গুণ ভাবিয়া থাকি। তাই  
আমরা ছাঃর খার হাইতেছি।

আমাদের সঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণের হিসাব  
নিকাশ বাহার আছে, তাহার বিলাসিতা  
সহিতে পারে। সেটুকু না ব্যকিলেই  
উপহাসাঙ্গ হইতে হয়। একটা মীন  
দাঁতের সন্ধান দাবি একটা ভাল সাটও গায়  
দেয় তবুও সে লোকের নিকট হাতাঙ্গ হইয়  
কেননা এ বিলাসিতাটুকু তাহার আয়ের  
সাহিত মিল যায় না। আমাদের বিলাসিতাও  
এইরূপ নহে কি ? সময় পড়িয়াছে, এখন  
বিলাসবাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।  
তুখু ব্যাকার হইলে চলিবে না হজুপে  
মাতলে কাজ হইবে না। প্রকৃত কাষের  
যোগ্য হইয়া কাজ দেখাইতে হইবে তবে ত  
বাসালীর কলম মোচন হইবে। সুরাজ।

### ৩। রাষ্ট্র অনুসন্ধান সমিতি

প্রথম অধিবেশন।

(সময় ২৭শে ডাঃ ১৩২১ রবিবার পূর্বাঙ্ক ৯টা)

উপস্থিতি—

ঐযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল সভাপতি  
মহামহোপাধ্যায় দ্বপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি,  
আই ই, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ, বি, এল,  
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যাভার্য, শৈলেন্দ্র-  
নাথ বিশ্বাস, সিদ্ধেশ্বর সিংহ, বি, এ, দ্বিপ্রসাদনাথ  
মণ্ডল বি, এল, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাখালদাস,  
রাধ বি, এ

কাৰ্য্যবিবরণ—

অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনিচয় সর্ব-  
সম্মতিক্রমে পরিশুভিত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—রাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস  
পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইত্যাদির অধ্যয়ন ও  
আলোচনার জন্য মাননীয় বর্ধমানাধিপতি

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতার  
বর্ধমান কেন্দ্রে "রাষ্ট্র অঙ্গুলিমান সমিতি"  
স্থাপন সম্বন্ধে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—বর্ধমান  
শাখার কাব্য নির্বাহক সমিতির ৩য় অধি-  
বেশনে যে প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা  
গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে  
সহিৎ এই সমিতি গঠিত হইল—

সভাপতি—

মহামোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ  
সি, আই, ই,

সহকারী সভাপতি

নগেন্দ্রনাথ বসু লিঙ্গাত্তবারিদি প্রাচ্যবিদ্যা-  
মহার্ষি—কলিকাতা।

সম্পাদক—

দিশেবর সিংহ, বি এ—বর্ধমান ( রাজ  
কাছারী )

সহকারী সম্পাদকগণ—

রাখালরায় রায়, বি, এ } বর্ধমান  
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র }

কোষাধ্যক্ষ

সন্তোষকুমার বসু—বর্ধমান

সহস্রগণ—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি এল, হুঁচড়া, অজয়  
চন্দ্র সরকার, হুঁচড়া, অধিকাচরণ গুপ্ত (হুগলী)  
কলিকাতা, কান্তিচন্দ্র রায় হুঁচড়া, কালীপ্রসন্ন  
বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ( বর্ধমান ) ঐ, চন্দ্রকুমার  
শর্মা মণ্ডল বোড়া, বর্ধমান, দ্বিতেন্দ্রলাল  
মিত্র, বি, এ, দাইশাট, বর্ধমান, দুর্গাদাস  
সাহিত্যী চাওড়া, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ,  
বি এল, বর্ধমান, দ্বিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল বি এল  
( বাঁহুড়া ) বর্ধমান, নন্দলাল দে হুঁচড়া,  
নিখিলনাথ রায়, বি, এল এখোরা, বর্ধমান,  
নীলরতন মুনোপাধ্যায়, বি, এ, রামপুরহাট  
বীরভূম, বলদ্রকন রায় বিদ্যভূজ ( বাঁহুড়া )  
কলিকাতা, মুক্তাঞ্জন আচা, বর্ধমান ( রাজ  
কাছারী ), রাখালচন্দ্র মুনোপাধ্যায় ঐ রাখাল-  
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, কলিকাতা, রাজ-

রাজেন্দ্র চন্দ্র ত্রিবাণী, বর্ধমান, রাধাকুমুদ  
মুনোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর এল, কলিকাতা,  
শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলনা, বর্ধমান,  
শিবরতন মিত্র, বীরভূম, সত্যচরণ শাস্ত্রী  
বিবড়া, হুগলী, সুজেন্দ্রনাথ রায়, ত্রিপুরা, পুত,  
হরিদাস পাণ্ডিত ( বর্ধমান ) কলিকাতা,  
মালদহ।

প্রয়োজন হইলে এই সদস্ত-তালিকা পরি-  
বর্তিত ও পরিবর্তিত হইতে পারিবে।

তৃতীয় প্রস্তাব—অনন্তর সমিতির কার্য  
করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমুহ  
গৃহীত হইল;—

(ক) মহারাজাধিরাজের দপ্তর হইতে যে  
সকল ঠাকুরের পুজার জন্য মানিক বা বাৎ-  
সরিক টাকা বরাদ্দ আছে, এবং যে সকল  
প্রাচীন মেলায় মহারাজের সরকার হইতে  
সাহায্য করা হয় তাহার একটি তালিকা  
প্রস্তুত করা।

(খ) সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর এই  
তিন মাসের মধ্যে উক্ত তালিকা দৃষ্টান্ত প্রস্তুত  
হয় তাহা অবলম্বন করিয়া যে প্রদেশের সম্পূর্ণ  
কর্ম পাওয়া যাইবে, সেই প্রদেশে ডিসেম্বর,  
জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এই তিন মাস সভাপতি  
এবং সহকারী সভাপতি মহোদয় অঙ্গুলিমানার্থ  
পরিচয় করিবেন।

(গ) এই প্রাথমিক পরিচয়মণে কিস্তি কাজ  
হয় দেখিয়া এপ্রিল মাসের পূর্বে সমিতি  
কিস্তি কার্য করিবেন তাহার বিবরণ এবং  
তাহাতে কত ব্যয় হইবে তাহার হিসাব  
প্রস্তুত হইবে।

(ঘ) প্রথম তিন মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর  
হইতে নবেম্বর পর্যন্ত মহারাজের দপ্তর হইতে  
উপরিউক্ত তালিকা প্রস্তুত কার্য হইবে।

(ঙ) অন্তঃপর তিন মাস উক্ত সময়ের  
প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সভাপতি

বীরভূমবার্তা।



আমাদের সমর-সচিব লর্ড কিচেনার

# গাহন

অগ্নি মেলি সোম' অনেক গুঁজি, আর, অগ্নি  
বাগিচের চাওর' শেষ, সেখি মনি ভিতরে ঢাঙিলে তর ।  
ক'নু ক'নিহু আকুল প্রাণ, ভিতরের দিকে ফিরায়ে নখন,  
নীধব কবাই বুকের বসনা দেখায়ে নামান তর,  
অনেক খুঁজেছি অগ্নি মেলে, সেখি অগ্নি বুকে বসি তর ।

বাগিন বিধ চূর্ণ, আছে গো প্রলয়-অগ্নির তরু,  
ভীব গম্বীর অন্তর বিকটি, সমাট কবিছে ধু ধু ।  
তুমি তুমিই উঠ শাকভনে, ওকাব হ'তে জাগ গো শুনো,  
এ নাভিপথে ক্ষয়পথে, জাগ গো শরণ বঁধু ।  
লগে চলি স্থা এত তাবা শত ভুলাবতবা নধু ।

এমনি করিয়া সকল বিধ আনাতে উঠিবে জাগি,  
বিশ্বের রাক্ষ, এমনি করিয়া হ'বে তুমি অছরাক্ষি ।  
বাগিচের চাতিয়া মিলে না তোনায়ে, নখন হুগিয়া বুকেছি এবায়ে,  
তোমাব লাগিয়া ফিবিব না আর সকলের ঘায়ে মাগি,  
আগারের ঘন বিশ্বের লগ, আগারের উঠিবে জাগি ।

শ্রী কালিদাস রায় ।

৬ষ্ঠ খণ্ড

৬ষ্ঠ বর্ষ

পৌষ, ১৩২১

তৃতীয় সংখ্যা ।

## আলোচনা

১। ভারতের যাচুঘর

ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশে একটি মাত্র  
মিউজিয়াম আছে । প্রদেশবাসী জনসাধারণ  
এই সকল মিউজিয়াম দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা-  
লাভ করিবার সুযোগ প্রায়ই পায় না । বড়  
সহরের বিশাল ভবনে প্রবেশ করিয়া কয়জন

পট্টাবাসী কৌতুহল নিবারণ করিতে সাতস  
পাচ ৭ কিস্ত প্রত্যেক মেলায় ছোট খাট  
সংগ্রহালয় থাকিলে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী,  
ছাত্র, শিক্ষক, কেরানী, হাকিম সকলের  
চোখের সমুখে দর্শনীয় বস্তুগুলি বিরাজ করে ।  
সংগ্রহালয়ের আবহাওয়া মেলায় মধ্যে জান-

লাভের একটা নূতন উপায়সমূহ হয়। কথায় কথায়, বিশেষ কষ্ট কল্পনা করা করিয়াও জনসাধারণ এই সকল নিউজিধানের অন্তর্গত ব্যবাসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে। দেশবাসীকে যথেষ্টের সুখী হইয়াইবার পক্ষে ইহা ব্যতীত আর কোন সহজ পথ অবলম্বন করা অসম্ভব।

ভাষণের বাহারা পাণ্ডিত্যের অন্ত এই সকল বস্তু বর্ণন করিতে চাহেন, তাহারা জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রদেশের বড় সংগ্রহালয়ে আসিলেই তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ সুযোগ পাইতে পারেন। হস্তগত অর্জনশক্তি এবং ইংরাজীতে অনতিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর ক্ষমতা যথেষ্টের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া দিবার অন্ত ভাবতবর্ষের ভিতর ছুই বৃহৎ নানা সংগ্রহালয়ের প্রবর্তন করা কর্তব্য। বর্তমানে যত বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয়, সমস্ত জাতির ভিতর জ্ঞানবিস্তার করিবার সুবিধা তত বেশী হইতেই যাবে। দেশের মধ্যে কোন একস্থানে একটা বিপাল কেন্দ্র স্থাপন করিলে মুষ্টিবের লোক ব্যতীত উপকার লাভ করে না।

বিশেষতঃ বিশাল সংগ্রহকেন্দ্রে নানা জেলায়, নানা প্রদেশের, নানা জাতির তথা সংস্কৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলি দেখিয়া জনগণ বিশেষ উপকৃত হয় না। সে সমুদয় পদার্থ তাহার নিকট নিতান্তই অপরিচিত। কিন্তু যে জেলায় বা যে জনপদে লোকেরা বাস করে, সেই স্থানের অরণ্যবোধ্য পদার্থ নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রে জমা থাকিলে লোকেরা সহজেই সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরিচিত সামগ্রীগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে ক্রমশঃ পরিচিত ও দূরদেশীয় বস্তু সমূহ জানিবার অন্ত তাহাদের আগ্রহ জন্মে।

২। সফলতা ও বিফলতার প্রভাব  
 জয় বা পরাজয়, সফলতা বা বিফলতা সংসারের নিত্য ঘটনা। এই ঘটনাসমূহের প্রভাব মানবচরিত্রের উপর অত্যধিক। যদি কোন কাহো সফল হয়, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎজীবন যেমন হইবে, কাহো বিফল হইলে তাহার ঐক অন্তরঙ্গ হইবে। “কর্মণ্যো-বাধিকারতে না ফলেন্দু কদাচন”—নিঃশেষে চিরকাল লোকের আদর্শবস্তুই রহিয়াছে। এই আদর্শ কাহো পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কারণ কাহোয় সফল বা সফল মাহতের জীবনকে চিরকালই প্রবলভাবে গঠন করিয়া আসিয়াছে। সফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনে আর বিফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনে আকাশ পাতাল পার্থক্য। দুইয়ের চিন্তা, কণ্ঠ, হাবভাব, আশা আকাঙ্ক্ষা দুই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ।

ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা বিফলতার প্রভাব অনেক সময়ে আশ্রয় লক্ষ্য করিয়া থাকি। একজনের জীবনে আশা উদ্ভব উৎসাহ দেখিয়া সুখ, এই ব্যক্তি পূর্বে ক্রমাগত উন্নতির পথে উঠিয়াছে। আর একজনের মুখে বিবাদের ছায়া ও নৈরাশ্রের কালিমা দেখিয়া অনেক সময়ে আশ্রয় সুখকে দারি যে তাহার জয় পূর্বে কোন ঘটনায় ভাবিয়া গিয়াছে। আর সকলেই এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন।

এই দৃষ্টান্ত জাতিগত জীবনেও বড় কম নয়—বয়ং বেশী। কিন্তু সাধারণতঃ আশ্রয় জাতিগত জীবনের উপর সফলতা ও বিফলতার প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি না। ঐতিহাসিকেরা, শিক্ষকেরা এবং রাষ্ট্রনীতি-বিশারদেরা কোন জাতীয় চরিত্রের ভাল মন্দ আলোচনা করিতে বাইরা তাহার গঠন

পূর্ববর্তী কৃতকাংক্ষা বা নৈরাশ্রের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন না। তাঁহারা সম্ভবতঃ কেবলই দেখেন না যে একবার যে কোন উপায়ে গা আড়িচা ঝাড়তে পারিলে সমস্যার মধ্যে নানা সম্ভবতার সন্ধান হয়। আবার কোন কারণে পণ্ডন হইলে আশ্রিত চরিত্রে নানা বোধ প্রবেশ করিতে থাকে। উদান ও পতনের ফলে জনগণের মধ্যে দুই স্বতন্ত্র প্রকার আবেগ হওয়া স্ফট চইয়া যায়।



### ৩। টোলে শিক্ষাসংস্কার

আমাদের দেশের টোলে বিস্তার পণ্ডী বড়ই সন্ধান হইয়া পড়িয়াছে। দেশানে গুটিকয়েক বাধা বিষয় ছাড়া আর অল্প কিছুই শিক্ষাদান হয় না। আমরা দেখিতে পাই অধিকাংশ টোলেই ব্যাকরণ, কাব্য, মর্শন, শ্রুতি প্রভৃতির অধ্যাপনা হইয়া থাকে। কিন্তু গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, রসায়ন প্রভৃতি হিন্দু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারগুলি ছাত্রদের কাছে একেবারে অপরিচিতই থাকিয়া যায়। কেবলমাত্র পূর্বোক্ত সামান্য বিষয়গুলিতে বিশেষজ্ঞ করিবার অল্প গোড়া হইতেই চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ফলে টোল হইতে ছাত্রগণ যখন বাহির হয়, তখন তাহাদের শিক্ষার সন্ধানতা সংসারে চলিবার পথে প্রতিপথে বিস্তর অসুবিধা। আমরা দেখিয়াছি, এমন অনেক ছাত্র টোল হইতে বাহির হইয়া, বহিরা জমাখরচ পঞ্চাশ কেমন করিয়া নিষিতে হয়, তাহা জেনেন না। কিন্তু একজন সন্ধান শিক্ষাদান আসে। বাহ্যিক নহে। আমরা মনে করি, টোলের প্রাথমিক শিক্ষা আরও ব্যাপক হওয়া আবশ্যিক। সেই শিক্ষায় নানা বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান ছাত্রগণ অর্জন

করিতে সক্ষম হইবে। বোধ হয় ব্যাকরণ শিক্ষার পক্ষেই একজন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। নিয়ম করা উচিত তাহারা এই প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে নিখা না যাইবে, তাহারিগকে অল্প কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে দেওয়া হইবে না। কতদিন পঞ্চাশ এইরূপ শিক্ষার কাল নির্দিষ্ট থাকিবে— কি উপায়ে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, সে সব কথা কল্পনায় না নাশিলে ঠিক করা কঠিন হইবে। বর্তমানে যে সব পণ্ডিত টোলে অধ্যাপনা করেন, হয় তা তাহাদের অধিকাংশের ঘারা নানা বিষয়ের শিক্ষার্থী নাও চলিতে পারে। কিন্তু কল্পকল্পীরা যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নানা স্থান হইতে উপযুক্ত পণ্ডিত আনয়ন করিয়া কোন বাক্যে ব্যাপক শিক্ষার কার্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। তবে অর্থাভাবে সব টোলেই ঠিক এরকম বন্দোবস্ত গোড়াতেই হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু চেষ্টা করিলে অন্ততঃপক্ষে একটা আদর্শ টোলও যে না হইতে পারিবে, একজন নহে। সেই আদর্শ টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ দ্বারা দেশে অত্যন্ত টোলেও ব্যাপক শিক্ষাপ্রদানী প্রবর্তন করা সহজ হইয়া যাইবে।

বর্তমান অসন্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রত্যেক সন্যাসীরই কর্তব্য। বিশেষতঃ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সেজন্য পরিচয় পরিপূর্ণ হয় না, সত্য; কিন্তু দেশের কল্যাণকামী শিক্ষিত মহাত্মগণ যদি মাতৃভাষার মধ্যস্থিত জনগণকে বর্তমান অসন্তের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা পান, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা আশাহত জন পাইব।

টোলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হয়, মাতৃভাষার স্থান তথায় নাই। কারণ মাতৃভাষায় কিছু

জানলাভ করিয়াই ছাত্রগণ টোলে প্রবেশ করে। অতএব তথ্য ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক যদি সরল সংক্ষেপে লিখিত হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপের মধ্য দিগ্ধি ছাত্রগণ অনেক তথ্য আয়ত্ত করিতে পারিবে। বর্তমান জগতের সঙ্গে তাহার। সেইরূপেই পরিচিত হইতে সুযোগ পাইবে।

### ৪। বিদেশের কৃষি শিল্প

ধনবিজ্ঞানের মামুলি গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে মনে হইবে, ইউরোপে শিল্পই প্রধান, কৃষিকর্ম ভারতবর্ষের একচেটিয়া অঙ্গসংস্থানের পথ। ভারতবর্ষে শিল্পের অভাব, ইউরোপে কৃষির অভাব! পাকাত্য জগতের কথা উল্লিখিলে আমরা সর্বাংশে “Industrialism” শিল্পক্ষেত্র, বড় বড় কলকারখানা, লোহালতড় বালগুহাম ইত্যাদির উল্লেখ করি। আর ভারতবর্ষের বৈবক্ষিক অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে বাধা পং আওড়াইয়া থাকি, “India is an essentially agricultural country,” ভারতবর্ষ “essentially non-industrial.”

তবে স্বচক্ষে পাকাত্য দেশ দেখিলে এই মামুলি কথার অসত্যতা সঙ্গ্ৰহণ হয়। সে দেশে শিল্পের প্রভাব বেশী কি কৃষির প্রভাব বেশী তাহা বিচার করা বড় কঠিন। কাগজপত্র, statistics, ব্যবসায়-শিল্প-কৃষির বিবরণী ইত্যাদি লইয়া মাথা না ঘামাইলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা বৃত্তিতে পারি, সেখানে কৃষির প্রভাবও যথেষ্ট। কৃষিকর্ম অনেক আতির, বধা করালীর, অঙ্গসংস্থানের

প্রধান উপায়। এমন কি ক্রান্ত দেশকে যদি কোন ব্যক্তি কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া বর্ণনা করে, তাহার মত অবজ্ঞা করা সহজ হইবে না। ভারতবর্ষের অপেক্ষা তথ্য কৃষিশিল্প বেশী একথা বলিলেও ভুল হইবে না। অত বড় বিস্তারিত ভূগণ্ডের ভিতর এত পল্লী ও নগর দেখা যায়—কিন্তু industrialism, commercialism, শিল্পজীবনের গ্রাফা কলকারখানার কোলাহল বড় দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পকর্ম যে সে দেশে নাই, তাহা নহে, যথেষ্টই আছে। শিল্প ও কৃষি সে দেশে সমভাবে বিদ্যমান। কৃষি-জাত ব্রহ্মণশি শিল্পক্ষেত্রে নীত হয়। তাহা দ্বারা সেখানে নতুন নতুন পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার শিল্পকারখানার প্রয়োজন অনুসারে পার্শ্ববর্তী কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদ তৈয়ারী হয়। তথ্য কৃষির বহু শিল্প, এবং শিল্পের বহু কৃষি। কৃষি ও শিল্পের একত্র পরস্পর-সাপেক্ষতা ভারতবর্ষে নাই। তাহার বাহার অনিচ্ছাশুলেই বিদেশীগণের শিল্প সামগ্রীর ভাগ্য মাত্র। কিন্তু একত্র চিরকাল ছিল না। ১৫ বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে কৃষির বহু শিল্প এবং শিল্পের বহু কৃষি দেখা যাইত। তখন এদেশ কৃষিপ্রধান কি শিল্পপ্রধান তাহা বিদেশীয় পর্যটকগণের বৃত্তিতে কষ্ট হইত।

• •

### ৫। সহর ও বাস্য

সহর দেশের সহর পোতা-স্বত্ব। এই গানেই দেশের মোটামুটি নকশার কিকিঞ্চিক আভাস পাওয়া যায়। যদিও সহরে সামাজিক কৃত্রিমতার উপজব খুব বেশী, যদিও সহর জগতের আধুনিক প্রচলিত সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে সন্ততই প্রয়াসী, তবুও সহরের এখতি

পরিবর্তনশীল অবস্থা দেখিয়া প্রায়ই একটা প্রশ্নের কথা মনে পড়ে। সহরে প্রায় সব রকমই সুবিধা রহিয়াছে, কিন্তু সুবিধা আছে বলিয়া অনুবিধা থাকিবে না কেন? ইহা যদি সহর ভুলিয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে সহরের আড়ম্বরই সার। বাস্তবতা কচি বিশাশিতা আর উচ্চাঙ্গলতার আশাই সহরের দৃশ্যতঃ প্রাণ। এ প্রাণ লইয়া সহর পরিভ্রমণের পথে বা পেশ মায়ায় অগ্নয়ন হইতে বা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি না তাবিষয় দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া ঠিক করিবার সুজ্ঞানাত ইতিপূর্বেই সূচিত হইয়াছে ও হইতেছে। সহরের লহর কোন দিকে, তাহা হ্রস্বপুণ পরিচালকগণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অবিলম্বে প্রতিকার বা সংস্কার-পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতপ্রবৃত্ত হইয়া যান। সহর হেতুনেত্র করিয়া বাহ্যের ও কুলকিনারী বাধিয়া কেঁলিয়া দেন। বাহ্যের বাধ যদি সহরের চলন্ত স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে ভাঙিয়া না পড়ে তবে সেই সহরই জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া দেশ ও জাতি বিশেষের গৌরবের স্থান বলিয়া জগতে পরিগণিত হয়।

সহর মানব-সমাজের মুহূর লদৃশ। মুহূরে যেমন লোকগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিকলিত হইয়া তাহাদের হাবভাব, আকার বিকার ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষের আভাস প্রকটিত হইয়া যায়, ঠিক তেমনই সমস্ত মানব-সমাজের রীতি, প্রতিভূতি ও চরিত্র প্রতিকলিত হইয়া মানব-সমাজের ধ্যানধারণা ও উন্নতি অবনতি ইত্যাদি সমাজের আর্থিক ও পরমার্থিক ক্রিয়াকলাপের বিচিত্রচিত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শরীর ও মনের সঙ্গে বৈষ্ণব সম্বন্ধ, সহর ও মানবের

সঙ্গে ঠিক তদ্ব্যবস্থাপন। প্রত্যেকেই অপরের সঙ্গে এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট যে একের কল্যাণ অস্তরের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বা আংশিক ভাবে কাঙ্ক্ষ্যকরী না হইয়া থাকিতেই পারে না। উভয়ের ব্যবস্থার এমন ভাবে সংযুক্ত ও সম্মিলিত যে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটার লক্ষণ অপভ্রান্তিক বা অসম্মান হইলেই অমনিই দুকল প্রবৃত্ত ও প্রকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

আমরা প্রাচীণ বলি, শুধু বলি তাহা নয়, অন্তরের সহিত স্বীকারও করিয়া লই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ গ্রাম, কান্দার, খন, উপবন সৃষ্টি করিয়াছেন। যে স্থান তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে, সে স্থানে তাঁহার দৃষ্টিও অচঞ্চল অনাবচ্ছদ হইয়া রহিয়াছে; যেখানে তিনি স্বয়ং প্রভু সারিধা নিজ গুণপরিমার বিশেষ বিকাশ লোক-সমাজের গোচরীভূত করিয়া থাকেন, ঠিক সেই স্থানেই নিজ ক্রিয়াপদ্ধতির নিঃশেষ নিকাশ নিতানিত্য প্রদান করিয়া জীবিতের পরিচালকভাবে একই আসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। ভগবানের প্রতি ঐহাধের বিশ্বাস অটল ও ভগবানের গড়ন ভঙন, স্বজন মরণে ঐহাধের চিন্তাবল অদমা ও অপ্রতিহত থাকে তবে ঐহাধের ভয় কিসের? ঐহাধের নিকট তা ব্যক্তিগত জন্ম ও মৃত্যু বিকাশ ও বিয়োগ বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু মানব জন্মে পড়িয়া বা ইচ্ছা করিয়া তাহা পালন করিবার ক্ষমতা সমর্থ হইতে পারে নাই। মানবগণ নিজেদের স্বকীয়তা নিবন্ধন বিশ্বজগতের বিশ্বের প্রতি বিশ্বাস হারাওয়া নিজের কর্তৃত্ব জোর পূরক স্থাপন করিতে বাওহায় সরলকে অটল করিয়া ফেলিয়াছে; এক্ষণে জটীলকে প্রাচীনে ফিরাইয়া লইয়া বাওহা: বড়ই দুঃসাধ্য, বরক অসম্ভব। তাই আজকাল ভগবানের ভাল-



বাগা নৈমিত্তিক শোভা দীক্ষণের ভিতর বিধা ছুটিয়া আনিয়া প্রাণমন মোহিত করিয়া কেলে না। ভগবানও আস্তে আস্তে মানবের বজ্রাঘাতক স্পর্শন ও কঠিন কথাবার্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য প্রস্থান করিয়াছেন, কলে মানবের কর্ণক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। মানব ক্রমে ক্রমে বন অঞ্চল কাটিয়া ফেলিল, গ্রামকে সহর করিয়া তুলিল। এইখানেই অকৃত্রিম কৃত্রিমে পরিণত হইল। সহর ভগবানের রাজ্য কখনই ছিল না, এখনও নাই। ইহা মানবের কৃত রাজ্য। ইহার ভালমন্দ সুবিধা অসুবিধার ভিত্তি মানবগণই সম্পূর্ণ ভাবে রাখে।

মানবগণ নিজেদের হাতে ধ্বল কাটিয়া ধ্বল আনিবার জন্য কেত্রে প্রস্তুত করিলেন, এবং বেশ বস্ত্রের সহিত বীজবপন করিয়া কলাকাজ্জ্বল আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষে উন্নত হইল; দুই একটা ভাল কলও দেখা দিতে লাগিল, কিন্তু উপযুক্ত বস্ত্রের ও সেবার অভাবে সে কলে সরল ভরিয়া পেল, আর তাঁহারা সেইকল লইয়া অকালে চিরকালের জন্য বিহার্য লইলেন। -বাস্তবিক, সহরে কি তাহাই দেখা যায় না? সহর কি এখন আরুহ অহর হইয়া নাই?

এই যে এত বড় কলিকাতা সহর সেখানে কি দেখিতে পাই? এককালে ইহা নিখিল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল; এখন রাজধানীর আদান হইতে স্থলিত হইলেও ইহা বর্তমানে সর্বাঙ্গপেক্ষা যে গরীবনী তাহা নিঃসন্দেহভাৱে বলিতে পারা যায়। এই ভারতের নিরোমনি কলিকাতার অবস্থা কিরূপ? কলিকাতার অভাব কিরূপ? এই যে সহরের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড গড়ের মাঠ, বেহুণ মাঠ জগন্নাথ

প্রদান প্রদান সহরের নিকট দেখিতে পাওয়া যায় বলিঙ্গা মনে হয় না, ইহার পার্শ্ববর্তী চক্-চকে কিক্‌মিকে সুপ্রসূত চৌরঙ্গী রাজ্য, আবার নিকটের মিউনিসিপ্যালিটি বাজার দেখিয়া কি মনে হয় যে কলিকাতার কোন কিছু অভাব আছে? হইতে পারে ইহাদের অবস্থান নিরপেক্ষতাবিহীন, হইতে পারে ইহাদের স্ট্রীট দুড়ি পাড়ি-ওয়ালায় সজোপের নিমিত্ত, হ'তে পারে ইহাদের শোভা দীক্ষণের ব্যক্তিগত রঙ্গি চিত্র করিয়া ধর্মসমবায়, Grand Hotel ইত্যাদি শৌখিনালায় ভ্রমের বাহার ঘুলিয়া বাইতে পারে, কিন্তু তবাপি আশঙ্কনক ফলপ্রাপ্ত করিয়াছে কি? কৃত্রিম "গোলদীপ" "হেথো" কলিকাতার জনসাধারণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। যাহা জনসাধারণের সমন্বয়গমনের (access) বাহিরে তাহা লইয়া গৌরব করিবার তাঁহাদের কি আছে? হী, বড়বাজার, বটবাজার, মেছুয়া বাজার ইত্যাদি স্ট্রীট যদি চৌরঙ্গীর মত হইত, রাজ্যমাণব বাবুর বাজার যদি মিউনিসিপ্যালিটি বাজারের মত হইত, তবে জানিতাম কলিকাতা বেশ ভালই আছে, বেশ সুন্দর হইয়াছে, বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কিন্তু সে সব কই?

আমরা বলি না যে কলিকাতার চৌরঙ্গী রাজ্য হউক; তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক ইহা বলিতে কোন ঘোষ আছে কি? সাহেবদের সুখ মেথিয়া আমাদের দুঃখ কি তুলিয়া বাওয়া ভাল?

আমাদের "নেটিভ" পাড়ার অবস্থা বড়ই নৈচর্য্য ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা জানি সাহেবদের ভিতরটা নোয়া বাহিরটা বেশ পরিষ্কার। সকলেই ঘানিয়া লইয়েন ইহা বাস্তব পক্ষে অনিষ্ট-

কারী। আর, আমাদের অবস্থা ঠিক তাহা-  
বের উল্টা। আমরা ভিতরে বেশ পরিষ্কার  
নিভাঘারী হইয়া দিন কাটাই, কিন্তু বাহিরটা  
আমাদের নোংরা। এটাও যে বাহ্যের পক্ষে  
অনিষ্টকারক তাহা, বোধ হও, কাহাকে বলি  
দিতে হইবে না। প্রতিবেশী যদি অপরিস্কার  
অপরিস্কার থাকে তবে ইহার অংশ অংশে  
পাইবে না কেন? বেটনীর বাহিরের তেরই  
কাজ করিতে পারে না! এইজন্য স্বাস্থ্যবিদ  
পতিভেদ্য উপদেশ দিয়া থাকেন যে নিজে  
দুঃখ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে  
ইচ্ছুক হইলে শুধু নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন  
থাকিলে অসুস্থ হইতে পারেন। ইহাও যাইবে না,  
অনেকের ঠিক তদ্রূপ থাকিবার জন্য অসুস্থ  
করিতে বা বাধ্য করাইতে হইবে। “এখানে  
প্রস্তাব করিও না।” ইহার “না” উঠাইয়া দিয়া  
প্রস্তাব করিয়া বাহাদুরী লইবার কোন  
প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে কি? আমরা  
জাবিধা দেখি না যে ইহা হইতে বিষম  
ফলের উৎপত্তি হইতে পারে। আমরা  
ব্যারামের বীজ চর্খচর্খতে দেখিতে পাইনা  
বলিবা কি মনে করিব যে স্থানটি বেশ ভালই  
আছে? এই প্রশ্নে একটা খাঁটা গল্পের,  
যদি ও নোনা, কথা মনে পড়িল। একদা  
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ একটা ছেলে সপ্তিকটবর্তী  
সহরের দিকে হাটুয়া দাঁড়াইতেছিল, সে খানিক  
দূর গিয়া ক্রান্ত হইয়া পড়ার বিদ্যালয়  
করিতেছিল; কিন্তু পথে সে দেখিতে পায়  
তাহার প্রধান পণ্ডিতও সহরের দিকে  
আসিতেছেন; ছেলেটা পণ্ডিতের গুরু  
তাকাতাকি পথের ধারে গিয়া চক্ষু বন্ধ  
করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয়  
ছেলেটিকে দেখিতে পাওয়ারাত্র দু’একটা  
ধমক দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে

ছেলেটা বাড়ী আসিয়া অস্ত্রাঙ্গ বন্ধদের  
নিকট বলাবলি করিতে লাগিল, “নোনা  
তাই, আমি চোখ বন্ধ করে পথের একধারে  
দাঁড়াইছিলাম, এমন সময় পণ্ডিতমহাশয়  
আমার দিকে ফেলেন এত বড়ই আশ্চর্য,  
আমি চোখ বুজিলে সব অসুস্থ হইয়া যায়—  
আবেকমনে দেনে কিভাবে?” বোধহয়  
শেষের ছেলের মত লোকেরাই প্রস্তাব  
করিতে প্রতীতি হয়। আনিয়া আমাদের  
অজান-ভিমিরের পক্ষ কবে অপসারিত  
হইবে। কবে রোগবীরের অস্তিত্ব সম্ভাব্য  
বলিবা ইহাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পক্ষে  
বাধা প্রধান ও তিরোধানের জন্য উত্তীর্ণ  
পড়িয়া লাগিব। কবে আবার ইহাদের  
উগ্রভাঙনার সম্মুখীন হইয়াও রণে জয়ী  
হইব! কবে আবার ভিতরে বাহিরে, আশে-  
পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া স্বাস্থ্য-  
ধেবীকে সুপ্রসন্ন করিয়া দিব। তাই আমরা  
অনেকবার বলিচ্ছি,—আবার বলিতেছি  
আমরা স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অস্তিত্ব: সাধারণ শিক্ষা  
চাই বাহাতে আমরা বৃত্তিতে পারি যে  
কৃতকর্ম বাহ্যের অসুস্থ হইবে।

সহরে স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার ভার আছে  
মিউনিসিপ্যালিটির উপর। কিন্তু মিউনি-  
সিপ্যালিটির উপর ভার আছে বলিবারূপে  
বা উদাহরণ হইয়া বলিবা থাকিলে আমরা  
আশঙ্কিত হইতে পারি না। এমন অনেক  
কাজ আছে বাহ্যের উপর ব্যক্তিগত বা  
সাধারণভাবে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে তাহাদের  
পরিণাম ভাল আশাযেই কেই ভোগ করিতে  
হয়। যেমন, সহরের অগ্নিশিখার দেখানে  
সেখানে প্রস্তাব করা, রাস্তার আবহাওয়া  
রাখি কেহিয়া রাখা করিয়া রাখা এবং  
ইহাদের উপর রোগবীজসমূহকে সম্বাধ্য

বহুত হইতে দেওয়া, ছুটপাথে খুঁ খুঁ ফেলা, মিষ্টায়ের জিনিগণি খুলিয়া রাখা, হুচ্-বিক্রেতাদিগকে হুড়ের বাস্তু খোলা রাখিতে প্ররম্ব দেওয়া ইত্যাদি।

জোরক'রয়া কোন কাজ করাষ্টতে পারা যায় না, করাইলেও সে কাজ দ্বারা থাকে না। যতদিন পর্যন্ত না আমরা বুঝিতে পারি যে আমরাই আমাদের পায়ে কোনানী মারিয়া পশু হইয়া পড়িতেছি ততদিন অকতলজীর হইয়া থাকি অনন্তর।



#### ৬। ইংলণ্ডে প্রাচ্যসমাদর

প্রাচ্যদেশকে সুখিয়ার মন্ত্র ইংরাজেরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এদিয়ার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধাতিসমূহের জীবনকথা আজকাল ইংরাজসমাজে আদৃত হইতেছে। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা অবগত হইবার মন্ত্র বিলাতের জনগণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনে একটা "প্রাচ্যগমিতি" গঠনের বিরাট আয়োজন চলিতেছে। তাহাতে ইংরাজ পণ্ডিতেরা প্রাচ্যমানবের চিত্রাংকতি, কার্যপ্রণালী, শিল্প, সাহিত্য, আদর্শ, সকল বিষয়ে গবেষণা করিবেন। এতদিন ইংরাজেরা করানী, জাদুঘর এবং এমন কি রুল অপেক্ষাও প্রাচ্যদেশকে কম জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এক বা একাধিক প্রাচ্যগমিতি আছে। কিন্তু ইংরাজ-সমাজে একটিও নাই। এই মন্ত্র লর্ড কার্জন এক প্রকৃত সভায় হুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মতে সাক্ষাৎ ও বাণিজ্য রক্ষা করিবার মন্ত্র ইংলণ্ডে প্রাচ্যদেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, ইতিহাস ও দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া নিত্য আবশ্যক।

বাংলাহটক এতদিনে যে জাপান, পারস্ত, চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের প্রতি ইংলণ্ডের স্বাধীনগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। একজন ইংরাজ সমালোচক রব'জনাথের "গীতাঞ্জলি" ইংলণ্ডে আদৃত হইবার কারণ আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ইংরাজের নব্যবিকলিত প্রাচ্য-সমাদর প্রবৃত্তিই ইহার মূল।

যেথা যাইতেছে ১৯০৪ সালে জাপানের গুলফান্ডের পর হইতেই ইংরাজেরা প্রাচ্যকে সুখিয়ার মন্ত্র উদ্ভোগী হইয়াছেন। প্রাচ্য-সমাজে এই জীবনশ্রমণ লক্ষ্য না করিলে ইংরাজজাতির মধ্যে এত শীঘ্র প্রাচ্যসমাদরের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ।



#### ৭। পঞ্জীর আদর্শ সেবাজম

সুখিয়ার, সারিগাছির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বোড়লবর্গের কার্য-বিবরণী আমা-দের হস্তগত হইয়াছে। আমরা বহুদিন হইতেই এই আশ্রমের বিষয় এবং আশ্রমধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের অকৃত সেবা ও কার্য-তৎপরতার সংবাদ রাখিয়া থাকি। কিন্তু বিশেষভাবে আশ্রমের কার্যপ্রণালী এতদিন জানিতে পারি নাই। বর্তমান রিপোর্টপাঠে তাহা জানা গেল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ নানাবিধ লোকহিতকর কার্যে চিরদিনই নিমগ্ন। খেতড়ি, উষরপুত্র, আলোয়ার প্রভৃতি স্থানে তাঁহার জীবনের প্রথম সেবাকার্য আরম্ভ হয়। তিনি ঐ সব দেশে গরীব দুঃখীর দুঃখবিমোচন ও শিক্ষার আলোক বিস্তার করে বহু পরিচয় করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য স্বামী অখণ্ডানন্দের দ্বারাই প্রথম আরম্ভ হয়।

আজ যোগবৎসর ধরিয়া তিনি মুশিবাদের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে শিক্ষা ও সেবার কাণ্ডে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি গ্রামের মধ্যে না চট্টা সহরের মধ্যে হইলে, বোধ হয় আশ্রমের বহু বিষয়ে উন্নতি হইত। কিন্তু অর্থগত কারণেই নিজের কার্যক্ষেত্রব্যবস্থাপনা নির্মাণে করিয়া উপযুক্ত দ্রব্যবস্তুর পরিচর্য দিয়াছেন। পল্লী ভাষা-ভাষা সভ্যতার কেন্দ্র। পল্লী ভারতের গ্রাম। পল্লীবাসীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে, প্রকৃত ভারত-বর্ষকে চেনা যায় না। কিন্তু পল্লীর অবস্থা এখন নানা কারণে বড়ই পোচনীয়। সেই জন্য অনেকেই পল্লী হইতে ঘুরে থাকিতে ভাল বাসেন। প্রকৃত কর্মী সে সমস্ত বাধা বিয়ে ভ্রমকপও করেন না—পল্লীর মধ্যে বসিয়াই—নানা অসুবিধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই তাঁহার পল্লীর ভদ্র বৃক্ক আশার বাসী ধনিত করিয়া তুলেন। স্বামী অর্থগত-নন্দ ও তাহাই করিয়াছেন এবং করিতেছেন। দীর্ঘ সময় ধরিয়া একরূপ অবজ্ঞাতভাবে অসম্মা উৎসাহের সহিত ক্রমাগত একইভাবে তিনি যে পরিচর্য ও কৃতকার্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন—তাবিতে গেলে বাস্তবিক পক্ষেই তাহা বড় বিস্ময়কর। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রিপোর্টে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিয়ে ভাল উদ্ধৃত করিলাম।

“ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এক্ষণে দরিদ্র, দুর্ভ, পতিত প্রভৃতি দেশের সর্গসাধারণের উন্নতি ও শিক্ষাবিধানের জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। সারগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অর্থগতনন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও উপদেশে গত বিশ বৎসর যাবৎ

উক্ত সমস্তাপূরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—গ্রামবাসি-গণের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আদর্শ বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিবেন। ঐ সমূহ বিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালী দেখিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বৃত্তিতে পারিবেন, কি উপায়ে তাঁহারা গ্রামবাসিগণের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের ভিতর শিক্ষাবিস্তার করিতে পারেন। তাঁহার অভিপ্রায়—নিয়-লিখিত কার্যগুলি এই বিদ্যালয়গুলির অধ-ব্যবস্থাপন করিবেন।

(১) অনাখ্যাজন—হাটবের কোন আত্মীয়-বন্ধন নাই, একজন বালকসদৃশ পিতৃবৎ রত্নে প্রতিপালন।

(২) সেবার্কা—গ্রামের মধ্যে কলিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতিবিধানকল্পে স্বাস্থ্যকর নিয়মসমূহের প্রবর্তন এবং রোগের বা বিপদের সময় তাহাদের সেবা-সুজ্ঞা-ঔষধ-পথ্যাদি দানের ব্যবস্থা।

(৩) গ্রাম্য অশিক্ষিত বালক ও চাষাভূষার ভিতর যথাবিহিত শিক্ষাবিস্তার।

(৪) সংসারের কার্যোপযোগী শিল্পশিক্ষার বিস্তার।

(৫) বর্তমান উন্নত-প্রণালীতে কৃষিক্ষিক্ষার বিস্তার।

(৬) বালিকাদের জন্য অনাখ্যাজন, শিক্ষা-দান প্রভৃতির বস্ত্র ব্যবস্থা।

(৭) এই সকল গ্রাম্যসাধা ও জেলা-কেন্দ্রের কার্যগুলিকে এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা যাওয়াতে সকলগুলিই মূলে আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকে ও সমূহ বিভাগ ঐ চরম লক্ষ্যকর্তার দিকে অগ্রসর হয়।

ঐতিহাসিক পরিচালিত কেন্দ্রীয় জেলা আশ্রমে উক্তরূপ ৬টি পৃথক বিভাগ থাকিবে

এবং বিভিন্ন গ্রামে উহার এক একটা শাখা থাকিবে। বিভিন্ন গ্রামের অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝিয়া এই সকল বিভিন্ন বিভাগের কার্য ভিন্নভাবে নিয়মিত করিতে হইবে, এবং বাহ্যতে গ্রামবাসিগণের সাহায্যে তাহাদের উক্ত উন্নতিবিধান কার্য চলিতে পারে, তাহাও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উক্তির মূল ধৈর্য্যাক্রমে এমন কতকগুলি যুবককে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, বাহ্যিক প্রচেষ্টা থাকিয়া এই বেশহিতকর কার্যে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিবে। আমাদের মনে রাখা উচিত, পল্লীগ্রামসমূহেই আমাদের সমগ্র জাতীয়শক্তি লুপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং এই পল্লীসমূহেই ম্যালেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য নানা বিপদ আমাদের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া আমাদেরকে সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। এখানে ইহারও উল্লেখ কর্তব্য যে, হুবিধামত এই আশ্রমসকলে বৈদ্যশিক্ষা-প্রবর্তনের ব্যবস্থাও চেষ্টা করার এবং গো জাতির উন্নতিকল্পে আদর্শ গোপালো স্থাপনেরও কল্পনা আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামবাসিগণের সাহায্যে বাহ্যতে গ্রামের সর্ববিধ অভাব দূর হয়, তাহাই আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হইবে। কিন্তু প্রথমে বাহিরের কিছু সাহায্য না হইলে চলিবে না। এই কারণেই আমরা ভারত ও ভারতের বৈদেশী সর্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের কার্যাবলীর বর্তমানে দীর্ঘপতি লক্ষ্য করিয়া মনে নৈরাশ্রের স্কার হইতে বেগবা কর্তব্য নহে। উহার ভবিষ্যৎ সফলতার আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী। কারণ, সামান্য বীজতুল্য প্রভীতমান হইলেও উহার তিতর অব্যক্তভাবে কলকাতাসমধিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেন,

আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কোনরূপে একটা কেন্দ্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তাহার লাক্ষ্য দেখিয়া তাহার আদর্শে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র এইরূপ আশ্রম ও শিক্ষালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের যে কতদূর কল্যাণসাধন করিবে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য অগ্রসর হইবার কতদূর সহায়তা করিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতএব আমরা বিবেকানন্দের অমর ভাবাবলম্বনে আমরা তপস্বৎসমীপে প্রার্থনা করি—

‘নূতন ভারত বেকক। বেকক লাক্ষ্য ধরে, চাবার হুতীর ভেদ করে, বেলে, মালা, মুচি, মেথরের খুণড়ির মধ্য হতে। বেকক হৃদির বোকান থেকে, ভূনাগরালার উল্লনের পাশ থেকে। বেকক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেকক কোড়, জল, পাখাড়, পর্বত থেকে।’

পূর্কোক্ত উক্ত অনেকাংশেই সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে আশ্রমের উপযোগী গৃহ এখনও নির্মিত হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি দেশবাসী পল্লীর উন্নতিকল্পে এমন একটা আদর্শ আশ্রম অর্থাভাবে হীনশাশ্রিত হইতে দিবেন না। এতদূর আশ্রম সমূহে থাকিলে অন্যান্য পল্লীর অবস্থাও বীরে বীরে উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনে জাগ্রত হইতে পারে—অনেকে সংয়ের ভোগ স্ব ভোগ করিয়া পল্লীর ক্ষোভে করিয়া বাইতে পারেন—অনেকে পল্লীর দুঃস্থতা অপনোদনের জন্য ব্রতীও হইতে পারেন। অতএব এতদূর আদর্শ আশ্রমের আবশ্যকতা নিতান্তই বেশী, এবং ইহাকে বিশেষ হইতে বেগবা করাও বাঞ্ছনীয় নহে।

## ৮। বিলাতী সমাজে ভারতীয় ঐতিহাসিক

ভারতীয় লেখকেরা প্রাচীন ভারতের পৌরবশুচক কোন তথ্য প্রচার করিলেই তাহা পক্ষপাতিত্ব দোষে ভুট্টে বলিয়া অনেক ইংরাজেরই ধারণা হয়। যে সকল ঘটনাঘাতা ভারতবাসীর অপদার্বিতা, অকর্ণপাতা, চরিত্র-হীনতা, রাষ্ট্রীয় দুর্গমতা ইত্যাদি প্রমাণিত হয়, সেগুলির বিবরণ বেই বিতে পারিলেই ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে ভারতীয় লেখকেরা বাস্তবিকই পক্ষপাত-দোষ-হীন। আমাদের যে সকল লেখক কতকগুলি নানা প্রকার তথ্য ও সংবাদ মাত্র প্রদান করেন, ইহারা তাঁহাদিগকে আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই তথ্যগুলি কোন জাতীয় জীবন গঠনের উপকরণ যত্ন ব্যাখ্যা করিতে সেলেই তাহাদের রচনা বিলাতী পণ্ডিতগণের অস্বীকৃত হয়। অথবা আমাদের যে সকল লেখক প্রাচীন ভারতীয় জনগণের সংসারে অস্পৃহা এবং কণ্ঠে ঔদাসিন্য প্রচার করিয়া হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতার সাক্ষ্য দেন, তাহাদের প্রতিও এই সকল পণ্ডিতেরা বড় সঙ্কট। কিন্তু কৰ্ম্মরসগতে ভারতবাসীর প্রভাব ছিল এক্ষণ কোন তথ্য প্রচারিত হইলেই লেখক ইহাদের মতে অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন প্রমাণিত হয়।

## ৯। ভারতীয় ঐতিহাসিকের ভবিষ্যৎ

বিলাতী সমাজে আদর ইউক বা না ইউক, তথাপি আমরা আপা করি ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতবাসীদিগের দ্বায়াই নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। আমকাল নূতন

নূতন ঐতিহাসিক বেশে দেখা দিয়াছেন। তাহাদের ইতিহাসচর্চাই আমাদের স্বদেশীয় ইতিহাসরচনার ভিত্তিস্থাপন করিবে। এই 'ভারতীয়' প্রথম বিলাতী প্রয়াস হইতে সম্পূর্ণ পথের পথে চলিতে থাকিবে। বিলাতী ভারতঐতিহাস অল্প বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্মাণিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশীয় লোকের ইতিহাসালোচনাই জাতীয় চরিত্র গঠিত করিবে।

যেতদপ দেখা দাইতেছে ভারতবর্ষের-ইতিহাস এখন হইতে দুই ধরণে লেখা হইবে। বিলাতী লেখকগণের রচনায় এক প্রকার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে—স্বদেশী লেখকগণের রচনায় অল্প প্রকার ব্যাখ্যা প্রচারিত হইবে। বিলাতীরা স্বদেশীয় লেখকগণের রচনা হইতে প্রায়ই কোন প্রমাণ গ্রহণ করিবেন না। ইহারা এখনও বড় একটা তাহা গ্রহণ করেন না। স্বদেশীয় লেখকগণও বিদেশীয় প্রকার হইতে প্রমাণ গ্রহণ ত করিবেনই না, করিলেও ব্যাখ্যা দ্বাখীন ভাবে করিবেন। প্রধানতঃ বিদেশীদিগের দুল সিদ্ধান্তগুলি গণন করাই ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের কর্তব্য হইবে।

• •

## ১০। প্রাচ্যে হিন্দু প্রভাব

মনসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ মিল মহাশয় হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। নব প্রকাশিত "নারায়ণ"পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি বুঝাইয়াছেন একঘের এবং একঘের অস্বভূতিই হিন্দুর ভিতরকার দৃষ্টি, ইহাই তাহার জ্ঞানলিপ্সা এবং কৰ্ম্মচেষ্টাকে প্রবৃত্ত করিয়া আসিয়াছে—ইহাতেই তাহার সত্যতা ও সাধনা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডাত্য দৃষ্টিও যেমন

শ্রীশ্রী ও রোমক সভ্যতা, গ্রাচ্যোও তেমন ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার আকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—ইহাই দেখাইতে দিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিরে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনা মানবীয় অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মনোব্যাটন করিয়াছে, মানব-জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মানব-সমাজের গঠন ও বিকাশের কতকগুলি বিশেষ স্তরের আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব-জীবনের সার্বকাল্যভারের মত কতকগুলি বিশিষ্ট সাধন অবলম্বন করিয়াছে। এইগুলি ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্ট ও নিজস্ব বস্তু। এইগুলিই বিশ্বমানবের বিকাশে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট কৰ্ম। প্রসার মহাসাগরের উপকূল হইতে পারস্যের সীমান্তপর্যন্ত, যথা আশিয়ার বিস্তৃত উপত্যকাকুমি হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণপ্রান্তপর্যন্ত প্রচুর সময় গ্রাচ্য ও যথা আশিয়ারখণ্ডে ভারতের এট সাধনা ছড়ানিয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই চাষার বৎসরকাল এই বিশাল মানব-সমাজ যে তৎক্ষণাতের অগ্রদূত, যে সমাজ-নীতির অগ্রদূত, জীবনে যে আদর্শের সাধন করিয়াছে, তাহার পত্তনবর্ত্তম যক্ষ এবং মূল স্বত্বগুলি ভারতের তত্ত্ববিদ্যার, ভারতের সমাজ-নীতির এবং ভারতের বহুনীতির ও বর্ধসাধনের মধ্যেই কেবল বুলিয়া পাওয়া যায়। রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী রোমকশাসন-বস্ত্র, রোমক-রাষ্ট্র-তন্ত্র, এবং রোমক-ব্যবহার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া পৃথিবীতে একটা নূতন একতার ও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও দিন আশিয়ারখণ্ডে একতর কোন পার্থিব সাম্রাজ্যের বা শাসনশক্তির

প্রতিষ্ঠা করে নাই, বা করিতে চাহে নাই। কিন্তু রোম যেমন যুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবহার বিধি, এবং শাসন-বস্ত্রের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপে ভারতবর্ষও সময় যথা ও গ্রাচ্য আশিয়ারখণ্ডের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির এবং পারমার্থিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছে। পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা পার্থিব সম্পদ ও সাধনার প্রভাব অপেক্ষা যে পরিমাণে পত্তনবর্ত্তম হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে যুরোপের সভ্যতা ও সাধনার উপরে রোমের প্রভাব অপেক্ষা গ্রাচ্য আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উপরে ভারতবর্ষের প্রভাবও সমবিক পত্তন ও স্বাধী হইয়াছে। বাহ্যে হইতে দেখিলে আশিয়ার এই বহুবিধত্ব ভ্রুতগণ, এই অগণ্যকোটি লোকপুঞ্জের মধ্যে, জাতি-বর্ণগত, আচার-অচর্য-গত, বর্ধ-কৰ্ম-গত, অনেক প্রকারের বৈষম্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এসকল ভেদ বিরোধের মধ্যে দিয়াই আমরা একটা বিশিষ্ট আকারের সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি আদর্শ এবং সাধন-পন্থাও দেখিতে পাই। আর ভারতের তৎক্ষণাতই গ্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সমাজ-তন্ত্র, জীবনাদর্শ, ও বর্ধ-কৰ্মকে আত্মজ্ঞানের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তাহার প্রকৃত মৰ্ম উন্মোচন করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই গ্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা তৎক্ষণাতের বস্ত্র ও সাধনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। কলতঃ ভারতবর্ষ যে কেবল গ্রাচ্য আশিয়ার সমাজ-নীতি, বর্ধ-নীতি, ও আধ্যাত্মজীবনকেই আপনার তৎক্ষণাত ও সাধন-পন্থার দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিপুষ্ট

করিয়াছে, তাহা নহে। যে তর্কশাস্ত্রের সাধ্যাধা আশিষ্য সত্যের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে, তাহার মূল উপাধান ও প্রণালী, তাহার বৈজ্ঞানিক অঙ্গভূতি বা Scientific concepts, যে ভাবে আশিষ্য এই প্রত্যক্ষ ভগতঃ জানিতে ও ধরিতে পিয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠবিভাগ, আর মাহুয়ের মহৎজ্ঞান দা আশুপ্রভাভের যে সকল দৃষ্টি ও সন্ধান ধরিয়া আশিষ্য সত্যের বা সত্য্যএর এবং চৈতন্যের বা জ্ঞান-এর মূল-প্রকৃতির অঙ্গসম্বন্ধে যাটটা আপনাতর বিবিধ তথ্যসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তৎসমুদায়ট ভারতের নিকট হইতে পাঠিয়াছে। আপনাতর ও চীনের তর্কশাস্ত্র ভারতের জ্ঞানের মূল-স্থলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যুরোপের জ্ঞান দর্শন গ্রীষ্মের জ্ঞানের উপরেই পড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্মেরদিগের প্রমাণপ্রতিষ্ঠার প্রণালী ভারতের প্রমাণ-বিজ্ঞানের প্রণালী চইতে ভিন্ন। আপনাতর ও চীনের প্রমাণ-বিজ্ঞানে ভারতীয় জ্ঞানের প্রভাব বেশিতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মের জ্ঞানের নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা Philosophy of nature জড় ও গতির, কারণ ও কাৰ্য্যের, সেন ও কালের যে সকল তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চীনের মধ্যযুগের বিজ্ঞান তাহারই উপর পড়িয়া উঠে। হিন্দুর রসায়নজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই চীনে কোনও কোনও পণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। চীন নানাপ্রকারের হা-এর আবিষ্কার করিয়াছে, আর তাহার স্বত্বকগুলি হিন্দুর রসায়নবিদ্যার আশ্রয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞেরা মধ্যযুগের চীনের এবং আপনাতর ললিত কলাতেও ভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।”

## ১১। পাশ্চাত্যসমাজে প্রাচ্য চিকিৎসক

ভারতবাসীর গুণগণা অতি ক্ষুদ্র গতিতে পাক্ষাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। পশ্চিম সমাজ এখন আর প্রাচ্যসমাজকে অবজ্ঞার চোখে বেশিতে পারে না, বেশিতে চাহে না, চাহিলেও পারে না। এখন তাহার নানা ভাবে প্রাচ্যের মধ্যমা দৃষ্টিতে চোঁটা করিতেছে। পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ভগতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রবহু এক নতুন তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চমকে এক নতুন বাণীর সাধার দিয়াছেন। ফলে, প্রাচ্যের গৌরব বিশ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

এই শুভ মাহেজ্ঞকে ভারতবাসীর প্রধান-দিশকে বিশ্বের সভ্যতলে আহ্বান করা হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আমরা আজ অস্ত্রাঙ্গ বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিয়া হোমিও-প্যাথিক ভগতে ভারতবাসী কিছুদল সম্মান অর্জন করিতেছেন, তাহাই প্রদর্শন করিব। ডাক্তার মণ্ডলসাল সুরকারের পরে একদল সম্মান বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে খুব কম লোকেই অর্জন করিয়াছেন। ভবানীপুরের হুগ্গসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীধর শরচ্চর যোব এম, ডি মহাপ্রাণ টাহার মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, কশিরা, স্পেন প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মেগ, বহুজ্ঞ, বেরি বেরি, ও নিউমোনিয়া যোগে টিউবার্কুলিনায় প্রভৃতি পুস্তক রচনা এবং বাসক, অশ্বখ, শেফালিকা প্রভৃতি সৌম্য ঔষধ সম্বন্ধে তাহার তথ্যপ্রচার হোমিওপ্যাথিক-ভগতঃ চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে।



ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি ১৯০৪ সালে তাঁহার স্থানে পরংবাবুকে “করেন্সাণ্ডিং মেম্বর” নির্বাচিত করেন। কিন্তু বর্তমান বৎসরে অগস্তের সর্ক্সপ্রেট ও সর্ক্সগ্রন্থা চিকিৎসা-পরিষদ, “আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি” সর্ক্স সম্মতি ক্রমে পরংবাবুকে “করেন্সাণ্ডিং মেম্বর” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীর অতি বিচক্ষণ ও প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকগণ এই পরিষদের সাধারণ সভা, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক “করেন্সাণ্ডিং” সভা বলিয়া পরিগণিত হন। পরংবাবুর অত্যন্ত মৌলিক না থাকিলে, এ সম্মান তিনি কদাচ পাইতেন না।

আমরা আপা করি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দেশীয় গাছ গাছড়া কিরূপ সফলতা প্রদান করিতে পারে, পরংবাবু তাহা দেখাইতে বিব্রত হইবেন না, এবং বেশেই বাহাতে সেই সব গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার আরোজনও তাহা দ্বারা সম্ভবপর হইবে।

• •

## ১২। গ্রন্থমালা-প্রচার

সূত্র আকারে গ্রন্থ লিখিয়া জ্ঞানবিদ্যারের চোটা ইংলেও খুবই দেখা যায়। সেখানে বহু প্রকারের “গ্রন্থমালা”র প্রবর্তন হইয়াছে। অল্প কথার ছোট ছোট পুস্তিকা পাঠ করিয়া কালের লোকেরা নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিতেছে। এই সকল গ্রন্থমালা কেবল মাত্র অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত বা কৃষিকারী ও শিল্পী জনগণের জন্যই লিখিত হয় না। উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাও এই সকল

গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন কথা শিখিতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা গ্রন্থগুলি লিখান হয়। Englishmen of letter Series, Universal Library Series, Home University Library Series, People's Books Series, Wisdom of the East Series, Foreign Statesmen Series, ইত্যাদি নানাবিধ গ্রন্থমালা প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর-জীবন সম্বন্ধেও এক জেম্বীর পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বিখ্যাত নগর-সমূহের ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। পাঠকগণ অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা ইত্যাদি নগরের পরিচয় ইহা হইতে সহজেই পাইতে পারেন।

ভারতবর্ষে আজ কাল সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ভারতীয় নগর-কথা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থমালা প্রচারিত হইবার সময় এখনও আসে নাই কি? নালন্দা, তক্ষশীলা, মাছরা, পুণা, পুরী, কামাখ্যা, গৌড়, কাশী, হরিদ্বার, নাগোর ইত্যাদি নগরের সূত্র সূত্র ইতিহাস-পুস্তক বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী ও অস্ত্রান্ত ভাষায় এক্ষণে দেখা বাইতে পারে না কি? “ভারত-দৌরব্য-গ্রন্থাবলী” যে প্রণালীতে ভারতীয়-প্রধান ব্যক্তিবিশেষের জীবনী প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন, নগর-কথাও ঠিক সেই ভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হইতে পারে।

দেশে ও নানা প্রকারের অভাব লাগিয়াই আছে। হাফাকারেরও অভাব নাই। কিন্তু দেশবাসী অধিকাংশই অজ্ঞাত বলে সে অভাব মোচন করিতে পারিতেছে না, সে হাফাকার বন্ধ করিতে পারিতেছে না। বিশেষজ্ঞগণ যদি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য

স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সরল ভাষায় সরল পন্থা নির্দেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাদ্বারা প্রণয়ন করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত করেন, তাহা হইলে দেশের মহৎ কল্যাণ লাভিত হয়। তাহারা উচ্চ জীবিত উপর প্রভাবমান থাকিলে অস্বাভাবিকতরনগণ তাহাদের "নাগাল" পাঠ্যে না। তাই তাহাদিগকে নামিয়া আসিতে হইবে—সমস্তল মাটিকে স্পর্শ করিতে হইবে। এই মাটিকে স্পর্শ না করিলে, দেশহিতৈষণা কাদান ছাড়া আর কিছুই বলিয়া অস্বাস্থ্য হইবে না।

• •

### জাপানে বৈষয়িক উন্নতি

গত ৬০ বৎসরের মধ্যে জাপানের বৈষয়িক উন্নতি খুবই ক্ষুদ্র বাড়িয়া গিয়াছে। যেদিন হইতে জাপানীরা পাক্কাটা প্রণালীকে আদর্শ করিয়াছে সেই দিন হইতেই এই উন্নতির সূচনা। এখন, জাপানের প্রধান প্রধান লোকবহুল স্থানে নানাবিধ কল-কারখানার ঘোঁষার আকাশ সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ের মধ্যেও জাপানীরা কখনো নুপুণের আভাস দেখা যায়।

জাপানের যে বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখিতেছি এখন সেখানে ১৪,২২৮ টি ফ্যাক্টরী, এবং তথায় নিযুক্ত লোকসংখ্যা প্রতিদিন গড়ে ১২৩,৩৮৫ জন। ইহা হইতে বুঝা যায় দশবৎসরে কারখানার সংখ্যা ৬,৮১২ এবং তথায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৩৬০,০১২ বাড়িয়াছে।

আগে সেখানে হাতের ছায়া চালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন বাষ্পীয় যন্ত্রের কাছে সে সব হার মানিতেছে। বহিঃ বহন-

কার্যে এখনও তাঁতগুলি হাতেই চালান হয়, কিন্তু তথাপি এ বিভাগেও বিশেষতঃ সুতা ও রেণম বহনে দ্রাবুণিক উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিবার সূচনা দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ মারিয়ার দাবী জনাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন বেশ কম বলিয়া বুঝা যাইতেছে। অস্ত্র-এবং হাতের পরিভ্রম অপেক্ষা যন্ত্রের ব্যবহার বিশেষ আদরীয় হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মানুষ অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যে বেশী কাৰ্য দেখাইবে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বিশেষতঃ জাপানে প্রাকৃতিক ষোয়া প্রভৃতির অভাব নাই, সুতরাং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র চালাইবার পক্ষে সম্ভাবনাও সেখানে খুব বেশী। এখন জাপানের অসাধ্য নদী-নালা জল-প্রপাত প্রভৃতি এইরূপ কার্যে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে তখন, তাহার বৈজ্ঞানিক উন্নতি যে কি বিপুল বিস্তার লাভ করিবে, তাহা আমরা বেশই বুদ্ধিতে পারিতেছি।

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনও অনেক পরিবর্তিত হইয়া যায়। সামাজিক শাস্তি পথে পথে ক্ষুদ্র হইতে থাকে, ব্যক্তির জীবনে চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি নানা দোষ আনিয়া দেখা দেয়। শেষে বাহ্যিক মূলধন বোপাইয়া থাকেন, তাহার অর্থ ও ভোগবিলাসিতার গড়াইতে গড়াইতে অলস জীবন যাপন করেন, এবং যে সমস্ত হুণী মজুর তাহাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সেই অর্থ তাহাদের হাতে তুলিয়া দেয়, তাহাদের দৈন্ত দুর্জনা উচ্ছৃঙ্খলতার অভাব থাকে না। এই জীবন বৈষম্য নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই বৈষম্য বিতাড়িত করিবার জন্য নানাবিধ সম্মতির উদ্ভিত হয়। সেই সম্মতিদ্বয়ের কেহ বা

সোসিয়ালিষ্ট, কেহ বা ধ্যানাঙ্কিষ্ট। ইউরোপে  
আম জাহাঙ্গিরের বিরূপ প্রাধান্য, অনেকেরই  
বোধ হইত তাহার খবর রাখেন।

আপান বড় বেশী ইউরোপের দিকে তুঁকি-

তেছেন। কিন্তু আমাদের আশা আছে,  
ইউরোপ যে তুল করিঘাড়ে, জাপান সে তুল  
করিবে না, পরিণামে সে সব দিকেই সামঞ্জস্য  
ও শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।



## নব্য বিলাতের রুজ্জমক ও নাট্যকলা

সন্ধ্যার পর স্নাতক থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গেলাম। শেক্সপীয়ারের Mid Summer Night's Dream নাটকের অভিনয় হইল।

নাট্য হিসাবে আমি কোন দিনও ইহাকে পছন্দ করিতাম না। জীবনের গভীর কথা ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। মোটের উপর একটা হালুকা পাতলা অগভীর জীবন বাপনের চিত্র এই নাটো প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদনামূলক বিনামাস্তক নাটো জগতের যে সকল বৃত্তি জাগরিত হয় এ নাটো তাহার আভাষ মাত্র নাই। মাঝে মাঝে গাল ভরিয়া হাসিবার স্বযোগ পাওয়া যায় মাত্র। অবশ্য এই জন্তই এই অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। একজন হাসি ঠাট্টা আয়োজন প্রয়োজ্যও প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া কতকগুলি স্বন্দর স্বন্দর বক্তৃতা এই নাটোর স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে লম্বা লম্বা উপদেশ কিংবা স্বপ্ন কথ্য ইত্যাদি বিশেষ শোভা পায় না। বিশেষতঃ এই নাটকের গল্পও এমন কিছু ঘটনাবলি নয় যে মাঝে মাঝে ছোট কবিতার আশ্রয়িত্তি অনুভব মনোযোগ বাড়াইতে হইবে। সকল দিক হইতেই এই নাটক নাট্য হিসাবে অতি নিয়মশীল অন্তর্গত।

যাহা হউক শেক্সপীয়ারের নাটক আজ-কাল প্রায়ই অতিমীত হয় না। এক্ষণে দেখিতে গেলাম। নৃত্য শীতারিখি এই অভিনয়ের প্রধান অঙ্ক। তাহাই উপভোগ করা গেল।

বুদ্ধিলাস শেক্সপীয়ার যে যুগের জনগণের মস্ত লিপিরাছিলেন সেই যুগে ইহা যথেষ্ট আশ্চর্যই পাইত।

বিলাতী নৃত্যের ভঙ্গী ভারতবর্ষে অস্বাভাবিক হওয়া উচিত কি না, তাহা বলিতে পারি না। নৃত্য-কলা কখন বৃদ্ধিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু ইহা বেশ বুদ্ধিলাস যে বিশেষীয় নৃত্যও ভারতবাসী দৌন্দর্য উপভোগ করিবার অনেক লক্ষণ পাইবেন। বিশেষভাবে মনে পড়িতে লাগিল যে একসঙ্গে অনেকের নৃত্য ব্যাপারে সামঞ্জস্য ও সুখ্যাতি রাখা করিবার রীতিই বিলাতী নৃত্য-কলার প্রধানতঃ প্রাণসংযোগ্য। ইংরাজী শীতের স্বরকেও অবজ্ঞা করা চলে না। অন্যদিকেই এই স্বর বুদ্ধিগা উঠা যায়। স্বরজ, তালজ, বাগজ না হইয়াও ইংরাজী নৃত্য-শীত-বাগে বদৈশ্বর ওস্তাদগণের কলাজ্ঞান বুদ্ধিতে পারা গেল। অবশ্য রীতি সম্পূর্ণ পুঙ্খ।

প্রাচ্য দেশকে বৃত্তিবার মস্ত ইংরাজেরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এমিলিয়ার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানজাতি সমূহের জীবন কথা আজকাল ইংরাজসমাজে আদৃত হইতেছে। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা অবগত হইবার মস্ত বিলাতের জন-গণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার নানা পরিচয় ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনে একটা "প্রাচ্য-পরিব্রমণ" গঠনের বিষয়টি আয়োজন চলিতেছে।

ভাষাতে ইংরাজ পরিভ্রমণ। পাচা মানবের চিন্তা-পদ্ধতি, কার্য-প্রণালী, আবেশ, শিল্প, সাহিত্য সকল বিষয়ে প্রবেশনা করিবেন। এতদিন ইংরাজেরা ফরাসী, জাপান এবং এখন কি কথ্য অনেকাংশে প্রাচ্যবিশ্বকে ক্রম জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইতোপূর্বে প্রায় সকল দেশেই এক বা একাধিক প্রাচ্য সমিতি আছে। কিন্তু ইংরাজসমাজে একটাও নাই। এই জন্য লর্ড কার্জন সে দিন এক প্রকাশ্য সভার ভূষণ করিয়াছেন। ইংরাজ মতে সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রাচ্য দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প ইতিহাস ও ধর্মের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া নিত্য আবশ্যক।

যাহা হউক কিছুদিন হইল পারস্ত, জাপান, চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের প্রতি ইংলণ্ডের লুপ্তগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সে দিন রবীন্দ্রনাথের "সীতাভক্তি" ইংলণ্ডে আদৃত হইবার কারণ আলোচনা করিতে যাঁহা একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছিলেন ইংরাজের নববিকশিত প্রাচ্য-সমাজের প্রতি ইংরাজের মূল। তিনি ইংলণ্ডে প্রাচ্য সমাজকে বুঝিবার জন্য বিশাল সঙ্কে বলেন "Then came the talk about Delhi Durbar and the Delhi Durbar itself and all that vague interest in Eastern Art, Eastern thought and Eastern literature which had been steadily, if quietly growing since the opening up of Japan, concentrated upon India. Hence the success of *kismet* of Pseudo-oriental drama of the Russian ballet and Summeran." দেখা যাইতেছে ১৯০৬

সালে জাপানের অঘলাভের পর হইতেই ইংরাজেরা প্রাচ্যকে বুঝিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রাচ্য-সমাজে এই জীবন-সংশয় লক্ষ্য না করিলে ইংরাজরাতির মধ্যে এত শীঘ্র প্রাচ্য-সমাজের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ।

কাল রায়ে "মোব" থিয়েটারে Kismet দেখিতে গিয়াছিলাম। কিস্মেতের আদর ইংরাজের সমাজে খুব বেশী। "মোব" থিয়েটার "লেভার" থিয়েটারেরই মত। বাড়ী ঘর, সাজ সজ্জাম, কার্য পরিচালনা, মক, বসিবার স্থান ইত্যাদি সবই প্রায় একপ্রকার। দুই রাত্রেই থিয়েটারে লোক সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। দর্শকবিশেষ মধ্যে কাগজকেও কথাবার্তার অংশবিশেষ বা উচ্ছ্বসন বোধ হইল না।

দুই থিয়েটারেই মেথিলায় নৃত্য শিল্পে বা অভিনয়ে দর্শকেরা বিশেষ স্ত্রীত হইলে অভিনেতারী ঘবনিকা পতনের পরেও যেকোন উপর আশ্রয় দর্শকগণকে অভিবাদন করিয়া যান। মার্কাসের অভিনেতারীও ঐরূপ করিয়া থাকেন। ইহা বোধ হয় পাকিস্তান দেশের রীতি। কোন ব্যক্তির প্রশংসা গাইলে তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এই সমাজের নিয়ম। এমনই প্রশংসা প্রাপ্ত নায়ক নায়িকা বা নট নটরী নৃত্য শিল্পের পরক্ষণেই অবনত মস্তকে দর্শকগণের প্রতি সজ্ঞা ও সন্তান প্রকাশ করেন।

সে দিন Mid Summer-nights Dream-এর শেষ রজনী ছিল। অভিনয়ের পর দর্শকবর্গ এবং অভিনেতারী সকলে মিলিয়া ড্রপ-সিনের সম্মুখে যেকোন উপর দাঁড়াইলেন। দর্শকেরাও সববেত হইয়া প্রায় ৫ মিনিট করতালি দ্বারা নিজেদের

আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। থিয়েটারের কার্যাব্যাক বলিলেন “আপনারা এই বিখ্যাত নাটকের বর্তমান নাট্যকারকে যে সম্মানে প্রদর্শন করিতেছেন হুঃখের কথা তাহা নিজে দেখিবার জন্য তিনি উপস্থিত নাই। যাহা হউক আমি পত্র দ্বারা তাঁহাকে আপনাদের স্তুতি জানাইব।” বেশিলায় পর দিন প্রত্যুষে টাইম্‌স্‌ পত্রে এই উৎসাহ ও আনন্দের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

‘কিস্মেট’ের অভিনয় এক অপূর্ণ ব্যাপার। ইহা দেখিলে সমগ্র মুসলমান সভ্যতার চূড়ক ২০ ঘটটার মধ্যে আয়ত্ত হইয়া যায়। মুসলমান জগতের এমন কোন ঘটনা বা দৃশ্য নাই যাহা এই নাটকের ভিতর কোন না কোন আকারে প্রতিবেশিত হয় নাই। থিয়েটারের কর্তৃকর্তারাও এই অভিনয়কে সকল প্রকারে খাটি মুসলমান সমাজের যথাযথ চিত্ররূপে দর্শকগণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

শ্রী পুরুষ, বালক বালিকা, হাট বাজার, বিচারালয় জেলখানা, মসজিদ সহর নগর পল্লী রাস্তাঘাট, বাড়ী ঘর সবই এই অভিনয়ে ইংরাজের নিকট নৃতন ও বিচিত্র বোধ হইবে। এই নৃতন ও বৈচিত্র্য বুঝাইবার জন্য অভিনয়ের ভিতর অগণ্য নাটক নাটিকা, বালক বালিকা, নট নটীর অবতারণা করা হইয়াছে। কেবল মাত্র ২৪ জন মুসলমান শ্রী পুরুষ দেখিলে মুসলমান সভ্যতার চিত্র বিদেশীয়গণের নিকট পরিষ্কৃত হওয়া কঠিন। কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের, নানা ব্যবসায়ের, নানা চিত্তের, নানা বয়সের নানা নর নারীকে চোখের সামনে নানা প্রকার কাণ্ডে ও চিন্তায় ব্যাপ্ত দেখিলে ঐ সমাজের সকল অঙ্গাঙ্গী ও প্রতিষ্ঠান এবং খুঁটিনাটিও চিত্তের

মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। একজন ‘কিস্মেট’ দেখিয়া ইংরাজেরা মুসলমান জগতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার সুযোগ পাইতেছেন। আমরাও তিন ঘটটার জন্ত বিলাত ছাড়িয়া মিশর, এশিয়া মাইনর এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিচরণ করিলাম। আনন্দেই সুপরিচিত লোকজন আমাদের সম্মুখে বিরাজমান দেখিলাম।

কোন চিত্রে মুসলমান সমাজে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বুঝা যায়, কোন চিত্রে রাজা প্রজার সম্বন্ধ পরিষ্কৃত। ইংরাজেরা মুসলমানী শিল্প, উপাসনা পদ্ধতি, চিকিৎসা, ব্যবসায় এবং হাটবাজার কর্তাও দেখিবার অবসর পাইলেন। রাষ্ট্রের পরিচালনা, মহী বা উল্লীর অবস্থা, বড়ঘর, বিচার পদ্ধতি এসব পরিবাররূপেই বুঝা গেল। রমণীজাতির অবস্থা, তাহারের পোষাক পরিচ্ছদ, শ্রী স্বামীর সম্বন্ধ, বিবাহের নিয়ম, গৃহস্থালী ইত্যাদি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনও হৃদয়ঙ্গমেই অঙ্কিত হইয়াছে। একটা নৃতন জাতিকে বৃত্তিতে হইলে স্বতন্ত্রি বিবাহ জানা আবশ্যক সকলগুলি এই নাটকে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত রহিয়াছে।

নাট্যকারকে বেশী প্রণয়না করিব কি থিয়েটারের কার্যাব্যাককে বেশী প্রণয়না করিব বৃত্তিতে পারিতেছি না। নাট্যকারের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্ত কার্যাব্যাক বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। কোন কোন দৃশ্যে প্রায় চল্লিশজন আবালবৃদ্ধবনিতার প্রবেশ দেখান বড় সহজ কথা নয়। প্রত্যেককে আবার ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে শিল্প বেগান আরও কঠিন। এই অভিনয়ে দেখিলাম কোন একজন কবিরের চেহারা অন্য একজন কবিরের অঙ্কন নয়। কোন

রমণীর চাল চলন অস্ত্র রমণীর চাল চলনের মত নয়। কোন এক ভূতোর পোশাক পরিচ্ছন্ন বা চরিত্রও অস্ত্র কোন ভূতোর মত নয়। এত বৈচিত্র্য ও এত বিভিন্নতা দেখা-ইতে না পারিলে কি একটা বিশেষীয় সমাজের বাস্তবজীবন এবং চিত্তরকার জীবন কোন সম্পূর্ণ নৃতন সমাজের নিকট বৃত্তান যাব ?

কলিকাতায় কোন থিয়েটারে খাটি রূপ সমাজের অবস্থা সযত্নে একটা অভিনয় করিতে হইলে মোব থিয়েটারের এই প্রচেষ্টার অসুত্বপূর্ণ কার্য্য করা হইবে। প্রথমতঃ রূপ জাতি সযত্নে কত বিষয় জানা আবশ্যক ? দ্বিতীয়তঃ তাহা বুঝাইবার অস্ত্র কত সরঞ্জাম আবশ্যক ! এই কথাগুলি বুঝিলেই মোব থিয়েটারের কিস্মেত অভিনয়ের মাহাত্ম্য বুঝা যাইবে।

আর একটা বিষয়ও লক্ষ্য করিলাম। মূলময়ান সমাজকে বিজ্ঞপন বা তিরস্কার করিবার অস্ত্র এই নাটক প্রস্তুত হয় নাই। ইহা একটা 'caricature' 'নক্সা' বা প্রহসন যাত্রা নয়। ইংরাজকে মজার গল্প শুনাইবার অস্ত্রই নাট্যকারের প্রয়াস ছিল না। তিনি মূলময়ানজাতির সত্য বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ণকেরা প্রকৃত মূলময়ানগণের পরিবাহ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের পরিচয় পাইতেছেন।

ইংরেজ সমাজে এবং মূলময়ান সমাজে প্রায় কোন বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। এজন্য নারক নারিকাগণের কাজ কর্তৃ হাব ভাব বুঝিতে ইংরাজ বর্ণকদিগের কিছু কষ্ট পাইতে হয়। অনেক ঘটনা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেও বাধ্য। কিন্তু বিশ্ব বা তান্ত্র বিজ্ঞপন বা অবজ্ঞার কল নয়। সম্পূর্ণ পৃথক জীবনযাত্রা পদ্ধতির প্রথম পরিচয় পাইয়া সকলেই একরূপ আতর্ক্য হইয়া থাকে।

মানবজাতির একটা নৃতন শাখা সযত্নে ইংরাজ জনগণ এই অভিনয় দেখিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতেছেন। ইহা প্রকৃত প্রত্যাবে মূলময়ান সভ্যতার একটা মিউজিয়াম, সংগ্রহালয় বা প্রদর্শনী। ইতিপূর্বের নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিক্ত ঈর্ষাকেরা যত শিথিয়াছেন এই অভিনয় দেখিয়া ইংলেণ্ডের জনসাধারণ তাহা অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। ইহাই কিম্বেত অভিনয়ের বিশেষত্ব ও গৌরব।

কিন্তু এই থানেই আবার ইহার অসম্পূর্ণতা। একটা বায়োম্যাপের যে কল, একটা সিনে-ম্যাটোগ্রাফের যে কল, এই অভিনয়েও ঠিক সেই কল দেখিতে পাইলাম। থিয়েটারের অভিনয়কলাকে সাধারণ দৃষ্ট-প্রদর্শনের সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে। কাজেই উক্ত অঙ্কের অভিনয়চর্চাতির স্থান এই নাটকে অল্প। ছবি দেখা, বিচরণশীল মুক্তি দেখা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দৃষ্ট দেখা, নানাজাতির সভাব দেখা, বিভিন্ন রীতি নীতির সম্মুখ বিবরণ দেখা এই সমুদয়ই কিস্মেতের প্রাণ।

কিস্মেত কাব্যকলা অপেক্ষা এবং নাট্য-শিল্প অপেক্ষা ম্যাকিক লঠনের দ্বারা চিত্র-প্রদর্শনের ভাব বেশী পাইলাম। তাহার দ্বারা জিনিষগুলি মনে ভাল স্থান পায় সত্য ; কিন্তু কার্য্য হিসাবে, অভিনেতাদের কৌশল হিসাবে, নাট্যকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা হিসাবে, নাটকের গল্পরচনা হিসাবে এত অভিনয় হইতে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই না। কেবল নাচ গান, লোক পরিবর্তন, দৃষ্ট পরিবর্তন দেখিতেছি। প্রত্যেক দৃষ্টই মনোরঞ্জন—প্রত্যেক দৃষ্টই নৃতন নৃতন জিনিষ দেখিয়া প্রীত হইতেছি। যেন এক নিঃশব্দে মিশরের সকল নগর খুঁটিয়া আনি-

লাম। গল্পাংশেব পারদর্শী মনে না রাখিলেও ক্ষতি নাই। দেখানে দেখানেই চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও দৃশ্য পাওয়া যায়।

কাজেই কিশ্বত দেখিয়া মোটের উপর দুইটা ধারণা স্পষ্ট হইল। প্রথমতঃ ইংরাজ-জাতি অল্প সমাধিকে নৃসিংবার ভঙ্গ চেষ্টা করিলে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন। তাঁহাদের কবি ও লোকগণ বিশেষীক-সমাজের তথ্য সংগ্রহে নিপুণ। থিয়েটারের কাৰ্য্যাধ্যক্ষ এবং বায়োম্পোন এবং সিনেম্যাটোগ্রাফের প্রদর্শকগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের তথ্য সংগ্রহে যথার্থ চিত্র সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট। বিশেষতঃ এই চিত্রগুলির ভিত্তিকার কথা নৃসিংবার ক্ষমতাও তাঁহাদের আছে। এষ্ট কাহো তাঁহারা নিত্যন্ত গোলমালে গিঁড়ী সৃষ্টি করেন না বা “উদ্যোগ পিত্তী বৃদ্ধের খাড়ে” চাপান না। পরকীর সমাজের নানা দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া ইহারা তাহার একটা সামঞ্জস্য-পূর্ণ ছন্দে চিত্র প্রদান করিতে সমর্থ।

দ্বিতীয়তঃ ইংরাজসভিতে মানবলম্বাঙ্কের গভীরতম তত্ত্বগুলির আলোচনা হয় কি না সম্ভব। নাট্যের দ্বারা চরিত্র গঠন করা, লোকমত তৈয়ারী করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য বর্তমান রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না। দর্শকেরা সারাদিনের কষ্টের পর থিয়েটারে আনন্দ উপভোগ করিতে আসেন।

চিত্রাণুর্ নাটক দেখিতে ইহাদের প্রস্তুতি হয় না। Midsummer night's Dream এবং kismet দুইই এই ধারণা বহুমূল করিল। থিয়েটার বর্তমান বিলাতে শিক্ষালব্ধ নহে নব-নাট্যগণের বিলাস ভবন দ্বারা—কাকি গৃহের ভ্রমর সমন্বয় কাটাঁইবার একটা অভ্যাস।

অবশ্য কিশ্বতের গল্পাংশ সাধারণ ইংরাজের অপরিচিত কোন একটা সমাজদ্বারই চিত্র।

ইহাতে উজীরের বিচার দেখিলাম; খলিপার শোভাযাত্রা দেখিলাম। মনজিলে নামাজ পাঠ করিলাম। ইহার ভিত্তর বাগানের মধ্যস্থলে বোকাবদারগণের প্রতিবন্দিতা ও চাতাচাতি আছে। উজীরে খলিপার রেণা রেনির চিত্র আছে। তাকাত সর্দারের অদ্বুত নীরব কাহিনী এবং লোমকর্ষণ কাৰ্য্যাবলী আছে। ভাগার উপর শুভপ্রেরণ ও বেপস মঙ্গলের অন্ত্যবহারত আছেই।

মোটের উপর আখ্যায়িকা ভাগ ইংরাজ দর্শকগণের হৃদোবা না হউক চিত্তরঞ্জন করিতে যথ্য। কিন্তু নাটকে ঘটনার অটলতা বা ঘটনতা নাই। চরিত্র বিরোধের চেষ্টা নাই। কোন আর্থিক বা সামাজিক সমস্যার অব-তারণা করা হয় নাই। সামান্য ভাবে একটা গল্প বলিয়া যাওয়া হইয়াছে। গল্পের ভিত্তর দিয়া কোন আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিতে পাঁই না। তাকাত বীর হাওয়ার অদ্বুত জীবন ব্যতীই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজেরা এতদ নাটকে কি শিখিতে-ছেন? নূতন দেশের পরিচয় পাওয়া ছাড়া তাঁহাদের জীবনে নূতন কোন আদর্শ ও ধারণা প্রবেশ করিতেছে কি? বাস্তবিক নাট্য সাহিত্য হিনাবে “কিশ্বত” ইংরাজের অবনত অবস্থারই সাক্ষী। ইংরাজ-জীবন বড় ঠাণ্ডা ও আদর্শহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে নূতন কোন নাটকের অভিনয় প্রবর্তিত হইলে প্রায় এক বৎসর ধরিয়া ক্রমা-গত তাহারই অভিনয় চলিতে থাকে। পালা পরিবর্তন শীঘ্র শীঘ্র হয় না? আদ্যকাল ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় হইতেছে—কিন্তু এইগুলির কোনটা একবৎসরব্যধি কোনটা ছত্রাণ হইতে কোনটা ২০ মাস হইতে প্রতিদিন অভিনীত হইয়া আসিতেছে।



আজ সন্ধ্যার বার্লিড শ প্রদীত 'পিগম্যান-নিধন' নাট্যের অভিনয় দেখিলাম। শ-কবি আধুনিক ইংরাজী লেখক মহলে বোধ হয় স্বীকৃতি স্থানীয়। এই নাটকের নামও স্তুতিযোগ্য। থিয়েটারের প্রধান অভিনেতাও এদেশে সুপ্রসিদ্ধ। কিছুকাল পূর্বে ইনি লেন্সদীঘরের নাটকের অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। রজন্যকে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম Twelfth Night-এর অভিনয়ে যতগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা আছে সেইগুলির দৃষ্ট তৈল চিত্রাকারে অথবা ফটোগ্রাফির সাহায্যে গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। পিগম্যানিধন নাট্যের প্রধান অভিনেতার কার্যই সেই সকল চিত্রে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত।

বার্লিড শ মামুলী প্রেমকাহিনী পরিত্যাপ করিয়া এই গ্রন্থে কথঞ্চিৎ নূতন নূতন সমস্তার অবতারণা করিয়াছেন। বিলাতী সমাজে জাতিভেদ বধেই। এখানে নিম্নশ্রেণীর অধিকার অতি অল্প মাত্র। অবনত জনগণের সামাজিক উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। শ-কবি ইংরাজ জাতির এই সমস্তা বুকাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সামান্য একটা দৃষ্ট মাত্র তিনি দেখাইয়াছেন। পক্ষাঘ্ন বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলেন নাই। চরিত্র বিশ্লেষণেরও কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। সামাজিক সমস্তাটাও পতীতভাবে আলোচিত হয় নাই। সমস্তাটার প্রতি দর্শক ও পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র।

সাধারণ একটা নিম্নজাতীয় ফুলগুদালীকে "মধ্যবিত্তশ্রেণী"তে তুলিবার প্রয়াস এই নাটো দেখিতে পাইলাম। একদিকে যেমন কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য, দৃষ্ট-বৈচিত্র্য, স্থান-বৈচিত্র্য, এবং লোক-বৈচিত্র্য পাইলাম না, তেমনি অপরদিকে গুণ প্রেমের চিত্র, পর পুরুষ

সংসর্গ, অসংযত চরিত্রের দৃষ্টান্ত, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়াট ইত্যাদি নাট্যকারগণের প্রিয় বস্তু সমূহও দেখিতে পাইলাম না। বাস্তবিক পক্ষে প্রেম কাহিনী এই নাটকে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যাত ও বর্জিত হইয়াছে। ইহাই শ-কবির বিশেষত্ব। মামুলি হাহাতাপ, বিচ্ছেদ, হিংসা, ভাইভোদা, স্বীকৃতি, বিবাহ ইত্যাদি লেশমাত্র স্পর্শ না করিয়াও কবি একটা উপায়ে রচনা দৃষ্টি করিয়াছেন।

এ কথাও বলা আবশ্যক যে এই গ্রন্থে আলোচনার পতীততা বা বিস্মৃতি নাই। অতি ক্ষুদ্র কাহিনী, অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, অতি ক্ষুদ্র লোক-সমাগম। লেখকের সমাজ বিবন্ধক চিন্তা ঠিক কোন দিকে তাহা বুঝা কঠিন সমাজ-সংস্কারের জন্য ইংরেজদিগের আর্থিক অবস্থা কিন্তু পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক তাহাও জানা দেল না। এ দিকে কোন পরিবর্তন আবশ্যক কি না গ্রন্থকার তাহা বুকাইতে চেষ্টাও করেন নাই। তার পর ইহার রাষ্ট্রীয় মতই বা কি তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। সাম্রাজ্যানীতির প্রভাব সমাজের উপর কতখানি তাহার বিশ্লেষণ ইনি করেন নাই। এই মাত্র দেখাইয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্মচারীরা ইংরাজসমাজের আদব কাহিনী কুলিগা ধান। বহুকাল পরে কিরিয়া আসিলে ইংরাজ স্বদেশের সভ্যতা বুঝিয়া উঠিতে বিব্রত হন।

লেখক হস্ত রসের অবতারণা স্থানে স্থানে করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের রস প্রায়ই নাই। কোন কোন শব্দের মার পাচ করিয়া তিনি হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কছন্নত ইগাতে কথঞ্চিৎ হয়। তাহা দ্বারা কাঠ হাদি হাসা যায়। কথা কাটাকাটি দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্য পুলকিত হওয়া

যায়। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে বা চরিত্রবিকাশে এই হাত হইতে কোন দিক পাওয়া যায় না।

মানবজীবনের গভীরতর সমস্যাগুলির মধ্যে অশেষ বিষয়, বিরোধ, অসামঞ্জস্য এবং বৈপরীত্য স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে। সেই সকলের পরিচয় পাঠলে মানুষ বিচিহ্ন ও পুলকিত হয়। এই বিষয় ও পুলক কেবলমাত্র কথিক আনন্দ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয় না। তাহার দ্বারা জীবনের উপর একটা স্থূল প্রভাব বিস্তৃত হয়, এবং চরিত্র গঠিত হইতে থাকে।

মানবজীবনের এইরূপ স্বাভাবিক বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য ইত্যাদি সাহিত্যে দেখান সহজ কথা নয়। এই জন্য উক্ত অনেক humor বা হাস্যরস আমরা যে দেখে কাব্যে পাই না। রবীন্দ্রনাথের “আজি রজনীতে হেঁচে সময়, এসেছি বাসবদত্তা” চিত্রে যে বিষয় ও পুলক সৃষ্টি হয় তাহা সাধারণ হাঙ্গা কাব্যে পাওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য সাধারণতঃ আমরা যে সকল সাহিত্য পাঠ করিয়া হাস্য উপভোগ করিয়া থাকি সেগুলিতে শেষের আভ্যন্তর, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি ভাব্য কারণচূপি মাজ দেখিতে পাই। দোজা কথাই ইহাকে ফকরী, বাচালতা এবং কাজলামি বলে। ‘হিউমার’ বা হাস্যরস ইহা হইতে স্বতন্ত্র। তাহা অন্য জগতের জিনিষ। বার্নার্ড শ প্রণীত এই সামাজিক কাব্যে সে হিউমার নাই।

এগানকার থিয়েটারে বিনা পয়সায় প্রোগ্রাম পাওয়া যায় না। এক টুকরা কাগজের জন্য ১/৬ আনি পরমা খরচ করিতে হয়। তাহাতে অভিনীত নাটকের অর্থ এবং দৃশ্য সসুহৃৎ বিনন্দরূপে বুঝান থাকে না। নাট্যোন্নতি ব্যক্তিগণের ন্যায় লেখা থাকে এবং কোন্ কোন্ মট নটী এই সকল ব্যক্তির কার্য অভিনয় করিবেন তাহাদের নামও লেখা

থাকে। অদিকন্তু, দৃশ্য পরিবর্তনের সময় কনসার্ট পাউ যে সকল সুর বাজাইয়া থাকেন তাহাদের পারিভাষিক নাম অর্থাৎ রাগ রাগিনী তাল ইত্যাদি বুঝান থাকে। কিন্তু গল্পের সার মর্ম্ম এই প্রোগ্রাম দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না। শিগম্যানিওনের ‘প্রোগ্রামে’ এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

### প্রথম অঙ্ক

রাতি ১১টা ১৫ মিনিট। স্থান—কডেক্ট-উত্তানের অভ্যন্তরস্থিত গির্জাঘরের বারান্দা।

### দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক

অধ্যাপকের বিজ্ঞানালয়।

### তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্ক

অধ্যাপক জননীর বৈঠকখানা—টেন্সের কিনারায়।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা প্রথম অঙ্কের পরদিন প্রাতঃকালে এবং পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা চতুর্থ অঙ্কের পরদিন প্রাতঃকালে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের ভিতর কয়েক মাসের ব্যবধান এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ভিতরও কয়েক মাসের ব্যবধান।

নাট্যে বর্ণিত ঘটনার কাল—আধুনিক।

আজ অক্ষর ওয়াইল্ডের An Ideal Husband বা ‘আদর্শ স্বামী’ নামক নাট্যের অভিনয় দেখিলাম। এই নাট্য ইংলণ্ডের বাহিরে জ্ঞান, জ্ঞানপি এবং কনিয়ার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবি ওয়াইল্ডও ইংরাজ সমাজে বিশেষ পরিচিত। বার্নার্ড শ এবং ওয়াইল্ড এই দুইজন নাট্যকার আধুনিক ইংরাজী-সাহিত্যের দুর্দ্বার।

এই অভিনয়ের অর্থ ও দৃশ্য নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

## প্রথম অঙ্ক

প্রভেনার কোয়ার্টার—তার রবার্ট চিলটার্ণের  
তখন ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

তার রবার্টের বৈঠকখানা

## তৃতীয় অঙ্ক

লর্ড গোরিং এর গৃহের বলিবার ঘর

## চতুর্থ অঙ্ক

তার রবার্টের বৈঠকখানা

ঘটনার কাল—আধুনিক । ঘটনার স্থান—  
লন্ডন ।

নাট্যাঙ্গিভিত ঘটনা একদিন বুধবার সন্ধ্যা-  
কালে আরম্ভ হইয়া পরবর্তী শুক্রবার সকালে  
সমাপ্ত ।”

এই নাটকে সুপ্রচলিত পাঁচ অঙ্ক নাই ।  
ঘটনার স্থান বৈঠকখানা বা বলিবার ঘর ।  
অম্বরমহল বা “ঘোনাঘর” কোন দৃশ্য ইহাতে  
নাই । পারিবারিক চিত্র এখানে দেখান হয়  
নাই । যে বলমতে রাষ্ট্র বা সামাজিক জীবন  
ব্যক্তি প্রকাশ্য তথ্য এই কাব্যে আলোচিত  
হইরাছে ।

আর একটা কথা লক্ষ্য করা কর্তব্য ।  
নাটকের ব্যক্তিগণ বড় ঘরের লোক । ইগার  
কেহই জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর  
অভ্যর্থিত নন । লর্ড পরিবারের কাহিনীই  
এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় । শিশুমানুষনে  
বার্ণাড শ ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা  
করিয়াছেন । আজ এই সমাজের উচ্চ  
সমাজের রহস্য জানিতে পারিলাম ।

তার রবার্ট পার্সোয়েন্টের নামজালা সম্বন্ধ ।  
ইনি বিলাতের পর-রাষ্ট্র-সচিব । বিশেষ  
রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিও এই নাটকে স্থান  
পাইয়াছেন । তিনি কখনো রাষ্ট্রদূত । অবশ্য

ইহার স্থান অভিনয়ে অতি সামান্য । বিশেষ  
মধ্যে মিশরের কথা এই গ্রন্থের কেন্দ্র ।  
মিশরের নাইল নদীর উপর ডায়াম নিখাণ  
ব্যাপারে ফ্রোড় ফ্রোড় টাকা খরচ হইবে ।  
এই কার্য্য হুশাসিত করিবার জন্য ব্যবসায়ী-  
নিগের উৎসাহ সৃষ্টি করা আবশ্যক । অথচ  
ইহাতে লাভবান হইবার আশাও অত্যন্ত ।  
কিন্তু একজন লর্ড কত্যা এই ব্যাপারে অজ্ঞ  
টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন । কাজেই  
তিনি মনে করিলেন যেন তেন প্রকারেণ  
পার্সোয়েন্ট-লর্ডায় এই ব্যবসায়ের স্বপক্ষে মত  
প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য । তাহা হইলে অত্যন্ত  
ধনী লোকেরা এইদিকে ঝুঁকিবে । তখন  
নাইল ডায়ামকে সফল করিয়া তোলা ইংরাজ  
ধনীনিগের স্বার্থের মধ্যে পরিগণিত হইবে ।

এই উদ্দেশ্যে লর্ডকত্যা তার রবার্টকে হাত  
করিবার জন্য আনিয়াছেন । যুব বাহা প্রয়ো-  
জন হয় তাহাই দিতে তিনি যীকৃত । তার  
রবার্ট রাজী হইলেন ।

এদিকে তাহার পত্নী অর্থের প্রলয় দিবে  
না—বামীকে বিরত করিতে চেষ্টা হইলেন ।  
এইখানে পারিবারিক সম্বন্ধ এবং রাষ্ট্র  
জীবনে বিরোধ ঘটিল । সাম্প্রতিক-প্রেম এবং  
রাজনৈতিক পরমর্থাভাষ ঘন ঘন হইল ।  
এই ঘন ও বিরোধই “আদর্শ বানী” নাটকের  
কেন্দ্র । কবি এই ঘন বেশাইতে যাইয়া  
বিলাতের রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালী, ইংরাজ-সমাজের  
গুণকথা, ইংলণ্ডের ধনী নরনারীর অর্থনিপা,  
চরিত্র হীনতা, চৌধুরিত্ব, কপটতা ইত্যাদির  
স্পষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন ।

বিলাতী বড় ঘরের চারিটা চরিত্র এই  
নাটো বিশদরূপে বৃত্তান হইয়াছে । চারিজনই  
নানা দোষে দোষী । আল জুতাচুড়ী, অসা-  
ধুতা, গল্পপ্রেম এখানকার ধনী সমাজের

স্বভাবনিষ্ঠ। এই অভিনব দৈবিলে ইহাই মনে হইবে। রাষ্ট্রীয় জীবনের এট কলঙ্ক নিবারণ করিতে হইলে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ উন্নত কর। আবশ্যক। এই তথ্য বুঝাইবার জন্যই কবি ওয়াইল্ড নাট্য রচনা করিয়াছেন বুঝ। গেল।

শে দিন ইংরাজের জাতিভেদ সমস্ত। দেখিয়াছি। আজ ইহাদের পরিবার সংস্কারের আন্দোলন বৃদ্ধিলাভ। দুইটোতে দেখিলাম সামাজিক কৃত্রিমতাকে, অর্থের

গৌরবকে এবং পদমর্যাদার অহঙ্কারকে পর্ত করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে সহৃদয়তাকে, স্বাভাবিকতা-স্বল্পতাকে এবং ব্যক্তিগত ও পরিবারগত জীবনের উচ্চ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইংরেজরাণী সমাজের সর্বত্রই আজ এই বিপ্লবের সূচনা দেখা যাইতেছে। ইহারা কি ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে চলিল ?

শ্রীদর্শক।

## রোগ-রহস্য

জীবজন্তু মানবের জীবনব্যাপী অন্তরে আমরা নানাবিধ নৈমিত্তিক ক্রিয়াপরম্পরার উপান পতন, হ্রাস বৃদ্ধি, উৎকর্ষ অপকর্ষ অবলীলাক্রমে চান্দ্র্য দৃষ্টিগোচর করিয়া চলিয়া আসিতেছি। ইহা যে শুধু মানবের বেলা প্রযোজ্য তাহা নহে, জীবজন্তুই এই অবস্থান্তররূপী কালনেমীর দাসত্ববাস। জীবজন্তুই জীবন রহিয়াছে; ঘুরাইয়া বলিতে গেলে, যাহাদের জীবন আছে তাহারাই জীব। যেখানে জীবন, সেখানে চৈতন্তের স্ফূর্তি অপরিহার্য। চৈতন্ত জীবনের অন্তর্ভুক্ত ঔপলব্ধিক শাখা মাত্র। লোকে গতচৈতন্ত হইলেও জীবরাধ্য হইতে বহির্ভূত হইয়া পড়ে না; তা না হইলে অপ্রয়োজনকালীন হর্ষোচ্ছ্বসিত (Chloroformed) কল্পব্যক্তিবিশেষকেও আমরা নিজীব-বলিতে কখনই কুণ্ঠিত বা পশ্চাদ্গম্য হইতাম না। চৈতন্তের সাক্ষ্য, অথবা Response to Stimulus অল্পভূত করা না যায়, তবে প্রাক্তিবিশেষকে বাহ্যিক জ্ঞানরহিত, সাধারণ কথায় গতহাবতাব হইতে দেখা যায় বটে,

কিন্তু তাই বলিয়া ইহা হইতে অহুত হই না যে প্রাক্তি জীবনবিবর্তিত বা নৃত। দেহ-শিক্তের যতকণ জীবন বর্তমান থাকে ততকণ দেহধারীকে আমরা জীব বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকি। এই জীবনই সার। জীবের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই সর্বপ্রথমে জীবনব্যাপার ও দৈবনিক শক্তির আধার সম্বন্ধে যথাসংক্ষেপে উল্লেখ করা, বিশেষতঃ এখানে, অতীব প্রয়োজনীয় মনে করি। এতদ্ সম্বন্ধে বর্তমান যতবাদের অবতারণা না করিলে আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া যায়, এবং বর্তমান রোগনীলীসমস্তা ব্যাপারে দৃষ্টিভ্রষ্ট করা যৎপরোনাস্তি কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়ে; আবার আমরা অনেক সময় আমাদের প্রাচীন ধারণাকে জনগণে বহুদূর রাখায়, এবং অনেক স্থলে নিজেদের উক্তি সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বা বা তা আওড়াইয়া নীরবে বসিয়া থাকায় রোগমূলে নিহিত সত্য হইতে অলিঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি।

আমকাল আমরা বাস্তবত্বের (Physiology) সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়া থাকি ইহা সেই বিজ্ঞানই বাহা জীবন্ত দেহের Chemistry ও Physics লইয়া সম্মিলিত। জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা মতবাদই প্রচলিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে হুগারের মতবাদই প্রাধান্যলাভ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই মতবাদকে Chemical and Physical মতবাদ বলা হয়। তাহার মতবাদ এককথাঃ লিখিতে গেলে লিখিতে হয় Life — Protein — cyanogen. রাসায়নিকগণ যখন cyanogen molecule লটয়া কাজবার করিতেছেন, আর ইতিমধ্যে জৈবিক রসায়নের শিরোমণি ডাক্তার এমিল কিনার (আখ্যানি) Protein প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, তবে উক্ত মতবাদানুসারে আশা হইতেছে, যদিও এখন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, একদিন না একদিন রাসায়নিক পণ্ডিতবর্গ বিজ্ঞানাগারে (Laboratory) synthetically Protoplasm তৈয়ার করিয়া ফেলিবেন, পরে ইহা হইতে উপযুক্ত অবস্থায় বিবিধ জীবের সৃষ্টি করিতে পারেন, যেহেতু Protoplasm জীবন্ত। এইরূপ জল্পনা কল্পনা আমকাল রসায়ন মহালে চলিতে পাওয়া যায়। আমরা অসম্ভব বলিয়া পরামুগ্ধ হই, আর বাতুল—আশা বলিগা উপহাস করিয়া থাকি। কিন্তু বাহ্যিক প্রকৃত ব্যানী তাহার কখন না কখন এক সময় সিদ্ধার্থ হইয়া তাহারে আবিষ্কৃত সত্যে লগত প্রাবিত করিয়া ফেলেন, এক পরিণেবে আমরা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হই।

সেহ, আত্মা, আর মন এই ত্রিবিধের সংযোগষ্ট যে জীবনের লক্ষণ তাহা পান্ডাভ্য-দেশীয় স্থানীয়গণী গ্রহণ করিতে একেবারেই

অনিচ্ছুক। তাহার জীবনের লক্ষণকে এই কয়েকটা ক্রিয়া দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন :—যথা, ( ক ), Metabolism, অর্থাৎ জীবন্তদেহে লক্ষ্যকৃত রাসায়নিক পরিবর্তন, তাড়াগড়া উত্তাপি; ( খ ), Response to stimulus, অর্থাৎ চৈতন্যের লাড়া; ( গ ) Motion বা গতি; ( ঘ ) Growth বা বৃদ্ধি; ( ড ) Reproduction বা পুনরুৎপাদন।

এই জৈবিক বিশেষণ ও লক্ষণ কোন এক জৈবিক শক্তির উপর নির্ভর করে; অথবা এই জৈবিক শক্তি বা কর্মতৎপরতা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। এই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইবার উপকরণগুলির অন্যটন হইলেই জৈবিক শক্তির হ্রাস হয়, এবং নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষ্য আসিয়া দেখা দেয়। মাংসে এই শক্তির একমাত্র ও প্রধানতম আধার glycogen. ইহা অন্নজানের সহযোগে আহারিক অম্ল, গ্যাল, জল ও Sarcolactic অমলে পরিণত হয়; এবং পরে এই Sarcolactic অম্ল অতিরিক্ত অন্নজানের সহযোগে আহারিক অম্ল গ্যাল ও জলে পরিণত হয়, কিন্তু এই শেষের প্রক্রিয়াটা মাংসে ঘটে না। এই প্রক্রিয়ার কলেই শক্তি (energy) উৎপন্ন হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে মাংসকে শক্তিসম্পন্ন ও সতেজ রাখিতে হইলে যথা পরিমাণ glycogen ও অন্নজান থাকা একান্ত আবশ্যিক। বহু কারাগারে, অকর্মজ অন্নর মহলে অন্নজানের প্রায়ই অভাব; কাজেই কয়েদি ও অবরোধবাদিনীগণের মাংস ক্রমশঃ অকর্মজা হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে কি? glycogen carbohydrate বিশেষ। কলকুল

শর্মাণি হইতে আমরা এই লক্ষ্যণের প্রাপ্ত হইয়া থাকি; তাই ইহাদের অভাবে মাংস নিখিল হইয়া পড়ে। অতএব অস্বাভাব রূপ (ওরফে স্থিতিক) যেমন glycogen এর অভাবে এবং মাংসশৈথিল্য, অনিলাভাব রূপ তেমনই অন্নরানের অভাবে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বাধা, ফলে মাংসশৈথিল্য, দৌর্গল্য ও অস্বাস্থ্য। লম্বে লম্বে বেহের বিভিন্ন রক্তাধিত্ত ও অতিরিক্ত ভাটা আদিয়া পড়ে। ইহার পরিণাম ফল আমরা বাহ্য বেগিতে পাই তাহাই দৈহিক দৌর্গল্য; এবং এই দৌর্গল্যই "রোগ ধরা"র পথ অনেকটা লঙ্ঘন করিয়া দেয়।

মানবের কৌশল অবস্থাকে আমরা কয় অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি তাহা লবিশেষ প্রকটন ও প্রদর্শন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমরা সোজাহুজি বলিয়া থাকি মানবীয় বেহে, অস্বাভাবিক অবস্থার আবির্ভাব অল্পকৃত হইলেই রোগোৎপত্তি বা সুরল কথায় রোগ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকি। কিন্তু মানবীয় বেহে, মাৎকাটীর মাগা এমন কোন নির্দিষ্ট অবস্থা আমাদের ইন্সটিগেচরীকৃত হয় না, বাহ্যকে আমরা নিঃসন্দেহচিত্তে স্বাভাবিক বলিয়া বিবৃত করিতে পারি; কাজেই রোগের সাধারণ সংজ্ঞার যথার্থ্য নিরূপণ করা নির-তিশয় সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেই কোন একজন লোক রোগগ্রস্ত হইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বাভাবিক শক্তি সম্পন্ন অপর ব্যক্তি ঠিক তদুৎকরণ অবস্থায় পতিত হইলেও রোগাক্রান্ত নাও হইতে পারে। রোগের বিশেষ কারণ নির্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর নয়, কেননা কয় অবস্থা ফলবিশেষ। ইহার ক্ষেত্রে বিবিধ কারণাবলী নিহিত থাকিতে

পারে। অনেক বালকবালিকাশিশুকে সন্দি, কান্দি, বা হাম, ইত্যাদি ব্যাধির আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; ইহার কারণ হয়ত পূর্বাগত পুষ্টিকর পদার্থের ও যথাপ্রকার খাদ্যের অভাব, যথাযোগ্য পরিচ্ছদের অনাটন, এবং অবহেলা ও অলসশৈথিল্য শক্তির অপচয়; বোধ হয়, উপযুক্ত যত্ন প্রদর্শন ও যথাবিধি মনোনিবেশ স্থাপন করিলে তদবস্থায় তাহাদের আনন্দে ব্যাধির সংঘটিত হইতে পারিত না। বাহ্য-স্বাস্থ্য ব্যাধ্যখাদ্যের উপর নির্ভর করে, কাজেই খাদ্যখাদ্যের ফলাফল ব্যক্তিগত অবস্থার উপর নির্ভর করে, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন লোকের constitutions ভিন্ন ভিন্ন। একের পক্ষে এক ব্যাধ্য হুৎকৃত্য হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে ঠিক সেই ব্যাধ্য বিঘবৎ হইতে পারে; একজনের পক্ষে গ্রহবাযোগ্য, অপরের পক্ষে পরিত্যজ্য। ব্যতিক্রম, ব্যাধ্যব্যাধ্য কখনই সমাজ-গত বা জাতিগত হইতেই পারে না। ডোজেন লম্বে "আপ কচি বানা", "বা লম পেটে তাই বাও চেটে" অপেক্ষা হুমকি ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে?

আমরা রোগের কারণাবলীকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত বা বিভক্ত করিতে পারি; যথা,—মুখ্য ও গৌণ। বেটনা, বংশাচক্রম, দুর্ভিক্ষ, বহন, ও ব্যবসা গৌণ কারণ বলিয়া আমরা ধরিয়া থাকি। অবস্থার ভিতর রোগ-বীজের প্রবেশ ও উদ্ভাট বিঘ-ক্রিয়াই প্রথমোক্ত শ্রেণীর কারণ। সর্বত্র সর্বদা এই শ্রেণীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না; প্রাধান্য বৈধক্রমে আদিয়া উপস্থিত হয়, এতদ্বারা আমরা এই মুখ্য শ্রেণীকে বৈধাগত বলিয়াও নামকরণ করিয়া থাকি; ইহার অন্নবালী পথে দানিকারক, ইত্যাদি পথ পথে বৈধাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হুৎকৃত্য

প্রভৃতি যন্ত্রনুযায়কে প্রত্যক্ষভাবে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলে।

বেটনো রোগের অন্ততম কারণ ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ইহা সভ্য কি না তাহা একবার ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক। খুব সম্ভবতঃ আমাদের দেশের জেলখানার অধ্যক্ষগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে সেন্ট-নেভে অঙ্ককারময় প্রকোষ্ঠে কয়েদিগণকে কিয়দিন বা বহুদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের জৈবনিক শক্তির হ্রাস হইতে থাকে; জেলখানায় গমন ও তথা হইতে বহির্গমন এতদ্রুত অবস্থাপ্রাপ্ত কয়েদীর শারীরিক শক্তির হ্রাস করিলে স্বর্ণ ও পাতাল বলিয়া বোধ হয়।

বেটনীর অবস্থাতেই শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়; কিন্তু শক্তির হ্রাস হইলেই যে রোগ আদিয়া উপস্থিত হয় এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় কি? তবে এটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে এক্ষণ অবস্থায় রোগ আক্রমণের সম্ভাব্য পথ অধিকতর সহজ হইয়া যায়।

আমাদের দেখে এমন কতক প্রতিনিধি বর্তমান রহিয়াছে যাহারা রোগ-বীজের আক্রমণে বাধা প্রদান করিয়ায় ক্ষত অনতি-বিলম্বে অগ্রসর হয়, ইহা বিবহিষিত ও বিশ্ব-বিস্তৃত। কণিষ্ঠের কার্যকণিকা (corpuscles) ও অণুজীবের মধ্যে তরল পদার্থ বিশেষই এই প্রতিনিধিষের সুখপাত্র। ইহারা মানবের পরম উপকারক, তক্ষকের প্রতিবন্ধক, রক্ষক; কাঁচের বস্তু; এবং অতিভাবক। ইহাদের কার্য বহিষ্কার আক্রমণে বাধা প্রদান করা, এবং ইহারা সংখ্যাগে বেণী ও শক্তিতে স্তম্ভী হইলে সমাগত শক্তকে বহিষ্করণ বা নিধন করা। এই সত্যের উপর আমাদের হইয়া আমরা বলিতে পারি “রোগধরা” ব্যাপারটী বাধা প্রদান

কারী জীবাণুর সামর্থ্যের অভাবে সংঘটিত হয়। হৃৎ শরীরে এই সকল কার্যকণিকা বা কোষ বা তরল পদার্থ অতীব কণ্ঠ থাকে; এবং ইহাদের কণ্ঠতা সাধারণতঃ অতিরিক্ত আহার, কিংবা অতিরিক্ত পান, কিংবা নিদ্রাভাব, পুষ্টিগত পদার্থের স্বল্পতা, অতিরিক্ত ব্যায়াম, ইত্যাদি নানাপ্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা ও বাবস্থায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে; সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ রোগের নিকট অপেক্ষাকৃত অধিকতর susceptible হইয়া পড়ে।

উপযুক্ত প্রতিজ্ঞাটী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে, বোধ হয়, বক্তব্য বিশদীভূত আরও প্রাক্লপ ও পরিষ্কৃত হইতে পারে। অস্বাভাব রোগের একটা প্রধানতম কারণ। অন্নপূর্ণার রূপাভিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াই হটক, বা রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, বাহ্যতত্ত্ব, Engineering, ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার দরুন অভিশপ্ত হইয়াই হটক, বা Human Psychologyর জটীলতা নিবন্ধনই হটক আমাদের বেশ অস্বাভাব্যমণিত বৈজ্ঞানিকগণ শুদ্ধগ্রাণ হইয়াছে। পরিজ্ঞানের উপায় অবশ্যই চিন্তনীয়। এই অস্বাভাবকে আপামর জনসাধারণ সহজ কথায় দৃষ্টিক্ত বলিয়া থাকেন। অন্তএব আমাদের প্রতিজ্ঞার সাধারণতন্ত্র এই হইয়া গাড়াইল—ইহাই সঙ্গ্রাম করিতে হইবে যে দৃষ্টিক্ত রোগ ও মৃত্যুর কারণ।

আমরা যখন তখন ঠাকুর দাদার হুঁলি বলিয়া থাকি “ওক্কে বেহ শক্ত।” বাস্তবিক, কখনো ঠাকুরদাদার সময়ের বলিয়া যে উড়া-ইহা দিতে হইবে তাহার কোন দৃষ্টিক্তগত কারণ দেখি না। কখনো আদ্যকাল কেন,—সবকালই সভ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এই রকমে বিবিধ কার্যকরিতা বিস্তারিত রহিত আছে ; ইহাদের একটি লাল, অপরটি বেত । প্রথমোক্তটি অত্যধিক পরিমাণে রক্তে বর্তমান, আর শেষোক্তটি সমগ্রপক্ষে অত্যন্ত ; প্রায় প্রত্যেক অর্ধশতাব্দী লাল কার্যকরিতার মধ্যে একটি বেত কার্যকরিতা দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা, বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় স্বাস্থ্য, এই বেত কার্যকরিতার বাহ্যিক ও প্রাথমিক উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে । এই বেত কার্যকরিতা সংখ্যার কমবেশী হইলেই আমাদের দৈনন্দিক শক্তি ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । বিভিন্ন বিধান কলে এই বেত কার্যকরিতাই আমাদের ভারী রোগনির্ণায়ক । পক্ষান্তরে, এই বেত কার্যকরিতার সংখ্যা প্রাচুর্য ও সামর্থ্য পুষ্টিকর খাদ্যোপাদানের উপর নির্ভর করে । শরীরে যে কোন বাহিরের জিনিষ বধনই আসিয়া উপস্থিত হয় এই বেত কার্যকরিতার দল অমনিয়ে পালে পালে ইহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে এবং বিধ্বস্ত করিতে কৃতপ্রয়াস হয় । এই সকল বাহিরের পদার্থ রোগবীজ, ক্ষতদোষক, বা তরুণ হইতে পারে । এই সকল পদার্থ বেহে আসিয়াযাত্র ছোট ছোট কার্যকরিতা দেখানে দিয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ফেলে, এবং লোমহরণ হুচ্ছ আরম্ভ হয় । বধন ইহারা হুচ্ছ হার মানিতেছে তখন আমরা অস্থির বোধ করি, বা ক্রম অবস্থার পতিত হই ; পরন্তু ইহারা হুচ্ছ জল-লাভ করিলে আমরা স্থির অস্তিত্ব করি । ইহাদের পরাভব ও বিষয় “রোগ ধরা” ও “রোগ না ধরা” ফলাফল পরিজ্ঞাপন করিয়া দেয় ।

বধাপরিমাণে বধাপ্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিলে রক্তে বেত কার্যকরিতার সংখ্যার বৃদ্ধি

ও সমৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে না । পরন্তু, ইহাদের অভাবে কার্যকরিতা কমলগ্ধাক ও হীনশক্তি হইতে থাকে । এতৎসঙ্গে অস্বাস্থ্য বা ব্যতিক্রমিত জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে রোগোৎপাদনকারী বপুঃ প্রবেশনার অপেক্ষাকৃত সহজগম্য হইয়া যায় ; ফলে বপুঃ দেহের কোণাকোণায় বসতি-বিস্তার করিয়া নিজেদের অদম্য প্রকোপ প্রদীপিত করিয়া ফেলে । অস্ত্রিমে রোগ, মৃত্যু আসিয়া বেহাকাল হইতে প্রাপ্যথায় অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায় । এক্ষণে ইহাই উপপাদ্য ।

বংশোক্তকম পৌণ কার্যের খিতীয়তর । অবশ্য প্রাথমিক ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় ; আবার কোন কোন স্থলে ইহার সাক্ষাৎ ফল অস্বস্তি হয় । পিতা কিম্বা মাতা, বা উভয়েই ওনারোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করিবার পর প্রসূত সন্তানসম্মুখিতক এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না । আঙ্গিক জর ও Tuberculosis সম্বন্ধেও অনেকটা তেমনিই । তবে দেখা গিয়াছে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন চারি পুরুষ এই সকল ব্যাধিতে ভুগিয়া চলিয়া আসিতেছে । সর্বাপেক্ষা একটা ব্যারামের বংশোক্তকমীর ফল জলজভাবে দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে ; সেটি গণোরিয়া বা গনি বা উপদংশন বা । ওংগো টেই বিশ্ববিদ্যালয়ে Pathogenic bacteria অধ্যয়নকালীন একদা অধ্যাপক ডাক্তার বোরের প্রমুখ্যে আমরা শুনিলাম “এই কলম্বের (ওংগোর সামধানী) অধ্যয়নালয়ে বর্তমান ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের প্রত্যেক বংশজনের মধ্যে নহননের অঙ্ক হইবার একমাত্র কারণ তাহাদের পিতা বা মাতা উভয়ের গণোরিয়া ।” ইহা বপুঃ-তাত্ত্বিকবর্ণের পরীক্ষিত সত্য । বোধ হয়



অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পগো-  
রিয়ার রোগী "ডোথ উঠা" ব্যাধায়ে ভুগিয়া  
থাকে। Syphilis নামে আর এক প্রকার  
দুরারোগ্য Venereal ব্যারামও এক পুরুষ  
হইতে অল্প পুরুষে চলিত হইয়া থাকে।

যদি অভিব্যক্তির মতবাদ (theory of  
evolution) সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়  
তবে এই অভিব্যক্তির অন্ততম কারণ যে  
বংশাধিক্রম (inheritance) তাহা উপেক্ষা  
করিতে পারা যায় না। পিতামাতার সন্-  
তান বা ইহার বিকাশ, অথবা অসন্তান বা  
ইহার প্রভাব সম্বন্ধে সন্তানসৃষ্টির উপর কাঙ্ক্ষার  
হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং আরও  
দেখা যায় যে একের সন্তান অস্ত্রের অসন্তান  
কাটিয়া ফেলে। বোধ হয়, এই মন্তাই কাছা-  
কাছি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধনের মধ্যে বিবাহ  
নিষিদ্ধ।

রোগের দৌল কারণাবলীর মধ্যে বয়স  
ও Sex কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে।  
এমন কতকগুলি রোগ রহিয়াছে যাহারা  
কেবল শৈশবকালেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।  
হাম, লালজরের তুচ্ছভোগী অধিকাংশ যুবক  
ও প্রাণী, বোধ হয়, অতীতকালের দুঃখের  
সময়ের কথা ভুলিয়া যান নাই। শিশু বয়স  
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকারে দেহ রক্ষণো-  
পযোগী শক্তি আহরণ করিতে থাকে, এবং  
দশ বৎসর বয়সের সময় এই সকল শিশু-রোগ  
হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কোন কোন হৃদয়  
ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে পক্ষ  
বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদিগকে যদি হামের  
আক্রমণ হইতে দূরে রাখা যায়, তবে বোপ-  
টিকে বজ্রত: একেবারেই তিরোহিত করিতে  
পারা যায়, কেন না এই বৎসরের পর শিশুগণ  
অপেক্ষাকৃত কম susceptible; এবং

রোগের কোরও অনেকটা দূর। আমরা  
যদি বৈদ্য সূত্রজ্ঞ ও সতর্পণ অবলম্বন করিয়া  
কোমলশক্তি শিশুগণের উপর অজ্ঞত: ভূমিষ্ট  
হওয়ার পর কয়েক বৎসর বিশেষ যত্ন  
রাখি, তবে এই সকল রোগকে উচ্ছেদ  
করিতে সক্ষম হইতে পারি। "ডেলেপিলে-  
দের রোগ অবশ্যজ্ঞাযী" একজন ধারণা লইয়া  
তাহাদিগকে রোগের সম্মুখীন করা অপেক্ষা  
আর কি ভাল হইতে পারে? অধিকন্তু,  
আমরা আরও ভাবিয়া দেখি না যে এই সকল  
রোগে দ্বৈত শিশুসত্তা ঘটিতে পারে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক শিশুসত্তার  
কারণ আছে। তন্মধ্যে দৃষ্টিত দুই ও মলপান,  
সন্তানশালনে মাঘের অনিচ্ছিতাই প্রধান।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে লোকে  
একবার ওলাক্রান্ত হইলে পরে আবার ওলায়  
আক্রান্ত হয় না, কেন না পূর্বাঙ্কিত সামার্থ্য  
বিচক্ষমান থাকে। ইহা সত্য হইলেও হইতে  
পারে; প্রকৃতপক্ষে তাহাই দেখা যায়।  
শিশুরাও যদি একবার হাম বা লালজরে  
আক্রান্ত হয় তবে পরে তাহারা আর ঐসকল  
রোগে আক্রান্ত হইবে না। কারণ ঐ একই।  
কিন্তু কথা উঠিতে পারে যে যদি "অবশ্যের  
মতন ভায়তবর্ষে বোরবৎসরের নিয়ন্ত্রণ  
হয়" তবে অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটতে  
পারে তাহা বিচার্য চিন্তা করিয়া পূর্বে দেখা কি  
উচিত নয়?

বার্দ্ধক্যকালে ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক যন্ত্রের  
ক্রমাবনতির মন্তাই রোগোৎপত্তি ঘটে, কেন না  
তৎকালে ইহারা স্বাভাবিক জিহা সম্পন্ন  
করিতে প্রারম্ভ পাবে না। বৃদ্ধকালে দ্বন্দ্বিত,  
রক্তসঞ্চালন, বহু ইত্যাদি রোগের স্কার  
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মন্তাই ক্রীড়নের  
দ্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত লোকগণের মধ্যে

বাত, মূত্রাশয়, ইত্যাদি অনেক প্রকার রোগের প্রকট আদির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যবন্ধার সাধারণ নিয়মাবলী উভয় Sex-এ প্রযোজ্য। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীরাতি অপেক্ষা পুরুষরাতি গড়ে কয়েক-মাস কম বাঁচে। কোন কোন ভোগ, যথা আত্মিক অর, ওলা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষবিগতে বেশী আক্রমণ করে, যেখানে পুরুষ ৩ জন দেখানো স্ত্রী ২ জন আক্রান্ত হয়। আবার cancer নামে রোগবিশেষ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোককে বেশী ভাগে আক্রমণ করে, যেখানে পুরুষ ২ জন দেখানো স্ত্রী ৩ জন আক্রান্ত হয়।

ব্যবস্থা নৌণ কারণের শেণ ও অপব-ত্তর। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসাতে নিযুক্ত কৃষ্টি-গণের ব্যারাম ভিন্ন ভিন্ন। মূলিকণা, বাহুতে ভাসমান অস্ত্রান্ত বেগুনমূত্র, অঙ্ককার, আর্দ্র ও সর্কর্পহান, পাবক ও আতপ-তাপ ঠাণ্ডা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্রান্তি, কেরাণ্ডা লাগাদিন আসীন কেরাণীর জড়ম্ব, স্বাভাবিক বাগবিক চাপ, রোগবীজ, বিব—যথা, নীসক, পারদ, আর্সেনিক ইত্যাদি দাভু, ও মাদকদ্রব্য এই সকল বিষয় মানবের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাইয়া দেয়। যাহারা খনির নিচে ওঃ বায়ুমণ্ডলের চাপে কাজ করে, এবং তাহার্য যদি হঠাৎ কার্য পরিত্যাগ করিয়া অগেৎকৃত্ত অন্ন চাপে আসিয়া পড়ে তবে তাহাদিগকে cassain রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যাহারা পেন্সিল কারবানার কাজ করে তাহাদিগকে নীসক বিবে ভুগিতে দেখা যায়। মাদকদ্রব্যে আনক্তি হইলে স্বাভাবিক বাগার্থ লুপা কমিয়া যায়, কলে রোগ আসিয়া দেখা দেয়। অবজ, বহুকালের হারানিধি স্বাস্থ্যকে পাইতে

হটলে উক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ কটাক্ষ-পাত রাখিতে চইবে। নীসক, পারদ, আর্সে-নিক ইত্যাদি দাভু আমাদের নিকট বড়ই মূল্য-বান, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কার্য সমাধা করিতে হইবে।

ভূদিক প্রসীড়িত সেনে বা অকলে সর্কর্পিধ রোগের উৎকট প্রাজুর্ভাব পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। ভূদিক হইতে দাবতীয় রোগের প্রকোপ বিস্তৃত হইতে পারে ইহা আমরা জানিয়া শুনিয়াও মুখে বা কাগজে প্রকাশ করিতে ভুলিয়া যাই।

যাদ্যের প্রচুর সরবরাহ থাকিলেই যে দৈহিক শক্তির হ্রাস হয় না এবং রোগ আসিয়া দেখা দেয় না, এমন কোন হেতুপস্থূত উক্তি অজ্ঞ বা বোঝার মত সমর্থন করিয়া লইতে আমরা কোন মতেই রাজী নহি। আমরা আজকাল বলিতে শিখিয়াছি যখন ভূদিকের প্রকোপ কমিয়া আসিবে তখন আমরা স্বাষ্টোষার্থ করিয়া পাইয়া স্বর্গস্থ অশুভব করিব, তখন আত্মাণের আর সীমা থাকিবে না, ফাখিনীশক্তি শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে বিদ্যুৎবেগে বহির্গত হইয়া বেইনীকে সর্কর্পিত ও শক্তিহীণ করিয়া তুলিবে। আমাদের করনার দৌড় এই পর্য্যন্ত নয় কি? আজ্ঞা, আজ হইতে যদি সেনে ধারাসরবরাহ ভরপুর থাকে তবে কি আমরা বাস্তবিকই রোগমুক্ত হইব? আমরা কি আমাদের অসীমিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব? আমরা কি আমাদের অভিপ্রায় মত সাফল্য পাইয়া চিরকালই নীরোগ হইয়া থাকিতে পারিব? স্বীকার্য, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্য না লইয়াই কি কেহ জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ ও সমাধান করিয়া দিতে পারেন?

একবে কয়েকটা জাঙ্কলা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিশ্বদীকে অপেক্ষাকৃত বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিব। একলা জনৈক বায়োটক্সবিদ কণ্ঠচ্যারী মকঃবলের বাহা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দিব্যাবসানের পর ঘরে ঘরে প্রবাহিত সান্ধ্য সমীরণে পা ভাসাইয়া সমাপ-বস্ত্রী বেসনের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি পরবস্ত্রী টেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটা বচাবচপল মণা আদিয়া তাঁহার বসনমণ্ডলে হল ঝাঁঝিয়া চলিয়া গেল। তিনি বাসায় কিরিয়া আসিতে না আসিতে ভালুকজরের মত ঈপ্সিতে ঈপ্সিতে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। এই অরুকে আমরা ম্যালেরিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। তিনি ডাক্তার, বায়োটক্সবিদ, ধনী, হুখাত্তোজী, বলবান, সাহসী, অথচ তাঁহার অবস্থাকে কয়েকটা মণার কানড়ের ধাপ সম্ব হইতে পারিল না। এবার আমি আমার চাক্ষু দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিব। ওহায়েটে টেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বপুত্ববিভাগে নিম্নোক্ত জ্যানুশেন নামে জনৈক Instructor ছিলেন; তিনি বলিষ্ঠ, হৃৎকায়, হুঠাম, হুদীর্ঘ ও মধ্যবিত্ত ছিলেন। তিনি একলা স্রমবশতঃ বিজ্ঞানাগারে glanders কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইহার ফলে তাঁগকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইহলোক পরিভ্রম্য করিয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার রোগ ও মৃত্যুর কারণ কি দ্রুতিক বলিব? কয়েক বৎসরের কথা, কোন্ বৎসর ঠিক আমার মনে নাই, কালিকর্ণিয়ার অন্তর্গত সান্স্ক্যান্সিছোতে কয়েকটা মেসের রোগী দেখিতে পাওয়া যায়; টেই ইহার উল্লেখ ল্যখনের নিবিত্ত ২১১ দিনের মধ্যেই কত পত কোটা ইছুর মারিয়া কেলি-দেন; কেন না ইহাদিগকে খুবানিক মেস

বচন করিতে দেখা গিয়াছে। রোগীরা যে হুতীক্স পাগারার মধ্যে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার ফলে পরে আর একটাও মেসের রোগী দেখা যায় নাই। রোগ-বীণের প্রতি সতর্কতাই কি এই অমৃতময় ফলের কারণ নয়? আমেরিকার যুক্তরাজ্যকে যুক্ত রাষ্ট্রবার ভ্রম এধেণের লোকেরা কি না করে? বিশেষগত imigrantদিগকে পুখাছপুখ-ভ্রমে পরীক্ষা করিয়া যেবিবার কারণ, বোধ হয়, আমেরিকাগ্রবাসী ভারতবাসী বেশ ভাল করিয়াই জানেন। এদেশ হইতে আমরা ছুরি ছুরি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে দ্রুতিক একমাত্র রোগের কারণ নয়। আমি আমার দেশের লব্ধে প্রায়ই অনভিজ্ঞ। তবে মাত্র একটা দৃষ্টান্ত, বাহা আমি বিশ্বস্ত-মুখে অবগত আছি, উল্লেখ করিব। মাল-মহের অন্তর্গত শিবগণ্ডে একটা রেশম-ফ্যাক্টরী আছে। ইহার ম্যানেজার ঐশ্বক্য হরগোবিন্দ চৌধুরী। অনেকেই জানেন ইনি দীর্ঘকায়, উন্নতগ্রীব, প্রনতবক্ষ, বলিষ্ঠ, হুখাত্তোজী, নিয়ামিষাহারী, শিকিত। কিন্তু, হায়। একপ লোককেও ম্যালেরিয়ার ভূগিতে দেখা যায়। ইহার মূল্যভূত কারণ কি খাডাত্যাব বলিব? তাঁহাদের অবস্থা খুব খজল না হইলেও, বোধ হয়, তাঁহাদের পেটে দু'বেলা ভাত জুটে। গত বৎসর তাঁহাকে প্রায় ৪১০ মাস আসন্ন রোগে ভুগিতে হইয়াছিল; কলে ফ্যাক্টরীর কাম বহু, অল্প টাকা ব্যয়, সেবে অর্থাভাব। স্বাস্থ্যের লক্ষ্য-নই কি এক্ষেত্রে দ্রুতিকের কারণ নয়? এধেণের সত্যাত্মবোধী ব্যক্তিবর্গ সাধারণ লোক-গণের রোগ ও ফ্যাক্টরীর লোকসানের কারণ অহুগতান করিতে গিয়া অনেক সময় স্বাস্থ্যের প্রতি অননোযোগ ও অবহেলাই উল্লেখ

করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের সমস্ত ক্যাস্ট্রীর ল্যাবল্যে, বাহ্যাবস্থা পর্যায় পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, ও পরে report প্রকাশ করিতে সম্পাদক মহোদয়গণ কি একবারও কৃতসঙ্কল্প হইবেন না? মুখে বা theoryর উপর নির্ভর করিয়া থাকি কি উহাদের লেখনীর বাবদ্য? এসব দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই কি ধনবিজ্ঞানের গভী রুচি করিতে পারি? ধনবিজ্ঞান যে বাহ্যবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভুলিয়া যাওয়া কি ভাল? বাস্তবিক, বাহ্যবিজ্ঞানকে বাদ দিয়া লোকে কখনই ধনী বা সুখী হইতে পারে না, পারেও নাই। বন্ধীর সমান ধনবিজ্ঞানের গোহাই দিয়া প্রকৃতিবস্তুর কয়েকটি দীর্ঘবিশেষকে আলোকাল নিজেদের স্বার্থে লাগাইয়া তথাকথিত ধনবিজ্ঞানের আসল রুচি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার পরিণত রুচি করেন কি হ্রাস করেন একবার হিসাব করিয়া দেখিয়া থাকেন কি? মঙ্গলারিত ওরূপাক ছাপল বা মুরগী ভক্ষণের পরিবর্তন নিজেদের শরীর ওজন করিয়া দেখিয়াছেন যে ফলটি ধনরাশির দিকে না ভগ্নরাশিরদিকে? মেম্বারের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কেন না ইহার অবস্থা সঠিক পরীক্ষা করিতে হইলে Presidency কলেজের Psychological apparatus এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মতপারী, পঞ্জিকাভেদবিপণের বাহ্যভাব ও পরে দারিত্র্য, ইহা কি কাহাকেও স্মৃতি করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? কঙ্কণলোলুপ তথাকথিত মিডাচারী লোকদের মধ্যে কাহারও কাহারও অর্শের ব্যারাম, কাহারও কাহারও পেটরুচি ব্যাধি বা সহস্র কথায় “জু’ড়ি-বাড়া”, কাহারও কাহারও দস্তরোগ কাহারও কাহারও “কৃত্রিম বশনগ্রহণেচ্ছা”, কাহারও

কাহারও রসনাভ্রকের উপদ্রুপরি পুঙ্খ বা বনজপ্রাপ্ত ইত্যাদি ব্যাধি কি প্রায় এখানে দেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না? আর ব্যাধি দেখা দিতে না দিতে

“রাষ্ট্রমে নিধি দাক্ষিণ্যদেই, ভাস্করবাবু নাম  
কো কাইসা ছায় ব্যারাম  
গুরে পায়া দৌড়কে অথো এই গেরাম।”

ইত্যাদি হাতুড়িয়া কবিরাজ বা ভাস্করদের হাঁকডাকে কি আলকাল অস্থির হইতে হয় না? আঘাত সব সময় প্রতিফল ফল দেখিতে পাই কেন? আঘাত ভাবি এক, করিয়া বলি আর এক; করিতে বাই এক, হইয়া যায় আর এক। কঃ পথ্যঃ, কিম্ ফলম্ একবারও কি অহুত্বিত কর্ত্তের প্রারম্ভে আদিয়া আমাদেরকে উদ্ধৃত করিয়া দিবে না? হায়! ক’বে আমাদের অজ্ঞান-পাপের প্রাণচিহ্ন হইবে?

হুতিক যে আমাদের রোগের অন্ততম নৌণ কারণ তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। হুতিক হওয়ার কারণগুলি বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রচুর ভুলিপাত, বিষম বস্তু, অনাবৃত্তি ও ক্রান্তির, বাহ্যতঃ Engineeringতে শিক্ষা-ভাববস্তুঃই আমাদের দেশ হুতিকে নিষ্পেষিত হইতেছে তাহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। অবশ্য অবশ্যেই ধনবিজ্ঞানের পণ্ডিত Malthusian theoryও কার্যকরী রহিয়াছে; ইহাকে বাদ দিলে বা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? এক কথার বলিলে বলিতে হয় শিক্ষা-ভাব। বস্তুতঃ পর্য্যাপ্ত না শিক্ষালোক আদিয়া রোগজনিত বশে প্রকৃতি হয় ততদিন দেশের উন্নতিবিধানের আশা বা চেষ্টা বৃথা।

এইবার আমরা রোগের মুখ্য কারণ

সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। জীবাণুদের কোন জীবাণু-বিশেষের প্রবেশ হইলেই যদি কোন রোগণীড়ার লক্ষণ সৃষ্টিত হয়, তবে আমরা এক্ষেত্রে রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। অনেক ভিতরে প্রবিষ্ট জীবাণুর উৎপাতে যে রোগের সঞ্চার হইবে এমন কোন স্পষ্ট সূক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এই সকল জীবাণু যদি বেহের বিশুদ্ধ প্রতিনিধি-বিশেষের সম্মুখীন না হয়, তবে পরিণামে ইহাদের সম্ভাবনসম্পত্তি ও বিনীক (virus) আশ্রয়মস্তক ছাড়াই ফলে। ফলে রোগ ও মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়। যে সকল জীবাণু প্রকৃতপক্ষে রোগের সঞ্চার দ্বারা তাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি, যথা—পরভোজী ও বপু। বড় ক্রিমি (tapeworm), ব্যাণ্টেরিয়া, হেকীপোকা (Hookworm), ইত্যাদি রোগ পরভোজী জীবাণুসমূহের সংঘটিত হয়। যে সকল জীবাণু পরের উপর কলার ফলাইয়া বাঁচিয়া বা টিকিয়া থাকে তাহাদিগকে পরভোজী বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আরিক জ্বর, ওলা-সিপ্টিসেরিয়া, Erysipelas, ইত্যাদি বপু আসিয়া পড়ে। অবশ্য অবস্থাবিশেষে ইহাদিগকেও পরভোজী হইতে দেখা যায়। এক কথায় রোগোৎপাদনকারী জীবাণুসমূহই পরভোজী।

ব্যাণ্টেরিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া অসংগতিভাবে সম্ভাবনসম্পত্তি প্রদান করিতে থাকে, এবং বেচেতু ইহারা পরলেহী অর্থাৎ পরের লেচন করাই স্বভাব থাকায় আমরা অবিলম্বে অনিবার্য অজের কাম্পনের বেষে পতিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকি। কি দারিদ্র্য-নিপীড়িত দুঃখী কি স্ববর্ণবর্ণিত সিংহাসনাঙ্ক

নরসিংহ সকলেই অবস্থান্তরে ইহাদের কড়ক কখন না কখন আক্রান্ত হন।

হেকীপোকায় বেলা মানবীয় দেহে তীব্র প্রসূত হয়, এবং আর্য্য রক্তাধার এমনন্তর অবস্থার অনীত হয় যে বেহের তেজস্বারিণী শক্তি কমিষা যায়, এবং ইহার ফলে anaemia উপ ও উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্থলে পোকা পাকরলী হইতে অটল করিতে করিতে বেহের বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেখান হইতে চুরিয়া উৎসাহনে ফোটকের সৃষ্টি করিয়া ফেলে।

আমাদের দেহে বড় ক্রিমির সংখ্যা অল্প থাকিলে তত বেশী অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বেশী হইলেই, পেটের অস্থখ, ক্ষুধামান্দ্য, এবং বহুক্ষম উপলব্ধ হইতে পারে। বড় ক্রিমি সাধারণতঃ সোজাটি ও মস্তের মধ্যে দেখা যায়। মস্তে বহন এই পোকা প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন ইহাদিগকে লম্বায় প্রায় পঁচিশ ফিট দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমরা অসিদ্ধ বা অর্ধশিষ্ট মস্ত ভক্ষণ করি তবে আমাদের অবস্থার ভিতরে এ রোগ প্রবেশ করিবার খুব সম্ভাবনা আছে। মস্ত বহুক্ষণ ধরিয়া হৃদয় করিলে এই পোকা আর জীবিত থাকিতে পারে না। তখন মস্ত ভোজনে কোনরূপ রোগের ভয় করিবার কারণ নাই।

রোগোৎপাদনকারী বপুস্বর লীলা বড়ই আশ্চর্য্য ধরণের। অল্পকাল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই রাতারাতি সহরের পর সহর উভাড় করিয়া দিতে পারে। হায়! এক অঘোরাভয়ের মধ্যেই মহামারী ব্যাধিতে সহস্রাধিক লোক নগরের কি না সর্বনাশই হইল! আমরা মানবের আততায়ী প্রাণ সংহারক অনেক রোগ-বীজের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াছি। আমরা না দেখিয়া না শুনিয়া বা তা একটা কিছু

বলিয়া বাই নাই। যদি কেহ রোগোৎপাদন-কারী বপুগুণমূহ নিষেধের গোণে দেখিতে চান তবে আমরা ইহানিগ্গকেও ইহাদের অপ্রতিদত্ত কলাকল প্রদর্শন করিয়া দিতে সব সমর্থই প্রস্তুত আছি। দুষ্টান্তস্বত্বপ, আমরা নাছির বেহ পত্রিকা করিয়া বলিয়া দিতে পারি যে ইহার গারে কোন রোগের বীজ সংলগ্ন আছে, কি না; থাকিলেই বা কোনটা কোন কোন প্রকারের; সংখ্যার বা কত।

আমাদের ঘেণে আশ্চর্য্য নানামুখে নানা কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। অশ্রুতিবৎসর বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তিগণ নিষেধের শৈশবকালের স্বাভাবিক হুঁইবর্ধার সঙ্গে ইহানীন্তন কালের দ্রোহা যন্ত্রবন্ত্রি পিত্ত বা যুবকগণের ত্রিধমাপ কাকিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া আচারে বিহারে, শরণে স্বপনে, স্বাত্ম্য বক্তৃতায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, “তে হি নো দিবঙ্গাগতাঃ”। আর বিতীর্ণ দল, —ঠাংরা অস্বদেশীয় কলেবের ছাত্রসম্ম, “গতন্ত শোচনা নাতি” অর্ধশুটবের বলিতে বলিতে লক্ষ্যরবণে একটুক বাত্যাগ কোনরূপে দিলিয়া বালায় ফিরিয়া আনিয়া পরম বন্ধু পুত্রকের সঙ্গলাভে ব্যাকুল হইয়া পড়েন; স্বাস্থ্যবদ্ধ এ অবস্থায় কদিন টিকিতে পারে? স্বাস্থ্য প্রস্থান ককক, আর থাকুক সেবিকে দৃষ্টিপাত করিলেও কে তত সাবধান হয়? কেন না, সব ছাত্রেরই ঐ একই অবস্থা। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীই কি এবিধ পরিতাপের বিষয় নয়? ইহাদের ছাড়া আর এক সম্ভাব্য আছে; ইহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার শিক্ষিত, বিধানে বিধিত, বিজ্ঞানে জ্ঞানদূর, চক্ষুরিঙ্গিযে জ্যোতিমান, মনোবিজ্ঞানে মূনিপুত্রব, আর হিতোপদেশে ধৃতরাষ্ট্রইব। ইহারা এখনই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য

সম্বন্ধে বিজ্ঞানিত হন তখনই ঠাংরা প্রতীচ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলেন যে এখন প্রতীচ্যে এ রহিয়াছে, ও রহিয়াছে, সে রহিয়াছে, তেন রহিয়াছে, তেন রহিয়াছে, “তদা নান্যপে বিজয়ায় সত্তর!”

শেষকালে উপলক্ষ্যের কথেকটীকথা বলিয়া আলোচ্য বিষয়টী সমাপ্ত করিব। ভারতবর্ষ বাতীত আর কোথাও মানবজীবন এত সস্তা আছে বলিয়া মনে হয় না; সেই জন্যই বুকি প্রতাহ সংগ্রহল লোক অকালে,—আমাদের অজ্ঞান ও অস্বস্ত, তাকিলো কালগ্রাসে নিশ্চিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রত্যেক সভ্যদেশে এতাদৃশ মৃত্যুর মস্তিক তালিকা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা কত পত যন্ত্র লওয়া হয়। শুধু যে মৃত্যুর কারণ ব্যতিরিক্ত করিবার ক্ষমতা একত্র করা হয় তাহা নহে, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মৃত্যুর হ্রাস ও বন্ধ করিবার উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, কেন না প্রত্যেক কুলী মৃত্যুর মৃত্যুর অর্থ প্রতীক-বিস্তার লোকসান বা ক্ষতি। বপুগুণাত হোগাবলীর তিরোধান এবং যতদূর সম্ভবপর স্বাভাবিক জীবনের সীমা প্রসারণ ও সমৃদ্ধি করা স্বাস্থ্যবেষণের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা এখনই মৃত্যুকে বাধ্যপ্রস্থান করিতে পারি না; কিন্তু এখনই আমরা দেখিতে পাইব যে মৃত্যু কেবলমাত্র বার্কিক্য অবস্থাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকদের মধ্যে ঘটতেছে তখনই বলিব যে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। গলিত-নখর চলচ্ছত্রবিত্ত জীর্ণ কলেবরের পরিণাম কল মৃত্যু ঘেঁপে স্বাস্থ্য-গম্য স্ব-সন্তোষ পূর্ণস্বাস্থ্য বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিব।

রোগের ভীষণ তাড়না হইতে নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া

পড়িয়াছে। মানুষের বাহ্যাবস্থা, আরাম ব্যায়াম সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করা বা সাধারণভাবে প্রত্যেক গৃহস্থকে উৎসাহ প্রদান করা ও তত্ত্বশূন্য উপায় উদ্ভাবন ও কণ্ঠে প্রয়োগ করা বেশবহু জননাযকগণের উন্নয়ন কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইলে স্বেচ্ছায় ভারতের বিত্তকল্যাণ দেখে প্রাণরসের স্ফূর্তি হইবে বলিষ্ঠা আমরা আশা করিতে পারি। দিনের পর দিন, এইরূপ তিনশত পঁয়ষট্টি দিন গত হইলে বহন সারা বৎসরের হিসাব করিয়া দেখিতে যাই তখন দেখিতে পাই অসহায় ও মহা-

মারীতে বছর বছর ৬২০০০,০০০ খাটী ভারত-বাসী জীবনলীলা সম্বরণ করে। সেইজন্য আশা করি, ধন্যসোমুখ ভারতবাসীদিগকে রক্ষা করিতে, প্রাচ্য ও প্রান্তীচ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বর্তমানের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গঠনে যেন কালবিলম্ব না হয়। পঞ্চাশ পড় না হইলে ইষ্টক প্রস্তুত করিতে পারা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া পরামুখ তত্ত্ব কি ভাল? যেন তাহাতে হইবে রোষ একদিনে গঠিত হয় নাই।

শ্রী—।

## নিগ্রোজাতির কর্মবীর \*

চতুর্দশ অধ্যায়

আটলান্টা-সম্মিলনে অভিভাষণ

অর্জুনা-প্রবেশের রাষ্ট্র-শাসক বৃন্দ একটি কৃত্রিম বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনী খুলিলেন। পরে ধর্মগুরু বেল্লেন ত্তোজ পাঠ করিলেন এবং একটি 'প্রদর্শনী-মঞ্চ' কবিতাও পাঠিত হইল।

এই সকল আনুষ্ঠানিক কার্য শেষ হইবার পর সম্মিলনের কার্য আরম্ভ হইল। প্রদর্শনীর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। রমণী-বিভাগের সভাপতির বক্তৃতাও হইয়া গেল। তাহার পর বৃন্দ মহোদয় আমাকে সমবেত জনসংগঠন নিকট পরিচিতি করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "ইনি বৃক্ষার গুণাশিষ্ট—নিগ্রোসমাজের একজন প্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ইনি আমাদিগকে নিগ্রোজাতির

কৃতিত্ব ও সভ্যতার বিবরণ প্রদান করিবেন।"

আমি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলাম—  
অমনি চারিদিক হইতে অরুণি উঠিল। নিগ্রোমহল হইতেই বিশেষ উৎসাহ পাওয়া গেল—এবং হাঙ্গার হাঙ্গার লোকের দৃষ্টি আমার দিকে পড়িল। নিরে আমার বক্তৃতা উদ্ভূত করিতেছি।

"সভাপতি মহোদয়, প্রদর্শনী ও সম্মিলনের ধূমকরগণ, এবং বহুগণ,

যদিও অকলের ঐ অংশ লোক নিগ্রো সমাজের অন্তর্গত। নিগ্রোসমাজকে বাহ্য দিয়া কর্তৃক করিলে কোন অনুষ্ঠানই এ অকলে প্রকল প্রদান করিতে পারে না। এ অকলের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক উন্নতি বিধানের

অল্প কৃষ্ণাধ্বাতির সহযোগিতা গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য।

আপনারা এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে নিখোজাতিক উপেক্ষা করেন নাই, বরং সকল অবস্থায়ই কৃষ্ণাধ্বাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপে প্রতি পদে আপনারা আমার স্বাধাতির চরিত্রবত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার যথোচিত সম্মান করিয়াছেন। এতদ্বারা আমার স্বাধাতিগণ আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। আমি তাহাদের যুগপাত্ত স্বরণ এই প্রদর্শনীর কর্ম-কর্তাদিগকে তাঁহাদের উদারতার জন্য যত্নবান প্রদান করিতেছি।

আপনারা আমাদিগকে এই উপায়ে সম্মানিত করিয়া যেতাত্ত ও কৃষ্ণাধ্বাতির সমাজের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিলেন। আমাদের বাধীনতা-লাভের পর এতদ্বা সত্যত্ব, সন্তুষ্টতা এবং পরস্পর-সাপেক্ষতা আর দেখা যায় নাই।

কেবল তাহাই নহে। আমরা এই সুযোগে শিল্প ও ব্যবসায় হিসাবে এক নবজীবন লাভ করিতে থাকি। এতদিন আমরা রাষ্ট্রীয় ও শিল্পক্ষেত্রে অনেকটা অনভ্যস্ত ছিলাম। গোড়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আমরা উচ্চ অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখিতাম। সম্পত্তির মালিক না হইয়াই প্রদেশ-রাষ্ট্রের এবং যুক্ত-রাষ্ট্রের মন্ত্রণা সভার পরলাভের আশা করিতাম। কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পে ও ব্যবসারে পরিচয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এবং গলাবান্ধীতে সময় ব্যয় করিতাম। এতদ্বা অস্বাভাবিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রহসনের যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা যে সময়ে বাধীনতা পাই তখন আমরা সকল বিষয়ে নিত্যন্ত শিশু ছিলাম—কোন দিকেই আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল

না। এতদ্বা সংস্কারের সোভনীয় পথ ও সম্মানগুলির প্রতি আমরা প্রথমেই অগ্রহণ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এগুলিকে লাভ করিবার উপায় ও কৌশলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই। আমরা ফললাভের জন্যই বেষ্ট্র ব্যগ্র হইয়াছিলাম—ফললাভের প্রণালীগুলি আয়ত্ত করিতে যত্ন লই নাই।

বহুদিন ধরিয়া একটি জাহাজ সমুদ্রে পথ হারাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিল। হঠাৎ এক দিন একটি নতুন জাহাজের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। পথভ্রান্ত জাহাজের মাস্তুল হইতে তাহার দিকে নিশান তোলা হইল—“জল চাই জল চাই, আমরা ডুকার মরিতেছি।” নতুন জাহাজ হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল “বেখানে তোমাদের জাহাজ রহিয়াছে সেই খানেই তাল জল পাইবে। ঠিক সেই খানেই বাস্তুি ফেল।”

পথভ্রান্ত জাহাজ আবার ধানাইল “জল, জল, শীত তাল জল পাঠাও।” নতুন জাহাজ আবার উত্তর করিল “ঐখানেই জাহাজ পানীয় জল পাইবে। বাস্তুি ফেলিলেই তাল জল উঠিবে।” এইরূপে তিন চারিবার দুই জাহাজে প্রার্থনা ও উত্তর চলিতে লাগিল। শেষে সেই পথভ্রান্ত জাহাজের কর্তা বাস্তুি ফেলিয়া দেখিলেন—অতি নিখল ও মিষ্ট জল উঠিয়া আসিল। তাহাদের জাহাজ সমুদ্রে ছাড়িয়া অনেকক্ষণ আমাজন নদে পড়িয়াছে।

আমাদের নিখোজরাহকেও আমি সেইরূপ বলি—“বেখানে আছে সেই খানেই বাস্তুি ফেল। তাল জল পাইবে। ডুকার স্বাধা হইতে হইবে না।”

তোমরা ভাবিতেছ আমেরিকা ছাড়িয়া গেলে স্বাধা হইবে? তোমরা ভাবিয়াছ তোমাদের সঙ্গে যেতাদর্শনাথকেও সন্তান



কোনদিনই জন্মিবে না। তোমরা ভুল বুঝিতেছ—সেই পণ্ডিতের জাহাঙ্গীর নাবিক-দর মত পুরাতন মোহে মজিয়া রহিয়াছে।

চক্ষু খুলিয়া দেখ—দেখিবে স্বাধিকার হুমিট জল তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে। বুঝিবে যেতাত্ত তোমার ভাই—দেখিবে আমেরিকাই তোমার স্বপ্নে। হুঁরে বাইবার প্রয়োজন নাই—বেতাত্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ও কার্য-বিনিময় কর। যে সেনের আবহাওয়ার বাস করিতেছে সেই আবহাওয়া হইতেই নিঃস্বাস গ্রহণ কর। সম্মুখেই এক কুটপুট ও চরিত্রবান্ জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

কৃষিকর্মে মনোনিবেশ কর। শিল্প ও ব্যবসারে মনোযোগী হও। অস্ত্রাস্ত্র নানা-প্রকার চাকরী, কেরানীশির ইত্যাদিতে লাগিয়া যাও। বিশেষ বাইবার প্রয়োজন নাই। “যেখানে আছ সেইখানেই বাস্তুি কেন।”

কিন্তু অকালের যেতাত্তদিগের অনেক মোহই আছে স্বীকার করি। কিন্তু একথাও মুক্তকণ্ঠে আমি বলিতেছি যে, এখানে নিগ্রো-জাতি ব্যবসায় হিসাবে কোন অসুবিধাই তোপ করে না। বরং আমাদের আর্থিক উন্নতির বথেষ্ট সুযোগই আমার সম্মুখিতাপন এখানে পাইয়াছে। কোন নিগ্রোই তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না।

আমরা অল্পকাল হইল স্বাধীন হইয়াছি। বলা বাহুল্য, অস্ত্রাস্ত্র স্বাধীনজাতির যে অবস্থা আমাদেরও সেই অবস্থাই হইবে। পুরাতন লঙ্ঘনপ্রতিষ্ঠা জাতির মধ্যে ব্যক্তিমাত্রকেই খাটিয়া বাইতে হয়। সংসারের কাজকর্মে বিশ্বাসুচ্চ ও চরিত্রবলের প্রয়োগ করিবাই তাহারা লগতে বিরাজ করিতেছে। নিগ্রো-

জাতিকেও সেইরূপ পরিভ্রম স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের অনেক গ্রাম আমাদিগকে নিগ্রোতেই মুখে তুলিতে হইবে। তাহার গুণ দারীতিক পরিভ্রম অন্ত্যাবস্রক।

“গোলামীর যুগে পরিভ্রম করিতাম—কিন্তু এখন স্বাধীন হইয়াছি পরিভ্রম করিব কেন?” —কোন চিন্তামূল ব্যক্তিই এরূপ ভাবিতে পারেন না। কারণ স্বাধীনতার অর্থ পরিভ্রম হইতে মুক্তিলাভ নয়! স্বাধীনতার যুগেও হাতে পায়ে খাটিতে হইবে—মাথার দাম পায়ে ফেলিতে হইবে।

গোলামীযুগে পরের স্বার্থে খাটিতাম, পরের নেক্ষে খাটিতাম, পরকে ছুণী করিবার জন্য খাটিতাম। সে খাটায় কিছুমাত্র নিজের ছিল না, নিজের লাভ দেখিতাম না, নিজের আনন্দ পাইতাম না। কিন্তু স্বাধীনতার যুগে খাটিব—নিজের জন্য, নিজ আনন্দের জন্য, নিজ স্বার্থ-শিখির জন্য—সকল বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ববোধ আপাইবার জন্য—সর্বত্র নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। কিন্তু খাটা বন্ধ হইবে না। হতহীন মানুষ থাকিব ততদিন খাটিতেই হইবে।

আমার নিগ্রো জাতীয় সর্বদা একথা মনে রাখিয়া চলিবেন। স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া বাহুগিরি ও বিলাসের সুযোগ পাইয়াছি—একথা যেন আমরা না বুঝি। বরং এখন হইতে আমাদিগকে কঠোর সংযম পালন করিতে হইবে। সৌধীন ও চকচকে পদার্থের প্রলোভন চাড়াইয়া বর্ষা টেকসই, দ্বারী এবং কার্যোপযোগী জিনিষপত্রের আদর করিতে হইবে। অলস্যর বেশভূষা ইত্যাদির আকাজক্ষা এখন কিছু বর্জন করা আবশ্যক। সকল বিষয়েই আমাদের এখন কঠোর সাধনার যুগ।

সকল স্বাধীন জাতিই বিবেচনা করেন যে, কবিতাগচনার যে কৃতিত্ব, আমি চাষেও সেই কৃতিত্ব। ক্ষুদ্রাং হাঁহারা সমাজকে ধনে সম্পদে উন্নত করিতেছেন তাঁহাদের সম্মান বড় কম নয়। এই বুদ্ধিগা আমাদেরও এই ধনসম্পদৃষ্টির কর্ণে মনোযোগী চাইতে হইবে। আমরা এই গোড়ার কথা তুলিয়া গেলে উন্নতির উচ্চ গুরগলিতে উঠিতে পারিব না।

তাৎপর্য আমরা যেন সর্জন্য মনে রাখি যে, আমাদের স্বযোগ ও সুবিধা বর্তমানে অনেকই রহিয়াছে। অবশ্য কতকগুলি বাধা ও বিঘ্ন আমাদের চরম উন্নতির প্রতি-বন্ধক হইয়া আছে—তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সর্জন্য সেই অসুবিধার কথা গুণবিচার প্রদোজন নাই, এবং তাবিধা তাবিধা সেইগুলিকে বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের হাতের কাছে যে সকল সুবিধা পাইতেছি সেইগুলিকে বুদ্ধি-মানের জ্ঞান ব্যবহার করিব না কেন? বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি ভগবতের শক্তি-গুলি বখাসম্ভব সম্ভাবনার করিয়া নিজেদের কাজে না লাগাই, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিয়া গেলাম? আমাদের বংশধরগণের উচ্চতর কর্ণ ও চিন্তার জন্য আমাদের এক্ষণে হুণ্ডু ভিত্তি গঠন করিয়া রাখা আবশ্যক নহে কি? এক্ষণ বর্তমানের স্বযোগ বাধা কিছু পাইতেছি সকলই আমাদের গ্রামণণে নিগ্রোসমাজের স্বাধীনতার জন্য বাহ্যার করা কর্তব্য।

আমরা যেতাম দেশবাসীদিগকেও আমি বলিতেছি—‘আপনারাও যোগ্যে আছেন, ঠিক সেইখানে বাস্তুি কেলুন’—আপনারাও অভাবেরও পূরণ হইবে। বিশেষ হইতে,

শোক আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। যদেশের কৃষাক্ষমজ্ঞের মধ্যে বাস্তুি কেলুন—আমেরিকার নিগ্রোজাতির সঙ্গে সকল বিষয়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করুন। আমেরিকাজননী প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবেন।

এই নিগ্রোরা আপনাদের যমজ জ্ঞাতা। ইহারা আপনাদের স্বপ্ন-স্বপ্নে উৎসব-ব্যাসনে সকল অবস্থায়ই আপনাদের সঙ্গী রহিয়াছে। আপনারা কি ইহাদের নিকট সঙ্গী নহেন?

নিগ্রোজাতির স্বভাব চরিত্র আপনাদের অজানা নাই। ইহাদের প্রকৃতভক্তি এবং চরিত্রবতার পরীক্ষা আপনারা বহুবার করিয়াছেন। আপনারা ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আপনাদের প্রীতুপপরিবার ও ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে কতবার নিশ্চিত হইয়াছেন—সে সকল কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। ইহারা যে বিশ্বাসঘাতক নয় তাহার সাক্ষ্য আপনারা ই সন্ধ্যাক্ষেপে দিতে পারিবেন।

অধিকতর এই কৃষাক্ষ সমাজ আপনাদের আর্থিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন। ইহারা ই মুকভাবে এতদিন আপনাদের জমি চরিয়াছে। ইহারা কখনও বন্ধ-ঘট করে নাই—আপনাদিগকে জম করিয়া নিজেদের বেতন বা অস্ত্রান্ত অধিকার বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হয় নাই। বিনাব্যাক্যব্যয়ে ইহারা আপনাদের জমল পরি-কার করিয়াছে—বেলপথ তৈয়ারী করিয়াছে—নগর নির্মাণ করিয়াছে। নিগ্রো স্কুলীরাই পৃথিবী খুঁড়িয়া অক্ষরকারময় বাদ হইতে ধাতু-বস্ত তুলিয়া আনিয়াছে—ইহাদের সাহায্যেই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের সকল স্থ ও প্রীপুট হইয়াছে।

আপনারা এই সমাজের প্রতি কি কৃতজ্ঞ হইবেন না? আপনারা কি আপনাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক পৌরবের

মূলকারণ স্বপ্ন নিগ্রোহাতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকিতে পারেন? আমি প্রার্থনা করিতেছি— যেতাব্দ সমাজের অগ্রদূতগণ, আপনারা কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যেই আপনাদের বাস্তুি ফেলুন। প্রতিদ্বন্দ্বি। ইহাবিপের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

আপনারা ঠিক পথেই চলিয়াছেন আপনারা নিগ্রোহেতাঙ্কের মিলন পথই ধরিয়াছেন— তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। আজকার এই প্রবর্ণনীই তাহার সাক্ষ্য। এই সম্মিলনে আমি যে বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইয়াছি— ইহাই তাহার সাক্ষ্য। আপনারা নিগ্রো-সমাজকে সম্মান করিতেছেন।

আপনারা এক্ষণে আমার বক্তৃতিদিগকে উত্তরিত নব নব পথে চালিত করুন। তাহাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করুন— তাহাদের জীবনের উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করুন। তাহা-দিগকে কৃষি, শিল্প, কলা, সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি সভ্যতার বিবিধ বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান করুন। যেহেতু,—দেশের মাটি উর্বর হইতে থাকিবে—ধরতী কলহুলে ডরা হইয়া আপনাদের মানব বিধান করিতে থাকিবে। আমেরিকা-র পরীগুলি উদ্ভানে পরিণত হইবে—নগর-গুলি নব নব ক্যাস্ট্রী বক্ষে ধারণ করিয়া সমৃদ্ধ হইবে।

আর জারিরা রাখিবেন, যখন প্রয়োজন হইবে, আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমরা আমাদের রক্তের পেশবিন্দু পর্যন্ত দান করিব। একদল প্রকৃতক বিপ্লবী এবং কৃতজ্ঞ জাতি আপনারা বিশেষ হইতে আম-জানী করিতে পারিবেন না। “আপনারা যেখানে আছেন সেইখানেই বাস্তুি ফেলুন।”

অতীতের কথাগুলি স্মরণ করুন সেই

গোলানীর মূল স্মরণ করুন—সেই গোলানী যুগের শেষ অবস্থা, সেই উত্তরপ্রান্তে ও দক্ষিণ-প্রান্তে লড়াইয়ের কথা স্মরণ করুন। অতীতে আমরা আপনাদের সম্মান সম্মতি পালন করিয়াছি, বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিয়াছি। আপনাদের যোগে ও শোকে আমরাই অস্থির ও রোগের ত্রেণ সহ করিয়াছি। আপনাদের দ্বাৰাপাৰ্শে কত দিনরাত্রি আমরা অনশনে কাটাইয়াছি। আপনাদের অভিজ্ঞতাকণের দৃষ্টিকালে আমরা কত আশ্রয় ফেলিয়াছি। আমরা আমাদের রক্তদিয়া আপনাদিগকে মাহুদ করিয়াছি। নতুন কোন জাতি আদিয়া আপনাদিগের দেহদণ্ড সেবাশুশ্রূষা করিবে?

এতকাল আমরা আপনাদের অন্ত দ্বারা করিয়া আদিয়াছি ভবিষ্যতেও আমরা ঠিক সেইরূপই করিব। আমরা আপনাদের ধর্ম, সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সকল কর্মক্ষেত্রেই আপনাদের সহযোগী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া থাকিব। আমরা যেতাব্দের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে এক পরিবারভুক্তরূপে জীবন যাপন করিব। আবশ্যক হইলে এই ৮০ লক্ষ নিগ্রো-জাতি প্রাণপাত করিয়া আবেহিকার গোরব রক্ষা করিবে। প্রত্যেক নিগ্রোর জীবন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ‘ইন্সত্যের’ জন্য উৎসর্গীকৃত জানিয়া রাখিবেন।

জানিয়া রাখিবেন—নিগ্রো ও যেতাব্দ লেন-ঘেন—খাওয়া, পরার পাঁচ আঙুলের মত স্বতন্ত্র থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুই সমাজ যুক্তরাষ্ট্রের ‘জাতীয়’ মঙ্গলের জন্য আমার এই বাহর মত ঐক্য বিশিষ্ট। আমরা দ্বন্দ্বম্পর-সাপেক্ষ—আমাদের একতা মানব-বোধের সত্য স্বাভাবিক গ্রহিগ্ৰন্থত। দুইএর স্বার্থ সম্পূর্ণ এক।

আমেরিকাবাসী এম অঙ্কে ছাড়িয়া যত্ন অঙ্কে পুট ও উন্নত করিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকের সম্মান ও স্বাধীনতা অপরের সম্মান ও স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আপনারা নিগ্রো-জাতিকে নানিধা চাপিতে এবং পশু করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে মৃত্যু সভাই অস্বহ্যতা করিয়া ফেলিবেন। তাহা না করিয়া আপনারা নিগ্রোকে আমেরিকার উপযুক্ত-সম্মানে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন, অভিজাত্যের দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করুন, তাহাকে সাহায্য করুন, তাহার শিশুসুলভ চিন্তাশক্তিরূপকে সংরক্ষিত, পরিপুষ্ট করুন, তাহার অস্বহ্যত কর্মশক্তিকে নানা উপায়ে বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করুন। এই "সংরক্ষণ"র জন্য আপনাদের যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং সময়-ব্যয় করাও আবশ্যক হইবে। কিন্তু বর্তমানে আপনারা এই সংরক্ষণ ও পরিপোষণ কার্যের জন্য যে কতিপয় করিবেন তাহা সমস্তই অল্পকালের মধ্যে হুবে আসলে উঠিয়া আসিবে। আপনাদের এই প্রয়াস অতি সম্ভব ফল প্রসব করিতে থাকিবে—দুষ্করাষ্ট্র ধস্ত হইবে।

জাতিরা দেখুন আপনাদের কার্যকাল কি হইবে। যদি আপনারা নিগ্রোজাতিকে এক্ষণে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে ৮০ লক্ষ নূতন কর্ম হইতে আমেরিকার যশোমান উদ্ভিত হইবে—৮০ লক্ষ নূতন কর্মে জননী অমরত্বের বন্দনা গীত হইবে। আর যদি এক্ষণে আপনারা স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অবনত সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্টা না হন, তাহা হইলে, এই ৮০ লক্ষ কর্ম আপনাদের বিরুদ্ধে সমস্ত

সংসারময় নিম্না টুটাইতে থাকিবে। আর যদি আপনারা নিগ্রোজাতির বাহনল সংরক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা চল, অনতিদূর ভবিষ্যতেই দেখিতে পাইবেন—১৬০ লক্ষ নূতন চক্ষে আপনাদের মাতৃভূমির বোকা তুলিয়া ধরা হইয়াছে—আপনাদের নিজেও ঘাড় অনেকটা হাল্কা হইয়াছে। আর যদি আর ইহাদের বাহ্যতে শক্তি পুট করিবার জন্য আপনারা লচেষ্টা না হন, তাহা হইলে দেখিবেন, আপনাদের বিপৎকালে ও দুঃসময়ে এই ১৬০ লক্ষ হাত আপনাদিগকে ধরিয়া পড়তে টানিয়া রাখিতেছে। হয়, আমরা দুষ্করাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের ১ অংশ শক্তি, না হয় আমরা ইহার ১ অংশ দুর্বলতা। হয় আমাদের দ্বারা এই প্রান্তের কার্যক্ষমতা, চরিত্রবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ১ অংশ বাড়িবে, না হয় ইহার ১ অংশ অপটুতা, চরিত্রহীনতা এবং অজ্ঞতা বাড়িবে। হয় আমরা দক্ষিণপ্রান্তের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির দর স্বরূপ হইয়া থাকিব, না হয় আমাদের প্রভাবে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবনতির দিকে এই অঞ্চলকে নানিতে হইবে।

তার পর প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদের নিকট আমার নিবেদন। আর আমরা আপনাদের এই বিরাট আয়োজনে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু আমরা বেশী কিছু প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। আপনারা নিগ্রোজাতির নিকট এত শীঘ্র বেশী কিছু আশা করিতে পারেন না।

ত্রিশবৎসর পূর্বে আমরা কেনা গোলাম ছিলাম। এখন স্বাধীনতা পাই, তখন ছুটা একটা কথল, ছুটা চায়টা মুগের ছানা অথবা ছুটা চারিটা শাকপাচী খাওয়া আমাদের লখল ছিল। সেইটুকুই আমাদের মূলধন জানিয়া

রাখিবেন। সে সব কথা আর মনে করিবারিতে হইবে কি? এই নিঃশব্দ অস্থায়ী ত্রিণবৎসরের মধ্যে আমাদেরকে নানা কষ্ট-ক্ষেত্রে পাড়াইতে হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রের দুর্য্যাক্ততার বলুন, পান্ডীভূঁড়ি বলুন, এতিনটোয়ার বলুন, সংবাদপত্র পুণ্ডকাদি বলুন, তিক্তকলা, মুষ্টিপঠনই বা বলুন, অথবা মোকামদারী এবং ব্যাচ পরিচালনাই বলুন—সকলই আমাদেরকে পিত্তর মত আরক্ত করিতে হইয়াছে। বিনা মূলধনে ও বিনা অভিজ্ঞতায়, আমরা এই সকল কষ্টে প্রবেশ করিয়াছি। ত্রিণবৎসরের ভিতর কত ফলই বা পাইতে পারি? তথাপি যে আপনাদের বিরাট কাণ্ডের এক কোণে আমরা আমাদের কৃত সত্যতার নিদর্শনগুলি দেখাইতে পারিয়াছি ইহাই বিশ্বাসের কথা।

এই সঙ্গে আমি যেতান্দ-সমাজকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণ প্রান্তের যেতান্দ জনগণ হইতে আমরা গত ত্রিণবৎসর অশেষ সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়াছি। উত্তর অঞ্চলের বনী মহাস্বারাও আমাদেরকে দলদান করিয়া নানা উপায়ে কষ্টজীবনে অগ্রসর করিয়া বিচাছেন। আজ আমরা আপনাদের সমুখে বাংলা উপস্থিত করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য যেতান্দ সমাজের নিকট আমরা সত্যপতাই স্বীকৃত। আপনাদের সাহায্য না পাইলে এত অল্পকালের ভিতর নিম্নোক্তাতি এই উন্নতি দেখাইতে পারিত না।

পুনরায় আমি দক্ষিণ প্রান্তের জননায়ক-

গণকে বলিতেছি—এই প্রদর্শনী ও সন্মিলনের ঠাট্টা শুভ অবসর আমাদের দুই সমাজের পক্ষে আর আসে নাই। কৃষ্ণাঙ্ক ও যেতান্দ সমাজের সৌহার্দ্য ও মিলনের স্বপ্ন এইবার যেতান্দ পুণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর আর বন্ধনও সেতন হই নাই। আজ এই মিলনমন্দিরে পাড়াইয়া ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। এবং নিবেদন করিতেছি, যে, নিম্নোক্তান অতীতের দ্বারা ভবিষ্যতেও যেতান্দকে ভাই বলিয়া জানিবে। আপনারাও ভগবানের কৃপায় আমাদেরকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হউন, আমাদের উন্নতিকল্পে আপনাদের উন্নতি বিবেচনা করিতে শিখুন এবং দুই জাতিকে অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে সন্মিলিত করিয়া মুক্ত-রাষ্ট্রে দুগন্তর সুপ্রিয় সাহায্যতা স্বকন। আত্ম-ভাবের বৃদ্ধি হইলেই এই প্রদর্শনীর সার্থকতা হইবে।

এইরূপে পরজাতিবিষয়ে ও পরজাতি-পীড়ন আবেশিত হইতে লুপ্ত হইলেই এবং জাতিনির্কলমে দ্বারা বিচারের প্রযুক্তন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাগের ব্যবস্থা করিলেই এখানে নবজীবন আসিবে। সেই নবজীবনের আবর্তাবেই আশঙ্কার এই কৃষি, শিল্প, চিত্র, মুদ্রি, ও ব্যবসায়ের প্রদর্শন স্বার্থ ফলপ্রসূ হইবে। সেই নতুন 'জাতীয়' ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেই এবং সেই নবীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিকাশ হইলেই, এই লোহাগড় ইট কাঠ ছবি ছাপার প্রচার সার্থক হইবে।"

নানা কথা

আমার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র জিজ্ঞাসার শাসনকর্তা বুলক মকের উপর হোড়াটুপা আঁধা আবেগের আমার হাত ধরিলেন। এইরূপে অসংখ্য লোক আমাকে হৃদয়ান্তিতে লাগিল। সত্যতঃ আমার প্রস্তাব শুধুমাত্র শুধু হইয়া উঠিল।

আমি আটলাণ্টা হইতে টায়েন্সীতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্ৰি লোকজন আমাকে দেখিয়া অভিযান করিয়া কৃতার্থবোধ করিতেছিল। তিনমাস ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দক্ষিণ সকল প্রান্তের সংবাদপত্রেই আমার প্রশংসা চালাইতে লাগিল। দেশের প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলি আমাকে একব্যাক্যে বক্তৃতার সাধুবাদ করিতে থাকিলেন।

টায়েন্সীতে আমার নিকট কত পত্র আসিল সকলে আমাকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভক্ত বক্তারূপে নিযুক্ত করিতে চাহেন। এক সন্ধ্যায় আমাকে লিখিলেন—“আপনি যদি আমাদের প্রস্তাব নানাভাবে বক্তৃতা করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে এককালীন ১০০,০০০ দিতে প্রস্তুত আছি। অথবা প্রত্যেক রাতে ৩০০ করিয়া আপনার পারিশ্রমিক দিতে পারি।” আমি এই সকল সন্ধ্যায়কে নম্রভাবে উত্তর দিলাম, “আমি আমার জীবনরত টায়েন্সী বিদ্যালয়েই উপস্থাপন করিব। হুতরাং আপনার অহুত্রেয় রক্ষা করিতে আমি নিতান্তই অসমর্থ। অবিকল বক্তৃতা করাকে জীবনের ব্যবসারূপে গ্রহণ করিতে আমি পারিব না। আপনারা আমার মাগ করিবেন।”

এই সময়ে ক্রীডল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা বা সভাপতি ছিলেন। তাঁহার নিকট ওয়াশিংটনধরবারে আমার বক্তৃতার একটা নকল পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বহুপত্র পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন, “আটলাণ্টা প্রদর্শনীতে যদি অল্প কোন কাজও না হইত, এবং কেবলমাত্র আপনার বক্তৃতার জন্যই যদি এই সম্মেলনের আয়োজন হইত, তাহা হইলেও ঐ অগ্ৰহণের অর্থহীন হইত না। আপনার বক্তৃতা শুধুমাত্র ও যেতাদ উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইবে।”

তাঁহার পর ক্রীডল্যাণ্ড প্রদর্শনী দেখিতে আটলাণ্টার আসেন। সেই সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। আমার অহুত্রেয় তিনি নিঃশেষবিধানে প্রদর্শিত ব্রহ্মাণ্ডি ধর-সংসারে দেখিলেন। এই হুত্রেয় অনেক নিঃশেষ পুঙ্খ ও অমণ্ডি তাঁহার সঙ্গে করমর্দন করিল। বহুলোকে তাঁহার নিঃসৃত হাতের মহি নাম লইয়া রানিতে উৎসাহ হইল। তিনি তাঁহাদের খাতার বা কাপড়ে বেশ আনন্দের সহিত বীর নাম লিখিয়া দিলেন।

এইবার আমার ব্রহ্মাণ্ডিপনের কথা বলি। তাহার প্রথম প্রথম আমার বক্তৃতার বেশ হৃদয়ান্তিতে করিল। আমার প্রতিপত্তিতে তাহার পৌরবোধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের মত বদলাইয়া গেল। তাহার ডাবল—আমি বড়ই সামান্য লোক—আমার রাষ্ট্রীয় মতগুলি নিতান্তই নরম হইবে। তাহাদের মনে হইল, আমি যেতাদমিগের প্রশংসা অত্যধিক করিয়াছি। তাহাদের

বিচারে আমার আব কিছুর গরম সরম কথা বলা উচিত ছিল—নিগ্রোসদের অধিকার এবং দাবীদাবী বেশ জোরের সহিত প্রচার করা উচিত ছিল। তাহারা ক্রমশঃ কাগজে আমার নিন্দা শুরু করিল। তাহাদের বিশ্বাস, আমি আমার কর্তব্যপালনে ত্রুটি করিয়াছি। আমি ভীক ও দারিদ্র্যবোধ হীন, আমি সুযোগ পাইয়াও নিগ্রোসান্তির কার্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

নিগ্রোসমাজে আমার দুর্নাম রটিতে থাকিল। এই সঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। টাঙ্কেনীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ এই বক্তৃতার প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে কোন সম্পাদকের অস্থবোধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে নিগ্রোসমাজের দৃষ্টান্তসমূহের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। অনেক স্পষ্ট কথা লিখিতে হইয়াছিল। সুতরাং আমার প্রথম চিত্র নিগ্রোসমাজের পক্ষে কটিকর হয় নাই। দৃষ্টান্তসমূহ আমার উপর কেপিয়া গেলেন—আমার ভুল ভাবিবার ক্ষমতা কত চেষ্টা করিলেন। এমন কি একজন ঠাহাদের ‘আড়কাটি’ও নিখুঁত হইল। তাহারা আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ভাসাইবার ক্ষমতা প্রাপণ করিতে থাকিল। অনেক সংবাদপত্রও আমার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে যোগ দিল। কেহ কেহ আমাকে কৈফিয়ৎ দিবার ক্ষমতা আহ্বান করিল।

আমি কোন কথা বলিলাম না—চুপ করিয়া রহিলাম। আমার উপর দিয়া কড় বহিয়া গেল। আমি নিজেই কথা সপ্রমাণ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিলাম না—আমার বাক্যের ও চরিত্রের তীক্ষ্ণ সবালোচনাগুলিতেও কৰ্পনাত করিলাম না। আমি সুস্থিতাম, আমি

কষ্টসা করিয়াছি—যথাসময়ে আমার কৈফিয়ৎগুলি লোকেরা আপনাপনিই স্মৃতিতে পারিবে। আমার আত্মরক্ষার জন্য এমন বাস্তবের নামিমা প্রতিবাদ বা কথা কটাকাটির প্রয়োজন নাই।

সত্যই তাহা হইল—ক্রমশঃ লোকেরা আমার নতুনই মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। দৃষ্টান্তসমূহের চরিত্র সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে নানা আপত্তি উঠিতে লাগিল, আমি দীর্ঘকাল বেধিতে লাগিলাম—কালপ্রভাবই আমার কৈফিয়ৎ সমাজে পৌছিয়াছে।

এই আটলাণ্টা বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাহাই করিলাম। নিগ্রোসমাজের প্রতিফল সমালোচনা চুলমাত্র বিচলিত হইলাম না। সংবাদপত্রে আমার নিজেই মত খোলসা করিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধও করিলাম না।

ইতিমধ্যে হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত গিলম্যান পত্র লিখিলেন, “মহাশয়, আটলাণ্টা প্রদর্শনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণব্যাপারে আপনাকে একজন পরীক্ষক মনোনীত করা হইয়াছে। আপনাকে শিক্ষা-বিভাগের প্রদর্শিত ব্যবসায় পরীক্ষা করিতে হইবে। আপনার সময় হইবে কি? টেলিগ্রামে উত্তর দিবেন।”

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কার্যই আমাকে পরীক্ষা করিতে হইল। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাতত্ত্ব পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সঙ্গে একত্র হইয়া আমি কার্য করিলাম।

আমি বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের সভায় বক্তৃতা করিতে পাইলে সুখী হই। বোষ্টন, নিউ-ইয়র্ক, শিকাগো এবং বাস্কেলো ইত্যাদি

নগরের বাবদাশিগণ অত্যন্ত হীরবুদ্ধি সম্পন্ন এবং সহজেই প্রতিপাত্ত বিষয়ের সার কথা বুঝিয়া লইতে পারেন। ইহাবিগকে বেশী কথা বলিতে চয় না। ইহারা অল্প কথার মাহুয়। এই মহলে বক্তৃতা করিছাই আমি সঙ্গাপেকা বেশী আনন্দ পাইয়াছি।

তাহার পর আমি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকজনকে শ্রোতৃমণ্ডলীতপে পাইলে আনন্দিত হই। ইহারা বেশ উৎসাহশীল—সামান্ত মাত্র উত্তেজনা পাইলেই বক্তাকে মাথার করিচা রাখিতে চায়।

আমি এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-বিগকে তৃতীয় স্থান দিয়া থাকি। হার্ভার্ড, ইয়েল, উইলিয়ামস্, আমহার্ট, কিং, পেনসিলভেনিয়া, ওয়েলসল্, মিচিগান, ইত্যাদি আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের সভায় আমার বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। ছেলে মহলে বক্তৃতা দিয়া আমার বেশী সুখ হয় না। আমি কালের লোক পাইলেই খুসী হই।

বাক্যের একটা শুদ্ধ বহুটিয়াছে যে, নিগ্রো-রমণীদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জনের চরিত্রও সৎ কি না সন্দেহ। একজন মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা নিত্যই অস্বাভাবিক। কোন সমাজ সম্বন্ধেই চরিত্রবিষয়ক মত প্রকাশ করা বড় কঠিন। আমি যদি নিউ-ইয়র্ক নগরে জঘন্য মহান্নার লোক সংখ্যা গণনা করিয়া সঙ্গ্রহণ করিতে চাহি যে, যেতদ্বা সমাজে সচ্চরিত্রা রমণী একজনও নাই তাহাও এইরূপ দামিষহীন মত প্রচার হইবে না কি?

আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্রের নানান্থানে শান্তি উৎসব অর্চনানের জন্য নানা উজোগ হয়।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আমাকে এক উৎসবে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। ১৮ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যাকালে সভা হয়। এত বড় সভায় আমি আর কখনও বক্তৃতা দিই নাই। ১৬০০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

এই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উইলিয়াম ম্যাক কিন্লিও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে পঞ্চাশ দিতে দাইয়া বলিয়াছিলাম, “আপনার উদারতায় নিগ্রোজাতি স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তৎকাল আমেরিকা-সম্রাট তাহার যেতদ্ব তাইএর সঙ্গে একত্রে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য বিক্ষেপে কর্ম করিয়াছিল। একজন আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।” এই কথা শুনিবামাত্র সভামণ্ডপ মুগ্ধরিত করিয়া সভাপতি মহোদয়ের জয়ধ্বনি উখিত হইল। কিন্লি জনমণ্ডলীকে অভিবাদন করিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অমনি আবার গভীরতর জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল!

সভাপতিমহোদয়ের বক্তৃতা করিতে গেলে একটা বিপদে প্রোহই পড়িতে হয়। কতকগুলি যক্ষ্মণের পাণ্ডাশিগের পাজা এড়ান বড়ই মুশ্কিল। ইহারা ‘রাভারাত’ বক্তৃলোক করিবার উপায় প্রচার করিয়া বেড়ান। বিনা রেশে নিগ্রোজাতির উদ্ধার সাধনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহারা হাটে বাজারে লোক জমা করেন। ইহারা দৈহ্য সহিষ্ণুতা ইত্যাদির একেবারেই পক্ষপাতী নন। ইহারা অনেক সময় কেবল তর্কের খাতিরেই তর্ক করেন। মুক্তিপে পরাভ হইলেও ইহারা তাহা স্বীকার করিতে স্তুতি হন। এই সকল ভাবযুগে তর্কিক-দিগকে আমি দূর হইতে নমস্কার করি।



তথাপি আমাকে বহুবার ইহাদের সঙ্গে বাক-  
হুঁচ শব্দের অপব্যয় করিতে চাইয়াছে।

আর এক ভাটীও লোক আছে। তাহার।  
নামজাদা লোকের সঙ্গে সঙ্গে খুঁড়ি। আনন্দ  
পার। ইহারা একপ্রকার উৎপাত বিপেব।  
কোন কাজ কন্ম নাই—লোকের সময় নষ্ট  
করাই ইহাদের স্বার্থ। একদিন সন্ধ্যাকালে  
যোঠন-নগরের এক বড়গড়ার বক্তৃতা করি-  
য়াছি। পরদিন সকাল হইবার পূর্বেই বেশ  
আমার নিকট এক কার্ড উপস্থিত। আমি  
ডাড়াডাড়া বিছানা হইতে উঠিয়া ঐকথনানার  
কতলোকের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির  
হইলাম। বাইরা বেশ একটি লোক বলিয়া  
আছে। সে বলিল, “কাল রাত্রে আপনি  
বেশ ভাল কথা বলিয়াছিলেন। আমার ভাল  
লাগিয়াছে। তাই আজ সকালে আরও  
কিছু সংকথা শুনিতে আসিলাম।”

আমার বহুগণ আমাকে অনেক সময়ে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন “ওয়ালিংটন, তুমি এত  
সময় পাও কোথায়? সর্ব্বদা তুমি বাহিরে  
বাহিরে বেশভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতেছ?  
বক্তৃতা দিতেই তোমার সকল সময় চলিয়া  
যায়! তোমার টাঙ্কেলীর কাজকর্ম চলে কি  
রূপে? অথচ টাঙ্কেলী ত দিন দিন উন্নতির  
পথেই অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।”

এই সকল প্রশ্নের আমি সাধারণ উত্তর  
দিয়া থাকি—“দেখ, একটা মানুষের কথা আছে  
যে, ‘নিজে যে কাজ করিতে পার অপরকে  
সেই কাজ করিতে বলিও না।’ আমি কিন্তু  
এই প্রবাব বাক্য মানি না। আমি আর  
একটা নূতন নিয়ম করিয়াছি। আমার মত  
এই যে, “যত লোকে যে কাজটা বেশ ভাল  
করিয়া করিতে পারে, তাহার যত তুমি  
মাথা ঘামাইও না। তাহাকেই সেই কাজ

করিতে দাও। তুমি নিশ্চিত হইয়া অত্যন্ত  
কাজ করিতে থাক।” এই নিয়ম অনুসারে  
চলি বলিয়া আমার টাঙ্কেলী বিদ্যালয়ের  
কারণ কম হয় না, অথচ আমিও প্রায়ই  
টাঙ্কেলীর বাহিরে বাহিরে নানা কাজ করিয়া  
কাটাই।”

টাঙ্কেলী বিদ্যালয় আজকাল বেশ পাকা  
বন্দোবস্তের উপর পাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার  
পরিচালনার নিয়ম অতি সুন্দর ও সুশাসিত  
রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একজন  
লোকের অডায় হইলে ওখানকার কার্যকতি  
বিশেষ হয় না। কোন একজন ব্যক্তিকেই  
সজ্ঞা এখানে লাগিয়া না থাকিলেও চলে।  
আজ আনাদের কণ্ঠচাত্তুরিগের সংখ্যা ৮৬।  
অর্থবিভাগ এবং বাহির বিভাগ এত সুন্দর  
ভাবে করা হইয়াছে যে, কলের মত কাজ  
চলিতে থাকে। অধিকাংশ শিক্ষক ও কণ্ঠ-  
চাত্তুরীই অনেক দিন হইতে এই কার্যে নিযুক্ত  
আছেন। আমার মত ইহারাও এই বিদ্যা-  
লয়ের যত দারিদ্র্য বুঝিয়া চলে। ইহারা  
সকলেই নিজের কাজ স্বরূপ বিদ্যালয়ের  
কাজগুলি করিয়া থাকেন।

অধিকন্তু, আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি  
না কেন, টাঙ্কেলীর সকল খবর রোজই  
আমার নিকট পৌছিয়া থাকে। আমি এমন  
দৈনিক কার্যাবলীর হিলাব রাখিবার এক  
অতি সহজ নিয়ম বাহির করিয়াছি। এই  
কার্যতালিকা ও হিলাব-বহি দেখিয়া আমি  
প্রতিদিনকার আয়, খরচ পত্র, ছাত্র সংখ্যা  
কারখানাগুলির অবস্থা, কৃষি ক্ষেত্রের অম-  
দানী রপ্তানী, দেশা পাওনা, শিক্ষক ও  
ছাত্রদের সংখ্য ইত্যাদি সকল কথাই বুঝিয়া  
লই। এমন কি, কোন্ ছাত্র কি কারণে  
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিল না, তাহা

পর্যন্ত এই দৈনিক কার্যতালিকা হইতে জানিবার উপায় আছে। অধিক কি বলিব, মাসে আর কাঁচা রাগা হইয়াছে কি পুড়িয়া গিয়াছে, এবং আজকার শাক লজ্জাগুলি বাজার হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে কি আমাদের বাগান হইতেই আনিয়াছে তাহাও আমি ৪০০০ মাইল দূরে থাকিয়া জানিতে পাই!

আমি প্রতিদিনই আমার দৈনিক কাজ শেষ করিয়া ফেলি। সুখ্যা হইলে পর দিনের কাজও খানিকটা করিয়া রাখি। অবশ্য সর্বদাই আমি দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকি। সকালের কার্য আরম্ভ করিবার সময়েই আমি ধরিয়া রাখি—আজ হয়ত কোন ঘরে আগুন লাগিবে, অথবা ছাত্রদের কোন দুর্ঘটনা ঘটবে, অথবা কোন সংবাদপত্রে আমার বিতর্কে আশ্বোচন হইতেছে দেখিতে পাইব, অথবা বাজারে আমার নিম্না রটিতেছে শুনিতে পাইব। আমি প্রথম হইতেই এইরূপ দুর্ঘটনা লোকনিম্না, অগমন ও বিকলতার জন্য বুক বাঁধিয়া রাখি। একজন বণন আমার উপর দিয়া বিপদ বহিরা যার আমি বিচলিত হই না—গভীরভাবে স্থিরচিত্তে সকল বাতনা ও নৈরাস্ত ও বেদনা সহ্য করিতে থাকি। চিন্তকে প্রশান্ত রাখিবার জন্য আমি পূর্ক হইতেই এইরূপ বিকলতাও কথা ভাবিয়া রাখি। কাজেই বিকলতা আমাকে কানু করিতে পারে না।

আমি অবকাশ কাহাকে বলে জানি না। বিগত ১২ বৎসরের মধ্যে আমি একদিনও কাজ হইতে ছুটি লই নাই। তবে ১৮৯৯ সালে কয়েক জন বন্ধু ভোর করিয়া আমাকে ইউরোপ ভ্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারাও সমস্ত বাৎসর্য বহন করিয়াছিলেন। এই জন্য

তিন মাস আমার পুরাপুরি ছুটি খটিয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্রিস্টল, আয়ার, বিহার আমি কখনই ভোগ করিতে চেষ্টা করি নাই। আমি প্রতিদিন যথেষ্ট ঘুমাইবার আয়োজন করি। যথাস্থিতি ঘুমাউতে পাইলে আমার কোন ক্লান্তির কারণ থাকে না। এখন শরীরকে এমন যত্ন করিয়া ফেলিয়াছি যে, ২০ মিনিট মাত্র ঘুমাউতে পাইলেই নতুন উদ্যমে নতুন কাজে লাগিয়া যাইতে পারি।

আমি কখনও কিছু গুরুত্বাধি পাঠ করি কি? রেলগাড়িতে চলিতে চলিতেই যেটুকু পড়িবার সুযোগ পাই তাহা ছাড়া আমার ভাগ্যে আর পড়িবার সময় ছুটে না। সংবাদপত্র পাঠ করিতে আমি বড়ই ভালবাসি। এ সব যত পাই তত পড়ি—ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখি না—এগুলি পড়া আমার একটা বৈশিষ্ট্য। উপদ্রাস, নাটক ইত্যাদি আমি চোখে দেখিতে পারি না। অনেক সময়ে ‘সভ্যতার ব্যতিরেক’ মহাবিখ্যাত জুই একটা উপদ্রাস পড়িতে বাধ্য হইয়া থাকি! তাহা না হইলে বন্ধুসহলে এবং উত্তরম্যজে মূখ দেখান কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রন্থের মধ্যে জীবন চরিতগুলি আমার অতি প্রিয় বস্তু। আমি কোন কাল্পনিক ঘটনা বা ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিতে পছন্দ করি না। রক্ত-মাংসের মাছুষ সংসারে বাহ্য বাহ্য করিয়াছে আমি সেই সমুদয়ের ঘর্ষা তৃত্তান্ত জানিতে উৎসুক। মহাশ্রাণ স্ত্রাপতি আব্রাহাম লিঙ্কলন লম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপত্রে, সমালোচনাপত্রে এবং গ্রন্থে ও পুস্তিকায় যে কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছে বোধ হয় আমি তাহার কোনটাই পড়িতে ছাড়ি নাই। সাহিত্য-সংসারের তিনি আমার প্রবক্তা।

তাহার জীবনী আলোচনা করিয়াই আমি আমার কর্তৃজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি।

বৎসরে বোধ হয় প্রায় ছয় মাস আমি টাঙ্কেজীর বাহিরে কাটাই। ইহাতে আমার অনেক উপকার হয়। প্রথমতঃ কাৰ্য্য পরি-বৰ্ত্তনই একটা বিশ্রাম স্বরূপ। নূতন নূতন লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অগ্নিব কৰ্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া নবজীবন লাভ করি। দ্বিতীয়তঃ একস্থানে থাকিলে সেই ক্ষেত্রেয় ঘূটিনাতিতপ্তি লইয়া দিন কাটাইতে হয়। একটা সৰ্ব্বাঙ্গ গণ্ডার মধ্যে জীবন ঘূরিতে থাকে। কৰ্ম্ম ও চিন্তাশক্তির বিকাশ বহু হইয়া যায়। তদন্তঃ চিন্তে ক্ষুষ্টি ও আনন্দের অভাব ঘটিতে

থাকে। কিন্তু তদন্তে থাকিলে পেপানকার সোধ ও অসম্পূর্ণতাগুলি সৰ্ম্মবা চোখে পড়ে না। থানিকটা দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির সহিত সেই প্রতিষ্ঠানকে দেখিবার সুযোগ আসে। তৃতীয়তঃ, নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান ও কৰ্ম্মক্ষেত্রে কাৰ্য্যপ্রণালী দেখিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়িতে থাকে। বিশ্বাবাসের বিভিন্ন নিয়ম-গুলি নিজ চোখে দেখিরা অতিজ্ঞতা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত বড় বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যরসী-দিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং ভাববিনিময় হইতে থাকে। তাহাতেও বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

## সোভিৎস অধ্যাক্ষ

### ইউরোপে তিনমাস

১৮৯৯ সালে, আমার ৩৯০ বৎসর বয়সে আমি ইউরোপে বেড়াইবার সুযোগ পাই। এই সুযোগ অতি অভাবনীয়রূপে আসিয়াছিল। ইহার পূর্বে আমার ইউরোপ-ভ্রমণের সামান্য হাজ আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাকালে বোষ্টননগরের কয়েকজন ইহাঙ্গি রমণী টাঙ্কেজীবিদ্যালয়ে অর্থ-সাধারণের জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়া ছিলেন। বৃথামের সহিত ঐ সভার কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। আমিও সভার উপস্থিত ছিলাম। একজন আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ওয়ার্ল্ডটন মহাশয়, আপনাকে বড়ই দুর্জল ও ক্লান্ত বোধ হইতেছে। আপনি বাড়িয়া পাটয়া অবসর হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার কিছুকাল কার্য্যকৰ্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদায় লওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ মানসিক উবেগ নিবারণের

জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।" অমনি আর একজন বলিলেন, "এবেগ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিলেই আপনার উবেগ কমিবে। দূরদেশে থাকিলে টাঙ্কেজীর জন্য চিন্তা কম করিতে হইবে। মনে শান্তি সৰ্ম্মদাই থাকিবে। ২৪ ঘণ্টা ভাবিয়া কাটাইবার প্রয়োজন হইবে না।" সেই সঙ্গে একজন তৃতীয় স্বেতাঙ্গ রমণী মিঞালা করিলেন, "আপনি কখনও ইউরোপ দেখিয়াছেন কি?" আমি অপর দুইজনকে বিশেষ কিছু বলিলাম না—আমার জন্য তাহারা চিন্তিত, এজন্য তাঁহাদিগকে বৃত্তবাহ প্রদান করিলাম। এই রমণীকে বলিলাম "ইউরোপে বাইবার কথা এতদিন কখনও আমার মনেই আসে নাই।"

কিছুদিন পরে একখানা পত্র পাইলাম, "বোষ্টনের কয়েকজন স্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী

আপনার মন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আপনার স্বাধীনতার মন্ত আপনি কিছুকাল ইউরোপ ভ্রমণ করুন—এইরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা। আপনাকে ঘাইতেই হইবে। এ অল্পবোধ অগ্রাহ্য করিবেন না। আমরা আপনার কাজের মন্ত, আপনাদের বিদ্যালয়ের মন্ত, আপনার জাতির মন্ত এই অল্পবোধ অথবা আজ্ঞা করিতেছি। আপা করি, আপনি নিগ্রোমাতার তথ্যতা তাবিয়া আমাদিগের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবেন।”

আমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুগণকে জানাইলাম, “আপনাদের অল্পগ্রহণ্য পাইয়া দ্বার পর নাই স্বার্থ হইয়াছি। কিন্তু আমার পক্ষে আমেরিকা ত্যাগ করা সম্ভবিত্ব অসম্ভব। বৎসর খানেক পূর্বে কথাঙ্কলে আমার একজন ধনী বন্ধু আমাকে একমাত্র সমস্ত পরচ দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে অমাত্র করিধাছি। আমি আমার কাজে একেবারে ভূবিয়া আছি বলিলেই চলে। সে কথা আমার মন হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে, যে আপনাদের এই পত্র পাইবার পূর্বে তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বাহা হউক, আমি আপনাদিগের সম্মান করিতে পারিলাম না। আমি আমেরিকা ছাড়িয়া গেলে, টাঙ্কেলীর অস্ত্রাঙ্গ কতি কিছু হইবে না। কিন্তু আজকাল পরচ এত বাড়িয়াছে যে, সে সমুদয় আমি ব্যতীত আর কেহ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। হুতরাং আমার ইউরোপ ভ্রমণ এবং টাঙ্কেলীর সর্বনাশ এক কথা।”

আমার পত্র পাইয়া একজন লিখিলেন,—“টাঙ্কেলীর পরচপত্রের মন্ত তাবিবেন না। আমরা তাহার সমস্ত দাবি লইতেছি। প্রিয় বন্ধুগণ! আপনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ আপনার

পৌষ—৭

অল্পবুদ্ধিকালে বিদ্যালয়ের বাহের মন্ত আবস্তক টাকা দিবেন। তাহারা নিজেদের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। হুতরাং আর আপত্তি করিবার আপনার অধিকার নাই।”

কাজেই আমি ইউরোপ ঘাইতে বাধ্য হইলাম। আমার মনে অনেক কথা আসিতে লাগিল। আমার শৈশবের গোলামাবাদ, গোলামখানার অনশন ও অনিশ্রা, বৌবনের কঠোর জীবনসংগ্রাম—সর্বদা দারিদ্র্য ও নৈরাশ্রের সহিত পরিচয়—সকল চিত্রই সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠ বৎসের পূর্বে আমি কখনও টেবিলে বসিয়া বানা দাইবার স্বযোগ পাই নাই! ইউরোপ, লণ্ডন, প্যারি,—এ সকল স্থানকে আমি মানবদুর্ভাগ্য স্বর্ণাভাষা বিবেচনাই করিতে শিখিয়াছি। আজ আমি সেই স্বর্ণাভাষা বেড়াইতে চলিলাম! আজ আমি হলের পোষাকে, স্বাধা ও হুপের উপভোগ করিতে করিতে ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইব। আমার নিকট সবই স্বপ্নের স্রাব অলৌকিক বোধ হইতে লাগিল।

আরও দুইটি চিন্তায় আমি কষ্ট পাইতে লাগিলাম। মনে হইল—আমার জাতিরা আমাকে কি বলিবে? তাহারা ত বুঝিবে না যে, আমি বাধ্য হইয়া ইউরোপ ঘাইতেছি। তাহারা সহজেই ধরিয়া লইবে, আমার ‘চাল’ বাড়িয়াছে—আমি আজকাল বড়লোকের সঙ্গে মিশি, বড়মহলে চলাফেরা করি, সুখে স্বচ্ছন্দে বেশবিশেষ ঘুরিয়া বেড়াই, এবং নানা উপায়ে নামজাদা লোক হইতে চেষ্টা করি। তাহারা আমার হৃদয়ের কথা ত বুঝিবে না—তাহারা আমাকে কমা করিবে না। তাহারা বলিবে, ‘আনি আনি বানিকটা কাজ করিবার পর সকলেরই মাথা বিস্ফুটাইয়া যায়—সকলেই

‘ধরাকে সরা’ জ্ঞান করে। ঐ সেদিন যেখানে না, আর একজন নিম্নো অধঃপাতে গেল। ভাবিচ্ছাছিলাম সেই লোকটার দ্বারা নিম্নো-সমাজের উপকার হইবে। কিন্তু অল্পদিনের ভিতরই, সে সকলকে অগ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্ত করিল। সে যেন কি অপতপ জীব-বর্গ হইতে মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে। সে আজ আমাদের পূজ্য ঠায়! ওয়াশিংটনও দেখিতেছি সেই বাবুগিরি ও ‘নেতা’-গিরির পথ ধরিল। ভাই, কথায় বলে, প্রতিষ্ঠা ও ধনের আকাঙ্ক্ষা সাধু পুরুষদেরও ছাড়ি না। আর, একবার প্রতিষ্ঠার দিকে নজর গেলে কোন লোকের দ্বারা সংসারের উপকার হয় না। সুতরাং ওয়াশিংটনকেও পরচের খাতায় লেখ।”

এই শু শু শু লোক-নিম্নার ভয়, তাহা ছাড়া আমার নিজের মনকে প্রবোধ দিতেও অনেক সময় লাগিল। আমি না হয় টাংক্‌স্‌ বিদ্যালয়ের প্রভু তার মাসের প্রথম পত্র পাইলাম। না হয় ধরিয়া লইলাম, আমার অভাবে একদিনের টাংক্‌স্‌ কোন কতিই হইবে না। কিন্তু আমি এককাল না খাটিয়া, না ভাবিয়া থাকিব কি করিয়া? আমার কর্তব্যজ্ঞান কি নাই? আমি কি ভগবানকে ঠাকি দিতে বসিয়াছি? আমি এইরূপ বিচার লইয়া কি স্বার্থপরতা দেখাইতেছি না? কাজ ছাড়িয়া, থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—জীবনে আর কোন দিন অবকাশ ভোগ শু করি নাই।

যাহাউক, খাইতে বাধ্য হইলাম। ১০ই মে তারিখে রওনা হওয়া গেল। শ্রীযুক্ত প্যারিসন এবং অন্তান্ত ইয়াজি বহুগণ ক্রালে এবং ইংলণ্ডে তাঁহাদের কয়েকজন বন্ধুর নিকট আমাকে পরিচয়-পত্র দিলেন। তাঁহারা নানা স্থানে গিয়া আমার প্রভু থাকিবার

ও অন্তান্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া রাখিলেন। নিউইয়র্কে জাহাজে উঠিলাম। জাহাজে থাকিতে থাকিতে একখানা পত্র পাইলাম। লেনা আছে দুইজন রমণী টাংক্‌স্‌ বিদ্যালয়ের ক্রীড়াবিভাগের প্রভু গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা বহন করিবেন।

আমাদের জাহাজের নাম ক্রিস্টমাণ্ড। রেড্‌ টার লাইন কোম্পানীর ইহা একখানা বৃহৎ ও সুন্দর জাহাজ। পূর্বে আমি কখনও এত বড় সমুদ্র-পোতে চড়ি নাই। সুতরাং এদিক-ওদিক ঘুরিয়া জাহাজ দেখার কৌতুহল মিটাইয়া লইলাম। ভাবিচ্ছাছিলাম, জাহাজে নিম্নো বলিয়া আমাদের যথেষ্ট অসুস্থান ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের সেতর কিছু ভোগ করিতে হইল না। জাহাজের কাগেজেরা আমাকে চিনিভেন বৃত্তিতে পারিলাম।

জাহাজ ছাড়িবার পর হইতে বহুদিনের বোকা যেন একসঙ্গে আমার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। আমি আমার কাবরার মধ্যে যোগ ১৫ ঘণ্টা করিয়া ঘুমানিলাম। তখন বুঝিলাম, সত্য সত্যই আমার শারীরিক ক্রান্তি ও দুর্বলতা কত বেশী ছিল। এই ক্রান্তি একস্থানে এক বিছানার এতক্ষণ ঘুমাইতাম, অল্প দিনে রাজের মধ্যে কোন সময় নিদ্রিষ্ট কোন কাজই ছিল না। আমার জীবনে এই-রূপ অভিজ্ঞতা আর কখনও পাই নাই। আমি সেই বাস্যকথাগুলি শ্রবণ করিলাম—সেই যখন আমি একরায়ে তিন পল্লীর মেঝেতে শুইয়া অনশনে কাটাইয়াছি।

দশদিন জাহাজ চলিয়া বেশজিহাম বেশের ঘ্যাটোরার্ণ নগরে পৌছিল। সেদিন ওদেশে একটা ছুটির দিন ছিল। সকলেই আনন্দে উৎসবে মগ্ন। বেশজিহামের লোকেরা বৎসরে এইরূপ অনেক আনন্দের দিন লুপে কাটাইয়া

থাকে। সহরের বড় মাঠের সমুখেই আমাদের হোটেল। আমার কামরা হইতে সেই উদ্ভানের সকল দ্রব্যই দেখিতে পাইলাম। গল্পী হইতে নগরে কত লোক আসিয়াছে। নানা রংয়ের ফুল বিক্রী হইতেছে। স্ত্রীলোকেরা দুখের তাঁড় আনিয়াছে। ভাঙগুলি খুব বড় বড় ও চক্চকে। কুখুরে এই সকল বহিরা আসে। লোকজন গির্জায় মনো প্রবেশ করিতেছে। এই দ্রুত আমার চোখে সম্পূর্ণ নতুন ভগবতের বার্তা আনিয়া দিল।

কিছুকাল এই সহরে কটাইলাম। পরে কয়েকজন বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে হল্যাণ্ডবেশ দেখিতে গেলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন ইহুদি পুরুষ ছিলেন। আমাদের কাছাকাছি ইহারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রকর—ছবি আঁকিতে বেশ নিপুণ এই ভ্রমণটা অতিশয় সুবকরই হইয়াছিল। একটা প্রাণতন ধরনের নৌকায় করিয়া হল্যাণ্ডের বালু বালু বেড়াইতে পাঠিয়াছিলাম। এই উপায়ে এদেশের গল্পী-জীবন অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। খাল বিরাট গল্পীগ্রামগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা রটার্ডামে পৌছিলাম। তার পর বেগ দেখিতে গেলাম। সেখানে তখন ভগবতের রাষ্ট্রনীতিবিশারদেরা শান্তি-সম্মিলনে ব্যাপৃত। আমাদের বদেশীয় প্রতিনিধিরাও এ সভায় যোগ দিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদেরকে দেখিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

হল্যাণ্ডের কৃষিকার্য্য আমার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। এখানকার পশুপালনও বেশ দক্ষতার সহিত হইয়া থাকে। হল-টাইন-নগরের গাজী বলম ইত্যাদি ভগবত সর্বোৎকৃষ্ট মনে হইল। হল্যাণ্ডবাসী কৃষকেরা অতি সামান্য মাত্র জমি হইতে অত্যন্ত বেশী

পরিমাণ কলম উৎপাদন করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যে তাঁহাদের কলমতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পূর্বে আমি কখন ভাবিতে পারিতাম না যে অত কম জমি চরিয়া অত বেশী কল পাওয়া যায়। দেখিয়া বোধ হইল হল্যাণ্ডের এক ছোটক জমিও বাজে পড়িয়া নাই—সর্বত্রই হৃদয়ের চাপে আবাস হইতেছে। আর চারিদিকেই শতভ্রামল প্রান্তর তাহার মধ্যে ৫০০০০০ বর্গট গাজী আনন্দে বিচরণ করিতেছে। একদা গোচারণের মাঠ এবং হৃদয় কৃষিকার্য্য দেখিবার ক্ষমতাস্বরূপই একবার হল্যাণ্ড বাওয়া উচিত। হল্যাণ্ড হইতে আমার বেলজিয়ামে ফিরিয়া আসিলাম। এবারে র্যাটোরার্পে গেলাম না। ব্রসেল্‌সে অল্পকাল ছিলাম। এখানে ওয়াটসনীর বৃদ্ধকেই দেখিয়া আসিলাম। পরে ক্রালে চলিলাম—প্রথমেই প্যারিসগরে নামিলাম। পৌছিলামাত্রই এক নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। প্যারিস ইউনিভার্সিটি-ক্লাব আমাদের আমেরিকাবাসী কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ক্রালের বৃদ্ধরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এই নিমন্ত্রণ-সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। বৃদ্ধরাষ্ট্রের পূর্বতন সভাপতি শ্রীমুক্ত হারিসনকেও এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

জোহনাস্তে দ্যাবিথি বক্তৃতা হইল। হারিসন মহোদয়ের আমার কথা এবং টাকেরী-বিদ্যালয়ের কথা সভামধ্যে প্রচার করিলেন। আমার দ্বারা নিগ্রোসমস্যার বিস্তার মীমাংসা হইতেছে তাহাও তিনি কিছু বুঝাইলেন।

প্যারিসগরে আমেরিকার একজন নিগ্রো চিত্রকরের স্বঘাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি ক্রালে বেশ নাম করিয়াছেন বুঝিতে

পারিলাম সকল শ্রেণীর ক্রান্তীরাই ইহার কাককাণ্ডেব প্রসঙ্গা করিয়া থাকেন। এমন কি লাক্সেমবার্গ প্যালেসের চিত্রভবনে তাঁহার হাতের কান্না রক্তিত হইয়াছে। এত বড় চিত্রশালায় নিগ্ৰোহ স্থান হইয়াছে শুনিয়া ফ্রান্সের ইয়াক্সিরা আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন। এই নিগ্ৰো চিত্রকরের নাম হেন্‌রি ট্যানার। তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপও হইল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, ‘রূপেতে কি করে বাপু শুণ বহি থাকে?’ অসং গুণের দাস। বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে সৎসারের সকল-কেই বশে আনা যায়। একথা আমি আমার নিগ্ৰো স্রাস্তাদিগকে সৰ্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি। ফ্রান্সে ট্যানারের প্রতিপত্তি দেখিয়া সেই কথা আমার বার বার মনে হইতে লাগিল। ইউরোপের ৩ আমেরিকার কত শত লোক ট্যানারের অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহ ত স্বপ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই—‘ও গুলি কাহার তৈয়ারী?’ সে ব্যক্তির চামড়া সাধা কি কাল, সে কি ইংরাজ না জাৰ্মান, না আমেরিকার নিগ্ৰো?’ যে ব্যক্তিই কোন কান্না ভাল করিয়া করিতে পারিলে সে মানবসম্মানে প্রতিষ্ঠাপাত করিবেই। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে মানবজাতি বন্নিহ হইবে।

ক্রান্তীজাতিটাকে বড় হুঙ্গুপ্রায় বোধ হইল। ইহারা স্বভাৱে ও বিলাসে যেন হাবুডু হইতেছে। ইহাদের নৈতিক চরিত্র বড় বেশী উচ্চ অব্দের ভাবিতে পারিলাম না। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গসমাজ অপেক্ষা ক্রান্তী-জাতির এ বিষয়ে কোন উৎকর্ষ লক্ষ্য করা গেল না। অবশ্য ইহারা আমাদের অপেক্ষা পুরাতন জাতি। ইউরোপের বিশাল মানব-সমাজের মধ্যে থাকিতে থাকিতে ইহাদের

বিজ্ঞাবুদ্ধি ধানিকটা বেশী যাক্ষিত হইয়াছে। জীবনলঃগ্রামের এত বড় আবর্তের মধ্যে পড়িয়া বাচিয়া থাকিতে হইলে নানা প্রকার সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। আর সংগ্রাম করিতে করিতে নানাবিধ শক্তি নতুন অর্জিতও হইয়া থাকে। আমার স্বজাতিও কালে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে— সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রান্তীরা জীবন কিছু আগে আরম্ভ করিয়াছে—আমরা সংগ্রামে কিছু পরে আসিয়া দেখা দিয়াছি। এই যা প্রত্যেক। ক্রান্তীদিগকে সত্যবাদী মনে হইল না। তাহারা কথার মূল্যও বেশী স্বীকার করে না। এ সকল বিষয়ে উহারা আমেরিকার নিগ্ৰো অপেক্ষা উচ্চ স্তরের লোক কোন মতেই নয়। কোন কোন বিষয়ে নিগ্ৰোরাই উৎসবের অপেক্ষা বোধ হয় উন্নত। কারণ জীবন নয়। ইহাদের নাই বলিলেই চলে। ইহারা গো-বলদ ইত্যাদি জীবজন্তুর প্রতি বড়ই নির্দয়। ঘোড়ার উপর, ফ্রান্স ছাড়িয়া ঘাইবার সময়ে আমার স্বজাতির ভবিষ্যৎ সংক্ষেপে অতি উজ্জ্বল আশাই আমার চিত্ত অধিকার করিল।

প্যারি হইতে লণ্ডনে পৌঁছলাম। তখন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ। ইংলণ্ডের রাজধানীতে মহা সমারোহ চলিতেছে। পার্লামেন্ট মহাসভার অধিবেশন হুঁক হই-  
য়াছে। আমার ইয়াক্সি বহুগুণ প্রথম হইতেই ইংলণ্ডে অনেকের নিকট পত্র দিয়া রাখা-  
ছিলেন। আমি পৌঁছিয়ামাত্র সকলেই আমাকে বক্তৃতা দিতে অহরোধ করিলেন। আমি স্বাক্ষর কর্ত্ত বেড়াইতে আসিয়াছি এই আপত্তি তুলিয়া অনেকগুলি এড়াইতে পারিলাম। কিন্তু ছুই একস্থলে আমি বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। লণ্ডনে, বার্নিং-

হায়ে, ব্রিটলে বড় বড় লোকেরা আমাকে অতিথি হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের অনেক স্থানেই খোলামী নিবারণ সমিতির বন্ধু ও সভাগণের সঙ্গে আসাপ হইয়াছি। তাহারা আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্যই করিতেন সুস্থিতে পাড়া গেল।

ব্রিটলে এক মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করি। সেখানে রাষ্ট্র ডিক্টোরিয়া উপস্থিত ছিলেন। তাহার সঙ্গে আমাংয়ের পরিচয় হয়।

পার্ল্যামেণ্টের কমন্স-ভবনে একদিন ষ্ট্যান্‌লি মহোদয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি আফ্রিকার অনেক গল্প করিলেন। তাহাতে বুকিলাম, আমেরিকার নিগ্রোরা মাতৃভূমি আফ্রিকার কিরিয়া গেলে বড় সুখী হইতে পারিবে না। আমেরিকাকেই তাহাদের জন্ম-ভূমি ও মাতৃভূমি বিবেচনা করা কর্তব্য। আমেরিকাই তাহাদের এক্ষণে স্বদেশ, সুতরাং ভূবর্গ।

আমরা দুই চারিজন সম্রাজ ইংরাজের পত্নী-পুত্র বাদ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, আমেরিকার বেতাদ্ধ অপেক্ষা ইংলণ্ডের বেতাদ্ধেরা বেশী সভ্য ও সুখী। ইহাদের পারিবারিক প্রথা ও গৃহস্থালী আমার নিকট আদর্শ জীবনধারণ প্রণালী মনে হইত। ইহারা হুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে জানেন। কলের মত ইহাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হয়।

এদেশের চাকররাও বেশ ভরজা জানে। আমেরিকার ভৃত্য ত পাওয়াই যায় না। আর তাহারা মনিবগণকে সন্মান আদৌ করে না। আমেরিকার চাকরেরা বুকে যে, তাহারা

দুই চারি বৎসরের ভিতরই হয় ত মনিব হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ডের চাকরেরা ভিন্নদেহন চাকরই থাকিবে, সুতরাং বড় বেশী আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। কোন্‌ নিয়ম ভাল? তাহার উত্তর এ ব্যাখ্যা আর দিলাম না।

ইংলণ্ডের লোকেরা আইন ও শাসনের নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিয়া চলে। অতি সহজেই এখানে বড় বড় কাজ নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ইংরাজজাতি কিছু বেশী দীর্ঘ—সকল কাজেই ইহারা সময় অধিক লইয়া থাকে। ইহাদের থানা বাইতে খুব বেশী সময় লাগে। হিউ-শীল ইংরাজের উট্টা আমাংয়ের আমেরিকার ইয়াতি। ইয়াতিরা বড়ই তড়বড়—২৪ ঘণ্টা চলাফেরা করিতেছে—সর্বদাই উদ্বিগ্ন, শনবাত্ত—চুপ করিয়া অথবা সময় বেশী খরচ করিয়া কোন কাজ ইহারা করিতে জানে না। কিন্তু হিউশীল ইংরাজেরা গতিশীল ইয়াতি অপেক্ষা মোটের উপর কম কাজ করে কি?

ইংরাজেরা আমেরিকাবাসীর তুলনায় গভীর ও চিন্তাশীল। ইহারা কথায় কথায় হো হো করিয়া হাসে না বা কোন কিছু প্রস্তাবে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যায় না। ইহারা শাস্তভাবে বিষয়টা তলাইয়া দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করে।

ইউরোপে তিনমাস কাটিয়া গেল। পরে 'সেন্টলুই' জাহাজে ইংলণ্ডের শাস্যাপটন বন্দর হইতে আমেরিকা বাজা করিলাম।

ফ্রান্সে থাকিতে থাকিতে আমি ওয়েস্ট-জাভিনিয়া প্রদেশ হইতে দুইথানা পত্র পাই। এই প্রদেশের ম্যাকডেন নগরে আমার বাল্য-জীবন কাটিয়াছে। একথানা পত্র প্রদেশপট্টের কর্তা চার্লস টেন-নগরের শাসন-কর্ত্তায়া লিখিয়াছেন। আর একথানা চার্লস টেনের নিগ্রো ও বেতাদ্ধ সমাজস্বদের পণ্যমাত্র ব্যক্তিগত



ও জনসাধারণ নিষিদ্ধাছেন। হুইটাতেই আমাকে ইউরোপ হটেতে ফিরিবার সময়ে চার্লটন হইয়া বাইবার অছরোধ ছিল। আমি আমার বালা-লীলার নিকেতন হইতে এই নিষয় অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না।  
বথাসময়ে চার্লটনে গাড়ী হটেতে নামি-

লাম। প্রবেশ-চাক্ষুর তৃতপূর্ণ শাসন কর্তা এবং অদৃশ্য লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপরদিন বর্তমান শাসন-কর্তার গৃহে দরবার হইল। সেইখানে আমাকে লইয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

## সপ্তদশ অধ্যায়

### উপসংহার

অনেকেই আমাকে বিজ্ঞাপা করিয়াছেন, “ওয়াশিংটন মহাপ্রভু, আপনার জীবনের কোন্ ঘটনায় আপনি সর্কাপেক্ষা বেশী আকর্ষণিত হইয়াছেন?” এ প্রশ্নের উত্তর যেওনা। আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কারণ আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই বিষয়-কর। তবে সকল কথা মনে মনে গভীর ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত চার্লস্ উইলিয়ম এলিয়ট আমাকে যে পত্র লিখেন তাহাতেই বোধ হয় আমি সর্কাপেক্ষা বেশী বিম্বিত হইয়াছিলাম।

আমার ইউরোপ ভ্রমণের দুই তিন বৎসর পূর্বে এলিয়ট আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সালের মে মাসে অর্থাৎ আমার ৩৬৩৭ বৎসর বয়সে এই পত্র পাই। তাহার কিছুকাল পূর্বে আমি আটলান্টা-সম্মিলনে বক্তৃতা দিয়া সমগ্র আমেরিকায় প্রসিদ্ধ হইয়াছি।

এলিয়ট আমাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি অনারারি উপাধি দিতে চাহিয়াছেন। সেই উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে ছয় মাসে ঠাহানের উৎসবে

যোগদান করিতে হইবে। ইহাই তাহার পত্রের মর্ম।

আমেরিকার সর্কশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়! তাহার কর্তার নিকট হইতে সম্মানের দান লাভ! যে সম্মানের দান আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর ও সাহিত্য বীরগণ মাত্র পাইবার যোগ্য! আমি সত্য বলিতেছি এলিয়টের এই পত্র পাইয়া আমি বস্তুর বিম্বিত হইয়াছিলাম এবং আর কখনও হই নাই।

হার্ভার্ডের এম্, এ উপাধি গ্রহণ করিতে বথাসময়ে ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের কেম্ব্রিজ-নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সম্মানোৎসব সহিত আমার হস্তে এম্, এ উপাধিগ্রহণ প্রদত্ত হইল। পরে এলিয়ট-মহোদয় আমাকে এবং অন্যান্য বীহারা আমার মত ‘সম্মানের দান’ পাইয়াছেন তাহাবিশ্বকে একটা ভোজ দিলেন। সেই ভোজে অন্যান্য সকলের বক্তৃতার পর আমি বলিলাম,—

“মাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সম্মানিত করিয়া নিম্নোক্তান্তিকে সম্মানিত করিলেন। আপনারা আমাকে এই সম্মানের উপলক্ষ্য কেন করিয়াছেন তাহার অন্য আপনাই নাই। আমিই ইহার উপলক্ষ্য

হইলে যারপর নাই সুখী হইতাম সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আপনারা এই উপায়ে আমেরিকায় একটি প্রধান সমস্তার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কারণ মুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত ও ধনবান ব্যক্তিগণ কিরূপে অনিশ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে পারিবেন—তাহাই এক্ষণে সকল আমেরিক-সন্তানের একমাত্র ভাবিবার বিষয়। এই যে অনতিদূরে বীকনষ্ট্রেটের সুখ্যা প্রাপ্যদ সমুদ্র ঝাড়াইয়া রহিয়াছে, উহাদের অধিবাসিগণ কি আলাবামাপ্রদেশের জুলার জমির চাষাদিগের এবং লুসিভানা প্রদেশের ইন্দ্র আবাদের কুলীগণের তত্ত্ব নিঃশাল অহতব করিতে পারিতেছেন? মুক্তরাষ্ট্রের বদেণ-সেবকগণের এক্ষণে আর কোন কর্তব্য নাই। তাহার। আলোচনা করুন—কি উপায়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অবনত ও পরদলিত নরনারীর জনন উন্নত, শিক্ষিত ও ধনবান ব্যক্তিগণের কর্ণে পৌঁছাবে?

সেই সমস্তার মীমাংসা করিবার অন্ত হার্ডার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ত্রুতী হইয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার স্ত্রা কৃষ্ণাঙ্ক, উচ্চ শিক্ষাহীন নিগ্রোকে লক্ষ্যন করিয়া এধেনের নিরুন্নতি-দিগকে উর্দ্ধে তুলিবার পথ প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে হার্ডার্ড অবনত হইলেন না, অথচ আমাদের দরিদ্রের জ্বরে আশার সকার হইল।

আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার অবনত স্বরাজ্যিকে নানা উপায়ে উন্নত করিতে চেষ্টিত হইরাছি। আমার নগর্য পত্নির স্ত্রা কৃষ্ণাঙ্ক ও বেতাঙ্গদম্পত্যে স্নাত্তচাব বর্ধনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করা সিদ্ধাচ্ছে। এক দিন আমার

নিকট আমেরিকাজননী যোগ্য লাভ করিয়াছেন, আশঙ্কার এই গৌরবে ভূষিত হইবার পরও আমার নিকট সেইরূপ কর্ম ও চিন্তাই আপনারা আশা করিতে পারিবেন।

আমি আমেরিকার জাতীয় আদর্শকে নিজ জীবনের আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমেরিকার সকল জাতিতে সেই জাতীয় আদর্শেই গঠিত দেখিতে চাহি। আমি বেতাঙ্গের লক্ষ্য ও কৃষ্ণাঙ্কের লক্ষ্য দুইটা স্বতন্ত্র ভাবে দেখি না। আমার বিবেচনায় দুইএর লক্ষ্যই এক—দুই জাতিতেই আমেরিকার এক আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। দুইএর উন্নতি—অবনতি এক মাপ-কাঠিতেই বিচার করিতে হইবে।

আগামী ৫০ বৎসরের ভিতর আমার স্বরাজ্যি সেই আমেরিকার ছাঁচে ঢালা হইয়া উন্নত হইতে থাকিবে—সকল বিষয়ে বেতাঙ্গের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করিয়া বিকাশ লাভ করিবে। সমগ্র মুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সাধনার ভিতর বিরা নিগ্রোসমাজ শিল্পে, সাহিত্যে, সেবায়, ব্যবসারে, চরিত্রে ও ধর্মে পরীক্ষিত হইতে হইতে কালে আমেরিকা-জননীর স্বতন্ত্রতম স্বরূপ অধে পরিণতি লাভ করিবে।

আমি টাংকেনীতে বিদ্যালয় স্থাপনকালে গুঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে আমার বিদ্যালয় চূড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিবে। মুক্ত-দরবারের সভাপতিতে এই বিদ্যালয় ঘোষাইবার অযোগ্য হইবে না। আমার আশঙ্কা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালে সভাপতি ম্যাক্‌কিন্‌লি আটলান্টার আসিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এবং তাঁহার কর্মচারিগণ টাংকেনীতে পদার্পণ করিয়া যান। ১৬ই ডিসেম্বর ক্ষুদ্র টাংকেনী নগর যথা আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্ক

উভয় সমাজই সভাপতি মহানবের অভ্যর্থনা যোগদান করিল। আমার বিদ্যালয়ও যথেষ্ট সম্মিত করা হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয় বক্তৃতাকালে বলিলেন, “টাক্সের প্রতিষ্ঠাতা ব্রুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির অগ্রদূত জননায়ক। ইনি স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহার শিক্ষা-প্রচার, বাস্তবতা এবং মানব-সেবা সর্বত্র সুবিস্তৃত।”

প্রায় ১২ বৎসর বাগী কার্ণের পর টাক্সেরী বিদ্যালয়ে ব্রুকারের সভাপতি প্রথম পদার্পণ করিলেন। বিশ বৎসর পূর্বে একটা পোড়ো বাড়ীতে আমাদের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। তখন টাক্সেরী ছাত্র সংখ্যা ৩০ এবং শিক্ষক মাত্র একজন। আজ আমাদের ৬২০০ বিদ্যার্থী। তাহার ৩০০০ বিদ্যা ছেলেরা চাব করে। আমাদের এক্ষণে ৬৬ টা বড় বড় ইমারত—ইহাদের ৬২টা ছাত্রদের নিজ হাতে গড়া। আজ এই বিদ্যালয়ে ৩০ প্রকার কৃষি ও শিল্পবিষয়ক কার্য কর্তৃক শিখান হইতেছে। আমাদের পাশ করা গ্রাজুয়েট আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষকতা ও ব্যবসায় বা শিল্পের কর্ণে নিযুক্ত। প্রতিদিন আমার নিকট এইরূপ পাশকরা লোকের জন্ত এক ভাগিদার আসে যে, অনেককেই আমি নিয়োগ করিতে বাধ্য হই।

বৃহৎ সম্পত্তি ইত্যাদির মূল্য সম্পত্তি ২,১০০,০০০। এতদ্ব্যতীত নগদ টাকা আছে ৩,০০০,০০০। বার্ষিক ব্যয় আজ-কাল ৫৫০,০০০। এই টাকার অধিকাংশই গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া আহার হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০। আমেরিকার ২৭ প্রদেশে হইতে ছাত্র আদিয়া থাকে। এছাড়াও, আফ্রিকা, কিউবা,

পোর্টো রিকো, আর্মেনিয়া ইত্যাদি দূর বিদেশ হইতেও আমরা ছাত্র পাই। আজকাল আমাদের কর্তৃকারী ও শিক্ষকগণের সংখ্যা সর্বদমেত ১১০। ইহারায় স্থপরিবারে বাস করেন। বিদ্যালয়ের চতুঃশীমার মধ্যে এই রূপে অন্ততঃ ১০০ জন লোকের বসতি।

১৮২০ সালে টাক্সেরীতে প্রথম “নিগ্ৰো-মহা-সম্মিলনের” প্রবর্তন করি। তাহার পর হইতে প্রতিবৎসর নিগ্ৰোসম্মিলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৮০০-১২০০ পুত্র ও স্ত্রী নিগ্ৰো ব্রুকারের তির তির প্রদেশ হইতে টাক্সেরীতে বৎসরে একদিন করিয়া কাটা ইয়া যান। এই দিন নিগ্ৰোজাতির আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, নৈতিক ও অন্তস্ত সকল প্রকার উন্নতির উপায় আলোচিত হয়। এই সম্মিলনকে নিগ্ৰোমিগ্রেস জাতীর সম্মিলন বলা যাইতে পারে।

এই একদিবসব্যাপী নিগ্ৰো-মহা-সম্মিলনের দৃষ্টান্তে বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে নিগ্ৰো-সমাজের তির তির কেন্দ্রে ছোট বড় নানা প্রাথমিক বা পল্লী-সম্মিলনের অল্পটান আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ সম্মিলনের সাহায্যে নিগ্ৰোজাতির কর্তৃপক্ষি এবং চিন্তাপ্রকৃতি অসীম প্রচেষ্টা লাভ করিতেছে।

টাক্সেরীতে প্রতিবৎসর ‘নিগ্ৰো-মহা-সম্মিলনের’ পর দিবস আর একটা সম্মিলিত অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার নাম “কর্মী-সম্মিলিত”। ইহাতে নিগ্ৰোসমাজের নানা কেন্দ্রে বাহারা শিক্ষাপ্রচার কর্ণে ব্রতী আছেন তাহার পরামর্শ করিয়া পর বৎসরের জন্ত কর্তব্য স্থির করেন। সুতরাং ইহাকে নিগ্ৰো-সমাজের শিক্ষাসম্মিলন বলা যাইতে পারে। নিগ্ৰো-মহা-সম্মিলন যে কার্য ব্যাপকভাবে ও বৃহৎভাবে করেন কর্মীসম্মিলিত তাহার কার্য-

নির্ধারক সভা স্বতন্ত্র হইয়া সেই কাণ্ডাই কথকিত ক্ষুদ্রতর পতীর মধ্যে সমাধা করেন।

১৯০০ সালে আমি নিম্নোক্তাত্তির “ব্যবসায়-সম্মিলনে”র প্রসংগ করিয়াছি। এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বোষ্টননগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দূতরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে যে সকল নিম্নোক্ত ব্যবসায়ের ও বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া ভাব-বিনিময় করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই বৃহৎ অস্থান হইতেও ছোট ছোট প্রাদেশিক ব্যবসায়-সম্মিলনে”র জন্ম হইয়াছে।

এই গ্রন্থ আমি আমার ধন্যকৃষি ভাষ্যনিয়ম প্রদেশের রিচমন্ডে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম। আর ১৯০১ সাল। ৩৫ বৎসর পূর্বে এই রিচমন্ডনগর খেলাসী প্রণায় প্রধান কেন্দ্র

ছিল। ২৫ বৎসর পূর্বে, আমাদেব স্বাধীনতা-লাভের কয়েক বৎসর পর, এই রিচমন্ডনগরে আমি প্রথম ত্রিভুজ আনন্দের থাকিয়া রাত্তার পার্শ্ব কাঠের তক্তার নীচে মাটিতে শুইয়া কাটাইয়াছি। আর সেই রিচমন্ডে যেতান ও ক্রমশঃ সমাজঘরের সমবেত প্রোত্মগণীর নিকট আমি গুত রাত্রে আমার আশার বাণী প্রচার করিলাম। যে স্থানে ২৫ বৎসর পূর্বে একবার্ত্তিও আমাকে একটি আলু মাত্র দান করিয়া সুখা নিবৃত্তি করিতে দেয় নাই, আজ সেই স্থানের সহস্র সহস্র নরনারী, নিকিত সম্প্রদায় এবং প্রদেশ-রাষ্ট্রের সকল কর্ত্তারাই আমাকে আমার আপ্যায়ন ও সন্মান করিতে বাগ্র। কালের কি বিচিত্র গতি!

ঐশ্বর্যকুমার সরকার।

## সমাজ-বিজ্ঞান

কেবলি সন্ততি নৃত্য বিজ্ঞান উপাধি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানকার অধ্যাপক হ্যাডন (Haddon) এবং অধ্যাপক রিভার্স (Rivers) বিশেষে নৃত্য ও সমাজ-বিজ্ঞানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবকাশ কালে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া থাকেন। অসংখ্যকোর্ডে দেখিয়াছি ম্যারেট অষ্ট্রেলিয়ার দ্বীপের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। এখানে রিভার্স ইতি-মধ্যেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। হ্যাডনও শীঘ্রই নিউগিনি, বোর্নিও ইত্যাদি দেশে যাইবেন।

রিভার্স ভারতের চৌতা জাতি সংঘে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হ্যাডন কখনও ভারতবর্ষে

আগেন নাই কিন্তু ভারতবর্ষের জাতি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহার গ্রন্থাগারে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়ের “মুণ্ডা জাতির বিবরণ” দেখিতে পাইলাম। হ্যাডন বলিলেন “অশিক্ষিত এবং অসভ্য জাতি সমূহ শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতার আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টান প্রচারকগণের কার্যকলে সভ্যজাতি-পুঞ্জের চালচলন ইহারা শিখিতেছে। প্রকৃত অসভ্যজাতি আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। শিক্ষা ও সভ্যতার কোন সম্পর্কে না আসিয়া মানবজাতি কিরূপ অবস্থায় জীবন যাপন করে তাহা বুঝিবার সুযোগ ক্রমশঃ সূত্র হইতে চলিল। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভাবে অসভ্য

মণ্ডলে পক্ষাত্তর প্রত্যহ চড়াইয়া দাঁড়িতেছে ।  
কাজেই নৃত্য ব্যবসায়ীবিগের আলোচনার  
ক্ষেত্র ক্রমশঃ সতীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ।

এই অবস্থায় আবাদিগকে সর্বদা ব্যস্ত  
ধাকিতে হয় । এখন যদি আমরা দেশ  
বিদেশে অভিবাসন না পাঠাই তাহা হইলে  
অসভ্য অশিক্ষিত বর্গের আতির বৃত্তান্ত আর  
পাইব না । অনতিদূর ভবিষ্যতে বাচি অলভ্য  
সময় একটাও থাকিবে কি না সন্দেহ ।  
অসভ্যেরা যে পরিমাণে সভ্য হইতেছে নৃত্য  
ও সমাজ তত্ত্বের আলোচনাকারী পণ্ডিতগণের  
কর্মক্ষেত্র ততই অস্থবিধামনক এবং কঠিন  
হইয়া উঠিতেছে । এই কারণে আমরা যে  
বোঝানে আছি সকলেই বনধ্বজে সুস্থিয়া  
বেড়াইবার সুযোগ খুঁজিয়া লইতেছি । আজ-  
কালকার সুযোগগুলি ব্যবহার না করিলে  
সমাজবিজ্ঞানের যথেষ্ট অদ্যুতপত্তা থাকিয়া  
যাইবে ।

নৃত্যবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা-  
বার্তা হইল । হাডন বলিলেন, “পূর্ববর্তী যুগের  
সংগ্রাহকারেরা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন  
না । যে বাহা শুনিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ  
করিতেন । কোন এক আতির মধ্যে বেশী-  
দিন বাস করিতে তাঁহারা চেষ্টা ছিলেন না ।  
অল্প সময়ের ভিতর অনেকগুলি আতির  
বাহ্য আচার বা আকার দেখিয়া তাঁহারা বড়  
শীঘ্র কোন একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছিতে  
চেষ্টা করিতেন । আমরা এক্ষণে এই  
আলোচনা প্রণালীর বিরোধী । অধ্যাপক  
রিচার্ড এবং আমি এই তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে  
বড় সাবধান । এমন কি বর্তমান অবস্থায়  
কোন সাধারণ সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার  
করিতে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনই নাই  
এইরূপ আমাদের মত । আমরা বিতীর্ণ

ক্ষেত্রের আলোচনা ইচ্ছা করি না । কোন  
এক সতীর্ণ গভীর মধ্যে আমাদের পর্যবেক্ষণ  
আবদ্ধ রাখিয়া থাকি । সেই গভীর ভিতর-  
কাণ্ড সমস্ত প্রকার চিন্তা ও কর্ম এবং  
তাঁহাদের ক্রমবিকাশ বৃত্তিবাহর অস্তর যত  
লইয়া থাকি । সেই ঐতিহাসিক পার্যক্ষণ  
বৃত্তিতে দাঁড়িয়া তাঁহাদের জীবন গঠন ও  
সমাজ চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি  
সাধারণ নিয়মও আবিষ্কার করিতে পারি ।  
কিন্তু এগুলি বিশেষ রূপে আর্য না করিয়া  
অভ্যন্তর জাতির কোন অস্থঠান প্রতিষ্ঠানের  
মধ্যে আলোচ্য আতির তুলনাসাধনে প্রবৃত্ত  
হই না ।”

হাডনের মতে, অনেক সময়ে একপ্রকার  
সীতি দুই সমাজে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের  
মূলমন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন । হুতরায় তাহাদের মধ্যে  
তুলনা করিলে তুল হইবে যাত্র । ভাসা ভাসা  
সাম্য নিরীক্ষণ করিয়া নিয়ম প্রচার করিতে  
গেলে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে না । অথচ  
পূর্ববর্তী যুগের নৃত্য বসন্তেরা এই সকল ভাষা  
ভাসা সাম্যগুলিই পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং  
সেই গুলি হইতে সামান্য ধর্ম প্রচার করিতে  
যত্নবান হইতেন । প্রকৃতপ্রত্যবে তাঁহারা  
গভীর ভাবে এবং গুহ্য ভাবে পর্যবেক্ষণই  
করিতেন না । ফলতঃ তাঁহাদের গ্রন্থগুলি  
একধে সর্বদা পরিত্যক্ত । তাঁহাদের বর্ণনার  
উপর নির্ভর করা একেবারেই চলে না ।  
তাঁহারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন  
সেগুলি সভ্য কি না তাহা এক্ষণে পরীক্ষা না  
করিয়া কোন পণ্ডিত গ্রহণ করিতে পারেন  
না । বাস্তবিক পক্ষে এখন নূতন করিয়া  
সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে ।

সম্প্রতি ফ্রেডার (Fraser) একখানা  
বিরিট গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন । তাঁহার

চিরঞ্জীবনের অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। গ্রন্থের নাম "The Golden Bough" ইহা নৃত্তবাবিধক বিশ্বকোষ স্বরূপ। কিন্তু হাডন বলিলেন "ক্ষেত্রারকে পূজবতী যুগের সংগৃহীত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ফলে গ্রন্থ ঘণ্টে অসম্পূর্ণতা থাকিবা পিয়াছে। আজকাল সতর্কতার সহিত যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইতেছে তাহার দ্বারা ক্ষেত্রারের বিরাট গ্রন্থে সন্নিবেশিত যত সমূহ ঘণ্টে পরিমাণে বর্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে।"

হাডন অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দিলেন। প্রথম যুগের নৃত্তবাবিধেরা অস্ট্রেলিয়ার প্রদেশ সমূহে একই প্রকার রীতি নীতি ও সমাজ-জীবন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজকালকার নৃত্তন পর্যবেক্ষণে বুঝা যাইতেছে অস্ট্রেলিয়ার বৈচিত্র্য কত কম নাই। অস্ট্রেলিয়ার জনগণের বসতিও একেবারে বা দুইবারে সম্পূর্ণ হয় নাই। নানা কালে নানা স্থান হইতে অস্ট্রেলিয়ার জনসমাগম হইয়াছে।

আমি বিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি বিবেচনা করেন যে, জগতের সকল জাতিই কোন এক নির্দিষ্ট প্রণালীতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে?" ইনি বলিলেন "না, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ক্রমবিকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সাধিত হইতেছে। কোন এক জাতি অল্প জাতি হইতে পৃথক নিম্নে বিকাশলাভ করিতেছে বলিয়া তাহাকে সেই সমুদয় অপেক্ষা নিম্নে বা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। ক্রমবিকাশের রীতি যেন-কাল-পাত্ৰভেদে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রীতির পার্থক্য কোন বিনেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে না। জাতিপুঞ্জের ক্রমবিকাশের দ্বারা আমরা চিরকালই বৈচিত্র্য দেখিতে পাইব।

ইহাদের মধ্যে কোন একটা রীতিকে আদর্শ বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। কোন একটা প্রণালীকে অস্ত্রান্ত্র জাতির মাপকাঠি বিবেচনা করিলে অস্ত্রান্ত্র হইবে। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র উপায়ে স্বতন্ত্র মাপকাঠিতে পরীক্ষা করা কর্তব্য। যে সমস্ত সমাজকে অসভ্য বা বর্জ্য বলা হয় তাহার সভ্যপতাই অনেক সময়ে বর্জ্য নয়। তাহাদের মধ্যে সভ্যতা, যত্নশক্তি, শ্রমজ্ঞান, আধ্যাতিকতা এবং প্রভুত্বপরিমানেই বিদ্যমান। কিন্তু লোকেরা নিজেদের পরিচিত মাপকাঠি এবং আদর্শের হিসাবে অস্ত্রান্ত্র জাতিকে নৃশিমে ঘাইয়া কাহাকেও বা অসভ্য কাহাকেও বা অর্ধসভ্য বলিয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনা নিতান্তই ভ্রান্ত্যক।

যাহাঙ্গিণকে অসভ্য বা বর্জ্য বলা হইতেছে তাহারাই যে আজকালকার তথ্যাকথিত সভ্য-জাতি সমূহের স্তারই গড়িয়া উঠিবে একথা কে বলিতে পারে? যেন কখন ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিগত ২৫০০-২৬০০ বৎসরে নানা ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির সমাবেশে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই আকারের ক্রম-বিকাশের পথে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই সকল অবস্থা কি অস্ত্রান্ত্র স্থানের জনসমাজের পক্ষে ঘটিবে? তাহা নয়। অস্ত্রান্ত্র জনপদের নরনারীগণ বিভিন্ন আবেশের দ্বিতর বিভিন্ন অবস্থার দ্বিতর বিদ্যা বিকাশলাভ করিতেছে। তাহাদের ক্রমবিকাশের কোন কোন অধ্যায়ের দুই একটা ঘটনা হয় ত ইয়োরোপীয় ক্রম-বিকাশের কোন কোন অধ্যায়ের দুই একটা ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া দুইএর ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে কোন এক পূজ বা একই দ্বারা ঘেঁষিতে গেলে মহা জাতিতে পতিত হইতে হইবে। ভালো ভালো

সাম্য সেবিয়া দুই ঘন সমাজের জীবন ব্যতীত হাবিক একরূপ বিবেচনা করা কদাচ বিজ্ঞান সম্মত নহে।”

এই কথা বলিতে বলিতে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার নিবৃত্ত দুইটা প্রবন্ধ পাঠ করিতে দিলেন। একটার নাম The Soul of the Red Indians. এই প্রবন্ধে হাডন বুকাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমেরিকার লোহিত জাতির ক্রম-কথা বুঝিতে প্রচাণী হইলে জানা বাটবে যে তাহারা নিত্যজই বর্ধমান ও চক্রান্ত জাতি নহে। তাহারা পৃথিবী না পাইয়াও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মাশ্রয়। হৃতরাং জোর করিয়া তাহাদের উপর একটা নতুন ধর্ম্ম চাপাইবার প্রয়োজন নাই। পৃথ-ধর্ম্ম প্রচারকেরা নৃত্য ও সমাজতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া কর্ম্ম করেন। তাহাতে বিধমরকস উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম Ethics among Primitive Peoples এই প্রবন্ধেও হাডন তাঁহার প্রিয় মতবাদের প্রচার করিয়াছেন। তথাকথিত অসভ্যজাতিকে নীতিহীন মনে করা বিজ্ঞানসম্মত নহে। এই প্রবন্ধের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহা-দিককে পুঁঠানগণের পরিচিত মানকাঠিতে বিচার করা অসম্ভব। হাডন বলেন—

“In attempting to understand the laws which govern the conduct of Primitive peoples, western standard of morality must be entirely set aside, lest one fall into the error of past generations who proclaimed the savage to be an immoral or even un-moral beings.”

হাডন বলেন “এমন কি শিশু হত্যার প্রথাও নিত্য বর্ধমানতা বা অমাহুতিকতার

পরিচয় নয়। আমাদের পরিচিত ইয়োরোপীয় সমাজে কিবা অসভ্য প্রাচীন সমাজে হযত ইহা দৃশ্য। তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। কিন্তু ভগবতের বহুমান পড়িয়া রহিয়াছে যেগুলি এখনও এধানকার মত রাষ্ট্রাধীন হইতে পারে নাই। সে সবল স্থানে ধান্যভাব ঘণ্টে—লোকেরা জীবন-সংগ্রামে অস্থির। সেই সমাজে শিশু হত্যা কি নিত্যজই অসভ্য? বরং তাহাদের বিচারে উদাহইয়া দাখিলপোর যাকী। সেইরূপ লিখপুত্রার কথাও দ্রা বাউক।

ইহা কি সত্য সত্যই বীভৎস? মনে করুন কোন জাতির মধ্যে ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য নষ্ট হয় নাই। তাহারা ইন্দিতে আকারে মনোভাব প্রকাশ করে। অবশ্য বর্ধমান্য পরিবর্তে চিত্রাঙ্গির সাহায্যে কথাবার্তা বলে। তাহারা নৃষ্টি কর্তা, নৃষ্টি শক্তি বুকাবার ক্ষম-যে চিত্র আঁকিবে তাহাকে নীতিহীনতা বা অজ্ঞানতার পরিচয় স্বরূপ গ্রহণ করিব কেন? আমরা সাহিত্যে যাহাকে “নৃষ্টি শক্তি” বলি তাহারা চিত্র আঁকিয়া তাহা বুকাইতেছে মাত্র। আজ আমরা সাহিত্যের অধিকারী হইয়া চিত্র-ভাষা বর্জন করিয়াছি বলিয়াই কি চিত্র হিনাবে উন্নত হইয়া পড়িয়াম?”

তাঁহার পর নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা উঠিল। হাডন বলেন “এবিষয়ে সুনির্ভিত কিছু বলিয়া উঠা কঠিন। আজকাল সকলেই নিগ্রোবীর বুকার ওয়ালিংটনের দৃষ্টান্ত নেন। বুকারের জায় আরও কয়েকজন নিগ্রো আছেন সত্য। কিন্তু ইহাদের ভিতর নিগ্রো রক্ত বেশী কি সত্য ইয়োরোপীয় রক্ত বেশী তাহা নিচায় করা অসম্ভব। কাজেই আজ-কালকার নিগ্রো নায়কদের সেবিয়া খাটি নিগ্রো সমাজের ভবিষ্যৎ বিচার করা বিজ্ঞান-সম্মত কি না সম্ভেহ।”

ছুই তিন বৎসর হইল লগনে বিশ্ব-মানব-পরিষদের সভা আচুত হইয়াছিল। তাগতে ছাউনও একজন খুদ্বর ছিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন “ছুই চারি জন বেহাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতাঙ্গ ও পীতঙ্গ লোকের আলাপ পরিচয়ে কি আন্তিগত স্রীতি স্থাপিত হইতে পারে? অগতের প্রত্যেক জাতিই অপর জাতিকে যুবায় চোখে দেখিয়া থাকে। জাতি মাত্রেরই এই স্বভাব। বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গেরা বিশেষ অহঙ্কারী। অল্প কয়েক লোকজনকে ইহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতে চাহে না। এই স্বাভাবিক বিরোধ ও বিবেকের আবহাওয়া কাটাইয়া উঠা কি সম্ভবপর? তবে এইরূপ সভাসম্মিলনে বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্থিতি হয়। আমি

অন্ততঃ এই কারণে এইরূপ বিশ্বমানবের পরিষদের সম্মিলন পছন্দ করি।”

শেষে দ্বিজানন্দ করিলাম “আপনি কি বিবেচনা করেন যে ইয়োহানেশীয় সভ্যতার একটা প্রাচ্য তরঙ্গ আদিগাছে?” ইনি বলিলেন “মোটেরই না। আজ কাল কোন কোন লেখক বা শিল্পী প্রাচ্যরূপত সন্ধে আলোচনা করিতেছেন বটে। প্রাচ্যের মহিমা কীৰ্ত্তিত হইতেছে দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা ছাড়া আমাদের জাতীয়জীবনের কোন অঙ্গই গঠিত বা পরিবর্তিত বা কণ্ঠস্থ নিয়ন্ত্রিত হয় না। আমাদের সমাজ-জীবনের উপর নূতন আদর্শের প্রভাব বিস্তার অতিশয় দুঃসাধ্য।”

শ্রীশিক্ষার্থী।

## সুকবি ৮রজনীকান্ত ও তাঁহার কবিতা \*

বঙ্গের সাহিত্য-সংসারে কালের জুহুটা পতিত হইয়াছে :—রমেশচন্দ্র গিগাছেন—চন্দ্রনাথ তিরোহিত—কালীপ্রসঙ্গের চিত্র। বুড়ী-গলাতীরে নিভিতে না নিভিতেই জাহ্নবীতীরে বাণীর মানসদস্তান রজনীকান্তের চিত্র। জলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যাকাশ হইতে একে একে জ্যোতিষ্মান জ্যোতিষ্কগুলি তিরোহিত হইতেছে। বাণীর মন্দিরতল হইতে দেউটী-গুলি একে একে নিভিয়া যাইতেছে।—জানি না ভবিষ্যতে আরো কি আছে! ঐ বঙ্গের ক্ষুদ্রানে চিত্তাধ্ব-পিঞ্চল অন্ধকার ছন্দ ছন্দ করিতেছে। শৃঙ্গল পেচকের অমঙ্গলধ্বনি ভেদ করিয়া কিল্লীহুল অজ্ঞাতবরে ডাকিতেছে। বনকুম্মি মানমূল্য নিশ্পন্দভাবে

ধমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাণীর মন্দির-তলে এ সম্ভার কীসর শব্দ বাজেনি—সকলে যেন বিষয়ায় প্রীতিমা বিশর্দ্বন করিয়া স্তূপ-প্রাণে, সন্তপ্তকণ্ঠে বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অজবিশর্দ্বন করিতেছে। আজ আমাদের সাহিত্যসংসারে কালের ছায়া পতিত হইয়াছে।

রজনীকান্ত আজ চিরবিজ্ঞানলাভ করিয়াছেন “আজ তিনি ভূবিত এ মরু ছাড়িয়া চির-বাহিত খাতার রসালনম্বনে উপনীত হইয়াছেন, বঙ্গীয় পিতার ককণাচম্বনে তাঁহার তপিতভিত্ত শীতল হইয়াছে।” কবি সাধক-প্রবর রামপ্রসাদের স্তায় আকর্ষ জাহ্নবীজীবনে ঝাড়ায়ে নেবের সঙ্গীতগুলি সাহিতেছিলেন আমরা কুলে দাঁড়াইয়া তাঁহার ককণাময়ের



আশ্বিনপ্রসঙ্গ প্রেমচণ্ডল বননবানি বেধিতে-  
 ছিলাম। সাধক অগ্রহ ইতিহাসে আর আশা-  
 বিসর্গে কিহিতে বলিগা নিজে জননীকোলে  
 কিহিয়াছেন। কবি—দুঃখ দাতনাকে সেব-  
 কবে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। মরৎকে সখা  
 বলিয়া তাহার স্বপ্নে ভর করিয়া স্বপ্নে  
 কিহিয়াছেন। আর তাঁহার অস্ত পিতার  
 ভোরণ বুলিয়া গিয়াছে। অহো! পিতাকে  
 ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার কণ্ঠ যে বিধীর্ণ  
 হইয়াছিল। “পাপ তাপ দুঃখ মোহ বিষয়তা,  
 নিরাশা, নিকটম সব ঘেহের সহিত অবসান  
 হইয়াছে।”

সামুখ্যিক বা ভগবানের অল্পগুণীত জনই  
 এই সংসারের সঙ্গে সঙ্গে সকল কৰ্মভোগের  
 শেষ করিবার অবসর পায়। পাপী এবং  
 দাতার দুগুণিত সন্তানই অল্পমাত্রার কৰ্ম-  
 ভোগের অস্ত নির্দিষ্ট থাকে। বধ্যময়ের  
 কোন ভক্ত কোন সাধক আর পর্যন্ত বিনা  
 অগ্নিপরীক্ষাতে দাতার চরণপ্রাপ্ত হয় নাই।  
 সেই বীর—সেই জয়ী—যে অগস্ত্যের এই  
 পারেই সকল পরীক্ষা ব্যথা ও কৰ্মভোগে  
 উত্তীর্ণ হয়।

রজনীকান্ত তাপস্যতনার চরম ও পরম-  
 সীমার উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি  
 একদিনও অভিজ্ঞ হন নাই—একদিনও  
 বিরক্তি বা অসন্তোষ দেখান নাই। দাতার  
 সকল দান বৃকে ধরিয়া সকল করিয়াছেন।  
 আর তাই তিনি জয়ী—তিনি মুক্ত।

### জীবনী

রজনীকান্ত, পাবনা জেলার অন্তঃপাতী  
 ডাকাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ  
 করেন। ইহার পিতার নাম ৮৩কপ্রসাদ  
 সেন; এবং দাতার নাম ঐন্দ্রজ্ঞান মনোমোহিনী

দেবী। রজনীকান্ত বাল্যে বৈদ্যবাংলাে জন্ম-  
 গ্রহণ করেন। ইহার পিতা মুন্সেফ ছিলেন।  
 কান্ত নিজে পিতার একমাত্র জীবিত পুত্র  
 হইলেও তিনি বহুবৈধিত্য পরিবারে প্রতি-  
 পালিত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা  
 বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এল ছিলেন। কান্ত  
 ছাত্রত্বপে বিশেষ কৃতকাৰী ছিলেন না তাহা  
 নহে। তবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যের সঙ্কীর্ণ-  
 সীমায় তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে ভাল  
 বাসিতেন না। কাব্য কলাবিজ্ঞা ও শ্রীতর্জী  
 তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি  
 সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।  
 রামসাহীই প্রধানতঃ তাঁহার শিক্ষা ও কণ্ঠের  
 ক্ষেত্র ছিল। কান্ত প্রথমজীবনে কোন কষ্ট  
 পান নাই—তাই আঞ্জীবন তাঁহার চরিত্র  
 প্রভুত্বভার মধুর ছিল। দাহারা শৈশবে,  
 যৌবনে, জীবনে সুখসৌভাগ্যের রস আশ্বাস  
 করিতে গাঁর না—তাহারা জীবনে আর  
 প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে না। বিভ্রান্ত্যাস  
 শেষ করিয়া কবি রামসাহীতেই তাঁহার বীর  
 পিতৃব্য ৮ গোবিন্দনাথ সেন (তাৎকালিক  
 বড় উকীল) মহোদয়ের চরণচিহ্ন ধরিয়া  
 জলকোট ওকালতি আরম্ভ করেন। প্রথম  
 প্রথম পদার ভাল হয় নাই। তাঁহার ‘উকীল’  
 নামক ব্যঙ্গ কবিতাটী তাঁহার তাৎকালীন  
 অভিজ্ঞতা হইতেই লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ  
 হয়। কিন্তু জামিদারী এবং অন্যান্য আর  
 থাকার অবস্থা বহুলই ছিল। কান্ত মিতব্যরী  
 ছিলেন না এবং আপনার ব্যবসায় প্রতিও  
 তাঁহার বিশেষ অগ্রহাস ছিল না—কাব্য এবং  
 সঙ্গীতেই মাতিয়া থাকিতেন—কাষেই শৈব-  
 কালে অর্ধের বিশেষ অভাব হইয়াছিল।  
 কান্তের পারিবারিক জীবন বড় সুখের ছিল—  
 সংসারে যে শোক তাপ ছিল না তাহা নহে

—তবে তিনি মনের অলৌকিক প্রকৃতিসত্য সব মধুস্বপ্ন করিয়া রাখিতেন।

### রাজসাহী জীবন

রাজসাহীতে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও আদিপত্য ছিল। তিনি শুধু কবি নন—সুগায়কও ছিলেন। রাজসাহীর জনসাধারণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অন্ধারত নখনে চাহিয়া রহিত। কবিতাও, গানে, হুমিষ্ট হাস্যোদ্বোধক কথোপকথনে, চরিত্রের মাদুধে ও সখ্যাবহারে রসিকরসাহন কান্তকবি, রাজসাহীর অধিবাসী-গণের মনোরঞ্জন করিয়া মাতাইয়া রাখিতেন। এককথায় তিনি রাজসাহীর শিকিত-সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। রাজসাহীর প্রত্যেক উৎসব, আয়োজ ও সাধারণের ক্রিয়াকর্মে কান্ত প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহার চারিপাশে, মংদির চতুর্দিকে শিষ্টবৃন্দের স্তায়, চক্রস্থার চতুঃপার্শ্বে তারাগণের স্তায় সর্ব্বথা ঘেরিয়া থাকিত।

হুজুমার মতি বালক হইতে বিজ্ঞতম বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, তাঁহার সকলেই বদ্ধ ছিল।

রাজসাহী উত্তর বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগর, এবং আধুনিক সভ্যতার অন্ততম কেন্দ্রখল। তথায় বিংশতি শতাব্দীর বিদেশীয় সভ্যতার ও আমাদের দেশের ও সমাজের পতিত অবস্থার সর্ব্ববিধ রূপ, রঙ্গ ও সংকীর্ণতা বিদ্যমান আছে। কবি, আপনার স্বভাব-মূলত অন্তর্গমনের কলে, তাহার সকলগুলিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কবিতায় তাহাদের প্রতি কষ্টকটাক্ষ করিয়া আপনার আন্তরিক বৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

### চরিত্র

রজনীকান্ত মিষ্টভাবী, বিনয়ী, জনপ্রিয়, আশ্বত্থাগী, সরল ও হৃদয়িক ছিলেন। তাঁহার অদারিক ও বিনীত ব্যবহারের কথা রাজসাহী

সাহিত্য সম্মিলনীতে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই বিজ্ঞাত আছেন। সভ্যগণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কবি তিনি চারি ঘণ্টাকাল ব্যাপী সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, সকলে কবির পান্থ্য বা ক্রান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া—কেবল—“চলুক—চলুক” করিতেছিল। এতদ্বিধ,—রাজসাহী পুস্তকাগারের ঐ সাহ্যাসভাতেই বালিকাকল্প ও বালকপুস্ত্রেরদ্বারা সঙ্গীত ও আবৃত্তি করাষ্টা আপনার সরল ও উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাতে কেবল দীনতা ও অনহংকার দেখিয়াছিলাম—কোথাও অবিনয় বা সংকীর্ণতার বেধামাত্র দেখি নাই।

রজনীকান্তের হৃদয় যথার্থই কবিত্ববৎ ছিল। শুধু তিনি কবিতা রচনা করিতেন না—তাঁহার জীবনই কবিতা। সে জীবন, দেহমমতা, দয়াদীনতা, প্রকৃতিভা ও শান্তভাবে অস্তিত্ব-শিকিত ছিল। ইহা তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই উদ্ভাসিত হইয়াছে। এতদ্বিধ তাঁহার বন্ধু-শ্রীতি, মাতৃভক্তি, আপন ধর্মে অনুরক্তবিশ্বাস যেক-বিষয়-শুক-প্রাঞ্জে যথোচিত প্রভা ও ভক্তি ইত্যাদি অল্পসংগত ছিল। পাঠকগণ,—ভাত্রের “দেবালয়ে” দেবাত্মক শশিগব বাবুও হানপাতালে বৃত্তান্তদাণারী কবির সাক্ষাৎ-কার ও কথোপকথন সন্থে প্রবঞ্চী পড়িলেই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও উচ্চতা এবং প্রাণের দীনতা বুঝিতে পারিবেন।

### সাহিত্যপ্রীতি

কবির পিতা ৮ গুরুপ্রসাদ সেন ছকবি ছিলেন। কবির ভগিনী শ্রীমুক্তা অম্বুজানুশী হলধিক। তাহা মাসিকপত্রের পাঠক মাঝেই জানেন। হুত্তরায় কান্তের কবিত্ব অনেকটা সহজাত। কিন্তু তাহা প্রথম বয়সে

বিশেষ ব্যক্তি ছিল না। তাই তাঁহার সাহিত্য-জীবন একটু বেশী বহুসেই আরম্ভ হয়। কান্ত আশৈশব কবিত্বের ছিলেন। শৈশব হইতেই রচনা ও রচনাবোধের ক্রমতা ছিল এবং বাল্যকাল হইতেই—বহুগুণের মনোরঞ্জনের মত আনন্দভোগ করিতে পারিতেন।—কিন্তু শিকার পরিবর্তির আগেই তিনি রচনা জনসমাজে প্রচারের মত ব্যাকুল হন নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কারের যথোচিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কাব্যরচনার হাত বেন। এবং তাহার অনেক পরে প্রকাশ করেন। কান্ত জানিতেন—“স্বরে মেওয়া কলে।”—তাই তাঁহাকে সারা বৌবন অপসার্য প্রেমমন্ডিত রচনা করিয়া হাত পাকাইতে হয় নাই। তাই কান্তকে—বৌবনে রচিত রচনা-ব্যতী অধ্যাতিগত নামকে অধ্যাতিগত হইতে উঠাইবার ভেঁয়াতে প্রৌঢ়বয়স কাটিয়া যায় নাই। রজনীকান্ত একেবারেই ব্যাতিগত বরণ করিয়াছিলেন। কান্তের প্রতিভাকে সারা তামসীরধনী ঘরিয়া বগোত্তের স্তায় লতার পাতায় বেড়াইতে হয় নাই। একে-বারে উদ্ধার মত জলিয়া ঘোমমার্গ আলোকে বিবীর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পুরাতন বাসিকপত্রে কান্তের কবিতা পাওয়া যায় না—কোনরূপ অক্ষবর্ণের কথাও শুনা যায় না। অথচ পুস্তক প্রকাশের আগেই গানগুলি বজের গৃহে গৃহে স্নিত হইত। গানগুলি পানীর মত পদ্মানদী পার হইয়া উড়িয়া আসিয়া আমাদের গৃহচূড়ায় ক্লেবন করিতেছিল—কে জানিত যে তাহারা কান্তকবির পিত্তর কাটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। কতকগুলি বুক আছে বাহার কল ধরে বড় দেবীতে, কিন্তু ধন ধরে—তখন বসোখলো। গাছ ত'রে ধরে এবং দুখা-রনে পরিপূর্ণ। রজনীকান্তের কবিত্ব ঐশ্বর্যের।

রজনীকান্তের সাহিত্যসেবার প্রথম উল্লেখ-লতাপণের মধ্যে—রাগসাতীর ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার বৈষ্ণবের আর (কল্যাণী বাহার নামে উল্লেখ) শ্রীকৃষ্ণ গোপালচন্দ্র নাট্যচীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

### মানসিক দুঃখকষ্টাদি

১০১২ সাল হইতেই কবির বাস্তবিক হয়। এই সময় তাঁহার মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। নানারূপ সাংসারিক স্বাট তাঁহার মনকে উদ্ভাত করিয়া রাখিয়াছিল। কবি কিছুদিন আগে শোক পাইয়াছিলেন। রইচী কুহুম কলিকা, বাহা চুটিতে পারিত, প্রাণভরা আশা সমাধিপাশে মুহুরে করিয়া গিয়াছিল; তাহাদের যেননা-বিষাক্তিত স্মৃতিটী কবির গল্পবুকে ভাসিতেছিল, কবি—“তোমারি মেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া”—বলিয়া বুঝা সাধনা দিতেছিলেন মায়। এই সময়ে তিনি দুর্ভোগ্য কণ্ঠশালে জড়িত হইয়া পড়েন এবং তথ্যাতীত নানারূপ অতীত স্মৃতিতে প্রাণ তাপিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এমম্বরে তাঁহার বাস্তবসাধনা পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। এই সময়ই কবি তাঁর ভাষাআলা মনন করিয়া, নিজে হলাহল পান করিয়া আমাদিগকে গীতুধারা দান করিতেছিলেন। কল্যাণীর কবিতাগুলি তাঁহার এই সময়কার জালাময় অজ্ঞতপ্র, স্মৃতিবিষাক্তিত হরয়ের ছাপ লইয়া উঠিয়াছে। কত কথা তেন করিয়া তবে এই গান গুলি—“রাধা হুল ধ'রে উঠেছে হুটিয়া

জনম শোণিত পাত

তাহে—অস্ত্র তলিছে শিশিরের মত

পোহাবে দুঃখ রাত ৮

কবি ঠিকই বলিয়াছেন—“What they learn in suffering they teach in song.”

## সাহিত্যিক ও সাংঘাতিক ব্যাধি

১৩১০ সালের ভাঙ্গ চইতে জর ইত্যাদি রোগে ভরসাহা হ'ন। তখন হইতে মাঝে মাঝে হুহু থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে শীড়িত হইতেন। এই ভাব ক্রমে ১৩১৪ সালে কঠকত হয়। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন অত্যধিক সক্রীত চর্চা। চইতে এই ব্যাধির উৎপত্তি। প্রথমে দিবাঙ্গগে, পরে রাত্রিশায়ীতে চিকিৎসা হয়—তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। পরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন কটকে বাস করেন। পরে কঠকত চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার্থ যান। ডাক্তার চিকিৎসকগণ ব্যর্থ-প্রথর হইলে কালীতে বালাজী মহা-রাজের নিকট অবশোধিতিক চিকিৎসার্থ যান। এই সময় কবিবরের অর্থাভাব এতই বেদী হয় যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার কীর্তি-তত্ত্ব 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র স্বত্ব (Copy-right) সামান্য ২০০/- দুই শত টাকা মাত্র মূল্যে গুরুদাস বাবুর নিকট বিক্রয় করিতে হয়। তাহাতেও নিফল হইলে সেবে পুনরায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্বের কণের সহিত চিকিৎসার ব্যয় ইত্যাদির জন্য আরো লণ বৃদ্ধি পাইয়া কবির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজে, চিকিৎসা ও গুরুদাস কোন ক্ষতি হয় নাই। আমাদের দেশে বহুদিন আগে, আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ ভাগ করিয়াছিল। তখন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিপত্তিও জন্মে নাই এবং বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি লোকের বিশেষ ভ্রাতাও জন্মে নাই। তাই কবির প্রতি বখার্ব কর্তব্য সাধিত হয় নাই। এত দুঃখের মধ্যে এই সাধনাটুকু পাইয়াছি যে,

বঙ্গদেশ কান্ত কবির এই অবস্থার বখেই সহ্যহুতি দেখাইয়াছে।—না দেখাইলে তাহার পাপের মার্জনা ছিল না। বেশ কবির নিকট অক্ষয় বণে বন্ধ—তাঁহার পরিশোধ হয় না।—তবে বঙ্গদেশ যে অকৃতজ্ঞ নহে—তাঁহার জন্য একটু সাধনা পাইয়াছি।

আজ ৪৮ মাল কাল বয়সে বাংলার কাগজে কাগজে—পত্রিকা পত্রিকা, ফুল কলেজে, পথে ঘাটে—এক কথা ঐ গুরু—ভোগতত্ত্ব কবির কথা। দেশে কবি ত অনেক ছিল—আছেও অনেক—কিন্তু তাহারও সহিত ত দেশের প্রাণের এমন স্নেহময় যোগ দেখি না।

দীনেশচন্দ্র, রামেন্দ্রচন্দ্র, সারদাচরণ ইত্যাদি সাহিত্যিকগণ তাঁহার পুত্রকগুলির প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া, বঙ্গভবর মহারাজ মনোমুগ্ধচন্দ্র নন্দী বহাদুর ও কুমার পরমেশ্বর রায় সন্তানগুলির শিক্ষার ভার ও 'অভয়া' ও 'আনন্দময়ীর' প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া, ঐহুত্ব এস, কে, লাভিড়ী 'অমৃতের' মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়া এবং মিনার্ভা বিরাটার Benefit night এ ১২০০/- টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া কবির শেষ দশায় বখেই উপকার সাধন করিয়াছেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ ও নবীন লেখক তত্ত্বগণ গুরুদাস করিয়া এবং তত্ত্ব কবিগণ মুমূর্ষু কবির চরণ তলে হৃদয়ের আত্মিক তত্ত্ব-ধারা ঢালিয়াছেন। বন্ধুগণ সন্তর্পণপ্রাণে অঙ্গ-বর্ধন করিয়াছেন। কবি যে কেমন দেশের বুকের সম্পত্তি—দেশের বঙ্গ পত্রের সহিত এ মহাত্মকের মূলগুলির যে কত নিবিড় বিমল—তাঁহা আজ রজনীকান্ত গ্রন্থান করিয়া জানাইয়াছেন।

### হাসপাতাল জীবন।

জীবনের সকল অংশ অপেক্ষা কবির এট হাসপাতালের রোগশয্যাগত জীবন উজ্জলতম, পুতুতন এবং সর্বাশেখা বিশেষতঃ পূর্ণ। কবিরূপের মধ্যে কালের সূতার একটু বিশেষত্ব আছে। পিতার আত্মান গুনিয়া, লোকান্তরের অস্ত্র প্রস্তুত হইবার আবেশ পাইয়া কবি কিছপে খাতার চরণে আত্মনিবেশন করে তাহা সাহিত্যঅগতে অপূর্ণ সামগ্রী। ইংরাজ কবি Keats তত্ত্ব বহলে, এইরূপ বিখ্যাতার আত্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁহাকে বাসনার পরশয্যাতেই ঘুমাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। রজনীকান্তের কিছু বাসনার রস পরিশাক প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাই তিনি সহজেই আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন।

পাণী বৃত্তাকে ভয় করে, সাধু জীবনকেই ভয় করে—জীবনের স্রাস্তি, জীবনের পদ-অশনই সাধুকে সর্জন। সত্ত্বত রাগে—বৃত্তাকে তাহার। বিশেষ ভয় করে না। দুর্জল-চিত্ত পাণী মরণের পুরাণত বিযাণধনি গুনিয়া মর্দবেদনার আতুল হয়। সরলচিত্ত সাধু মরণের বার্তাকে পিতার আত্মানপত্র বলিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করে—এবং আপনাকে তৎসত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া লয়। আর পিতাও সেইরূপ পুত্রকেই প্রত্যক্ষভাবে কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে সংবাদ দেন। পাণীর স্রাঘ তাহাকে সহসা অতর্কিত অবস্থায় বন্ধকরে বেশ ধরিয়া লইয়া যান না। রজনীকান্ত অনেকদিন আগে হইতেই পিতার আত্মান-লিপি পাইয়াছিলেন—কবিতার পে ডাব অনেকস্থলে পরিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কবি সম্পূর্ণ-রূপে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তগবক্তিতার মর

হইয়াছিলেন। কবি ডাক গুনিয়া মনকে বলিতেছিলেন।—

“হরি বেলাবেলি ঘাটে ঘাষি,

সোজা হ’য়ে চলবি,

তবে,—খুলে ফেল তোর পাখের বেড়ী,

কেলেগে তোর তোপুদী।”

(অভয়া)

তাঁহার কণ্ঠ নীরব হইয়াছিল। স্বপ্নও চলনশক্তি লোপ পাইয়াছিল। শব্দ ইঞ্জিয়ার শক্তিই হ্রাস পাইয়াছিল। আত্মার উজ্জলতার সঙ্গে সঙ্গে বেগের কান্ডি বাহ্য দৃশ্য তিরোহিত হইয়াছিল ‘বাহ্যকে নন্দনভরে ধেখুতে হ’লে বাহিরে চোখ দুটো কাণা করিতে হব’, বাহার ‘শীতল মনোরমায়ন যন্ত্রণানির ভান’ তুলিতে হইলে, আপন কর্কশ গান নীরব করিতে হব, ‘বাহার পরশমনি স্পর্শে আপনাকে সোনা করিতে হইলে, বিরাগ শঙ্কাধাতে, আপন চামড়াখানা অশাড় করিয়া লইতে হব’, তাহার সাধনা, ইঞ্জিয়ার শক্তি যত কমে, বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ যত লোপ পায়, ততই ভাল হয়। রজনীকান্ত অন্তরের দিকেই নমনকে কিরাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্থল অড়দেহ ক্রমে জ্ঞানচৈতন্যময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ‘বার প্রেমসাগরে মনকে একবার কেলে ধিলে চিরন্তরে হারিয়ে যাব’—“একবার পড়লে যে আনন্দনীরে ডুবে যায়, আর তাগে না,—” সেই প্রেমসাগরে মনকে ডুবাইয়া দিয়া-ছিলেন।

কালের দীর্ঘতা ও আত্মসমর্পণ অমাহুতিক বলিতে হইবে—সমুদ্রে বনন “ভীম বৈভবশী উত্তম তরঙ্গবারি তুলিয়া তিত্তীহুঁকে আত্মান করিতেছিল”—বনন—“কাল পরোনিধিতাওব নগুনে প্রীতি পলে প্রাণিবারে চাব”—আর হুঁরে —“তৈরবে বাজিছে—বিকট ভয়াবহ গর্জনে

মরণ বিধাণ" (অভয়া)—কবি তখন নীর অবিলম্বে চিত্ত—“বংশন লগ্নের শব্দাশ্রুত হইয়া, পঙ্গবচিতে বাস্তব সেবা করিতেছেন—ভাষ্যের প্রাতি কবির জ্ঞেয় নাই—তারা ত একবার, ক্রীড়ার মত করণকালীন করিলেই—পতঙ্গনা নত করিয়া পনতলে লুটিয়া পড়িবে। মরণরথ আনিয়া; দুঃস্বপ্নে অপেক্ষা করিতেছে—তখন কান্ত, মরণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া—বাস্তব শেষ ব্রজনীর মঙ্গল আশ্রিত করিতে—ছিলেন—শেষবিন্দু বন্ধরক্ত পর্বাঙ্গ মাতৃচরণে ঢালিতেছিলেন—মরণ মন্তক নত করিয়া কবির সাধনা ও তত্ত্বি দেখিয়া তত্ত্বিত হইয়া গিয়াছিল।

অনুষ্ঠের অশ্রুনিম্পাতাহত হইয়াও কান্তের কবিত্বতরু শেষবিন্দু জনপ্রিয়োপিত দিয়াও যে কুহুমগুলি ছুটাইয়া গিয়াছে—তাহা চিরদিন বন্ধমাতার কর্ণে অগ্নানুস্মার মাত্ররূপে চলিতে থাকিবে। এই সময়কার কবিতাগুলি যেমন শোকারহ, তেমননি প্রাণপূর্ণ ও আত্মনিবেদনের ভক্তিরূপে অভিসিক্ত। শোচনীয় অঞ্চল জ্বলয়। “শোচা চ প্রিয়দর্শনা • • • পত্নাপানিবা নোষণেন মরুতা স্পষ্টা লতা-মাংসী।” কবির ‘মহার বিচার’—‘অবোধ,’ ‘প্রার্থনা,’ ‘পাটনি,’ ‘দ্রাব্য’ ‘মৃত্যু-লক্ষী’ ইত্যাদি কবিতা বাহা প্রবালী, ভারতী, ব্রহ্মভাক্ত, দেবালয়, মানসী প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং ‘অভয়া’ নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আছে। তাহা পাঠ করিয়া অশ্রুসমরপ করা যায় না। অমৃত বাহা অমৃতের স্তায় উপাধের এবং বাহা আল বলের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে—তাঁহাও এই কৃত্যন্যায় রচনা।

কবির কর্তৃ নীহব হইয়াছিল—লিখিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতেন। পলায় মধ্যে ক্ষত অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিলে ট্যাক্সিটমি করিয়া চিকিৎসা আশ্রয় হয়। ডাক্তার বাড় নামা উপরে কবির জীবন কিছুদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রুর উপায়ে নলদ্বারা নিখাল গ্রহণ করেন হইত—অতিক্রমে আহার করিতেন। শেষে তাঁহাও নিফল হইলে—কিছুমাত্র আহার করিতে না পারিয়া কবির জীবনান্ত হয়। এই সময়কার অবস্থা কিত্তপ ভয়াবহ ও শোকারহ, দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়, শিশুর প্রেতও ধমকিয়া দাঁড়ায়—মাহুঘের ত কা কথা। পরিপূর্ণ সংজ্ঞা ও বিচারশক্তি লইয়া ক্ষত্রবিকৃত পনিত দেহ বহিরা, মরণের অপেক্ষার বসিয়া থাকা—কখন শেষ আত্মান আসে—হতে হতে আশঙ্কা সম্পূর্ণ—ইহা হইতে ভয়াবহ দৃষ্ট আর বিবে নাই। স্বকবি কান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত কবির রোগ-শয্যাপার্শ্বে দেখা করিতে যাইলে—কবি কাদিয়া বলিয়াছিলেন—“তাই কান্তিক। আমার পথের লক্ষন নাই। তুমি মরণের আগে কানে হরি হরি বলো তাই। আমি পে নাম কানে লইয়া ভরণুর হইয়া বেন মরিতে পারি।” ইহা কি অশ্রু অতীত নহে?

ভারপূর্ণ পত ২৮শে ভাত্র রাতি ৮৪০ সময় আমাদের প্রাণের কবির পবিত্র আত্মাবিহ্বল দেহের পিঞ্জর কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। কান্ত রাধিবা গিয়াছেন—ব্রজমল্লিক, • বিধবা পত্নী ও চারি পুত্র শচীন্দ্র, জ্ঞান, কিত্তি ও শ্রীয। ব্রজমল্লিক মল্লিক, ও ভাগ্যবতী পত্নীর আল কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহাদিগকে সাহায্য

• কান্তের ব্রজমল্লিক এই মাসের শেষে লক্ষ করিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া যায় এবং ৪১০ কান্তিক তারিখে কাদিয়াবে বেহতাপ করিয়াছেন।

বিষায় কিছু নাই। ঐ পরভের প্রভাতে, সন্ধ্যায় বিশ্বজনীন আগমনীর উৎসব বাণীর চারিদিকে বাজিয়া উঠিয়াছে। বাহ্যিক সর্বত্র বিধায় বিধা চিরবিজয়া ক্রয় করিয়াছে— তাহাষের করণ ক্রমের আশ্ব মিগ্ধমিগ্ধ আকুলিত করিয়া তুলিবে। তাহাষের সর্বজন-ধন বাহ্যর চরণে আত্মনিবেশন করিয়াছে— তাহাষ তাহাষি চরণে সাত্বনা সন্ধান করন। পিতার মহাবাদর্শে গঠিত, বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার শচীন, জ্ঞান, ক্ষিতি—লিঙ্গা ও চরিত্রে উন্নত হইয়া তাহাষের নহনজল দূর করক।

ইহাব্যতীত কান্ত গ্রামিয়া গিয়াছেন,— অমূল্যধন—তাঁহার বাঈ, কল্যাঈ, অমৃত অক্ষর আনন্দভাণ্ডার। ইহারাঈ মোকাত্তুর্য বহুজননীর নহনজল মুছাইবে। কবির “অভয়া” মহারাজার প্রেমে একাশোমুখ। আনন্দময়ী প্রকাশিত হইয়াছে প্রচারিত হয় নাই। ‘বিজ্ঞান’ বহু। \*

রজনীকান্তের কবিত্ব।

রজনীকান্ত প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে স্থান না পাইলেও—ইনি যে বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের অগ্রগণ্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কান্ত সীতিকাব্যের কবি, ইহার রচনা প্রতিভা বর্ধা Lyrical, কান্তের কবিতাগুলি খাটী বাংলার খাটী সম্পত্তি। এই কবিতাগুলিতে কোনও বিশেষ প্রভাবের রেখামাত্র দেখা যায় না। এমন কি ইহার কবিতাতে কোনও স্বদেশীয় কবিরও বসিষ্ট অহুত্বের গন্ধ পাওয়া যায় না। রজনী-কান্তের গান শুনিয়া—সাবকবর গ্রামপ্রদায়, কমলাকান্ত, বেগমদী, দামরধি ইত্যাদি পুরাতন কবিদের কথা মনে পড়ে।

“শেষের সে দিন মন, করবে স্মরণ” এর কবি বা “বাণের ফোলাতে উঠে, দাঙ্ক বটে” ইত্যাদি এবং কিকির চাঁদ, নীন বাড়িল ইত্যাদি লেখকের কথা স্মরণ হয় কিন্তু আধুনিক কবিরের কথা কচিৎ মনে পড়ে। কেহ কেহ বলেন—ইহার কৌতুক সঙ্গীতগুলি—বিদ্যেন্দ্র-বাবুর অহুত্বের রচিত। অহুত্বের অর্থ যদি স্মরণ বা ছন্দের অহুত্ব হয়—তাহা হইলে তিনি প্রণে করিয়াছেন সত্য—কিন্তু প্রণে অহুত্ব অংশের সহিত কোন মিল নাই।

উভয় কবি উল্লিখকের প্রার্থনা লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির কাপুত্বতা সত্ত্বে রংস্ত করিয়াছেন, কপট হিন্দু, পাশ্চাত্যশিক্ষাদুগ্ধ বাবু ইত্যাদি ব্যক্তি-গণকে লইয়া রক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এককল ব্যাপার মেনে অতি হান্তকরভাবে চোখের সম্মুখে এত বেশী দেখা ঘাইতেছে—বাগাতে সকল কবির মনেই এগুলি স্বাধীনভাবে প্রোথিত হওয়াই স্বাভাবিক। এবং সকল কবিরই কর্তব্য। ঐকল ব্যক্তিদিকে সমাজে স্থগার পাত্র করা। রজনীবাবুর রচনা বিদ্যেন-বাবুর অহুত্বের ত নহই—পরন্তু রজনীবাবুর কৌতুক রচনা অধিকতর সমিচ্ছাপ্রণোদিত। রজনীকান্ত দেশের ও সমাজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরতে পরতে তাঁহার অহুত্ব প্রবেশ করাইয়া তাহার ঘোষণা মানি গৌরব পূর্ণবেশন করিয়াছিলেন—একবিশুও তাঁহার দৃষ্টি এড়-ইতে পার নাই। কবি কোন নীচে বা সংকীর্ণতাবেকত্বর খালাস দেন নাই। এবিষয়ে তিনি আধুনিক সকল কবির উপরে।

কেহ কেহ বলেন—কান্ত—সাবন সঙ্গীত-গুলিতে রবীন্দ্রনাথের অহুত্ব করিয়াছেন,

\* অভয়া প্রথম প্রকাশিত না হইলেও তাহার কবিতাগুলি পাঠের বহিরা এবং ‘বিজ্ঞান’ প্রকাশিত না হইলেও তাহার পাণ্ডুলিপি বহিরা প্রকাশ লেখকের জাগো ঘটাইয়াছিল।

এবিষয়ে বলা যায়;—চন্দ্র ও অক্ষর ছাড়া আর কিছু অঙ্কুরণ করেন নাই। তবে সাহিত্যে বাচ্যের যখন যুগ চলিতে থাকে তাহার একটু না একটু প্রভাব, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সমকামী লেখকের উপর পড়ে। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কিছু পড়িয়াছে কি না তাহা মনোনিবেশ বিবেচনা করিবেন। 'অমৃত'—রবীন্দ্রনাথের অঙ্কুরণে রচিত বলিয়া একটা কথা শোনা গিয়াছিল। কিন্তু তাগারও বিশেষ ভিত্তি নাই।—এসম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অভিমত তুলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। "অমৃতের কবিতাগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রণালীতে রচিত বটে—কিন্তু এই দুই পুস্তকে বিস্তর প্রভেদ। কবিতাতে, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সহিত স্বরসিক বৃন্দাঙ্গীর উপহাস-প্রহসার একটা তীব্র বিবাক্ত জালা আছে—অমৃতে তাহা নাই।—ইহাতে কেবল সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সজ্জনবৃত্তিই দেখিলাম।" (উপাসনা) মূলকথা রজনীকান্তের কবিতা-শক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে প্রাণোদিত ও আয়-নির্ভর। কাহারও অঙ্ক পদ্যক অঙ্কসরণে নহে। ইহা বৃত্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকসিতা উঠিয়াছে।

কান্তের কবিতা, বহুদেশে সর্বাঙ্গেক্ষা সর্ববাদিসম্মতরূপে সমাদৃত হইয়াছে। পথে ঘাটে সর্বত্রই কান্তের সঙ্গীত শুনা যায়। অনেক কান্তের গান জানে—কিন্তু ঐ গানের রচয়িতা যে কান্ত তাহা জানে না। গানগুলি নিজেই আত্মনির্ভর—স্বনাম যন্ত্র। বাহারা স্বনামপ্রসিদ্ধ নহে—তাহাদিগেরই পরিচয় পিতার নামে দিতে হয়। কিন্তু কান্তের সঙ্গীতগুলি—আপনার ধনেই গৌরবাধিত—তাহাদের সহিত রচয়িতার গৌরবাধিত নাম

যোগ দিয়া তাহাদের চরিত্রতার কতিপয় করিতে হয় না।

কান্তের রচনার এইরূপ সর্বজন প্রিয়তার কারণটা কারণ আছে। প্রথম ইহার সরলতা ও আত্মরিকতা। ইংরাজী লেখকের কথার—কবিতাগুলিতে "The profoundest interests of life are spoken of directly, nakedly and sincerely." কান্তের কবিতা সরল প্রাণের সরল উচ্ছ্বাস। ইহাতে 'জটিল জ্ঞানের পরতা' কোনও থানে নাই। হৃদাহতমধুর প্রাণের নয় বারতা কে না ভাল-বাসে? ভাবার স্বচ্ছতার অন্ত ভাব কোনও থানে চূর্ণোন্মাদ বা তুরপিপাসা হয় নাই। আর কালকার বাংলার কবিদের দ্বারা ভাবের প্রচ্ছন্নতা বা বক্তব্য বিষয়টিকে ঘুরাইয়া বলিবার প্রকৃতি কান্তের ছিল না। অর্থ-বোধের অন্ত মস্তভেদ হওয়ার আশঙ্কা আদৌ নাই। ভাবগুলি নির্মল সরলীতে বিকসিত কমলের দ্বারা ভাসিতে থাকে—মুক্তার দ্বারা অন্তলজলে বাস করে না।

আমকালকার কবিরী অবাস্তব অন্ধরী-রাশি বাস করেন। তাঁহারা পরীর পাথর বাতাস, চকোরের তান, প্রমোদিত প্রাণ, দূরগত মঞ্জীরধ্বনি, নীপকুণ্ডের যোমাক মাকড়সার জাল, চম্পকলার মায়াপুরী ও তারার মালা ইত্যাদি কতকগুলি অম্পদ অবাস্তব পদার্থ একত্র করিয়া, নহনে একটা সোনালী স্বপন আনিয়া অবশ বিভোর হুবহুকে অর্থহীন কণ্ঠহীন ইচ্ছাজালে কেঁদিয়া দিতে চাহেন। আর রজনীকান্ত এই বাস্তবতারোত্তর কঠোর কর্তব্যের কথা, প্রাণের ভীষণ পরিণাম, যন্ত্রতার অনিবার্য পতন, অলসতা, বিলাস ও লালসার চরম পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া এবং যাত্রার অন্বেষ ও অন্বেষ নিবেশের ভেদী-



নিম্নে 'নিলাজ জনমে কঠিন আশাত'—  
করিয়া ঐ সোনালী বশনের রাগা হইতে  
জগতের কর্ণক্ষেত্রে ও ধ্বংক্ষেত্রে জনমকে  
আনিয়া তাহাকে পূর্ণ প্রবৃত্ত ও সত্যাহুৎসাহ  
করিয়া তোলেন ।

আজকালকার কবিরের অনেকে তাহা  
প্রকাশের ক্ষমতা কবিতা লেখেন না—গোপন  
করিবার ক্ষমতা লেখেন । এবং তাহার ভাল  
বলেন—তাঁহারা বুঝিয়াছেন বলিয়া ভাল  
বলেন না—পাছে লোকে নির্দোষ বলিবে  
বলিয়া গভীরার্থবোধের ভান দেখান । কিন্তু  
এক বিশ্বও বুঝেন না । দেখক, না বুঝিতে  
বিবার ক্ষমতা, অলঙ্কার, অগুণ ছন্দবদ্ধের  
আয়োজন করেন—তাঁহাতে পাঠকের সে দুর্গ  
তর করা হ্রাস্য নহে । এবং সন্দেহও  
তাই । এবং কতকগুলি অচপাতি, ভ্রান্ত-  
লিপি ও নিলালিপির জুরীয়া বাক্যবিত্তার,  
কতকগুলি হাইরোটারিকিস্ থাকিলেই—  
লেখক দ্বীপ । পাঠক না পড়িয়া বেকুব  
হইবার ভয়ে, আকৃতি দেখিয়াই দস্ত দস্ত  
করেন ।

এই সকল লেখকের রচনা গ্রীহীনা তাই  
তাঁহারা আপনায় নিজ ব্যাভাবিক সৌন্দর্য্যে  
কবিতা, বা পরকৃষণে বাহির হইতে সন্ধ্যা  
করে । তাই নানাতপ ওড়নী কাচনী অলঙ্কার  
বসনকৃষণে আপনায় ব্যাভাবিক সৌন্দর্য্য  
চাকিয়া—বেশভূষার চকিত চমকনে—নমনে  
চমক ও আবেশ আনিয়া দিয়া বিদ্যুতের মত  
চলিয়া যায় । তাঁহাদের কবিতা কৃষণ পরে  
না—কৃষণই কবিতাটিকে অবলম্বন করিয়া  
ফুলিতে থাকে । এইরূপ বাহ্য আয়োজনের  
মানে একমাত্র রমণীকান্তই আত্মা রক্ষা  
করিয়াছেন । তাঁহার কবিতা কোন বাহ্য-  
বস্তুর দ্বারা ধার ধারে না—তাঁহার অন্তঃসৌন্দর্য্য

এত যে, অপরার্থ কৃষণলঙ্কারে তাঁহার অনাবিল  
সৌন্দর্য্যের আবরণ সঙ্ঘ করিতে পারে না ।  
তাই নরসৌন্দর্য্যে অকৃত্রিত অনবদ্যুত উবার  
আননের দ্বারা জনমাকাশে জাগিয়া উঠে ।  
কবিতাগুলি কখন বন্ধনবাসে, কখন ছিন্ন-  
কৃষণে, কখন বা বসনে পরিপূর্ণের বসানো ।  
কবি বলিয়াছেন—“কিমিহি মধুরাণাং মণ্ডনং  
নাকুতীনাং ।”

দ্বিতীয়তঃ ।—কান্তের কবিতা—তাঁহার  
চরিত্রের দ্বারা বিনয়সে সিক্ত । যে হীন  
নমনে চাচে, যাঁহার কল্পিত চিত্রকলাগুলি-  
বন্ধ, যাঁহার প্রাণ শুধু ধূলার সূতায়ে কাঁদে  
তাঁহাকে ধূল্য হইতে কে না তুলিবে ? তাঁহার  
আঁশি মল অকলে কে না মুছাইবে ? কবির  
সাধন-সঙ্গীতগুলি প্রায়ই সব আত্ম-কথা  
প্রসূরিত—কিন্তু তাহা আত্মপ্রতিষ্ঠা নহে—  
আত্মনিবেদন—আত্মবিক্রয় । এক চন্দের প্রতি-  
বিম্ব যেমন লক্ষ স্থলে প্রতিফলিত হয়—সমু-  
দ্রের একটি তরঙ্গ যেমন বহু পিরিয়ছে,  
প্রতিফলিত হয়—কান্তের আত্মব্যক্তি । তেমন  
প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তরালে আপনায় সহ-  
যোগী খুঁজিয়া পায় ।

তৃতীয়তঃ ।—কবির কল্পনা উজ্জ্বলে সন্ধ্যা  
ও আদিপতা । কবির কল্পনা পাঠকের জ্ঞান-  
সীমা পার হইয়া উঠে নাই । কবির কল্পনা  
পাঠকের কল্পনায় স্থিত হাত ধরাধরি চলিতে  
পারে । কান্তের কল্পনা নিত্য কল্যাণী গৃহ-  
লক্ষীর দ্বারা সন্ধ্যার পথে ঘাটে, মন্দিরে  
তুলনীতলে নিত্য কাশ করিয়া বেড়ায় ।  
অপরী বা পরীর দ্বারা নমনে ঘোরাবেশ  
আনাইয়া যেখানে, পূর্ণনে পূর্ণনে, বসন  
উড়ায়, কৃষ্ণ ছায়া বেড়ায় বেড়ায় না ।  
কান্তের কল্পনা—পুরুষা সংশ্লিষ্ট উইজরীর  
দ্বারা—তাঁহার উপরী উরুর দ্বারা নহে ।

কান্তের প্রতিভা, গৃহবলিদ্রুত কপোত, শিখী, নীলকণ্ঠের মত গৃহচূড়ার ও মন্দিরদ্বারে বৃক্ষন করিতে থাকে—তরুত পক্ষীর (Sky Lark) স্তায় পক্ষদ্রুত বাগনার সৃষ্টি দরিদ্রা যোম্যমাগে উদ্যত উড়িয়া যায় না।

চতুর্থতঃ—রজনীকান্তের কবিতা বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। বঙ্গালী ভাষাতে নিজের প্রাণের কথা খুলিয়া পায়। রজনীকান্তের কাব্যে আশ্রয়—“মায়ের ঘরের শুধু ভাত, মায়ের ঘরের বি দৈন্দ্রব, মায় বাগানের কলার পাত”—প্রচুর পাইয়া থাকি—গোলাও কানীয়া, চাঁ বিসহৃত কোথাও নাই—তাই বলিয়া ভিক্ষার চালও কোথাও নাই।

পঞ্চমতঃ—কান্তের কবিতাগুলি শুধু কবিতা নহে—তাহা গানও। শুধু-কবিতার প্রবাহ থাকে না—তাহা তড়প কিংবা বীর্জিকার মত—কিন্তু যে কবিতা—সকীত তাহা গন গন নারিনী নদীর স্তায় কণ্ঠে কণ্ঠে তরঙ্গ চলিয়া ভ্রমরের ঘাটে ঘাটে আবাত করিয়া চলিয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ—সকল শ্রেণীর উপযোগী কবিতা রজনীকান্তের কাব্যে পাওয়া যায়। শুধু ইহাতে ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা নহে—ইহাতে হাসির উৎসও উদ্ভূত। শুধু স্বর্ণের বার্তা নহে ইহাতে মর্ন্ত্যের বার্তাও যথেষ্ট আছে—শুধু প্রবাসের সংবাদ নহে ইহাতে গৃহের গোপন কথাও আছে। রজনীকান্তের কবিতা এক কথায় :—

“True to the kindred points of  
heaven and home.”

তাঁহার কবি প্রতিভার পরিপূর্ণের যেনলা-

বেশে যদিও মর্ন্ত্যের মেঘ ভ্রমণ করিতেছে—  
শিরে কিন্তু দ্রালোকের আলোক বাজিতেছে।  
এতদ্বির কবির কবিতার সর্বত্র স্বপ্নভাব ও  
স্বকৃতি, অহিংস ও অত্যাচারবীর্য ভাবের প্রতি  
কটু কটাক—সর্ববিধ ভ্রাতা, স্ত্রী, জাল ও  
বিত্রোহিতাবের প্রতি তীব্র-কথাধাত, পাঠক-  
বর্গের মন আকর্ষণ করিয়াছে।

রজনীকান্তের কবিতা পড়িবার আগে  
ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র, অভিধান বা বিশেষ  
কাব্যাদি পড়িবার প্রয়োজন হইয়া উঠে না।  
রজনীকান্তের ছন্দ মধুর ও নানা শ্রেণীর,  
কিন্তু দুশাঠা নহে,—রস উপাধের কিছু  
দুশাঠা নহে, অহংপ্রাস, ব্যঞ্জন ও প্রশাব-  
গুণ সর্বত্র কিন্তু সন্দর্ভ সঙ্গতির বিনিময়ে নহে।  
কোথাও পদবাহুল্যে পুষ্প লুকাহিত হয় নাই।  
হাস্তরস প্রচুর আছে—কিন্তু সমগ্র বিশেষ  
বা ব্যক্তি বিশেষের মনঃসীড়ার কারণ কোথাও  
হন নাই। রজনীকান্তের কবিতাে ধূস্র নাই  
—অনল আছে—সে অনলে আবার তাপ  
নাই—আলোক আছে। রজনীকান্তে মধু  
আছে—মস্ত্রা নাই—গন্ধ আছে কাটা নাই।  
ত্বপক উপহার ভাবে কোমলা কবিতা  
কোথাও কুলা বা নত্যাকী হইয়া চলে নাই।  
তুই একটী কবিতার, বাহাতে ত্বপকামির  
প্রবেশনের প্রয়াস পাইয়াছেন (যথা ভ্রমর  
পবন, পাণবান্ধি (দেবালয়), তেলে যাই  
ইত্যাদি)—তাহাই তাঁহার স্লেষ্ঠ কবিতা  
নহে। আর সর্বত্র স্বতন্ত্রতা বৈকল্যের স্তায়  
রচনগলিক বন্ধ রাখিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালিদাস রায়—বি, এ।

## বিলাতী-সমাজে দারিদ্র্য ও কো-অপারেটিভ আন্দোলন

দারিদ্র্যসমস্যা বীমাংসা করিবার মিউনি-  
সিপ্যাল আয়োজন দেখিলাম। জনসাধারণের  
আবীর্ন আয়োজনও দেখিলাম। এই সকল  
দান-ভাণ্ডার সাহায্য-সমিতি, অনাথ-ভাণ্ডার  
এবং সেবাপ্রদায় ব্যতীত বিলাতে অন্তপ্রকার  
আয়োজনও আছে। সেগুলির নাম কো-  
অপারেটিভ বা সমবায় সমিতি। এদেশে  
কো-অপারেটিভ আন্দোলন বরিত্রের ক্রমশঃ  
নিবারণের অন্ততম মহাহুঁটান।

ম্যাক্টোর সমবায় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল।  
বাস্তবিক পক্ষে এই নগরে শিল্পব্যবসায় সম্বন্ধীয়  
যন্ত্রপ্রকার অহুঁটান ও প্রতিষ্ঠান দেখিতেছি  
তাহাতে সগুনকে ইংলণ্ডের প্রধান নগর  
বলিতে ইচ্ছা হয় না। ম্যাক্টোরকেই ইংরাজ  
জীবনের কেন্দ্র বিবেচনা করা উচিত।  
ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ম্যাক্টোকে, ইংলণ্ডের  
দারিদ্র্যও ম্যাক্টোকে, আবার দারিদ্র্য  
নিবারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়গুলি আবিস্কৃতও  
হইয়াছে ম্যাক্টোকে।

এখানকার Co-operative Wholesale  
Society এক অপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহা একটা  
সাম্রাজ্য বিশেষ। যেমন বড় বড় ফ্যাক্টরী-  
গুলি একদিকে দারিদ্র্যের আকর তেমনি এই  
বিশাল সম্বন্ধী-সমবায়-মণ্ডলী দারিদ্র্য  
নিবারণের মনোবধ। এই অহুঁটানই বহু  
দরিত্রের গর শুকবুকে আশা ধরিত্য  
তুলিয়াছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার  
অন্ত এত বড় হৃদয়াক্ত দুর্গ দেখিয়া রোমাঞ্চিত  
হইলাম।

ম্যাক্টোর নগরের কতকগুলি হুঁহুং  
অট্টালিকা সমবায় সমিতির কার্যালয়  
অবস্থিত। অট্টালিকাগুলি সবই সমিতির  
সম্পত্তি। নূতন নূতন অট্টালিকা নির্মিতও  
হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে নগরের এই  
অংশকে সমবায়-পাড়া বলিলেই চলে। একটা  
রাস্তার আগাগোড়া সবই সমবায় আন্দোলনের  
বাড়ী ঘর। কলিকাতায় ২৪৩০ খানা “ধর্ম-  
সমবায়” সৌধ মিলাইলেও ম্যাক্টোরের সমবায়  
মহাসার পরিমাণ বুঝা যায় না।

হোলিয়োক (Holyoake) সাহেব  
ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সমবায় নীতি-  
প্রবর্তক ছিলেন। তাঁহার শ্রুতিরক্ষার জন্য  
একটা হুঁহুং ভবন নির্মিত হইয়াছে। এই  
ভবনে আন্দোলন সম্পত্তি নানা প্রকার কাঁচা  
হইয়া থাকে। সমবায় সমিতির প্রচার  
বিভাগ, আলোচনা-বিভাগ, লোকশিক্ষা-বিভাগ  
ইত্যাদি হোলিয়োক ভবনে অবস্থিত। এখানে  
সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলাম। ইনি  
বলিলেন “মরণ্যর আশ্রয় আশ্রয় এই বিরাট  
ব্যাপারের কর্তব্য দেখিতেছেন। কিন্তু ২৪  
বৎসর পূর্বে আমি আরম্ভালি ও শিশু মাত্র  
ছিলাম। নিরবিভাগে কর্ম করিয়া ক্রমশঃ  
উচ্চতর সোপানে উঠিতে উঠিতে আজ এই  
আন্দোলনের এক প্রধান বিভাগের সম্পাদক  
হইয়াছি। আমার সঙ্গে এই যে সহকারী  
সম্পাদক দেখিতেছেন, ইহাকে আমার আদর্শ  
গড়িয়া তুলিয়াছি। ইনি পূর্বে সামান্ত মজুর  
মাত্র ছিলেন।”

ইনি প্রথমেই বিজ্ঞাপন করিলেন “আপনার অধিকাংশ উকীলকে চিনেন কি ? তাঁহার নিকট ভারতীয় সম্বায় আন্দোলন বিষয়ক কাগজ পত্র মাঝে মাঝে পাঠচা পাকি। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের এই পুস্তিকাখানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।” এই বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র পুথি আমার হাতে দিলেন। নাম ‘our story’ অতি সরল ভাষায় বালক বালিকাদিগের জন্য সম্বায় তত্ত্বের এবং বিলাতী সম্বায় আন্দোলনের কর্মবিকাশ বিবৃত করা হইয়াছে।

শুনিলাম এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় শিক্ষা করিয়া হাজার হাজার ছাত্র প্রতিবৎসর পরীক্ষা দিয়া থাকে।

সাধারণ কেনা বেচা, বোকানদারী ও মাল প্রস্তুত করা এবং সম্বায়-নীতির অন্তর্গত কেনা বেচা বোকানদারী ও মাল প্রস্তুত করা কি প্রভেদ তাহা অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারে। সম্বায়ের নিয়মে বোকান খুলিতে হইলে প্রথমে কি কি কার্য কর্তব্য তাহাও ইহাতে বর্ণিত আছে। কলতঃ ধরিত্র অমরীৱীঃ সহজে নিজেদের আর্থিক উন্নতির উপায়গুলি কাণ্ডে পরিণত করিতে সাহায্য পায়।

এই পুস্তিকা দিবার পর সম্পাদক নানাধরনের ৫০০০ খানা পুস্তিকা উপহার দিলেন। ইংলণ্ড, আয়ার্ল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আমেরিকা ইত্যাদি সকল দেশের সম্বায় সমিতির বিষয় এই সমুদয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

তাহা ছাড়া বিলাতী সম্বায় আন্দোলনের কেন্দ্র সম্বন্ধে অতীত ও বর্তমান সকল প্রকার তথ্যও এই পুথির ভিত্তর পাওয়া যায়।

আমি বলিলাম “সম্বায়-নীতির ব্যাখ্যা বা

হুফল হুফল ত্রিবিধ প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে বসিয়া এতদ্বিষয়ক ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিওঁ। এক্ষণে চক্ষুর্দূরের বিবাদ মিটাইতে চাতি। এই বিবৃতি আন্দোলনের কয়েকটা বিভাগের কার্য পরিচালনা স্বত্বে দেখিতে ইচ্ছা করি।”

তিনি বলিলেন “অল্প সময়ের ভিত্তর বেশী কাজ করিতে উচ্চা করিলে আপনাকে দুই জাঘগাধ লইয়া যাইব। প্রথমে আমাদের বোকানদারী বিভাগের কার্য দেখুন তবে আমাদের মাল উৎপাদন বিভাগের কার্য দেখিবেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের ইন্সপেক্টর এবং ব্যাংকিং বিভাগের কার্য সম্বন্ধে আপনাকে কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিব।”

বোকানদারী বিভাগের কার্য পরিচালনা দেখিতে অগ্রসর হইলাম। একখানি টার্মিন চক্ ইহাদের বাজার। মাছঘের বত প্রকার জিনিষের প্রদোষন ব্যক্তিগে পারে সকল প্রকারই এই বাজারেই ভিত্তর রহিয়াছে। এই বিশাল গৃহগুলির নানা প্রকোষ্ঠে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নাই।

কোন কোন গৃহে বাইরা খরিদদার এবং বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ করিলাম। বিক্রেতাকে বিজ্ঞাপন করিয়া বুজিলাম, তাহারা সকলেই সম্বায়-সমিতির অংশীদার ও সভ্য, কেহই সমিতির ছুতা বা কর্মচারী নন। মালগুলি সমুদয়ই সমিতির সম্পত্তি। কোন বাজে লোক ভাড়া দিয়া এই বাজারে মাল রাখিতে পায় না। টার্মিনচকের বাজারে এবং সম্বায়-সমিতির বাজারে এই প্রভেদ।

ক্রেতাদিগের সহিত আলাপ হইল। তাহারা সকলেই সম্বায়-সমিতির অংশীদার ও সভ্য। কোন বাজে লোক এই বাজারে মাল খরিদ করিতে পারেন না। ইহারা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র

সুত্র সমবায় বোঝানোর অল্প মাল যদিও  
করিতে আনিয়াছেন। ম্যাঞ্জেটোরের কো-  
অপারেটিভ Wholesale Societyর  
বোঝানে খুঁড়ার বিক্রয় হয় না। মকঃবলের  
সমবায়সমিতিসমূহ এখান হইতে পাইকিবি  
হরের ক্রয় করিতে পারে। এই সমিতিসমূহই  
কেন্দ্র-সমিতির অংশীদার। কোন ব্যক্তি কেন্দ্র-  
সমিতির অংশীদার নন।

ইংলণ্ডের ভিতর ছোট বড় বহু সমবায়  
সমিতি আছে। তাহার ৭৫ টাকার অংশ  
গ্রহণ করিয়া ম্যাঞ্জেটোরের এই কেন্দ্র-সমিতির  
সভা হইয়াছে। কেন্দ্র-সমিতি এই সকল  
মকঃবলের সমিতিদ্বারাই পুষ্ট। সুত্র সমিতি-  
গুলি দলবদ্ধভাবে বড় সমিতির সকল সম্পত্তির  
মালিক।

সুতরাং সুত্র সমিতিগুলিই বড় সমিতির  
বাজারে দলবদ্ধভাবে বিক্রয় করিতেছে।  
আবার তাহারাই স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ পৃথক্  
ক্রয় করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক সুত্র  
সমিতিই নিজের মাল বিক্রয় করিতেছে,  
আবার নিজের অল্পই ক্রয়ও করিতেছে।  
একই সমিতি ক্রেতা এবং বিক্রেতা। এই  
ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতার স্বয়ং থাকিতে  
পারে না। চাঁদনি চকের বাজারে ক্রেতা  
চাহেন অতি সস্তার মাল পাইতে, বিক্রেতা  
চাহেন বেশী দামে মাল বেচিতে, প্রত্যেকেই  
নিজের লাভ খতাইয়া দেখেন। কিন্তু ম্যাঞ্জে-  
টোরের এই সমবায় বাজারে দেখিতেছি যে  
লাভটী শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সমিতির নিজ  
তহবিলেই কিরিয়া আদিতেছে। ক্রেতাক্রমে  
সমিতি বাহা বয়চ করিতেছে বিক্রেতাক্রমে  
সমিতি তাহার লাভ পাইতেছে। যে বস্তু  
বেশী কিনিবে তাহাও সে তত লাভবান  
হইবে।

ক্ষেত্রাধিপত্যকে ভিজালা করিলাম “আপ-  
নাতা না হয় এই বাজারের অংশীদার। কিন্তু  
এখানে কিনিতে বাধ্য কি?” ইনি বলিলেন  
“না। আমরা এখানে ক্রয় না করিলেও পারি।  
তাঁহাতে আমাদেরই ক্ষতি, কারণ অংশীদার-  
ভাবে আমরা কতটুকু লাভই পাইতে পারি ?  
কিন্তু ক্রেতা হইলে দুইবার দুই হিসাবে লাভ  
পাইব। প্রথমতঃ অংশীদার হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ  
ক্রেতা হিসাবে।” ক্রয় বিক্রয়ে সমবায়-নীতি  
অত্যন্ত সুবিধাজনক নহে কি ?

তাহা ছাড়া সমবেত মোকাদ্দারীর অল্প  
লাভও আছে। প্রথমতঃ অল্পদামে মাল  
কিনিতে পারা যায়। চাঁদনী বাজারে  
কিনিতে গেলে বস্তু পরমা লাগে সমবায়-  
সমিতির সভাক্রমে সমবায়ের বাজারে  
কিনিতে গেলে তাহা অপেক্ষা কম পরমা  
লাগে। এখানে দেখিলাম Wholesale  
Society মকঃবলের কেন্দ্র-সমিতির নিকট  
যথাসম্ভব কম দামে বেচিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ Wholesale Society অতি  
সস্তাদরে মাল আনিতেও পারেন। ম্যাঞ্জেটোর  
দেখিলাম ইহার বেলদ্বিষয় আশাদি এবং  
ইংলণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ কারখানা হইতে সস্তার  
মাল কিনিয়া লম্বা রাখিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে—কেন্দ্র-সমিতির অধীনে  
কতগুলি বড় বড় কারখানাও পরিচালিত  
হইতেছে। এই কারখানাগুলিতে জুতা,  
জামা, বিড়ট, মিঠাই ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য  
প্রস্তুত করা হয়। বহুগণ্যক সমিতি মিলিত  
হইয়া কার্য করিতেছে বলিয়া প্রচুর মূলধন  
কেন্দ্র-সমিতির হস্তগত হইয়াছে। এই টাকার  
অপেক্ষ প্রকার ক্যাঙ্করী চালান হইতেছে।

সমবেত ক্রয় বিক্রয়ের কার্যপরিচালনা  
অতি সহজেই হইয়া থাকে। প্রাতি সপ্তাহে

মফঃব্বলের সমিতি হইতে লোক আদিয়া কেন্দ্র বাজারে মাল অর্জার দেন। কেন্দ্রের বিক্রেতার কাগজে অর্জার লিখিয়া রাখেন। অর্জারের মূল্য বাজারে দিতে হয় না। কেন্দ্র-সমিতির ব্যাকবিভাগে অম্মা দিতে হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরেই মাল যথাস্থানে পাঠান হইয়া যায়।

মফঃব্বলের সমিতিগুলিও ঠিক এই নিয়মে কার্য করেন। আশীবার ও সন্ধ্যাপন ব্যতীত কেহই বাজারে কেনা বেচা করিতে পারে না। বাহা কিছু লাভ হয় সমগ্রই আশীবারদের ভিতর বিভক্ত হইয়া যায়। এইরূপে পল্লী-বাসীরা সমবেত যোজানদারী করিয়া কেন্দ্র-বিক্রেতার বিহার ঘূড়াইয়া দিতেছে।

যে ব্যক্তি কেন্দ্রা সেই ব্যক্তিই বিক্রেতা। হুতরাং কে কাহাকে ঠকাইবে বা কে কাহার নিকট বেশী লাভ করিবে? এক্ষেত্রে ঠকিবার বা ঠকাইবার কোন লোকই নাই। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অস্থিষ্ঠানের নাম সমবায়।

সমবায়নীতি বহুবিধ কাণ্ডেই অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের বৈবহিক জীবনে যোজানদারী ক্ষেত্রেই সমবায়প্রথা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। সস্তার মাল পাইতে, উৎকৃষ্ট মাল পাইতে এবং ক্রয় করিবার ফলেও ভবিষ্যতে লাভ করিতে হইলে এই প্রথা সর্বত্র প্রচলিত হইবে।

১৯১২ সালে ম্যাক্‌টোরের কেন্দ্রসমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল ২,৮৭৬,০০০ অর্থাৎ ইংরাঞ্জ-জাতির শতকরা ২৫ জন লোক মফঃব্বলের সমবায়-সমিতির সভ্য হইয়া বিরাট Co-operative Wholesale Society-এর সকল সম্পত্তির আশীবার হইয়াছে। ১৯১২ সালে ইংলণ্ডের ভিতর ২১ কোটি টাকা লাভ-রূপে বিভক্ত হইয়াছিল।

ম্যাক্‌টোরের কেন্দ্রসমিতির হিসাবপত্র বৎসরে দুইবার করিয়া হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে আর্থ দ্বিবিধ (১) অংশবিক্রয় লভ্য (২) মাল বিক্রয় লভ্য। ইংলণ্ডে ব্যয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

- (১) কার্য পরিচালনা।
- (২) আশীবারদিগের স্থল ও লাভ।
- (৩) পুঁজি—ভবিষ্যতের জন্য।
- (৪) দান—বিদ্যার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য ইত্যাদি।

(৫) কেন্দ্রাধিপতির মধ্যে লাভ বিতরণ। হুতরাং সমবায়ের প্রতিষ্ঠান সভ্যগণের জন্য পরোপকার এবং লোক সেবা করিবার সুযোগও সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতার বন্দ-সমবায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এইরূপ। নিম্নের বিজ্ঞাপন হইতে ইংহা বুঝা যাইবে।

"অংশ—প্রত্যেক অংশের নির্দিষ্ট মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র। জনসাধারণের সুবিধার্থ আগামী ইং ৩০শে জুন ১৯১৪ সন পর্যন্ত উক্ত মূল্যের অংশ বিক্রয় করা হইবে। তৎপরে শত-করা ২০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ ৫ টাকা মূল্যের সাধারণ অংশ ৭ টাকায় বিক্রয় করা হইবে। অংশের মূল্য প্রাপ্তির ক্রমোত্তরায়ে অংশ প্রদত্ত হইবে। আগামী জুলাই মাসে সভ্যগণ বৎসরে চারিবার বিভক্ত হইবে। বিগত ৩ বৎসর যাবৎ অংশের লাভ বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা হারে বিভক্ত হইতেছে। বর্তমান বর্ষের কার্য্য-নিও ভাল চলিতেছে।

উদ্দেশ্যবর্ধন—গো-পালন ও গো-রক্ষণ এবং তৎসহ ধর্ম্মোৎসাহ অর্থোৎপাদন, বিজ্ঞান ও বিনিয়োগ; কিস্তিবদ্ধীকমে জনসাধারণের জন্য পুঁজি ও কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন; জমির উৎকর্ষ সাধন, উদ্ভাৱন বা অনুগত সংস্থাপন এবং তৎসহ

দেশের প্রকৃত ধন খেজু দান্ড ও বর্ষ বৎসর  
প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন। এতদ্ব্যতীত  
সমবায়ের সময় আয়ের অর্ধাংশ ব্যয়িত নিম্ন  
মূল্যে আছে ও প্রতিপালিত হইতেছে।

অগ্রষ্ঠান—পুস্তকাধা, কলিকাতা কাশিম  
বাগার ও কাশীধামে প্রকৃষ্টরূপে তিন বৎসর  
হইতে গোপালন ভূমির উৎকর্ষ বিধান এবং  
দৃঢ়াধি নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তৃত  
দ্রুত দ্রুত ও মাখনাদির আবস্তক হইলে  
সমবায় শোধ, করপোষণের মেন, দক্ষতা  
কলিকাতা এই টিকানায় অগ্রসরমান করিবেন।

কাল সমবেত ক্রম বিক্রম মওলীর বিরাট  
বাজার দেখিয়াছি। ইংলণ্ডের ১ অংশ লোক  
মিলিত হইয়া এই বাজার গঠন করিয়া দেন।  
১৮৬৪ খৃঃ এই বাজার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।  
সে দিন ৪০ বৎসর উপলক্ষে জুবিলী সন্মার  
হইয়া গিয়াছে। কোটি কোটি টাকা এখন  
ইহাদের রক্তপাত।

সত্তার মাল বোগান ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য  
অথচ মালগুলি যোগ্যে নিখুঁত এবং ভেদাল-  
হীন চর তাহার মন্তও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে  
কারণ টাঁহারা শু কেবল বিক্রোতা নন ইহা-  
দের ক্ষেত্রও যে ইহারা নিজেই।

ইহারা দ্ব্যলম্ব্য উৎপত্তি স্থান হইতে  
মাল লইয়া আসেন। ১৯১২ সালের কার্য-  
বিবরণীতে প্রকাশ—

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| উৎপত্তি স্থান | আমদানী মাল                          |
| আমেরিকা       | চিনি, মাংস, চর্কি,<br>গোধূম ইত্যাদি |
| অষ্ট্রেলিয়া  | চর্কি                               |
| অস্ট্রিয়া    | চিনি, ময়দা, কাপড়-<br>চোপড়, আসবাব |
| ক্যানাডা      | মাখন, চামড়া, মাংস                  |
| ডেনমার্ক      | ডিম, মাখন, মাংস                     |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ফ্রান্স        | চিনি, শুক কল, সৌধিন |
| জার্মানি       | কাপড় চোপড়         |
| গ্রীস ও তুরস্ক | চিনি, কল, ডিম       |
| হল্যান্ড       | শুক কল              |
| সুইডেন         | চাউল, পনির, ডিম     |
| স্পেন          | মাখন, ডিম, কাঠ      |
|                | কল                  |

দ্রুত লোকেরা সমবায়ের গুণে চিনিয়া  
হইতে মাল আমদানি করিতেছে। কাজেই  
সত্তার ভাল জিনিষ ভোগ করা তাহার  
ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। যাহারা এই সমবায়  
আন্দোলনের বাহিরে দ্রাবনদাপন করে  
তাহারা সাধারণ বাজারের যে কোন দোকানে  
যাইয়া প্রয়োজনীয় বস্তু বেশী দামে কিনিতে  
বাধ্য।

বিশেষ হইতে আমদানী করা ব্যতীত  
কেন্দ্র-বাজারের কর্তারা ইংলণ্ডের বড় বড়  
কারখানা হইতে পাইকারী দরে মাল কিনিয়া  
থাকেন। পাঁচ উৎপত্তি স্থানের মাল আনিতে  
হইলে বড় বড় 'কর্ডার' দেওয়া আবস্তক।  
সমবায়-সমিতির অর্ডারগুলি কখনই ছোট  
হয় না কারণ ইহাদের বাজার অতি বৃহৎ,  
মূলধনও প্রচুর। কারখানার অর্ডার দিবার  
কলে সত্তার মাল পাওয়া যায়।

এই ছই প্রকারে মাল বোগাইবার কলে  
কেন্দ্র-সমিতির মধ্যে লাভ হয়। থাকে।  
তাঁহা ছাড়া কতগুলি জিনিষ ইহারা নিজেই  
প্রস্তুত করিতেছেন। এমনকি অনেকগুলি  
ফ্যাক্টরী ইহাদের অধীনে পরিচালিত হই-  
তেছে। এইরূপ একটা ফ্যাক্টরী আজ  
দেখিলাম।

এখানে বিদ্যুৎ তৈয়ারী করা হয়। বলা  
বাহন্য সবই কলের কাজ। আজ বলনা  
কার্যে পরিণত দেখিলাম। কোন কলে

মদ্য খাঁড়ি হইতেছে, কোন কলে চিনি গ্লিম চর্কি ইত্যাদির সঙ্গে মদ্য মিশ্রান হইতেছে। এইরূপে ভাঙ্গা পণ্যসত্ত্ব কলে চটকা থাকে। এই খানেট শেষ নয়। কাগজের মোড়কে ভাঙ্গতরা কোটাবন্দী করা এবং বাস্তুশিল্প গদ্যম ঘরে চালান করা সবট বস্ত্রের সাগাঘো হইতেছে। কোন ঘরে পুরুষেরা, কোন ঘরে রমণীরা এক একটা কলের নিকট পাড়াইড়া কল দেবা করিতেছে। প্রায় ১০০ জন শ্রমজীবী এই কারখানায় কার্য করে। এই কারখানের প্রায় সকল লোকই সমবায়-সমিতির অংশীদার। সেই সকল সমিতির অংশীদার হিসাবে ইহারা সকলেই এই কারখানায় মালিক। কাজেই ইহারা স্বয়ংই নিয়োগ কর্তা, আবার নিজেদের নিযুক্ত কর্তৃত্বাধী এবং শ্রমজীবী। কাজেই সাধারণ ফ্যাক্টরীতে প্রভু ও শ্রমজীবীতে যে বৈষম্য এই কারখানায় সে বৈষম্য নাই। এখানকার ১০০ লোক সকলেই মহাজন আবার সকলেই শ্রমজীবী।

এখানে নিয়োগ কর্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যে সকল স্বাধীন যেনে স্বতন্ত্র বা স্বায়ত্তশাসন আছে সেখানে যেমন শাসন-কর্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এখানেও ঠিক সেইরূপ প্রভু বা মহাজন বা নিয়োগ কর্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই কর্মী আবার সকলেই মনিব। সমবেত উৎপাদন প্রণালীতে এক সম্ভ্রমায় Capitalist এবং Employer এবং অপর সম্ভ্রমায় Labourer বা Employee এইরূপ দুই সম্ভ্রমায় নাই। হুতরাং লাভ বা ক্ষতি কোন সম্ভ্রমায়ের হয় না, দুইই উভয়ের।

এখানকার লাভ সমস্তই কেন্দ্র-সমিতির নিকট জমা হয়। তাহার পর মফঃবলের স্বত্ব সমিতিগুলির নিকট পাঠান হয়।

সেখান হইতে অংশীদারেরা তাহাদের অংশের লাভ পাইয়া থাকে। ইহারা যদি সমিতির দোকানে কিছু মাল ক্রয় না করে তাহা হইলে ক্ষতি নাই। শেষ পণ্যসত্ত্ব অংশের স্বত্ব ও লাভ হ্রাসিত। বিদ্রুত ফ্যাক্টরীর কর্মীরা নিজ নিজ সমবায়-সমিতির অংশীদার হিসাবে বৎসরে দুইবার লাভ পাইতেছে। আশ্রয় এখানে শ্রমজীবী হিসাবে বর্ণ্য করিতেছে। কাল মফঃবলে অংশীদার অতএব নিয়োগ-কারী হিসাবে লাভ ভোগ করিবে।

বিদ্রুত ফ্যাক্টরীর ভিত্তর আরও অনেক লক্ষ্য করিবার বিষয় পাইলাম। প্রথমতঃ এখানকার ঘরগুলিতে আলোক ও বায়ুর গতিবিধি বেশ সহজে হয়। বায়বীয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আছে। সাধারণ কারখানায় মনিবেরা যেজন ঘরে কল রাখিতে ইচ্ছা করেন সেইরূপ ঘরেই রাখিয়া থাকেন। আইনের ঘর বা ঘা না হইলে শ্রমজীবীদের জন্ত কাথালয়গুলির সুবন্দোবস্ত করেন না। কিন্তু সমবায়-সমিতির এই ফ্যাক্টরীতে স্বার্থের বৈষম্য নাই। লাভ ক্ষতি যে সকলের পক্ষেই সমান। কাজেই জীবনধারণের নিয়ম প্রতিপালন করার সকলেরই সমান স্বার্থ। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিতা রমণীকে কারখানায় নিযুক্ত করা হয় না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পারিবারিক জীবনের উন্নতিবিধান করিবার জন্ত এই নিয়ম করা হইয়াছে। বিবাহিতা স্ত্রীকে নিজ গৃহের সকল রক্ষণ কর্ণে নিযুক্ত রাখিবার জন্ত ইহারা চেষ্টিত। রমণীরা নিজ পারিবারিক স্বত্ব হ্রাস গৃহস্থালী ইত্যাদিতে মনোযোগী না হইলে সমাজ টিকিবে না। সমবায়সমিতি ইহা বুঝিয়াছেন। হুতরাং সমবেত উৎপাদনের নিয়মে বিলাতে একটা সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতেছি।



চতুর্থতঃ ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ কাহাকেই করিতে হয় না। ইংলণ্ডে বহু প্রকার পিত্ত আছে সকল শিল্পের শ্রমজীবীরা মলবদ্ধ হইয়া এক একটা Trade union বা শ্রমজীবী-সমিতি গঠন করিয়াছে। প্রায় ২০০ বৎসর হইতে এই সকল ইউনিয়নের কার্য হইতেছে। ইহাদের প্রবল চেষ্টার অনেক সময়ে খনী মহাজনেরা ইহাদের স্বার্থ অঙ্গুণারে ফ্যাক্টরীর নিয়ম বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতী ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ হ্রাস করিয়াছেন যে কোন শিল্প কারখানার শ্রমজীবীরা ৮ ঘণ্টার বেশী খাটিবে না। এই নিয়ম এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু সমবায়-সমিতির কারখানা এই নিয়ম কার্যে পরিণত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ শ্রমজীবীদের অল্প বাগান মাঠ, ক্রীড়াক্ষেত্র লাইব্রেরী, ভোজনালয়, সন্ধ্যা-পুস্তক ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষাপ্রদ এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিষ্ঠান এই ফ্যাক্টরীর ভিতর বেষ্টিত পাউলান। ইহারা সকলেই হুখে হুহু জীবন যাপন করিতেছে বুঝা পেল।

পূর্বে দেখিয়াছি অশৌচ্যের হিলাবে ইহারা

লাজ ভোগ করে। এক্ষণে দেখিতেছি যে শ্রমজীবী হিলাবেও ইগাধের হুহু হুবিয়া কম নহে। প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনযাপনের ভিতরে একটা আনন্দ পাওয়া কি আধুনিক বিলাতী সমাজে কম কথা? এদেশের ফ্যাক্টরী নীতির প্রভাবে তাহার চিহ্ন যাহ লক্ষিত হয় না।

প্রকৃ-নিবৃত্তি ফ্যাক্টরীতে শ্রমজীবীরা কঠোর ভাবে জীবন যাপন করে, সমবায়-নিবৃত্তি ফ্যাক্টরীতে তাহারা সম্পূর্ণ নৃতন আদর্শে জীবন গঠনের সুযোগ পায়। পরাধীন দেশের জনগণ যে তাহা জীবনযাপন করে স্বাধীনতাপন এবং প্রজাতন্ত্র লাগনের স্বাধীন জনগণ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মে চলা ফেলা করে। স্বাধীনতার আবুগাওয়া এবং সমবায়ের আবুগাওয়া এক প্রকার। রাষ্ট্র-জনপদের স্বাধীনতাপন এবং বৈবাহিক জনপদের সমবায় প্রথা এক বস্তু। একক্ষেত্রের কর্ণ ও চিন্তা যিনি বৃত্তিতে পারিবেন, অল্প ক্ষেত্রের কর্ণ ও চিন্তা উহার পক্ষে দূরা কঠিন হইবে না।

“ধন-বিস্তান”

## হিন্দু ট্রাস্টি

### জড়-জগতে জাতিভেদ

জীব-জগতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে ধারার নিয়ত হৈ চৈ করেন, জড়-জগতেও জাতিভেদের কথা শুনিয়া তাঁহারা কি বলিবেন জানি না। কিন্তু তাবিত্তা দেখিলে দেখিতে পাইব, শুধু জীবজগতে নহে জড়-জগতেও জাতিভেদ আছে এবং সাধ্যাকর্ষণাদি প্রাকৃতিক নিয়মের ভাষা বিশ্ব-জগৎও ব্যাপিয়া

এই জাতিভেদ ও জাতিগঠনের বিভিন্ন অভিনয় অধরহঃ চলিতেছে—জাতিভেদটা শুধন আর হুংকারে উড়াইয়া দিবার ব্যাপার বলে মনে হবে না, প্রত্যুত ধারণা অস্বিবে ইহা একটা শুণকর্ণ বিভাগজ সনাতন সামগ্রীই বটে। অত সেই সম্বন্ধে হু এক কথা বলিব।

জাতিভেদ ও জাতিগঠনের একটা প্রধান লক্ষণ এই, ত্রিভাতি সমূহ চরিতে পৃথক হইয়া স্বাভাবিক স্বেচ্ছা একত্র মিলন হইতে প্রয়াস পান। ভাবিধা দেখিলে দেখিতে পাটব, এট বে মল বাধা নিয়মটি ইহা শুধু জীবনগতে নিবন্ধ নহে পরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতা বিস্তারিত।

অগতঃ জুড়ে অবিরত ভাঙ্গা গড়ার বিভিন্ন অভিনয় চলিতেছে। আকর্ষণ শক্তিবলে সকলে একত্র আকৃষ্ট এবং বিরোধন শক্তি কলে পৃথক হইয়া পড়ে। জীবনগতে এই আকর্ষণ ও বিরোধন প্রক্রিয়াটি জীবন ও মরণ নামে অভিহিত হয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে এই দুইটা প্রকৃত পক্ষে পৃথক ব্যাপার নহে কেবল মায়া-বশে বা দেখিবার দোষে ঐক্য বোধ হয়। জীবনের অর্থই মরণের পথে অগ্রসর হওয়া; চলিত কথায় বহন আমরা বলি আমাদের আত্ম ব্যক্তিভেদে, তখন আর এভাবে বিচার করিলে আমাদের আত্ম কহিতেছে ঠিক এই বিপরীত কথাই বলা সাধে না কি? আবার বাহ্যিক আমরা মরণ বলি তাহাও ঐক্য নবজীবনের সূত্রপাত মাত্র। মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের বেগের কতটা অংশ বৃত্ত ও ক্রান্ত হইতেছে কিন্তু উহাই নূতনের অঙ্গ বা সৃষ্টি পুষ্টির আরম্ভ নহে কি?

জীবন ও মরণ এইরূপ একই জিনিষের যেন দুটা দিক মাত্র। শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবার কালে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় শক্তিই হ্রাস পং বিকশিত হইয়া উঠে। রজ্জুগ্ৰাস্তে লোষ্ট্রখণ্ড বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকিলে লোষ্ট্রটি আকৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রকৃষ্টও হয়; তাড়িত শক্তির উদ্দীপনকালেও এইরূপ দুই বিপরীত শক্তির বা তাবের উল্লেখ হয়। একই শক্তি এইরূপ দুই বিভিন্ন ভাবে ক্ষুণ্ণ

হইয়া, জীবনগতে অল্পদুঃখ নামে এবং জড়-গতে নান্য অবস্থার নান্য নামে অভিহিত হইয়া নিহত ক্রীড়া করিতেছে। সাদা কথায় ইহার এক নাম “ভাঙ্গা গড়া।” পদ্মার এক পাড় ঘরন ভাঙ্গে অল্প অংশ তখন ঠিক সেই পরিমাণে পূর্ণ হয়। এক্ষেত্রেও আমরা দেখি-লাম জীবনে যে নিম্ন ক্রিয়াশীল, মরণের পরও তাহা বিদ্যমান, কারণ জীবন মরণ বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, একই শক্তির শুধু দুইটা স্বতন্ত্র নাম।

এইবার, অগতঃ জুড়ে দিনরাত যে ভাঙ্গা গড়ার বিভিন্ন অভিনয় চলিতেছে সে বিষয়টা একটু আলোচনা করা যাউক। এই ভাঙ্গা গড়া ব্যাপারের ভিতর এই এক বিভিন্ন নিম্ন আমরা দেখিতে পাই, যে ইহার কলে স্বাভাবিক স্বেচ্ছা সকলে একত্র হয় ও ত্রিভাতি সমূহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

অগতঃ এই আকর্ষণ ও বিরোধন শক্তিই, আমাদের শাস্ত্রে অযোধ্য কণ্ডল বা “গুণ কণ্ঠ বিধান” নামে অভিহিত কি না আমরা জানি না, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, ইহার অচিন্ত্য প্রভাবে জাতিভেদ ও জাতি গঠনের জায় একটা বিভিন্ন ব্যাপার অহরহঃ চলি-তেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জায় এ নিম্নমটিও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী; বহু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রচেষ্টা জড়জগতেই পরিদৃষ্ট কিন্তু জীব উদ্ভিদ জড় কেহই এই নিম্নের সূক্ষ্মতর প্রভাব অতিক্রমে সমর্থ নহে। ইহাইই প্রভাবে সমবেত হইয়া মানবগণ ক্রমশঃ বড় বড় নগরের সৃষ্টি করে, বিজ্ঞান পটীয়াশে লোকের অকতি সম্ভাব্য এবং নগর মধ্যেও আবার ব্যবসায়াদি ভেদে সমাজ বা সম্প্রদায় সমূহের সৃষ্টি হইতে থাকে। কলিকাতা সহরের গোশাণটি, চিনিগটি, সিন্ধুরেণটি, পশোণগটি

প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ সমূহ কি এই ভাবেই গড়িয়া উঠে নাই? বাজারের মধ্যে যাও দেখিবে, এক এক অংশ যেন বিশেষরূপে এক এক প্রকারের ক্রয় বিক্রয় অঙ্গ নির্দিষ্ট। এইরূপ বিভাগে হুবিধা বোধ করি বলিঘাট, উহা আমাদের প্রকৃতির অহুমোদিত বলিঘাট, উহার নাম দিই লুখলা এবং বিনরীত ডাংক বলি বিনুখলা। আমাদের প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন পন্নী বা “পাড়া” স্তলি বখালস্বব এই প্রণালীর অন্তর্গত করিয়া রচিত হইত। কায়বরীর শুকপাতী আকাশে উড়িতে উড়িতে এইরূপ পন্নীর পর পন্নী চিত্র দেখিতে দেখিতে অবশেষে অতি ভীষণ নিম্নাং-পন্নীর বে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িলে এবং উহার সহিত ব্রাহ্মণ-পন্নী প্রকৃতির পার্থক্য আলোচনা করিলে যেন একখানি ব্যাংকোপ চিত্রের স্তায় মনে হয়। ফলতঃ গুণকর্ম্মাঙ্গুসারে সমাজ-সম্প্রদায় বা পন্নীসমূহ এই ভাবে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে এবং ইহাতেই লোকে হুবিধা বোধ করে। মুসলমান পাড়া বহি হিন্দুপন্নী হইতে স্বতন্ত্র থাকে কত অনর্থক গণসোলের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। ব্রাহ্মণ পাড়ার বসতি হইলে, ব্রাহ্মণ সমাজ বড়টা সাম্রাজ্য বোধ করিবেন, হুজিণ জাতির মধ্যে নিরত অবস্থান করিয়া কখনই সেভাবে হুবি হইতে পারেন না। এইরূপ ধোপাদের জন্ত ঘোশাপাড়া, মুচিরের জন্ত মুচিপাড়া, কামারদের জন্ত কামার পাড়া, কুস্তকারদের জন্ত কুস্তকার পন্নী প্রকৃতি নির্দিষ্ট থাকিলে সকলেরই তাহাতে হুবিধা হয়, শিষ্টাঙ্গির উন্নতিও সমাজ সাধা হয়। সমগ্র সমাজ বা নগরটিকে যেন বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত প্রকাণ্ড একটি টেকনিক্যাল খুল বা শিল্পকলাদি নিবিবার বিভাগায়রূপে পরিণত হয়। এক

এক ব্যবসায়বৃত্ত সকলে একত্র অবস্থানে সমর্থ হইলে সকলের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষাকৃত অগাধাদে নিম্ন নিম্ন ব্যবসায়াদির উন্নতি সাধন করা যায়। মূচিগা সকলে মিলিয়া প্রকাণ্ড একটি tannery বা চৰ্ম প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিতে পারে। ঐরূপ কণ্ঠকার, কুস্তকার, হুস্তকার প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও নিম্ন নিম্ন ব্যবসায়ের উপযোগী উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ক্রয়ে সমর্থ হয়। সমাজ এইরূপ ভাবে রচিত হইলে, এই সব কলা লব্ধে হাতে কলমে জানলাতে ইচ্ছা থাকিলে কোথায় যাইতে হইবে ভাবিতে হয় না।

এই ভাবে আলোচনা করিলে প্রত্যয় হুস্তই হুস্তা জন্মিবে আমাদের বর্ণভেদ প্রথা এইরূপ সমাজে প্রাকৃতিক নিয়মে সজাত, উহার কখনও বিনাশ নাই, এবং স্বাধীনস্বব উহার অন্তর্গতই সমাজের কল্যাণ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি আবার ভেঙে জীবের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং জীবনের স্তায় মরণের পরও সম্ভবতঃ ক্রিস্টাল, যেহেতু পূর্বেই বলিয়াছি জীবন ও মরণ একই শক্তির দুই। বিভিন্ন নাম মাত্র, উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। সেখানে জড় মেহ যেমন শব্দভুক্তে বিস্তীর্ণ হইয়া স্বভাতি লব্ধ মিলিত হয়, চৈতন্যও ভক্তগুণ গুণকর্ম্মাঙ্গুসারী নিম্ন প্রকৃতির অহুস্তগুণ আধারে আবিষ্কৃত হইয়া স্বভাতির মাঝে ভয় লাভ করিবেন বিচিৎ কি? সম্ভবতঃ এই কারণেই আমাদের বর্ণভেদ প্রথাটি জন্মগত বিবেচনা করা হয়।

ইহা অবতীর্ণ স্বীকার্য, বর্ণভেদের শুকপাতী হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ব্যপদেশে মিননের প্রতিফুলে অতি মাত্রার দণ্ডায়মান হইলেও অনেক ফুল ফলে। এইভাবে অনেকেরই আজকাল স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে একেবারে বফলপ্ৰস্ত এবং

জাতি মাত্রায় মিলনের অসম্ভব। এইরূপ কখন একদিকে কখন বা আর একদিকে ঝোঁকের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মের পতি কত হয় না, বরং মোটের উপর টপাও ফলে মধ্যপথে বেশ অবাচ্ছন্ন গতিতে চলিতে থাকে। বেশ না কেন স্বাভাবিক দুর্ভাগ্যবান ও অশুভকালের এত চেষ্টা শেষেও, ইংলণ্ডের পেন্সিলসহর স্বতন্ত্র একটি কামার পাড়ায় এবং ল্যান্ডাণারার প্রকাণ্ড একটি জাতি পাড়ায় পরিণত হইয়াছে।

জীব ছাড়িয়া একবার উদ্ভিদ জ্বলের অবস্থা পর্যালোচনা করা যাউক। এখানেও জাতিভেদ এবং জাতি গঠনের নিদর্শন দেখিয়া তত্ত্বিত হইতে হয়। ভাবিয়া দেখ কি বিভিন্ন উপায়ে নিম্নরূপে ভিন্ন রসের এবং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নরূপের উপাদান সমূহ সঞ্চিত হয়। অর্থাৎ রস সমূহ যেন নিজ নিজ জাতি বাছিয়া একত্র হইতেছে। জীব ও উদ্ভিদের বেধে একদিকে যেমন স্বভাবীয় উপাদানগুলি সাগৃহীত হইতেছে, তেমনই আবার মল মূত্র যেন বাষ্পাধির আকারে ভিন্ন জাতীয় পরার্থ সমূহ প্রতিনিয়ত পরিত্যক্ত হইতেছে। বংশ বিস্তার কালে অবধি এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই, বীজে এবং ভ্রূণাবস্থাতেও এই জাতিভেদ ও জাতি গঠন নক্তি নিহিত।

জড় জগতের ত কথাই নাই! এখানে নানাভাবে এই জাতিভেদ ও জাতি গঠনতত্ত্ব আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা। জড়জগতে এই জাতিভেদ আছে বলেই বল ও বল আদ্য এইরূপ পৃথক্। জড় পরার্থ সমূহও নিজ নিজ জাতি বর্ণাধারায় অবস্থিত থাকে বলিয়াই আমরা আমাদের প্রয়োজনানুসঙ্গ ত্রব্যাদি সংগ্রহে সক্ষম হই। পরীক্ষাকারে প্রত্যয়গুলি সঞ্চিত না হইলে, এক টুকরা পাথরের সম্মানে

যে সকলকে গলদার্থ হইতে হইত; এমন বড় বড় পাথরের ঘর বাড়িট বা কিত্রপে নিশ্চিত হইত? বহুদিন নিষ্কাম জল্ল লৌহের আবশ্যক হইলে আমরা লোহা পাড়ায় অর্থাৎ লৌহ খনিতে তাহা প্রাপ্ত হই। চূণ, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ত্রব্যগুলি যদি ঈশ্বর রাশি রাশি পরিমাণে না পাইয়া পৃথক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইত তাহা হইলে কাহাকেও আর সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইত না। জাতিভেদ আছে বলেই, হাপরে খনিজ পরার্থ গলাইবার সময় কামা ও খাত পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে সঞ্চিত হয়; কর্দমাক্ত গলগাশি খিতাইবার কালে প্রথমে গুলভার অংশগুলি অনন্তর লঘুতর অংশ সমূহ স্ব স্ব বর্ণ বা গুণের অনুযায়ী বিভিন্নতর সঞ্চিত হয়। আর অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। বুঝা গেল, জড় জগতেও অবশ্যম্ভাব্য একত্র বাস বা জাতি বর্ণভেদ বিস্তারমান।

জীব জগতে এই আকর্ষণীয় শক্তির প্রক্রিয়াটি অতঃপর একটু ভিন্ন দিক্ হইতে আলোচনা করা যাউক। মানবগণ নিগত নানা প্রকারে আকৃষ্ট হইয়া একত্র হইতেছেন কিন্তু আকর্ষণের এই সব প্রকার ভেদের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠের আকর্ষণ বলিয়া সমাদর করি, আর কতকগুলিতে উপায় নাই তাই জড়ায় গড়ি। নিষ্ঠুর শ্রেষ্ঠের আকর্ষণের নানা উদাহরণ বর্তমান। পেটের দায়ে অনেকেরই হাত পা বাঁধা; অন্ন চিন্তা না থাকিলে আমাদের স্বাধীনতা কত না বাড়িয়া বাইত! তব, একটা মত আকর্ষণ; দণ্ডের ভয়ে, আমরা কত সময়ই না সংবৃত্ত রহিয়া প্রকৃত শান্ত ব্যক্তির স্বভাবি রূপে সখ্য হই ও তাঁহাদের সহিত একত্র থাকি।

বিপৎকালে—দেমন বন্যার সমত—হিংস্র কষ্ট  
 হিংসা ত্যাগ করে, অর্ধ নহল একর অবতান  
 করে। অত্যাচারের অতীত প্রভাবে মৈনিকগণ  
 স্বর চাণিতের দ্বায় রণক্ষেত্রে সমবেত এবং  
 অসুস্থিতচিত্তে প্রাণ নিসঙ্কমে অগ্রসর হয়।  
 আকর্ষণের এইরূপ নানাতরু প্রকার ভেদ  
 আছে। ভগ্নগত অবস্থার সাম্য (যথা বিশেষ  
 বিশেষ কালে, ক্ষণে, দেশে, সমাজে বা বংশে  
 ভগ্নগত), দারিদ্র্য, জনবস্তু, বিদ্যা, বয়োক্রম  
 বাহ্য প্রকৃতি বিষয়ে অবস্থার সাম্য, কৃতি বা  
 কণ্ঠের সাম্য, অশ্রের সাম্য, প্রকৃতির সাম্য,  
 আত্ম বা লোকের সাম্য প্রকৃতি নানাতরু  
 আকর্ষণে জন সমূহ অবিরত আকৃষ্ট হইতেছেন  
 ও ইহার ফলে সুস্থভাবে অসংখ্য জাতি সমূহ  
 নিরন্তর গঠিত হইতেছে। তাবিয়া দেখিলে  
 আমরা সকলেই স্বীকার করিব, ইহাদের মধ্যে  
 সমস্ত জাত আকর্ষণে আকৃষ্ট জন সমূহই  
 প্রকৃত উচ্চশ্রেণী রূপে পরিগণনীয়। এই  
 ভগ্নই বলা হয়, “দুর্ভিক্ষে গতি হয়, যদি  
 কৃক ভবে।” ইহাতে ভগ্নগত জাতিভেদ  
 অব্যাকৃত হয় না, বা উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান  
 হইতে উপদেশ প্রদত্ত হয় না, শুধু উচ্চ জাতিতে  
 পরিণত হইবার একটি দৃশ্য ও প্রশস্ত পথঃ  
 নির্দিষ্ট হয় মাত্র। যেন হয়, আমাদের নিতাই  
 পৌর এই ভাবেই সকলকে নীচের পরিহারে  
 চেষ্টিত হইতে বলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জাবিয়ার কথা  
 আছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আকর্ষণী  
 শক্তির ভিতরে বিকর্ষণী শক্তিটাও প্রচ্ছন্ন  
 থাকে। অতীতকালে ইহাই প্রবল আকারে  
 দেখা দেয়। তাবিয়া দেখিলেই স্বীকার  
 করিব, পূর্কোক্ত দার্শনিক, ভয় ইত্যাদি শ্রেণীর  
 আকর্ষণের ভিতর বিকর্ষণের ভাবটা যেন  
 একটু অধিক দৃঢ়তার বিদ্যমান এবং এই

কারণেও এই শ্রেণীর আকর্ষণ নিকট আকর্ষণ  
 রূপে পরিগণনীয়। গোরে গোরে অনেক  
 সময় মাস্তুলে তাই হয়ে দাঁড়ায় বটে কিন্তু  
 সে ভাড়াভাবটা কতক্ষণ স্থায়ী? বিকর্ষণ ভাব  
 প্রায় বিবর্তিত, সুতরাং বিশুদ্ধ উচ্চশ্রেণীর  
 আকর্ষণের উদাহরণ অসম্ভবান করিলে  
 অস্বাভাবিক অল্পরূপ, নিকটম কর্তব্য প্রকৃতিকেই  
 এই শ্রেণীর আকর্ষণের উচ্চতম উদাহরণ  
 রূপে সকলেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ  
 আকর্ষণে দাঁড়াইয়া আকৃষ্ট তাহারের মধ্যে উদাহরণ  
 দিখিল হইবার সম্ভাবনা আছে। সমাধি  
 বৈশ্যের সেই “হং প্রেমপ্রবণ চিত্তং বিশুদ্ধং  
 বদ্ধুঃ”—“কি করিব বদ্ধুগণ গুণহীন হলেও  
 তাহাবিগকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারি  
 না” উক্তিটি স্মরণ করুন। এত প্রেম না  
 হলে কি কেহ কখন মহাদেবীর কৃপায় লভ্য  
 মুক্তি লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়? পাণ্ডীকে  
 সকলেই ঘৃণে খেদায়, কিন্তু প্রেমে পাণ্ডল  
 মহাপুরুষ বিনা আর কেহ কি বলিতে সমর্থ  
 “তোমরা সব নির নির পাণ্ডের বোকা আমার  
 ঘাড়ে চাপিয়ে পরমানন্দে হরি বল” (মহাভা  
 হরনামের পত্রাবলি, ২৯ খণ্ড, ১০৭ পত্র)।  
 প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বেশ মনে, গীতার, শ্রীমৎ  
 পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, মহাত্মা হরনাথ প্রকৃতি  
 মহাপুরুষবর্গের কথায় ও কার্যে, এই প্রেমা-  
 দির দ্বায় উচ্চ শ্রেণীর আকর্ষণে বাধা পড়ি-  
 বার ভগ্ন ও আমাদের উপাস্যদেহ এই ভাবে  
 সংযোগ স্থাপন করিয়া সিদ্ধকাম হইবার ভগ্ন  
 আমরা নিরন্তর উপদেশ পাই।

পুরাতন হইতে বিজ্ঞেয় সম্ভাবনা না  
 থাকিলে, জাতিভেদের ও নূতন জাতি গঠনের  
 সম্ভাবনাও ভিন্নোভিন্ন হয়। এই হেতু বলা  
 চলে, বিশুদ্ধ প্রেম উপলব্ধি জাতি ভেদ ও  
 জাতি গঠনের কার্যও সমাপ্ত হয়। যিনি

এইরূপ প্রেমে প্রেমিক তিনিই প্রকৃত "ভাত হারাইয়া বৈকুণ্ঠ।"

সাধারণ জাতিভেদ হেনিয়া যদি বিরক্ত হও

তবে ঐ সব দৃষ্টান্ত ও উক্তের প্রেণীর আকর্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা পাও।  
বৈরাগী হইতে চাও, আগে অসুযোগী হও।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

## শস্যক্ষেত্রে সবুজ-সার

আজ কাল শস্যক্ষেত্রে সবুজসার ব্যবহার করিয়া অনেকেই উৎকৃষ্টতর ফললাভ করিতেছেন। আমাদের দেশের কৃষকগণের মধ্যেও ইহা সম্পূর্ণ অবিদিত নহে। অনেকেই পাটের জমীতে শণ লাগাইয়া শণগাছ কিছু বড় হইলে ঐ গাছ সবেত জমী লাঙ্গল ও মই দিয়া উড়া পড়াইয়া তাহাতে রবিশস্ত বপন করে। ধান কাটিয়া লইবার পর জমীতে যে "নাড়া" বা বিচালী থাকে অনেকে তাহা জমিতেই পড়াইয়া থাকে অথবা জমীতেই পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলে। ইহাতেও জমীর উর্বরতা-শক্তির অনেক উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু কি প্রণালীতে সবুজসার প্রস্তুত করিলে এবং কোন্ সময়ে তাহা জমীতে প্রয়োগ করিলে সর্বোৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের কৃষকগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহার কারণ আমাদের দেশের শিক্ষিত ভ্রমলোকগণ এখনও কৃষিকে নিত্যক অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

বিগত ১৯১২ সালের জুন মাস হইতে পুণা সর্বব্রহ্মেট কৃষি বিজ্ঞানগবে সবুজসারের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা হয়। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে (Bulletin No.40)। সাধারণের অবগতির লক্ষ্য আয়ত্তা নিয়ে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া

দিলাম। পুন্যতে শুধু শণগাছ দ্বারাই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু আবশ্যকমত অত্র গাছ দ্বারাও এই পরীক্ষা করা হইতে পারে।

সকলেই জানেন কোন গাছ বা লতা কিছু-কাল মাটিতে পুতিয়া রাখিলে উহা ক্রমে পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়। কেন পড়ে? তদন্তের বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে মাটিতে অনেক রকম কীটাত্ম আছে। কিছু মাটিতে পুতিলেই উহার সললবলে তাহাকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের অবশ্যজ্ঞাবী ফলস্বরূপ প্রোথিত গাছ বা লতার বিভিন্নাংশ ক্রমশঃ বিসিষ্ট হয় এবং পরিণামে উহার সমস্ত ভাগ পচিয়া মাটি হইয়া যায়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে কোনও একমাত্রীয় কীটাত্মদ্বারা প্রোধিত উদ্ভিদের সকলদেশের বিশ্লেষণ কার্য্য সংসাধিত হয় না বা শতের দ্বারা এমোনিয়া ও নাইট্রোজেনের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। বরতঃ প্রোধিত উদ্ভিদের উপর জন ও বাহুব ক্রিয়ার দ্বারা বৃদ্ধি দ্বারা এই সমস্ত কীটাত্মের কার্য্য অনেকটা সংযত ও গমন ক্রিয়াও উদ্ভিদের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ করা বাগতে পারে। শস্য সবুজসার হইতে বাধ্যতাপূর্ণ এমোনিয়া ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাহাতে এই এমোনিয়া ও নাইট্রোজেন সহজে অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে সবুজসার

প্রস্তুতকালে সেইরকম নুষ্টি রাখা উচিত। কোনও গাছ বা লতা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার পর জমীর সরসতা বা জলীয়ভাগের বৃদ্ধি করিতে পারিলে উহার গ্রন্থিসমূহ ও অপেক্ষাকৃত কঠিনাংশ (কাঠময়) গুলি সহজেই ও অন্তর্য সরসের মধ্যে নরম হইয়া আসে। তারপর, জমির জলীয়ভাগের পরিমাণ কিছু কমাইয়া উহাতে বায়ু চলাচলের সুবিধা করিতে পারিলে সহজেই এমোনিয়া ও নাইট্রোজেনের উৎপত্তি হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে ইহাই লব্ধসার প্রস্তুতের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোপেক্ষা সহজসাধ্য উপায়।

উপরে বলা হইয়াছে যে প্রোথিত উদ্ভিদের প্রধানবস্তু্যর জমীর পুষ্টি সরসতা ও পরে তাহাতে বায়ু চলাচলের সুবিধা থাকা চাই। বস্তুতঃ এই দুইটির উপরেই লব্ধসারের উপকারিতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। চর সপ্তাহ বয়সের একটি লগ-গাছ শতকরা পাঁচ ভাগ জলীয়াংশ বিশিষ্ট জমিতে পুঁতিয়া নয়মাস পরে ভুলিয়া দেখা গিয়াছে যে এত দীর্ঘ সময়েও উহার নরম অংশ মাত্র পচিয়াছে— অপেক্ষাকৃত শক্তাংশ যেমন তেমনই রহিয়াছে।

লব্ধ সার প্রস্তুতকালে শুধু এমোনিয়া ও নাইট্রোজেনের উৎপত্তির প্রতিই নৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রোথিত উদ্ভিদের প্রধানবস্তু্যর আর্গিনিন, হিস্টিডাইন (arginin, hystidine) প্রকৃতি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহার অনেকগুলিই শস্তের প্রাথমিক অবস্থাতে খাত্তরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এগুলি সাক্ষাতভাবে শস্তের মূল দ্বারা গ্রহীত হয় কিনা অথবা শস্ত এই সমস্ত যৌগিক পদার্থ হইতে এমোনিয়া ও নাইট্রোজেন বিশ্লেষণ করিয়া

লয় কিনা, তাহা এখনও স্থির রূপে জানা যায় নাই। তবে ইচ্ছা স্মিক যে এগুলির সম্ভাব্য উপকারিতা করিতে জানিলে এতদ্বারা শস্তের অনেক উপকার হইতে পারে। মনে রাখা উচিত, প্রোথিত উদ্ভিদের প্রধানবস্তু্যই এই সমস্ত যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বর্ষাকালে ক্ষেত্রে লব্ধসারের নিমিত্ত সাত পুঁতিলে এতদ্বারা হৈমন্তিক বা আন্তঃধাতের যেমন উপকার হয়, পরবর্তী রবিশস্তের তেমন চর না।

বেহার অঞ্চলে এখনও যথেষ্ট নীলের আবাদ হইয়া থাকে। সেখানে নীল তৈয়ারীর পর তাহার পরিত্যক্ত অংশগুলি তামাক ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের পাটের মত সেখানে প্রধানতঃ নীলগাছগুলি কাটিয়া লইয়া অল্পে ডুবাইয়া “মাগ” দেওয়া হয়। পরে “নীল” বাহির করিয়া লওয়া হইলে পর পরিত্যক্ত অংশগুলি এক জায়গায় গাথা করিয়া রাখা হয়। এক জায়গায় স্তপাকার করিয়া রাখার ইহার মধ্যে ততটা বায়ু চলাচল করিতে পারে না এবং পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই উপায়ে গাছগুলি দ্রুত সহজে ও অল্প সময়ে পচিয়া থাকে, শুধু সরল মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে তাহা হয় না। তখন এই আধা পচা গাছ গাড়ী বোঝাই করিয়া তামাকের জমিতে ফেলিয়া চাষ দেওয়া হয়। ইহা তামাকের উৎকৃষ্ট সার এবং বেহার অঞ্চলে এই নীল-সারের প্রাপ্তির সুবিধা অসুবিধার উপরই তামাকের জমির খাদ্যানার কম বেশী নির্ভর করে। এমন কি, অনেক জায়গায়, শুধু তামাকের জমির সারের জন্য নীলের আবাদ করা হইয়া থাকে। এতদ্বারা জমির সরসতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় পরবর্তী

শস্ত্রের অনেক উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু এই সরস্রা রক্ষা প্রাপ্তি উদ্ভিদের বিশেষভাবে উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ছয় সপ্তাহ বয়সের একটি শস্য-গাছ শতকরা পাঁচভাগ জলীয় অংশ বিশিষ্ট জমিতে পুষ্টি দ্বারা রাধিমা নগ্নমাস পরে দেখা গিয়াছে যে উহার শস্য-পত্রগুলি যেমন তেমনই রহিয়াছে। বলাই বাহুল্য অবশ্যকার সাগরদ্বারা শস্তের পাত, মাটির আঁশের উন্নতি সাধন বা তাহার লস্করণ করিবার ক্ষমতার বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন কাজই হইতে পারে না। সুতরাং জমিতে প্রাপ্তি করিবার সময় গাছের পরিপক্বতা ও উহার বিশেষভাবে উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা সর্বোচ্চভাবে কর্তব্য।

সবুজসারের প্রস্তুত বিষয়ে শুধু জমির সরস্রতা বা তাহাতে বায়ু চলাচলের বন্ধাবৃত্তের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই সব হইল না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোন কোন জাতীয় শস্য অপর জাতীয় শস্য অপেক্ষা জমি হইতে অধিকতর রস শোষণ করে। যেমন, কলাই বা শুট জাতীয় শস্য সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় শস্য অপেক্ষা এত অধিক রস শোষণ করে যে উহা হইতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহারাই এই ক্ষতির পূরণ হয় না। সুতরাং সবুজ সারের ক্ষমতা গাছ নির্বাচনকালে দেখিতে হইবে যে উহা দ্বারা একদিকে যেমন অধিক নাইট্রোজেনের উৎপত্তি হইতে পারে, অপরদিকে জমির সরস্রতা রক্ষা করিয়া বা নিজে জমি হইতে অল্প রস গ্রহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট রস দ্বারা বর্ধমান শস্তের উপকার করিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে শস্য অপেক্ষা দ্রুত গাছের এই সরস্রতা রক্ষা করিবার ক্ষমতা খুব বেশী। শস্যগাছ মাটিতে পুষ্টিবার পবেই

বৃষ্টির অভাব হইলে একদিকে যেমন উহা ভালরূপে পচিতে পারে না, অপর দিকে বর্ধমান শস্তের পক্ষে যে রসের প্রয়োজন তাহাও সম্যকরূপে সরবরাহ করিতে পারে না।

কিন্তু জমির সরস্রতার ব্যবস্থা করিলেই উৎকৃষ্ট সার হইবে না। উপযুক্ত সময়ে প্রাপ্তি উদ্ভিদে দাহাতে ভালরূপে বাতাস লাগিতে পারে তাহারও সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে। শতকরা বিশভাগ জলীয় অংশ বিশিষ্ট জমিতে শস্য গাছ পুষ্টি দ্বারা একবারও না কোলাইয়া বারো সপ্তাহ বা তিনমাস পরে দেখা গিয়াছে যে উহা তখনও ভালরূপে পচে নাই। অথচ শতকরা ষোলভাগ জলীয় অংশ বিশিষ্ট জমিতে উহা পুষ্টি দ্বারা প্রতি সপ্তাহে একবার ভাল করিয়া কোলাইয়া মাটি আদ্যুপ করিয়া দেওয়ায় ঐ সময়ের মধ্যে উহা উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা দাইতেছে যে শস্তের ক্ষমতা উৎকৃষ্ট সবুজ সার প্রস্তুত করিতে হইলে যতখানি মাটির নীচে সহজে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে, ঠিক ততখানি মাটির নীচে গাছ পুষ্টিতে হইবে। অবশ্য এই গভীরতা মাটির আঁশের প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে শব্দই প্রতীক্শমান হইবে যে উপযুক্ত পরিমাণ ও যথাকালে প্রযুক্ত মল ও বায়ুর উপরেই সবুজ সারে উৎকর্ষাপকর্তা প্রধানতঃ নির্ভর করে। জমিতে বায়ু চলাচলের সুবিধা করিয়া দেওয়া অনেক সময়েই সহজ সাধ্য। কিন্তু মলের ক্ষমতা সর্বদা একমাত্র আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে অনেক সময়েই কাষ্য পণ্ড হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় উপরে বেহার অকলে নীল "জাগ" দিবার যে প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে বা অন্য কোনরূপ



উপায়ে মাটিতে পুঁতিবার পূর্বেই পাছের অঙ্গত: কাঠময় কটিনাংগুলি পচাইয়া অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া লইয়া তবে উহা পত্রক্ষেত্রে প্রোথিত করা উচিত। তদনন্তর জমিতে পত্র বুনিলে অত্যন্তকালের মধ্যেই উহার কতকটা ঝাড়া সংগ্রহ হইতে পারিবে এবং এমোনিয়া ও নাইট্রোজেনও অনেকটা সহজে উৎপন্ন হইবে।

এই প্রকার আর একটা উপকারিতা এই যে এতদ্বারা একদিকে যেমন সাররূপে ব্যবহৃত পাছের পচন ও বিস্তরণ কার্যের পরিমাণ অনেকটা সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে, অপর পক্ষে ঠিক উপযুক্ত সময়ে এই সার জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সার প্রয়োগ ও পত্র রোপণের সময়ের ব্যবধান যতই বেশী হয়, ব্যবহৃত সারের উপকারিতাও ততই কমিতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থির হইয়াছে যে এই ব্যবধান ষাট সপ্তাহের বা দুইমাসের অনধিক হইলেই সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

এই প্রথা দ্বারা আরও একটা এই উপকার হয় যে পত্রাবশেষ অল্পপুঙ্ক্ত জমিতে সূক্ষ্ম সারের অল্প পাছ জমাইয়া পরে আবৃত্তক মত জমিতে বেওয়া যাইতে পারে। কারণ পত্রের জমিতে ইহা উৎপন্ন করিলে অনেক সময়েই এতদ্বারা ঐ জমীর স্রপস্রা অনেকটা কমিয়া যাওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা।

নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করিবার সময় সর্জবা মনে রাখা উচিত যে সারের ভারতম্যাহুসারে অভিস্রবিত ফলেরও বিশেষ কমবেশী হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন সারের একটা প্রধানতম দর্শ এই যে ইহার আবৃত্তকীয় পরিমাণের কিছুমাত্র কম পড়িলেই, তদ্বারা পত্রের কিছুমাত্র উপকার হয় না।

অনেক সময়ে জমিতে নাইট্রোজেন-সার ব্যবহার করিয়াও যে কোনওরূপ ফল পাওয়া যায় না, তাহার কারণও এই। সুতরাং জমিতে কি পরিমাণ নাইট্রোজেনের দরকার পূর্বেই তাহার পরীক্ষা করিয়া পরে তাহাতে সার দেওয়া কর্তব্য। এই অল্প প্রথমেরই সমস্ত জমিতে সার না দিয়া, প্রথমত: উহার অল্প অল্পে কিছু সার দিয়া সারের আবৃত্তকীয় পরিমাণ নির্ধারণ করা কর্তব্য।

কোনও উদ্ভিদকে বায়ুপুঙ্ক্তাবস্থা বা অল্প বায়ুতে পচাইতে আরম্ভ করিলে প্রথমাবস্থায় নাই ট্রাইট জাতীয় কতকগুলি বিযাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। বলাই বাহুল্য এগুলি পত্রের পক্ষে বিশেষ হানিকর। জমির জলনিকাণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই সমস্ত বিযাক্ত পদার্থের নিরাসন করা যাইতে পারে। এই সমস্ত বিযাক্ত পদার্থের দ্বারা অনেক সময়েই ধানের বিশেষ ক্ষতি হইতে দেখা যায়। অনেকস্থলে বিগের পচা কচা মাটি জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা হয়। এই মাটিতে এই সমস্ত বিযাক্ত পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী থাকে। সুতরাং পত্র ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার পূর্বেই ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস লাগাইয়া লওয়া উচিত। রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পারিলে বিযাক্ত পদার্থগুলি আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া যাইবে।

অনেক সময়ে জমিতে সূক্ষ্মসার দিবার পরেই যদি অত্যধিক বৃষ্টি বা অল্প কারণে জমিতে জল ঝাড়ায় এবং যদি শুষ্কতাভি জলনিকাণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে, তবে এই সমস্ত বিযাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া পত্রের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। তখন বাহাতে সহজে এই জল সরিয়া যাইতে

পারে ও সারে বাহিরের বাতাস লাসিবার  
জ্বিলা হয় অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করা  
সরীতোভাবে কর্তব্য। মুক্তিকাজের  
অত্যন্তরূপে দিয়া জল চলিয়া বাইতে পারিলে  
এই সমস্ত বিবাক্ত পদার্থের অধিকাংশই জলের

সহিত ভাসিয়া অন্তর চলিয়া যায় এবং জল ও  
বায়ুর সহিত যে অক্সিজেন বা অক্সিজেন বায়ু  
থাকে তাহারও অনেক বিবাক্ত পদার্থ বিনাশ-  
প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্বাখনাথ মজুমদার।

## মফঃস্বলের বাণী

### ১। দেশাচারে পাপ শ্রোত

আজকাল অধিকাংশ ব্যক্তির মুখে শুনিতে  
পাট, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত  
পর্যন্ত হিন্দু বালবিধবাদের অবস্থা দর্শন করিয়া  
বাত্তবিকই ভারতের অধিবাসিগণের উপর  
তাঁহাদের ঘৃণার উল্লেখ হয়। দেশাচার হতে  
হিন্দু বালবিধবাদের উপর তাহার। “পুনঃ  
বিবাহ করিতে পারিবে না,” এই কঠোর নীতি  
পালনের ভার কেন ন্যস্ত হইয়াছে তাহা  
তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইহা নাকি  
কোন শাস্ত্র, কিংবা সংহিতার কথা নয়।  
দেশাচার, কাল ভেদে ও পাত্র ভেদে হইয়া  
থাকে, দেশাচারের উপর নির্ভর করিয়া সমা-  
জের ভাল মন্দ সম্যক উপলব্ধি না করিয়া, শুধু  
জ্ঞানচারের দ্বারা খরিয়া নাকি আমরা চলিয়া  
থাকি এবং এতদুপে আমাদের চল। যে কত দূর  
বুক্তি সত্ত্বে তাহাও না কি তাঁহারা বুঝিতে  
পারেন না। এই দুর্নীতির প্রভাবে ভারতে  
যে কত পাপ সঞ্চার হইতেছে, সমাজের নেতৃগণ  
বোধ হয় এই নিম্ন সম্ভার করিবার সময়  
বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। পুরুষ বহু  
বিবাহ করিতে পারিবে, পাত্র নিবেদ্য নাই।  
দ্রব্যপানে কিংবা ব্যক্তিচারেও তাহাদের উপর  
সমাজের কোন শাসন নাই। শাসন শুধু  
অনাথা বালবিধবাদের উপর। কি নিহর

ব্যবহার!” এখন অনেক শিক্ষিত হিন্দু,  
হিন্দু সমাজ সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছেন।  
বালিকা বিধবাদের দুরবস্থার তাঁহাদের  
জগদ ব্যথিত হইতেছে।

আজকাল বালিকা বিধবা ঘরে রাখা যে  
কি দায় হইয়াছে, তাহা কেবল ভুক্তভোগীই  
বুঝে। এই পান্ডিত্য শিক্ষিত সংস্কার প্রয়াসী  
নব্য যুবকদের অত্যাচারে, বিধবা কস্তার  
পিতামাতার লাজনার একশেষ হইতেছে। সত্য  
বটে, এখনকার নব্য যুবকদের নিকট তাঁহা-  
দের পিতামাতা প্রকৃতি নির্কোষ, নিহর  
এবং ঘৃণার পাত্র বলিয়া পরিগণিত, কেন না  
তাঁহারা পান্ডিত্য সভ্যতার আলোক দ্বারা  
করিবার অবসর পান নাই; কিন্তু তাঁহারা  
এখনকার যুবকদের দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান  
বঞ্চিত ছিলেন না, এমন পান্ডিত্য গ্রামো-  
কোন রেকর্ড ছিলেন না। পশ্চিম হইতে  
কনি আসিল, বিধবা বিবাহ না বেওয়া মহা-  
পাপ, কেননা সে দেশে বিধবা বিবাহ হয়,  
আর অমনি যুবক নাচিয়া উঠিল—বাত্তবিকই  
ত আমরা বিধবা বিবাহ না দিয়া মহাপাপ  
করি, অতএব আমাদের পূর্ব পুরুষগণ নিত্য  
নির্কোষ ও নিহর ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ  
শুনিয়া কাজ নাই, বিধবা বিবাহ দিতেই  
হইবে। যুবকগণ একথা ভাবে নাই যে তাঁহারা

বয়স কত, পান্ডাভা। সভ্যতার বয়স কত, হিন্দু সভ্যতা। কত দিনের আর এই বিধবা বিবাহের আদর্শ তাঁহারা। কত দিন দেখিয়াছেন ? শত-করা ৪ পুরুষ ধরিলে ১০০ বৎসরে ২৮ পুরুষ হয়। আর ১০০ বৎসর হইল বিধবা বিবাহের আদর্শ মুসলমানের ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে আসিয়াছে। কিন্তু এপাশত তিন্মুগ এই আদর্শ গ্রহণ করিল না কেন ? ইহা ইতিহাসের কথা।

ইতিহাস বলিতে আমরা রাজাদের দৃঢ়-বৃত্তান্ত বুঝি এবং দুঃস্থ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকে চির বিদায় প্রদান করি। অতীতের ইতিহাস যে আমাদের ভাবী জীবন গঠনের প্রণালী নির্দেশ করে একথা আমরা জুলিয়া যাই। আমাদের ১০।১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা সমাজ সংস্কার কর্ণে ব্রতী হই, আর পূর্ক পুরুষদিগকে গালি পাড়ি। বাহারা পূর্ক পুরুষদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞানও থাকে না, তাই তাহারা আত্মহারা হয়। আত্মহারা ব্যক্তিই পথ হারায়। পথ হারাইলেই যে যে দিকে যাইতে বলে, সেই দিকেই যায়, ঠিক অষ্টিক বুঝিবার কক্ষতা থাকে না। তবিল, “বিধবা বিবাহ না দেওয়া অসত্য,” অমনি বুঝা ধরিল বিধবা বিবাহ না দেওয়া অত্যন্ত অসত্য” কিন্তু তাবিল না কেন অসত্য ? বহি তাবিল, তখন বুঝিল, “পুরুষের বেদন ইঞ্জির আছে, স্ত্রীলোকের তেমনি ইঞ্জির আছে। পুরুষে যে ইঞ্জির নিগ্রহ করে না, স্ত্রীলোকে সে ইঞ্জির নিগ্রহ করিবে কেন ? স্ত্রীলোকের বেলায় এ পার্থক্য কেন ?” এই কেন টুহু বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, চেষ্টাও নাই। বাহা মন্ম তাহা মন্মই, তাহাতে ভাল কি থাকিতে

পারে ? সকল বিবাহেরই যে ভাল মন্ম দুই দিক আছে, তাহা ইহারা বুঝিতে পারেন না। অথচ মনে করেন পূর্ক পুরুষ অর্থাৎ শাস্ত্র-কর্তাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা বুঝেন ভাল।

এই যে ১০০ বৎসর হইল মুসলমানগণ এ দেশে আসিয়াছেন, এই ১০০ বৎসরই বিধবা বিবাহের একটা চিত্র হিন্দুর চক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ক তাহারা এ বিষয়টা বুঝিতে না পারিলেও এ ১০০ বৎসর তাহারা অনেক দেখিয়াছেন, অনেক বুঝিয়াছেন, তথাপি সমাজকে এমন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমাদের দেশের বিধবাগণ বুঝিতে পারিলেন না যে, কেন মুসলমানের বিধবাগণ এই পাপ কার্য করে। আজিও সেরূপ বিধবার অভাব নাই। কিন্তু আজ দেশ পাশে জুড়িতেছে কেন ? আজ বিধবার চরিত্র দুবিত হইবে কেন ? আজ বিবাহের কথা শুনিলে সকল বিধবা কানে হাত দেয় না কেন ? তাহার কারণ এই নব্য যুগগণ ! এই যে বিবাহের গান, এই যে বিধবা বিবাহের গান, এই যে নাটক নচেপে বিধবার বিরহের কথাই ছড়াছড়ি, এ কাহার গোপে ? অতি চরিত্র-বানকেও চেষ্টা দ্বারা প্রলোভন দ্বারা চুচরিত্র করা যায়, একথা কে না বুঝে ? একদিন, দুই দিন, মণদিনের চেষ্টার না হউক বিশদিনের চেষ্টার অপাধ্য সাধন করা যায়ই যায়। এই তাবই তো বিধবা উত্তেজিত হইতেছে, চরিত্র নষ্ট করিতেছে ! শুধু বিধবার ঘোষ কি ? পুরুষগণ তোমাদের কি ঘোষ নাই, তোমাদের বহু বিবাহে শাস্ত্র আপত্তি করে না বটে, কিন্তু তোমরা শাস্ত্রের গোহাই বিধা বহু বিবাহ করা ব্যতীত আর কোন্ নিয়মটা মান ? কাম রিপূর্ক বশ করিবার লগ্ন শাস্ত্রে উপদেশ আছে, তোমরা কি তাহা কর ? শাস্ত্রে বলে

পুরাত্নেই ভার্যার প্রয়োজন, তাই স্বত্বেকাল  
ব্যতীত স্ত্রীসহবাস নাহে নিষেধ। কৈ সে  
কথা কয়জন মানিয়া থাকে ?

ঐ যে বেস্তার বার অব্যবহিত বহিষাছে,  
স্বক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সেই ঘাবের দিকে অগসর  
হইতেছে, যে সমাজ সংস্কারক, তোমার চক্ষু  
সে দিকে অন্ধ কেন ? তাহাতে কি সমাজে  
অনিষ্ট হইতেছে না ? ঐ যে শিশুপুত্র অকালে  
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জনক জননীর পঙ্করাহি  
ভাবিধা দিতেছে, কেন জান ? ঐ পিতা  
দিবারাত্রি বেশ্যালয়ে থাকে, সেই পিতার  
ঔরসকাত সন্তান ঐ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল,  
হে সমাজ সংস্কারক ! তোমার বিধান কি  
ইহার কেন প্রতিবিধান নাই !

ঐ যে জননী মলিনা, নোকাডুয়া, শীর্ণ  
মেহে, ভূমিপথায় পড়িয়া দিবা রাত্রি চক্ষের  
জলে বক্ষ ভাসাইতেছে, নিমেষ শরীরটী  
বহনেও অক্ষম হইয়াছে, কেন জান ? ঐ  
জননী ১৪ বৎসরে ১১। ১২ টী সন্তান প্রসব  
করিয়াছে, একটীও বাঁচিয়া নাই ! হায়  
সংস্কারক ! এই হতভাগ্য সন্তানগণের নরান্থ,  
কামের দাস পিতার লজ্জা তোমাদের বিধানে  
কি কোন দণ্ডই লিখে না ? ঐ যে বিধবা স্নান  
মেহে থাকিয়া সংসারের কত উপকার করি-  
তেছে, বীথ বধি কার্য্য করিতেছে, দুর্দান্ত  
রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া অহ করিবার  
লজ্জা প্রাপণ চেষ্টা করিতেছে, যে সমাজ  
সংস্কারক ! কেন তাহাকে ভূমি বিরহগীতি  
গুনাইতে এত চেষ্টিত হইয়াছ ! তোমার কি  
আর কর্তব্য কার্য্য নাই ! ঐ দেখ ! একটী  
কামপরাম্পদ লম্পট নরান্থ ঐ বিধবাটীর দিকে  
লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতেছে, রাখ তোমার  
বিরহ সঙ্গীত, যার ঐ লম্পটকে ! পুরুষকে  
সংস্কার করিবার বিধান কি তোমার নিকট

নাই ? কাম রিপুকে উত্তেজিত করিতে তুমি  
এত চেষ্টিত কেন ? যে শিক্ষিত যুবক !  
নিশ্চয় জানিবে যে আশ্বহারা, সে আশ্ব-  
সমাজের কত দেখিতে পার না, সে কাণে  
হাত না দিয়া কেবল চিলের পঙ্কাতেই দৌড়া-  
ইয়া আশ্ব কয় করে। আর যে জননী স্নান-  
ভূমি এমন সন্তান লাভ করেন, তাহার উত্ত-  
তির আশা যে কতদূরে অবস্থিত তাহা  
সহজেই অস্বমেধ। যেখানে দত্ত কামের দ্রব  
সেখানেই তো ক্ষয়, সেখানেই অকাল মৃত্যু,  
সেখানেই ক্রণ হত্যা। যে দেশে বিধবা  
বিবাহ আছে, সে দেশে কি ক্রণহত্যা হয় না,  
সে দেশে কি পাশাচার নাই, তবে সেখানে  
অবস্থান হাড়পের প্রয়োজন হয় কেন ?

হে সমাজ সংস্কারক ! তোমার পূর্কপুরুষ  
এই সব দিক বিবেচনা করিয়াই কামকে দমন  
করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মূল ব্যাধি নষ্ট  
হইলে তাহার উপসর্গাদির মোর হইতেই  
পারে না, ইহা তুমি স্বক না, কিন্তু তাহারা  
বৃদ্ধিতেন। তাই শাস্ত্রে লম্পটের শাস্তি,  
উত্তম শৌহ নৃষ্টি আলিঙ্গন বিতর্কিত। সেখান  
হইয়াছে, কিন্তু তোমরা বিজ্ঞানবিৎ হইয়াছ,  
বিজ্ঞানের বলে জানিয়াছ, এমন শাস্তির কোন  
স্থান নাই, তাই পূর্ক পুরুষকে নির্দোষ বলিয়া  
লম্পটতার প্রস্তর দিতেছ।

বাহারা বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন,  
তাহারা স্বত্বেকাল ব্যতীত স্ত্রীসহবাস নিষেধ  
করিয়াছেন। তাহার মধ্যেও আবার কহা  
স্ত্রী, কয়শরীরী পুরুষ প্রভৃতির পক্ষে নিষেধ  
বিধি আছে, তিথি পঙ্কাদি কত বাধাবিষ  
আছে, স্থান অস্থান কালকাল, কতট বিবেচনা  
করিবার কথা লিখিত আছে, সে সমস্ত  
মানিতে গেলে স্ত্রীসহবাসের অতি অল্প সুবি-  
ধাই ঘটে, এসব কি তোমরা মান ? বিধবার



প্রকার খেলা ভাষা, দ্বিতীয় প্রকার খেলা বস্ত্র। ১০। বালকের দ্বারা বালিকাদেরও বাহ্যিক প্রয়োজন। দৌড়ান তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

## ২৪ পঃ বার্তাবহ

### ৩। মধ্যবিভেদর অঙ্গসমস্যা

অনেকেই বিশ্বাস, মধ্যবিস্তৃত গৃহস্থের অঙ্গ-সমস্তা দিন দিনই বাড়িতেছে। সাধারণতঃ ইহার দুইটা প্রধান কারণ নির্দেশিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহাদের আয়ের প্রধান উপায় চাকুরির পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তববোধের অপরিসীম মূল্যবোধিত আয়ের তুলনায় ইহাদের ব্যয়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই দুইটা মূল কারণের আধার ছোট বড় বয় উপকারণও বর্তমান রহিয়াছে। অর্থনীতির হিসাবে আমাদের সামাজিক জীবনে ইহাদের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে নিত্য আলোচ্য বিষয়। সম্প্রতি সমাধার গভর্ণমেণ্ট যে দুইটা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তথ্যগ্রন্থ প্রকাশ করাইয়াছেন, এগুলে তাহাও উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রন্থগ্রন্থান-সমিতি—এড্‌মিনিষ্ট্রেশন কমিটি বা শাসন-সংস্কারক সমিতি; দ্বিতীয় গ্রন্থগ্রন্থান—গ্রাই-সেস এনুকোমারী কমিটি বা মূল্যবৃদ্ধির কারণ-নির্ণায়ক সমিতি। ইহারা সাক্ষাৎসংঘ বা পরোক্ষভাবে মধ্যবিভেদর অঙ্গসমস্তার বিচার-ব্যবস্থা করিতেছে। বলা বাহুল্য, একই উদ্দেশ্যে বা অঙ্গসমস্তানকলে, একই উদ্দেশ্য-নির্দেশের আশা, কোন অঙ্গসমস্তান সমিতিই গঠিত হয় নাই। কিন্তু এই অঙ্গসমস্তান ফলে, পুরোঁস্মিত কোন কোন বিষয়ের মূল্যবৃত্ত কারণ নির্ণয়ে বেশব্যাপী সুবিধা ঘটতেও পারে। কাহারও কাহারও অঙ্গসমস্তান, এড্-

মিনিষ্ট্রেশন কমিটির বিপোর্ট চাকুরি সমস্তার-বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাদের এ অঙ্গসমস্তান সত্য কি না, জানি না। অঙ্গসমস্তানকারীতা বলেন—এড্‌মিনিষ্ট্রেশন কমিটি নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা সকলেই কর্মলাভ করিতেছেন—চাকুরির অভাবে, তাহারা এক্ষণ নিরক্ষার দল সৃষ্টি করেন না। বিশ্ববিভাগের তুল্য বৎসর বৎসর বৎ যুবক উপাধির বহুমাল্যে মগ্ন হইতেছেন, তাহাদের সকলের ভাগেই একটা না একটা চাকুরি মিলিতেছে, হুত্তরাং এড্‌মিনিষ্ট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্তে বুঝা যাইতেছে, আমাদের মধ্যবিস্তৃত সম্প্রদায়ের চাকুরী সমস্তার কথা অনুলক। দ্বিতীয় অঙ্গসমস্তানের আংশিক ফল ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এ কথা ঠিক, যে কারণেই হউক, দেশে বাস্তববোধের অপরিসীম মূল্যবোধি ঘটনায়ে এবং ইহাও একতরুণ পরীক্ষিত সত্য, বাস্তববোধের মূল্য বৃদ্ধিতে, মধ্যবিস্তৃত সম্প্রদায় কোন উপকার লাভ করিতেছেন না। মধ্যবিস্তৃত-সম্প্রদায়—বাগ্মন্যময়ীর ক্রেতা কিন্তু উৎপাদক নহেন। ফলে, ইহারা অধিমূল্যে বিভিন্নই ক্রয় করিয়া থাকেন।

প্রদত্তক্রমে আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে। যেরে অভাব থাকিলে, যে কোন কর্মগ্রহণেও শিক্ষিত যুবকের আগন্তি রহিতে পারে না, কিন্তু ইহাতে কি তাহার অভাব পূর্ণ হয়, বা ইহাতে তাহার প্রাণে শান্তি আসে? হুত্তরাং এড্‌মিনিষ্ট্রেশন কমিটির কথায় আংশিক সত্য রহিলেও, প্রকৃতপক্ষে আমাদের চাকুরী সমস্তার কোন নিরাকরণ হইতেছে না। বেশের লোকে সাধারণতঃ প্রত্যেক জানে চাকুরী সমস্তার কথাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

আমাদের বিবাদ, ঐ দুইটি অঙ্গুল্যের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, ইহাদের সম্পর্কে যেনে একটু আলোচনা হইবে; কারণ, অর্থ-নৈতিক হিসাবে, দুইটা ব্যাপারেই আমাদের সামাজিক জীবনের ইষ্টান্টি নির্ভর করিতেছে। দেশের সেই আলোচনার দিনে, দুইটা রিপোর্ট মিলাইয়া, আমরাও ইতার সত্যাসত্য নির্ণয়ে লগেই রহিব।

### চাকাপ্রকাশ

#### ৪। জন্মভূমি

কবি বলিয়াছেন—

কামিনীর কমনীয় কর্তৃত্বা হারে,  
লীলামান মণ্যমণি যেমন স্বন্দর,  
সেইরূপ সমুদার মেদিনী মাঝারে  
আছে দিবা স্থান এক অতি মনোহর।

সেই দিবাস্থানট আমাদের জন্মভূমি।

আমরা যে স্থানে জন্মি তাহা আমাদের নিকট এইরূপই স্বন্দর। ভূস্বর্ণ কান্দারে থাকিয়াও যেস্থান বেণিব্যার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠে—প্রবাসী যেস্থানে পানী হইয়া উড়িয়া আসিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যায়—নির্জানিত যেস্থানের কথা মনে করিয়া স্বর্গের স্থিতি বিস্মৃত হয়, সে স্থান আমাদের নিকট কত প্রিয় তাহা বাক্যে প্রকাশ করার সাধ্য নাই। যেস্থানে আমরা মার কোলে বসিয়া অন্তর পান করি—পিতার বর্ষ উপদেশে স্মৃতি-কর্তার পরিচয় লাভ করি—সঙ্গীতগের ক্রীড়া-মোহে লসারের মাদার কাঁধ পায়ে পরি, সে স্থানের মহিমা কে বলিতে পারে? জানী যে স্থানকে স্বর্গামণি পরিগণী অর্থাৎ স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন সে স্থান কি বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নহ? স্বর্গ তো জন্মভূমিতেই আরম্ভ হয়। যে স্থানে আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষ লাভ পিণ্ডিলাব—ঈশ্বরের পরিচয় পাইলাম, মহত্তম স্বর্গ তো বাস্তবিক সেইখানেই। এই পরিগণী জন্মভূমি সঘে আমাদের কর্তব্য কি

তাঁহা আলোচনা ও শিক্ষা করাই আজ আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই জন্মভূমি সঘে আমাদের কর্তব্য কি তাঁহা তো এক কথাতেই শেষ হইয়া যায়। যদি বলি তাহাতে দেশের উন্নতি হয় তাহাই করা আমাদের কর্তব্য, তবে আর কি বলিতে বাক্য রহিল? কিন্তু জন্মভূমির উন্নতি হয় কিণে তাহা কি আমরা জানি? বিশেষ আত্মপূরক আলোচনা না করিয়াও সংক্ষেপে এ কথা বলিতে পারি—স্বর্গ স্বর্গ কেন? না দেখানে ঈশ্বর বাস করেন। দেবলোক দেবলোক কেন? না, দেবতা বাস করেন। সেইরূপ দেশ বিশেষ বড় কেন? না, দেখানে মহৎ লোক বাস করেন। সেই জন্তই স্বর্গ তাহা সেই জন্তই স্বন্দর।

বর্তমানে আমরা সেই প্রাচীন আশ্রয়ের অধিবাসী, আমরা তাহাতে পৈত্রিক সঘে অধিকারী। কিন্তু আমরা সকল বর্ষার মধ্য হইতে না পারিলে যে আমাদের দেশ বড় হইবে না তাহা নিশ্চয়। আমরা বা আমাদের দেশের ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর আমাদের দেশের ভাল বা মন্দ হওয়া নির্ভর করিতেছে। এটি দেশ পৃথিবীর মধ্যে লক্ষ্য ছিল কখন? এখন এই দেশের সকল লোক বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও বর্ষে পৃথিবীর মধ্যে লক্ষ্য ছিল এমন যদি আমরা সে ক্ষেত্রতা লাভ না করি, বা লাভ করিতে চেষ্টা না করি তবে আমাদের দেশ বড় হইবে কি করিয়া? কেবল “জননী আমার, মাত্রী আমার, দেবী আমার, আমার দেশ।” বলিয়া গান গাহিলে আমার দেশ বড় হইবে না। আমরা বড়—আমরা ভাল, কেবল একথা বলিলে আমরা বড় বা ভাল হইব না। বড় ও ভাল হইতে হইলেই বড় গুণ অধিকার করা চাই।

বড় হওয়ার অধিকারীত্ব যৎগতও নহে—দেশগতও নহে। আমি হিন্দু, উচ্চ হিন্দু বংশে জন্মিচ্ছি, সুতরাং আমি বড় হই। বলিয়া অহঙ্কার করিবার দিন পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। এখন জীবনে মহত্বের লক্ষণ না থাকিলে লোকটা ছোট কি বড় তাহা বলিবার কাহাও অধিকার নাই।

এখন পণ্ডিত বলিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। ভূমি পণ্ডিত তাহা বিববিধানিকের পারদর্শিতা পত্রদ্বারা তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে বা তোমার লিখিত গ্রন্থ বা গবেষণাকে তোমার পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্যরূপ উপস্থিত করিতে হইবে। নতুবা তোমার বিদ্যারূপ বা কাব্য-তীর্ণ উপাধি ভূমি। কেহ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না। কেবল তোমার পরিচয়ের মধ্যবর্তী। যেখানেও বর্তমান সময়ে কেহ তোমাকে খণ্ডী বলিবে না। যনের ব্যবহার দেখাইতে পারিলে তবে তোমার রাশা বাগদুর উপাধি লাভ হইবে। ভূমি সঙ্কল্পিত অথবা বলিলেও আমি আমার অন্তঃপুরে তোমাকে প্রবেশ কাঙ্ক্ষিতে দিব না। চরিত্রের পরীক্ষার উত্তীর্ণ না হইলে কখনও সং বলিয়া পরিচিত হইবার উপায় নাই।

বলিতে বাস্তবিকই লক্ষ্য ও শ্রুতিয় জনস্ব স্বইয়া যায় যে, যে দেশের রাজপুত্র বিদ্যা কোন ভূমিমালা পরন্তু সামান্য একটু পথ হাঁটিতে নিরাপদ মনে করেন না, সে দেশের পুরুষেরা জগতে সঙ্কল্পিত বলিয়া অভিমান করিবার আশা মনে পোষণ করিতে চাহ।

আমরা বড় হইব সেই দিন—যেদিন আমাদিগের মা ও ভগিনীরা নিরাপদে লব্ধ হইয়া থাকিবে—হা আমাদিগের দেশের লোক উন্নত হইয়াছে। নতুবা জব্বারতা কলঙ্ক লইয়া বলিতে আসিও না—ওগো, আমরা বড় বংশে আত্মদ্বাদ্ধি আমরা বড়।

যদি আমরা বাস্তবিক বড় হইতে চাই তবে জগতে আমাদিগকে উত্থানপথে পথে ধাক্কাইতে হইবে বাহারা বৈজ্ঞানিক ব্রহ্ম সঙ্কল্পের স্বষ্টি করিয়া জগৎ উন্নত করিয়া তুলিতেছেন, বাহারা পৃথিবীর ধূলিতে বসিয়া বসল গ্রহের জীবের সহিত কথোপকথন করিতে চাহিতেছেন, বাহারা পৃথিবী হইতে অশ্বত্থা, বহিরত, জরা, বার্দ্ধক্য, ত্যাগহীন দিয়া ক্ষুধিত পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া কহিতেছেন—ওগো! পৃথিবী যদি লব্ধ প্রসব না করে, তবে নাই অনাহারে যবির বলিয়া ভীত হইও না। মানুষের ভবিষ্যৎ বাদ্য রহিয়াছে ঐ বিজ্ঞান পুত্র, বিজ্ঞান আমাদিগকে

দেখাই এমন বিজ্ঞান-বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে, যাহা দেখনে আগরের প্রযোজন হইবে না। ভারতবাসী, তোমাদিগের অজ্ঞতাও মুখ লক্ষ্যের অবনত হই আমরা কি ইগামিগের জাতি বা জাত। বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য?

দেখ বড় করিতে চাও তবে আপনি বড় হও। আপনার জনহটা আগে বড় কর। পবের জগৎ দ্বারা আগুন করিতে শিক্ষা কর। জ্ঞান ও ধর্মদ্বারা আগে তোমার দেহ মন্দির সাজাইয়া সেখানে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা কর। তোমার জনস্ব ও বাহির আগে নির্মল হইয়া থাক। দেখিও বেশ আপনি বড় হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের লোক মধুসূক্ত মধুপের মত বড় হওয়ায় অমৃত লাভের জগৎ আমাদিগের দেশে ছুটিয়া আসিতেছে।

যতদিন সেই অবস্থা না আগে আপনাদিগের দেশের ক্ষুধার মূখ লক্ষ্যের অবনত করিয়া আই অন্ড্রেনী হিমাট্রি কন্দের সুচারিত হইয়া সাধনা কর। সেট দিন আসিবে কবে?

ত্রিবিপিনচন্দ্র পাল।

হরাজ

৫। “ক”

কলিকাতার কাছাকাছি কালীঘাটের কমলাকান্ত, কৃষ্ণগঞ্জের কীসারীপাড়ার কালী-কৃষ্ণ কবির কলিতা কবিতা কমলিনীর কব জয় করিয়াছিল। কৃষ্ণমহী কাত্যায়নীর কণ্ঠায়, কমলাকান্তের কামনাছায়া কণ্ঠায় কমল-কোরকোপম কুমার-কুমারী, কমলিনীর কোড় শোভা করিল। কিছুকাল কোড়কে কটিল। কমলাকান্ত কলিকাতার কাঠমহাউলি কেরানীর কথ করিতেন। কমলিনীর কেমন কপাল!—কালীঘাটেরই কোন কৃষ্ণকায় কুংলিতা কামিনী কথার কোশলে, কাম্পের হৃৎকে, কৃষ্ণ কমলাকান্তকে কবায়ত করিলেন। কায়েই, কবু কঠ। কলিত-কনক-কাঞ্চি কমলিনীর কপালে কমলী! কমলা-কান্ত হৃৎকিনীর “কোল-কলিত-কুত-কুটীরে” কোন কায়েই কার্পণ্য করিতেন না, কিন্তু কমলিনীর কাছে কমলাকান্ত কেবল



কার্পণ্য করিতেন। সুহৃদিনী, কাব্য, কাটলেট, কোথা করিয়া কমলাকান্তের কাণ্ডে দেখে কাব্যন করিয় কৰ্ম্ম তাহার করিতেন। কমলিনী কি করিবেন? কামিয়া কাটিয়া, কাণ্ডকাঠে কোনরূপে কাল কাটাইতেন। কেননা, কান্তকে কষ্টের কথা কহিলে কমলাকান্ত কর্ণপাতও করিতেন না, কেবল কৃৎখা করিতেন। কিন্তু কান্তপ্রাণ। কমলিনী কান্তের সু-ব্যবহারের কথা কখনও কাহারও কাছে কহিতেন না। কেহ কমলাকান্তের কলঙ্কে কটাক করিয়া হুংসা করিলে কর্ণপাতও করিতেন না। হুমার-হুমারী কষ্টের কারণে, কাহারও কাহারও কাছে কিছু কিছু কৰ্ম্ম করিতেন। কৰ্ম্ম করিয়া ক'দিন কাটে? কমলিনী কান্তের কাছে কৰ্ম্মের কথা কহিলেন, কত কাহুতি করিলেন, কত কাঁহিলেন, কিন্তু কিছুই কিম্বাকার কমলাকান্ত কি কমলিনীর কথার কেয়ার করেন? করিবেন কেন? কঠিন কান্ত কমলাকান্তের কাণ্ড কারখানায় ব্রিট-কলেক্টর কমলিনীর, কনককান্তি হুম-কোমল কমলিনীর কাণ্ড ক্রমশঃ কাণ-রোগে কাহিল! কিংকৰ্ণব্য-বিশুদ্ধ কালীকাক, কস্তার কাণের কথা, কলিকাতায় কতটিং কৃতবিদ্য রূপানু কবিরামকে কহিলেন। কবিরাজটীও কত কি করিলেন, কিছুতেই কাণ কমিল না! কাল কি কখনিকালে কাহারও কথায়, কাহারও ক্রমশে, কর্ণপাত, করিয়াছে? কৃতান্ত, কমলিনীকে কষ্টের কবলে কবলিত করিল! কস্তানোক-কান্তর কালীকাক কান্দি-বালা করিলেন। জন্মে, কুমারপ্রাণ কমলা, কমলাকান্তকে কুটুপি করতে, কমলাকান্ত কার্য। কামাই করিয়াও, সুহৃদিনীর “হুম-কুটীর” কাল কাটান; কাজে কাজই কাটম-হাউসের কালেক্টর কোণে কটুৎ করিয়া কমলাকান্তকে কর্ণচ্যুত করিলেন। কালক্রমে, কাণ্ড-হুল-কলঙ্ক কামুক কমলাকান্ত, কৰ্ম্মের কল্যাণে কারাগারে কিছুকাল কাটাইয়া, কালোপম কষ্টের কলেক্টর হুলকাৎ করিলেন

ঐকমলাকার কাণ্ডগীর।

ইচ্ছাভাবিত্ব

৬। জগদ্বীর দশ অনুরোধ

বাইবেলে “হতা করিও না,” “নিখা বলিও না,” “চুরি করিও না” প্রভৃতি দশটি আত্মা লিপিবদ্ধ আছে; সেই অহঙ্কারি প্রত্যেক বৃষ্ট-শিত অহঙ্কার দ্বারা রাধিষ্ঠা জীবনপথে অগ্রসর হ'ন। অধুনা সমগ্র অর্থনীতে এক নতুন দশায়া প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার মধ্যস্থত্ব প্রদত্ত হইল।

১। জুনি এখনই যে টাকা ব্যয় কর, তখনই নিরুত্ত তোমার স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও কল্যাণের কথা মনে রাখিও।

২। এখনই জুনি কেন বিশেষভাবে জব্য ক্রয় কর, তখনই তোমার দেশ দরিদ্রতর চর; এই কথাটি কখনও ভুলিও না।

৩। তোমার স্বর্থ যেন অর্থব্য ব্যতীত আর কাহাকেও লাভবান না করে।

৪। বিশেষে প্রস্তুত কলকজা ব্যবহার করিয়া জগদ্বীর কারখানাগুলির কলঙ্ক করিও না।

৫। তোমার খাইবার টেবিলে বিশেষ-ভাবে বাধ্যসামগ্রী কখনও পরিবেশন করিতে দিও না।

৬। অর্থনীতে প্রস্তুত কাগজের উপরে জগদ্বীর কলম দিয়া লিখিও, অর্থনীতে প্রস্তুত ব্রটিং কাগজ ব্যবহার করিও।

৭। জগদ্বীর মধ্য, জগদ্বীর কল, জগদ্বীর মন্ডই তোমার মেহে প্রস্তুত অর্থব্যবিক্রম সফলিত করিয়া দিতে পারিবে।

৮। যদি জগদ্বীর কবি তোমার ভাল না লাগে, তবে “অর্থ-উপনিবেশ-সমূহ হইতে আনিত কবি পান করিও।

৯। জগদ্বীর কাণ্ডই তোমার পোষাক হোক; জগদ্বীর টুপী ছাড়া তোমার মাথার আর কিছুই পরিও না।

১০। বিদেশি চাটুকারিতার মোহে এ সব উপদেশ ভুলিও না। যে বাহাই বলুক, স্থির জানিও, জগদ্বীর জিনিষই কেবল অর্থ-পিতৃ-জুনির সন্তানদের ব্যবহারের যোগ্য।

ঢাকা প্রকাশ।

# গাহছ

আঁখি বেলে তোনা অনেক খুঁজেছি, আর আঁখি মেলে নহ,  
বাতিবের চাওয়া শেষ, দেখি যদি ভিতরে চাটিলে চর ।  
কন্ড কবিহু আকুল প্রবণ, ভিতরের দিকে ফিরাহু নবন,  
নীলব কবাই মুখের বলনা দেখায়ে নানান ভব,  
অনেক খুঁজেছি আঁখি বেলে, দেখি আঁখি দুমে যদি হয় ।

বাহিরে বিব চূর্ণ, আছে গো প্রলয়-অঁধার তরু,  
ভীম গছের অতল বিরাট, সদাই কহিছে ধু ধু ।  
তুমি চক্কাবি উঠ শাকভনো, ওকাই হ'য়ে জাপ গো শুনো,  
এ নাভিপথে ছনয়শয়ে, জাপ গো লবণ বঁধু ।  
লয়ে চক্ৰ পৃথী গের তাহা শত ভুলারভরা মধু ।

এবনি কবিহা সকল বিশ্ব আমাতে উঠিবে ভাগি,  
বিশ্বের বাজা, এমনি কবিহা হ'বে তুমি অম্বরাসী ।  
বাহিরে চাটিয়া মিলে না তোনাগে, নবন মুখিয়া খুঁজেছি এবারে,  
তোমার লাগিয়া ফিবিব না আর সকলের ধারে মাগি,  
আঁখাবের ধন বিশ্বের সহ, আঁখারে উঠিবে ভাগি ।

শ্রী কালিদাস রায় ।

৬ষ্ঠ খণ্ড

৬ষ্ঠ বর্ষ

মাঘ, ১৩২১

চতুর্থ সংখ্যা ।

## আলোচনা

১। অন্তরাস্ত্রার পূজা  
প্রগতির শক্তিগুলিকে মাহুৎ একে একে  
নিষ্করতলগত করিতেছে, নিষ্ক জীবনের  
নানাবিধ কারণে লাগাইতেছে—এইগুলিকে  
ব্যবহার করিয়া নিরাজীবনের অভাব ঘোচন  
করিতেছে । প্রকৃতির উপর মানবের

আধিপত্য-বিস্তারই সভ্যতার ইতিহাসের  
একমাত্র তথ্য ।

মাহুৎ ও বিশ্বশক্তিগুলিকে ক্রমশঃ দবল  
করিয়া কেলিতেছে । প্রকৃতি তাহার খুঁজ-  
শক্তির নিকট মানীর দ্বার আত্মপালন  
করিতেছেন । তাহা হইলে মাহুৎ নিজকে

ধর্ম করিবে কাহার নিকট ? মাথা নোথাইতে শিখিবে কাহার নিকট ? পূজা করিবে, ভক্তি করিবে কাহাকে ? মাছের লংসারের কিছুই ত নিজ অগ্নিকা মহন্তর, বিপালতর, বিপ্লুত-তর দেখিতে পাও না ! তাহার দৃষ্টিতে সবই যে ছত্র, বীচ, নীচ, পশু ।

আজ লংসারের যে তিনিবকে তুমি বড় বা অসীম মনে করিতেছ, কাল তাহাই তোমার চোখে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বোধ হইবে । ছই হাঙ্গার বৎসর পূর্বে তুমি কাহার নিকট মাথা অবনত করিয়াছিলে, আজ সেই সকল পদার্থ তোমার নিকট একেবারেই শ্রদ্ধার পাত্র নয় । আজ যে বস্ত্র দেখিয়া তুমি ভীত সন্ত্রস্ত হইতেছ, কয়েক বৎসরের সাধনায়াই বহত তাহা তোমার কল্মসলকবৎ খেলার সামগ্রীতে পরিণত হইবে । তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি, তোমার দৃষ্টি, তোমার ঐতি, তোমার সকল ঈশ্বরের ক্ষমতা বাড়িয়াই চলিয়াছে । প্রতিদিনই যে নতন নতন বস্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হইয়া তোমার ক্ষমতাকে অসংখ্যগুণ বাড়াইয়া দিতেছে । তাহা হইলে মাছের কি ভবিষ্যতে ভক্তি, শ্রদ্ধা, পূজা, ভালবাসা সবই বিসর্জন দিবে ? মাছের জ্ঞানবুদ্ধি কি মাছকে পণ্ড করিয়া ফেলিবে ?

সমস্তা বড়ই কঠিন । মানবের অন্তর্জগৎ যদি অসীম না হয়, তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির আর উপায় নাই । কারণ জগতের পদার্থমাত্রই একদিন না এক-দিন অসীম, শান্ত, গতিবদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া পড়িবে । অনেক বাহ্যবস্তুরই পূর্বে অসীম মনে করিতাম—একণে সেগুলিকে সসীম বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছি ।

আমাদের স্বয়ংকে যদি পূজার পাত্র ও সন্মানের বস্তু বিবেচনা না করি, তাহা হইলে

মাছের প্রকৃতির প্রত্যুৎপত্তে হইতে অগতের ঘূর্ণাচ্ছবে পরিণত হইবে । বাচিরের মিনিবকে সন্মান করা চলে না—মাছেরের অস্তরই, নিছকের আত্মাই ভক্তির উপযুক্ত পদার্থ । অন্তরাত্মাকে পূজা করিতে শিখিলে, তাহা হইতে অনন্তধারাৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, করুণা, বাৎসল্য ইত্যাদি নিঃসৃত হইবে । সেই ধারাসমূহই জগতের সসীম ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে বোত করিবে । আমাদের নিকট পৃথনীয়, মহনীয়, বরদীয় করিয়া তুলিবে । অতি নগণ্য সামান্য অকিঞ্চিৎকর পদার্থও জগৎয়ের প্রভাবে আমাদের পূজার সামগ্রীতে ও পূজনীয় দেবতার পরিণত হইবে । তখন আমরা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ দেখিতে পাইব—নগণ্যের মধ্যে বিরটকে উপলব্ধি করিতে পারিব—সসীমের মধ্যে অসীমকে লাভ করিব ।

জানে আমরা বতাই বড় হইতে থাকি না কেন, ভক্তি দ্বারা আমরা নিজকে সর্বত্র ছোট করিতে শিখিব । জগৎকে বড় করিতে পারিলেই কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী, তরু-লতা সকলের মধ্যে মহৎ দেখিতে পারিব । আশ্বার উদারতা জন্মিলেই ক্ষুদ্রাদপি, ক্ষুদ্র ভূগপজে, সচেতন অচেতন সকল বস্তুতে আমরা অসীম অনন্ত ঐশ্বর্য দেখিতে সমর্থ হইব । তখন সসীম সমুদ্র দেখিয়াও অসীমের ধারণা করিতে সক্ষমবোধ করিব না । জীবনের অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলীর মহিমাও আমাদের গুণমানকে পুলকিত করিবে—সমাজ, সংসার, পরিবারের নগণ্য গুণও আমাদের অনন্তবোধে ভাগ্যকর থাকিবে । সাধারণ, সামান্য, মাণ্ডলি জগৎটাই তিরস্কৃত-পূর্ব, উদারতাময়, বিপুল ও গরীয়ান্ মনে হইবে । জগৎয়ের মহত্ব এবং আশ্বার

অসীমতার জগতের ক্ষুদ্রবস্তুর অভাবকে  
বিস্তীর্ণ শক্তির পরিচয় পাইব।

ক্ষুদ্রকে বড়ভাবে দেখিতে না পারিলে  
মানুষের পক্ষে শাস্তি পাওয়া কঠিন। নিম্নের  
উদাহরণসমূহই বিশ্বনাথকে মনোমুগ্ধ ও  
পূজনীয় করিয়া তোলা মানুষের স্বর্ধর্ম। এই  
কারণেই মানুষ তাচার নিম্নের চক্ষে গড়া  
জিনিষের নিকটও বসন্তা বোকার করে। এই  
কারণেই তাহার পত্নপুত্রা, ভক্তদেবা, দরিদ্র-  
স্বর্ধর্ম। মানুষের পূজনীয় দেবদেবীগুলি  
তাহার বকীষ কল্পনা, ভাবুকতা ও স্বপ্নবস্তুরই  
পরিচায়ক।

• •

### আয়ল্যাণ্ডে পল্লীর সমবায়-দোকান

আয়ল্যাণ্ডের কোন কোন ভেলের পল্লীতে  
কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার্যাল সোসাইটির  
কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পল্লীর  
কৃষকেরা সমবেত হইয়া Store বা দোকান  
খুলিয়াছে। প্রত্যেককে একত্রে Share বা  
অংশ কিনিতে হইয়াছে। এই অংশীদারেরাই  
ইহার কর্তা। টানার টাকার পাইকারী দরে  
সহর হইতে জিনিষ বহন করা হয়। সেই  
সকল জিনিষ এই ঠোরে জমা থাকে।  
সাধারণতঃ অংশীদারেরাই এই জিনিষ কিনিয়া  
থাকে। তাহাভেদ নিকট পাইকারী দরে  
বিক্রয় করা হয়। ঠোরের কর্তৃকারীরা অংশী-  
দারগণের মতামতসারে নিযুক্ত হন। তাহারা  
নিজেও কো-অপারেটিভ অর্থায়ন সমবায়পন্থী।

এই সমবায়-ঠোর স্থাপন করিয়া কৃষকেরা  
সস্তায় নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিস পাইয়া  
থাকে। পূর্বে যখন এই সমবেত দোকান  
ছিল না, তখন ইহাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে

হইত। সহর হইতে মাল আনিতে অনেক  
দায় লাগিত। ভাল মালও পাওয়া হইত  
না। পছন্দ অহুলাসে প্রয়োজনীয় জিনিস  
জুটান অনন্তর হইত। এক্ষণে ইহারা চাল,  
লাঙ্গল, বীজ, শস্ত, ঘোড়ার লাগাম, গাড়ীর  
আলুবা, খোতা, খুরগী, বালতী, কৃত্রিম  
মোটর, পত্র-খাত ইত্যাদি সকল জিনিষই  
সস্তায় পাইতে পারে। এই দোকানের কর্তৃ-  
কারীরা বড় হইতে এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ  
মাল পরিণ করিয়া আনেন। একত্রে সস্তায়  
পাওয়া যায়। কৃষক-অংশীদারেরাও একটা  
বড় ঠোর নিজ পল্লীর ভিতর পাইয়া পছন্দসই  
জিনিষ কিনিবার সুযোগ পায়। তাহা ছাড়া  
পূর্বে ইহারা খুদ্রা দরের দায় দিয়া মাল  
আনাইত। এক্ষণে খুদ্রা ক্রয় করিয়াও  
পাইকারীদরের সুবিধা পায়। কারণ ঠোরের  
যাহারা সমবেতভাবে মালিক, তাহারা ই ব্যক্তি-  
গতরূপে ক্ষেতা। ক্ষেতা এবং বিক্ষেতা  
একই দোকান। কাজেই লাভ করিবার  
প্রয়োজন কি? ঠোরের কর্তৃকারীরা সস্তায়  
মাল কিনিয়া আনিয়াছেন; সেই সস্তায়ই  
তাঁহারা অংশীদারগণের নিকট বেচিতেছেন।  
অতঃপর ভাল মাল, সস্তা মাল এবং পছন্দসই  
মাল সমবায়-পন্থীরা ঠোরের সাহায্যে  
পাইতেছে।

কেবল তাহাই নহে। দোকান চালানিতে  
গেলে লাভ কিছু না কিছু হয়ই। নিত্যক  
কম হারে লাভ জমাইলেও বৎসরান্তে অনেক  
টাকা জমিয়া যায়। পল্লীর ঠোরেও বৎসর  
বৎসর বেশ মোটা লাভ জমিয়া থাকে। এই  
লাভ কাহারা পায়? যাহারা ক্ষেতা, তাহা-  
দিগের ভিতর এই লাভ বিতক্ত করা হয়।  
কৃষকেরা কিনিবার সময়ে সস্তায় মাল পাইয়া  
একবার লাভ করিয়াছে—আবার বৎস-

রাস্তাও দ্বিতীয় বার লজ্যেণ পাইয়া থাকে। সলা বাহুলা কো-অপারেটিভ ট্রোরের নিয়মে যে বস্তু কেতা, সেই ভত্ত লাভের অধিকারী। তাহা ছাড়া অংশ ক্রয় করিবার কলেও হুত আছেই।

বেশকানের গুল্যমে অনেক সময় বেশী দামের মালও রাখা হয়। কিন্তু ক্রয়কর্মিণের পক্ষে সেগুলি ক্রয় করা অসম্ভব, এবং ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রত্যেকের নাই। সেইজন্য দোকানের ঐ মালগুলি ক্রয়কর্মিণের নিকটে ভাড়া দেওয়া হয়। তাহারাই একযোগে ঐ মাল ব্যবহার করিতে পাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কাজ পাইতে পারে। সত্যার বহুমুলা বস্তের সাহায্য পাইয়া ক্রয়কর্মিণের তিত্তপ লাভ হয়, সহজেই অন্তমেয়।

ক্রয়সমবায়ের আদর্শ অস্থান্যে ক্রয়-সমিতি বা ট্রোর ভারতবর্ষে এখনও স্থাপিত হয় নাই। নব্য বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সরঞ্জাম এবং কম কজা টক্তাদির ব্যবহার দ্রবিত্র পল্লীসমাজে অল্প কোন উপায়ে প্রচলিত করা সম্ভব কি?

• •

৩। হেতমপুরের ত্রীগৌরান্দ্র-মঠ

আমরা পূর্বে একবার মফঃস্বলের বাকীতে হেতমপুর ত্রীগৌরান্দ্র মঠের বিবরণ পাঠক-গণকে জানাইয়াছি। মঠ প্রতিষ্ঠিত গুরুগৃহে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মিলনে হিন্দু ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়া সংস্কৃতি, গ্যাস্ট্রী, কর্মী ও জ্ঞানী করিবার চেষ্টা হই-তেছে। বর্তমান সময়ে অনেকেই ব্রহ্মচর্য শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত গুরু অভাবে সে কার্যটি সম্ভবপর বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। তবে আমরা মনে করি, আকাঙ্ক্ষা যখন আদিত্যে,

আকাঙ্ক্ষাহুয্যাদী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার আয়োজন যখন চলিতেছে, তখন উপযুক্ত গুরু আবির্ভাব হইবেই। হুত এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতেই প্রেরণ আদর্শ গুরু ভ্রম্ভগ্রহণ করিবেন। ততদিন তাহা না হয়, ততদিন প্রেরণ প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে, এবং ইহার বাহুলা দেশের মধ্যে যত বিস্তারিত হয়, ততই হুফলের আশা করা যাইতে পারে। মঠের একখানি কার্যতালিকা আমাদের হৃদয়গত চটাইছে। বর্তমানে মঠে চারিটি বিভাগের কার্য চলিতেছে,—

(১) বিভাগ—এই বিভাগে কতকগুলি হিন্দুসন্তানকে আশ্রয় দিয়া সনাতন হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারের আর্থ্য কবিহুয়ারদের আদর্শে, ব্রহ্মচর্য অবস্থার সংস্কৃত ও ইংরাজী বিভ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) বালিকা বিভাগ—এই বিভাগে বালিকাগণকে পুস্তকগত বিভ্যা, গার্হস্থ্য কর্ম্ম, সূচিকার্য্য ও ঘোবর্জনা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) চিকিৎসা বিভাগ—এই বিভাগে পীড়িত দ্রবিত্র ব্যক্তিগণকে বিনা অর্থে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসাকার্য্য অববাহুয্যাদী এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীয় এই ত্রিবিধ মতে সম্পাদিত হয়।

(৪) দাতব্য বিভাগ—এই বিভাগে নিরা-শ্রয় ও নিঃস্ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দেওয়া হয় ও ভরণপোষণ করা হয়।

যে সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক হিন্দুছাত্রকে বিভাগে রাখা হয়। শিক্ষাকার্ম পর্ধ্যন্ত তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার আশ্রমই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন কি তাহাদের উপনয়ন প্রকৃতি সংস্কারের ব্যয়ভারও আশ্রমই বহন করেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে প্রাচীন আর্থ্য কবিহুয়ারগণের আদর্শে ছাত্র-

দিককে পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। বিদ্যার্থী-সমূহে সশব্দস্বর হইতে স্বর স্বরস্বর বসনের মধ্যে ভিত্তি করা হইয়া থাকে, এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাব্যবসায়ের নিকট হইতে এই মর্মে একটি অধীকার পত্র লিখিয়া লওয়া হয় যে মঠে অবস্থানকাল পর্যন্ত বালকের উপর তাহাদের কোন অধিকার থাকিবে না।

এখানে ছাত্রগণকে একাধারে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দেখিয়া আমরা তত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রগণকে সর্বাঙ্গ কয়েকটি মামুলি বিভাগে বিশেষজ্ঞ করিবার প্রণালী বড়ই ভয়াবহ। ইহাতে ছাত্রগণের জ্ঞানের পরিধি কিছুতেই বিস্তারিত হইতে পারে না, এবং পারেনা বলিয়াই তাহারা অস্বস্তির কয়েকটা বাধা রাখিয়া চলিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবন এরূপ ভাবে বর্ধিত করা কোন মতেই দৃষ্টিগত নহে। তাই আমরা মনে করি ছাত্রগণকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত উদ্ভিদবিজ্ঞান, জন্তুবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সর্ববিষয়েরই মোটামুটি জ্ঞান সহজ ও সরলভাবে মাতৃভাষায় প্রদান করা কর্তব্য। প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সেই বিষয়টি কত দিক দিয়া মানুষের কার্যে লাগিতেছে। নতুবা ছাত্রগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না যে বিষয় শিখিবার দরকার কি, এবং কাছে কাছেই তাহারা তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা দাইতে পারে, ছাত্রগণ যদি পূর্বে

জানিতে পারে একটা গাছের কেন্দ্র কেন্দ্র অংশ মানুষ কি কি ভাবে ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেই গাছের সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়, এবং তখনই গাছের শারীরিক বস্তুর তথ্যগুলি তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, সে শিক্ষা তাহারা আনন্দের সহিতই গ্রহণ করে। এইরূপ শিক্ষার ছাত্রগণের চোখ ফুটিয়া যায়, এবং তাহারা ভবিষ্যতে স্বাধীন জ্ঞান অর্জনের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতিরও মোটামুটি জ্ঞান ছাত্রগণকে দেওয়া চাই।

আমাদের আশা আছে মঠের কর্তৃপক্ষগণ ভবিষ্যতে মঠের শিক্ষাকে আরও ব্যাপক করিবেন। কেবলমাত্র ১৩২০ সালের চৈত্র মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও ইহার সম্যক সৌষ্ঠব সম্পাদন আশা করা যায় না। তারপর সর্বসাধারণের অর্থসাহায্য ভিন্ন এরূপ একটি আশ্রমের সম্পূর্ণ উন্নতি নিতান্তই অসম্ভব। আর্থিক উন্নতি সাধিত হইলে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা আছে, বেশের নানান্বানে ইহার শাখা-আশ্রম স্থাপন করেন। লক্ষ্য সঙ্গত ব্যক্তিগণ ইহার দিকে দৃষ্টি দিবেন কি ?

• •

#### ৪। ইন্দোরে রেশম-শিল্প

ইন্দোর রাজ্যে রেশম-শিল্প-বিভাগের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১২ সালে এই বিভাগ খোলা হয়। একটা বড় জমি লইয়া, তাহাতে তুতগাছ লাগান হইয়াছিল, সমস্ত বৎসরটাই ঐ কার্যে জমিটা ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু একাধো আরও জমির দরকার, এবং মহাত্মকের কাছে একজ্ঞ দরখাস্তও করা হইয়াছে। এই শিল্পটি এখনও

পরীক্ষণই অবস্থায় অবস্থিত বিষ যেতঃ  
কেনা বাটতেছে, তাগতে ভবিষ্যতে ইহার  
উন্নতি হইবার আশা আছে। দেশের অল-  
বাহু ইহার অতুল, অতঃবে গ্রাম্যের মধ্যে  
হঠাৎ প্রসার বাড়িবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ  
নাই।

পূর্ণোক্ত কাব্যের অন্ত বর্তমানে একটি  
পোকা সংরক্ষণাগার, চারপাছের অন্ত একটি  
প্রধান উদ্যান, একটি দাহুঘর ও লাঠিঘেরী  
স্থাপিত চট্রায়ে, এবং সূতাভাটা, কড়ান,  
দোলাই করা, ঝা বেওয়া, বয়ন প্রকৃতি  
কার্যও এখানে চলিতেছে।

• •

### কয়েকজন পরলোকগত বাঙ্গালী

বিগত কয়েক মাসের মধ্যে বঙ্গবন্দী  
ঊহার কয়েকটি স্থলস্থান হারাইয়াছেন। চট্ট-  
পত্রীর সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রাশালদাস ভাষ্য  
মহাশয় প্রায় সশ্রুতিগর্ভ বয়সে ৮০বর্ষিয়মে  
নবম মের ত্যাগ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকত্বগতে  
ঊহার অকৃত প্রতীতি সর্বজনবিদিত। ভাষ্য-  
মর্শন সন্থে ঊহার অনেকগুলি গ্রন্থ  
হরিয়াছে। তাহা হইতেই ঊহার পাণ্ডিত্যের  
পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাহাই ঊহাতে  
অমর করিয়া রাখিবে। তমু পাণ্ডিত্যের দিক  
রিয়াই তিনি বড় ছিলেন না, ঊহার চরিত্র-  
বত্তাও অসাধারণ ছিল।

নৃত্যের কয়েক বৎসর পূর্বে বগন তিনি  
বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া ৮০বর্ষিয়মে শেষজীবন  
যাপন করিতে চলিয়া যান, তখন তিনি  
ঊহার তৎকালীন বিহার-ব্যাধা কবিতায়  
প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। ঊহার বয়স-  
স্ক্রীতি যে কত গভীর—আধুনিক দলের

অপেক্ষা তাহা যে কোন অংশেই নূন নহে,  
তাহা সেই কবিতাপাঠে সূতা যায়। আর  
সূতা যায়, যেহেতু অগ্রগত হইলেও প্রাণটা চির-  
কালেই নবল ও নবান থাকে।

ঊহার মধ্যেই সাহিত্যজগতে স্থপরিচিত  
বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহকাল ত্যাগ  
করিয়াছেন। ঊহার প্রণীত “পাকপ্রণালী”র  
পরিচয় আর পাঠকমণ্ডকে নুতন করিয়া দিতে  
হইবে না। নিম্নেতোচের বলা হইতে পারে,  
পাকবিজ্ঞান সন্থে ঊহার পুস্তকই বাঙ্গালা  
ভাষায় প্রথম ও সুবিস্তৃত পুস্তক। এতদ্ব্যতীত  
ঊহার আরও অনেক পুস্তক আছে।  
তৎপ্রণীত “ভতবিবাহ-ভণ্ডে” আমরা ঊহার  
গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই।  
কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, অনেকেই বিপ্রদাস  
বাবুকে পাকপ্রণালীর প্রণেতা বলিয়াই  
অবগত আছেন, কিন্তু “ভতবিবাহ-ভণ্ডে”র  
খোঁজ ঊহার বড় একটা রাখেন না।

বিগত ৬ই গৌবে আমরা আর একটি  
সাহিত্যরত্নকে হারাইয়াছি। চট্টগ্রামের  
প্রবীন সাহিত্যিক কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস  
মহাশয় আর ইহজগতে নাই। ইহার মত এমন  
আভ্যন্তর সাহিত্য-সেবী খুব কম লোককেই  
দেখা যায়। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত কোটিঃ  
পত্রিকার ইহার সন্থে অনেক আলোচনা করা  
হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কিছু কিছু  
অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিলায়।

“নবদীপের পণ্ডিত-সমাজ নবীনচন্দ্র দাস  
মহাশয়ের কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ঊহাকে  
কবিগুণাকর, পূর্ববঙ্গের সারথিত সমাজ  
কাব্য-রত্নাকর এবং চট্টল শব্দমণ্ডলী বিভাগপতি  
উপাধি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঊহাকে  
সর্বগুণাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।  
কেবল পণ্ডিত-সমাজ হইতে তিনি সম্মান

প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন নহে; ঢাকা টেকস্ট বুক কমিটিরও তিনি একজন প্রবীণ সদস্য ছিলেন। স্বাধীনীতা, চরিত্রবল ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রাণতা প্রথমে মস্তিষ্কপতির সহিত একত্র হইলে মানুষের যতগুলি সম্ভব বিকশিত হইয়া থাকে নবীনচন্দ্রের তৎসমগ্রই হইয়াছিল। যে সময়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য বিচার-বর্জন প্রভৃতি এবেশে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, নবীনচন্দ্র দাদা মহাপত্র সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমূহে উচ্চস্থান অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন,— অথচ কোনরূপ বাড়িচার আশ্রয়ন তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এমন স্বাধীনীতা, চরিত্রবান, বিলাসব্যাসনশূন্য সংযমী ও ভাগ্য-শীল লোক তদানীন্তন উচ্চ শিক্ষিত সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, চট্টগ্রামের অগ্রতম উজ্জল ব্রহ্মবিদ্যাপাণিচেন্দ্র, স্বামী শি, কে, লাহিড়ী ও নবীনচন্দ্র দাদা একই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন, এবং তাঁহারা তিন জনেই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নবীনচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে যেমন অগাধ গভিত ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমন বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং বাংলাব্যবহাৰ সাহিত্যের দেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

“এম এ, ও বি এল, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন তখন এখানে একটিও মুদ্রাবন্ধ ছিল না। স্বদেশপ্রাণ নবীনচন্দ্র ও তাঁহার ষোড়শ বৎসরের সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম ঐচ্ছিক শরচ্চন্দ্র দাদা বাহাদুর সেই অতাবদূর করেন। মুদ্রাবন্ধ আসিল, তাহার নাম হইল ‘সারদা’। পার্শ্বিক পত্রিকা ‘পূর্ণ প্রতিধ্বনি’ প্রচারিত হইল। ক্রমে ক্রমে

‘চন্দ্রশেখর’ ‘প্রান্তবাসী’ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি দেখা দিল। নবীন বাবু অল্পদিন মধ্যে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ প্রতিধ্বনির সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন না। পণ্ডিত ঐচ্ছিক চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার সম্পাদক হন। কিন্তু নবীন বাবুর ঐকান্তিক ঘরেই চট্টগ্রামে প্রথম সংবাদপত্রের প্রচার আরম্ভ হয়।”

“নৈশবে মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত প্রাণে যে বাসনার উদ্বেগ হইয়াছিল, নবীন চন্দ্রের জীবনের প্রত্যেক স্তরে আমরা তাহারই ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। সরকারী চাকরী গ্রহণ করিলেও একদিনের তরেও তিনি সাহিত্য চর্চা হইতে বিরত ছিলেন না। সেই একদিন সাধনার মধ্যেই তিনি ইংল্যান্ড হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ‘রঘুবংশ’ ‘শিবপাল বন’ ‘কিরাতাঞ্জুনীচ’ প্রভৃতি যে সমস্ত অতুলনীয় বহু বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে তিনি যোগাইয়া দিয়া গেলেন, সেই গুলিই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিবে।”

### ৬। মাদ্রাজে শিল্প-সভা

সেদিন মাদ্রাজে শিল্প-সভার দশম অধিবেশন হইয়া গেল। বোম্বাইবাসী মাননীয় ঐচ্ছিক মনোমোহন দাস মহাপত্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা অনেক নূতন কথা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদের দেশের হস্তার কাপড়ের ব্যবস্থা কিরূপে আস্তে আস্তে মৃতপ্রায় হইল তাহা তিনি বেশ সুস্বরূপে বিবরণ প্রদান করিতেছি।



ভারতবর্ষ হইতে কেলিকো (calico) কাপড়ের বিলাতে খুব কাটতি ছিল। ঐ ব্যবসারে এবেলবাণীরা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে এগানকার অভাব পূরণ করিয়া তাহারা মাল বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিত এবং তাহা তাহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ও হইত। উক্ত ব্যবসারে ইংলণ্ডের বণিকের এক কতি হইতে লাগিল যে উৎকানীন (১৭৬৭) রাজসচিব বাধা হইয়া দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য এক আইন জারি করিলেন। তাহার ফলে ইংলণ্ডবাসীকে কেলিকোর ব্যবহার করিলে পাঁচ পাউণ্ড এবং বিক্রয় করিলে ২০ পাউণ্ড অরিমানা দিতে হইত। এই নতুন আইন জারি হইবার অল্পদিন পরেই ভারতজাত ব্রহ্ম অতি অল্প পরিমাণেই তথায় রপ্তানি হইতে লাগিল।

এজন আইন জারি হইবার কারণ তখন ইংলণ্ডে যথেষ্ট ছিল। তখন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ আবিষ্কারকর্তা Hargreave এর কাপড় বুনান নতুন বর প্রস্তুত হয় নাই। তখনকার ইংরাজ তাঁতিরা দেকলে রকনের যন্ত্রে কাপড় চালাইত। তাহাতে বৈদিক উৎপন্ন ব্রহ্ম অতি সামান্য ও ব্যবসাধা ছিল, সুতরাং অল্প বেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর যন্ত্রে জাত ব্রহ্মের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহা হটিয়া যাইতে লাগিল। ঐ আইন জারি হইবার পরেও এবেলের ব্রহ্ম যথেষ্ট পরিমাণেই ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছে এবং ম্যাক্লেটারের প্রস্তুত কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। মেখে রাজসচিব কাপড়ের বস্ত্রদ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতজাত কাপড়ের উপর শতকরা ০১½ শুদ্ধ বসাইলেন। এই নতুন আইনের পর হইতে আমাদের বেশের স্বভাব

কাপড় অতি অল্প পরিমাণেই ইংলণ্ডে রপ্তানি হইতে লাগিল এবং তখন হইতেই ভারতবর্ষ তেবলমাত্র ব্রহ্মপ্রধান দেশ হইয়া পড়িয়াছিল।

নিম্নেই বাঁচাইবার জন্য সকল দেশেই এইজন “বেলি ব্রত” গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশেই আমোলনও তাই ব্রহ্ম আরও হয় নাই। দেশের যুতপ্রাণ শিল্পগুলিকে উজ্জীবিত করিতে হইলে বেলি-ব্রতকে দৃঢ়তরূপে পালন করিতে হইবে। সভাপতি মহাশয় তাই প্রত্যেককে এই ব্রত গ্রহণ করিবার রস্ত্র আহ্বান করিয়াছেন।

• •

### ৭। জগতের শাস্তি

বর্তমান সামাজিক সাম্যবাদীদিগের মধ্যে এইচ, ডি, ওয়েলস্ লাহেবের নাম সুপরিচিত। পৃথিবীতে বাহ্যতে আধুনিক যুদ্ধের মত এমন সর্জবিধগণী আধোজন আর না চলিতে পারে, বাহ্যতে জগতে চিরশান্তি স্থাপিত হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি দুইটা উপায় অবলম্বন করিতে বলেন। তাহার মত—মাহুষের মধ্যে যদি সাহসিকতা ও সাধুতা প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে একটা জগৎশান্তিলাভ সম্ভব করা অসম্ভব নহে। অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ করা হইলেই সভ্যতা কর্তব্য হইবে। তাহার শাসনে প্রথমতঃ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা একেবারে বিনষ্ট হইতে পারিবে, এবং দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রের কোন দেশের উপরই কাহারও অধিকার না থাকায় পৃথিবীর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার পন্থা পরিষ্কার হইবে।

মতটি আপাততঃ বোধে বেশ মধুর বলিয়াই চোঁকিবে। একটা জগৎ-সভার দৃষ্টি, তাহার শাসনে যুদ্ধ সহকার্যের স্থিতি নষ্ট করা আর সকলেরই মনোপুত্র। কিন্তু কাঁধটা তত সহজে আরও হইবার উপায় আছে কি না,

তাহাই বিবেচ্য। বিপদে পড়িয়া অথবা ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া একটা অগত্যা সত্য সত্যি হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহার অত্যাশঙ্কনে যে সব সময় সকলে চলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? আমরা ত চোপের উপরেই দেখিতে পাউতেছি, দেশবিকার “গেম সমিতি”র উদ্দেশ্য একেবারে বাতিল হইয়া গেল! বাহিরে অগত্যাভার কথা চলিবে, ভিতরে ভিতরে অনেকেরই আশঙ্কিতের ভয় প্রভুত হইতে থাকিবেন, ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? তারপর যিনিই একটু শক্তিশাল হইয়া পড়িবেন, তিনিই মাথা তুলিয়া অগত্যাভার বৃদ্ধান্ত দেখাইয়া নিজেদের অসহ্য শক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য কোমর বাঁধিবেন, ইহা ত নিশ্চিত কথা। সত্য বলিতে কি, ওদণ্ড বাহিরের কসাকসিতে যুদ্ধবিগ্রহ থামিতে পারে না, যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মাহুদ বতদিন তাহার ভোগলিপ্সাকে সংযত করিতে না পারিলে, বতদিন আত্মত্যাগিতা বিলম্বিত না হইবে, বতদিন তাহার স্বপ্নের প্রকার না বাড়িবে, ততদিন প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারিতেছে না। পাকিস্তান সমাজ যদি এই বাহিরের বাঁধনের দিকে নজর না দিয়া ভিতরের সাধনের দিকে নজর দেয়, যদি সে ত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া কর্মদ্বারা প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করে, তবেই তাহার এই আর্থ-সংঘর্ষের সমাধান—এই যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারিবে, নচেৎ নহে।

•

### ৮। ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠান

আমাদের মূল-বলেজগুলিতে যথাবিত্ত-শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। আল কাল

শিক্ষালাভ করিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহাতে অধিকাংশ ইংলিশ স্কুলের ব্যয় কুশাল অত্যন্ত কঠোর কথা। এদিকে সমাজে বিলাসিতা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং কয়েকটি মাত্র কাথাকেন্দ্র উচ্চ খাতায় মধ্যশ্রেণীর অল্পসংখ্যক পুত্রপাল হইয়া পড়িতেছে। অনেক তরুণলোক অর্থহীনতাবে বেশ বৃদ্ধমান ও ক্ষত্রিয় ভেলেন্সের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। আমাদের সমাজে পূর্বকালের যে ‘খানবর্গ’ আর নাট, আমরা বিন্যাসন করাকে একটা পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করি না। বস্তুি ভেলেন্সের শিক্ষা-দীক্ষার সংস্থান করিয়া দেওয়াই এখন আর অর্থবান ব্যক্তির উদ্যোগের অর্থের সমাধান বলিয়া মনে করেন না।

মধ্যশ্রেণীর লোকের লেখাপড়া না শিখিলে নয়, অর্থ খরচের ক্ষমতা হ্রাস হইতে হয়। লেখাপড়া শিখিতে না পারিলে তাহাদের আর মোটাই ভয় হইবে। এই অর্থ-সঙ্কটের একটা সমাধান আমাদের সমাজ অতি সহজেই করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলে যদি শিক্ষকতা অথবা অন্য কোন উপায়ে নিজের খরচ নিজে চালাইয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে তবে একটা উপায় হয় বটে, কিন্তু সে যদি উচ্চরূপে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে অপারূপ অথবা অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করাইয়া কস্তার পিতার নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ কর। যখন নিজের পেট স্বেচ্ছায় জলিতে থাকে তখন আর লম্বাঘের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিও না। ইচ্ছা হয় হটক, অনিচ্ছা হয় হটক, এই কস্তা-বহন বন্দোবনে ছেলের দাম বোঁটুক-পাও যাবেও অন্ততঃ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হইবেই। এই টাকার দ্বারা সহরের স্কুলে পড়িবে, যেসে বাস করিবে, বাহুগিরি করিবে,

ও খিচোরী দেখিবে। তারপর, কিছু শিশুক না শিশুক পান করিতে পারিলেই বস্ত্রের টাকা সার্থক হইল।

এইরূপ আনন্দের ছাত্র-সমাজে আশু-নির্ভরতা ও মনের বল ক্রমশঃ কমিয়া বাইতেছে। ২০-২৫ বৎসর পূর্বে চীনাবস্ত্র ছাত্রেরা নানা কষ্ট করিয়া এমন দি অস্ত্রের বাগাণ্ড স্বহস্তে ভাত রাঁধিয়া ও অস্ত্রান্ত গুণকাজ করিয়া অগানে করিতেন। তাঁহারা হারিত্রের ও দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কবিত্তে সংসারের ভারী অগ্নি-পরীকার ভক্ত অনেকটা প্রস্তুত হইতে পারিতেন। গত শতাব্দীর অনেক প্রসিদ্ধ মেধাবী ছাত্রের জীবন আলোচনা করিলে ইহা বেশ প্রতীত হইবে। বাহা ইউক আর কাল যথাক্রমে ছাত্রেরা বেতন অব্যাহত উপায়ে, ও সনাতনের বেতন অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজেদের শিক্ষার ব্যয় আদায় করেন তাহাতে তাঁহাদের অভাব না কমিয়া বহু বাড়িতেই থাকে, কারণ তাঁহারা বিদ্যা-সাধনাকে কষ্টসাধ্য তপস্কর্য্য বলিয়া মনে করেন না, ছাত্রজীবন ভোগের ও বিলাসের প্রশস্ত সময় এইরূপই তাঁহাদের ধারণা।

সমাজের এই অযোগ্যতার মোহকে ফিরাইতে হইবে। বাহারা ভবিষ্যতের আশা, সেই ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের ভক্ত অস্ত্রের নিকট বিক্রীত হইতে ও বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিলাসের পুঁজা করিতে দেখিয়া আমরা মনে অত্যন্ত ব্যথা পাই। দরিদ্র ছাত্রগণ বাহাতে অল্প পরিশ্রমে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে-পারেন সে বিবে আশাদের সমাজ-সংস্কারক-গণের দৃষ্টি পড়া উচিত। গৃহশিক্ষকতা, দোকানের ও ফুলের কাজ, পুস্তক বিক্রয়, গ্রেনের ও পত্রিকার কাজে সহায়তা, নানা প্রকার ছোট ও সহজসাধ্য শিল্পকার্য্য

ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে ছাত্রদিগকে যুগিত পুণ্য-বিক্রয় হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের প্রযুক্তিকে উদ্ভূত করা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অভিভাবকদের এ কলেজের অধ্যাপকদের লইয়া একটা "ছাত্র-সাহায্য-সম্মত" প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। এতদ্ব্যতীত সকল হইলে ছাত্রদিগকে আর দুই চারি টাকা সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না, তাঁহারা নিজেদেরই নিজেদের সাহায্য করিতে পারিবেন। ছাত্রেরা আর ঘরে ঘরে ভিক্ষা না করিয়া অথবা আশ্রয়-বিক্রয় না করিয়া নিজের ভার নিজে নিজে পাতিবেন ইহা কম দৌরবেদ কথা নহে।

..

## ৯। ছাত্রজীবনের স্বপ্ন-দুঃখ

আজকাল আমরা দেখিতে পাই অভিভাবকগণ ছেলেরের স্বপ্ন-কলেজে পাঠাইয়া দৃষ্ট থাকেন, ছাত্রেরা স্বপ্ন-কলেজে যাউনাই দৃষ্ট হয়, এবং অধ্যাপকেরাও তথু পড়াইয়াই দৃষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত। ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ছাত্রজীবনের স্বপ্ন-দুঃখের সহিত অভিভাবক ও অধ্যাপকদের কোনই যোগ বা সংস্পর্শ নাই। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় বিভ্রাটের ছাড়া ছাত্রেরা আর কিছুই লাভ করিতে পারে না। লেখাপড়ার চাপে তাহারা একেবারে দমিয়া যায়, স্বাধীন ভাবে কোন বিষয় চিন্তা করা বা কোন বিষয়ের দৌলদার উপভোগ করা তাহাদের হইয়া উঠে না। সমস্ত স্বপ্ন-জীবন পাঠ হইয়া যখন তাহারা কলেজে আসে তখনই তাহারা নিজের চেষ্টায় নিজেদের গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করে যাত্র। ফুলের ও পরবর্তী ১৮১৯ বৎসর পর্যন্ত বয়স এইরূপে তাহাদের পক্ষে

বার্ষ হইয়া যায়। এই সময়ে তাহার পত-  
 ন্য জীবনের ভুল-ত্রুটি সারিতে ও একই সঙ্গে  
 নতুন ভাবে জীবন গঠন করিতে ছুঁক করে।  
 ততরাং আমাদের অনেক ছাত্রের জীবন-  
 ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে  
 জীবনের মূল্যবান ও ভাব-প্রসঙ্গ (impre-  
 ssionable) প্রথমভাগই অনেকের কোন  
 কাণে লাগে না, বরং ভবিষ্যৎ উন্নতির বাধা  
 হইয়া থাকায়।

অনেকে শুধু ছাত্রদের ঘোষ দিয়া থাকেন।  
 কিন্তু চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে ছাত্রেরা  
 তাহাদের জীবনকে পড়িয়া তুলিবার উপায়  
 খুঁজিয়া থাকে—তাহারা পুস্তকাদি পাঠের  
 দ্বারা ভাব-সংগ্রহ করিতে চাহে এবং  
 লোকের সঙ্গে মিশিয়া পরস্পর ভাঙুবিনিময়  
 করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ কারণে  
 তাহারা অভিজ্ঞাবক বা অধ্যাপক কাহারও  
 বিশেষ সাহায্য পায় না। কারণ, অভিজ্ঞাবক  
 ও অধ্যাপকগণ তাহাদের ছাত্রেরা কিরূপ  
 চিন্তা করে, অথবা কিরূপ পুস্তক পাঠ করে  
 সেদিকে ঘোটেই দৃষ্টি রাখেন না, এবং কিরূপ  
 লোকের সঙ্গে তাহাদের বেলা-মেলা হয়  
 তাহারও খোঁজ রাখেন না। ছাত্রেরা  
 প্রথমাবস্থায় ভাল মন্দ বুঝবার পুণ্য  
 সাহিত্য-রস-পিণ্ড হইয়া সম্মুখে যে পুস্তক  
 পায় তাহাই পড়ে, তাহাই তাহাদের ভাল  
 লাগে। এইরূপ অনেকেই প্রথম যৌক  
 বটতলায় তথা-কথিত উপভোগ—নবভাগ—  
 রস-ভাগ—ভগ্নকথা প্রভৃতি পাঠ করিয়া  
 কৃত্তিক বিকৃত করিয়া ফেলে—কেহ তাহা-  
 বিগকে বাধা দেয় না। কেহ তাহাদিগকে  
 উচ্চ আদর্শের সন্দাহিত্য পড়িতে উৎসাহিত  
 করে না। প্রথম জীবনের এই আদ্যোপ-  
 কোতুহল-প্রণোদিত বিকৃত সাহিত্য-আলো-

চনার বিনয় কল হইতে মুক্ত হইতে জীবনের  
 অনেক শুভ মুহূর্ত নষ্ট হইয়া যায়।

ভাব-বিনিময় সম্বন্ধেও এইরূপ। লোকের  
 সঙ্গে মিশিয়া তাহারা নিজেদের কথা,  
 নিজেদের আশা, হর্ষ ও বিষাদের বিনিময়  
 করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু গতি-চরিত্র ও  
 বহনশীল অভিজ্ঞাবক ও অধ্যাপকের আওতা  
 না থাকিলে সাধা কি যে এই সকল ক্ষুদ্র  
 কোমল-প্রাণ ও ভাব-প্রবণ ছাত্রগণ সংসারের  
 নানা প্রলোভনের ভিতর নিজেকে স্থির  
 রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

যাহারা ছাত্রদের মঙ্গল ইচ্ছা করেন,  
 তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে মাছুষ  
 চৈতন্যের করিতে হইলে ছাত্রদিগকে মহত্বের  
 মত শিক্ষা দিতে হইবে, এবং মাছুষের মত  
 শিক্ষা দিতে গেলে তাহারা যে মাছুষ,  
 তাহাদের যে জন্ম আছে, তাহাদের যে চিন্তা  
 ও জাব আছে, আশা ও কল্পনা আছে তাহা  
 না বুঝিলে চলিবে না। কিন্তু ছোটবেলা  
 হইতে লালন-পালন করিয়া ও সর্বদা চোখের  
 উপর বেঁধিয়া ও অনেক অভিজ্ঞাবক ছেলের  
 জন্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন  
 না, এবং অনেক সারাজীবন অধ্যাপনা  
 করিয়াও ছাত্রদের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে  
 পরিচিত হইতে পারেন না। এমন অনেক  
 লোক আছেন যাহারা ছাত্রদের সকল  
 প্রয়োজকেই ছেলেমাছুষি মনে করেন, যেন  
 ইহার চিত্তকালই ছেলে মাছুষ থাকিবে।  
 আমরা বড় বড় ফলবান্ বৃক্ষ পাইতে ইচ্ছা  
 করি, কিন্তু চারাগাছ লইয়া ভাবিতে ও বৃদ্ধ  
 করিতে অনিচ্ছুক।

১০। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি  
 স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দেশের সকল  
 লোকেরই মনে মনে এই আশার উদয় হইয়া  
 ছিল যে আর কিছু হউক বা না হউক  
 অন্ততঃ এদেশের শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধন  
 হইবে। সে আন্দোলনের আঘাত ছুঁ বিক  
 বোধোচ্ছ্ব। এক, বিদেশী প্রবোধ বর্জন,  
 অপর, দেশী প্রবোধ ব্যবহার। অন্তর্দেশে  
 এই দুয়ের দ্বারা এই দেশের শিল্পের উন্নতি  
 হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একতর দুর্ভাগ্য  
 যে দ্বারা অপর দ্বারা উন্নতির সোপানে  
 আরোহণ করে সে উপায় অবলম্বন করিয়াও  
 আমাদের বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না।  
 একতর বিপরীত ফলের কারণ কি তাহা  
 অন্বেষণ করিয়া দেখার সময় হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের মূলে যে আমাদের  
 স্বদেশ-প্রীতি নিগূঢ়ভাবে বর্তমান ছিল তাহা  
 সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে  
 স্বদেশ-প্রীতির উৎসাহে পরিচালিত হইয়া  
 আমরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম যে  
 আমাদের যথার্থ শত্রু মিত্র সকলেই চমকিত  
 হইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু উৎসাহের উপর  
 নির্ভর করিয়া কখন কোন দেশে শিল্প বাণিজ্য  
 প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যেখানে টাকা-আনা-  
 পয়সার সম্পর্কই সর্ব প্রাধান্য না হইলেও  
 সর্বপ্রকার সম্পর্ক সেখানে অস্বাভাবিকি ও  
 পরিবার ভ্রাতৃত্বের বাঙ্গালী ইচ্ছাসম্মত  
 “আমের বেওয়া মোটা কাপড় মাথাধ তুলিয়া”  
 লইতে অস্বাভাবিক হইলে তাহাকে বোধ  
 যেওন অসম্ভব। সত্যতঃ দুঃস্থ বাঙ্গালী দেশ-  
 হিতের জন্য অস্বতঃ কিছুকাল তাহাও  
 করিয়াছে। চিরকাল সে তাহা না পারিলে  
 কি কেবল তাহারই দোষ?

সেই আন্দোলনের দিনে যখন দেশহিতৈষণা  
 উদ্ভাবন করবার মাধ্যমের স্রাব এই মহা-  
 দেশ প্রাণিত করিয়াছিল তখন বাস্তবিকই  
 এদেশের আবার-বৃদ্ধ-বণিকতার মধ্যে এমন  
 কেহই ছিল না যে দেশী শিল্পোন্নতির জন্য

বিদেশী প্রবোধ বর্জন প্রাণ হইলেও জন-  
 সাধারণের দ্বারা বর্জন পূরক তৎপরিবর্তে  
 উৎসাহে বচলমহাশয় দেশী প্রবোধ প্রয়োগ করে  
 নাই এবং অবশ্যই অস্বতঃ প্রবোধ  
 অনেক স্থলেই দেশী প্রবোধ গ্রহণই গৃহ  
 মাত্রেই কৃতব্য—কর্তব্য নহে ধর্ম—এই  
 জানিই লোকে পর্যালোচিত হইয়াছিল।  
 লোকে দেশের জন্য কিছুকাল ঐ উত্তরারও  
 উৎসাহে অল্প মূল্যের বিপণী প্রবোধ  
 অপেক্ষা নিতট হইলেও গ্রহণ করিল। মনে  
 মনে ভাবিল এইভাবে কিছুকাল চলিলে পরে  
 দেশজাত প্রবোধ উন্নতি ও উহা  
 পরিমাণে উৎসাহ হইবে এবং তাহা হইলে  
 কালক্রমে উন্নিত মূল্যে উন্নিত প্রবোধ  
 হইবে। কিন্তু তাহা হইল না।

দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তৎকালে এ দেশী-  
 গণের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোকের  
 আবির্ভাব হইল তাহারা জনসাধারণের দেশ-  
 হিতৈষণার স্বার্থে গ্রহণ পূরক স্বীয় স্বার্থ  
 সিদ্ধির প্রাণ কবিত্তে বিধা বা সঙ্কট বোধ  
 করিল না।

তাহারা নিজে শিল্পী নহে শিল্প প্রবোধ  
 প্রবোধকারী নহে। তাহারা শিল্পগণের  
 নিকট হইতে তাহাদের ভাবনাকরকারী  
 অস্বতঃ পরিচালনা প্রবোধ পরিবর্তে  
 তাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী দৈনিক  
 মূল্য প্রদান পূরক সেই প্রবোধ জনসাধারণের  
 নিকটে অতীব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া  
 “রাতে রাতে বড়লোক হইবার” প্রাণ  
 পাইতে লাগিল। এইভাবে তাহারা দেশ-  
 হিতের পক্ষে কৃত্যাব্যাহত করিল। এতদ্বিধা  
 দেশের ধনাগার নেতা তাহাদের কেহই দেশী  
 শিল্পের প্রকৃত উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নাই।  
 তাহাতে শিল্পগণ বিদেশী প্রবোধ দ্বারা উত্তম  
 শিল্প প্রবোধ গ্রহণ করিতে পারে সে বিষয়ে  
 কেহ উদ্ভাবনকে কোনরূপ শিক্ষা দেন নাই।  
 তাহারা পুঙ্খবাস্তবিক প্রবোধ ও উপায়  
 অবলম্বন পূরক পূরক নিতট দেশী  
 প্রবোধ প্রবোধ করিতে লাগিল। যা যে  
 চিরকালেই কেবলমাত্র “মোট কাপড়” বেন  
 নাই একথা তাহারা অনেকদিন বিস্তৃত  
 হইয়াছে। তাহাদের পূরকপূরকগণই যে কোন

কালে "মোটো কাপড়" ভিন্ন ভাল কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিত একথা এখন তাহাদের নিকট যশের স্মৃতি নাই। সুতরাং তাহারাও যে উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম একথা তাহাদের মনেও উদয় হয় নাই। একথা শুধু পরিবেশ ব্যবস্থা সহজে নচে, অত্যা-বস্ত্র ব্যবস্থার জন্য সহজেই প্রযুক্ত। অপর দিকে দেখি আনন্দকর তথা প্রস্তুত বিষয়ে যতদূর মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। তদপেক্ষা অধিক মনোযোগ কেবলমাত্র সাবান-মোকা-গেলী প্রস্তুতি বিলাসের জন্য সামগ্রী প্রস্তুতে প্রয়োগ হইল। কলে স্বদেশীর নামে নৈশে নানা প্রকারের বিলাসের জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ধনীর মনে বিলাসের প্রলোভনের সৃষ্টি করিতে লাগিল। সুতরাং জীবন ধাপনো-পন্যবায়ী ব্যবস্থার জন্যই এদেশে এতাব্যবসায় উচ্চিত মূল্যে পাওয়া গেল না। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে। স্বদেশীর দোগাই দিয়া অনেককেই জনসাধারণকে অনেক কার্যে নিয়ো-জিত করিয়াছে। কিন্তু অল্পকালস্থায়ী বস্ত্রালো আর সে করার কর্তব্য করিতে সক্ষম নচে। এদের তাহার নহে। এ তাহার অবস্থার দোষ। স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহে বাস্তবিকই আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানপুত্র হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। সে দিন প্রাতে উঠিয়াই আমরা সকলে নিজ নিজকে এক একজন ব্যবসায়ী ধরনের মনে করিয়া লইয়াছিলাম। ব্যবসার যথারীতি পরিচালন করিতে যে বিজ্ঞাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা আমাদের কাহার কখন ছিল না একথা বলিলে অস্বীকার হয় না। বরং আমাদের মনের ধারণা এই যে ব্যবসায়ে উহার কোনটির প্রয়োজন নাই। পেশস্ত্র আমরা মনে করি যে বাতির মধ্যে যেটি অধা ছেলে সেও ব্যবসায়ে উপযুক্ত। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহের প্রাবল্যে একেবারে বিচার-বিরহিত হইয়া আমরা ছোট বড় কত প্রকারের কত ব্যবসা পণ্ডন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কণ্ঠি সাফল্যলাভ করিয়াছে? তাহাতে কত টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ পাইলে জানা যাইবে যে বাক্যালী স্বদেশীর লব্ধ স্বার্থ-তাগে কিছুমাত্রও কার্পণ্য প্রকাশ করে নাই।

অল্প উদ্যোগের একটিও রীতিমত টেকে নাই।

এতদ অবস্থায় দেশবাসী যে নৈরাশ্রের দ্বারা পড়িয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সকল দেশের লোকই সন্তোষ মাল কিনিতে ইচ্ছুক। নির্ধন বাক্যালী আর স্বদেশীর দোগাইয়ে বেশী দামে দেশী তথা ক্রয় করিবে না। এখন সে সন্তোষ বিনোদী জন্যই ক্রয় করিতেছে।

স্বদেশীর লব্ধ বিনোদী তথা বর্জন করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে অধিকাংশ স্থানেই বিনোদী প্রযোজ্য জাতি জাত। কিন্তু বিনোদীতরীর চুক্তিক্রমে সমতানলে জাতিগীর ব্যবসা যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত জানিয়াও আমরা আর কেহই স্বদেশী শিল্পোন্নতির লব্ধ কোনরূপ চেষ্টা করিতেছি না কেন?

মতং হইবার সুযোগ জাতীয়-জীবনে বহু-কাল অন্তর এক একবার আসে। বাক্যালী-জাতীর স্বদেশী আন্দোলনের দিনে সে সুযোগ একবার আসিয়াছিল। তাহা আমরা হেলার হারায়াছি। তদবস্থানের কৃপার অত্যাধিকাল মধ্যে পুনরাব আর এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উদ্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে আমরা সকলেই সরকারের সাহায্যপেক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই আত্ম-নির্ভরতা জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় হইলেও তদ্বারা আমাদের সকলতা লাভ হয় নাই দেখিয়া নেতৃগণ আজ সকলেই সরকারের সাহায্য প্রত্যাশায় উন্মূখ হইয়া বহিষ্কৃত। কিন্তু সরকারের নিকট এই বিষয়ে আমাদের কিছুনা সাহায্য প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

প্রথমতঃ শিল্পোন্নতির লব্ধ যে টাকার প্রয়োজন সে টাকার অভাব এখনও আমাদের হয় নাই। শিল্পোন্নতির লব্ধ আদ্য আমাদের ধনিগণ টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কীর্ণ নন। সুতরাং তৎস্ব স্বস্ব সরকারের সুশাসনকী হওয়া কোন প্রকারে উচিত নহে। বিশেষতঃ বর্তমানে আমরা সরকারের সাহায্য লইব ততই

আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে কষ্টক পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ কেহ কেহ বলেন অবাধ-বাণিজ্যপ্রভাব পূর্বে আমাদের শিল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং আজও তৎকারণে আমাদের শিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। তৎকাল উপাধা সরকারকে দেশীয় শিল্প রক্ষার জন্য বিশেষ শিল্পের উপর কর স্থাপন করিতে অসুযোগ করেন। কর স্থাপন হইলে বিদেশ হইতে ত্রাণাদি এদেশে বিক্রয়ে লাভ হওয়া অসম্ভব হইবে। সেজন্য এদেশে আমদানী কমিবে। কিন্তু বর্তমান মহাপন্থর হেতু এদেশীয় শিল্পের মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী আমদানী শিল্পের এদেশে আমদানী বন্ধ হইয়াছে। হুতরাং সরকার উৎসাহের উপর শুদ্ধস্থাপন করিলে যে কল হইত সে কল আমরা তথাকথিতবকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্তমান বৃহৎক্ষেত্র কতদিন চলিবে তাহা নির্ধারিতরূপে বলা কঠিন। কিন্তু ইংরাজবিশেষ যথো সাময়িক-বিদ্যায় যিনি অধিতীয় ভাণ্ডার বতে উঠা অস্তিতঃ তিন বৎসর স্থায়ী হইবে। হুতরাং আপাততঃ আমরা যিনা শুধেই ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। বৃহৎক্ষেত্রে যে সে আরও কিছুকালের জন্য এদেশে মুগ দেখাইতে পারিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব সরকারকে শুদ্ধস্থাপন করার অসুযোগ করার কোন আবশ্যকতা নাই।

হুতরাং বিশেষ শিল্পের উন্নতির জন্য আবাবিশেষ সরকারের সুশাসন নাই। পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষ-আন্দোলনের কয়েক বৎসরে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা মনে যৌজ-ময়ের প্রায় জন করিয়া আমরা কণ্ঠক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আমাদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

• •

### আমাদের জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় চরিত্র

জাতীয় চরিত্র ব্যক্তিগত চরিত্রের সমষ্টি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন চরিত্রের পরিচয় দিব, প্রাত্যহিক জীবনের ছোটবড় কাজগুলির ভিতর দিয়া যে সমুদায় যোগজন

প্রকাশ পাইবে, জাতীয় চরিত্রে সেইগুলি সমষ্টিবদ্ধরূপে দেখা দিবে। কাজে কাজেই 'জাতীয় চরিত্রে উৎকর্ষ' কথাটির অর্থ জাতীয় অতীত প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের মোশের দ্বারাকরণ ও গুণের উন্নয়ন। ইতিহাস এই কথা প্রচার করে—যে জাতি যখন বড় হইয়াছে তখন একটা বড় আদর্শ, কতকগুলি বড় বড় গুণ আশ্রয় করিয়া সেই জাতি পৃথিবীর বিশ্ব-সমূহ কক্ষক্ষেত্রে আপনাত প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। অবশ্য জনকতক ভাবুক, কয়েকজন মনীষী লক্ষ্যবৃত্তরূপে ভাবুকতা ও উদ্যোগনার নূতন স্রোতে জাতির জলর সতল করিয়াছেন, নূতন আশার উজ্জ্বল বিদ্যুৎবীর্ণ জনসমষ্টির চারবাহরের দ্বারা অন্ধকার তেজ করিয়া তাহাদের প্রাণে নূতন আশ্বাস জাগাইয়া তুলিয়াছে। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত তাহাদের আশার উদ্বোধন গীত সংগে বকে ধারণ করিয়া উত্তর-কালে বিশ্ববাসীর দ্বারে তাহাদের আবাস বাণী পৌছিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জাতিই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা জনসমষ্টির নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কর্তব্যপরতার ভিত্তির উপর গড়াইয়াছে। যখন জনসমষ্টি নূতন ভাবে আন্দোলিত হয় নাই, সাধারণের কর্তব্যশক্তি নৈদিল্য ও আলস্যের আক্রামণ দ্বারা জাগ্রত উঠে নাই, তাহাদের ছোট ছোট স্বার্থগুলি সমষ্টির স্বার্থের নিকট সানন্দে মতক নত করে নাই, তখন অনেক উচ্চতাব ও বড় আদর্শ বিদ্রোহের মতই চমকিয়া আবার আবার মিশ্রিত গিয়াছে। আর যেখানে সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল ও সেটে সেইখানেই বাধ্যবিশ্বাস পরিত্যক্ত, এবং পৃথিবীর চিন্তা ও কষ্টের রাণো অভিনব শক্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। কাজে কাজেই আমাবিশ্বকেও বৃত্তিতে হইবে, আমা-দের জাতির বড় হইবার সেই একই পন্থা—প্রত্যেক ব্যক্তির (unit) নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কর্তব্যশক্তি বড় করিয়া তোলা। প্রতিদিনের কাজগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের গুণভালকে গুঠ করিয়া তুলিতে হইবে। আকস্মিক সুযোগ বা দুর্যোগ মাত্র অবলম্বন করিয়া এই গুণগুলি বাচিতে বা বাচিতে পারেন। প্রত্যাহ অল্প অল্প ব্যায়াম করিয়া যেমন লোক শয়ল হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রাত্যহিক কাধ্য-

বলীর মধ্যেই অগ্নে অগ্নে বড় গুণসমূহের পুষ্টি ঘটিবে। এইরূপে চরিত্রের বিকাশ না হলে কতবা পালনের সময় দেখা দাঁড়াবে অনেকেরই সম্বল সিন্ধু। কতবা হুস্পন্দ করিবার শক্তি তাহাদের নাই।

আমরা বাঙালী জাতি বড় সন্তুষ্টের পরিচয় অনেক সময়ে দিরাছি। আমাদের মধ্যে এমন মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাহাদের লইয়া পৃথিবীর যে কোন জাতি গর্জ করিতে পারে। হুতরাং আমাদের জাতির মধ্যে অস্বাস্থ্য জাতির মতই যে সমৃদ্ধ ও মহাপ্রতি নিহিত রহিয়াছে, এ কথা বেশ স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, লগুনী, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাস, আবদুল ঘোষ, প্রভঞ্জননাথ ষ্টল, রামবিহারী ঘোষ, রমেশ চন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিকে আর মহৎগুণবান্ধিত ও সামর্থ্যবান বলিয়া অভিহিত করিলে চলিবে না। কারণ নিত্যমাত্র নির্জীবের নিকটও এ অপবাদটা একটা ঝাঁক। মিথ্যা অপবাদ বলিয়া ধরা পড়িবে। তবে একটা কথা আমরা অব্যাহত করিতে পারিব না—এই সকল বড় বড় শাক্তের শক্তি ও প্রতিভা তেমন তাঁহাদের জাতির ভিতর সংক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। তাঁহারা যেন আমাদের সহিত আপ-ছাড়া, আমাদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ তেমন সূচিয়া উঠে নাই। ইহাদের দ্বারা তেমন বেশ অসুস্থ বা অপ্রতিভভাবে চলিতে পারে নাই। এক একমূহের পক্ষেই অসুস্থ ও অগণিত অসুস্থতার মল আসিয়া জুটে নাই। তাঁহারা আমাদের জাতির মধ্যে জায়গাছিলেন বলিয়াই যেন তাঁহারা আমা-দের; তাঁহাদের সহিত আমাদের জাতির একাত্মগত সাদৃশ্য যেন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বর্তমান সময়ে জাতীয় উন্নতির, সেইজন্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতিরও কথা কেহ কেহ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে জাতীয় চরিত্রের উন্নতির একমাত্র অর্থ, ব্যক্তিগত চরিত্র বড় করিয়া তোলা; জাতীয় চরিত্র একটা চৌবাচ্চার মত, তাহাতে আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র এক একটা নল, এবং

ইহাওই মধ্য বিদ্যা সাফল্যের ও শক্তির জল-খারা যদি আসে, তবেই সেই চৌবাচ্চা পূর্ণ হইয়া উঠিবে—ইহা বেশ স্পষ্ট ও প্রবলভাবে আমাদের জন্ম অধিকার করিতে পারে নাই। বিগত কয়েক বৎসরের ইতিহাস আমরা বিশ্লেষণের উপায়া ও কল্পনার চক্ষে দেখি-নাই, আমাদের নিজের মরণ বাঁচনের সমস্যা ও তাহার সমাধানের প্রয়াস বলিয়াই দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কাজ যে কতকটা হইয়াছে তাহা বুঝিয়াছি; কিন্তু সেই সঙ্গে আরও অনেকটা হইতে পারিত, কিন্তু হইয়া উঠে নাই, এটো অস্বাভাবিক সত্যটা স্বপ্রত্যক্ষ চোপের সম্মুখে বহুবার পড়িয়াছে। তাবি-য়াছি, কেন এমন হইল, কি দোষে আমাদের আগ্রহ, চেষ্টা ও অসুস্থতা এমন বাধতার বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। যে কেবলটা কারণ সঙ্গতই বেশ একটা হইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলি, আর বাহারা স্বজাতির মঙ্গলকামী, এবং জাতীয় মঙ্গল বাহাদের উপর নির্ভর করি-তেছে, কাপালিনী জননীরা সেই সকল সমস্যা এবং সাধারণ বাঙালী জাতির নিকট নিবেদন করিতেছি। কেহ যেন মনে না করেন, আমাদের বোলআনাই দোষ, গুণগুলি একে-বারেই নাই। তবে যেটুকু আছে তাহাতেও আমাদের চলিবে না। আমরা চাই শক্তির বিপুল স্রোতস্বতী। এই ক্ষীণবারাং আমাদের আর রক্ষা করিতে পারিবে না।

(১) "উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব," অর্থাৎ "নীচাশয়তা"। আমরা মহৎ কল্পনা, মহৎ প্রয়াস একেবারে ভুলিয়া বাইতে বাসিয়াছি। নিত্যমাত্র ছোট ছোট স্বপ্নেই তাল আমাদের গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ক্ষীণনের সমস্ত আশা, কল্পনা ও কাঙ্ক্ষা আমরা কেবল দাঁড়ির মাগ কাটী দিয়া মাগিয়া থাকি। বিরুদ্ধের আহ্বান, ভূয়ার ডাক, সঙ্গীত-সঙ্গীত-বিকল্পী মহত্বের সাড়া আমাদের কাছে আলিতেই পার না। "সাধনা দ্যাদুনি বস্ত দিচ্ছিত্তবতি তাদুনি"। আমাদের সাধা ছোট, সাধনাও ছোট, তাহার সিদ্ধও ছোট। বাহাতে নিজের পেট ভরে না তাহাতে এ বিপুল জাতির সুখা মিটিবে কিরূপে?

(২) "আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাব"।



আমরা যে বড় কাজ করিতে পারি, নিজের পায়ে ঠাড়াইয়া নিজের কন্মতার যে কোন দ্রুত কাজ সম্পন্ন করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে নিহিত আছে—এই মহাপ্রত্যক্ষ আমাদের বিশ্বাস নাই। যে আত্ম-প্রত্যক্ষের প্রেরণায় পশু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক বাচান হয়, তাহার অভাবে আমরা অকর্মণ্য ও পশু হইয়া বলিয়া আছি।

(৩) “নিষ্ঠার (tenacity of purpose) অভাব”। যে অবিচলিত নিষ্ঠা, অটলবৈধ্য ও অপরোক্ষ উদ্দেশ্যের নিকট বাধাবিহীন মন্থক অবনত করে, সফলতা খর্য দেয়, আমাদের তাহা নাই। কত শিশু অস্থিমান ও সঙ্কল্প বহুবিশেষ অসংখ্য সমস্যাত শিশুর মত প্রতিধ্বা পুণেই মরিয়াছে, তাহার ইচ্ছা কে করিবে? কোন একটা বিষয় কামড়াইয়া ধরিয়া থাক যেন বাঙালীর কোঠিতে দেখে নাই; আজ বাহারা উৎসাহ ও তেজে চঞ্চল করিয়া ছুটিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহারা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কত সুস্থ বৃদ্ধ আন্দোলন ও প্রয়াস আপিয়াছে; কিন্তু কয়টা টিকিয়া গিয়াছে?

(৪) “সমবায়শক্তির অভাব”। দল বাধিবার বা দলবদ্ধ হইবার ক্ষমতা (capacity to organise or to be organised) কি ভীষণরূপেই লোপ পাইয়াছে! বাঙালী একা যেটুকু পারে, পাঁচ জনে মিলিয়া যিনি কাজ করিতে সেলে যেন সেটুকুও খট্টা উঠে না। ছোট বাঁধিয়া সকলকে উদ্ভুদ্ধ করিয়া মিলাইয়া মিলাইয়া চলাইবার উপযোগী কর্মী নেতা আমাদের একেবারেই নাই। আর অভাগা আমরা দলবদ্ধ হইয়া নির্দেশ মানিয়া চলিব সে ক্ষমতাটীও হারাইয়াছি। কোথায় হে কর্মীর দল, বাহ্যেবর জীবনব্যাপী সাধনা বহুশ্রুতির মত

আমাদের চারিদিকের বিকল্প বহুশ্রুতিকে উদ্ভিন্ন করিয়া তাৎক্ষণিক ঐক্যের সূত্রে গাঁথিয়া দিবে?

(৫) “স্বাধীনতার অভাব”। আমাদের সব কাজেই যেন চলাধি। একটা ব্যাপার হাতে লইয়া তাহার গুরুত্ব বুঝিয়া কামনো-বাক্যে সেই অস্থানে চেষ্টা করিব, সেটা আমাদের ইচ্ছা উঠে না। আমরা চাকুরের নীচে বসিয়া বেশ স্বকণ্ড ভাবে কাজ করিতে পারি; আফিসে চাকরীর দায়ে, রেলস্টেশনে গাড়ীর বাতিরে আমরা বেশ নিরস্ত ও সময়েত অস্থবর্ত্ত। কিন্তু ঘোষানে কাকটা ঘোলায় আমরা হাতে, সেই গানেই বিষয় শৈথিল্য, মহাবিশৃঙ্খলা। এইরূপে কত কাজই না আমরা পণ্ড করিয়াছি!

(৬) “প্রবর্তন শক্তি”(power of initiation) অভাব। আমরা কৃশাশ্রুতি বাঙালী-জাতি, ভাবিয়াছি অনেক, শুনিয়াছি অনেক, শিখিয়াছি অনেক। কিন্তু কয়টা কার্য গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি? চিন্তা ও আলোচনার গণ্ডী ছাড়াইয়া আমাদের শক্তি কার্যের লগতে কিছু বিশেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আজ দেশের সকলকেই এখন এক লক্ষ্য লইয়া সাধনা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও স্বার্থ তুলিয়া, সমষ্টির স্বার্থ, সমষ্টির উন্নতিই যদি আমাদের ধ্যান হইয়া উঠে, তবেই আমরা রক্ষা পাইব। আর আমাদের জাতীয় দোষগুলি দূরীভূত হইবে, যদি আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনে সেই-গুলি দূর করিবার চেষ্টা করি। আমাদের মাতৃভূমির বহুগুণাবিত সম্ভাবনাদের মধ্যে একমল কঠোরকর্মী, একনিষ্ঠ, ত্যাগব্রত তাপস কি আমাদের আজ পথ দেখাইবেন না?



## বসন্ত-প্রয়াণ

( শ্রীপরমহংস দামোদর প্রণীত )

সাহিত্যকে সাধারণতঃ চই দিক দিয়া দেখা হইয়া থাকে ; নৌস্বার্থ-দৃষ্টি দ্বারা চিত্তস্থমিকে যখন রূপসিক্ত করিবার আয়োজন দেখা যায়, তখন তাহাকে বলা যায় কাব্য ; আর কোন বস্ত-তত্ত্বের অগ্রনন্দনে মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে করিতে যখন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস লক্ষিত হয়, তখন সেই শ্রেষ্ঠীর রচনাকে সাধারণতঃ তত্ত্ব-লোচনা নামে দেখা যাইতে পারে। জীবনের বেদনাসূত্রে বেগানে এই উভয়দিকের মধ্য-কথা পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া পরস্পরের সম্পর্কে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে দেখানে অতি বড় সাহসী মণিকারও তাহার মূল্য ঘাটাই করিতে ভয় পায়। হার হইতে বেগানে মণি বিচ্যুত করা যায় না, হারের সংগ্রহনের মধ্যেই বেগানে মণির নৌস্বার্থ লভ্যত্বে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, দেখানে তাহার গুণ বিরেচন করিতে গেলে আশ্চর্যানন্দ ও আশ্চর্য্যকৃতির কল্পিতাধর ছাড়া কোন সাম্প্রদায়িক সমালোচনা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা বাস্তবিকই দুষ্কর। চিত্তের জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে দ্বারার জ্যোতিক প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাকে দিবালোকের স্পষ্টতার মধ্যে আনিয়া সকলের চক্ষুতে রূপপ্রকাশ করিয়া দিবার ভরসা ভরশামাত্রই থাকিয়া যায়।

জ্ঞানের পথে যত দূর হইয়া কূটতর্কের আল বাধিয়া সত্যের ফলকে পাড়িয়া যখন হাতে করিতে চাই তখন অহঙ্কার হয় যে সত্যকে বুঝি পাইলাম। কিন্তু ঐহই বুঝিতে পারি

যে কেবল সে পাওয়ার প্রাণ তৃপ্ত হয় না ; সে পাওয়ার কেবল বাহিরের দিক দিয়াই সত্যকে বেটন করা যায় মাত্র কিন্তু তাহাকে আপন জীবনরসের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া যায় না। তাই হাতে পাইলেই পাওয়া হয় না, আশ্রয়নের দ্বারা যে পাওয়া তাহাই স্বার্থ পাওয়া, সে পাওয়ার বর্ণনা নাই অঙ্গ-ভূতি আছে। রূপ নাই গন্ধ আছে, বিস্তৃতি নাই অথচ প্রচুরতা আছে। এই পাওয়ার মধ্যে প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থে তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক দিয়া যে সমস্ত তথ্য অপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্রবের সঙ্গে ঝড় গানের স্রাব, স্রবের উচ্ছ্বাসে প্রসূতিত হৃদয়ের স্রাব, রসের স্রবিত পরিণত পেশল ফলের স্রাব তাহাদের অন্তরর বসন্তাতুর নিবিড় সহজ্যগে জীবনের বৈচিত্রে বিচিত্র ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রেয়ের প্রথম উন্মেষে দ্বারার উন্মেষে সমস্ত জীবন অর্থাৎ হৃদয়ের মত উন্মেষ্ট হইবার অঙ্গ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল সে আশ্রয় যখন কবীর কৃপাকটাকে সংস্পর্শ হইল তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিত্তি দিয়া যে দুঃসহ স্রাবের কলম মধ্যভেদী হাফাকার উন্মিত হইয়াছিল, তাহাতে লেখিকার হৃদয় প্রথম আহত হয়। এমন প্রবলভাবে আঘাতটী আসিয়াছিল, এমন একটা আলোড়নে তাহাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল যে তাহার উদ্বেগনার আঘাত-কেজে তাহার জীবনের সমস্ত লক্ষি সংস্পর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। এই আঘাত ও তাহার

প্রতিবাদই তাঁহার জীবনে প্রথম অভ্যাস। সত্য ও অসত্য শব্দই হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রমের ঢুকা। স্বতন্ত্র ছিল ততন্ত্র কেবল মোহ ছিল; ধ্যানের ফলে ধীরে ধীরে ছায়ার মতন বহন তাহা অপসৃত হইয়া গেল তখন তাহার অন্তরালে তিনি তাঁহার আত্মার বিরাট প্রেমস্থান প্রত্যক্ষ করিলেন। শরীরের ক্ষুধার দ্বারা সে ক্ষুধা পাইবার নয় দিবার। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে সমস্ত বিশেষই সেই নির্বিশেষ বিরাটের অভিব্যক্তি মাত্র তাই আত্মা যখন সেই বিরাটের সহিত যোগ হুক্ত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এই বিশেষকেই উপলক্ষ্য করিয়া সে ছোট্টে এবং অনন্ত বিশেষের মধ্যে বসেই সে আপনাকে বিলাইয়া দিতে থাকে নির্বিশেষের সহিত হুক্ত হইবার পথে ততই সে অগ্রসর হইতে থাকে। সংগ্রামের ফলে লেখিকা যতই আত্মার রসাতলপূরে নিমগ্নতাই চতুর্থে লাগিলেন, বিশেষ সমস্ত সার সত্যগুলি ততই ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তর ইন্দ্রিয়ের নিকট অপরোক্ষ হইয়া আসিল; প্রেমের বলে সত্যকে বাস্তবিক জীবনে অনুভব করিয়াছেন বলিয়া তব্বালোচনা সাধারণতঃ বেতন শুক ও কঠোর হয় ইহার রচনার তাহা দেখা যায় না; ক্রমশঃক্বেত্রে অহুতবের রসে সমস্ত সত্য যেন আপন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সরসতার অধুষিত হইয়া উঠিয়াছে। তর্কের পথে সত্যগুলি আবিস্কৃত হয় নাই বলিয়া ইহার মধ্যে তর্কের আভাস নাই; উপনিষদের প্রণালীতে অনেক সত্যের তত্ত্বকথা বিনা সত্যোচ্যে অভ্যাস নিঃসন্দেহ ও সহজভাবে সরসে বিখ্যাসের সহিত উচ্চারিত হইয়াছে। বাহ্য লিখিয়াছেন তাহা লেখিকার অন্তরের মধ্যে এক স্মৃতি, শব্দ, সত্য ও সহজ-

ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। যদি অহুতবের লেনমাত্রের অনশ্লিষ্টতা থাকিত তাহা হইলে তাঁহার রচনা প্রণালীকে হস্ত একটু অক্ষুণ্ণ বলিলেও বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহার জ্ঞান নাই। “ইহা লোকোপযোগী প্রেমের তাক্তনায় মানব-জন্মের বস্তোনিখিত একটা বার্তা। লেখিকার অন্তরের মধ্যে যে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল বেদনার প্রচণ্ড উদ্ভাসে এই রচনাও দানা বাঁধিয়া এইভাবে প্রথম আবিস্কৃত হইল। এই আবিস্কার কেবল পাঠকের কাছে নয় ইহা লেখিকার কাছেও নূতন। ইহা বৃত্তি করিয়া ভাবা নয়; চিন্তা করিয়া পাওয়া নয়; বিশেষ অবস্থার মাহুতের সমস্ত প্রকৃতি যখন অবিস্কৃত ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় মন ক্রমশঃ সহসা তীব্র চৈতন্যের আলোকে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তখন সেই আলোকে একটা কোন গুহ্যহিতকে অনুভব করা গেল ইহাই এই রচনার বিষয়। এই রচনার মধ্যে যে অনির্জনীনবের অহুতব আছে তাহার অনির্জনীনবতা কিছুই নষ্ট হয় নাই। তবে আমাদের স্মৃতি হইল কি? না অহুতবের সত্যতা; তাহার স্বতঃ প্রকাশিত স্বাভাবিকতা আমরা বিশ্বের এবং আত্মার রহস্যলোকের একটা নূতন সাক্ষী করিলাম। সেই সাক্ষী সরল অথচ শিক্ত, এইজন্য তাহার সাক্ষীর বিশেষ একটা মূল্য আছে।” ইহাকে অনেকাংশে উপনিষদের সহিত এবং কতক অংশে পরমহংসদেবের বাণীর সহিত তুলনা করা যায়।

লেখিকার লেখা পড়িলে বেশ মনে হয় যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের গোড়াকার কথাগুলি তাঁহার বেশ জানা আছে, এবং

সংস্কৃত দর্শনের পারিভাষিক শব্দগুলির উপরও দখল আছে, বেশ ছোট ছোট ক্রমবর্ধমান কথায় প্রাণের বাস্তবতা বিস্তৃত করিয়া লিখিতে লিখিতে স্থলে স্থলে সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে তথ্যার্থকে এমন হৃদয় সংকল্প ভাবে সংগৃহীত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যে তাহারই মধ্যে সমস্ত বাক্যার্থের ছবিটী ধেন সহস্র উজ্জলভাবে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে ইউরোপীয় দর্শনের এক একটা গভীর তত্ত্বকথা এমনি সহজভাবে দুই পংক্তিতে প্রসঙ্গক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে যে দেখিবার বিন্দিত হইয়াছি। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শিক্ষার অভিজ্ঞতাও ভাবের ক্ষুদ্রতাকে হৃদয় ও হৃদয়ভিত্তিকভাবে আবিহৃত করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষার যে উপকরণগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মনন ও অহুতির দ্বারক রূপে জীব হইয়া চিন্তাপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে বলিয়া লেখিকার রচনার মধ্যে বিভাবতা বা পাতিতোর কোন আড়ম্বর নাই অথচ প্রকার স্বাভাবিক সিন্ধতা বিস্তারিত হইয়াছে।

ভোগ দিয়া আরম্ভ হইলেও ভোগের মধ্যেই বেগের বাতবিক অমরত্ব মেঘনুত, সুমার-সত্ত্ব ও নকুলার কবি তাহা মধুময় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষৎও বলিয়াছেন 'ভ্যক্তেন ভূতীয়া' 'ভ্যাপেনৈকে অমৃতত্ব-মানসঃ'; ভোগ সীমাবদ্ধ, বৈরাগ্য অসীম, ভোগমগ্ন, বৈরাগ্য পূর্ণ, ভোগে তর, বৈরাগ্যে অভয়, এ আনন্দের সেনের অতি পুরাতন কথা। কিন্তু ভোগের মধ্যে আপনাকে আচ্ছন্ন ও লম্বুত দেখিবার দ্বারে দ্বারে অগ্রসর হইয়া ভোগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহা যে সত্য আপনার দ্বার্থ স্বরূপ লাভ করিতে পারে,

এ প্রণালীতে এ কথাই আলোচনা আমাদের সাহিত্যে কথঞ্চিৎ নূতন বলিয়াই মনে হয়। নরনারীর পার্থক্য প্রেমও যে ক্রমশঃ শোধিত হইয়া দ্বিধাক্ষপ দ্বারক করে বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহার ভূরি আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু কি দ্বাধ, কি স্নোতে ভোগের নিষ্করিত দ্বিধা ভোগের মহাদাগরে উপনীত হয় অন্তরের অহুতির মানচিত্রে তাহা সন্নিবেশিত করিতে বাওয়াই এই গ্রন্থানির বিশেষত্ব। কোন মহাদাগরের অর্থও অনন্ত বেটনী, আপনার মধ্যে ভোগ ও ভোগকে সন্নিবেশিত করিয়া ভোগের অপূর্ণতার মধ্য দিয়া আপন ক্রমবিকাশের অন্তর্দীপ্য ভোগের পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে সার্বক করিয়া তোলে ক্রমের সহজ ভাষায় এই গ্রন্থ লেখিকা তাহারই সূচিনিক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

পরমার্থেও অর্থও এক সত্য বস্তু, জ্ঞানের ভাষায় ইহাকেই চিন্তাধরূপ বলা যায়। এবং ভাবের ভাষায় ইহাকেই আনন্দধরূপ বলা যায়। অজ্ঞান, অবিজ্ঞা বা অধ্যাসবশতঃ এই জাতক্রেম সূত্র অর্থও জ্ঞানকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও বিবিধ বিষয় জ্ঞানরূপে আনন্দা সত্তাই গ্রহণ করিয়া থাকি। বিষয় ও বিষয়ি ব্যতিরিক্ত এই অর্থও আনন্দকেই অধ্যাস-বশতঃ অগতের বিচিত্র সূত্র আনন্দের মধ্যে প্রত্যাক করিয়া থাকি। নির্কিণেব আনন্দ ও নির্কিণেব জ্ঞান একই বস্তু, সমস্ত বিশেষ-জ্ঞান ও বিশেষ আনন্দ তাহারই উপর আরোপিত এবং মিথ্যা। কাজেই সমস্ত বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ আনন্দ মিথ্যা বলিয়া জানিবার তাহার প্রতি সঙ্গ্রহকার ভোগবান্দা দমন করিয়া নিরঙ্ক স্নেহ স্বরূপ, জ্ঞান-রূপ ও আনন্দ স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া

সেই নির্জিনেব বস্ত্রের মধ্যে চিরবিজ্ঞান  
ও চিরশক্তি বিস্তৃতভাবে চরম দিকান্ত ।

জীব ও জগৎ উভয়েই সেই পরম দেবতার  
অংশ বিশেষ । অসংখ্য রূপ, অসংখ্য বিশেষ,  
অসংখ্য গুণ, অসংখ্য জীবের মধ্য দিয়া ঈশ্বর  
আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন । সমস্তই  
তাঁহার শক্তি হইতে উদ্ভূত কাছেরই ইচ্ছাধর  
কোনটাই বিখ্যা, কল্পিত বা আরোপিত নয় ।  
তিনি পূর্ণ, আর আমরা অংশ মাত্র ইহা  
বুঝি। তাঁহার সহিত আমাদের যথার্থ সংঘ  
রক্ষ । করিবার জন্য জীব হিসাবে অংশ হিসাবে  
আমাদের সমস্ত বিশেষ কণ্ঠ বিশেষ জ্ঞান  
বিশেষ বাসনা সেই পূর্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ  
করিতে পেখাই আমাদের প্রথম কর্তব্য ।  
অংশ বা অবয়ব বস্তুর জীব যদি আপনার  
জ্ঞান বা কণ্ঠকে ঈশ্বর হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র-  
ভাবে আপনার বলিয়া মনে করিয়া সম্বা-  
ভিবান মুক্ত হয় তবেই বিশেষ বিস্তার  
উপস্থিত হয় । কিন্তু ঈশ্বরে কণ্ঠ সমর্পণ  
করিলেই কর্তব্য শেষ হইল না । প্রেমরসে  
আপনাকে ত্রব করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন-  
ভাবে আপন ভিত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিতে  
হইবে । রসে নিমগ্ন হইয়া এমনভাবে আত্ম-  
হারা হইতে হইবে যে আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের  
কথা মনে না উঠিবে। আমি যে তাঁহারই এই  
ভাবে প্রাণ সহজেই অহংপ্রাপিত হইয়া  
উঠিবে । ক্রমে “আমি যে তাঁহারই” এ  
প্রেমের তাবতী সখা, দাস্ত, কান্দা প্রকৃতি  
নানাভাবের মধ্য দিয়া এমন একটা অবস্থায়  
উপনীত হয় যেখানে একটা অগুণ প্রেমরসের  
মধ্যে পরম্পরের রসাবাদের অনন্ত রান-  
লীলায় উভয়ে নিমগ্ন থাকে ।

“প্রভু কহে পড় স্নোক সাধের নির্ঘ ।

রাহ কহে স্বপ্নাচরণে বিজুক্তি হয় ।

প্রভু কহে এতো বাহু, আগে কহ আর ।

রাহ কহে কক্ষ কদম্পর্ণ সাধাধার ।

প্রভু কহে এতো বাহু, আগে কহ আর ।

রাহ কহে স্বপ্নাচরণ এই ভক্তিসাধাধার ।

প্রভু কহে এতো বাহু আগে কহ আর ।

রাহ কহে জ্ঞানমিত্রা ভক্তি সাধাধার ।

প্রভু কহে এতো বাহু আগে কহ আর ।

রাহ কহে জ্ঞানমিত্র ভক্তি সাধাধার ।

প্রভু কহে এতো হয় আগে কহ আর ।

রাহ কহে প্রেমভক্তি সঙ্গীসাধা সার ।

প্রভু কহে এতো হয় আগে কহ আর ।

রাহ কহে দাস্ত প্রেম সঙ্গীসাধা সার ।

. . .  
. . .

প্রভু কহে জানিল কক্ষ রাধা প্রেমভক্ত ।

শ্রুতিতে চাহিয়ে ধোঁহার বিলাস-মহৎ ।

রাহ কহে কক্ষ হয় ধীর ললিত ।

নিরন্তর কাম ক্রীড়া ধোঁহার চরিত ।

রাত্রিদিন কুল ক্রীড়া করে রাধা সনে ।

কৈশোর বয়স সকল কৈল ক্রীড়া রমে ।

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর ।

রাহ কহে ইহা বই মুক্তি গতি নাহি আর ।

দেখা প্রেম বিলাসবিষয় এক হয় ।

তাঁহা শ্রুতি তোমার অর্থ হয় কি না হয় ।

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল ।

প্রেমে প্রভু ব্রহ্মে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ।

তথাহি গীতম্

ন সো রমণো ন হ্যম রমণী ।

দুহ মন মনোভব পেখল জানি ।”

সংক্ষেপতঃ এই যে দুইটি দিকান্তের উল্লেখ  
করা গেল, ইচ্ছাধর উভয়ের সহিতই লেখিকার  
মস্তের আত্মবৃত্তা আছে, যদিও তিনি ইচ্ছার  
কোনটাইই অহংপর্য করেন নাই । লেখিকা  
বলেন প্রেমের কারকরসে বধন আত্মা ও

পরমাত্মার এক মহামিলন উপস্থিত হয় তখন সমস্ত জ্ঞানালোকের অতীতে প্রেমের এমনি এক অসম্প্রজাত সমাপিত উল্লেখ হয় যে তাহাতে আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই দাঁত হয়; সেখানে আর কাহারও কোন স্বতন্ত্রতা থাকে না; জীবেরও না পরমাত্মারও না। “পরিণয়ে মৃত্যু! প্রজাপতির আদি অভিশাপ! জন্মে জন্মে বসন্ত সখার সহিত কাল পরিণয়ের অভিনয় করিলাম। আজ আমি ও ঈশ্বর মিলনে সেই যুগযুগান্তরের অভিনয় সমাপ্ত হবে। আহা কি মধুর মৃত্যু! কি করণ সংহার! আজ আমাদের মিলন, আজ আমাদের লয়! এ বিশেষ আজ আর আমিও থাকব না, আমার ঈশ্বর থাকবে না। আজ হতে আমারও লোপ হবে আর আমার ঈশ্বরও লোপ হবে।.....এ—আমি—ঈশ্বর মিলন যে একযোগ। লয়যোগ।..... এই ঈশ্বর আমার মিলন একরস। বলতে গেলে ইহাই আদিরস। এ বৈ রসের স্বরূপ, স্বরূপের রস। যুগল বিয়ছে যে রসমুক্তি গড়ে উঠেছিল এই এক রসে গলিয়া গেল। বিয়হ চলিয়া গিয়া যে নূতন সমগ্র আলিল তাহাতে জ্ঞানের রস বিশ্লেষণ নাই। এ রস সাগরে কেবলানন্দ কৈবল্যরস, জ্ঞানও নহে অজ্ঞানও নহে, জ্ঞান-জ্ঞানের অতীত।” বৈষ্ণব শিষ্যান্তে কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই লয় যোগ স্বীকৃত হয় নাই। সেখানে জীব-জন্তুে একটা অতিষ্ঠ ভেদাভেদ থাকিবেই থাকিবে। বিপুলত্বৈত্ববাদের সঙ্গে অবৈত্বত্ববিহিন্যে সন্মতি থাকিলেও যে জ্ঞানাতীত মিলন রূপের রসাক্ষেপে চক্ষু অহুনিপ্ত করিয়া আনন্দস্বাদাপণ্ডা হইয়া দেখিবে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই তাহার শিষ্যান্তকে মধুরতর “করিয়া তুলিয়াছে।

বেদান্তশিষ্যান্তে নির্জিনেবকেই চরম বল হইয়াছে, বৈষ্ণব শিষ্যান্তে বিশেষই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু এই নবীনা লেখিকা তাহার উল্লেখিত জ্ঞানের আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে বিশেষ ও নির্জিনেব ব্যক্তি ও সমষ্টি, ব্যক্তি ও বিশ্ব, এ সমগ্রই এক মহতী মনো-শক্তির আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। নরনারীর ইন্দ্রিয়কল্ল, ভোগপ্রবণ, দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে আমরা অতি সুন্দর-ভাবে ইহার প্রথম নিদর্শন পাইয়া থাকি কিন্তু এই প্রেম ক্রমশঃ দাম্পত্যজীবনের নিখিট বিয়হ ভাগ করিয়া এই মহাসংসারের অসংখ্যের প্রাণের মধ্যে নানা আধারে নানা ব্যবস্থায় বিচিরিত্রপে আপনাকে প্রকাশ করিতে বিশ্বমানবের হৃদে ছুঁবে সমবেদনা জাগরিত করিয়া আপন আনন্দরসে সকলকে অভিযুক্ত করিয়া আপনার মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিয়া “মহা-মিলন স্বরূপ” আপন বসন্ততত্ত্বলব্ধে সমুদ্র হইয়া উঠে।

শরীরকে আশ্রয় করিয়া রূপের সীমার মধ্যে নরনারীর প্রেম বসন প্রথম প্রকাশ পায় তখন উভয়ের মধ্যে যে একটা সূচু তৃষ্ণা থাকে তাহার দাবী মিটাইবার কোন পথই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সীমার মধ্যে সীমাকে পাওয়া যায় না তাই এই চাওয়ার মধ্যে আমরা কোন পাওরাকেই পাইতে পারি না। ভোগের মধ্যেই আমরা ভোগকে হারাই। কিন্তু এই রূপের চাওয়ার অন্তরালে স্বপ্নের মধ্যে যখন একটা দেওয়ার তৃষ্ণা ধীরে ধীরে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে তখনই বাস্তবিক আমাদের বসন্ত পাওরাকে আমরা আশ্রয় করিয়া থাকি। প্রেমোন্মাদনের উদ্দেশে সমস্ত প্রাণ বসন অবৈষ্ণবী ভোগ-

লিঙ্গায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে তখন সেই জ্যাম বাহার অঙ্কুড়তির মধ্যেই আমাদের অতরপুত্র তাহার আশ্রয়প্রাপ্তির বর্ধা সন্ধান পাইয়া থাকে। যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ ভোগ-প্রবণ ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের জড় ও গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে এই জ্যামপূর্ণা যখন সে গুলিকে দূর করিয়া দিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই ক্রমশঃ পূর্ণতর হইয়া আসে। আপন বর্ধা-বক্তৃতির উপলব্ধি করিয়া আপ্তকাম হইয়া উঠে। এই বেওয়ার মতোই যখন বর্ধা পাওয়ার সন্ধান ঘটে তখন বেওয়া ও পাওয়ার প্রভেদ ঘুচিয়া যায় এবং কালেই বেওয়াটা যত নির্ভীক ও নির্ভয় হইয়া উঠে পাওয়াটাও তত পরিপূর্ণতর হইতে থাকে। ফলে এমন অবস্থা ঘটে যখন নানই মানের চরম সার্থকতা হইয়া পড়ায়; যখন এই মানবুতি কোন বিশেষ পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-বলে মন্বাকিনীর অন্ততথারায় সকল কালে সকল লোকে প্রবাহিত হইতে থাকে তখনই এই অসংখ্যের বিশেষের মধ্য দিয়া বিশ্ব আদিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হয় এবং বিশ্বের সহিত আমাদের হৃদয় একযোগে যুক্ত হয়।

আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, যে প্রেমের লীলা আমাদের গিকে অগতের সহিত যুক্ত করিয়া আপনাকে সার্থক করিতেছে, তাহাই বিশ্বঅগতে, বস্তু, স্থিতি, লয়ের লীলা পরস্পর আপনাকে একাধিক করিয়াছে, একই মিলন-শক্তির স্বাভাবিক বিকাশে অগতে জীব উৎপন্ন হইতেছে, একের সহিত অপরে রূপের বন্ধনে যুক্ত হইয়া পালিত হইতেছে এবং নানা বেহ নানা আধারের মধ্য দিয়া মানের দ্বারা জ্যামের দ্বারা সার্থকতার চরমসীমায় নীত হইলে, পুনরায় সেই মহাপ্রতির মধ্যে সংযত

হয়। বিশেষ ও বিশ্ব এই উভয়ে যখন স্বকীয় লীলাধের চরম সার্থকতায় উপনীত হন তখনই লীলাধের লয় হয় ও একে অপরের মধ্যে সংযত হন, এই অস্ত্র “সংহার” নামই চরম মান।

লেখিকা “বিশ্বের পথে” বিশ্বমাতার এই অনির্জননীষ প্রেমলীলার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই রূপসংহের মধ্যে অবগতি হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সাম্প্রতিক হিসাবে জননীত্বপে মাতৃশক্তি অতীব করিবার মাতৃবৃত্তি (maternal instinct) তাহার নাই; তাই জ্ঞান মহিমায় সমস্ত অগতকে আপন অপভ্রান্তে মনে করিয়া আপন মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে অপ্রাকৃত ভাবে সন্ধানরূপে মাননী দৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বের মাতা মেঘী, ঐক্যের মাতা বশোদা জননী না হইয়াও মা হইয়াছেন তাহাতেই হুচিৎ হইয়াছে যে এই পরলীলা মাতৃশ্বের মধ্যেই বাস্তবিক মাতৃশ্বের পরিপূর্ণ বিকাশ চরম সকলতা, জগতের পাণ্ড লঙ্ঘনে প্রকৃতির মাতৃশক্তির সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইয়া ইনি প্রত্যেক করিয়াছেন যে, সন্তানের উপর নিজের কিছুমাত্র দাবী না রাখিয়া, যে মেহ-রসে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অনারত অঙ্গবর্ধণেই বিশ্বমাতার মাতৃশক্তি আপ্ত-কাম হইয়াছে। সন্তান বাহাতে তাহার পরিপূর্ণ সকলতা পাইয়া যত্ন হইতে পারে তাহারই অহুত্রে তাহার স্বাধীন সৃষ্টির চেষ্টাকে অঙ্গ বেষ্টন্যে পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই বাস্তবিক মাতৃশ্ব। সন্তানের কাছে কিছু চাহিব না কেবলই তাহার জন্ত জ্যাম করিব, ইহারই নাম মাতৃশ্বের সন্ধান।

ইহার পরে লেখিকা আবার প্রলয়ের কলমের এই বহিঃপ্রসিদ্ধে সৎকার্যবাহার বিশ্ব-

শক্তির কোড়ম্ব দেখিতে চাহিয়াছেন, জ্ঞানের মধ্যে এই বিবেক ভেদ বিশুদ্ধ, জ্ঞানের মধ্যে বিশ্ব সর্বদাই সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে,— সেখানে সেই একই বিস্তারিত, কিন্তু কণ্ঠের অবস্থায় তাহাই কিচিত্র হইয়া বৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইতেছে। “জ্ঞান কণ্ঠ কেবল মগা-চক্রে ঘুরিতেছে। কণ্ঠশেবে, সবই এক, আবার কণ্ঠের অন্ত দুই। এই এক দুই, দুই এক, চিরকাল ঘুরিতেছে। কেও জানুছে না কখন এক, কখন দুই। কেও বলুছে এক, কেও বলুছে দুই। কণ্ঠ দেখানে দেখানেই দুই, জ্ঞান দেখানে দেখানেই এক। কণ্ঠের অন্তই সৃষ্টি, আর জ্ঞানেই সংহার, তাই সেই অচিন্ত্যাদিলন বা শক্তি অনন্তকালের, অনন্ত-ক্রমের, অনন্তলক্ষি ও অনন্তসংহারের আবর্তন-চক্রের বিরামবিহীন ধারাগতির মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার বিরামও নাই, বিচ্ছেদও নাই, যে আমার আত্মার আত্মা তোমার সৃষ্টি ও সংহারের কি কোন ক্রম আছে? সেই মহাকালেরও পূর্বে নির্দিষ্ট ক্রম, পে ক্রম কে জানে? তুমিই কি সেই ক্রম? তুমিই এই অনাধ্যাত্ম পরম্পরার সূত্র-বদ্ধ? তুমিই এটি? তুমিই বন্ধন? তবে তোমার কি মুক্তি নাই?”

“বিবেকের পথে” “বিবেক পথে” “বিশ্বাতী-তের পথে” এই তিন খণ্ডে গ্রন্থখানি ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষ খণ্ডটিকে “বিশ্বাতীতের পথে” বলাটা তত সঙ্গত হইরাছে বলিয়া মনে হয় না বরং “বিশ্বস্ত-বিলাস” বলিলে প্রবন্ধার্থের ঘোড়না অনেকাংশে স্পষ্টতর হইত, এ খণ্ডটি পূর্ণ দুই-ভাগের Synthesis বা সমাবেশ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবোধের যে একটা দৃশ্য আছে প্রত্যগাত্মরূপে বিশ্বশক্তির প্রতিকল্প

যে একটি বৃহৎ আত্মপ্রত্যয় ও তাহারই সংরচকপে ত্রৈবিকপে যে আর একটি ক্ষুদ্রতর আত্মপ্রত্যয় আছে,—এই উভয়কে লইয়াই, তৃতীয় গও লিখিত হইয়াছে।

ত্রৈ চৈতন্ত আপনাকে বন্ধনমুক্ত বলিয়া বোধ করিলেও দ্যতদিন পর্যন্ত না এই জগৎ-লীলার সঞ্চরণ হয় ততদিন পর্যন্ত প্রত্যগাত্ম-চৈতন্তের সহিত তাহার আনন্দোপভোগের বিরাম নাই, কেহই কাহারও সহিত একেবারে মিলিত হয় না অথচ উভয়েই উভয়ের সন্নিবিষ্ট তৃপ্তি ও আনন্দ অমুভব করে

“সেই মত মুক্তপ্রাণে প্রেমিক সান্নিধ্যে  
লীলাতে মেতেছি আনন্দ মোর বধু সনে  
জানে প্রেম, মুগ্ধপথে পক্ষ প্রণারিণে  
লীন হবে মুক্তাপ্রাণে লীলা সঞ্চরণে

.....তোমার অন্তর ঘন বেতে পারিনি তখন  
সেই সখোদী লীলা করে তোমায় রস প্রদান  
করি। আর তুমিও আমার তোমার তৃপ্তি  
বৃদ্ধিতে ধাও। তোমার তৃপ্তি বৃদ্ধি আমি নূতন  
লীলা করি যাতে তোমার পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও  
তাহা হতে যে অঙ্গ তাহা ঘেন শীঘ্র আসে।”

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই, এই প্রত্যগাত্মচৈতন্ত ও ত্রৈচৈতন্তের দ্বন্দ্ব আমরা সময়ে সময়ে অমুভব করি, ও ত্রৈচৈতন্তের উপর প্রত্যগাত্মচৈতন্তের যে বাস্তব বা নিশ্চয় তাহাকে বিবেক, conscience বা categorical imperative বলিয়া ব্যাখ্যা করি; কিন্তু লেখিকা যে অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এ অবস্থা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, এ অবস্থার এই উভয় চৈতন্তের সঙ্গে নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ বা স্বামিত্বভূতর সঙ্গ নাই, উভয়ে উভয়ের সন্নিধান মাঝেই তৃপ্তি অমুভব করে এবং উভয়ের তৃপ্তি উভয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়, এ আত্মানন্দ লীলার দান



কাজেই ইহাতে উপস্থ. অপচয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। “আত্মার যে আশ্রয় এই লাভালাভ গণনা শেষ হইয়াছে। আত্মার পক্ষে, আশ্রয় এই তোমার বন্ধন ভয় ও বন্ধন, মুক্তি বাসনাও বাসনা।” যতদিন যতদূর থাকে, জীববৃত্তিতে কর্তব্যবোধ থাকে, ততদিন এই ভয়, এই বাসনা, কণ্ঠের সঙ্গ, মুক্তিপথে পথপ্রদর্শক। পরে যখন আত্মার কেন্দ্র হারা হইয়া যায়, পরিচিও থাকে না তখন অরূপ অবাধ আত্মপ্রকাশই সার, এই আত্মপ্রকাশই আত্মদান। এ দানে অলাভও যেমন অদত্তব, লাভও তেমনি অলীক। সে যে আত্মকাম, আত্মরতি। সে যে সর্বকাম, সর্বভূক্ত।

অথবা আত্মার এই দ্ব্যর্থতা double personality ছাড়াও এখানে মন বলিয়া আর একটি অর্থবোধও চিহ্ন পাওয়া যায়। উই-চৈতন্তের অপূর্ণতার অংশটুকুই যেন মন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে বাধাটুকু থাকার ক্ষত্র। উই-চৈতন্ত একেবারে সমগ্রভাবে প্রত্যাপাখ-চৈতন্তের সঙ্গিত মিলিত হইতে পারিতেছে না, তাহাই যেন মন। উই-চৈতন্ত, উভয়ের সম্মিলনের অপূর্ণতা দেখিয়া আত্মশোষ করিতেছে। গান করে একেবারে নিঃশব্দ ও নিরাবরণ না হতে পাবলে আর সত্যকে সমগ্রভাবে পাবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

মনে হয় যে লেখিকা এক এক সময়ে এক এক স্তর হইতে বিভিন্ন প্রকারে আপন আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেই অত্মপ্রেম, এই বিভিন্ন প্রকারের আত্মবোধ (personality) উপলব্ধি করিয়াছেন, যখন প্রত্যাপাখ্য ও উই-চৈতন্ত মিলনযোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তখন আর কোন বাধা বা সত্যপূর্ণতার সেনসাত্বও অগ্রসর করেন নাট; আবার যখন আর একটু নীচে আসিয়া

বেধিয়াছেন, তখনই বেধিয়াছেন যে তাহারই সত্যপূর্ণতার বাধার উভয়ের সম্মিলন সমগ্র হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, ও সেইজন্য মনের কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া আত্মশোষ বোধ করিয়াছেন।

জ্ঞানের মধ্যে বিবর্তকে আমরা যে ভাবে পাই, তাহাকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। জ্ঞানবাত্তাই-ক্ষণাৎপক্ষী। বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রত্যয়ে তাহার বিকাশ। তাই বর্ণনাক্ষণে আমরা বস্তুকে কখনই সমগ্রভাবে পাই না, এক একক্ষেপে বস্তুর একটা দিক্ আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়, আশ্রয় ক্রমাবলম্বনে পূর্ণাঙ্গের হিসাবে তাহারই এক একটির উপর ভর করিয়া জ্ঞানের অনন্তে বিচরণ করি, কিন্তু এই যে প্রত্যয়-ধারার মধ্যে দিয়া আমরা বস্তুকে স্পর্শ করি, ইহাতে বস্তুর সত্যস্বরূপকে আমরা একদমে হাতে করিতে পারি না। এদিকে ওদিকে আত্মল দিবে স্পর্শ করি যাত্র। যে সহস্র সহস্র স্তরের সমন্বয়ে জ্ঞানপথে কোনও বস্তুকে যখন আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা সত্য সত্য একক্ষেপে যুগপৎ কখনও প্রকাশ পায় না, তাই একটা ত্যাগ করিয়া অপরাধ ও সেটাকে ত্যাগ করিয়া অপরাধ। এই বিরোধ ও গ্রহণের প্রণালীতে, জ্ঞানের শূন্য ক্রমবদ্ধিত হইয়া আপনায় মধ্যে আপনি বৃত্তাকারে পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। সত্যের স্বরূপকে আমরা কখনও তাহার দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। এই শূন্যলকে আমরা যতদূর ইচ্ছা। বাড়াইয়া বাড়াইয়া সত্যের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে পারি বটে, কিন্তু তবু বস্তুকে যে পাওয়া হইল না, এ বোধটা আমরা ঘুচাইতে পারি না, অনেক ঘুরিয়া আসিয়াও শূন্যের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখি যে তাহার মধ্যে সত্য খরা পড়ে নাট, শুধু একটা শুষ্ক শূন্যতা খা খা করিতেছে।

কিন্তু আনন্দের মধ্যাহ্ন বিবের যে দৃষ্টিকর্ষ ঘটে তাহাতে সত্য একেবারে আমাদের প্রাণের প্রাণনার মধ্যে অভিযুক্ত হয়। সেই অবস্থার কোনও শৌর্যপথ্য নাট, তাই তাহার কোনও বিশ্লেষণও নাই; জীবনের মধ্যে তাহার লক্ষ্য পাওয়া যায়, তাই বাক্য সৃষ্টিতে তাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহা আমার আত্মবৃত্ত তাই প্রমাণের অপেক্ষা করে না, তাহাতে কোনও ভ্রম হইবার ধোঁ নাই এবং তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।

ইহা আমাদের অন্তরাত্মকে পড়ভাবে অহলিঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে ইহা আমাদের ইঞ্জিরসমূহকে চেতনাময় করিয়াছে এবং আমাদের প্রাণকে প্রাণনাশকিতে অভিযুক্ত করিয়াছে। ইনি না থাকিলে আমরা কেমন করিয়া ঐতিহ্য থাকিতাম “কোহেবাগ্যাত কঃ প্রাপ্যাত যন্তেব আকাশ আনন্দো ন ত্রাৎ” এই আনন্দের আকর্ষণে যখন ষড়ঙ্গগতের সহিত আমাদের অন্তরাত্মের একটা যোগ ঘটে, তখন আনন্দের সেই বিশেষ প্রকাশকে আমরা “সুন্দর” বলি, সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে যে অদ্বৈতত্ব আনন্দসৌন্দর্য্যের স্রোত বহিয়া যায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া কবার বুঝাইয়া দিতে পারি না; জীবনীশক্তির মূল নাড়ী যেখানে সেইখানেই তাহার প্রকাশ।

মাহুকের সঙ্গে মাহুকের মিলনে, এই আনন্দের যে প্রকাশ তাহাকে আমরা পাজ-ডেবে প্রেম, বৈধ, মমতা, ভালবাসা, সহ্য বলিয়া থাকি। প্রেমে মাহুকের জ্বরকে দ্রব করিয়া প্রেমাস্পদের সহিত এমন একরস করিয়া দেয়, যে সেখানে মাহুজ কেবল সেই রসাহুতবেই তৃপ্তি পায়, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকে না। এই প্রেমের পথে

সম্মিলন ঘত পাত্তর হইয়া আসিবে, জানের বাহ্যিকতা ততই কমিয়া আসিবে, “নিম্পীড়িতেন্দু করকন্দলমুদেকে”র জ্বাঘ, বিদ্যুদার চন্দ্ররসের জ্বাঘ প্রেমাস্পদের সহিত এমনই একটা আনন্দ নিবিড় সম্মিলন উপস্থিত হয়, যে যন সেই রসে নিমগ্ন হইয়া যায় ধারা-জানের ছুটাছুটি আর থাকে না।

প্রেমের এই জানহারা নিবিড়তাতে সম্মুখিত হইয়া লেগিয়া প্রথমে সেই প্রেমকে জানের চক্ষে দেখিতেছিলেন। জানের কাজল চোখে লাপাইয়া প্রেমের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, যে প্রেম জিনিষটা কি।

এইরূপে জানের দ্বারা প্রেমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রেমকে বিশেষ হইতে বিশেষ ও বিশ্ব হইতে বিশেষ, ক্রমবিকৃত ও ক্রমচকল বলিয়া বোধ করিয়াছেন, জানের মতন প্রেমকে পাত হইতে পাতান্তরে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছেন এবং এই ছুটাছুটি ছাড়া প্রেমের যে একটা নিবিড়তার দিক আছে তাহার বিশেষ সন্ধান পান নাই; কিন্তু পরিশেষে তিনি বুঝিলেন যে, জানের মূখে প্রেমের আশ্রয় করিলে প্রেমের দ্ব্যর্থ্য বাদ পাওয়া যায় না; তাই যে প্রকৃতির দানকে তিনি প্রথম অজানার দান বলিয়া ভুল করিতেছিলেন, বাতাকে প্রথম কর্ণধার মাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন, বুঝিতে পারিলেন যে তাহার অজানার মধ্যে স্পষ্ট উদ্বেগ না থাকিলেও একটা সঙ্গীততা আছে; একটা গুতি, ক্ষতি, চিরন্তনত্ব আছে, যেন চিরন্তন বিস্তরণের দ্বারা একমুখী একটা রসপ্রবাহ চিরদার্থক হইয়া চলিতেছে।

অনেকে প্রেম বলিলে শুধু মাত্র ভালবাসার বোধ বা mere feeling of love বুঝেন; কিন্তু প্রেম বলিতে যদি সেইটুকু বুঝাইত তাহা-

হইলে আর আমাদের প্রকৃতির একটা অনির্জটনীয় প্রেম আছে একথাটার কোন সার্থকতা থাকিত না। জীবনের মধ্যে যে একটা পতীয় সামঞ্জস্য আছে তাহাকেই আনন্দ বলা যায়; অরু ও তিৎ লইয়া এই যে বিব ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা একটা অশুভ বিরতি জীবনের পরিচয় পাই; সেই জীবন বা প্রাপণক্তির বিকাশেই বিব প্রাপণের চট্টা উঠিয়াছে; এক প্রাপণক্তির বিকাশ বলিয়া এক বিশ্বের বিকাশেই সেই প্রাপণক্তির উদ্বোধন বলিয়া, বিশ্বের সমস্ত প্রাপণক্তির সঙ্গে পরস্পরের একটা প্রবল টান রহিয়াছে। প্রাপণের বিকাশই চরম বলিয়া, যে যে আবার আমাদের প্রাপণক্তির কাষ দেখিতে পাই তাহারাই সেই বিকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। সমস্ত প্রকৃতি জুড়িয়া এই প্রাপণের বিনিময় চলিয়াছে এবং এই বিনিময়ের মধ্যে বিশ্বের আনন্দ, বিশ্বের প্রাপণ পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এট আনন্দ ও জীবন অভিন্ন, ইহাতেই মগ্ন ইহাতেই স্থিতি এবং ইহাতেই লয়—আনন্দা-ছোব বহিমানি দূতানি জ্ঞাত্তে যেন জাতানি জীবন্তি বৎ প্রবৃত্তান্তিনঃবিশন্তি তদ্বিনিম্বাসৎ তদ্বৎ। রসো বৈসঃ। রণং হেবাবং লভ্য আনন্দী ভবতি।

বিশ্বের এই আনন্দান্তিব্যক্তির এক তরে মহত্ত্বজীবনে জ্ঞান ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানের মধ্যেই যে আনন্দের উদ্ভব তাহা বলা যায় না, বরং জ্ঞানই আনন্দের একটা বিশেষ অবস্থার সন্ধান, তাই আমাদের মন বহুই প্রাপণক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ-প্রসঙ্গের মধ্যে তলাইয়া বাইতে থাকে ততই বাহ্যিক জ্ঞানের ছুটাকাট কবিয়া যায় এবং ক্রমশঃ প্রাপণক্তির সঙ্গে অদ্বয় হইয়া গীন

হইয়া যায়; এই অবস্থাই বেদান্তে "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দং ব্রহ্মণ্যো বিদ্যান্ ন বিভেতি নৃতন্দন" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে।

লেখিকাও প্রেমকে প্রাপণরূপেই বুঝিয়াছেন, এবং সেইজন্যই স্থানে স্থানে প্রেম বা আনন্দ শব্দ স্থানে প্রাপণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এবং পরিচেষে তাহার বধূবরণ এই প্রাপণক্তির সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত মিশাইয়া দিয়া অদ্বয় হইয়া গিয়াছেন।

"এই বধু ও আমি—আমার মিলন এক রস। বলিতে গেলে ইহাই আদিত্য। এ যে রসের বরণ, স্বপ্নের রস, মৃগলবিগ্রহে যে রসমুষ্টি গড়ে উঠেছিল, এই এক রসে গলিয়া গেল। বিগ্রহ চলিয়া গিয়া, যে নৃতন সমগ্র আগিল, তাহাতে জ্ঞানের রস-বিস্ফোরণ নাই। এ রসদাপ্তরে কেবলানন্দ কৈবল্যরস জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, জ্ঞানাজ্ঞানের অন্তীত"— "আমি ও বধু দুইমনেই বড় প্রাজ হইছিলাম। এখন এই মিলনে প্রাণ্ডি অপ্রাণ্ডি সমস্তেরই লয় হইয়াছে। এখানে বিরামও বিরত হইছে, শুভতাও শুভ হইছে। নীহারিকার বেধা যে মৃতগর্ভে লীন হয়ে যার সে মৃতও নাই, কিছুই নাই।"

কিন্তু এ অদ্বয় ভাবও যে জীবনীপঞ্জির একটা অবস্থামাত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য লেখিকা বলিয়াছেন যে প্রাপণক্তি রূপনই এইভাবে ফুটব হইয়া থাকিতে পারে না, তাহার অন্তর্নিহিত বিরতি জুখাই তাহাকে আবার বহুতে পরিণত করে এবং সেই বহুর মধ্যে আবার প্রেমযাত্রা, প্রাপণযাত্রা সেইরূপে সার্থকতার বিকরণে চকল হইয়া উঠে। এই যে এক হইতে বহু ও বহুর সম্মিলনে এক, ইহাই মগ্নতের রাসলীলা, আনন্দলীলা,

প্রাণলীলায় একটি ক্ষণে জনবহুর মধ্যে এমনি একটি স্রোতের প্রদীপ জলিয়া উঠে যে তাহারই আলোতে ধীরে ধীরে জীবনের রাসমঞ্চ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং বিশ্বের রাসলীলার আনন্দের মধ্যে প্রেমবনস্তের পূর্ণ প্রকাশের সমগ্র উপলক্ষি সার্থক হইয়া উঠে।—হে

প্রাণ, হে বসন্ত, হে প্রেম, হে আনন্দ, আজ সমস্ত জগতের জনর দ্বয়ের মধ্য দিয়া বীণা-কন্ধারে তোমার প্রার্থনার মর 'আবিরা-কি-মি-এ' স্বরত হইয়া উঠুক।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ,  
অধ্যাপক, চট্টগ্রাম-কলেজ।

## “বঙ্গীয় জননীর শিক্ষা”

“জননী অস্বভূমিত বর্গাধিপী পরীচরনী” এ মহাবাক্যের সার্থকতা কি মানবসমাজ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে। যে জাতি, যে ব্যক্তি জননীর সন্ধান জানে না সে জাতি বা ব্যক্তি কখনও মানব-ইতিহাসে স্লামার স্থান লাভ করিতে পারে না। আবিলাময়, বার্ষলংঘন-পূর্ণ, কটকাকীর্ণ জীবন-সংগ্রামে যখনই মানব-মনে বিবাহ, নিরাশার ছায়া আনয়ন করিয়া সারা উদ্যমটা বার্ষ করিয়া দিবার উদ্যোগ করে, জীবনটা যখন দুর্ভিষিভ তার বলিয়া বোধ হয়, অগত্যা যখন একটা নির্মম বার্ষের হাট অহুমিত হয়, যে সময়ে বিশ্বাসী প্রত্যেক জীবেরই কার্ণা প্রতিজ্ঞা পূর্ণি পড়ে তখন জনয়ে দ্বিভ, অসুতময় বারি দিকন করিয়া কোন এক নক্তি অন্তরালে মানবচরিত্রের উপর বঙ্গীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ?

অকলময় পরমেশ্বর অগতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; এমনই তাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্র্য। যে একের সত্য অস্ত্রের সত্য; যেতপ বল এই কথা মনে উদিত হইলেই দুগুণ অক্সিজেন (oxygen) ও হাইড্রোজেন (hydrogen) দুইটা বায়ুর নাম অতিরিক্তাবে মনে উদিত হয় ওতপ মানব জাতি বলিলেই স্ত্রী, পুরুষ উভয়

জাতিরই সৃষ্টি একত্রে উদিত হয়; একটি হইতে অপরটি পৃথক করিলে যেতপ বলের অতিরিক্ত থাকে না ওতপ স্ত্রী হইতে পুরুষ অথবা পুরুষ হইতে স্ত্রী জাতিতে পৃথক করিলে মানব-জাতির সত্য উপলব্ধি করা যায় না। বাল্য হইতে উভয় জাতিই পরস্পর আত্মকল্যাণ একই গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতেছে। হর্ষা নির্ধাণ করিতে গেলে যেতপ রাজমিত্রী ও হরদার উভয়েরই সাহায্য সমভাবে আবশ্যক অথচ কাহারও অস্ত্র অপেক্ষা নিতাই বলা যায় হইতে পারে না। মানব সমাজে স্ত্রী, পুরুষেরও স্থান ওতপ; কোন জাতিতেই অপর অপেক্ষা হীন বলা যায় হইতে পারে না। উভয় জাতিরই মধ্যে বিশেষত্ব এই—প্রত্যেকেই কতকগুলি বলবৎ নির্দিষ্ট বৃত্তির অধিকারী, কর্তব্যও এই বৃত্তির অহুযায়ী। মানবজীবনই ধারাবাহিক কর্তব্য—ভগবৎসাহিত্যলাভই মানবের চরম উদ্দেশ্য। কর্তব্য তাহার উপায়। কিন্তু এ কর্তব্য মালিন্যাবর্জিত নিশিষ্ট কর্তব্য। স্ব-বৃত্তির সূত্রণ দ্বারা মানবসমাজকে এই কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎসিদ্ধিতে অগ্রসর হইতে হইবে। কর্তব্যে প্রেম না থাকিলে উহা হস্পন্ন বা নিষ্ফল হইতে পারে না—নিষ্ফল প্রেম ব্যতীত ভগবৎসাহিত্যলাভ হয় না।

শ্রেনবিহীন কর্তব্য। ঋতুপুত্রলিকার প্রহসন  
যাজ। "শ্রেয়," "ত্যাগের" জননী। শ্রেয় না  
থাকিলে ত্যাগ কখনও সম্ভব হয় না, এট  
ত্যাগই আবার আত্মদিককে ঈশ্বরাত্মবৃত্তি  
করিয়া দেয়। শ্রেয়ময় ভগবানকে লাভ  
করিতে হইলে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে,  
কিন্তু ঈশ্বর শ্রেমিকের নগ্নে ত্যাগ অতি  
সহজ। নিজস্ব ভগবৎশ্রেয় লাভ বড়ই  
দুঃসহ কিন্তু স্বার্থস্বত্ব পাখি শ্রেয়ের পরিণতি  
ভগবৎশ্রেয়ে। জননীই এই বৃত্তিময়ী নিজস্ব  
শ্রেয়। অগতে একদা নিষার্থ ত্যাগ আর  
কোথায় বেধিতে পাওয়া যায়? জননী  
সত্যানের অস্ত্র বাবতীর স্বপ্ন, স্বচ্ছন্দ্যতা বিসর্জন  
ধিতে স্তুতি হন না, প্রচোদন হইলে  
সত্যানের অস্ত্র আত্মস্বীকৃতি বলি দিতে  
পারেন। ভবিষ্যৎকালের দারিদ্র্য জননীর  
উপর বৈষ্ণব, একদা আর কাহারও উপর নাই  
তাই সূর্য অগতে আদর্শ-জননী প্রকৃতির  
অস্ত্র এত উদার। বাহ্যের উপর ভবিষ্যৎ-  
সত্যানদিগের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে তাঁহা-  
দিগের কর্তব্য সাধনোপযোগী শিক্ষারও  
প্রয়োজন। বন্ধারা উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি-  
গুলির স্মরণ হয় তাহারই নাম শিক্ষা, কেবল-  
মাত্র কতকগুলি গ্রন্থপাঠ করিলেই শিক্ষা  
সম্পূর্ণতা লাভ করে না; এর পাঠে বৃত্তির  
প্রার্থনা সাধন হইতে পারে বটে কিন্তু নৈতিক  
বৃত্তির স্মরণ হয় না। নৈতিক শিক্ষার কর্তব্য-  
জ্ঞানের উদ্যোগ হইয়া থাকে, গ্রন্থপাঠ হইতে  
লভনিকার কর্তব্য সাধনোপযোগী উপকরণ।  
একটি ব্যতীত অপরটি কোন একাধারে স্মৃতি  
লাভ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষে পাণ্ডিত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হই-  
বার সঙ্গে সঙ্গে ত্রী-শিক্ষার একটা আন্দোলন  
চলিতেছে। একদা আন্দোলন সমাজের যে

বিশেষ হিতকর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ  
নাই। এই আন্দোলনের ফলে আমাদের  
দেশের রমণীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের  
অস্ত্র মহাত্মা স্বাভাৱমমোহন রাই, প্রোফঃ-  
স্বরগীষ ঈশ্বরচন্দ্র বিনোদভাগ্য প্রভৃতি দেশ-  
অগ্রদূতরা বিশেষ উদ্যম করিয়া গিয়াছেন;  
তাঁহাদিগের উদ্যমের ফলে বঙ্গদেশে এখন  
অনেকগুলি উচ্চশিক্ষিতা রমণীলাভ করিয়া-  
ছেন। দেশবাসী অবশ্যই এজন্য তাঁহাদের  
নিকট কৃতজ্ঞ। এই উচ্চশিক্ষা বিস্তারে  
বঙ্গী-জননীরা উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর  
হইয়াছেন তাহা এক্ষুণ্ড প্রবন্ধের আলোচ্য  
বিষয় নহে। কিন্তু শিক্ষা বঙ্গী-জননীকে  
ভগবৎনির্ধিষ্ট পথে চালিত করিতে পারে ইহাই  
এই ক্ষুণ্ড প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

ভারতবর্ষের উন্নতির মুগে ভারতীয়  
মনীষীরা যে ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন  
না তাহার প্রমাণ পুরাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ-  
সমূহে বিরল নহে, তাহা না হইলে "কন্যা-  
পোষ্য পালনীয় শিক্ষনীয়ান্তিভরতঃ....."  
এই অঙ্গশাসনটি মহানির্লোভ তত্ত্ব জান পাইত  
না। ভারতের নানারূপ ভাগ্যবিপর্দারের  
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় উচ্চ আদর্শ ক্রমে ক্রমে  
অধঃপতিত হইয়া কুসংস্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি  
ইহার স্থান গ্রহণ করায় ত্রীশিক্ষাও বিলুপ্ত  
হইয়া পড়িয়াছিল। এই কুসংস্কারের ফলেই  
আজ আমরা বঙ্গী-জননীদিগের মুখে শুনিতে  
পাই "পাপের ফলে নারীভগ্ন গ্রহণ করিয়াছি।"  
ইহা বঙ্গী-জননীদিগের দোষ নহে, এ  
দোষ তাঁহাদেরই, ভগবান বাহ্যের উপর  
ইহাদের কর্তব্য পথে চালিত করিবার ভার  
অর্পণ করিয়াছেন। যখন নিরোয়াই পবিত্র  
হইয়া পড়িলেন তখন ত্রীলোকবিশেষের যে  
একদা ছরবরা হইবে তাহা আর বিচিন্তা কি?

আজ একটা নূতন জাগরণের দিনে বঙ্গীয়-জননীদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে মানব-সমাজে তাঁহাদের স্থান পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন প্রকারে নিকট নহে। তাঁহাদিগের উপর যে সমস্ত কর্তব্য ন্যস্ত আছে উহা কোন ক্রমেই পুরুষদিগের কর্তব্য অপেক্ষা ছোট নহে—বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষাও উচ্চতর কর্তব্য সাধনে নিদুঃ; দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অসম্ভবী বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তোলা তাঁহাদেরই কাজ; ইহা ডাকের ভারটা সকল বেপার সকল সমাজেই পুরুষদিগের উপর। আমাদের পূর্বপুরুষেরা একবারে ভ্রম-প্রমোহ মূক্ত ছিলেন না এতদূর না হইতে পারে তবে যে প্রাণীতে সে যুগে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিতেন সে প্রাণীটা যে মানব সমাজের আদর্শ প্রাণী ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারা যায়। পরম্পর আত্মকল্যাণবাহিনী হইয়া মানবসমাজ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমিরের সংগ্রাম না হইলে প্রকৃত শান্তিহীন লাভ করিতে পারা যায় না। লগৎকে ঘটন্য সমস্ত আপনার করিয়া লওয়াতেই মনুষ্যজাতির বিকাশ। এই “আমিরের সংগ্রাম” মূলমন্ত্রেই হিন্দু পরিবার গঠিত হইয়াছিল। হিন্দু পরিবারস্থ সকলকেই অপরের জন্য নানাবিধ পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইত। একদা ত্যাগের দ্বারা কর্তব্যের কাঙ্ক্ষিত দূর হইয়া পরম্পর একটা পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। একদা নৈতিক শিক্ষার বলেই যে হিন্দুসমাজ অতি সুবকর হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আজ-কালকার বৈজ্ঞানিক যুগে “স্বাভাবিক সত্ত্ব” ( Natural rights ) লইয়া বৈ, চৈ উত্তি-হাছে। পান্ডিত্যপনাম জ্ঞী, পুরুষের এই

স্বাভাবিক সত্ত্ব অক্ষর রাপিতে বিশেষ দয়বান। এই “স্বাভাবিক সত্ত্বের” চেউ গাচা-উপকূলে লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্ভ্রমারও এই সত্ত্ব বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই “কর্তব্যের” স্থান “স্বাভাবিক সত্ত্বের” উপরে।

মানবসমাজে কর্তব্যজ্ঞানের উদ্বেগ হইলে “সত্ত্ব” অক্ষর রাখিবার পুথকু চেউ করিবার প্রয়োজন হয় না পরন্তু নৈতিক-শিক্ষার দ্বারা কর্তব্যজ্ঞান উৎপাদন না করিতে পারিলে অশান্তির বীজ বপন করা হয় মাত্র। পান্ডিত্য-জগৎ এই শিক্ষার বিষময় ফল এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন। আমরাও পান্ডিত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া একটা অভিন্ন স্ব-প্রধান আনিবের বিজাতীয় ভাবে পুট হইতেছি। এইভাবে আমাদের অন্তঃপুরেও সংক্রামিত হইতেছে। অনেক বিষয়ের জন্য যে পান্ডিত্য-শিক্ষার নিকট আমরা কণ্ঠী একথা অবশ্য স্বীকার করিতেছি না; তবে আমরা যে ইহার প্রভাবে আত্মসংযম হইয়া পড়িতেছি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গীয় জননীরা ভোগ বিলাস পরিত্যজিয়া তুলিতেছেন। জী স্ববরে উচ্চ বৃত্তিগুলি অহুসিলন অভাবে নিজেই হইয়া পড়িতেছে, আত্মীয় স্বজন, গুরুজন দিগের প্রতি সে চিরন্তন ভক্তি, প্রেম বা স্নেহ-লোপ পাইতেছে। হিন্দু রমণীরা সংযম পরম্পর-কান্তরতা প্রকৃতির জন্য গুণতের আদর্শহানী ছিলেন, এক্ষণে ঐ সমস্ত গুণ-গুলি বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাদীদের প্রতি যে তাঁহাদের কোন কর্তব্য আছে একথা তাঁহাদের স্বয়ং

আমাদের ভাব স্থান পাবে না। মান-  
সঙ্গতার অক্ষর পুড়েই উল্লসিত হইয়া থাকে,  
যিস্থ পরিবারে বিশ্বাসের প্রতি প্রেম ও  
আত্ম-বিশ্বাসের মূল মহাই আমরা শিক্ষা  
পাইতাম—আজ যেন পাকাতা-সভাতা  
স্রোতের আবেগে পড়িয়া সেই উদ্বারশিক্ষা  
শিখিল হইয়া পড়িতেছে—এ ত্যাগের আদর্শ  
যেন আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া  
বাইতেছে।

আমাদের জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে  
হইলে, মানবজাতির সর্বোচ্চ বিশ্বশ্রেমের  
আদর্শ বলার সাহিত্যে হইলে, বঙ্গীয় জননী-  
দিগকে আবার সেই সনাতন শিক্ষার পুনরু-  
জ্জীবিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে—পাকাতাশিক্ষা প্রবর্তিত  
হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে—  
জুই রকমের মত দেখা দিয়াছে। এক সম্প্র-  
দায়ের মতে আমাদের বাহা কিছু ছিল বা  
আছে সমস্তই মল বা কলঙ্কার জড়িত,  
পাকাতাশিক্ষার বাহা আছে সমস্তই ভ্রম-  
প্রমাদ পুত্র—স্বপ্নের বিষয় এইরূপ মতাবলম্বী  
লোকের সংখ্যা আশ্চর্য্যজনক অল্প; অল্প

সম্প্রদায়ের মতে আমাদের বাহা ছিল বা  
আছে সমস্তই উত্তম। আমাদেরকে কিছু  
সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে,  
জাতীয় ভাব অক্ষর রাখিয়া বাহা কিছু ভাল  
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গীয় জননী-  
দিগকে আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে  
তাহাদিগকে সনাতন বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেম-  
মূলক উদ্বার আদর্শ গঠিত করিতে হইবে—  
সঙ্গে সঙ্গে পাকাতা জাতির বিজ্ঞান, ইতিহাস  
প্রভৃতির মৌলিক তথ্যগুলিও শিক্ষা দিতে  
হইবে।

এই ক্ষুদ্র আলোচনার পাঠক, পাঠিকাও  
মনে না করেন যে আমরা আমাদের তমসী  
সমাধে ভাল বলিবার কিছুই নাই বলিতেছি,  
বাহা আছে তাহার আলোচনা এখানে  
অনাবশ্যক, বাহার অভাব হইয়াছে তাহারই  
আলোচনা ও তৎসমূহ কার্যে প্রবর্তিত করাই  
আবশ্যক। এক কথাই আমাদের পবিত্র  
জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া উন্নতিশীল জনতের  
সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে। এতদুপ শিক্ষার  
বঙ্গবাসীর গৃহ পবিত্র স্থান, শান্তির আগাধ  
হইবে।

শ্রীমদীপ্রসাদ রায়।

## সুকবি ৩রজনীকান্ত ও তাঁহার কবিতা

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

৩রজনীকান্তের কবিতাতালিকে সাধারণতঃ  
তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।  
(১) সাধন সঙ্গীত (২) বাহ কোতুক সঙ্গীত  
(৩) বদেণ সঙ্গীত। বৈরাগ্যোদ্দীপক সঙ্গীত  
গুলি—সাধন সঙ্গীত ও কোতুক সঙ্গীত

গুলিকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন  
২৪টা প্রেম সঙ্গীতও আছে।

সাধন সঙ্গীত। ৩রজনীকান্তের সাধন সঙ্গীত  
গুলি কবির জীবন রক্তের রক্তকমল, বাণীর  
কণ্ঠের মণিহার, বঙ্গভাষার নুকের ধন আর

বাগানী পাঠকের পুণ্যর সামগ্ৰী। এই সঙ্গীতগুলি কবির আত্ম-নিবেদনের দীনতায় মহিমাম্বিত, অহুতাপের অক্লান্তে অর্জিত। আর আত্মবিকৃত্যর দীর্ঘযাত্রার চলল। এ সঙ্গীতে—তাপিত সাধনা লাভ করে; পানী ও পতিত তরঙ্গা সাধ ও সাধু বিমল আনন্দা-  
হুতব করে। এই সঙ্গীত গুলিতে অনেক-  
স্থলে, কান্তকবি প্রসাদকবির পরাধ অঙ্গুসরণ  
করিয়াছেন। প্রসাদ কবির স্তায়, কান্তকবি  
কখনও জননীর উপর আবদার ও রাগ  
করিয়াছেন—কখনও বা মৃত তিরস্কার, কখনও  
হতাশ হইয়াছেন—কখনও বা তরঙ্গা পাইয়া-  
ছেন। যে দ্যত জননীর বৃকের নিকট বাইতে  
পারিয়াছেন—সে তত মার অঙ্গে আবদার  
করিয়াছে। মাতের মেহের উপর অঙ্গুর  
তরঙ্গা না থাকিলে—কখনও আবদার করা  
চলে না। স্বামপ্রসাদ মা'র বড় আদরের  
ছেলে ছিলেন—তিনি আবদার করিয়া এবার  
কালী তোমার খাব পর্য্যন্ত গাহিয়া গিয়াছেন।  
আমাদের কবি দত্তর লভ্য, মার চরণের  
নিকটবর্তী হইয়াছিলেন।—স্বামপ্রসাদের মত  
অন্ত বল তিনি কোথায় পাইবেন?—তাঁহার  
গানাদে হৃৎকটু লইয়া—সন্ধ্যার, দুপার ও  
কোন্ডে অঙ্গুস্ত হইয়াছেন—কিন্তু বার্থ হন  
নাই। নিজে অকৃতকায্য বলিয়া আপনাকে  
বিকার দিরাছেন—মাকে ডাকিয়া বলিতে  
ছেন—

“ব্যথা পেওনা পেওনা, কেণো না অঙ্গ  
এই ব'য়ে দাওদা ছেলে মলে”।

কেলে যাও আর করোনা দত্তন,

দিয়াও ববন, পরাও চরণ।

ছাড়া মোর জ্ঞান, মোছ ভালবাসা

( বৃক ) লাবণ্যেরে চলে যাও ।”

ইহাতে কত ক্ষোভ, দুঃখ, আবদার এবং  
তাগারি সহিত একটু তরঙ্গা। ‘যে জননী  
অক্লান্তী অশ্রম সন্তান বলে কম করে দেখনি  
এবং যা দিয়েছে—তার অযোগ্য জীব  
কিছু কেড়েও নেয়নি—যে যা সন্তত শিরের  
ভেগে থাকে—আর বিপদে সম্পদ একপাও  
সরে বাছনি—যে জননী চির অপরাধী সন্তানের  
বোঝা হাদিস্থে বহেছে এবং সন্তানের নিজ  
হাতে গড়া বিপদের মাঝে তাকে বৃক করে  
থবেছে—তাগার কাছে বার বার ভুল  
করিয়াও আবদার চলে, তাই কবি বলিতে-  
ছেন।

“( মাগো ) এ পাতকী ভবে যদি যাও,  
অন্ধকার চির মরণ সিদ্ধনীরে; তোমার মহিমা  
তাঁহে বাড়িবেনা হার ।”

অথবা—

“বদি,—পাতকী নাপায় গতি,

তবে ত্রিকুবন পতি,

পতিত-পাবন নাম কেন নিলে গো ।”

এ মার কাছে ভর করেনা সত্য কিছু মাতের  
করণাপ্রবাহ এবং নিছের অবাধ্যতা লক্ষ্য  
করিয়া মরমে মরমে মরিয়া বাইতে হয়—  
তাই ক্রমাত্তেও অবিবাস হয়।

( চিত ) কাতর করুণা ভারে

বহিতে আর নাহি পানে

দুর্জল হ'য়েছে পাণে এত দয়া নাহি নয়

তোমার কথা হেলা করে

পাপ করিয়া ফিরি ঘরে

( তুমি ) হেলে বসো কোলে করে’

বেখে কত লক্ষ্য হয় ।”

“দুর্জল হইছে পাণে এত দয়া নাহি নয় ।”

আর “বেখে বড় লক্ষ্য হয়”—ইহার তুলনা  
নাই। এ গান শুনিয়া—আঁখি জলে বৃক



জানিয়া দায়—পাখওও ভাঙ্কিয়া উঠে  
করণাময়ী যা আমায়!

বাহাদুর সাধনা আন্তরিকতার পরিপূর্ণ—  
তাহারা অপেক্ষের ভক্ত নিরাশ্রয়ত হইলেও  
জননীর বরাহর কখনও হারায় না—সাধনার  
বলও তাহাদিগকে কখনও ত্যাগ করে না।  
তাহারা জোর করিয়া বলিতে পারে।

“কেন বলিত হ’বে চরণে ?

আমি, বড় আশা করি বসে আছি পাব,  
জীবনে না হয় মরণে !”

যে জন মধনে বসন বাঁধিয়া, আঁধারে  
কাঁদিয়া মরিয়াছে তাহাকে যিনি দেখায়ে ও  
বৃত্তাবে দিয়াছেন। পথের দূয়ার অন্ধ হইয়া  
দীন পথিক সঙ্ঘাষ যখন ঘাটে আসিয়া  
দেখিয়াছে যেহা বন্ধ ভবন যিনি শেষ খেদায়  
পায় করিয়া লইয়াছেন—তিনি যে আমাদের  
কবিকে চরণে স্থান দিবেন সে বিষয়ে কিছু কি  
সন্দেহ আছে ?

ভগবান গীতার বলিয়াছেন—“চতুর্বিধাঃ  
ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিভ্যোহর্জুন।

‘আর্ন্তঃ বিজ্ঞানঃ অর্থার্থী জানী চ ভরতপুত্র।’  
আমার বিশ্বাস, ঐ আর্ন্তের ভজনট,  
তাপিতের ডাকই মরমের অন্তঃস্থল হইতে  
উদ্ভিত। আমাদের কান্ত কবি ঐ আর্ন্ত প্রাণে  
মর্থ স্রবী আলোড়ন করিয়া দয়াময়কে  
ভাঙ্কিয়াছেন—তাই তাঁহার রচনার এত  
অন্তরের কথা এবং তাহাতে ভক্তি-রাস্তা রক্ত  
চিহ্ন। এমন অনেক কবি আছেন, তাহারা  
ভগবানের নিকট নিবেদন ও অন্তরের কথা  
গোপন করেন। কিন্তু হায় হায়—তিনি যে সব  
অন্তরালের খবর জানেন—তাহার কাছে  
লুকোচুরী কি ? সব কথাই খুলিয়া বলাই  
নিরাপদ—তাহা কান্ত বুদ্ধিহীনেন।

কবি জীবনে অনেক শোক তাপ দাগা,

কুলভ্রান্তি পত্রভটতার ফলভোগ করিয়া,  
‘ভয়ভ্রমে কল্পবকে, ছিন্ন কথিরাক্ত পদে’

ফিরিয়া প্রাণ চরিয়া ভাকিতেছেন—আমি—

“ঠেকিয়া ঠেকিয়া পিখে, কিরেছি তোমার  
দিকে,” তাই দাক্ষিণ্য ব্যথার গহিত মরম ঘর  
নিভড়াইয়া, হৃদয়বি বিদারণ করিয়া গান গুলি  
উঠিয়াছে, কৃষ্ণ যেমন নীহার নিপীড়িত  
কঠিন দলের আবরণ প্রাণের যাতনায়  
উন্মোচন করিয়া ছুটিয়া উঠে, নিখর যেমন  
হৃদয়ের ব্যগ্র ও ব্যথিত উজ্জ্বলে পাবাণ  
ডেহ করিয়া সবলে উকুনিয়া উঠে। কবির  
সাধন সঙ্গীতগুলি তেমনি তাহার—“দাক্ষিত্য  
পুশিত মুকুতি বেদনা-রাশি” বিমথিত করিয়া  
প্রাণের বেগে ছুটিয়াছে।

ভাবার বৃন্দ বা অলসারের ফেনিলতা,  
ভাবের স্রসীতে খাতার চরণ চন্দ্রমার নির্মল  
প্রতিবিম্ব কোথাও রোধ করে নাই। দয়াময়ের  
‘চির মধুমধুরী মণ্ডিত মুখ’ মরমতলে ছুটিয়া  
উঠিতে কোথাও বাধা পায় নাই। বসন্ত  
সমাগনে পল্লবকুসুম, শুক হৃদয় শালসী  
তরুর বেধে ভরিয়া রক্ত কৃষ্ণমেঘ মত কবির  
হৃদয়ের বেদনারাস্তা ভক্তিরাশি এই আশ্র-  
নিবেশনের সঙ্গীত গুলিতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।  
কবির পূর্ণ প্রত্যয়। শত রোগ শোক তাপ  
হৃদয়ের মাঝে কবি দয়াময়কে আরো ঘনিষ্ঠ-  
ভাবে ভাল বাসিয়াছেন কোনও ধানে—‘নন্দয়  
বিধা তর্ক যশে’র বেধা মাত্র নাই। কোথাও  
সন্দেহের বুদ্ধে ভক্তির অনলপিখা ঢাকিয়া  
যায় নাই। ভগবানে এত গভীর বিশ্বাস না  
থাকিলে তিনি গাহিতে পারিতেন না।—

“তোমারি বেওয়া প্রাণে তোমারি বেওয়া

দুখ

তোমারি বেওয়া বুকে তোমারি অছতব”  
ইহা বড় সহজ কথা নহে। ইহা ভগবানে

সর্ব্বথ্য সমৰ্পণের কথা—ঐশায়ে সর্ব্বাধি  
কৰ্ম্মাধি সমস্তাধের কথা, গীতার চরণ পঞ্চ—  
ইহা “কৰ্ম্মণো বাদিকারন্তে মা ফলেমু  
কৰ্ম্মাচন।” মহামন্ত্রের প্রতিবিধান।

এত পড়ার বিপাস না থাকিলে কি—কবি  
শেই “অস্তহীন, বিরট, নিখিলবাণী, অচূত  
অকরের নিকট আপনাকে তুণ্যাদি হীনচ  
অস্ত্র নগণ্য হীনতুচ্ছ” বলিয়া উপসক্তি করিতে  
পারিতেন? কবি পারিতেছেন—

‘প্রেমের জল হ’বে যাও গলে’

কঠিনেবেশনামে যে মেশে যেতরল হ’লে।”  
কবি শুধু তুণ্যাদি হীনচ নহে—তরোরিব  
সহিষ্ণু। একবিনের অস্ত্র দুঃখের প্রতি  
বিত্তকা সেখান নাই। আপনাকে অস্ত্রতাপের  
অনলে দগ্ধ করাইয়া শোক দুঃখের দুঃখের  
আঘাতে আপনাকে স্থপতিত করাইতে প্রার্থনা  
করিয়াছেন। যাকে বলিয়াছেন—

“কামাইয়া ধূবে লও নরন জলে।”

ভবরোপের চিকিৎসককে ডাকিয়া বলিয়া-  
ছেন :—

“প্রভু, নিলাজ হববে কব কঠিন আঘাত,  
কব, দুট কলকিত এ শোণিত পাত।

• • • • •

বৃদ্ধ প্রতিকারে বাধি হ’বেনা নিপাত পো  
তীর ভেসজ ঘোরে বেহ বৈয়নাথ। (কল্যাণী)  
তা’—কবির অভদ্রা গ্রন্থের শেষ প্রার্থনা  
পূর্ণ হইয়াছে। কবি চিরনিরাময় হইয়া গৃহে  
কিরিয়াছেন।

কান্তের দয়াময়ের ধারণা, ঠিক দয়াময়ের  
আপনত্ব। পাতকীর গোখে বিধাতার যে  
ভীষণ মৃষ্টি আগ—কান্তের মানস নয়নে সে  
মৃষ্টি জাগিত না। কান্তের দয়াময় জনবে  
“শাস্ত্রীতলরাগে, ললিত মধুর আঁধি মেঘিয়া,  
ককণা অমিদা মাখিয়া চাহিয়া থাকে তাই

কান্ত জননীমৃষ্টিতে দয়াময়ের ভাল ধারণা  
করিতে পারেন—যে মৃষ্টি অশ্রুপের লাগিয়া  
সজীবনী অধা লইয়া “শান্ত অবিরত বামিনী  
জাগরণে, অশ্রু কল তল মলিন অনমনে,

আত্মহারা সব, বিম্বী নিজ অধে,

তল তল ময়, ককণা ভরা বৃকে  
ধাতনা তাপ তুলি বতনে লব তুলি  
বদন পানে চেয়ে থাকে।”

কবি এই মৃষ্টি জনবে রাখিয়া গাহিয়াছেন

“ভোর—বৃকের দুখ যে খেবে বাঁচি

আমি কেমন করে তুলে আছি?”

“বস্তুর তার দাতিক সত্যানের যে মার  
বৃকে স্থান হয়, (অদ্বিত)—বাঁহর কাছে মহা-  
পাতকীরও নিবেদন চলে—

“কোলের ছেলে খুলা কেড়ে তুলেনে  
কোলে।

কেলি না যা খুলা কালা যেখেছি ব’লে।”

দে জননী মৃষ্টি ছাড়িয়া কি সহজে অস্ত্রমৃষ্টি  
দেখা করিতে ঘন ঘা?

কবি শুধু শান্ত জননী মৃষ্টিতে শান্তভাবেই  
দেখিতে পারিতেন তাহা নহে। তাঁহার  
অনন্ত মৃষ্টিরও সম্যক ধারণা ছিল।—যে  
“তির কারণ-নিছুর শক্তি বিম্বতে—মৃষ্টির  
বিলালতা একটিত—যে চিৎ বহুপ নিছুর  
জান বিম্বতে মৃষ্টির স্বজ্ঞতা-কৌণল রটিত”  
(মেঘালয়)—‘বাঁহর স্বজন বাপনা কথা,  
আঁধি কোণে লইয়া চাহিলে, নিষেবে বিরট  
বিশ চরণে নতি করিয়া মহামূন্যে বিলাজ  
ক’রে, (বাঁধী) এবং বাঁহর

“প্রতি রোম কূপে কোটা অশ্রুত্বপে,

অনীয় স্বষ্টি প্রতিভাত হয়।” (মানকী)

সে মৃষ্টিও তিনি দিয়া নয়নে হেরিতেন।

দয়াময় অনন্ত অনাদি, তাও ভক্ত ডাকিলে  
‘মহালোক নিছুর, ঘূর্ণান্ন মহাবিশ্বান’—লব

ছাড়িয়া ভক্তের কাছে আপিয়া বসেন। সে শুধু অনন্ত নহে—সে বে ছরধিগম্য। “সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, জামার মত, ডালা, কুলা, বামার মত, যে, পথে ঘাটে বেবুতে পাবে?” (কল্যাণী) অথবা,—

“ভাবিস্ সে কি তোরাই মত পাতলায়ে।  
দরকি তার কাণাকড়ি বড় জোর আধলায়ে।” (অভয়া)

“মানসাতে বাওয়া করিয়া অথবা ওয়ারিস হুয়ে তাহাকে পাওয়া যায় না—অথবা মস্ত উপাধি লইয়া—বিজ্ঞানের মস্ত খাতার সাহায্যে চন্দ্রলোক ঘাবার রাত্তা প্রশস্ত করিলে তাকে পাওয়া যায় না।”

“প্রতি স্মৃতি বেদমন্ত, জ্যোতির্জিহ্বা স্রাব তত্র বিজ্ঞান পারে না প্রভু করিতে সংশয় ছেদ।” তাই সেই কেনর কেন ওস্ত কেন, নিখিল কেনর মূল কারণে ঘাইতে হইলে, ‘নব কুট তর্ক নিরসন,’ করিয়া—“সর্বত্র সম-পিতবন্ত” বলিয়া সর্বত্র না দিলে আর উপায় নাই।

কান্ত কবির প্রকৃতির ধারণা, পরমেশ্বরের ধারণা হইতে বিভিন্ন নহে। সমগ্র প্রকৃতি সেই একেরই মহা সন্ধ্যাতে মর—তাহা কবি সিদ্ধ সন্ধ্যাত, আকাশ সন্ধ্যাত ও কলসে সন্ধ্যাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবানের কথা বাম দিয়া, কোথাও সন্তোষের চক্ষে প্রকৃতিকে দেখেন নাই। “অনলে অনিলে চির নতুনীলে, নষ্ট তারকায ভগনে,”—অনন্দের মেঘে, সত্যের প্রণয়ে, ধরালের চোখে, ভক্তের অঙ্গতে সর্বত্রই ব্রহ্মময়ের বিকৃতি বিস্তার করিতেছে। প্রকৃতি হৃদয়ের বলিয়া ইহার স্রষ্টা হৃদয়, ইং। না বলিয়া কবি বলিতেছেন—“তিনি হৃদয় তাই তাহার রচনা হৃদয়।

“তুমি, হৃদয় তাই তোমার বিশ্ব হৃদয়  
শোভাময়।

তুমি, উজ্জল তাই নিখিল দৃশ্য, নন্দন  
প্রভাময়।”

বাহুবল্লব সর্বত্রই খাতার মাধুরী। বাহুবল্লব প্রভাব কবির ভবন বৃন্তে মোহের ফুল ফুটায় নাই—ভক্তির ফল ধরাইয়া ছিঁড়াছিল।

বে সকল সৌম্য সাধক নব সায় মন্ত্রে, প্রভাতী গাহিয়া জাতীয় জীবনের নবীন উষালোক বরণ করিয়াছিলেন—রজনীকান্ত তাহাদের মধ্যে অঙ্গতন। কান্তের—“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,” একদিন বন্ধের প্রান্তরে প্রান্তরে পথে ঘাটে সর্বত্র প্রতি-ধ্বনিত হইয়া গিয়াছে। কান্তের—“তব চরণ নিয়ে উৎসবময়ী, ভ্রাম বধনী সরলা।” জননীর মন্দিরে মন্দিরে বন্ধনা গীতি-রোলে লক্ষকণ্ঠে উজ্জ্বলিত হইয়া গিয়াছে। বাহার্য নিঃশাল নধনে হৃদয় মগন ছিল, তাহাদের হৃদয়ের অবশ্যমের মন্ত কে অস্ত্রভেদি ধবল শূন্য সন্ধ্যাত রাষ্ট্রকে মন্ত তীর ভৈরবী রাগ ধরিতে সাধিয়াছিল?—সে আশ্রমের কান্ত-কবি। মায়েরি রাখে মায়েরি কার্যে বধন প্রথম চোখ ফুটে তখন তিন্কার ঢাল পায়ে ঠেলিয়া, মায়ের ঘরের শুধু ভাত বি সৈন্দব মাথায় ধরাতে কে শিখাল? আর কেই বা অবৃত স্মিত মাথের ছদ্ম পরে মোহন করিয়া লইয়া ঘাইতেছে সেবিধা—উপবাসী সন্তানকে জাগিয়ে সতর্ক করিল?—সে আশ্রমের রজনীকান্ত।

সে দিনও বধন নধনে মৃত্যু-বিভীতিকা জাগিতেছিল, রক্ত কৌণ আপস পরাণ-কণিকা দীপ দীপ করিতেছিল, তখন বীনকণ্ঠে, ঘেরের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিকে কে হাতে ধরে বলে গেছে—“হুমার। যেখা রপো

বেশ ? (অবৃত্ত) সে আমাদের মাতার  
সন্তান রঙ্গনীকান্ত ।

হাস্তরসে কান্তের সমকক্ষ বঙ্গমাহিত্য  
বিসল । রঙ্গনীকান্তের কাব্যে হাসি হুট  
প্রকারের আছে । এক প্রকার—দ্রুত  
কম্পনের অট্টহাসি—অল্প প্রকার মনোরঞ্জন  
মধুর হাসি । এক প্রকার জ্বলন্তরসে সাক্ষা-  
চিত্তের আলোক রাগের জ্বালা নাড়িতে থাকে ।  
অল্প প্রকার নিখিল সরসীজলে স্নেহাংগ  
প্রতিফলনের স্রাব । প্রথম প্রকার হাসি  
ঐ নীরস্ত রান, অশ্রুনের হাসি স্তমিমা প্রাণ  
নিহরিয়া উঠে । কান্তের বৈরাগ্যোদ্ভীপক সঙ্গীত  
গুলিতে ঐ প্রকারের হাসি । কবি যখন  
হাসিতে হাসতে, “শান্তিহুগ্ন নূর করিয়া বহ্ন-  
করে কেশ ধরাই” কথা বলেন—যখন যখন  
বাড়ী হ’তে লাগে পেরায়া আসার কথা বলেন  
তখন—“ভাবতে প্রাণ নিউরে উঠে, নিরায়  
উক পোণিত বয়” যখন শুনি—

“আধারে কি না করো আলোয় বেড়াও  
বুকটা হুঁকে,

এর মধ্য বুকবে দে দিন বে দিন মাঝে  
শিঙে হুকে ।”

অথবা—“তলব আসছে ক্রমে, তবু হুঙ্কে না  
চৈতন্য” “কি কল হ’বে খুঁড়লে কুখো, বাড়ী-  
মেছে পুড়ে ।” ইত্যাদি অথবা এই নবর  
যৌবনের জয়ারবহ পরিণতির কথা—জয়া  
জালার করাল কবলের কথা অথবা মৃত্যু  
পূহের সেই ভীষণ দুস্তর কথা রঙ্গরসে, যখন  
কবি বলিতে থাকেন, তখন কবির সঙ্গে যোগ  
দিয়ে করে একটু কাঠে হাসি হাসা যায় বটে  
কিন্তু অন্তরাঙ্গা শুকিয়ে যায়—আর মনে হয়  
বিধাতাপুঙ্কবের কথা শুণ্ডো কবির মুখ দিয়ে  
বাহির হইতেছে । কবি ত—নিষ্ঠীক নানী-  
চেতা চিত্তকরের দ্বার অশ্রুনা চিত্ত আঁকিলেন

—তার মাঝে, মস্তখনসূত্রে পিতার দুটী  
দেখিয়া—নিহরিয়া উঠে—তার—“পুত্র অপি  
গুরুত্ব মন্থল নিরুজ বন”—দাহে শুকাইয়া  
যায় । এইখানে জানের কাছে ঘনের স্বার্থ  
পরাজয়—মৃত্যু নষ্ট ।

কবির দ্বিতীয় শ্রেণীর হাস্তরস আবার দুই  
প্রকারের আছে । প্রথমবিধ, বেশের ও  
সময়ের সঙ্গবিধ তত্ত্বানি, মানি, খুঁটো,  
জালের প্রতি ভীর কটাক্ষ এবং স্থলে স্থলে  
তাল কথাব্যত । দ্বিতীয়বিধ, মনের শান্তি  
ও হুগ হইতে জনগণের মনোরঞ্জনই লক্ষ্য  
রচিত—যথা বৈরাগ্যবর্ণন সম্পত্তির প্রেমালোপ,  
তামাক, ঔষধিক ইত্যাদি । প্রথমবিধ—  
Humour তাহা অন্তর্দর্শনের উপর স্থাপিত  
—বিত্তরবিধ Fun. কবি উভয় দিকেই  
নিদ্বন্দ্ব । সমাজের ভালে ভালে পাতায়  
পাতায় কোথাও কিছু কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াতে  
পারে নাই ।—কবি কল্কীর দ্বার অন্তঃপুরেও  
প্রবেশ লাভ করিতে পারেন—সেখানেও ঐ  
লুকাতে চাহিয়াছে—সেইখানেই তাহার  
নয়না প্রকাশ করিয়া লাজে অড়লড় করিয়া  
দিয়াছেন । ৮ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর সমাজের  
সঙ্গবিধ নীচতা, মানি ও বিস্রোহিতাবে  
কেহই এরূপ কথা প্রহার করিতে পারে নাই ।

এইখানেই কবির কৃতিত্ব ও কর্তব্য সন্না-  
হন । যে সত্যকে অবমাননা করিতেছে,  
বেশের পবিত্র রীতিনীতিকে পরদলিত করি-  
তেছে, কর্তব্যকে পায়ে চেঁলিতেছে, বিলাতী  
যোহে আপনায় সমাজধর্ম দ্বারনীতি সব  
বিশর্জন দিতেছে—তাহার স্বপ্নার বাবস্থা  
শাস্তির বাবস্থা কবি নইলে কে করিবে ?  
তাঁহা না করিলে কবির কর্তব্য অসম্পূর্ণ রহিত ।  
তাঁহারা সংক্ষেপে কিতক আর নাই কিতক—  
তাঁহারা সমাজে স্থপিত হটক, পরদলিত হটক,

তাহাদিগকে আমরা যেন অন্তরের সহিত বুঝা করিতে পারি। অন্তর ও বাহ্য, বাক্য ও প্রাণ, আসল ও নকল, সত্য ও অসত্য, গত্যন্তগতিকতা ও পারমার্থিকতা, ইহাদের যেন প্রভেদ করিতে পারি। কবি, ধর্ম তোমার প্রতিভার আলো তুলে ধরো—কোথায় কে লুকায়ে?—সব লামে জড়সড় হইয়া যাউক। ঐ পতিত ব্রাহ্মণ ও পতিত পুরোহিত লক্ষ্য যুগ লুকাইতেছে।—নিবিত্ত্যম বড়ই সুনাম করেছিল আজকে ‘বিচুড়ী’ ভক্ত—নিবি কাপিতে লাগিয়াছে, বিংশতি পত্যকীর নয়া বাঙালী যুবক লক্ষ্যের মাথা হেঁট করিয়াছে—এমন কি বেহারা বেহাইও লক্ষ্য পাইয়াছে।

কবি অতি নিপুণতার সহিত ‘উকীল’ ‘হাকিম’ ‘ডাক্তার’ ‘কোরান্দি’ ‘মোস্তাফা’ ‘ভেপুটী’ ‘পুলিস’ ও পুরাতত্ত্ববিদগণকে তাহাদের অন্তরের লামে রক্তমণ্ডকে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। “উকীল”—নামক ব্যক্তি কবিতায় আপনার আত্মগত অভিজ্ঞতা আছে উহাতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই উহা আজকালকার উকীল জীবনের নিখুঁত চিত্র। সমাজতন্ত্রের গুপ্ততম গুহায়—মানব চরিত্রের পুঙ্খনুপুঙ্খ কবির নির্লক্ষ্যভাবে দৃষ্টি প্রবেশ করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক সমাজে ঐ সব মানি এত বেশি যে প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে আপনার বিজ্ঞপ্ত ও ব্যক্তিগত কবিতার মধ্য হইতে বাহিয়া লইতে পারেন। বিহারী কাল অক্ষ glycerine সাধানে পরিষ্কার করিতে চান, বিহারী আপনার পিতৃরক্তকে বুঝা করিয়া সাধেবিদ্যানা করিয়া—সাধেব হইয়া পড়িতে চাহেন, বিহারী এক বাংলা কৃষান্তের অন্তর আপনার বংশ জাতি ধর্ম মর্যাদা সব বিসর্জন দেন, অহিংস মতপাদিগণ সকলেই জীষণ কষা-

যাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজকালকার দিনে মাঘের অবস্থা, বুড়ো বাপের অবস্থা, গুরু ও পুরোহিতের প্রতি ব্যবহার, নিরীহ পুত্রবধূর পিতার প্রতি ব্যবহার যাহা লিখিয়াছেন—তাহার একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে। শাস্তিক অন্তঃসারমুক্ত পতিত ব্রাহ্মণ, বিহারী নরক হইতে দুহাত তুলিয়া স্বর্গের সিঁড়ি দেখান—তাঁহার ঠিকই উনিয়াছেন।

“বদিও করেছি চটির ধোয়ান

ঠেলছি বেড়ি ও হাতাটা

( কিছ ) টিকিটা শুভ বজার রেখেছি

মহদি ব্যালের মাথাটা

মদটা আসটা খাই যালে মালে

পড়েও থাকিগো ধানান্তে।

( আর ) ব্রাহ্মণ বলে চিন্তে না পেরে

লয়েও নে যায় ধানান্তে।

এখনো রেখেছি ইত্যাদি। ( মানসী )

“ব্যুর বুন্দে” কবি বাঙালীর বীরত্বের বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা অতি উপযোগে বাঙালী ভক্তলোক, ও সব উৎপাত ফেলিয়া ইংরাজগণকে দেশে ফিরিতে বসুছেন আর পরামর্শ বিবেচন

“পালিয়ে এস চলে ও কচু দেশে কলে

দুঃখ বাবে ক’ছিলিম তামাক খেলে

চেহারা বাবে কিরে বেগোবে কাল শিরে

জুড়িটে বেড়ে বাবে চমৎকার।”

পরীগ্রামের বৃদ্ধ পিতার পত্র খানিতে হাসি-রাসির মধ্যে বুক কাটা আবিষ্কৃত লুকান আছে। দেশের দশা দেখিয়া হাদিও পায়, কাহাও পায়। যে দেশে—বাপের বালা-পোষ আর ভাগ্য বিনিময়ে—শিক্ষিত (?) সন্তানের বিলাতী বিনামা হয়—সে দেশের রসাতলে ঘাইতে আর বাকী নাই।—সন্তানের যে শিক্ষার (?) ব্যয় সাধনের অন্ত পিতা

পন্নীতে ছিন্নবাসে ভূপহীন স্ত্রীতরে এক বেলা  
আহার করিয়া জীবন বাপন করেন আর  
সন্ধান—সোনার চন্দ্রমা ও টেবিলে পাননা  
মাথায় নগরের ছায়াবাসে বাস করিয়া নিশি  
নিশি রক্তমাখা ঘাতাঘাত করেন এবং  
পিতাকে সন্ধানের পথে সভা জগতের  
অতুলনূর বলিয়া তৎপন্ন ভূমিতে হয়, সে  
শিক্ষা আজই মেঘের সমাধীনী আধাতে  
বেশ হইতে বহিষ্কৃত হউক। এতদপ সন্ধান  
হুল কলেজের মেসে তুলিত নহে। তাহার  
পূর্বে রজনীকান্তের এই বিনামা গ্রন্থের কিছু-  
মাত্র অস্তর হয় নাই।

“কান্ত বলে এই মহীতে

আর কি পারে তার সহিতে ?”

কখন বা বলে যায়।

কি বিষম বিলাসী হাওয়া এলো এ দেশটার।”  
আমকালকার দিনে একদল লোক আছে—  
তাঁহারা ঐষ্টানী আচার ব্যবহার বেশ ভূগা  
ব্যবহার করিয়াছে, নিত্য ব্রাহ্ম সমাজে যায়,  
হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ লক্ষ্যে কাপড়ে লেখে আর  
সন্ধ্যার রমজান চাঁটার হোটেলের আহার  
করে। তাঁহারা মাথা মুড়াইয়া বাপের আশ্রয়  
করে, অপৌচের মধ্যে ঘোরগণ ধায়, মদ  
খাইয়া মত্তপান নিবারণী সভার বক্তৃতা করে  
আর নামাবলীর ছাঁট কোট পরে তাঁহাদের  
প্রতিনিধি নিধিগ্রামের কবির হস্তে বড়ই  
দুর্দশা হইয়াছে।

পরীষ বাপের গুণবান ছেলের পড়ার  
বরচ দেওয়া ছাড়া আরো গুরুতর বিপদ  
আছে। সে আবার গুণবান জামাতা সংগ্রহ।  
কান্ত যে অবস্থ প্রাথমিকজীবীর বিবাহ ব্যয়ের  
ফর্মীতি নিরূপণে তাঁহাতে বোধ হয় অনেকের  
সুবিধা হইয়াছে, বরের পিতা “বরের দর”  
কবিতাটা নকল করিয়াই সংক্ষেপে কাজ

করিতে পারিবেন। কবি তাহা লিখিয়াছেন  
তাঁহা তাঁহার স্বজাতীয় সমাজের অভিজ্ঞতা  
হইতেই লিখিয়াছেন। শুধু বিবাহ কালে  
স্বস্ত্যায় বন্ধক রাখিয়া সর্ব্বত্র দিলেও রক্ষা  
নাই—চিরজীবন ভোগ আছে। যে দেশের  
এই ব্যাপার প্রতিদিনকার, সে দেশের কবির  
চোখের জল শুকান সম্ভব নহে। তাই  
“দেশের দশা দেখে কান্ত করে অশ্রুবহিষণ।”

দুর্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের  
আবর্ত চিত্র—“কেরাণী জীবন।” “কেরাণী  
জীবন”—সর্ব্বাকৃষ্ণের চিত্র—বাঙ্গালীর পারি-  
বারিক জীবনের নিখুঁত ফোটো। ইহার  
কোনও পংক্তি বার্থ বা নিতেন্দ্র নহে। ইহার  
প্রত্যেক বর্ণ বাঙ্গালীর মধ্যে মধ্যে প্রতিফলিত  
হইয়া ভগ্নব্রহ্ম স্বকলন করিয়া কাপোবে তুলে।  
কবির ‘নব্যা নারী’—ভারতের নারী চরিত্রের  
অধঃপতনের বার্তা। জননী-জগন্ময়ের ককণা-  
বারিণি, পত্নীপ্রাণের প্রেমতরঙ্গিণী আর  
কস্তা জগন্ময়ের মেঘের বাণী এতদিন ভারতকে  
চিত্র-ভ্রামল চিত্র-স্বীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল—  
তাঁহা এখন পঙ্কিল, মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিলে  
কে না নীরব্যাল ভোগ করিবে? কেহ কেহ  
বলেন বাঙ্গালী জাতিগোষ্ঠে। তাঁহার সমাজে  
যে পারিবারিক-জীবনে চারিদিকে নবীন  
উত্তেজনা জাগিতেছে। কবি বলিতেছেন—  
দেশের দশা ক্রমে খারাপই হইতেছে। শুধু  
বাহিরে লক্ষ অল্প প্রকৃত কাজ কোথাও  
নাই। শুধুই বক্তৃতা। আশুতোষ একতা,  
সংস্কার প্রকাশ কোথাও নাই। “এটা কফ-  
ভরা কমাণের মত, বাহিরে একটু আভর  
মাখা।” কালাচীর বিভ্রান্তি দেখে যখন  
গুরুতর মত্ত নিবারণ মাইতির সঙ্গে অনেক  
স্বপ্না করিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা চাইলে দেখা  
পেল, উভয়েই হোটেলের পাচাকা দিলেন।

অধর্ম বুড়োর সঙ্গে টাকার লোভে পিতা।  
 ৭ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিচ্ছেন—ত'ল  
 শাস্ত্রী বিনয়ালঙ্কার বিদ্যের মন্ত্র পড়চ্ছেন—  
 আবার দুদিন বাধে বিবহা হইলে স্বামীর  
 বুঝোৎসর্গ আর কস্তার একাদশের জ্বাবস্থা  
 পাকা করিলেন।

“সে একাদশের রাতে মরে জল পিপাসাতে  
 বোকা বাপ ঠাড়িয়ে দেবে

মাথার হাঁকার পাখা।

( আবার ) বসে সেই মেয়ের পাশে

অর গেলে গ্রাসে গ্রাসে

সমাজের নাই চেতনা,

অশ্ববিধির মিছে ভাষা।”

পাড়ারীষ-দলাদলি, কথার কথার ধোণা  
 নাপিত বন্ধ, হিংসা, ঘেঘ ইত্যাদি—নগরে  
 প্যান্ডাত্য শিক্ষাক্ষত সর্ববিধ গ্রামি, দিন দিন  
 বাড়িতেছে। সংস্কার কোথাও নাই।  
 উত্তেজনার শক্তিকর সর্কজ। তাই কবি  
 বলিতেছেন—

“কাজ কর কর প সত, এরাই বেশ হিতে রত,  
 এটা বে গাড়ীর মত, কানায় জুইলো ঢাকা।  
 এরা—খুমিরে ছিল উঠলো জেপে,

চাকা টানতে গেল লেপে।

মরণের অস্ত্র যেমন কুন্তকর্ণের হঠাৎ জাগা।”  
 হাণির কোয়ারা তুলিয়া নানা রঙ্গ করিয়া  
 কান্ত একথাগুলি বলেছেন বটে কিন্তু আরেয়  
 গিরির পঙ্কজ অরিগুণের স্তায়, কেন বৃহদ্রথ  
 নদীর অন্তরহ ঘণ্টাজোতের স্তায়—“বুক  
 ফাটা জুখে গুমরিছে বৃকে গভীর মরম  
 বেমন।” সমাধি প্রাপ্তের অঙ্গ ভরিয়া  
 কুন্দন জ্বপের স্তায় কান্তের পদাবলীতে রঙ্গ-  
 রসের বিস্তার অনেক বটে কিন্তু অন্তরে সেই  
 গভীর বেমনার নরকভাল আপনাকে গভীর  
 ভাবে উপনিবেষ্ট করিয়া বলিয়াছে।

রজনীকান্ত প্রেমবিবর পূর্ণরূপের কবিতা  
 বিশেষ পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে আর  
 প্রেমের কবিতা রচনা বিড়ম্বনা। বৈষ্ণব  
 কবিসম্প্রদায় প্রেমকে যত দিক্ দিয়া সাহিত্যে  
 লগ্না সম্ভব তাহা লইতে বাকী রাখেন নাই।  
 বিশেষতঃ কবির রবীন্দ্রনাথের পর বঙ্গদেশে  
 প্রেমকবিতা রচনা চর্কিত চর্কিত বই কিছুই  
 নহে। তাহাতে নবীনতা পাওয়া যায় না। উপরন্তু  
 বিরক্তিকর। কবি নিজে ঐ একঘেয়ে প্রেম-  
 কবিতা ভাল বাসিতেন না। তিনি এ ধীন  
 ভক্তকে এক সময় একখানি পত্র লিখিয়া-  
 ছিলেন। “তোমার পুত্রকে যে অপরের  
 স্ত্রায় একঘেয়ে প্রেম কবিতা নাই, তাহা  
 আমাদের দোষাত্মক। ঐটা থাকিলেই আমি  
 বড় কাহিল হইয়া পড়ি।” কান্তের পদাবলীতে  
 বাহ্য এক আঘাত। প্রেমকবিতা আছে তাহা  
 তাহার অতীত স্মৃতির অনিবার্য উজ্জ্বল।  
 সে সঙ্গীতগুলি মধুর সরল, স্নেহিত সঙ্গীত,  
 কিছু মাত্র কষ্ট বলনা নাই।

গীতিকাব্য—অষ্টপদী কবিতা।

‘অমৃত’—কবির রোগপথ্যের রচনা। এই  
 অমৃতই বিবরণে বিলাইয়া কঠে কালহলাহল  
 পরিয়াছিলেন। অমৃতের আদরের কথা  
 বলা নিঃস্বার্থজনক। আর পর্যন্ত বঙ্গদেশে  
 কোনও পুত্রক ৬:০ মাসের মধ্যে তৃতীয়  
 সংস্করণে পৌঁছে নাই। “কবিতাগুলির  
 মধ্যে যে সকল চিরন্তন নীতিবাণী নিহিত  
 আছে তাহা ধারা বালকবালিকাদের  
 কোমল হৃদয় ও সরল মন পৈশব  
 হইতে সংগে চালিত হইবে।” (সম্ভবনী)  
 —ইহার অধিকাংশ কবিতা, বিনয় কথ্য,  
 আশ্বত্থ্যাপ পরোপকার, ধর্ম ও ধীনতার ক্ষুণ্ণ  
 জুড়িত। সামান্য গোশব্দও যেমন চন্দের  
 ন্যায় অচকল প্রতিবিম্ব পতিত হয়,—সুত্র

অক্ষিপোলকে যেমন বিরাট বিশ্ব প্রতিফলিত হয় এই ক্ষুদ্র কবিতাভূমিতেই তেমন রঙ্গনী কান্তের সমগ্র উদার ও প্রগতি দ্বন্দ্বী স্টুটি উঠিয়াছে। কান্তের স্ত্রাঘ কল্পনা ও বিনয়ের কথা এমন ভাবে কেহই লিখিতে পারে না। “দগ্ধার বিচারের” কবি সমুদ্রে আর একটি কথা বার বার প্রচার করিয়াছেন—তাঁহা অত্যাঙ্ক অহংকারের পতনের কথা—“পরিপতি” নামক কবিতায় যত্নস্বরে একথা ভাল কবিয়া সন্নিহাছেন। তাঁহার্য আনকৌর কাছে নর, মেঘের কাছে লিংহ, রসাকরের কাছে গিতি, লিঙ্গুর কাছে মেঘ, ধূলির কাছে মানব ও যেতে সরার কাছে কাচের শিশি ঐ একই সত্য শিক্ষা করিয়াছে। শিক্ষা ও প্রবৃত্তি,... ইত্যাদি কবিতা অতুলনীয়। বহুমতী ঠিকই বলিয়াছেন “অমৃত যদি বাংলার গৃহে গৃহে গৃহপত্রিকার মত বিরাগ না করে, তাহা হইলে বলিব, সে দুর্ভাগ্য কবির নহে, সে শোচনীয় দুর্ভাগ্য ব্যঙ্গালীর।” সঙ্গরপতকের পর এ শ্রেণীর গ্রন্থ বাংলায় এই প্রথম।

অতঃ। কবির প্রস্তুত হইবার কথায়, আত্ম-নিবেশনের আত্মলতার, দয়াময়ের মহিমা ও প্রেমগানে এই পুষ্টিকা পরিপূর্ণ। পূর্বকভাবে ইহার সমালোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। ইহার ‘দুঃখ,’ ‘অবোধ’ ‘প্রার্থনা’ ‘পাটনী’ ইত্যাদি কবিতা মঞ্চবিনায়ক। অতঃর অধিকাংশ কবিতাই পুরাতন বহু-কবিতার অঙ্কুরণে বড়িত। কবির কীর্তন ও বাড়িলের সুরগুলি বহুকাল নগর বাসের পর পল্লীতে কিরিয়া সিংহা মধ্যরাত্রে রাখালের বাসের বাসীর তান অথবা মেঠোহরে গ্রাম্য বালকের হুহুয়াগত সঙ্গীত ধ্বনির স্ত্রাঘ মিষ্ট লাগে। কান্তের পদে আমরা পুরাণো কবির ভাষা, স্বর ছন্দ, গুণিতা সব প্রাপ্ত হই।

টেলি চেয়ার যন্ত্রিত গৃহে—বিরোধের বিলাপ জ্বাের মধ্যে বাস করিয়া কান্তের কবিতাকে আমরা পিতামহের কৌটিল্য মস্তুর বা পিতামহীর সিন্ধুরের স্বাপীতির স্ত্রাঘ মাধার ধরিয়া কণেকের মন্ত মনের মানি পূর করি। কান্তে আমরা শুব সঙ্গারিত গ্রাম্যবাসনের শেষ শুক পুণানিধালা পাটখা ভক্তিনত না হইয়া থাকিতে পারি না।

শিল্প হিসাবে কবিতার সহিত বিদ্যার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে সত্য—কিন্তু নগ্রপ্রাণের উজ্জ্বল, প্রেমবিজ্ঞান জনদের আত্মল আত্মানে—বিদ্যা সহকারিত্বী না হইয়া বাধারই স্বজন করে। বিদ্যা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে। বাহাতে আত্মপ্রাণ হইতে হইতে—মাধ্য-নিবেশন করিতে হইবে—তাহাতে বিদ্যা, বিরোধিতা সন্দেহ কি। প্রকৃত কবিতা যন্ত্রিকের ত্রা নহে—তাঁহা জনদের ত্রা। কবি,—যিনি জনদের বার্তা ঘোষণা করিয়া গগন মাজাইতে চাহেন—তিনি বিদ্বান না হইয়া প্রেমিক হইলেই ভাল হয়। পোনা দার ইংরাজ কবি Grey অধিক পণ্ডিত হওয়ার ভাল কবিতা অধিক রচনা করিতে পারেন নাই। Milton কে নাকি অনেকটা বিদ্যা জ্বলিতে হইয়াছিল। ভবকৃতিকে নানা উপারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কমাতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদকে বালকের স্ত্রাঘ সরল ও সংসারে অভ্য হইতে হইয়াছিল। Shakespeare বড় জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া নহে—বড় প্রেমিক ছিলেন বলিয়াই এত বড় কবি হইয়াছিলেন। Wordsworthএর কবিতার বিদ্যার লেশমাত্র নাই তবুও তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্বান কবিও অনেক আছেন কিন্তু সৎকবিতা তাঁহাদের বিদ্যার কল নহে—ওক্তির কল। ওক্তি নিশ্চয়ই বিদ্যাকে



ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ভক্তিরীন লোকের, তাহাদের বিষয়ই চোখে পড়িয়াছে।

Moral Sense, Aesthetic Sense বাক্যবস্তুর হইতে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সাহায্যে জন্মে না। তাহা আত্মার স্বাধীন বিকাশ—আত্মজ্ঞানের সহিত জড়িত ও সহজাত। বাক্যবস্তুর সহিত সযত্নে তাহা প্রকাশ ও ভূষণ প্রাপ্ত হয়। কবিত্ব শক্তি ঐ সৌন্দর্য্য বুদ্ধির বিচিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে। বাংলাতে ঐ বুদ্ধি অসাধারণ ভাবে পরিপুষ্ট—তিনিই কবি। আমাদের দেশে কিছুক কবি, বাউল কবি, নিরক্ষর কবি কত অনিচ্ছিত কবি ছিল। তাহাদের চক্ষে দোষ ছিল, তাহা অমান্য ছিল, রচনা পারিপাট্য কিছুই ছিল না কিন্তু তাহাদের রসবোধ ছিল প্রেম-ভক্তি ছিল। রচনায় প্রাণ ছিল—প্রাণমাতানো তান ছিল।

কালের অভ্যাস অধিকাংশ তবু সঙ্গীত-গুলি ঐ সকল কবিরের পদাঙ্ক অনুসরণে রচিত। কান্ত বিদ্যান ছিলেন না তাহা নহে কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহার বিষয়া তাহাকে পাইয়া বলে নাই। প্রেমই তাহাতে জাগ্রত ছিল। অভ্যাস কবিতাগুলি ভক্তিরূপে সিক্ত বলিয়াই এত উপাধেয়। জ্ঞানের কথা ও যথাতথাই শুনা যায় ও পুরাতন হইয়া যায়। প্রেমের কথা কখনও পুরাতন হয় না সকল সময়ই প্রাণ মাতায়। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।” ইহাতে কোনও সাহিত্য, কোনও বিজ্ঞা নাই তথাপি ইহা অনাদিকাল হইতে প্রাণমাতায়ে এসেছে—অনন্তকাল ধরিয়া নিখিলের প্রাণ মাতাইয়া দাইবে।

তাই, অভ্যাস সাধনসঙ্গীত গুলিতে নৃত্য ও কথা কিছু নাই—কিন্তু চিত্তনবীন প্রেম-

বিহীনতা তাহারিগকে—মহিমাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কবি গাহিতেছেন—

“আমি হ’রে অন্ধ হ’য়ে বধির,

মা মা বলে হবো অধীর,

দুঃখনে বইবেরে নীর—

দীনদীন কাহালের লাজে।”

অথবা— “আমায় পাগল করবি কেবে ?

মা মা বলতে অবিরত দুঃখনে ধারা ব’বে।”

এ গান শুনিয়া—“এমন দিন কি হ’বে মা তারা”র কথা মনে পড়ে ও ভক্তিরূপে প্রাণ অভিসিক্ত হয়।

কবি যখন গাহিতেছেন—“আমি—অবিরত নয়ন দুদিয়া ( মাগো ) বেজায় আধারে রয়ে যাই।”—তখন আর এক মহাকবির কথা মনে পড়ে,—বিদ্রি—“বধাব ললিলে ডুব মরি” বলিয়া ভাবামাকে ডাকিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। কবি যখন গাহেন—

“দেশে শুনে আনলিরে কড়ি

সব কড়ি গুলো হলো কাণ।

ভাল বলে কিনলিরে দুখ

উননে তুলতে হলোরে ছানা।”

তখন—“হৃদয়ের সাগরিয়া এ ঘর বাঁধিছ”র কবিকে স্মরণ করিয়া আনন্দ হয়। কবির—“বে পথে মরা ছেলে ঘাচ্ছে নিয়ে স্বপ্নান ঘাটে।” অথবা—“ভাব বেধি মন কেমন ওস্তাদ বে দিন দুনিয়া গড়েছে।” এ সকল গান শুনিয়া দীন বাউল, কিকির চাঁপ ইত্যাদি বাউল কবিগণের মধুর সঙ্গীত স্মরণপথে আগিয়ে উঠে। কবির, মহাল মাঝির কথা, ভজন বাধা, বড়রিপুর রূপক, দেওভাও ইত্যাদির কথা শুনিয়া মর্ম্মতন্ত্রী পুরাণোক্তের বাজিয়া উঠে।

কবির “আনন্দময়ী”—উমার আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। তজ্জ-

পুলকে ভরপুর হইয়া জননীকে মানবণ্ডের  
গভীতে আনিয়া জীড়া করিয়াছেন। গিরি-  
রাঞ্জের কল্যাণে জননীকে কাদাইয়াছেন  
হাসাইয়াছেন। রামপ্রসাদ, দামরুণি, কমলা-  
কান্ত ইত্যাদি সাক্ষর কবিগণ এই ভাবেও  
আগমনি ও বিরয়া বিষয়ের সঙ্গীত রচনা  
করিয়া বঙ্গদেশকে মাতাইয়া গিয়াছেন।  
কান্তকবি আর একবার মাতাইয়া গেলেন।

বিস্ময়ে যে 'পরিণয় মঙ্গল' কবিতাগুলি  
আছে—তাঁহাও অতি মনোহর। বিবাহের  
উপহার হুত্রে তাহাতে অতি উচ্চ আশ্বর্ষের  
কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

কবির কতগুলি বালায়চনা ও আত্ম-  
নিবেদনের শেষ কবিতাগুলি শ্রীত্বই প্রকাশিত  
হইবে।

শেষকালের কবিতাগুলি যেমন মধুম্পনী  
তেমনি হৃদয়।

এই ছুগমালা বিশ্বজনের কণ্ঠে দান করিয়া  
কবি নিজে কণ্ঠে কল্যানের মালা গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন—এই শিরোভূষা বহুভাষাকে দিয়া  
কণ্টকমুক্ত পিরে পরিয়াছিলেন। নমুনা স্বরূপ  
উদ্ধরণ করিয়া দেখাইতেছি।

“আমায়—সকল রকমে কাড়াল করেছ

পর্ক করিতে চুর।

বশা ও অর্থ মান ও বাধ্য

সকলি করেছ দুর।

এগুলো সব মায়াময় রূপে

ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে।

তাই সব বাধ্য সরাসরে দখাল

করেছ দীন আতুর।

আমায় সকল রকমে কাড়াল করিয়া

পর্ক করিছে চুর; (প্রবাসী)

“কেড়ে লও নয়নের আলো,

পাণ নয়ন কর অন্ধ

মায়—৩

চির যবনিকা পড়ে থাক হে, নিচে

ধাক্ রবি তারা চক্স।

•

(তুমি) স্মৃতিমান হ'য়ে এস প্রাণে,

স্বপ্ন স্পর্শ রূপ রঙ্গ পঙ্ক

এনে দাও অভিনব চিত্র,

ভুক্তিতে দে বিমলানন্দ।”

(বঙ্গবর্নন)

“ঐ—এপারে আলোক ঝিক ঝিক করে

কি মধু সঙ্গীত আগে বায়ু ভরে

আমি—এপারে বসিয়া বিকল হোদনে

আর কত কাল হরিব।

ওগো—‘খুলে দাও’ বলে আর কত পারে

খরিব?”

(উপাসনা)

ইত্যাদি। কি করণ করি কি মধুম্পনী।

আর দুটী কথা বলিয়া এই বীর্ষ প্রবন্ধের

উপসংহার করিব। কান্তের কবিতার আনন্দ

একটা অক্ষর পাতত্রা প্রাপ্ত হই। ইহার

কবিত্ব স্বাধীনভাবে ইহারি ক্ষয়ক্ষেত্রে উৎপন্ন

ও প্রতিপালিত এবং একমাত্র আন্তরিকতাই

এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে।

একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

“Without the passion, there is no  
poetry, to recognise a great poetry,  
is to hear the authentic voice.  
Poetry is the touch-stone for insin-  
cerity; if any one does not feel  
what he desires to express, he may  
make a passable oration, he will  
never make a great poem.”

আন্তরিকতা ব্যতীত, শ্রেষ্ঠ কবিতা হয় না,  
এবং ভাল কবিতা হইতেই জানা যায়, কবির  
আন্তরিকতা আছে কি না? যে কেহ অস্তরে

অন্তরে অসুস্থতা না করিয়া দিখিয়াছে তাহার রচনা, নীতিশাস্ত্র ভাল হইতে পারে, ভাল শিল্পকলা হইতে পারে, ছন্দোবন্ধে বকুতা হইতে পারে—কিন্তু ভাল কবিতা হয় না। চাপকোর শ্লোক হইতে পারে, Pope-এর Essay on criticism হইতে পারে, Shelley-র Adonies, চণ্ডীদাস বা রামপ্রসাদের পদ অথবা Wordsworth-এর Intimation Ode হয় না। অতি হৃদয়ের পাথরের ফুল হইতে পারে, সজীব, নবীন, মধুসূদন বনের কুহন হয় না।

আন্তরিক ভাবের অন্তরিক প্রবলতা, আবার মানবকে নীহব ও নিশ্চল্য করিয়া তুলে, দেই কারণে ভাবপ্রকাশের মন্ত্র, শিল্প ও সীমার দ্বারা ভাবকে সংযত ও নিয়মিত করার প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, শিল্প ও সীমা—গঠন ও আকৃতি মাত্র—তাঁহা বস্তু বা সারস্বত নহে। তাবই পদার্থ, তাহা বাতিরেকে কবিতা সূন্য পর্জী আর বাহ্যের শিল্প ও গঠন হৃদয়ের কিন্তু তাহার বাহিরে বাহ্য ভিতরে তাহা নহে—তাঁহা বহিঃহৃদয়, বাহ্য-ভূত-পর্জী স্তম্ভিকার প্রতিমা, তাহাকে লোকে চুড়ারদিন পূজা করিতে পারে কিন্তু তারপর বিশদর্শন ঘের—কিন্তু বাহ্যের ভিতর বাহির এক পদার্থে নির্ধিত এবং হোকনা তাহা বাহিরে রক্তনহীন, তাহা প্রত্যয়ের প্রতিমার মত, মানবমন্দিরে চিরদিন নিত্য সেবা লাভ করে।

“কাব্যে যেমন ভাব কবি তেমন নয়গো” এতাকা অন্ততঃ দুইজন কবিকে প্রণোদ করা যায় না। Wordsworth ও রবীন্দ্রনাথ। ইহাদের কাব্যও যেমন চমকও তেমন। ইহাদের দ্বারা আন্তরিকতা-পূর্ণ, আড়ম্বর মুক্ত কবি অতি বিরল। ইহারা

সঙ্গীত, ভাবভঙ্গ, কৃত্রিম আড়ম্বর, ভগ্নাঙ্গী কৌলতা, মৌখিকতা, কৃত্রিমতা ও বহিঃলক্ষ্য-তাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন। উভয় কবিতাই কেবল, সরলতা, উদারতা, মধুরতা, স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা অথচ সবগুলিই শিল্প ও সীমার দ্বারা সংযত ও শৃঙ্খলিত। অন্তরাত্ম কবিতার মধ্যেও এভাবে আছে—কিন্তু তাহা মাঝে মাঝে উৎসাহের মত ভাগে, কিন্তু ইহাদের কাব্য কখনও ভ্রামল করিয়া এত ভাব কলহনা নবীর দ্বারা অন্তরাত্মভাবে চলিয়াছে। Wordsworth-এর সাধনা ছিল—বিশ্বপ্রকৃতি প্রেম। রবীন্দ্রনাথের সাধনা বিশ্বনাথ প্রেম। উভয় প্রেমই একই ভাবের দুইটি পূর্ণকৃষ্ণিক বই আর কিছুই নহে।

আর এক কথা, রবীন্দ্রনাথ অনসাধারণের কবি—ইনি আমাদের দেশের মূল গায়ক হইয়া গলে গলে চলিয়াছিলেন। বীণা লইয়া ঘুরে বসিয়া গান শুনান নাই।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত সমাজের মহাকবি। তাঁহার কালোচ্ছাসী গান অনসাধারণ ভাল শ্রুতিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে তক্তি হয়। কিন্তু কান্তকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। Browningকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়,—কিন্তু Burnsকে কুকুরে বহিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্রনাথ বা নবীনচন্দ্র আমাদের মতকের উপর—রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতকের নিকট। ঐটের দ্বারা উঁহারা পরস্পরে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন আমাদের গ্রহণ করিতেছি, তবে হরি সংকীর্ণনে আমাদের মধ্যে তাও বৃত্তা করিয়া অগাই মাধাই উচ্চার করিয়া নিমাইয়ের মত সর্গজীবকে মাটাইয়া তুলে কে?—সে আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

যে যে—“পতীর ওড়ারে নাম বন্ধারে কাণিত ঘুরবিমান।” যে যে—“ভক্তকল্যা-

সীনা বাণী হয় সপক্ষে বীণা বাঁদিয়া নোচন  
তান তুলিত অথবা যে দেশে নারদ চম্রালোক  
আলোকিত করিয়া নারদ হরিশ্রবণ গান করিয়া  
তুবনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত—সে দেশে কালের  
সদীত নিষ্ফল কঠ বেদনায় পরিণত হয় নাই ।

বাণী আপন সম্বানের এবং নারদ আপন  
শিষ্যের সঙ্গীত-ভূমিমা মুগ্ধ হইয়াছেন এবং  
কবির এ সঙ্গীত-অর্থ—“মুগ্ধ কমলা কান্ত  
চরণে” স্থান পাইয়াছে—তব্বৎসে সন্দেহ নাই ।  
শ্রীকালিদাস রায় ।

## আত্মধর্ম ও পরধর্ম

শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন। —

“বৃথার্থে নিবনং শ্রেয়ঃ পরধর্মেভ্যোভ্যবহঃ ।”

বৃথার্থে বিনাশ পায় সেও ভাল কিন্তু পর-  
ধর্ম ভয়াবহ মনে করিয়া সর্বদা পরিহার  
করিবে। এই বৃথার্থ ও পরধর্ম কি ইহা  
ভাবিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা  
পূর্বে বৃথার্থ নামক প্রবন্ধে তাহার কতকটা  
আভাস দিরাছি। আমাদের দেশে বর্তমানে  
বৃথার্থ কথাটা যে ভাবে ব্যবহৃত হইতে চলি-  
য়াছে তাহা আপনারা হয় ত সকলেই অবগত  
আছেন। বাহ্যিক হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া  
কলাপে আত্মবান, বাহ্যিক ত্রিসন্ধ্যা পূজা  
আহিকাদি করেন, বাহ্যিক ব্রাহ্মণ বেদিলে পদ-  
ধূলি গ্রহণ করেন দেবতার মূর্তি দেখিলেই ভূমিষ্ঠ  
হইয়া প্রণাম করেন, ছোটো কাটোন, কোলীন  
আটোন, তিলক ধারণ করেন, মতকে শিক্ষা  
রক্ষা করেন, এক কথায় বাহ্যিক ধর্মের বহিঃক  
লইহা বাহ্যিকভাবে সুশোভিত হইয়া মাখাল  
কলের প্রায় ধার্মিক নাম ক্রয় করিবার লগ্ন  
যোকান পাতিয়া বলিয়াছেন তাহারাও বর্তমানে  
আমাদের দেশের ধার্মিক লোক বলিয়া ও  
বৃথার্থপরায়ণ বলিয়া খ্যাত। তাহাদের ভিতরে  
কি আছে না আছে কেহ অহুসন্ধান করে  
না। তাহারা পরের দৃষ্টিতে ভূষিত হন কি  
না এবং তাহা মোচন করিতে প্রয়াসী কি না,

আপ্তের রক্ষা, দরিদ্রের ভরণ, আত্মার বিত্তি,  
দেশের হিতসাধন, জীবের সুখ এ সকল গুণ  
প্রাপ্তির জন্যে নিহিত আছে কি না, তাহা  
কেহ দেখিতে চাহে না। দেখিতে চাহে  
তিনি ইউনিভারসিটির কোন ভিত্তি পাইয়া-  
ছেন কি না, তিনি ভূগর্ভস্থ ধর্মসভার সভ্য  
কি সম্পাদক কি না, কোন দিন ধর্মলব্ধ  
হই চার পর কোন সভ্যক্ষেত্রে বক্তৃতা করিয়া  
শ্রোতার মন মুগ্ধ করিয়াছেন কি না, কোন  
ধর্মমন্দিরের সংস্কার জন্ত ২। ১০ হাজার  
টাকা দান করিয়াছেন কি না? এই সকল গুণ  
যাকিলেই আমাদের দেশে লোক বর্তমান  
যুগের বৃথার্থপরায়ণ আত্মধর্মপরায়ণ বলিয়া  
কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা  
কি বৃথার্থ? ইহাই কি আত্মধর্মপরায়ণতা?

হিন্দু, বদি কালী, দুর্গা প্রভৃতি মূর্তির কাছে  
ছাপ মহিষাদি বলি দিয়া পশুপক্ষের মৃত্তিকা  
মিশ্রিত করে কিবা স্তব্ধ করতালে হরি নাম  
কীর্তন দ্বারা মানবকণ পরিভ্রষ্ট করে অথবা  
ভাবে বৃত্তান্তারা লোকচক্ষু মোহিত করে।  
ব্রাহ্ম বদি প্রতি রবিবারে ব্রাহ্ম সমানে গিয়া  
আচার্য্যের উপদেশ এবং গায়ক গায়িকার  
সুধীত সঙ্গীত শ্রবণ করে, বৃত্তান বদি প্রতি-  
রবিবারে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাইবেল  
হস্তে ভজনালয়ে ( church ) গমন করে এবং

দেশানে আবধপটা একঘণ্টা কোনরূপ কাফ-  
 রেশে ঘাপন করিয়া ধর্মযাজকের উপদেশ  
 শ্রবণ করে, মুসলমান যদি প্রতিদিন পাঁচ  
 বেলা অর্থ না খুঁচিয়া কোরাণের বহাদুলি  
 পাঠ করে ও নামাজ করে, বৈক্য যদি  
 কৌপীন এটে ফোটা কেটে চিতে বাধ সেজে  
 রাত্তার রাত্তার হরিনাম সংকীর্্তন করিয়া  
 বেড়ায় তবে কি সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে  
 স্বধর্মপরায়ণ হয়? আর যে ব্যক্তি ইহাদের  
 মধ্যে কোন এক ধর্মের আশ্রয় লইয়া জীব  
 জগতে বিচরণ করিতেছে তাহার নিকট  
 অস্তিত্ব ধর্মই কি ভগাবহ? হিন্দু-মুসলমানকে  
 রেজে বলিবে, মুসলমান হিন্দুকে কাফের  
 বলিবে, খৃষ্টান হিন্দুকে ভূগা করিবে, ব্রাহ্ম  
 অস্তিত্ব ধর্মসম্প্রদায়কে অজ্ঞান ও ভুলংকারী  
 বলিয়া ভূগা করিবে, ইহাই কি ঈশ্বরবানের  
 উল্লিখিত উপদেশের অর্থ? ইহাই যদি হয়  
 তবে ভগবানকে একমেশ্বরী ও পক্ষপাতী  
 বলিয়া মনে হয় না কি? হিন্দুর শাস্ত্রমণ্ডিত  
 ঈশ্বরতত্ত্ব অনুতকে বিষম বলিয়া মনে করিতে  
 হয় এবং মগন উদার সনাতন হিন্দুধর্মকে  
 অতি অশুভার ও সঙ্কুচিত করিয়া জীবজগতে  
 ঘূণিত ও উপেক্ষণীয় করিতে হয়। ঈশ্বরবান্  
 যখন তাহার শ্রম সখা অর্জুনকে উপদেশ  
 প্রদান করিয়াছিলেন তখন তিনি স্বধর্ম অর্থে  
 প্রচলিত জগতের ধর্মকথা বলেন নাই।  
 তাহার এই ধর্মের অর্থ আত্মধর্ম।

এই আত্মধর্ম রক্ষা করিতে হইলে যদি  
 নিধন হয় তাহাও শ্রেয়ঃ তবুও পরধর্ম গ্রহণ  
 করিবে না। জীবজগৎ ব্রাহ্মনীতি, সমান-  
 নীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি সমস্তে অপরের  
 কথা শুনিতে পারে—অপরের মত গ্রহণ  
 করিতে পারে কিন্তু ধর্ম বাহা প্রাপের  
 প্রাণ বাহা যানবজীবনের চরম লক্ষ্য

একমাত্র ধ্রুব তারা, তাহা অপরের উপদেশে  
 অপরের মুক্তিতে বা পরামর্শে—অপরের ভয়ে  
 বা প্রলোভনে গহণ বা পরিহার করিতে  
 পারে না। ধর্মরূপতের ইতিহাস উত্তোলন  
 করিলে দেখা যায় সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে  
 বর্তমান কাল পর্যন্ত শত শত শতাব্দী, ভক্ত  
 এই ধর্মের জন্ত হাশিতে হাশিতে আত্মপ্রাণ  
 সমর্পণ করিয়াছেন।

বৈতারাণ-ভনয় প্রজ্ঞান এই ধর্ম রক্ষার  
 নিমিত্ত পিতামাতা, রাজ্য সম্পদ, সমুদয় ত্যাগ  
 করিতে পারিয়াছিলেন। আপনার প্রাণ  
 জলে, অনলে, হস্তিপদতলে, বিঘটকণে  
 বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত চন নাই। বৃদ্ধ,  
 চৈতন্ত, মহাম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা এই  
 স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত বাধ্যাতিক জগতের  
 সকল প্রকার স্বসংকোপ ও বিলাসবাসনা  
 পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।  
 এই ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত বীণ ক্রুংকাঠে বিদ্ধ  
 হইয়া হাশিতে হাশিতে জীবন ব্রহ্মময় সত্যকে  
 আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কেবল বীণখুঁট  
 নয়, ধর্মের জন্ত তাহার অঙ্গাণা শিখ ও ভক্ত  
 এইরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচারীর হস্তে আপনাদের  
 প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের  
 জন্ত আত্মবলি কি করিয়া দিতে হয় তাহা  
 খৃষ্টানগণই দেখাইয়াছেন।

রোমান সম্রাটদিগের রাজত্ব কাল হইতে  
 আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্র যেরূর রাজত্ব  
 কাল পর্যন্ত প্রায় বোলশত বৎসরে কত  
 ধর্মপ্রাণ নর নারী প্রচ্ছলিত হৃৎসনে  
 জীবিতাবস্থায় বিঘট হইয়া ধর্মের জন্ত প্রাণ  
 বিসর্জন করিয়াছেন তাহার ইংছা নাই।  
 ইংলণ্ডের দুইজন ধর্মযাজক লাটিমার  
 ও বিডগী যখন তাহারদের ধর্ম বিশ্বাস  
 পরিবর্তন করিতে অসম্মত হইয়া জলজ

অনলে দগ্ধীভূত হইবার আদিষ্ট হইলেন তখন একজন অপর জনকে বলিতেছেন “আজ আমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছি, ইহা কখনই নির্দোষিত হইবে না, ইহা মনে করিয়া শান্তিলাভ কর।” সেই ধর্মপ্রাণ মহাত্ম্যগণের আত্মত্যাগের মহান আদর্শ আজ অর্ধ স্মৃশল ব্যাপিরা অগ্নি প্রতাপ বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাকেই বলে স্বধর্ম পালন। এই স্বধর্ম-পালনের স্তম্ভ পরধর্ম পরিহার করা কঠিন কথা নহে। এই খেল স্বধর্ম-পালনের কথা—ইহা ভিন্ন স্বধর্ম নামক প্রবন্ধে ইহার আলোচনাও কিছু হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত নানা কথায় আমরা আমাদের কাজের কথাই জুলিয়া গিয়াছি এখন দেখা যাক পরধর্ম অর্থ কি? তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিতেছেন “পরধর্ম” অর্থে শত্রীরের ধর্ম—ইঞ্জিরের ধর্ম। আত্মধর্ম এবং ইঞ্জিরের ধর্ম বা চৈতন্তের ধর্ম ও জড়ের ধর্ম চিরকাল বিরোধ। যিনি আত্মধর্মের স্তম্ভ ইঞ্জিরের ধর্মকে বিনাশ করিয়াছেন তিনিই মনীষী। এই স্তম্ভই স্খিত্য ভগবান বলিয়াছেন—

“শ্রেয়ান বিভগঃ স্বধর্মোপরধর্ম্যং বহুষ্ঠিতাং।”

স্বধর্ম বিভগ হইলেও তাহা উত্তমরূপে অস্থিতি পরধর্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শত্রীরের ধর্ম যে প্রকার উৎকটরূপেই অস্থিতি হউক না কেন তাহা কখনই আত্মধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। আমরা এই পরধর্মকে বাহিরের ধর্ম—জাতি-ধর্ম বলিয়া মনে করি। ইহা কেবল শত্রীরের বা ইঞ্জিরের ধর্ম নহে, ধর্মের নামে যে সকল বাহিরের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধ হয়, তাহাও সেই পর-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। মাহুয় যতক্ষণ এই বাহিরের আচরণ লইয়া থাকে, ততক্ষণ শত্রীর ও ইঞ্জিরের ধর্ম প্রতিপালন করিবার স্তম্ভ ব্যত থাকে; যতক্ষণ

এই স্তম্ভে ব্যাপৃত থাকে ততক্ষণ তাহার আত্মধর্মের উৎকর্ষলাভের থাকে কি? একটা বিষয় ঘরে বাহিরের স্তম্ভস্বরূপ হয় কি। পরধর্ম জাগতিক ধর্ম—আর স্বধর্ম আত্মধর্ম। আত্মধর্মের উৎকর্ষ সাধনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং মানবের একমাত্র গন্তব্য পথ। উপনিষদ এ বিষয়ে চমুতে অমূল্য প্রশংসা করাইয়া বলিতেছে,—

ইঞ্জিরেভ্যঃ পরাধর্ম্য অর্থেভ্যাম্ পরং মনঃ।

মনস্ক পরাবৃত্তিবৃত্তিরেভ্যো মহান্ পরঃ।

অর্থাৎ ইঞ্জির হইতে রূপাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মা আরও শ্রেষ্ঠ।

এই আত্মধর্ম অথবা পরমার্থ লাভনের স্তম্ভ মানবের মন ব্যাকুল হয় তিনিই অগতে মানব নামের উপযুক্ত। তাহার সেই আত্মধর্ম সাধন যদি কোনও কারণে বোধহীন হয়, যদি তিনি বুদ্ধিবিপাকে বা জ্ঞানাত্যবে প্রকৃত পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারেন তবুও তাহার স্বধর্ম পালনের চেষ্টা তাহাকে উচ্চতর সোপানে আরুঢ় করে। তিনি যত্নবালোকে অন্ধ-গ্রহণ করিয়াও দেবতার সোপান লাভ করিয়া থাকেন। তিনি তাহার সেই মহৎ চেষ্টায় স্তম্ভ চিত্ত হইয়া ‘সজু তং পরমাপ্নোতি যথা-দৃগো ন ভায়তে’ এমন পথ লাভ করেন যাহাতে আর মানবরম্যে ব্যবহারিক অগতের জালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।

এইরূপে মহাজ্ঞানী মহাজনের নিকট ‘পর-ধর্ম ভয়াবহ’ হইয়া থাকে। যিনি একবার সেই অমৃতের আশ্বাদন করিয়াছেন তাহার নিকট ব্যবহারিক অগতের পরধর্ম নিত্য ভীতি-উৎপাদক। তিনি অগতের হীনক স্বর্ণামিকে পূরীষের স্রাব পরিত্যাগ করেন এবং কেবলমাত্র সেই দুয়ারাধা অমূল্য ব্রহ্ম-

পথ লাভের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। অগতঃ মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া স্বপ্নমগ্ন ধর্মন ক্রিয়া তিনি দুর্গত মানব জীবনের অপব্যয় করাকে মহাপাতক মনে করেন।

কিন্তু এই পথ অতি দুর্গম। এ পথ লাভ করা কেবল কষ্টসাধ্য নয়—ইহা সৌভাগ্য সাপেক্ষ। স্মৃতি ও স্মরণনা ব্যতীত এই পথ ধর্মন করা অসম্ভব।

সুইয়া দ্বারা নিশ্চিতা দুরভায়া  
দুর্গমপথতঃ কবয়ো বদন্তি।\*

তৎকালীন মহাজনেরা বলিয়াছেন এই পথ ধর্মপথ নিশ্চিতা সুখ দ্বারার দ্বারা দুরভিমানীয়া। এই পথে বাইতে হইলে যেমন প্রাণের ব্যাকুলতা চাই তেমনি ভগবানের বিশেষ রূপ আবশ্যক। সে রূপ লাভের জন্য তাঁহারই পথপাশ হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ধর্ম-অগতঃ মহাজনেরা সেই পথ দেখাইবার জন্য সেই পরাবিদ্যা লাভ করিবার জন্য চিরদিন ডাকিয়া

ডাকিয়া বক্তৃতা বহন করিয়াছেন তবুও মায়া-মুগ্ধ চৈতন্য সম্পাদিত হইতেছে না। মানব প্রকৃষ্ট পথ পরিহার করিয়া নিকৃষ্ট পথেই সমাধিক আকৃষ্ট হইতেছে। আশ্চর্য্য কুলিয়া গিয়া পরাতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে এবং অবিদ্যা। মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বপ্নের অলীক স্বপ্নে কাগ কাটাইতেছে। কতবার ভগবান এই অজ্ঞান-নাশ জীবকে বজ্রনির্ঘোষের ডাকিতেছেন।

“উত্তীর্ণত আগ্রত প্রাপ্য বরাগিবেদ্যত”

কিন্তু হায়! তথাপি এ অজ্ঞান মোহ নিস্তা। এ অবিদ্যার কৃষ্ণ-স্বপ্ন ভাঙ্গা হইল না। কবে হইবে কে জানে? একদিন ছিল স্বপ্ন এ ভারতে সেই জ্ঞানি প্রতীক্ষনিত হইয়া ভারতবাসীকে এক নবপ্রাণে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, আবার কি ভগবানের রূপায়। সেদিন কিরিয়া আসিবে—আবার কি দুঃখ দারিদ্র্য মায়া কৃষ্ণ অবিদ্যার গতি হইতে প্রেম শ্রীতি সাম্যের উদয় হইয়া আশ্চর্য্য সাধনে বস্তুর হইবে।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

## প্রত্যাবর্তন \*

এ অগতঃ পরিবর্তনশীল; ইহা নতুন কথা নহে। অগতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষ্য করিলে প্রত্যাবর্তনেরও অনেক লক্ষণ দেখিতে পাই।

বাহ্যে যার তাহার সমস্ত না হউক অনেকটা আবার কিরিয়া আসে। যে আকারে যায়, ঠিক সে আকারে না আসিতে পারে কিন্তু আসে। ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার,

নীতি, নীতি একবারে যায় না, গিয়াও যায় না, মনে হয় বাইতে বাইতে এক এক বার কিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া যায়। আবার আসিবে বলিয়া যায়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব ?

আমরা বালাকালে দুই চারি জন অতি প্রাচীন বুদ্ধকে দেখিয়াছি। তাঁহার সেকালেরও অতি প্রাচীন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, সেই সেকালে তাঁহাদের আমলে জন্ম-

পোকে মত্তকের চারিদিক কামাইয়া কেবল মধ্য স্থলে দীর্ঘ কেশ রাখিতেন। এই কেশ ছেদন বিষয়ে উড়িয়ার আমানতের আদর্শ ছিল কি আমরা উড়িয়াদের আদর্শ হিসাব, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে আজকাল অর্থাৎ উড়িয়া বন্দনেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ন পর্যন্ত উড়িয়ারা সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-দিগের অনুকরণ করিয়া আসিতেছিল। সেই অন্ত মনে হয় যে উড়িয়ায় যে বিচিত্র কেশ ছেদন প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বাঙ্গালীদিগেরই অনুকরণের ফল। এখন কলিকাতা অঞ্চলে যুবকগণের মধ্যে আবার সেই সেকালের মত মাথার চারিদিক কামাই-বার প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। তবে সেকালের মাথা কামান আর একালের মাথা কামানর মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। সেকালে ক্ষৌরিত স্থানের পার্শ্বে একেবারে দীর্ঘ কেশ থাকিত, একালে ক্ষৌরিত কেশের পর অতি ক্ষুদ্র কেশ তার পর অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া অবশেষে দীর্ঘ কেশে পরিণত হয়।

একদিন দেখি, একটি যুবক মত্তকের চতুর্দিকের কেশ অতি ক্ষুদ্র করিয়া ছাটিয়াছে, কেবল কপালের উপরে এক গোছা কেশ বড় আছে। দেখিয়া মনে হইল যে ঐ কেশ শুদ্ধ যদি একটু সরিয়া মত্তকের ঠিক মধ্য স্থানে যায় তাহা হইলে উহা বেশ দীর্ঘ ও সুশুভ্র শিখাতে পরিণত হয়। একালে টিকি রাখাটা অসম্ভাব্য কিন্তু সেই টিকি যদি স্থানান্তরিত হইয়া কপালের নিকট আসে তবে সেটা সম্ভাব্য চিহ্ন। সে কালের দীর্ঘ কেশে বেশী বন্ধন চলিত, একালে এখনও চলে নাই আশা করি দুই এক বৎসরের মধ্যে যুবকগণের মত্তকের মধ্যস্থলে আবার বেশী বা কবরী দেখিতে পাইব।

সে কালের শিরান একালে “পাভানী” নামে তত্ত-পরিচ্ছন্ন-সমাজে আবার প্রবেশ করিয়াছে, তবে এবারে একটু ঢং বদলাইয়া অর্থাৎ আত্মন দুইটা সজ্জ করিয়া আসিয়াছে, নতুবা শিরানই যে পাভানী, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা বাল্যকালে এক প্রকার কিতাবীনা পাড়কা ব্যবহার করিতাম, তাহার নাম ছিল—“হাতী কান হস্তিঃ” তাহার প্রত্যেক পার্শ্বে কিতাবীবাঁধার গুচ্ছ দুইটা করিয়া ছিন্ন থাকিত। এখন সেইরূপ পাড়কা অনেকেই শ্রীচরণ কমলে দেখিতে পাই। তবে একটু প্রভেদ আছে—কিতাবীবাঁধার ছিন্ন প্রত্যেক পার্শ্বে দুইটার পরিবর্তে চারিটা হইয়াছে, ছিন্ন-গুলি আরও অনেক বাড়িয়াছে এবং পাড়কারও নাম বদলাইয়াছে। সেকালের “হাতী কান হস্তিঃ” একালে “ভার্মি নাম” লইয়া তত্ত সম্ভাব্যগণের চরণসেবার প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালী সাহিত্যেও আজকাল প্রত্যাবর্তনের প্রভাব যেন নখনে পড়ে বলিয়া মনে হয়। আমাদের অর্থাৎ শ্রৌতদের নখনেও গোষ্ঠি: আভাবিকই অল্প। স্তত্রাঃ আমায় দৃষ্টিতে যাহা প্রত্যাবর্তন বলিয়া বোধ হইতেছে, যুবক-গণের স্ত্রীক দৃষ্টিতে তাহা দৃষ্ট কিছুর নহ। যশের আভিলাষগত: দৃষ্টির বোঝেই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, আমার কিছু মনে হয় যে, সে কালের ভাষাটা আবার নব কলেবর ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসি-তেছে। সে কালের বাঙ্গালী দলীলে, নিমন্ত্রণ পত্রে ও অন্ত্যস্ত কাগজ পত্রে যেরূপ বানান দেখিতে পাওয়া যায়, একালের অনেক মাদিক কাগজে আবার সেই সকল বানানের পুনরাবর্তন হইয়াছে, ও, ওং, ঙ, ই এবং ঙ, অ এবং ও ইহাদের ব্যবহারের বাধাবানি



অনেকটা কবিতা গিয়াছে। “বার” অর্থাৎ ঘামণ অর্থে “বারো” লিখিতে কোন দোষ নাই। “তোমার নাম কি?” এই “কি” তে ই দিলেও চলে ই দিলেও তুল হয না, বরং ভাল রকম চলে। আর “বাংলা”-ত এখন “রত্ন” “বেয়তে” লেখা বাইতে পারে।

কিছু দিন পূর্বে আমার একবার মনে হইয়াছিল যে পাত্রী সাহেববিন্দকে বলিয়া তাঁহাদের বৃত্তান্ত-সমিতিসমূহ হইতে প্রকাশিত “মহি” “বোহন” প্রভৃতির লিখিত “হুমচাচার”গুলির ভাষা সংস্কারের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ঐ সকল পুস্তক সকল বৃত্তানী বিদ্যালয়েই পড়ান হয়, একটা বিকৃত বাঙ্গালা ভাষা পড়াইয়া ছেলের মস্তক তক্ষণ করা হয় কেন? যদি পড়াইতেই হয়, তবে ঐ সকল পুস্তক ভাল বাঙ্গালা ভাষাতে লিখাইয়া পড়াইতে ক্ষতি কি? কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সেই মহি বোহনের হুমচাচারিভাষাটাই আমার শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদরের ভাষা হইবার উপক্রম করিতেছে। এখনকার জুই চারি খানা বালিক পত্রে হুমচাচারি ভাষার বড় আদর হইয়াছে। একটু নমুনা দেখিবেন?—

“সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া ছুড়ু, নাড় শবে ঘরের দরজা জানালা-গুলি বন্ধ করিয়া দিতে চায়, তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে বাহারা দরজা খুলিয়া দিবার ভয় উৎসাহ চাইয়া উঠিবে।”

“কত কাহাকেও দেখিলে বেগের। দহীসের মন তত উছলিয়া উঠিত না বত উঠিত উবাকে দেখিলে।”

কবিতারামা হইতে পদ্য ও ত্রিপদী নির্ধা-  
সিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা আমার কিরিয়াছে।

কিরিয়াছে লভ্য তবে নূতন বেশে। পদ্যের  
প্রতি ছত্রে ১৪টি করিয়া অক্ষর আছে, ছত্রে  
শেষে মিল আছে, কিন্তু অষ্টমাক্ষরের পর  
যতি সকল ছত্রে নাই। ছত্রে মাক্ষর্যানে  
পূর্ণক্ষেপ। পড়িলে বৃষ্টিতে পাত্রা যায় না  
যে পদ্যের কি মাইকেলের অমিতাক্ষর।  
যথা:—

“বলিয়া প্রকোষ্ঠে মোর রাজি হ’ল ভোর  
মনোবিজ্ঞানের শুভ নীরস কঠোর  
অংশগুলি পড়িতেছি। ধর্মী কণি আলো  
করোটি প্রাকার তলে অন্ধকার কালো  
শুভ কার্য-কক্ষগুলি বেড়াতেছি ঘুরি  
আয়ুসগুলের শত বনি খাত খুঁড়ি  
খুঁজিতেছি মহারথ—সত্য মহামনি  
পেই পুত্র আত্মকন প্রসারণ পদ।”

সামাজিক প্রচার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও  
দেখিতে পাই যে দেকালের কোন কোন  
প্রথা দীর্ঘকাল পরে আবার নব বেশে কিরিয়া  
আসিয়াছে। বিবাহে পণ প্রথা কস্তার পিতাকে  
ছাড়িয়া পুত্রের পিতাকে আশ্রয় করিয়াছে।  
দেকালের কস্তা বিক্রয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া  
৮নিসির চন্দ্র ঘোষ “নবন রোপেণা” নাটক  
লিখিয়াছিলেন, একালের পুত্র বিক্রয়ীর পুটে  
কথাঘাত করিয়া অসুতলাল “বিবাহ-বিব্রাট”  
এবং গিরিশচন্দ্র “বলিদান” লিখিয়াছেন।  
দেকালে বাগ্মিতার পরীক্ষা হইত কথকতার,  
একালে বক্তৃতায়।

একটা একটা করিয়া নাম করিয়া আর কত  
বলিব? আপনারা—বিশেষতঃ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ-  
গণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বৃষ্টিতে  
পারিবেন যে, বাগা যায় তাহার কিছু আমার  
আপে। কোনটা বেশ বদলাইয়া, কোনটা  
চম বদলাইয়া আমার কোনটা বা অবিকৃত  
তাবেই কিরিয়া আপে। আমরা হিন্দু—আমরা

অস্বাস্থ্যের বাহ্যিক কারণ করি, মানবস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার বিশ্বাস করি। মানুষ মরিয়া যখন আবার কিরিয়া আসে, তখন মানবসমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতিই বা কিরিয়া আসিবে না কেন?

যাহা গিয়াছে তাহা আবার আসিবে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন “সত্ত্বাধি যুগে যুগে।” তবে গিয়াই যে লোক লোক কিরিয়া আসিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোনটা বা ১০ বৎসর পরে কিরিয়া আসে,

আবার কোনটা বা ৫০ বৎসর, আবার কোনটা বা ৫০০ বৎসর পরে কিরিয়া আসে। এই প্রত্যাশাধীনতা লক্ষ্যে যাহা গিয়াছে তাহার কিছু আসিবে, কিছু এখনও আসে নাই কিছু আসিবে। তবে আসিবে তাহা কে বলিবে? যাহা হারাইয়াছে তাহা আবার পাইব—কিন্তু কবে পাইব? কবিতা বলিয়াছেন—অপেক্ষা কর—পাইবে।

—“কালোহুঃ নিবন্ধি বিপুলো চ পৃথ্বী।”

ঐযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## স্কটল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রাউন কলেজের বর্ণনা

(১) প্রাচীন ইংল্যান্ডের জীবন-কেন্দ্র আজ সকালে এডিনবারা যাত্রা করিলাম। কেবল হইতে মন ঘটাতে পথ। প্রথমে এডিনবারে গাড়ী বদলাইতে হইল। এই নগর কেবলজের অতি নিখটে। প্রাচীন কালে যখন কেবলজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছিল তখন এলির ধর্মমন্দির বিশেষ প্রত্যাপনালী ছিল। প্রাচীন কেবলজে এলির প্রভাব যথেষ্ট। সোজা উত্তরে চলিতেছি। পথে দেবতার বিশেষ কিছু নাই। খোলা মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। চাষ ও আবাদ প্রায় সর্বত্রই দেখা গেল। পাহাড় পর্বত নদী খাল বন অশ্বল ইত্যাদি দৃশ্যের সংগোহনাদি অভাব। প্রাকৃতিক দৌন্দর্য্য হিমায়ে পথ তত রমণীয় নহে। লিঙ্কলন্ড ও ডনক্যাটার হুইটা বড় সহর পার হইয়া গেলোম।

প্রায় ১ টার সময়ে ইয়র্কে পৌছিলাম। আজকাল ইয়র্ক একটা শিল্প-কেন্দ্র। প্রাচীন ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ইয়র্ক বিশেষ এলিড ছিল।

মাঘ—৭

ইংরাজী সাহিত্য, সভ্যতা ও শিক্ষার প্রথম যুগ ইয়র্কে কেন্দ্রে অতিবাহিত হইয়াছে। ইয়র্কের পণ্ডিতগণই ইংরাজীভাষিকের প্রথম অবস্থায় শিক্ষিত ও বোদ্ধিত করিয়াছেন। ইয়র্কের লোক সেই সময়ে ক্রাফের এবং ইউরোপের ভাববিনিময় হইত। ইয়র্ক ইউরোপীয় সভ্যতা-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিত। ইয়র্কের একজন পণ্ডিত হ্যাংকুইন অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রান্স-নরপতি চার্লেম্যাগনের শিক্ষা-সচিব ছিলেন। ফলতঃ কেবলজের প্রথম অবস্থায় ইয়র্কের প্রভাববিস্তারিত পাই।

ইয়র্ক ছাড়াইয়া ডারহাম নগরে আসিলাম। গাড়ী হইতে পর্বতপৃষ্ঠস্থিত সিন্ধাবার দেখা গেল। সিন্ধাবারের নির্মাণ ও অবস্থান অত্যন্ত স্বন্দর ও বিচিত্র ভাববোধক। বিদ্যোত্তম স্তরমা অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ডারহামের ধর্মমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বোধ হইল। ডারহামে একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী নিউকাস্লে আসিয়া গাড়িছিল। প্রথমেই একটা উচ্চ শেতু পার হইলাম। টাইন নদীর উপরে এই শেতু। গাড়ীতে বসিয়া দেখা গেল নগরের কারখানা-সমূহের কলের ধূমে চারিদিক অন্ধকার। এতগুলি চিম্বী এপক্স কোন নগরেই দেখি নাই। নগরও ছোট খাট বোধ হইল না। রেলপথের দুই ধারেই নগর বিস্তৃত হইয়াছে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ নিউকাসলের তুলনায় পরীক্ষা যাত্র। অবশ্য লওনে এত মহালা আছে যে তাহার সঙ্গে নিউকাসলের তুলনা করা কঠিন। কিন্তু কল কারখানা, চিম্বী, ধূম, শিল্প ও ব্যবসার হিসাবে নিউকাসলের সঙ্গে লওনের শিল্প-মহানগর সমুদ্র আছে। নিউকাসলে করবার কার্য বেশী।

এইবার ইংলণ্ডের সীমা পার হইয়া স্কটল্যাণ্ডে পড়িলাম। এইখান হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য কিছু বদলাইতে লাগিল। খানিক পরে ভাহিনদিকে সমুদ্র দেখা গেল। নীলদিগ্ধ প্রথমে কিছু দূরে, ক্রমশঃ অতিশয় নিকটবর্তী হইল। স্থানে স্থানে সমুদ্রের কূল বিঘাই রেলপথ নির্মিত হইয়াছে।

এডিনবারা ছাড়ার সময়ে শৌছিলাম। তখনও উজ্জল সূর্য্য কিরণ। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সূর্য্য দেখা গেল। আহারের পর রাস্তার বাহির হইলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তাপথ—লওনে একদম রাস্তা বেশী নাই মনে হইল। ঘরগুলিও প্রাসাদতুল্য এবং একধরনের। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি দেখিলে লওনের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু লোকের গতিবিধি বেশী নয়—গাড়ী থোড়া মটরকার, ট্রাম, ট্যাক্সি কম চলে। লওনের পকানভাসের একভাগও বোধ হয় এখানে কর্তৃপ্রবণতা ও চলাকোরা নাই। অধিকতর কলকারখানা ফ্যাক্টরী, চিম্বী

ইত্যাদিও প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি না। অনেকটা নির্জনতা ও শান্তি উপভোগ করিতেছি।

## ( ২ ) এডিনবারার গৌরব

এ কয়দিন লেখাপড়ার আনুধ্যাত্যে বাস করিতেছিলাম। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের রাস্তায় বাহির হইলেই শিক্ষার্থী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। বাড়ীঘরের মধ্যে হয় ছাত্রাবাস না হয় কলেজ ও ধর্ম্মশিক্ষার। বোকান হোটেল ইত্যাদিও প্রধানতঃ বিদ্যা-পুত্রীর অধিবাসীদিগের অভাব মোচনের অঙ্গরূপ।

এডিনবারা একটা ছাত্র-নগর মাত্র নয়। ইহা একটা রাষ্ট্র-কেন্দ্র। অবশ্য কোন স্বাধীন রাজ্যের প্রধানকেন্দ্র এখানে নাই। এডিনবারা-কেন্দ্রের উপরওয়ালদিগের আকিস-সমূহ সবই লওনে। কুইল্যাণ্ডের এই রাজধানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রতম নগর মাত্র। এই হিসাবে কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদির সঙ্গে ইহার কথকিং তুলনা হইতে পারে। লওনের হট্টপোল এখানে দেখিতে পাইতেছি না। এই নগরীর প্রাসাদসমূহ দেখিলে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের পরিচয় পাই। অধিকতর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টনের মধ্যে মানবশক্তি এক কৃত্রিম-সৌন্দর্যের আকর নির্মাণ করিয়াছে বুদ্ধিতে পারিতেছি। ওখানি এডিনবারায় বসিয়া কর্তৃত্বপূর্ণ রাষ্ট্রকেন্দ্রের আভাব পাই না।

এডিনবারার প্রধান উদ্যান ও প্রান্তরের দক্ষিণদিকে বাস করিতেছি। এ অঞ্চলের বিতীর্ণ জনপদে সর্বত্র শান্তিপ্রিয়তার চিহ্ন অঙ্কিত। যখন পার হইয়া উত্তর দিকে অগ্রণ হইলে লোকজন বেশী দেখিতে পাই বটে, কিন্তু শিল্প কারখানার কল ও চিম্বী চোখে পড়ে না; ব্যবসায়ীদিগের কোলাহলও

জন্মিত পাই না। এই বিরাট নগরীর নিত্যজাত বাতাবিকই চিত্রে এক অপূর্ণ ভাব স্ফূর্ত করে। পৰ্ব্বতের সমান উচ্চ গৃহ-গুলিই যেন আমার একমাত্র সঙ্গী ও প্রতিবেশী মনে হইতেছে।

এতিনবারার এই অংশ অতি নূতন। বিখ্যাত একশত হইতে দেড়শত বৎসরের ভিতর এই অঞ্চলের প্রাণদতুলা অট্টালিকা-সমূহ নির্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, লণ্ডনের আধুনিক শোভাপটভ এবং ধর্মবর্ষ্যও নিত্যজাই নূতন। সেই মহানগরীর শৌন্দর্য ও সৌন্দর্য উনবিংশ শতাব্দীর ভিতরেই প্রধানতঃ সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ জাতির বর্ষা শাস্ত্রাভ্যাস ভোগ বতদিনের কথা, লণ্ডনের ঐশ্বর্য ও ততদিনের কথা। আজকালকার প্রমত্ত রাজপথ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী-ঘর দেখিবা অষ্টাদশ-শতাব্দীর লণ্ডন বা এতিনবারার চিত্র করনা করা অসম্ভব। অষ্টাদশ-শতাব্দীর লণ্ডন কিরূপ ছিল তাহা ক্রাইবের বিবরণে জানিতে পারা যায়। ক্রাইব তখনকার মূর্ণিরাবায়কে লণ্ডন অপেক্ষা সম্পদশালী এবং শৌন্দর্যপূর্ণ ও বিস্তীর্ণ বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১০০। ১৫০ বৎসরে লণ্ডনের কিরূপ পরিবর্তন হয়!

এতিনবারার নূতন ও পুরাতন অংশ উভয়ই ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। এই নগরের ব্রহ্ম, পর্বত, নদী, সমুদ্র, হুয়াণা, রাতাঘাট, গলি, গির্জা, বাজার, হাট, উদ্ভদ, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকলই উচ্চ সাহিত্যে অমর রহিয়াছে। গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যেই তাহার পরিচয় পাই। বাহ্যার স্যার ওয়াটসর কটের উপভাণ পাঠ করিয়াছেন তাহাদের নিকট এতিনবারার আলিওলি স্থপরিচিত। কেবল তাহাই নহে। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে

এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান ধ্রুত্বেরা কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তাহারা এতিনবারাতেই বাস করিতেন। এতিন-বারার সাহিত্য-সমাজ ও ক্রাফসমূহই তৎকালে বিশেষ প্রভাপশালী ছিল। ইংরাজ জাতির প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম, ধনবিজ্ঞানের জয়-দাতা রিচার্ড স্মিথ, ঐতিহাসিক রবার্টসন, কবিবর বার্নস্, চিত্রাবীর কার্ণহিল সকলেই কটল্যাণ্ডের সন্তান। এতিনবারা তাহাদের বাল্যভূমি অথবা কর্মক্ষেত্র ছিল। কাজেই ইংরাজী সাহিত্যে এতিনবারা চিত্রাবীর হইয়াছে—লণ্ডনের ইতিহাসেও এতিনবারার চিত্রাক্ষেত্র অমর থাকিবে।

সুত্র আকারে গ্রন্থ লিখিবা জ্ঞানবিপ্লবের আয়োজন ইংলণ্ডে অনেক বেধা ঘাইতেছে। বহুপ্রকার 'গ্রন্থমালা'র প্রবর্তন হইয়াছে। অল্পকথার ছোট ছোট পুস্তিকা পাঠ করিয়া কালের লোকেরা নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিতেছে। এই সকল গ্রন্থমালা কেবল মাত্র অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বা কৃষিকর্মী ও শিল্পীজনগণের জন্যই লিখিত হয় না। উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও এই সকল গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন কথা শিখিতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা গ্রন্থগুলি লিখান হয়। Englishmen of Letters Series, Universal Library Series, Home University Library Series, People's Books Series, Wisdom of the East Series, Foreign Statesmen Series ইত্যাদি নানাবিধ গ্রন্থমালা প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর-জীবন সম্বন্ধেও একশ্রেণীর পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বিখ্যাত নগরসমূহের

ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। পাঠক-গণ অকম্পোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা ইত্যাদি নগরের পরিচয় হইতে সহজেই পাঠিতে পারেন। ভারতবর্ষে আব্দুল কালাম ইত্যাদি ও ইতিহাসের চর্চায় প্রতি শোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ভারতীয় নগর-কথা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থমালা প্রচারিত হইবার সময় এখনও আসে নাই কি? নালন্দা, তক্ষশীলা, মাগধা, পুণা, পুরী, কামাখ্যা, গৌড়, কাশী, চরিদ্বার, লাহোর ইত্যাদি নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস-পুস্তক বাখালা, হিন্দী, মারাঠী ও অন্যান্য ভাষায় এক্ষণে লেখা হাইতে পারে না কি? বিদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমাদের মৌখিক সাহিত্যের এই অভাবের কথা অতি-প্রবল ভাবেই মনে পড়িতেছে।

### ( ৩ ) শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা

স্কটল্যান্ডের অনেক তথ্যবিষয়ক মিউজিয়াম একবৎসরের অল্প বয়সে রহিয়াছে। এই সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থাসমূহ নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। কাজেই এক নিঃশ্বাসে গোটা স্কটল্যান্ডের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সুস্থিরা লইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

এই বিশেষী সংগ্রহালয় ব্যতীত এডিনবারায় আর একটি সংগ্রহালয় আছে। তাহার নাম রয়াল স্কটিশ মিউজিয়াম। লণ্ডনের সংগ্রহালয়গুলি দেখিবার পর এই দুইয়ের ত্র্যাসমূহ চোখে উঠে না! কিন্তু এখানকার জীবতত্ত্ব-বিষয়ক নিদর্শনগুলি মোটের উপর বিশেষ-রূপেই উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া লণ্ডনের নানাস্থানের দুই চারিটা করিয়া পদার্থ সংগৃহীত রহিয়াছে। ইউরোপের বিখ্যাত অট্টালিকা-সমূহের নকলে ছোট ছোট খেলানা-গৃহ অথবা অঙ্কিত চিত্রও কতগুলি দেখিতে

পাইলাম। ভারতবর্ষের ভূমিবিদ্যা অতি অল্প জানা। কলিকাতা মিউজিয়ামের মধ্যে সকলেই বঙ্গদেশীয় বাস্তুশিল্পের নক্সা দেখিয়াছেন। সেই নক্সার অঙ্কনও লণ্ডনের সংগ্রহালয়ে একটা বাহার দেখা যায়। এডিনবারায়ও তাহার একটা নকল দেখিলাম।

শরৎকালের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল। লেখা আছে যে, মাঝে মাঝে সংগ্রহালয়ের বিভিন্ন নিদর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা দিরা থাকেন। সেই সকল বক্তৃতা বুঝাইয়া দিবার জন্য মাসিকলন্ডনের সাপ্তাহ্য লওয়া হয়। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এই সকল বক্তৃতার প্রবর্তন হইয়াছে। শ্রোতাদিগের নিকট কোন সন্দেহ লওয়া হয় না।

একটা বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় পৃথিবীতে নৌ-বিজ্ঞানের ইতিহাস। লণ্ডনের কোন্ কোন্ জাতি কবে কোথায় কি ভাবে সমুদ্র-পোতা ব্যবহার করিয়াছে তাহার তথ্য এই বক্তৃতায় প্রচার করা হয়। প্রাচীন রোম, ভেনিস, হল্যান্ড ইত্যাদি দেশের সমুদ্র-বাণিজ্য ও নৌযুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হয়। সেই যুগে জাহাজ নির্মাণ করিবার কি রীতি ছিল তাহাও বৃত্তান্ত হয়। পরে কোন্ কোন্ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আধুনিক বাষ্পচালিত অর্ধবহানের জন্মবিকাশ হইয়াছে তাহার আলোচনা হইয়া থাকে। স্পেনের যুদ্ধ-জাহাজ, নেপোলিয়নের যুদ্ধজাহাজ, নেলসনের নৌকৌশল এবং বর্তমান জাহাজ নির্মাণ সকলই দেখান হয়।

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কলকাতাবাসী-বিশ্বক-গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহার ভিতর নানাবিধের নানাপ্রকার নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির নক্সা রক্ষিত হইয়াছে। চীনা,

রোমীয়, ইতালীয়, ওলন্দাজ, স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতির প্রাচীন নৌ-শিল্পের নমুনা একসঙ্গে বেহিতে পাওয়া গেল। তাহার পর আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জাহাজ-সংক্রান্ত যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয়ও পাওয়া গেল। একখানা গোটা জাহাজের ক্ষুদ্র নমুনা মধ্যভাগে কাটিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা দেখিলে জাহাজ-নিৰ্ম্মাণের কারিগরি সফলতাই বৃদ্ধিতে পারা যায়।

কলকারখানার ঘরে যেনগড়ে, সীমহস্তিন, বেলুন, বিমান, আলোক-গৃহ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সকলপ্রকার বৈজ্ঞানিক বস্তুনির্ম্মিত পদার্থের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরটা বিশেষ বৃহৎ নয়। অথচ তাহার ভিতরেই আধুনিক ইউরোপের প্রধান গৌরবগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থের ঘারা ই বর্তমান যুগে সকল প্রকার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। বিগত একশত বৎসরের ভিতর যে সকল আত্মজ্ঞানক আবিষ্কারের ফলে নব্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এক সঙ্গে তাহার নমুনা আজ প্রথম দেখিলাম।

এডিনবার্গের আদিম অবধি কাগজপত্রে চীনা পদার্থের প্রদর্শনার কথা শুনিতেছি। আজ মিউজিয়ামে এইগুলি দেখিতে পাইলাম। এই পদার্থসমূহের প্রতি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করা হইতেছে। প্রাচীন চীনের পোষাক পরিচ্ছদ, সাপ সন্ধ্যা, বাঘা ঘর, এনামেল পাত্র ইত্যাদি শ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কোন বিশেষ দেখিলাম না। তবে কটল্যাণ্ডের লোকের পক্ষে এ সমুদয় কৌতুহলোদ্দীপক সম্ভব নাই।

এতদ্ব্যতীত আধুনিক চীনা চিত্রকলায় কতকগুলি নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গাছ পাতা, জীব জন্তু ইত্যাদির চিত্র অতি দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক চিত্রে রংয়ের খেলা অতি সুন্দর। প্রাকৃতিক পদার্থের অন্তরে চীনাগের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া কতকগুলি সাময়িক এবং দর্শনবিষয়ক চিত্রও সংগৃহীত হইয়াছে।

একস্থানে বেশিলাম পাঁচ ছয়খানা চিত্র সাজাইয়া একটা ধর্ম্মমন্দিরের মত গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। চিত্রগুলির ব্যাখ্যাও একটা বিজ্ঞাপন পত্রে লিপিত রহিয়াছে। পাঠ করিয়া বুঝা গেল চীনারা মৃত পূর্বপুরুষগণের স্মৃতি ভাঙ্গনক রাধিবার জন্য যে ধর্ম্মাহুষ্ঠান করিয়া থাকে এই চিত্রগুলি তাহারই পরিচায়ক। হিন্দুগণের “পিতৃ-পূজা,” তর্পণ, জ্রাক, পিণ্ডদান ইত্যাদির সঙ্গে চীনাদিগের পূর্বপুরুষের প্রতি ভক্তির সাদৃশ্য দেখে। কটল্যাণ্ডের নরনাগ্রীণ অবস্থ এই প্রজাতি ও ভক্তির তথ্য কিছুই বুঝে না। এই কারণে তাহাদের জন্য এই পূজাতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ এ সম্বন্ধে একবৃন্তের তিন ফুল গ্রাহ্য একই আদর্শে এবং একই প্রণালীতে এই তিন জাতি পিতামহদিগের পূজা করিয়া থাকে। এশিয়ার ঐক্য ইহা হইতে কিছু বুঝা যাইবে। আজ একবার এখানকার একটা বড় বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেক স্থলে এডিনবার্গের বিদ্যালয়গুলির ব্যয় প্রাচীন দানের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। এই বিদ্যালয়টির পরিচালনা হেবিমটের সম্পত্তির উপর নির্ভর করে। মধ্যযুগের অনেক মূর্খী, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ধনীলোকেরা শিক্ষার জন্য সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেন। শিক্ষা-

বিদ্যার উদ্দেশ্যে ধনধানের অল্প এতিনবারার লোকেরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবল পাঠশালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নয়, কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ও এইরূপ ধানের উপর চলিয়া থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত দানবীর বনমূলের কার্ণেলি এতিনবারার সজান। এতিনবারাতেও তাঁহার দানে অনেক বিখ্যাত-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

হেরিউটবিদ্যালয় আমাদের ভারতবর্ষে প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ের ভাব পরিচালিত হয়। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে বাস করে না। এক একবার ঘণ্টা শেষ হইলে ছড়াছড়ি করিয়া ছেলেরা বাতায়নত করে। দল বাঁধিয়া আজ্ঞা দেওয়া ছাত্রমণ্ডলেরই স্বভাব। কেবল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন, এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ও ভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। ছেলেরা বেবেখানে ইচ্ছা সেইখানে বাস করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অথবা অধীন কোন ছাত্রাবাস নাই। ‘অক্সফোর্ড’ ও ‘কেম্ব্রিজ’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নির্দিষ্ট হোটেলে বা ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের অল্প তিনটা করিয়া কামরা রাখা ছাত্রাবাস-ব্যবস্থার অবশ্য কর্তব্য। তাহাতে বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু এতিনবারার ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে একঘরের মধ্যেই খাওয়া শোওয়া সবই করিতে পারে। এমনকি, একঘরের ভিতরেই ২।৩ জন থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন আগতি হইবে না। এই কারণে দরিদ্র ছাত্রেরা মাসিক ৮০। ১০০ টাকার এতিনবারার থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে। কিন্তু ‘অক্সফোর্ড’ কেম্ব্রিজে ৩০০ টাকার কমে খরচ কুলান অসম্ভব।

স্টলগ্যাণ্ডের দরিদ্র পরিবার সন্তানের বালক বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার অল্প

বিশেষ আয়োজন আছে। ছেলেরের স্কুটা জামা, কাপড় চোপড় না থাকিলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ডায়াগনিক সেইগুলি দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহার গৃহে উপযুক্ত আহার্য পায় কি না সে বিষয়েও যথোচিত অঙ্গসজ্জা করা হয়। প্রয়োজন হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে খাওয়ান হইয়া থাকে। শিশুসন্তানরা ছেলেরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকিলে বিদ্যালয়ের শাসনকর্তারা ডায়াগনিক যথেষ্ট তিরস্কার করেন। মোটের উপর এতিন-বারা সহস্রটা একটি বৃহৎ শিক্ষালয় স্বরূপ—অভিভাবকগণের উপর কর্তব্য চালাইবার অল্প স্বাধীন অভিভাবক সর্বদা সন্মত রহিয়াছেন। খানিকটা প্রাচীন শাটটার আদর্শ এখানে অবলম্বিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

এ করদিন মধ্যদানে বেড়াইতেছি। সর্বদা এখানে অসখা বালক বালিকা লাকালাকি, মারামারি, খেলাধুলা করে। ছেলেরা মধ্যদানে না থাকিলে বিদ্যালয় হইতে তাহা-দিগকে দাড়াই দিবার ব্যবস্থা আছে। অভিভাবকগণও ছেলেরের ক্রীড়া কৌতুকে উৎসাহ দিতে বাধ্য।

এতিনবারার শিক্ষাবিত্তদের বেতন গ্রহণ দেখিতেছি অল্প কোন নগরে এরূপ দেখিতে পাইব কিনা সম্ভব। এই সহরে গ্রাহ তিন-লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ৩০০ লোক শিক্ষক ও অধ্যাপক অথবা শিক্ষা-বিভাগের কেরানী ও কর্মচারী।

৪। অকুমার শিল্প ও কৃষিকার্য্য এতিনবারার প্রসিদ্ধ ‘প্রিন্সেস স্ট্রিট’র উপর তার ওয়াটার স্টেটের প্রথম স্তম্ভি রক্ষিত হই-  
য়াছে। স্তম্ভিটি হৃদয় কাঙ্ক্ষার্য্য পূর্ণ সূর্যমধ্যে সন্নিবেশিত। এইরূপ স্মৃতিস্তম্ভন লওনের হ্যালবার্ট মেমোরিয়াল।

স্বত্ব-ভবনের পার্শ্বেই ঋণিৎ ব্যাক্যাত্তেবীর গৃহ। আশ কাল এখানে একটা প্রদর্শনী ঘোলা হইয়াছে। প্রতিবৎসরই এইরূপ প্রদর্শনী ঘোলা হইয়া থাকে। স্কটল্যান্ডের চিত্রকর, স্কার এবং বাস্তবশিল্পীরা স্বংসরে যে সকল কাণ্ড করিয়া থাকেন সেইগুলি এখানে দেখান হয়। স্কটল্যান্ডের স্তম্ভনিপের কাণ্ডাই সাধারণতঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে বিদেশীয় শিল্পীগণের শিল্প চর্চাও প্রদর্শিত হয়। এবার বেলজিয়ামের কোন কোন নিদর্শন সংক্ৰীত হইয়াছে।

প্রস্তর ও শিল্পের নানাপ্রকার স্মৃতি দেখিতে পাইলাম। স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তর প্রাণ-বস্তার বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক-টাতেই স্বপত্তির ক্ষমতা পরিস্ফুট। চিত্রগুলির মধ্যে অকনটনপুণ্য, বর্ণসমাবেশ এবং বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা ব্যক্তি-বিশেষের আকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। কোন চিত্রের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না। দেখিলেই বুঝা যায়। ফটোগ্রাফী এবং এইরূপ চিত্রশিল্পে কোন প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই চিত্রসমূহেও অঙ্কিত ব্যক্তির মনোভাব এবং জন্মের কথা অনেকটা বুঝিতে পারি। পিডাইবার বা বলিবার ভদ্রী, মুখমণ্ডলের প্রভাব, চক্ষুর নক্তি ইত্যাদি অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এতগুলি কারিগরের এতগুলি কাণ্ড দেখিয়া আমাদের ভারতীয় শিল্পিকুলের অগ্রাচুর্ভাবের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এখানে কল্পনাশক্তির বেশী পরিচয় নাই।

এখানকার সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম-ভবনের সঙ্গে আলাপ করিলাম। স্কটল্যান্ডের কৃষি বিলাতের কৃষি হইতে কোন কোন বিষয়ে শততর। এখানকার জলবায়ু এবং

যুক্তিকার উপাদান কথঞ্চিৎ পৃথক্। কিন্তু বিলাতের মত স্কটল্যান্ডেও কৃষকগণকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দ্বেষ্টে পরিমাণে দেওয়া হয়। দেশের কৃষিকাৰ্য্যের উন্নতি সাধন করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। একতর কৃষককুলের সঙ্গে গবর্ণমেন্টের সাংযোগও ঘনিষ্ঠভাবে হইয়া থাকে।

আমকাল ছোট ছোট কৃষিকৃষির প্রবর্তন করিতে সকল দেশেই প্রয়াস দেখা যাইতেছে। স্কটল্যান্ডে এ বিষয়ে পরীক্ষা ও অল্পসন্ধান চলিয়াছে। ক্ষুদ্র-ক্ষেত্রের কৃষকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহাদের স্ব স্ব কাৰ্য্যের উন্নতি সাধন করান হইতেছে। একতর গবর্ণমেন্ট পরিদর্শক, পরীক্ষক, পরামর্শদাতা, ইত্যাদি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে ক্ষুদ্র কৃষিকৃষি বিষয়ক কথেকথানা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইংরাজেরা এ বিষয়ে নিজে লিখিতেছেন এবং অন্তর সাহিত্য হইতেও অল্পবাদ করিতেছেন।

কৃষি-বিভাগের গ্রন্থশালায়ও এগুলি দেখি-লাম। ইংরাজের নাম—Land and Labour—Lessons from Belgium. By Seebohm Rowntree, এবং Large and Small Holdings. By Hermann Levy. দ্বিতীয়টি জার্মান হইতে অল্পবাদ। এতদ্ব্যতীত Rural Denmark নামক গ্রন্থের কথা অনেকই জানেন।

ইউরোপে আমকাল আন্দোলন চলিতেছে—সহর বনাম পল্লী। সেইরূপ আর এক আন্দোলন বৃহৎ কারবার বনাম ক্ষুদ্র অল্পজন। এই দুই আন্দোলন আবার পরস্পর সম্বন্ধ। পল্লী ও ক্ষুদ্র অল্পজনের জগৎ হইলে ভারতীয় বৈষয়িক আদর্শের বিবেক পাশ্চাত্য জগৎ অগ্র-সর হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, পারিবারিক



জীবনের প্রতিগ ইহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং অন্ততঃ চিন্তারাজ্যে অধ্যাত্মবাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য লগাতাই কি অগতে স্বামী হইয়া যাইবে?

৫। হেরিয়ট বিদ্যালয় ও ভূর্গ

কেম্ব্রিজের নৌ-বিদ্যালয়ে মেথিয়ার্থিনাম ছাত্রদিগকে সত্তর-কৌশল পিথাইবার এক একটা গৃহের দ্বিতর পতীর সরোবর প্রস্তুত করা হইয়াছে। সীতার কাটিতে শিক্ষা করা ইংরাজলগ্নাঘের সর্বমুখ শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের উপায়স্বত্ব বিবেচিত হয়। এতিন-বার্ষিক প্রসিদ্ধ হেরিয়ট-বিদ্যালয়েও সত্তর-কৌশল শিক্ষার আয়োজন আছে। লোক মলে ভূমিমা পেনে তাহারিগকে রক্ষা করিবার উপায়ও শিখান হয়। চৌং সীতার, জুব সীতার, বুক সীতার ইত্যাদি নানা প্রকার সীতার অভ্যাস করান হইয়া থাকে। সম-স্বাস্থ্যের ক্ষমতা পুষ্ট করিবার জন্যও বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

হেরিয়ট-বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ১৮১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকে। অনেকে অতদিন লেখা-পড়ায় কাটাইতে পারে না। তাহার ১৮১৬ বৎসর বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই পর্যন্ত তাহার মন্য শিক্ষালাভ করে না। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, অঙ্কন, সূত্রধরের কণ্ঠ, কর্ণকারের কাণ, ইত্যাদি বিজ্ঞা ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা করে। তাহার উপর ধনবিজ্ঞান এবং কৃষি, শিল্প বানিজ্যের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি লক্ষ্যে বৈষয়িক জ্ঞান লাভও ইহাদের হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সাধারণ সাহিত্য, গণিত, ভূগোল এবং ইতিহাসও শিখিতে হয়। মোটের উপর ১৮১২ বৎসর বয়স ছাড়িয়া নানা ব্যবসারে প্রবেশ

করিবার উপযুক্ত বিজ্ঞার অবিকারী চর্য্য উঃ। এই বয়সেই তাহার যোগ্য ওস্তাদ-পণের শাস্ত্রবৃত্তী করিতে পারে।

আর হাজার ১৮। ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ করিতে পারে তাহার। সঙ্গ বিধয়ে ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারীদিগের সমান বিনা অর্থন করি। প্রত্যেক বিজ্ঞানের মোটামোটি নিয়মগুলি তাহার। চাতে কলমে লিখিয়া থাকে। অধ্যাপকের বক্তৃতা বা পুস্তকের লেখা মায়ের উপর তাহার। নির্ভর করে না। প্রত্যেক বিষয় তাহার। নিজ চাতে পরীক্ষা করিয়া দেখে। এক্ষণ ল্যাবরেটরীর অতি সুন্দর ব্যবস্থা মেথিয়ার। প্রত্যেক শিক্ষকের সঙ্গে ১৬ জন ছাত্র কার্য করে। প্রত্যেকের জন্য বস্ত্র স্থান আছে। এই বিদ্যালয়ে বহু বড় ও বহুগুলি বিজ্ঞান-গৃহ দেখিতে পাইলাম আমাদের অনেক কলমেও সত্তর ল্যাবরেটরী নাই। তাহ পর ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা বাস্তব অস্ত্র প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা গণ্যলীও তাহার। শিক্ষা করে। বিজ্ঞানে গণিত-শাস্ত্রের প্রবেশ ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা যাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে ১৬। ১৭ বৎসর বয়স ছাত্রের। Statics, Dynamics, তাপ, আলোক ইত্যাদি পদার্থ বিজ্ঞানের তথ্য বিবরণ অস্ত্র করিতেছে। রসায়নের পরীক্ষা-লয়ে দেখা গেল কেহ কৃষি তত্ত্বের অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, কেহ চিকিৎসাবিদ্যার আত্মপনিক রসায়ন শিখিতেছে। কেহ বা দিল্লিস সার্ভিস পরীক্ষার অস্ত্র লগ্নাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে।

হেরিয়ট-বিদ্যালয়ের ছাত্রের। লেখা পড়া

পেথ করিয়া নানা পথে অগ্রসর হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির অস্ত্র চেষ্টা না করিলেও তাহারা বিবিধ উপায়ে তবিষায় আঁচন পঠন করিবার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াও এখানকার বিদ্যালয়ের পর ২০ বৎসর বাটিয়া কেহ কেহ ভারতীয় পিঙ্গল সাত্ত্বিক পত্রিকাও উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানে দ্ব্যস্তা বিদ্যা শিক্ষা করা হয় তাহার কলে কৃষিকলেজে অথবা চিকিৎসা-কলেজে প্রবেশ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

আজকাল এখানে ১২০০ ছাত্র। তাহাদের মাত্র ৬৪ জন শিক্ষক। প্রত্যেক শিক্ষকই এম, এ, বা এম্, এন্স, সি ডিগ্রীধারী। বিজ্ঞান শিখাইবার মাত্রই ১৫ জন নিযুক্ত আছেন।

বিজ্ঞানালয়ে ছাত্রদের কার্য্য দেখিয়া শিক্ষালায় প্রবেশ করিলাম। শিক্ষালায় ৪ জন শিক্ষক। প্রথমে কাঠের কারখানা দেখিলাম। শিক্ষক বলিলেন “আপনি ভারতবর্ষের লোক হইয়া কটল্যাণ্ডের শিক্ষা কি দেখিবেন? আপনাদের কার্য্যকার্য্য যে অতি উচ্চ শ্রেণীর।” আমি বলিলাম “শ্রমজীবের কর্তব্য শিখাইবার প্রণালীটা বুঝিতে চাহি।” কারখানার নানা স্থানে ঘাইয়া ছেলেদের হাতের তৈয়ারী কাজ দেখিলাম। ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বয়সে কোন্ কাঠের পর কোন্ কাজ করিতে হয় শিক্ষক মহাশয় ধারাবাহিকরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তারপর একটা প্রদর্শনী-ঘৃহে গেলাম। সেখানে কতকগুলি ভাল ভাল কাঠ সংগৃহীত রহিয়াছে। এই গুলি সেখানেইতে দেপাইতে শিক্ষক বলিলেন “এই জিনিষটি আপনাদের দেশের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট তৈয়ারী করিয়াছেন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “সে কি রকম?” ইনি বলিলেন “আজ সে ভারতবর্ষে নিবিধিয়ান। বলাবাহুল্য সে এই

বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিত। আমাদের নিয়মে সকল ছাত্রকেই ছাত্রমিত্রের কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। এ নিয়মটা খাটাপ কি? নিজ ঘরের ছোট পাট কাপ নিজেই সারিয়া লওয়া কি মজা? আমার এক ছাত্র খুব বড় লোক। তাহার মোটরকার আছে। মোটর-কারের মেরামতী কার সে নিজ হাতেই করিয়া থাকে। আমি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “তুমি ইহা কোথায় শিখিলে?” সে বলিল “আপনার নিকট হইয়া শিখিয়াছিলাম তাহার কলেই এ যোগ্যতা লাভ করিয়াছি। কি বলেন, মহাশয়, আমাদের নিয়মটা ভাল নয় কি?”

ছেলেদের অগ্রগমনের পথ বাহির করিয়া দেওয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েবা নিজেদের কর্তব্য বিবেচনা করেন। এমনকি তাহারা দেশের নানা স্থানে আকিস, কারখানা, কারবার, ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত লোক জনের সঙ্গে চিঠি পত্র লিখিয়া থাকেন। এইরূপ অগ্রসরানের কলে তাহারা ছাত্রদের মাত্র উপযুক্ত চাকুরী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবকেরা এমনকি বিদ্যালয়ের নিকট সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।

এডিনবারা সহরের নানা অঞ্চল দেখিতেছি। যে পাড়ার রহিয়াছি সে পাড়া আধুনিক এডিনবারার নূতনতম অংশ। এখানে বসিয়া আসল এডিনবারার কিছুই বুঝা যায় না। এডিনবারার সমগ্রতা জয়যক্ষ করিতে হইলে আমাদের সাহেব, দিল্লী, কাশী অথবা মিশরের কাইরো ইত্যাদি নগরের চিত্র মনে আনিতে হইবে। এডিনবারা ইহাদের স্রায়ই প্রাচীন—অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে এডিনবারার অস্ত্র হয় নাই একথা মনে রাখা

আবর্তক। কিন্তু সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এডিনবারা যেভাবে চলিয়া আসিয়াছে আমাদের দিল্লী লাহোর ও সেইভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছে। যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রাম ও রক্তপাতের কাহিনী এই সকল নগরের ইতিহাস। নানাধরনের প্রাচীরগঠন, নানা কোশলের গৃহনিৰ্মাণ বিভিন্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়-দ্বাপনের ইতিবৃত্ত এই সকল রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অশান্তি, বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটি এডিনবারার মানবজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এইভাবে অল্পতঃ ৬০০ বছরের কাটায়াছে। নগরের বাহ্য আকৃতি ইহার ফলে কম নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি, অপরিকার দুর্গন্ধময় গৃহনিৰ্মাণ, প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এই প্রভাবই ব্যাপন করিতেছে।

সেই পুরাতন ও মধ্যযুগের নগরের পার্শ্বে আধুনিক নগর গঠিত হইয়াছে। দুই নগরে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ট্রামে একদিক হইতে আর এক দিকে বাহিতে থাকিলেই ছয়ের প্রভেদ বুঝা যায়। একদিকে রাজ-প্রাসাদ অপর দিকে ধরিত্রের কুটির। অথচ এই কুটিরগুলিই প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদ ছিল! কাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ গৃহ বেধিয়া আসরা চমকাইয়া যায়। কিন্তু এডিনবারার আলোকবিহীন নরককূট-সমূহ মহান্নাগুলি না দেখিলে মধ্যযুগের ধ্বংস বৈখরিক অবস্থা বুঝা যায় না।

ইউরোপের মধ্যযুগে বেতন দুর্গ নির্মিত হইত ভারতবর্ষেও সেই ধরনের দুর্গ নির্মিত হইত মনে হইতেছে। এখানকার প্রাচীনতম নগরের প্রধান অংশই ছিল পূর্নজলদিত

‘কাস্‌ল্’ বা দুর্গ। এই কাস্‌ল্‌ আমাদের চুপার, লংহাণ্ড, চিতোর ইত্যাদি পার্শ্বতা দুর্গেরই অন্তর্ভূত। যদি এডিনবারার দুর্গে স্বভাবতঃ লোক না দেখিতাম তাহা হইলে আমি একটি ভারতীয় দুর্গের ভিতরেই আছি বিশ্বাস করিতে কোনরূপ আপত্তি থাকিত না। ইংরাজেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলি-কাভায় ফোর্ট উইলিয়াম প্রস্তুত করিবার সময়ে আকবরের এলাহাবাদ দুর্গের নকল করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহার দুর্গ-নিৰ্মাণ-বিদ্যায় ভারতবাসী অপেক্ষা বিস্ময়াজ্ঞ অগ্রগামী ছিলেন না। এডিনবারার দুর্গ এবং প্রাচীন নগর নিৰ্মাণের রীতি দেখিয়া মধ্যযুগের সভ্যতার এনিচা ও ইউরোপের ঐক্য ও সাদৃশ্য স্মৃতিতে পারিতেছি।

প্রাচীন যুদ্ধনীতির হিসাবে এডিনবারা অতি দুর্বল নগর ছিল। চারিদিকে পর্বত প্রাচীর—মধ্যযুগেও পর্বতবেষ্টিত—তাহার উপর দুর্গ। এই দুর্গের চারিদিকে জনগণের বাস। পূর্নদিকে অনতিদূরে সমুদ্র ও বন্দর। দুর্গের নিম্নে কৃষিকৃষি। ফলতঃ কৃষি, বাণিজ্য ও আশ্রয়স্থল হুযোগে এডিনবারা নগরীকে প্রকৃতি দ্বারাই দান করিয়াছিলেন। রাজধানীর উন্নয়নও ঠিক এইরূপ দুর্বল ছিল।

নগর নিৰ্মাণের বিদ্যায় হিন্দুজাতি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পঞ্চদশশতাব্দী-শতাব্দীতে বাঙ্গালী বিদ্যায়ের তত্ত্বাচার্য্য অমরপুর নগর নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন। কৃষিজীবী, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কৰ্মচারী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর জনগণের হুবিধা অহুবিধা বিবেচনা করিয়া সেই নগরের গৃহবিন্যাস এবং পথ-সরিয়েণের রীতি নির্ধারিত হইয়াছিল। নগে নগে জনগণের স্বাস্থ্য এবং আলোক বাহ্য

ইত্যাদির চলাচলের সম্বন্ধেও হিন্দু বাস-  
শিল্পগণ চিন্তা করিতেন। আজকাল ইউ-  
রোপে সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনাকারী পণ্ডিত-  
গণ নগর-নিখাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠা  
করিতে যত্নবান হইয়াছেন। হিন্দুরাতি  
বহুকালে হইতেই নগরতথ্য আলোচনা করিয়া  
আগিতেছে। তাহার বাস্তবায়ন, নীতিশাস্ত্র,  
শিল্পশাস্ত্রগুলির কয়েক অধ্যায় আজকালকার  
"Civico" বিজ্ঞান বা Town-Planning-  
কলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অনেক ভারতবাসীই  
বোধ হয় একথা না জানিয়া পাশ্চাত্যের  
বৈজ্ঞানিকতার মুখ!

#### (৬) ব্যারাক-জীবন

নব্য এডিনবার্গের নূতনতম অংশে বাস  
করিয়া আধুনিক সভ্যতা ও সমাজজীবনের  
চরমলীলা দেখিতেছি। কলিকাতার  
১০১২১৫ খান। Writers' Buildings বা  
হাটবাড়ী রেলওয়ে-স্টেশন ইত্যাদি একত্রিত  
করিলে লম্বা চৌভাঘ এবং উচ্চতার দ্বৈতপ  
বাড়ী হয় সেইরূপ বাড়ী ঘর এডিনবার্গের এই  
অঞ্চলে নির্মিত হইয়াছে। চুঁচুড়ার ব্যারাক-  
গুলি যত লম্বা তাহার মণ্ডপ বারস্তম্ব লম্বা  
এখানকার প্রত্যেক ভবন—উচ্চতায তিন-  
স্তম্ব। অবশ্য বাহ্য-সৌন্দর্য্য ঐ ব্যারাকগুলি  
অপেক্ষা এখানে বেশী। এখানকার লোক-  
জন এইরূপ ব্যারাক-জীবনই বাপন করিয়া  
থাকে।

এই প্রকাণ্ড মালগদামের ভিতর দুই  
তিনটা কুঠরী ভাড়া বা ভ্রম করিয়া  
পাশ্চাত্যেরা বাস করিতেছে। নিজেদের নিজেদের  
ঐ ঘর কথনবার পার্কে, উল্টে বা নিজে  
কাছাকাছি বাস করে তাহা জানিবার প্রয়োজন  
হয় না। প্রতিবেশী বসিয়া কোন পক্ষ এখানে  
নাই। তার পর এই ব্যারাকের মানবজীবন

অতি বিচিত্র। খ্রীষানীতে মিলিয়া একটি  
পরিবার গঠিত। কাহারও বা দুই একটি  
শিশু সম্ভব আছে—কাহারও বা নাই।  
সন্তানের জন্ম ইহার পছন্দ করেন না।  
ইহারা দোকানে হোটেল খাবার কিনিয়া  
খায়—ঘরে রাধা করিবার অভ্যাস নাই।  
অনেক ফুলেই একটি রুমমী মাত্রেই পরিবার  
—কোথাও বা একজন মাত্র পুরুষই কামরার  
অধিবাসী। এই একজন ছইজন লোকে  
এরপের পরিবার! পরিবারে পরিবারে  
প্রচলন ইটের প্রার্থীর দ্বারা সাধিত হয়।

"হাঘের রাজধানী পাখান কাহা!"

\*

ইটের পরে ইট, মাঝে মাঝে কীট।

ভারতের বৃট্টের গোনালা হইতে তুলনী  
গাছে পঞ্চাশ, পালগ্রাম শিশা হইতে খুড়তুত  
ডাইয়ের মাদতুত ডাই পঞ্চাশ বাস করে।  
সুভাগ্য পরিবারের মধ্যে বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য,  
জীবনবৃত্তা, মরলতা আছে। পশুপেয়া, তরু-  
দেবা, মানবদেবা, দেবদেবা স্বভাবতঃই হইতে  
থাকে। হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক গৃহেই প্রকৃতি-  
পূজা স্থান পাইয়াছে।

একটাই এদের লোকেরা কথার কথার  
মুক্ত আলো, মুক্ত বায়ু, মুক্ত আকাশের অন্ত  
লাগাশিত হয়। ইহাদের সাধারণজীবন  
নিতান্তই অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিকৃত।  
বাহ্যের গৃহে প্রাণ নাই—বাহ্যের আকাশ  
দেখিতে পায় না, বাহ্যের পরিবারের স্বাভা-  
বিক জীবনবিকাশের মধ্যে প্রকৃতির কোন  
স্থান নাই, বাহ্যের অন্তঃকরণ সর্বদা "বন্ধ,  
অন্ধকার" তাহার প্রকৃতির অন্ত, পঞ্জীর অন্ত,  
স্বাভাবিকতার অন্ত মাঝে মাঝে বিপ্লবপান  
করিতে উদ্ভট হইবে, ইহাতে বিশ্বের কথা  
কিছুই নাই। ওয়ার্ডলওয়ার্থের প্রকৃতিপূজা,

কণের প্রকৃতিশুধা, করানী বিপ্লবের প্রকৃতি-  
পূজা, অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবন-  
ধারণের ভীত প্রতিবাদ। ভারতবাসীর প্রকৃতি-  
পূজা স্বভাবসিদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ, নৈসর্গিক—নিত্য-  
নৈমিত্তিক। কিন্তু আন্দোলনের বিষয় পান্ডা-  
তোরা আজকাল লম্বা গলা করিয়া ভারত-  
বাসীকে মুক্ত-আলো, মুক্ত-বায়ু ও মুক্ত-  
আকাশের মহিমা শিখাইতে আসিয়াছে।  
আর আমরাও বিনা বাকাব্যাহে তাহাদিগের  
নিকট হুঁশ খাওয়াইয়া বলিতে পথিতেছি  
“ইউরোপের নিকট Outdoor games গ্রহণ  
কর—পান্ডাতোর love of Nature সমাধর  
কর।” আত্মবিশ্বাস আর কাহাকে বলে!

বেধিতেছি, ইউরোপীয়েরা আজ কাল  
Back to the Land, Back to Nature,  
Back to Village, Back to Cottage,  
Back to Family ইত্যাদি মন্ত্র জপিতে  
জপিতে রুমণ: ভারতীয় আবেশেরই  
সম্মুখীন হইতেছে। ইংরাজ এতদিনকার  
কৃত্রিমজীবনের বৈমুগ্ধ কষ্ট, দুর্দশা বুঝিতে  
পারিয়া স্বাভাবিক মানবজীবনের দিকে  
ফিরিতেছে। সেই স্বাভাবিক স্বাধীন সরল  
প্রথমদ মানবজীবনের সমাজ ভারতবর্ষেই  
প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিনি বলিতে  
পারেন “Have I not reason to lament  
what man has made of man” তিনি  
ভারতের সেই পল্লীসভ্যতা এবং ছুটির-  
জীবনকেই আদর করিতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের চিত্ত সম্বোধিত হইয়া গিয়াছিল।  
পান্ডাতোর সাময়িক বিমুগ্ধ ও গৌরব দেখিয়া  
ভারতবাসী মত্ত হওয়ার ভাব “পাষণ কায়া”র  
দিকে ছুটিয়াছিল। এখন আবার মায়ের  
কোলে ছুটিতেছে—কারণ ইউরোপ নিজেই  
সেই পাষণ কায়ার “বিরট মুষ্টিভলে” চাপা

পড়িয়া নিশ্চেষ্ট হইতেছে। এট ভগ্নই  
একণে ভারতবাসী

“শবাই মনে হয় আঁখার ছায়াঘন

দীপির সেই জল স্নিগ্ধ কাণে।

তাহারই কোলে দিহে মরণ ভাল।”—

এই ভাব মনে রাখিয়া জগতের নবযুগ প্রবর্তনে  
পথপ্রদর্শক হইয়াছে।

কেবল এডিনবারা কেন, ইংলণ্ডের দত্ত  
সহর দেখিলাম সর্বত্রই এই ব্যারাক্‌জীবন  
এবং প্রায়ই “নাইক ভালবাসা, নাইক খেলা”।  
তাহার উপর, হৃৎস্ব দারিত্র্য ও কষ্টই কি  
এখানে কম? পশলাওঘাটা লোক যে কয়জন  
আছেন তাহাদের কথা না ধরলাম। কিন্তু  
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার এখানে সীমা নাই।  
সামান্য ধরণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত এখানে স্ব-  
পরোপাতি অর্থব্যয় করিতে হয়। অল্প অর্থ-  
ব্যয় করা কয়জন ইংরাজের পক্ষে সম্ভবপর?  
প্রায় সবলেই বিনা প্রানে চিরজীবন কাটাইতে  
বাধ্য হয়। হাটের গল আঙ্গুল এবং চোখ  
মুগ্ধ কাণ ব্যতীত অল্প অল্প জল দিয়া পরিষ্কার  
করা ছুব অল্প সংখ্যক ইংরাজের কপালেই  
ছুটে। কেন না জলের খরচ এখানে  
অত্যধিক। জল গরম করিবার জন্ত কয়লার  
মূল্য বড় কম নয়। কাপড় চোপড় খোজান  
জন্মের মধ্যে একটা কর্ষ স্বরূপ! কাজেই  
অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্নভাবে থাকা ইংরাজের  
স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। নিতান্ত ধনী লোক না  
হইলে ভারতবাসীর আদর্শে পরিষ্কার থাকা  
পান্ডাতাজাতির পক্ষে অসম্ভব। তারপর  
স্বাস্থ্য ঘাটে সর্বত্রই বেধিতে পাই লেখা  
আছে “ছুট পাখে থুখু ফেলিবেন না—স্বাস্থ্য  
থুখু ফেলিবেন না।” নতুন লোক আসিলে মনে  
করিয়ে “এ দেশের লোকেরা কতই না  
স্বাস্থ্যের জন্ত যত করেন।” ব্যাপার কি?

পুণ্য ফেলিতে হইবে ক্রমালের মধ্যে—সেই ক্রমাল রাখিতে চাইবে প্যাণ্ট বা কোটের পকেটে—অথচ এদেশে প্যাণ্ট বা কোট কখনই খোপার বাড়ী পাঠান হয় না। সুতরাং পুণ্যের বোজ বা ব্যালিসাইগুলি নিজের পরিচ্ছদের ডিউর সংক্রামিত হইতে থাকুক।

এ দেশের একটা প্রবাদ আছে “Cleanliness is next unto godliness” পাজীর একথা বেশী বলেন। আমাদের ইংরাজ অধ্যাপকেরাও ভারতবাসীকে দেখানে লেখানে যখন তখন এই কথা শুনিয়া থাকেন। কারণ আর কিছুই নয়। যাহারা স্বভাবতঃ এবং দারিদ্র্যবশতঃ চিরজীবন অপরিষ্কার থাকিতে বাধ্য তাহাদের নিবট পরিষ্কার থাকাই দেবত্বের সমান হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ভারতবাসীর বিবেচনায় পরিষ্কার থাকা অতি সামান্য মানবতার লক্ষণ মাত্র—ইহা আমাদের পক্ষে এত সহজ ও স্বাভাবিক যে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করাই প্রয়োজন হয় না। আমরা যাহা জন্মাবধি প্রাকৃতিক হ্রসোগে ভোগ করিয়া থাকি এই দেশের লোকেরা তাহা কষ্ট কল্পনা করিয়া জীবনের চরম আদর্শ-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। ইংরাজ যাহাকে দেবত্ব মনে করে আমরা তাহাকে পশুজীবনের প্রতিমাত্র বিবেচনা করি। ভারতবাসী যাহাকে দেবত্ব বিবেচনা করে তাহারা তাহা কল্পনা করিবে কোথা হইতে?

আমরা নদ নদী জলবায়ু আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে এক হইয়া জীবন ধারণ করি। এ সমুদয়ের জন্ত আমাদের কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। আমাদের দৈনন্দিন কার্য কলাপে স্বাধীনতা স্বাভাবিক ও স্বাভাব্যপূর্ণতা বিরাজমান। সামান্য শারীরিক ধর্ম পালন করা বিশেষ কোন উচ্চ আশের কার্য বিবেচনা

করা আমরা বালকোচিত ভাবিয়া থাকি। স্নানাহার, উঠাবসা, চলাফেরা এসব “সামান্য-মন্তব্য পত্রিকাঃ” এগুলি মানুষের পশুধর্ম-মাত্র। এগুলির উপরে উঠিতে চেষ্টা করাই ধর্মজীবনের সাধনা। কিন্তু পাকাত্যেরা এই পর্যন্ত পৌছিতেই গগনবন্দ্য হইয়া যায়। জীবনসংগ্রামের জন্ত সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেই তাহাদের সকল শ্রমাস। তাহাদের সভ্যতার গোড়ার কথাই এই। পাকাত্য-সমাধে জীবনসংগ্রামের কঠোরতা না থাকিলে তাহাদের আধ্যাত্মিকতার অভাব বুঝা যাইবে না।

স্বভাবতঃ ইহারা বহু অন্ধকারের মধ্যে জীবন যাপন করে। একত্র আনকাল আইনের দ্বারা জোর করিয়া চারুশিক্ষক অভিজ্ঞাবকগণকে খেলা মাঠে বেড়াইতে বাধ্য করা হয়। তার পর স্নান করিবার অভ্যাস ইহাদের জন্মে না বলিয়া স্নানকার হইতে নগরের স্থানে স্থানে বৃহৎ “বাথ” স্নানাগার নির্মাণ করা হয়। তাহাতে বিনা পয়সায় লোকেরা স্নান করিবার সুবিধা পায়। কিন্তু অনসংখ্যার অল্পপাতে স্নানাগারের সংখ্যা কিছুই না। সুতরাং স্নানের দ্বারা পরিষ্কার হইবার বাসনা অনেকের মধ্যেই জাগে না। যাহারও বা কিছু জাগে তাহার বাসনা কার্যে পরিণত হয় না। কাজেই Cleanliness is next unto godliness—মন্ত্র পাকাত্য জনগণের একটা আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত রহিয়া যাইতেছে।

(৭) অধ্যাপক প্যাট্রিক গেভিঙ্ক অধ্যাপক প্যাট্রিক গেভিঙ্কের কথা আমরা ভগিনী নিবেদিতার কাছে প্রথম শুনিয়াছিলাম। ইনি ইংলণ্ড, কটল্যাণ্ড এবং আমেরিকার শিক্ষাসংসারে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

উদ্বিদ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান এবং প্রাণ-বিজ্ঞান ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সকল বিজ্ঞানের নিম্ন সমগ্র বিজ্ঞানে প্রয়োগ করিয়া ইনি ব্যাতিশাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি নগর-বিজ্ঞান বা "Civics" এর চর্চায় নিযুক্ত।

ইনি আর মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। এডিনবার্গের প্রাচীন গিরি-দুর্গের পাৰ্শ্বেই ইহার গৃহ। এই গৃহের ভিত্তি ভিন্ন কুঠুরী হইতে সমগ্র এডিনবার্গ নগরীর পুরাতন ও আধুনিক অঙ্গল এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এক সবে দেখা যায়।

বয়সমতে ইহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখা হইবামাত্র ইনি বলিলেন "মহাশয়, আমি প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের চর্চা করিয়া থাকি। কারণেই সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ, নগর, পল্লী ইত্যাদি সকল বস্তুই প্রকৃতির নিয়মামুসারে বৃত্তিতে চেষ্টা করিতে ভালবাসি। আমার বিবেচনায় নগর ও পল্লীগুলি নরনারীর মৌচাক নহে। যে কারণে মধুমক্ষিকারা চাক প্রস্তুত করে মাহুবেলাও সেই কারণে 'বসতি' প্রস্তুত করে। এই বসতিগুলির বৃদ্ধি বিকাশ ও লয় মৌচাকের ইতিবৃত্তের অনুরূপ।" এই কথা বলিতে বলিতে ইনি আমাকে কতকগুলি প্রাচীন নগরের সমসাময়িক চিত্র দেখাইলেন। অধপুত্রের অথর প্রাণাধের প্রাচীরগায়ে অথোথা, পাটালপুত্র ইত্যাদি নগরের এইরূপ চিত্র দেখিয়াছি। কাইরোর মুলবানী সংগ্রহালয়ে ও মক্কা এবং মদিনা নগরদ্বয়ের এইরূপ চিত্র দেখিয়াছি। কান্ট প্রকৃতি নগরের এইরূপ পটও আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইনি এই চিত্রগুলি দেখাইয়া প্রত্যেকটার বিবরণ বুঝাইতে লাগিলেন। কোনটা মার্কুড-

নগরের চিত্র, কোনটা আন্থ্রোপোলজির চিত্র। কোনটা অক্সফোর্ডের চিত্র, কোনটা বা ফ্রান্সের নগরের চিত্র। শেন, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যান্ড, ইংলণ্ড, বর্তমান ইত্যাদি নানাদেশের কতিপয় নগরের পট এইরূপে একসঙ্গে দেখিতে পাইলাম। অধ্যাপক গেভিষ এটগুলির তুলনামূলক আলোচনার প্রবৃত্তি বহিষ্কার করেন। এই আলোচনার ফলেই নগর বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রণীত হইবে। যত-দূর জানি মনে হয়, গেভিষের পূর্বে এ বিষয়ে কেহ হাত দেন নাই। অবশ্য নগরের রাষ্ট্র-জীবন, শিল্প-জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা গ্রন্থই লিখিত হইয়াছে। ফ্রেড্রিক হারিসন, জীম্যান এবং গ্রীণ নগর সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গেভিষের আলোচ্য বিষয় নগরনির্মাণের রীতি। নগরের ভিত্তর গৃহনির্মাণ, পথ সমাবেশ, প্রাচীরসংস্থান, দুর্গ-প্রতিষ্ঠা, বিভাগসংগঠন ও মন্দিরস্থাপন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে বোধ হয় গেভিষই প্রথম আলোচনা করিতেছেন।

এই মানচিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন যুগের। প্রত্যেক চিত্রে গৃহ, দুর্গ, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, বিভাগ, প্রাচীর, মন্দির ইত্যাদি সকল জিনিসই অঙ্কিত রহিয়াছে। আন্থ্রোপোলজির বন্ধের বহুলমূল্যক নোকা এবং অর্থবোধেও চিত্রিত দেখিলাম। সকলগুলি এক সঙ্গে দেখিলে যুগে যুগে গঠনকৌশলের বিচিত্রতা সংক্ষেপে বুঝিতে পাওয়া যায়। একই নগর যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও অঙ্গ-পাতের গৃহ, উদ্যান এবং দুর্গের আশ্রয়ভাষা হইয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলির রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক কারণ এবং প্রভাব বুঝবার সাহায্য হয়। মোটের উপর, নগর-গঠনের ইতিহাস আলোচনা

করিতে বাইরা মানবলভ্যতার ইতিহাসের অল্পতম দিক উন্মোচিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ নগর-বিজ্ঞান সভ্যতা-বিজ্ঞানেরই নূতন এক অধ্যায়।

গেভিগ বলিলেন, “এডিনবারা নগর নগর-বিজ্ঞান-আলোচনাকারীদিগের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রথমতঃ এখানে প্রাচীন অথবা একেবারে নূতন হইয়া যায নাই। প্রাচীনের পার্শ্বেই নবীন পড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক যুগের শৃঙ্খলা, ও বিশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য-জ্ঞান ও কাকর্ষ্য এবং কদম্বতা ও নোষ্টবীনতা এক সঙ্গে এই নগরে দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এডিনবারা নিত্য ক্ষুদ্র ও নয়, জাবার লগনের মত একটা বিশাল জনপদও নয়। নিত্য ক্ষুদ্র হইলে নগরজীবনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য এখানে থাকিত না। অথচ বৃহৎ মহানগর বিশেষ হইলেও এডিনবারাকে নগর বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে হইত।”

ভাড়াহড়া করিয়া নগর নির্মিত হইলে সৌন্দর্যের ব্যাঘাত হয়। যথায়গে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীনকালের নগরে গৃহ, পথ, উদ্ভান—সকল বস্তুই বেশ সামঞ্জস্য সহকারে সন্নিবেশিত হইত। ১৪১৭ খৃস্টাব্দে প্রভাৎে অল্প অল্পে নগরবেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করা আবশ্যক হইল, তখন বাড়ী ঘর স্নাতাঘাট ভাঙিয়া ছুঁরিয়া প্রাচীন সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য ধ্বংস করা হইল। এদিকে নগরের ভিতরও বেসান্বেলি, স্থানান্তর, সর্কারী গলি, বহুতলবিশিষ্ট ঘর, অপরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদির প্রভাব আশ্রয় পড়িল। রূপসজ্জার লজ্জ প্রভুত থাকিয়া নগরের অধিবাসীরা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অলাভলি দিতে বাধ্য হইল।

আজকালও সৌন্দর্যহীনতা এবং অসাম-  
জ্ঞতার অনেক সাক্ষ্য পাইবেন। অষ্টাদশ  
শতাব্দীতে এডিনবারায় এক বিচিত্র সৌন্দর্যের  
ছবি হইয়াছিল। সেই যুগে লর্দার্ন পার্শ্বিক  
কাপ্ত-প্রবর্তিত লর্দার্নবায়ের প্রভাবে এক  
গোপীভূত বৈচিত্র্যহীন লম্বা লম্বা ভবন নির্মিত  
হইতেছিল। সেই সময়ের ভিতর এক  
পাইবেন, সামঞ্জস্য পাইবেন, বৈচিত্র্যের স্থান  
পাইবেন—কিন্তু ব্যক্তিগত পাইবেন না, স্বাস্থ্য  
ও স্বাধীনতা পাইবেন না। যাহাউক  
তাগাতেও একপ্রকার সৌন্দর্যের বিকাশ  
হইতেছিল কারণ তাগাতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের  
অধীনতা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার পর  
রেল আসিয়া জটিল—এবং রেলের আধু-  
নিক নানাপ্রকার নিয়মের লজ্জ কল কারখানা,  
ক্যান্টারী ইত্যাদির আমদানী হইল। এই  
গুলি রেলপথের সন্নিবিষ্টই পুরাতন শৃঙ্খলা  
ভাঙিয়া বিকট মূর্তিতে পাড়াইয়া রহিয়াছে।  
অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈচিত্র্য হীনতার যথো  
বৈচিত্র্য আশ্রিয়াছে বটে; কিন্তু এ কিভূপ  
বৈচিত্র্য? এ যে স্বাস্থ্যের পরশীড়নশীল  
ব্যক্তিগত—এ যে উৎকট নিয়মহীনতার  
তাগব! এই অবস্থায়ই এডিনবারা এখনও  
রহিয়াছে। এই অবস্থায়ই আধুনিক ইউ-  
রোপের বড় বড় নগরগুলিকে দেখিতে  
পাইবেন।”

এইরূপ আলোচনা হইতেছে এমন সময়ে  
গেভিগের একজন শিষ্য ও তরু উপস্থিত  
হইলেন। ইনি প্রমত্তবিশূলের অধিকার  
ঘোষণাকারী “কেবিয়ান” সম্প্রদায়ের লোক—  
তাগদের একজন পাণ্ডা। তিনজন আহারে  
বসিয়া। সেই স্থরে গল্প চলিতে লাগিল।  
আমি নিজস্বা করিয়া, “দেখিতেছি, নগর-  
বিজ্ঞান আলোচনার ফলে আপনি যথায়গে



মহিমা ও গৌরবের পক্ষপাতী হইতেছেন। আপনি কি স্ত্রীর ওঘাণ্টার কটোর স্ত্রীর মধ্যস্থকে কিরাইতে চাহেন? পাশ্চাত্য সমাজের সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবিয়াছেন? ভবিষ্যতে এ দেশের নগর বা পল্লী কোন্ আদর্শে গঠিত হইবে?” গ্রেভিজ বলিলেন, “পারিলে, মধ্যযুগই কিরাইয়া আনিতে চেষ্টা হইতাম। কিন্তু মধ্যযুগের সময় ও রণ-সম্ম। চাহি না। মধ্যযুগের যাবামারি, কাটা-কাটি, রক্তপাত, আতিবিধেৎ এবং ঐক্যের অভাব চাহি না। আমরা মনে হয় মধ্যযুগের আদর্শ সমাজ বেরূপ ছিল আগামী যুগে পাশ্চাত্য সমাজ সেইমুকে বাইবে। জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে সভ্যতার বৈচিত্র্য থাকিবে—পাশনের বিভিন্নতা থাকিবে, শিল্পের ও কৃষির পার্থক্য থাকিবে। অথচ দেশ ভরিয়া (এবং এমন কি স্বদেশের বাহিরেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহ) আদর্শের ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিজ্ঞানের ঐক্য প্রবলিত হইবে—বুদ্ধিবিগ্রহ অগম্য হইবে, বৃত্ত-রাষ্ট্র সংগঠিত হইবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবাহিত হইবে। আমি প্রদেশ মাত্রের শিক্ষা, সভ্যতা ও শিল্পের স্বাভাব্য চাহি। প্রত্যেক region বা জনপদের ভিন্ন ভিন্ন বৈবরিক প্রতিষ্ঠান, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যজীবন এক ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি—এইরূপই আমার মত। এই জনপদ পত্ত (regional) স্বাধীনতা বর্ধন না করিয়া মানব ভবিষ্যৎ সভ্যতা গঠন করিবে।”

আমি বলিলাম “তাহা হইলে আপনি কি আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন, পল্লী-সভ্যতা এবং বৈচিত্র্য-প্রিয়তা চাহেন? কেন না, সময়ে সময়ে রাষ্ট্র

ঐক্য প্রবলভাবে না থাকিলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র চিরকালই সমাজ ও সভ্যতার আদর্শে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য ছিল—অথচ প্রদেশে প্রদেশে, জনপদে জনপদে শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বাণিজ্য, শাসন, শিক্ষা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্যও বিস্তৃত হইত।” ইনি বলিলেন “এইরূপ ঐক্যযুক্ত বৈচিত্র্য চাহি সভ্য কিন্তু আধাণি ও ভারতের দুই দেশেই রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম অত্যধিক ছিল। তাহা চাহি না।”

গ্রেভিজের মতামুসায়ে আমায়ালকার রাষ্ট্রীয় ঐক্য বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। প্রত্যেক দেশে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা-ক্ষেত্র এবং মানব-মৌচাক প্রস্তুত হইবে। অথচ এই মৌচাকগুলি পরস্পর সন্মানসূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। এই সন্মানসূত্রে নানা আকার দেখা বাইবে—(১) বিজ্ঞানগণ্ডে বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকল জাতিকে অর্থাৎ মানব-মৌচাককে একীভূত করিবে। জগতের যে কোন স্থানের মানবমাত্রই বিজ্ঞানের কলভোগ করিবে। (২) রাষ্ট্র জীবনে Federation বা ‘যুক্ত-পাশন’প্রণালী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও জনপদে জনপদে বিবাহ যৌথাসা করিয়া দিবে। International Tribunals বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়গুলি সেই ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিতেছে। (৩) ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত সন্ধিপত্র বা Zollverins এর কণে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কুলিতে অভ্যস্ত হইবে। এইরূপ ঐক্য প্রবর্তনের প্রভাবে জগতের নানা কেন্দ্রে নানাগ্রকার শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, চিন্তাপ্রণালী, কথ্যপ্রণালী, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির বিকাশ হইতে থাকিবে।

পাওয়া যাওয়ার পর 'কেবিনান' সমিতির যুবক সভাপতি লওন চর্চিয়া গেলেন। গেভি-  
জের সঙ্গে আমি চিড়িয়াখানাঘর আসিলাম।  
সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে এটী জুঙ্গি-  
ক্যাল উদ্যান। এক বন্দর মাছ এটী উদ্যান  
ভৈরৱী করা হইয়াছে। এই উদ্যান গঠনে  
গেভিজের হাত ছিল। তাঁহার পরামর্শ  
অনুসারেই উদ্ভানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন  
জন্তু রক্ষা করিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।  
অধিকন্তু পক্ষপণ্ডকে যথাসঙ্গত প্রাকৃতিক  
অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।  
এই সকল স্থান এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতে  
দেখাইতে গেভিজ বলিলেন "কেমন, মহাশয়,  
আমি নগর-নিখাণ বিভাগে পারদর্শী কি না?"  
এই উদ্যানের জানোয়ারগুলির দিকে আমার  
দৃষ্টি বেশী নাই। ইহাদের আবাসস্থান,  
ইহাদের বড়বা ও অঁচবা, ইহাদের প্রাকৃতিক  
ভবন ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেই আমি  
ভালবাসি। এই জন্তু এই বাগান প্রস্তুত  
করিবার সময়ে পরামর্শ দিতে আমি যীকৃত  
হইয়াছিলাম।"

চিড়িয়াখানাঘর পটিনজন পুঙ্খ ও রমণীর  
সঙ্গে দেখা হইল। ইহারা অধ্যাপক গেভি-  
জের জন্তু অপেক্ষা করিতেছিলেন। গেভিজ  
আজ ইহাঙ্গিকে বাগানের জানোয়ারগুলি  
দেখাইবেন কথা ছিল। বাগানটা একটা  
প্রকাণ্ড বিস্তৃত পর্কটপাত্রের অবস্থিত। এখান  
হইতে এতিনবারা সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর  
দেখায়। পাহাড়ের গায়ে কাটিয়া পুষ্করী,  
গম্বর, বন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে।  
যে জন্তু যেদ্রপ স্থানে থাকিতে অভ্যস্ত তাহাকে  
দেখিরাপ স্থান বেচরা হইয়াছে। লোহার  
খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা হয়  
নাই। ইহাই এখানকার বিশেষত্ব। ভারত-

বর্ষ হইতে একটি শিশু হতী আসা হইয়াছে।  
চিড়িয়াখানা সম্পূর্ণ হইতে এখনও ৫-৭ বৎসর  
লাগিবে।

জীবজন্তুগুলি দেখা হইয়া গেলে আমরা  
চা-পানের জন্তু খোটেলে আসিলাম। চা-  
পানের পর আমাদের পক্ষিপণ্ডের মধ্যে একজন  
গাফাইরা গেভিজকে ধস্তাবাদ দিলেন। ইনি  
বলিলেন, "আমাদের এই পদার্থবিজ্ঞান সমিতি  
অধ্যাপক গেভিজের নিকট অভ্যস্ত রমণী।  
ইনিই এই সমিতির কর্মস্বত। ইহার প্রা-  
মর্শেই আমরা ঘেরের তুলনাতা, জীবজন্তু,  
নদ নদী, বন উপবন এবং কৃষিক্ষেত্র, শিল্প-  
কারখানা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হইবার  
জন্তু এই সমিতি গঠন করিখাছি। তাঁহার  
নিকট আমি আপনাদের সম্পাদকভাবে  
সম্মুখাই সাহায্য পাইয়া থাকি। আজ আমার  
তিনিই আমাদের নামক হইয়া তাঁহার আদর্শ-  
হুগারে প্রবর্তিত এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান  
অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। ভবিষ্যতে ইহা  
কেন্দ্র দিকে অগ্রগতির হইবে তাহাও জানিতে  
পারিলাম। ইনি না থাকিলে এত কথা  
বুঝিতে পারিতাম না। ইহার অগ্রহণে  
আমরা কেবলমাত্র জীবজন্তুগুলি দেখিলাম  
না সঙ্গে সঙ্গে একটি জুঙ্গিক্যাল উদ্যান  
প্রস্তুত করিবার প্রণালীও শিখিয়া লইলাম।  
ইনি ৩ ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে কাটাইলেন এজন্য  
আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।"

এই ক্রম বক্রতার পর গেভিজ গাফাইরা  
সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "আমাদের এতিনবারা  
এতদিন যত্না নিবনের অগ্রদূতনাগ ছিল।  
অধি কফল, নবদেহ, ইত্যাদির আলোচনায়ই  
আমাদের নগর প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ  
জীবনের আলোচনার আমরা মনোনিবেশ  
করিতেছি। সম্রাতি করানী পতিত বারগো

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্তুতঃ দিব্যর জন্ম নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার বস্তুতঃ আমরা নূতন দিক হইতে জীবনকে চিনিতে শিখিয়াছি।

আজ এই জীবনমন্ত্র সংগ্রহালয়ে আপনারা উপস্থিত এই বাগানে আশঙ্কাল প্রত্যাহ ২০০১০০ নবনরী উপস্থিত হইয়া থাকেন।

জীবনতত্ত্ব বুঝিবার দ্রষ্টা হটলাওবাণীদিগের এই আগ্রহের কোন গভীর অর্থ নাই কি? আমার বিশ্বাস, আমরা অদ্বিককাল, ইটকাঠ, কলকল্লা ইত্যাদি ছাড়িয়া জীবনবস্তুর কথা, এবং জীবনীশক্তির গুঢ় তত্ত্ব বুঝিতে যত্নবান হইয়াছি।”

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

## গো-দুগ্ধ

মানবজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে দুগ্ধের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া গো-পালন করিয়া আসিতেছে। পূর্বকালে গাভী ধনাদির মতো পরিগণিত হইত; তৎকালাবধি গাভী “গো-ধন” নামে আখ্যাত হইতেছে। আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ইহার দুগ্ধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই গো-দুগ্ধ সর্বত্র বহুবিধ প্রকারে মানবজাতির মঙ্গল সাধন করিতেছে। অতি নৈশব-কাল হইতেই গো-দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার, বার্ডকো ও কল্যাণদ্বারা যখন অল্প কোন প্রকার আহাৰ্য্য আবহা জীর্ণ করিতে অক্ষম হই- তখন একমাত্র গো-দুগ্ধই আমাদের জীবনী- শক্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। হিন্দু-শাস্ত্রে গোপালনে বিশেষ পুণ্য উল্লেখ আছে; হিন্দু- জাতি গাভীকে মাতৃ নামে সম্বোধন করিয়া আপনাকে দত্ত মনে করিতেন। হায়! সে জ্ঞান ও তত্ত্ব এখন কোথায়? তাহা থাকিলে কি পোরাকণে আমরা এমন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতাম, না, আজ বেশ হইতে গোজাতি এত শীঘ্র ভিরোহিত হইতে পারিত? হায়, সে পূর্বকারিণী আর আমাদের মনে নাই। সে তাব আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই এই কৃষিপ্রধান দেশে আমাদের এই

দুর্দশা! কিন্তু আজ পাশ্চাত্য দেশে গোজাতির কিতাপ আদর! এক্ষণে তাহারাই গোজাতির সম্যক দত্ত করিতে শিখিয়াছে; তাই তাহাদের এত উন্নতি। আর আমরা আমাদের জ্ঞানের বিশ্বরণে দুঃখার্ণবে নিপতিত হইয়া নিরন্তর হ্রাসহ বরণা লব করিতেছি।

এক্ষণে এতদ্বশে আর গাভী পূর্বের স্তায় আদৃত হয় না। ইহার প্রয়োজনীয়তা যে আমরা বুঝিয়া তাহা নহে, তথাপি নানা কারণ বশতঃ যথাযথ সেবা করিতে সক্ষম হই না। পূর্বের স্তায় স্বচ্ছন্দ বনজাত আহাৰ্য্য এক্ষণে গাভী প্রাপ্ত হয় না এবং যৎবুদ্ধিও নানা কারণে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বেশ হইতে দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমাগতই হ্রাস হইতেছে; যথা- হুতাদি পাওয়া এক প্রকার দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

গাভীর আহাৰ্য্য বিহারের উপর যে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ নির্ভর করে তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং আজ- কাল যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা শুণে নিতুলিতা প্রাপ্ত হইতেছে। বাহাতে আবার গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া স্বাভাবিক দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

লেবরেটরিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন  
যারা মল উৎপন্ন করা হয়; পলুপোকা তুত-  
পাতা খাইয়া রেশম প্রস্তুত করে; মধুমক্ষিকা  
ফুলের মধু আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে,  
গাভীও তজ্জন নানা প্রকার তৃণাদি গ্রহণে দুগ্ধ  
প্রদান করিয়া থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সি-  
জেন মিশ্রিত করিলেই মল হয় না, উপযুক্ত  
পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান প্রযোগের  
প্রয়োজন। ফুলের মধু ও চাকের মধু এক  
নহে; ফুলের মধু, মক্ষিকার উন্নয়ন হইয়া  
মধুতপে পরিণত হয়। আবার সকল ফুলের  
মধুও এক প্রকার নহে; লগুন ও পদ্ম মধুই  
সর্বোৎকৃষ্ট। তুতপাতা ও রেশমও সেইরূপ  
এক লিখিত নহে। তুতপাতা তক্ষণ করিয়া  
পলুপোকা রেশম প্রস্তুত করে। যদি পোকাক  
বখেট পরিমাণে পাতা না দেওয়া যায়, তবে ঐ  
পোকাক প্রস্তুত কোরা উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত  
পোকাক কোরা অপেক্ষা গুণে অনেক নিকট  
হইবেই।

গাভীও একটা ভগবানের লেবরেটরি।  
ঘাস, পাতা, মল ইত্যাদির বিনিময়ে দুগ্ধাদি  
পরিমোচকারী দুগ্ধ প্রাপ্ত হইবার অন্তই  
ভগবান ইহা আমাধিগকে প্রদান করিয়াছেন।  
এই অন্তই গাভীর তক্ষণ বস্তুর উপর তাহার  
দুগ্ধের গুণাগুণ নির্ভর করে। একটা বস্তুর  
সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সব্বত্র রাখিলে,  
ঐ বস্তুর কিবা বৈশিষ্ট্য সহজে ও উৎকৃষ্টরূপে  
হইয়া থাকে, তজ্জন গাভীকেও যথাবস্ত্রে  
রাখিলে আভ্যাত্তরিক ক্রিয়াস্থানে উৎকৃষ্ট  
দুগ্ধ পাওয়া যাইবে। বৈশিষ্ট্য বাস্তব গাভীকে  
দেওয়া যাইবে, দুগ্ধও তদ্বৎসারে প্রাপ্ত হওয়া  
যাইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, গাভী  
দুর্গন্ধযুক্ত ঘাস খাওয়ায় তাহার দুগ্ধে দুর্গন্ধ  
হইয়াছে; হঠাৎ দুই একটা পেছা খাইতে

পাইলে, তৎপরদিন ঐ গাভীর দুগ্ধও পেছা-  
দুগ্ধের গন্ধ পাওয়া যায়। অতিশয় কলম্বুক  
পদার্থ গ্রহণে গাভীর দুগ্ধ পাতলা হয়, আবার  
সব্বত্রবর্ণের তৃণাদি তক্ষণে হুইটে দুগ্ধ উৎপন্ন  
হইয়া থাকে। উপযুক্ত আহার ব্যতীত  
পলুপোকা বৈশিষ্ট্য উৎকৃষ্ট কোরা প্রস্তুত করিতে  
পারে না, তজ্জন গাভীকেও উপযুক্ত আহার  
প্রদান না করিলে, গাভী দিন দিন দুর্বল  
হইবে আর যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিতে  
সক্ষম হইবে না। জীববাত্তেরই আভ্যাত্তরিক  
নিয়মে শরীরের নিত্যকর্ম আছে; বাস্তবায়ন  
এই ক্ষতি পূরণ করিয়া বাহ্য উত্তর হইবে  
তাহারই কতকংশ দুগ্ধে পরিণত হইবে।

একটা গাভী হইতে কি পরিমাণ দুগ্ধ  
পাওয়া যাইতে পারে তাহা আলোচনা করিতে  
হইলে, প্রথমতঃ গাভীর আতি ও বয়ঃক্রম  
নির্ণয় করিতে হইবে। স্থান ও গুণ বিবেচনা  
গাভীর আতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের  
বাঙ্গালার গাভী এক প্রকার, আবার ভাগলপুর  
ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাভী অন্য প্রকার।  
ইহাদের যেমন আকৃতিতে তেমনই দুগ্ধের  
পরিমাণেও ভ্রাসবুদ্ধি পরিমিত হয়। এই  
সকল প্রভেদসমূহের গাভীর আতি নির্ণয়  
হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গাভীর বয়ঃক্রমের  
সহিত তাহার দুগ্ধের ভ্রাসবুদ্ধি হইয়া থাকে।  
সর্ব সময়ে এক গাভী একই প্রকার দুগ্ধ প্রদান  
করিতে সক্ষম হয় না। গাভী প্রথম প্রসব  
অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রসবে পরিমাণে অধিক দুগ্ধ  
প্রদান করে। আবার গাভীর বয়ঃক্রমের  
সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের পরিমাণও ভ্রাস প্রাপ্ত হইতে  
দেখা যায়। অষ্টম বয়ঃক্রমের উর্দ্ধ হইতে  
গাভীর দুগ্ধ পরিমাণে ভ্রাস হইতে আরম্ভ  
করে। আতিভেদ নির্দিষ্ট হইলেও, নিয়মিত  
গাভী যথানিয়মে বক্ষিত হইয়া উপযুক্ত আহার

প্রাপ্ত হইলে অধিক দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে। আবার উচ্চ শ্রেণীর গাভীও অল্পে উপেক্ষিত হইলে, বরং দুগ্ধ প্রদান করিতে থাকে। দুগ্ধের পরিমাণ অনেকাংশে পালকের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর গাভী হইতে দশ বার সের দুগ্ধ পাওয়া যায়, একগ গাভী বিরল নহে। সাধারণ-গাভী যত্নে পালিত হইলে পাঁচ ছয় সের দুগ্ধ দিতে পারে। উচ্চ-শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গাভী দৈনিক আঠার সের দুগ্ধে অর্ধ মণ পর্যন্ত দুগ্ধ দিতে সক্ষম হয়। ইংলেণ্ডে ক্রমাসত্তঃ বহু ও চেষ্টা দ্বারা সওয়ামণ পর্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে। একগ গাভী বিশেষ যত্নে পালন করিতে হয় নচেৎ সহসা দুগ্ধ কমিয়া যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, যে গাভী পূর্বে অধিক দুগ্ধ প্রদান করিত, বাসস্থানের পরি-বর্তন করিলে আর উচ্চগ দুগ্ধ প্রদান করে না। যদি পরিবর্তিত স্থানে আবার কিছুদিন বাস করে এবং যে লোক দুগ্ধ দোহন করে তাহার সহিত পরিচিত হইয়া আদর ঘর ও উপযুক্ত আহাৰ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই গাভী পুনরায় পূর্বের ত্রায় দুগ্ধ প্রদান করিবে। কখন কখনও শীত গ্রীষ্মে ও আব-হাওয়ার পরিবর্তনে দুগ্ধের পরিবর্তন ঘটয়া থাকে; ইহা আবার কিছুদিনের পর সংশো-ধিত হইতেও দেখা যায়। স্থান প্রভাবে দুগ্ধের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সৈতসেতে শীত প্রদান স্থানে দুগ্ধ পরিমাণে কমিয়া যায়; আবার যে স্থানের বায়ুতে জলকণার অংশ অধিক, বৃষ্টিবা উষ্ণতা সে স্থানে গাভী হুম্ব ও বলিষ্ঠ হয় এবং দুগ্ধও অধিক পাওয়া যায়।

গাভীর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; স্বাস্থ্যকমে দুগ্ধ বরজতা প্রাপ্ত হয়, এবং তন্মধ্যে ব্যাধি প্রবিষ্ট হইয়া পানকাঠীর

অস্থিততা আনয়ন করে। এই প্রকার দুগ্ধ পান করা নিষিদ্ধ। সদা সর্বদা গাভী গৃহে আবদ্ধ রাখিলে স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ সম্ভাবনা ও তৎসঙ্গে দুগ্ধ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আবার সর্ব সময় মাঠে বিচরণ করিতে দেওয়াও সুচিত্র নহে। তথাপি উভয়েই প্রয়োজন; যথা-সময়ে মাঠে চরিতে দিতে হইবে, আবার গৃহে আবদ্ধ করিয়া অল্পকাল ব্যস্ত প্রদান করিতেও হইবে। অনেকের সংস্কার আছে যে, গাভী সর্বদা মাঠে বিচরণ করিয়া উপযুক্ত আহাৰ্য্য গ্রহণ করিলে, তাহার শরীর সুস্থ থাকে এবং অধিক দুগ্ধ প্রদান করে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। একগ ধারণা করা অসম্ভব; কারণ ইহাতে হ্রস্ত শরীর সুস্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি উচ্ছ্বল হইবার সম্ভাবনা। উচ্ছ্বলতা গাভীর পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নহে। গাভী শান্তিপ্রিয় ও নির্ভীক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, শেয়াল এমন ভাবে পালন করিতে হইবে, দাড়াতে মহুযাদি দেখিয়া ভীত না হয় কিম্বা টিঙ্গ না পারে।

দুই বৎসরের নিম্নে গাভীর সন্ধান হয় না। ভাল গাভী তিন বৎসরে প্রায় করিয়া থাকে। প্রসবের পরেই দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে। এমন কি ইহা সন্ধ্যাভাত বৎসর পানার্থে প্রদান করাও নিষিদ্ধ। প্রসবের একমাস্তা পর দুগ্ধ দোহন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; পরে বৎসকে গাভীর নিকট ছাড়িয়া দিতে হইবে, তখন বৎস যথাসাধ্য দুগ্ধ পান করিবে। এইরূপে তিন বিঘল বাহাতে বৎস সম্পূর্ণভাবে দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিতে পারে, তত্ক্ষণ করিতে হইবে; কিন্তু তথাপিও যদি সম্পূর্ণ দুগ্ধ বাহির না হয় তাহা হইলে পুনরায় দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে। এই দুগ্ধ বালকদিগের

পানার্থে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহা হইতে মাখন প্রস্তুত হইতে পারে কিবা ইহা চাও কফিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোথাও বা এই দুই হইতে দধি ও পুডিং প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। প্রসবের পর ষাটদিন দিবসের মধ্যে দুই পানার্থ ব্যবহার করা অকর্তব্য।

দৈনিক দুইবারের অধিক দুই দোহন করা উচিত নহে। ইহাতে উত্তম দুই পাওয়া যায় না, মাখনের অংশ কমিষা যায়, গাভীর প্রকৃতি নষ্ট হয়, দোহন করিবার সময় বিরক্তি প্রকাশ করে, এবং সহস্র দোহন করিতে দেয় না। প্রসবের পর দুই পাতলা হইয়া থাকে; বৎস যতই বড় প্রাপ্ত হয় দুই ও তদুপাতে গাঢ় হইয়া পরিমাণে কমিষা যায়। কিন্তু মাখনের অংশ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন দুই একেবারেই কমিষা যায় তখন মাখনের অংশ অনেক পরিমাণে অধিক হইতে দেখা যায়।

দুই সাধারণতঃ দুই প্রকারে দোহন করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বাঁটের পোড়া হইতে বুদ্ধান্ধী ও তর্জনীর সাহায্যে শেণ পর্যায় টানিয়া দুই বাহির করিতে হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ বাঁট মুটা করিয়া ধরিয়া এক একবার টিপিতে হয় আবার ছাড়িতে হয়। যে সকল গাভীর বাঁট বড়, তাহাদের পেশোক্ত প্রকারে দোহন করাই ভাল। অবশ্য দোহন বিষয়ে প্রকারভেদে বিশেষ তারতম্য নির্ভর করে না। যে দোহনকারী যে ভাবে অভ্যস্ত তাহার সেই প্রকারে দোহন করাই সঙ্গত। দোহনকালে গাভী বাহাতে ভীত বা বিরক্ত না হয় তাহা বিবেচনা করিয়া রাখিতে হইবে। দোহনের কিঞ্চিৎ পূর্বে গাভীকে খাওয়াইয়া তাহার বৎস ছাড়িয়া দিতে হয়;

ঐ বৎস যখন দুই পান করিতে আরম্ভ করিবে, মাড়পেটের বশবর্তী চটয়া গাভী দুই প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তখন ঐ বৎস গাভীর নুনের নিকট ধরিয়া রাখিয়া দুই দোহন করিতে হইবে। দোহনের সময় গাভী তাহার বৎসকে লেহন করে; বাহাতে সে বিষয়ে অসুবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গাভীর অজ্ঞাতে বৎস আবদ্ধ রাখারও প্রথা আছে; গাভী বিরক্ত না হইলে ঐ প্রকারে কোনও দোষ নাই। দোহনের সময় গাভীর পদ্মাপদম্বর কখনও বন্ধন করা উচিত নহে; ইহাতে যে গাভী লাগি না যের সেও এই কৃশিকা করিতে আরম্ভ করে। বাহাদের ঐকপ অভ্যাস হইয়াছে বা লাগি মারিতে থাকে তাহাদের আর উপায় নাই; পদম্বর বন্ধন করিতেই হইবে।

গাভী অতি লাগিগ্রন্থ এবং তাহাকে সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে দেখা যায়; সেইজন্য দোহনের সময় পরিবর্তন করা উচিত নহে। যতদূর সম্ভব স্থানও পরিবর্তন না করাই সঙ্গত। যে লোক দান দান করে, সে যদি দোহন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার ষাটাই দোহন করান কর্তব্য। তথাপি যে সচরাচর দোহন করিয়া থাকে তাহাকে সহস্র পরিবর্তন করা উচিত নহে।

গাভী তাহাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহারা না আসিলে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং সম্পূর্ণ দুই প্রদান করিতে চাহে না। দোহনের সময় গাভীকে নির্দিষ্টভাবে প্রহার করা উচিত নহে। দোহনকাধ্য যত সম্ভব হওয়া সঙ্গত, তাহাই করা কর্তব্য, নচেৎ গাভী বিরক্ত হয়। এই কার্য দেখিতে যত সঙ্গত প্রকৃতপক্ষে তত সঙ্গত নহে, ইহারও

শিক্ষা প্রয়োজন। ইচ্ছা করিলেই বোম্বাল হওয়া যায় না। দেখা গিয়াছে, একটী ভাল বোম্বাল যে সমস্তের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রুত বোহন করিবে, অনভ্যস্ত বোম্বাল তাহার বিত্তন সময়েও তদ্বৎ পরিমাণ দ্রুত বাহির করিতে সক্ষম হইবে না। বোম্বাল পরি-বর্তনের কিছুদিন পরেও যদি গাভী বিরক্তি প্রকাশ করে তাহা হইলে ঐ নূতন বোম্বাল পরিবর্তন প্রয়োজন। নূতন বোম্বালের নিকট গাভী প্রথমতঃ বিরক্তি প্রকাশ করিলেও সে যদি স্নেহশীল হয়, গাভী তাহাকে অবশেষে ভাল বাসিয়া থাকে। দ্রুত বোহনের পাত্র মাটির, তামার, কাশার, টিনের বা অন্যমেলের হইতে পারে, কিন্তু সেগুলি বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। পরিষ্কার করিবার সময় গরম জল দ্বারা ঘোঁষ করা উচিত এবং ধাতুপাত্র হইলে তখন দ্বারা পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

যদি প্রসবের কিছুদিন পরে গাভীর বৎস মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রকার আর একটী বৎস সংগ্রহ করা উচিত; তাহার পর এই বৎসের মস্তকে, পাত্রে ও নাভিতে সেই গাভীর দ্রুত লাগাইয়া সমুখে ধরিতে হইবে। নিম্নের দুইয়ের মধ্যে গাভী তাহার বৎস মনে করিয়া তাহাকে লেহন করিতে আরম্ভ করিবে এবং দ্রুত বোহনে আর বাধা দিবে না; কিন্তু তথাপিও যদি দ্রুত বোহনের ব্যতিক্রম হয় বা তদ্রূপ বৎস সহসা সংগৃহীত হইয়া না উঠে, তখন সেই দ্রুত বৎসের চর্খ ট্যান করা-ইয়া উহার মধ্যে বড় ইত্যাংগি ভরিয়া বোহনের সময় গাভীর নিকট ধরিতে হইবে। তাহাতে গাভী নিম্নের ক্ষীণিত বৎস ভাবিয়া লেহন করিবে ও দ্রুত প্রবাহে বাধা দিবে না। কিন্তু এই স্থলে আর একটী কথা জানা আবশ্যক।

যে, যদি ঐ বৎস কোন সাক্ষাতিক ব্যাধিতে মরিয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণ না কড়াই সম্ভব, কারণ চর্খলেহনে গাভীও সেই ব্যাধি-গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

অনেক সময় গাভীর অনাকাটা বিশেষ আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠে। অনেক গাভীর অন প্রসবের পর স্বভাবতঃই কাটিয়া যায়। কখন বা বোহনকারীর দোষেও ঐরূপ ঘটয়া থাকে; ইহা ব্যতীতও বৎস যদি বাট অধিক চাপিয়া চুবিয়া দ্রুতপূন করে, তাহা হইলেও ঐরূপ ঘটতে পারে। এক্ষণস্থলে বৎসকে অধিকক্ষণ দ্রুতপান করিতে দেওয়া উচিত নহে। বাট কাটিলে দ্রুত বোহনের সময় গাভী কষ্ট অহুভব করে এবং বোহন করিতে দিতে চাহে না। তখন বলপূর্বক বোহন করা উচিত নহে, ইহাতে গাভীর অহুবিধা হওয়ায় দ্রুত কমিয়া যায়। পরিবার তৈল, মোম ও চর্কি সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া গরম করিলে যে মলম প্রস্তুত হইবে, উহা বাটে লাগাইলে বাটকাটা সারিয়া যায়। এমন কি, প্রসবের পর মালোবধি এই মলম বাটে লাগাইলে বাট সহসা কাটিতে পারে না। বাট কাটিলে এই ভেদ্য ব্যবহার করা সম্ভব, বলপূর্বক বোহন করিয়া গাভীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। বোহনের পূর্বে বাটে মাখন লাগান উচিত; ইহাতেও বাট কাটে না। বাটে পরিবার তৈল লাগাইয়া দুইয়ের দ্বারা ভিজাইবার প্রথা আছে, বাহা হউক বাহাতে বাট কাটিতে না পারে এক্ষণ কিছু করিতে হইবে। বোহনের পর গাভীর অন মুছিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ বাট কাটিবার সম্ভাবনা।

দ্রুত-বোহনের পূর্বে গাভীকে কিছু খাওয়ান প্রয়োজন। তৎপরে যথা সময়ে ও যথা নিয়মে দ্রুত বোহন করিতে হয়। তাহাতেও যদি

দুগ্ধের পরিমাণ ক্রাস হইতে থাকে, তাহা চাইলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, গাভীর শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণতঃ অকীর্ণতা বলতই কীর্ণতা ঘটিয়া থাকে। ইহা বৃত্ত শীঘ্র আরোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, এবং তৎক্ষণতঃ সহনশীলতা থাকার প্রয়োজন। ইহাতেও অল্প না হইলে, কণ্ডিসন পাউডার অর্ধ ছটাক অথবা এক ছটাকে চতুর্থাংশ জলে বিছা খায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করাইতে হয়। বৎসের অগ্রখে ইহার অর্ধেক পরিমাণ ব্যবস্থা। ইহাতে অকীর্ণতা দূর হইয়া গাভী পূর্ণস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। কণ্ডিসন পাউডার প্রস্তুত করিতে হইলে, সমান ভাগে বিট লবণ (Black salt), গন্ধক, ভুট, চিরতা, আডুইন (Bishop seed) রাই, মসুর, ও মেথির (Mathee) সহিত ইহার অর্ধ পরিমাণ কর্পূর চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। ব্যবহারের নিয়ম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদি অল্প কোন কারণে অল্পই হওয়ার দুগ্ধ কমিয়া যায়, তাহা হইলে পপেতার পাতা, পাকা কল ও ময়লা জলের দ্বারা বাঁটিয়া গাভীকে বাঁধাইতে হইবে এবং দুই তিন দিনের অন্তর, বৎসকে গাভীর নিকট ছাড়িয়া রাখিতে হয়; তাহা হইলে বৎস পুনরায় দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিতে সক্ষম হয়।

প্রসবের পর কতদিন পর্ষাদ গাভী দুগ্ধ প্রদান করিবে তাহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সমস্ত গাভী একই নিয়মে দুগ্ধ প্রদান করে না।—কোন কোন স্থলে এমন কি, এক প্রসব হইতে অন্ত প্রসব পর্ষাদ দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাখাপি সচরাচর গাভী চতুর্থ মাস পর্ষাদ ভালভাবে দুগ্ধ প্রদান করে। তৎপর বষ্টমাসে দুইতে দুগ্ধ অল্প অল্প

করিয়া কমিতে আরম্ভ করে। প্রথম মাসে একবারেই দুগ্ধ কমিয়া যায়। ইহার পরও দুগ্ধ পাওয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য এবং তাহাতে বিশেষ কোন আশা বা শক্তি থাকে না। প্রসবের দুই মাস পূর্বে আর দুগ্ধ দোহন করা উচিত নহে। ইহাতে গাভী দুর্জল হইবে এবং তাহাতে ইহার অনেক সময়ই অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাভী দশ মাসে প্রসব করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যথা নিয়মে দুগ্ধ পাওয়াই বাধ্য কাজেলে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, কারণ যে সময়ে একবার শুষ্ক শুকাইয়া যায়, পুনরায় সেই সময়েই দুগ্ধ শুকাইয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। দেখা গিয়াছে যে দ্বিতীয় বারে, সেই সময় দুগ্ধ শুকাইবার উপযুক্ত কাল না হইলেও, শুষ্ক শুকাইয়া যায়। সেইজন্য দ্বিতীয় বারোতে সহসা দুগ্ধ না শুকাইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

গাভীকে উপযুক্ত খাদ্য প্রদান ও স্বেচ্ছাচার করিলেই স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ পাওয়া যায়। অধিক দুগ্ধ পাইবার লক্ষ্যে আশ্রমে গাভীকে অধিকতর খাদ্য কখনও প্রদান করা সম্ভব নহে। ইহাতে গাভী অসুস্থ হইয়া পড়ে, এবং পরিণামে স্বাস্থ্যতক হওয়াই দুগ্ধ কমিয়া যায়। যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা পাতলা এবং পান করিলে ব্যাধি উৎপাদন করে। এইজন্য পাতলা অধিক দুগ্ধ অপেক্ষা গাঢ় বর দুগ্ধই উত্তম। অধিক দুগ্ধের আশায়, এইজন্য পাতলা দুগ্ধের প্রয়োগ হওয়া উচিত নহে। অনেক দুগ্ধ অধিক পাইবার জন্য গরম জলের মধ্যে ভুঁই, ময়লা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া গাভীকে খাইতে দেয়; আবার কোন কোন স্থলে জলে লবণ



সমুদ্র করিয়া গাভীকে পান করিতে দেওয়া হয়। গাভী এই লবণাক্ত জল পান করিয়া তৃষ্ণাতুর হওয়ার অধিক জল পান করে; ইহার ফলে পরিমাণাধিক দুগ্ধ পাওয়া যায় লভ্য, কিন্তু গাভীর স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভঙ্গ হয়। অবশ্য এই সকল পদার্থ যে গাভীর পক্ষে একেবারে অহিতকর তাহাও নহে; তবে অধিক দুগ্ধ পাটবার আশায়, প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করা কখন সম্ভব নয়।

বড় বড় সহরের কোন কোন স্থলে গো-দোহনের অল্প কৃৎসাদি বেওয়াতপ জীবাণু প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রথা বাহাতে সর্বজোড়াভে তিরোহিত হয়, তজ্জন্ত সকলেরই বহুপরিষ্কার হওয়া উচিত। কেননা ইহার ফলে গাভীর পুঞ্জোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়, এবং দুগ্ধও বিকৃত হওয়ায়, মানব-শরীরে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি প্রবেশ করে, মোহনকালে গাভী কষ্টে ছটিকট করে, তাহার মুখ মলিন হয় এবং তাহার সমুখে থাকে তাহাদের প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। আত্ম দুগ্ধ পাইবার আশায়, আমরা ভবিষ্যতের প্রতি একটুকুও দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। এই কুপ্রথা আরও জীবন ফল এই, গাভী পরিণামে বংশপারনে সক্ষম না হওয়ায়, দুগ্ধ কুয়াইলে তাহা হইতে আর কোনও উপকার লাভের আশা নাই মনে করিয়া অনেক জ্বররহীন অকৃতজ্ঞ পোক গাভীকে কপাইয়ের হাতে বিক্রয় করিয়া অর্থ লভ্য করে।—আমরা যদি এই কুপ্রথা আমাদের দেশ হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে এত শীঘ্র গাভী, হত্যার অল্প আর বিক্রীত হইবে না; যথা সময়ে সেই গাভী আবার বংশ প্রসব করিয়া আমাদিগকে দুগ্ধ দানে সক্ষম হইবে, এবং এতদ্ব্যতীত হইতে গো-বাতির সংখ্যা এত শীঘ্র হ্রাস হইবে

না। দিন দিনই গো-বাতি দেখে হইতে তিরোহিত হইতেছে। এখন আর আমাদিগকে নীরব থাকি উচিত নহে। বাহাতে গো-সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায়, আবার অর্থা-কৃষি ভারতে গোমাতা সমৃদ্ধ হইয়া তাহার শীঘ্র-পুত্রিত দুগ্ধ দানে আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে পারে, তাহার অল্প আমাদের সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। এই দানে এক প্রকারের অবতারণা হইতে পারে যে, কলিকাতার দ্বার সহরে গাভীর দুগ্ধ শুকাইয়া সেপে তাহাকে পুনরায় পালন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়, অগত্যতঃ যাহা যায় হয় পরিণামে তাহা লাভেই কারণ হইয়া থাকে। খরচ না করিলে যে লাভবান হওয়া যায় না তাহা সকলেই অবগত আছেন, ইহাও সেই লাভের অঙ্গই করিতে হয় :—অতি উৎকৃষ্ট গাভীও হত্যার অল্প বিক্রীত হইলে অতি মূল্যে হইয়া থাকে; আবার সেই গাভীকে বিক্রয় না করিয়া পালন পালন করিলে, সে প্রসবের শক্তি লাভ করিয়া পুনরায় প্রসব করে; তখন কি তাহার দুগ্ধের অল্প মূল্য অধিক হয় না? বংশেরও বংশান্তর মূল্য হয়। সুতরাং প্রথমতঃ যে অতিরিক্ত ব্যয় মনে করা যায়, তাহা পরিশেষে লাভের বিষয় হইয়া পড়ায়। বাহায়া এই নিয়মে গোপালন করিয়া আসিতেছে, তাহার লাভের বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে সন্দেহ নাই।

অনেক স্থলে এইরূপ প্রথা আছে যে, গাভীর দুগ্ধ কুয়াটলে তাহাকে কোন ভূপূর্ণ কেজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ স্থানকে বাধান বলিয়া থাকে, ইহাতে মল খরচেই গাভী রক্ষিত হইতে পারে, এবং উন্মুক্ত বায়তে

বিচরণ করিয়া নব নব তৃণাদি উৎক্ষেপে গাভীর  
স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া থাকে। ইহার ফলে,  
বলিষ্ঠ বৎস ও অধিক দুগ্ধ পাওয়া যায়।  
ঔষধি সোপানলন করিয়া লাভবান হইতে  
ইচ্ছা করেন, তাহানিগের সহরের বাহিরে  
জমি রাখা আবশ্যক। গাভীর দুগ্ধ ফুরাইলে  
তাহাকে সেই স্থানে প্রেরণ করিতে হয়।

গাভী ও তাহার দুগ্ধ সম্বন্ধে যথাসম্ভব  
উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে দুগ্ধের প্রকার  
ও গাভীর বর্ণাভূষণের তৎপরিবর্তন সম্বন্ধে  
আলোচনা করা যাউক।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বৃদ্ধিতে পায়া  
যায় যে, সকল গাভীর দুগ্ধ এক প্রকার নহে।  
গাভীর বয়োবৃদ্ধির লগ্নে ও প্রসবের পর দুগ্ধের  
পরিমাণ ও বর্ণ প্রভৃতির পার্থক্য লক্ষিত হয়,  
অর্থাৎ অল্প বয়সের গাভীর দুগ্ধ বেতুন,  
বয়ঃপ্রাপ্ত গাভীর সেক্তন নহে,—আট বৎসরের  
অধিক হইতে গাভীর দুগ্ধ সাধারণতঃ কমিতে  
থাকে এবং বৎস ততই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, গাভীর  
দুগ্ধও ততই অল্প হইতে আরম্ভ করে।  
অল্পতার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের গুণেরও ভারতম্য  
জন্মে। দুগ্ধ অল্প হইতে থাকিলে, মাখনের  
পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়; পক্ষান্তরে  
গাভীর বর্ণাভূষণের দুগ্ধেরও প্রকার ভেদ  
উপস্থিত হইয়া থাকে। কাহারও তুঙ্গ ঘন,  
কাহারও পাতলা, আবার কাহারও বা  
নীলাভবুজ হইতে দেখা গিয়া থাকে।

দুগ্ধ ত্রিবিধ; প্রথম প্রকার দুগ্ধের বর্ণ  
হরিদ্রাভ। ইহাতে তৈলাক্ত পদার্থের পরিমাণ  
অধিক থাকায়, অতিরিক্ত মাখন পাওয়া যায়;  
সাধারণতঃ লোহিতবর্ণের গাভী হইতে  
এইরূপ দুগ্ধ পাওয়া গিয়া থাকে। দ্বিতীয়  
প্রকার দুগ্ধের বর্ণ শুভ্র, ইহা অত্যন্ত গাঢ়;  
ইহাতে কেজিনের অংশ অধিক থাকায়, ইহা

হইতে উত্তম দধি ও নানাপ্রকার বলকারক  
খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; কৃষ্ণবর্ণের গাভী হইতে  
এই প্রকার দুগ্ধ পাওয়া গিয়া থাকে। তৃতীয়  
প্রকার দুগ্ধের বর্ণ ঈষৎ নীল। ইহা পাতলা,  
পূর্ণের ত্রায় গাঢ় নহে; কিন্তু আবারনে  
মিষ্টাভাববুজ। ইহাতে সব, মাখন ও দধি  
অধিক প্রস্তুত হইতে পারে না; কিন্তু ইহা  
সহজ পাচ্য ভক্ত বালক ও রোগীদিগের পক্ষে  
বিশেষ উপকারী। শুভ্রবর্ণের গাভী হইতে  
এই প্রকার দুগ্ধ পাওয়া যায়। দুগ্ধের  
বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিবার ক্ষমতায় ল্যাকটো-  
মিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত  
হইয়াছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধে জল মিশ্রিত কিনা  
তাহা জানিতে পায়া যায়। কিন্তু ইহাতে  
নিঃসংশয়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না;  
কেননা, ইহার দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে  
হইলে, দুগ্ধ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন;  
কারণ, যেমন দুগ্ধের সারাংশ (Solids) জল  
হইতে ভারি, তত্ৰূপ মাখন আবার জল  
অপেক্ষা হালকা। ভারি পদার্থ জলে ভুবিয়া  
যায়, এবং হালকা পদার্থ জলে ভাসে; সুতরাং  
মাখন ভাসিতে থাকে, ভুবে না। এক্ষণে যে  
দুগ্ধে সারাংশ অধিক তাহা, যে দুগ্ধে মাখনের  
অংশ অধিক তাহা অপেক্ষা ভারি এবং যে  
দুগ্ধে সারাংশ ও মাখন উভয়ই কম তাহা  
সর্বাপেক্ষা হালকা; সুতরাং ল্যাকটোমিটারের  
পরীক্ষা, এই তিন প্রকার দুগ্ধে কখনও এক  
হইতে পারে না। যে দুগ্ধে সারাংশ অধিক  
তাহাকে বিশুদ্ধ মনে করিলে, যে দুগ্ধে মাখনের  
অংশ অধিক তাহাকে বিশুদ্ধ মনে করা হইতে  
পারে না এবং তাহা হইলে তৃতীয় প্রকার  
দুগ্ধকেও জল মিশ্রিত দুগ্ধের দ্বায় পরিচয়  
করিতে হয়। মাখনবুজ দুগ্ধ উৎকৃষ্ট ও বল-

কারক; ঐ ঘর সাহায্যে ইহার বিস্তৃততা নিরূপিত হয় না। তৃতীয় প্রকার দ্রুত, যাচা রোষী ও বালকদিগের পানার্থে বিশেষ উপ-  
যোগ্য, তাহাও ঐ ঘরের পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত  
হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার দ্রুত  
অনুমিলিত করিও, তাহাতে যদি কিছু শর্করা  
দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা ল্যাকটোমিটারে  
বিস্তৃত দ্রুত বলিয়া নিরূপিত হইবে। অল  
মিলন এই ঘর কিছুতেই ঘটিতে পারে না।  
একণে প্রসন্ন হইতে পারে যে, এই ঘরের কি  
ভাবে কিছুই উপকারিতা নাই? এবং দ্রুতের  
বিস্তৃত্যই বা কি প্রকারে পরীক্ষিত হইবে?  
ইহার উত্তরে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে  
যে, ইহা দ্রুতের বিস্তৃততা নিরূপণ করিতে  
অনেক পরিমাণে সক্ষম, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে।  
যাহারা চর্মেব বিষয় কিছুই জানেন না, কেবল  
বস্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক, ইহা  
ঔষধের পক্ষে সম্পূর্ণ দোষবৃত্ত হইবে না।  
পক্ষান্তরে যাহারা দ্রুতের শুণ্যগুণ লক্ষ্যে  
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারা এই  
ঘরের দ্বারা দ্রুত পরীক্ষায় অনেক সাহায্য  
পাইবেন সন্দেহ নাই। অনেকে হস্তে দ্রুত  
রাখিয়া অস্ত্র হস্তদ্বারা উহাতে আঘাত করিয়া

অল নিরূপণ করিয়া থাকে। কোথাও বা  
কেহ কেহ রটি কাগজ বা শুক কাপড় দ্বারা  
দ্রুতের অল নিরূপণ করিয়া থাকে; ইহাও  
অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যদি কেহ  
বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত পরীক্ষা করেন,  
তাহা হইলে কিছুদিন পরে যে জান কল্পে  
তাহাতে ঘরের সাহায্য ব্যতিরেকেও দ্রুত  
পরীক্ষার কোন বাধা অস্তিত্ব না।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদী একটা ভগবানের  
ল্যাবোরেটরী। এই চিত্রার ফলে শুনিতে  
পাই, পাচ্চাতাদেশে নাকি একটা কল  
উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহাতে খোল, তুসি,  
খড়, অল ইত্যাদি প্রদান করিয়া ঢালাইলে  
উহা হইতে অস্বাদু দ্রুত নির্গত হইয়া থাকে।  
মানবের চিত্তাশক্তিপ্রভাবে ইহাঙ্গণারে কি  
হইতেছে আর কি হইবে, তাহা যনে করিলে  
শ্রুতি হইতে হয়। আশা করি ভগবৎ  
কৃপায় এই বুদ্ধিপ্রভাবে আবার আমরা  
গো-আতির উন্নতিসাধনে বহুশ্রমিক হইব।  
আবার গৃহে গৃহে গো-পালন হইলে, আমরা  
সেই গো-অননীর অমৃতনির্যাসী দ্রুত পান  
করিয়া আবার সতেজ ও পুনঃ শৌবনীশক্তি  
লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ত্রিকেরাননাথ চৌধুরী।

## বয়েকটি বিভিন্ন-জাতীয় জামগাছের পরিচয় \*

ইউজিনিয়া **Eugenia**

No. **Myrtaceæ**. Myrtle Family.

ইংরেজী ভাষায় মিরটল (Myrtle) অর্থে  
মেসি জাতীয় গাছকে বুঝায়। ইউজিনিয়া

জাতীয় গাছমাত্রই মিরটল অর্থাৎ মিরটেলি  
(Myrtaceæ) পরিবারভুক্ত। ইউজিনিয়া

(Eugenia) নামে মানা জাতি বৃক্ষ ও গুল্ম আছে। গুল্মজাতির বিবরণ গুল্মসংগ্ৰহে লিপিত হইয়াছে। এখানে কেবল বৃক্ষজাতির বিবরণই লিপিত হইল। ইহাদের কোন কোন জাতি উদ্যান বোডাকর ও কোন কোন জাতি ফলপ্রসূ। আবার কোন কোন জাতি সারবান বলিয়া আধিক্য উদ্ভিদসমূহে পরিগণিত। কোন কোন জাতি ঔষধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশ জাতিই আরবর। ইহাদের সকল জাতিই চাষ ও গাছ উৎপাদন প্রণালী একরূপ নহে। সুতরাং ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির চাষ ও গাছ উৎপাদন প্রণালী স্বতন্ত্ররূপে লিপিত হইল। এই পরিবার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতিই মন্থা জাতির বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে।

১। ইউজিনিয়া জাম্বোলানা Eugenia Jambolana- Syn. Syzygium Jambolana. কালজাম *Tambo*. ইহা অতি বৃহৎ বৃক্ষ। ইহার গাছ ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়; দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহার পাতা বর্গাকার; অগ্রভাগ সরু; ৪:২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২:৩ ইঞ্চি পার্শ্ব বিশিষ্ট হয়। ইহার পত্রবৃদ্ধি বৎসর; পাতা গাঢ় সবুজবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ইহা পুষ্ণিত ও ফলিত হয়। ইহার পুষ্ণি অনবস্থিত। বর্ষাকালে ইহার ফল পরিপক হয়। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। উহা রসাল। ইহার রসক ফলের রস নীলাভ বেগুনে বর্ণ; অম্লমধুর রস যুক্ত; খাইতে সুস্বাদু ও মৃণ্মোচক। ইহা পাক্তা প্রদেশে চাষে উপযোগী নহে ১০০০-১০০০ ফোটার ফুট উচ্চ পাহাড়ের উচ্চ স্থানে ইহার চাষ হইতে পারে। ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে ইহার

জন্মস্থান এদেশীয় প্রাচীন যবে ইহার কৃষি কৃষি প্রথমে প্রাপ্য হওয়া যায়। এদেশীয় প্রাচীন যবে ভদ্রবীপ নামে যে একটি দ্বীপের উল্লেখ আছে উহাও ভারতবর্ষ, ইহা পৃথিবীর সমুদ্রপথে অস্থগত দ্বীপ বিশেষ। ইহার আকৃতি পত্রকোষের মধ্যবর্তী কোষের দ্বারা অর্থাৎ ইহা পত্রকোষাকার বা ত্রিভুজাকৃতি। নীলপঙ্কজের দক্ষিণ ও নিম্নের উত্তর স্থান নামে, এক সনাতন বৃক্ষ (জাম) বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের নামোচ্চারণেই ভারতবর্ষ ভদ্রবীপ নামে আখ্যাত হইয়াছে।

“দক্ষিণে নতুনীপত্ৰ নিমন্তোত্তরেননত্।

স্থানমি নাম মহান্ ভদ্রবৃক্ষ: সনাতনঃ।

তত্ত নার্য সনাখ্যাতো ভদ্রবীপ সনাতনঃ।”

সংস্কৃত ইহার তিনটি জাতি, এদেশের নিম্ন প্রদেশে দৃষ্টগোচর হয়। একটীর ফল ত্রুজাকার, প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩/৪ ইঞ্চি পাত ও এক ইঞ্চি স্থল হয়। ইহাই সাধারণ জাতি। দ্বিতীয় জাতির ফল বৃহৎ; প্রায় ২:১ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১/২ ইঞ্চি স্থল হয়। ইহাও ব্রহ্মাকার। তৃতীয় জাতির ফল বৃহৎ; প্রায় ত্রিভুজাকার; ১:২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রায় ১/২ ইঞ্চি স্থল হয়। ইহাকে মোগামায় (Mammoth blackberry) কহে। ইহা অতিদূর মায়েল ও উৎকৃষ্ট জাতি। ইহাদের আধিক্য অধিবাস উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব। অধুনা ভারতবর্ষের সর্বত্র ইহাদের চাষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার এদেশের সর্বত্র এবং সকল প্রকার মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে। ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় না। ইহাদের চাষ প্রণালী ঠিক মোলক। জামকলের চাষ প্রণালীর অনুরূপ। ৩০ হাত অল্প অল্প ইহাদের গাছ রোপণ করিতে হয়। বীজ খারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমূল্য পাওনা দায়। উহা অনন্যর স্বাদ বিশিষ্ট ও সুগন্ধ। পশ্চিম ও শূণাল, ভল্লুক প্রভৃতি পতঙ্গগণ ইহার ফল খাইতে ভালবাসে। ফল পাকিলে ইহার গাছ নানা রাস্তা পক্ষীর বিচরণ কৃষি হইয়া থাকে। ইহার ফল, পত্র, বহুল, ফলশ্রুত ও বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠ পাতলা চকোলেটবর্ণ, শুষ্ক, মৃদু, ঘনমানবৃত্ত, ও দীর্ঘস্থায়ী। ইহার কাঠ দ্বারা তক্তা ও ফালি (scantling) প্রস্তুত করিয়া ৪৭ দিন উহার উপরে ভাত দিয়া (ভারি বস্তুর চাপ) রাখিতে হয়। তৎপর উহাকে ৪৭ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া জল হইতে উঠাইয়া ঘরের ভিতরে রাখিয়া শুষ্ক করিলে উহার তক্তা দীর্ঘ স্থায়ী হয়। এবং উহা কীট কর্তৃক আক্রান্ত হয় না। উন্নত দ্বারাও বাকিয়া যায় না। পূর্বেকৃত রূপে ইহার তক্তাকে প্রথম চাপে রাখিয়া তৎপর জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করার নাম পাইনট করা। ইহার তক্তা বা ফালি করিতে হইলে ২৫:৩০ কি ৪০ বৎসরের অনূর্ধ্ব বয়সের গাছ ব্যবহার করিতে হয়। ইহার উর্ধ্ব বয়সের গাছের সাধারণ কর পাইয়া ভিতরে গহ্বর হইয়া যায়। সুতরাং উহার কাঠ একবারে অব্যবহার্য হয়। ইহার তক্তা ও ফালি নানা কার্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। ফালি ও তক্তা দ্বারা ঘরের তীর, বর্গা, চোকাঠ, কপাট, ও তক্তাপোষ (চোকা) প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কাঠ জলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহার বহুল ব্যয়ক ও কষায়। ইহা হইতে পীপল বর্ণ ও পীপল বর্ণের ছায়া যুক্ত নানাবিধ বর্ণ প্রস্তুত হয়। যে সকল ক্ষয়কারক (Corrosive) পদার্থ সংযোগে এই সকল বর্ণ প্রস্তুত করা হয় উহাদের

পরিমাণানুসারে ইহাদের তির তির বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইহার ফল দ্বারা নানাবিধ উৎকৃষ্ট আচার (Preserve) প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা ইউরোপ দেশজাত কন্টুরেন্ট (currant) নামক ফলের চাটিনীর আবাদযুক্ত। খাইতে সুস্বাদু। প্রতি বৎসর ইহার শুষ্ক ফল ভারত-বর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় কন্টুরেন্ট ও ওয়েলস্‌জাত অন্তান্ত ফলের চাটিনী সুস্বাদু করার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। ইহার ফলের শত্রু দ্বারা তথায় একরূপ মদ্যিরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাও সুস্বাদু। ইহার শুষ্কফল এবেল হইতে বিশেষে রপ্তানী হইয়া থাকে। অধুনা রপায়ন-তত্ত্ববিদ মানবীয় ত্রীমূলক প্রস্তুত চন্দ্র রায় মহাপণ্ডের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার বেঙ্গল কোমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল (Pharmaceutical) ওয়ার্কস্‌ নামক রাসায়নিক কারখানায় ইহার একরূপ আয়ক প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে। উহা সুস্বাদু ও বহুমূল্য পীড়ার মহৌষধ। ইহার বীজ দ্বারাও একরূপ আয়ক প্রস্তুত হইতেছে। উহাও বহুমূল্য পীড়ার মহৌষধ। আমূল্য ইউরোপ হইতেও ইহার ফলের ও বীজের আয়ক প্রস্তুত হইয়া বিশেষে রপ্তানী হইতেছে। উহা অতিশয় উচ্চমূল্যে আমেরিকা ও অন্তান্ত দেশে বিক্রয় হইতেছে। অধুনা পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই এই ফল সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ইহা প্রচুর পরিমাণে যোগাইবার লোকান্তার বশতঃ ইহার ব্যবহার এখনও উন্নতি লাভ করিতেছে না।

ইহার চাষে অধিক অর্থ ও শ্রম ব্যয়ের আবশ্যক হয় না। এক বিঘা জমিতে

সামান্যিক ১৬টী গাছ রোপণ করা যাউতে পারে। উত্তম ফল হইলে, বয়ঃপ্রাপ্ত প্রাতি গাছ হইতে প্রাতি বৎসর অনুমান ৩৪ টাকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার গাছ রোপণ করিয়া ২১০ বৎসর সামান্য যত্ন করিলেই উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পশুগণ ইহার পাতা খাইতে ভাল বলে না। সুতরাং ইহার গাছ পশুর উপদ্রব হইতে রক্ষিত। ৭৮ বৎসরে ইহার গাছ ফল ধারণ করিয়া থাকে। ২০১২৫ বৎসর বয়সের সময় ইহা বহু ফল ধারণ করিয়া থাকে, ইহার গাছ শতাধিক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং দীর্ঘকাল ইহার উপযত্ন ভোগ করা যায়। ইহার কাঠ, বহল, ফল ও বীজ সকলেই ব্যবহার্য। সুতরাং ইহার চাষ লাভ-জনক উদ্ভিদ আর নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। ৮১০ বিঘা জমিতে ইহার চাষ থাকিলে ক্ষুদ্র পরিবারবিশিষ্ট চতুঃপাশ্বে ভারতবাসীর পারিবারিক ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্বাহিত হইতে পারে। একবার কষ্টে খুটে কতকগুলি গাছ জম্মাইতে পারিলেই দীর্ঘকাল ইহার ফল ভোগ করা যায়। সকল প্রকার ভূমিতেই ইহা জন্মে। বালি ও কঙ্করময় অব্যবহার্য জমিতেও ইহার চাষ হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণ লাভজনক ব্যবসারে শৈথিল্য প্রদর্শন করা কর্তব্য নহে।

ইহার ব্যবহার সযত্নে উপরে নানা কথাই বলা হইয়াছে। আনুর্কৌষী ও বৈদেশিক চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার সযত্নে আরও কয়েকটী কথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন বিবেচনায় উহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বহুদেশে ইহা ক্যালজুয়াম বা ব্রডে ক্যালজুয়াম নামে পরিচিত। তৈলবে ইহা নেসেডু ও নীর নেড্ডি; হিন্দুস্থানে ইহা বড়িগামন, বা বড়িগাম্ন; মহারাষ্ট্রে

পোর জাবুল বা নদী জাবুল; কেহিলে রাজীলে; শুজরাটে রাজজাবু; বারনাং ও বেল রোপা জাবু; আসামে কলা জামু ও কর্ণাটে নিরলু নামে পরিচিত। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে জাম্বু (Jumbo) ও ইণ্ডিয়ান অলস্পাইস (Indian allspice) কহে।

ইহার সংস্কৃত নাম জম্বু। জম্বু, মহাজম্বু, ক্ষুদ্র জম্বু ও ভূমি জম্বু ভেদে ত্রিবিধ। বড় বা বৃহৎ জম্বু ব সংস্কৃত পর্ষায় মহাজম্বু, মহাপজা, রাজজম্বু ও বৃহৎ ফল।

“মহাজম্বু মচাপজা রাজজম্বুর্জম্বুকলা।”

ইহার পর্যায়বাচক আরও কয়েকটী নাম আছে। জম্বু, হুরডিপজা নীলফলা, ত্রামলা, মহাজম্বা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মেঘমোহিনী।

“জম্বু হুরডিপজানীলফলা ত্রামলা মহাজম্বা, রাজার্হারাজফলা শুকপ্রিয়া মেঘমোহিনীচ নবাহ্না।”

জামগাছ (ফল, পত্র, বীজ ও বৃক সহ) কষায় রস, গ্রাহী, মধুররস, পাচক, মল তক্ত-কারক, কক্ষ, কঁচকারক, অন্নরস, ও শ্বস-বর্ধক। ইহা ক্রিমি, বাসন্তোগ, শোথ, অতী-সার, কাস, রক্তদোষ, ত্রণ, পিত্ত ও বাহ্য নালক। ইহার ফল গুরুপাক, বিষ্টভি, কষায় মধুর রস, শীতবীৰ্য, অগ্নিবৃদ্ধ, কক্ষ, বাতজনক এবং বক্ষ ও পিত্ত নালক।

“জম্বু বৃক্স জুবরৌগ্রাহী মধুর পাচকঃ।

মলতক্তো করোজকো কচিকৃৎ পিত্ত হাহ্না।  
অন্নকর্থাঃ ক্রিমি খাস শোষাতীসারকাসহা,  
রক্ত দোষং কফকৈব বিনাশয়েৎ।

জাতিবৎ শুক বিষ্টভি কষায় শ্বাস্ত্রীতলম্

অগ্নিসম্ভবণং কক্ষং বাতলং বকপিত্তজিৎ,”  
অগ্র্যগ্রহ, ত্রণ রোপণ, পিত্তজন বমন, অতীসারের দোষিত জাব, বালগ্রহণী,

প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী। ইহা বহু মূল রোগের মতোষণ। কিন্তু এ বিষয়টি প্রাচীন আয়ুর্বেদগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। চরকের মতে লঘুবীর মূল সংগ্রাহক। শুষ্কপুত্রবন্তী আয়ুর্বেদচাৰ্য্যসং কোন কোন স্থলে ইহার এই গুণ থাকার উল্লেখ করিয়াছেন। উহারের মতেও ইহা মূল সংগ্রাহক অর্থাৎ মূত্রাদিকা নিবারক। ইহার বীজ চূর্ণ, পাতার রস ও বহুলের কাথ ঔষধে ব্যবহার হয়।

২। **ক্ষুদ্রজলম্বু** (ছোটজলম্বু) ইহা বন্যবেশে বনজাম নামে পরিচিত। ইহার পাতা বড় জামের পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বলসাকার; অগ্রভাগ মক; পীতভ সন্মুখবর্ণ; পীতবর্ণের শিরাতুল্য ও বড় জামের পাতা অপেক্ষা পাতলা। কেহ কেহ ইহাকে পীতজাম নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। ইহার ফল অতি ক্ষুদ্র। পাকিলে ককবর্ণ হয়। ইহা মস্তকের ঝাঙোপযোগী নহে। পকিগণ ইহা খাইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের বন লম্বলে ইহার গাছ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার গাছ মধ্যমাকার। ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়। ইহার কাঠও বড় জামের কাঠের স্তায় দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। শেতবর্ণ ও ঘনমানাতুল্য। ইহার কাঠখারাও ঘরের তীর বর্ণ। ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। আমার বাগানে ইহার গাছ আছে। ইহার চাষ ও গাছ উৎপাদন প্রণালী বড় জামের স্তায়।

ইহার সংস্কৃত পর্যায় ক্ষুদ্র লঘু, ক্ষুদ্রপত্রা, নামেরী ও বল লঘুতা।

“ক্ষুদ্রলঘুঃ ক্ষুদ্রপত্রা নামেরী বললঘুতা।” ইহার অঙ্গ পর্যায় ক্ষুদ্র, কককলা, লঘু, দীর্ঘপত্রা ও মধ্যমা।

“ক্ষুদ্রককলালঘু দীর্ঘপত্রাচ মধ্যমা।”

ভৃশ্বরক্তা, পিক্তকা, ও কাঠলঘু প্রভৃতি ইহার আরও কয়েকটি পর্যায়ভাচক লম্ব আছে।

বন্যবেশে ইহা ছোট জাম, বনজাম, কাঠ-জাম ও ক্ষুদ্র জাম নামে পরিচিত। ইহার গাছ আর্দ্র ও ঘনমূল্য স্থানেও কল্পিয়া থাকে। সেইমত কোন কোন স্থানে ইহা পনিজাম নামেও পরিচিত। হিম্মস্থানে ইহা কয়েক ও ছোটী লাম্বু; মহারাষ্ট্রে ননীলাম্বুঠ; ও গুজরাটে বেলরোপা লাম্বু ও ভূমি লাম্বু; কর্ণাটে বোদ্ধনিরলু ও তৈললে নীরনেরতি নামে পরিচিত।

ইহা ধারক ও কক এবং কক, পিত্ত, রক্ত-ছটি ও হায নাশক।

৩। **ভূমিভম্বু**—*Eugenia Fruticosa* ছুইজাম।

ইহা পূর্ববঙ্গে ছুইজাম নামে পরিচিত। ইহার ফল অতি ক্ষুদ্র। মটর অপেক্ষা বৃহৎ নহে। ইহার গাছ ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা গুণবর্ণের বৃক বিশেষ। ইহার পাতা অতি ক্ষুদ্র; মেম্বিপাতার আকার, কিন্তু উহা অপেক্ষা বৃহত্তর। ইহার পত্রগুলি বৃষ; পাতা খেতাত লম্বলবর্ণ; পীতবর্ণের লালবৎ শিরাতুল্য। ইহার ফল অননুভূত। ইহার গাছ পূর্ববঙ্গের লম্বলে দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম জেলার পাহাড় সমুদ্রে এই জাতির নানাবিধ অন্তঃস্ফীতি ও দৃষ্টিগোচর হয়। উহার নামিভাম, বৃটিভাম, ও মূলভাম প্রভৃতি নামে পরিচিত। উহার ক্ষুদ্রজাম ও ভূমিভামের ভেদ বিশেষ। ইহাঘের গুণ ও ক্রিয়া ক্ষুদ্রজামের স্তায়, ভূমিভামের সংস্কৃত পর্যায় ভূমিভম্বু, কাকভম্বু, নামেরী ও পীত-পঞ্জবা।

“ভূমিভম্বুঃ কাকভম্বু নামেরী পীতপঞ্জবা।”

কাকবলতা ও কুমেঠা প্রভৃতি ইহার আরও কয়েকটি গুণাধ্যাতক লক্ষ্য আছে।

ডাক্তার রস্মবার্গ বলেন ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলের উত্তরবর্তী পার্শ্বভাগে প্রদেশসমূহে একতরু উৎকৃষ্ট জাতীয় জাম দৃষ্টিগোচর হয়। উহার ফল অতি বৃহৎ; কণোতাও হইতেও বৃহত্তর। ইহাই সম্ভবতঃ মোণ্ডা নামক জ্ব। ইহার অন্তস্থান ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের উত্তর প্রাণ্ডে প্রদেশ। পাঠ্যবে ইহা বহুলপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবতঃ ইহাই রস্মবার্গের তিখাকার জাম। আমি লাহোর হইতে এই জাতীয় জামের ২৩০টা গাছ আনিয়াছিলাম। উহার দুইটা গাছ মরিয়া গিয়াছিল। একটা গাছ আবার বাগানে ১৯১৬ বৎসর কাল জীবিত ছিল। উহার ফলও হইয়াছিল, ২৩ বৎসর হইল গাছটা মরিয়া গিয়াছে। ঐ গাছের বীজ-জাত একটা ক্ষুদ্র গাছ অত্যাগি আমার বাগানে বর্তমান আছে। ইহার চাষ ও গাছ উৎপাদন প্রণালী বড় জামের তায়।

নবায়তে সকল প্রকার জাম-জীভের, বিশেষতঃ বড় জামবীজে জাম্বোলিন (Jumbolin) ও ফলজাত শর্করার ভাগ আছে। ইহাতে সামান্য পরিমাণ উষ্মারী তৈলের (essential oil) চিহ্ন লক্ষিত হয়। ইহাতে উদ্ভিদের সবুজ বর্ণোৎপাদক পদার্থ (Chlorophryll) বস। (Fat), রজন (Resin), গ্যালিক এসিড (gallic acid) নামক পদার্থ ও এলুমেন (ডিথের ভিত্তরে যে পিঙ্কিল যেতবর্ণ তরল পদার্থ থাকে তৎৎৎ যে পদার্থ ফলের গর্ভকোষস্থ বীজের চতুর্দিক বেটন করিয়া থাকে) নামক পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বহলে শতকরা ষাট ভাগ

টেনিন (Tanin), অর্থাৎ কব বিশেষ ও কিনো (Kino) নামক আঠার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহার মুতলঃগ্রাহক গুণটা নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। স্ট্রোবিলিন নামক ভেষজ দ্বারা কৃষ্ণের কৃত্রিম বহুমুত্র রোগের সৃষ্টি করিয়া পরে ইহার ফলের সার (extract) দ্বারা উহাকে রোগমুক্ত করা হইয়াছে। ইহার ফল হইতে একতরু দিরাপ (Syrup) প্রস্তুত হয়। উহা খারক ও মুতঃরোগ নাশক। ইহার বহলের কাথ (Decoc-tion) শিশুর উদরাময় ও গ্রন্থী রোগের ঔষধ। ছুরালতা (Dhuniato) নামক উদ্ভিদের সহযোগে ইহার কাথ বহুমাত্রী হইতে রক্তশ্রাব, কঠ, এবং মিস্রাকটা রোগে হিতকর। ইহার কচিপাতা ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে উহা আরোগ্য হয়। ইহার বীজচূর্ণ বহুমুত্র রোগের অস্বাভ মধৌষধ।

জামের রস বা শের্কা (Syrup) আরেব, বাহুনাশক ও মুতঃকারক। মুতঃতন্ত (মূত্রাবাত) ও মুতঃক্লম রোগেও ইহা উপকারী। ইহার বহল স্ফোটক; আমা-তিসার, উদরাময়, অধিক রক্তশ্রাব রোগে ইহার কাথ উপকারী। মাত্রীক্ষত ও মাত্রীর শিথিলতা রোগে ইহার কাথ দ্বারা কুল করিলে উপকার হয়। আমাশয় রোগে ইহার পাতার রস ছাপিঁহুত সহ পান করিলে উপকার হয়। ফলতঃ কালজামের স্ফা উপকারী বৃক্ষ অতি অল্পই আছে। উপরে যে কয়েক জাতি জামের বিবরণ লিখিত হইল তন্মিত্র চিনা জাম নামে একজাতি জাম আছে। উহার বিবরণও এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

#### ৪. ইউজিনিয়া



চাইনেন্ লিন্ *Eugenia jambolana*  
*var. Chinensis* চিনাভাষ্য।

ইহা চিনাভাষ্য, বোকসলী জাম বা বার-  
মেসে জাম নামে পরিচিত। ইহার জন্মস্থান  
অনির্দিষ্ট। কেহ কেহ বলেন চীন দেশই  
ইহার জন্মস্থান। আমার বাগানে ইহার  
একটী গাছ আছে। আনি ঐষ্ট হইতে এই  
গাছটী আনা হইয়াছিল। ইহা অশ্রুত মূলভ  
নয়। ইহাই সম্ভবতঃ ডাক্তার রত্নবার্গের  
ইউজিনিয়া অবটুসিফলিয়া (*Eugenia*  
*obtusifolia*) নামক জাতি। ইহার জন্ম-  
স্থান মোলভাস্ বীপ। হুতরাং সম্ভবতঃ  
মোলভাস বা তদ্রিকটবর্তী কোন স্থান হইতে  
চিনাভাষ্য ঐষ্ট হইয়া বা চট্টগ্রামে আনীত হইয়া-  
ছিল। ঐষ্ট ও চট্টগ্রাম জেলার পাথারফে  
ইহার গাছ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা চীনদেশের  
অধিবাসী নহে। ইহার চীনাভাষ্য নামটী  
হইবার তাৎপর্য কিছুই বুঝা যায় না।  
এদেশে বিশেষগত গাছমাত্রকেই চিনা বা  
বিলাতী নামটী দেওয়া হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ  
ইহার নামও এইরূপেই ফষ্ট হইয়াছে।

ইহা বৎসরে দুইবার ফলে। এদেশীয়  
জাম ফল বর্ষাকালে পরিপক হয়। ইহার  
ফল পরিপক হইবার সময় চিনা জামগাছ  
পুষ্পিত হয়। প্রায় তাত্র মাসে ইহার ফল  
পরিপক হয়। আবার কখন কখনও আশ্বিন  
মাসে ইহার গাছ পুনরায় পুষ্পিত হয়। শীত-  
কালে ফল পরিপক হয়। আবার কখন কখন  
ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহা পুষ্পিত হয়। বৈশাখ  
আষাঢ় মাসে ইহার ফল পাকিয়া থাকে।  
নিরবধি ইহা কচাচিৎ দুইবারের অধিক ফল  
ধারণ করিয়া থাকে। জন্মভূমিতে বৎসরে  
তিনবার ইহা ফল ধারণ করে বলিয়াই,  
সম্ভবতঃ ইহাকে বারমেসে জাম কহে।

আমার বাগানে বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফল  
হইয়া থাকে। ইহার ফল অননুকৃত; ফল  
মুত্র; প্রায় গোলাকার; ইহা দীর্ঘ; ম্যাসেল  
ও হৃদয়। ইহার ফলও পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ  
হয়। খাদ্যে ইহা বড় জাম বা কালজামের  
তুল্য ও মিষ্টতর। ইহার পরিপক পাতা  
ত্রিধাকার; কচি পাতা ত্রিভুজ আকার;  
০.৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১.৫ ইঞ্চি পার্শ্ব বিশিষ্ট হয়।  
ইহার কোমল ডাল পালায় ও পত্রবৃন্তের  
উপরিভাগ লালবর্ণের আভাযুক্ত সুস্বাদু।  
পাতা ইহা শীতবর্ণের আভাযুক্ত সুস্বা-  
দু। আর্কুর্কেন-গ্রন্থে বা আধুনিক কার্য-  
কোশিয়াতে ইহার উল্লেখ থাকা দৃষ্টিগোচর হয়  
না। আমার বিবেচনায় ইহার গুণ ও ক্রিয়া  
মুত্র বা বৃহৎ জামের তুল্য হইবে। কেন না  
ইহার ফল ও গাছ প্রায় সর্বত্রই ঐ জাতির  
তুল্য। কেবল ফলের ও পাতার আকারে  
সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহার গাছ  
২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। চাষ ও গাছ উৎপাদন  
প্রণালী বড় জামের স্তায়।

৫। ইউজিনিয়া-ক্লোভিফ্লোরা (*Eugenia*  
*Claviflora*) লম্বা হলিভাম ইহার জন্মস্থান  
চট্টগ্রামের পাথারফে। ইহা বৃহৎ বৃক্ষ  
বিশেষ। ৫০। ৬০ ফুট উচ্চ হয়; ইহার  
পাতা বহুবাকর ও অগ্রভাগ লম্বা। চট্টগ্রামে  
ইহা লম্বা হলিভাম নামে পরিচিত। ইহার  
ফল খাদ্য বায়। ইহা খাইতে তত হৃদয়  
নহে। ইহার কাষ্ঠ দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। নানা  
কার্যে ইহার ব্যবহার হয়। ইহার চাষ ও  
গাছ উৎপাদন প্রণালী বড় জামের স্তায়।

৬। ইউজিনিয়া-প্যানিডোরা পানিডোলা  
*Eugenia Poniola* পানিডোলা জাম ইহার  
জন্মস্থান ও চট্টগ্রাম। ইহা তথ্য পানিডোলা  
জাম নামে খ্যাত। ইহার ফল পানিডোলা

নামক ফলের আকার। সেট ফল উঠাকে  
পানিখানা জায় করে। ইটা বড় বড়।  
৪০। ৬০ ফুট উঠে হয়। ইটার কাঠও দৃঢ়,

কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। ইটার কাঠ খারাপ নানা  
কার্য্যে চয়। ইটাব চাপ ও গাছ উৎপাদন  
প্রণালীও বড় জমেছে প্রায়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

## নাট্যসাহিত্যে “অমর যঙ্গল”

### উপক্রম

(১)

বহুবর্ষ অভীত, যখন সংস্কৃতসাহিত্যের  
বহুপ্রকার ছিল, একাধারে জ্ঞানপ্ৰবেশের  
অত্যাশ্চর্য্য পরিণতি সংস্কৃতসাহিত্যের ভিতর  
দিয়া হইত, দেশের সাধারণ লোক শ্রেণীই  
সাহিত্য বলিয়া সংস্কৃতকেই আদর করিত,  
তখন দেশের একটা অগত্যা জাতীয় সবার  
ভিতর দিয়াই দেশমাতৃকার প্রতিষ্ঠা হইয়া-  
ছিল। আচার, ধর্ম্ম সবই তখন সাহিত্যের  
সঙ্গেই দেশকে এক করিয়া দিয়াছিল, তাই  
সংস্কৃত সাহিত্যে দেশের লোক গোটা ভারত-  
বর্ষেরই পরিচয় পাইত। সে অনেক দিনের  
কথা হইলেও তাহার স্মৃতি মনে নাই, তাহার  
পরিচয় কমে নাই—সেই জ্ঞানপরিমায়গুণিত  
বহুভাষ্যের পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্য অত্যাশ্চর্য্য  
লোকলোচনের সম্বন্ধে বর্তমান রহিয়াছে,  
অনুনা সেই সাহিত্যের প্রাণ স্পষ্ট হইলেও—  
তাহার অবশেষপ্রায় বার্ক্যাকীর্ণবনের রান  
আটাইকু এখনও মনে অভীতের কত কথা  
আনিয়া দেয়। আনিয়া দেয় বলিয়াই আর  
সেই বঙ্গসাহিত্যে লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে  
মনে আনন্দের উদ্বেক হয়। দেশের বু-  
য়োগীকে যদি সেই সাহিত্যের মজ্জানোমুখ  
বেহীকেও ধরিয়া রাখিতে দেখা যায় তবে  
সেই আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁর উপর

যদি বেশা যায় যে পরবর্তীর বয়সের পণ্ডিত-  
মণ্ডলী এখনও এই জ্বলন্ত নতুন নতুন  
জ্ঞানপ্ৰবেশের, কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি  
যাত্রা সংস্কৃতসাহিত্যের নবজীবন দান করেন,  
তবে মনে যে কি একটা নবজীবনের উৎসাহ  
তরঙ্গ বহিয়া যায় তাহা বলিবার নহে। আর  
এখনো নতুন সংস্কৃত নাটকের পরিচয় দিতে  
বলিয়া এত কথা মনে পড়িতেছে। তটপন্নীর  
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শূর্য্যপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ পঞ্চানন  
তর্কর মহাশয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র  
‘অমরসিংহের’ পবিত্র চরিত্রগাথা লইয়া ‘অমর-  
যঙ্গল’ রচনা করিয়াছেন। সেই নাটকই এই  
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অনুনা বঙ্গসাহিত্যের বিশেষত্বপেই  
পুষ্টি ঘটিতেছে। কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা  
প্রভৃতি নানা বিষয়ের সরল প্রবন্ধে বঙ্গভাষা  
উজ্জলীকৃত, সাহিত্যবলে দেশের প্রাণ  
অভিবিজ্ঞ হইলেও—প্রবন্ধগোঁড়বে মাতৃভাষা  
শৌষ্ঠবশালিনী হইলেও—উৎকর্ষাপকর্ষের  
বিচার লইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার তুলনা-  
মূলক সমালোচনা চলে না। বঙ্গভাষার  
প্রাচীন সংস্কৃতভাষা চিরকালই পূজার অর্ঘ্য  
পাইবে। সংস্কৃত বাণীর বিরাট উদ্বল-নিঃসৃত  
বঙ্গভাষা নিত্য নগণা না হইলেও বাঙ্গালীর  
নিকট তাহা আদরণীয় হইতে পারে; কিন্তু  
বাঙ্গলা এক, ভারত আর। সংস্কৃত সমগ্র

ভারতবাসীর, এগুট সংস্কৃতির অঙ্গশেষে সমস্ত ভারতবাসীই আনন্দিত হওয়া উচিত সন্দেহ নাই। বাস্তবিক সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতবাসীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশের একমাত্র প্রধান দ্বার—তাই এই নাটকপ্রকাশে আমাদের এত আনন্দ।

আমাদের বৃহৎ সংস্কৃতিগাতিতোর একটা নিজস্ব গতি আছে। প্রত্যেক ভাষারই এইরূপ এক একটা জাতীয় নিজস্ব গতি থাকিতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত সাহিত্য নিজের স্বয়ং বিসর্জন দিয়া অপর বিলাতীয় সাহিত্যের অনুরণনে প্রবৃত্ত হয়, তখনই বৃষ্টিতে হইবে সাহিত্যে সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্করীকরণ যেমন জাতীয় ব্যারার উচ্ছেদের হেতু, সেইরূপ সাহিত্যদ্বারা যে দেশমাতৃকার প্রতিষ্ঠা হয়, তারারও উচ্ছেদের হেতু।

একশ্রেণে বঙ্গসাহিত্যের অনেকস্থলেই এই সঙ্করীকরণ প্রবল। তাই দেখা যায় অনেক বঙ্গকাব্য-নাটকে সংস্কৃতির গতি বিসর্জন দিয়া আধুনিক কবিতার বৈদেশিক রীতি নীতির অনুরণন করিতেছেন। সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে বাহাইহউক—দেশের প্রাণের সঙ্গে এবিধ সাহিত্যের এখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বর্তমান আলোচ্য নাটকে বৈদেশিক রীতিনীতির কিছুমাত্র অঙ্গকরণ নাই। সংস্কৃতির নিজস্ব গতিই সম্পূর্ণভাবে ইহাতে বর্তমান।

“অমরমঙ্গলের” প্রধান ঘটনা অমরসিংহের চরিত্র লইয়া। টডমাহেবের রাজস্থানে অমরসিংহের চরিত্রের প্রথমোক্ত বর্ণিতরূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, বিলাস বামনারীপরায়ণতা প্রভৃতি প্রধান দোষগুলি তাহাতে বর্তমান। বিশেষতঃ প্রতাপসিংহের উচ্ছাদনমুষ্টি অমরসিংহের দগর হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। অতবড় লোকের ছেলের এইরূপ

অপবিত্র ভূমিতে বিন্মিত হইতে হয়। কজ-তেজোবাহিত্য ভীকতা প্রভৃতি সেই প্রতাপসিংহের চরিত্রেই শোভা পাইয়াছে। যাচাইউক রাজস্থানে অমরসিংহের শোষণ বড়ই শোভাময়। বর্তমানে সে কথার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। স্বর্গীয় বিজ্ঞানলাল রায় মহাশয়ও “মেবার পতন” নাটকে অমরসিংহের চরিত্রের অপবাদ অংশই প্রথমে দেখাইয়াছেন। বর্তমান আলোচ্য নাটকে অমরসিংহের চরিত্র বড় মনোহর। প্রতাপপুত্র পিতার যোগ্য পুত্রই বটে, কজতেজ, উত্তরচরিত্র, মনবিত্তা প্রভৃতি সমস্ত গুণই তাহাতে বর্তমান। এ অমরসিংহ টডমাহেবের বিলাসী অমরসিংহ নহেন, শোষণ পাত্তাধ্যমণ সে মহতীমুষ্টি কজ-প্রভৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী। সত্য মিথ্যার তার ইতিহাসের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমরা খালস। নাটক সব স্থলে ইতিহাস নহে। তাই অমর-মঙ্গল ‘নাটক’।

ইতিহাসের নিকট একটা কৈকিরং দিবার নিমিত্ত তর্কবৃত্ত মহাশয় ভূমিকার বলিয়াছেন, “অন্তথা বা প্রকল্পং” এ অন্তথা কল্পনার একটা অপর মহৎ কারণও আছে।

সাহিত্যদর্পণের বই পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই,—

“নাটকঃ খ্যাতকৃতঃ স্যাৎ

প্রখ্যাতবংশোরাজর্ষি ধীরোবাতঃ প্রতাপবান্  
দিব্যোহংখ দিব্যাদিখো বা গুণবান্নারকঃ মতঃ”

ইত্যাদি

নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে উক্ত কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ—নাটকের নায়কের চরিত্র প্রশস্ত হইবে। নায়ক খ্যাতবংশে উৎপন্ন, রাজর্ষি, ধীরোবাত, প্রতাপপালী বা দিব্য, এবং দিব্য হইয়াও অদ্বিধ্য হইবেন। এই

লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে গুণবান্ বা অগুণ-  
বান্ যে কোন একজন নাটকে নাটক চর্চাতে  
পারিবেন না। কোন বৈলিখ্যবাহিত নাটক-  
চরিত্র অল্প প্রকরণের মধ্যেই খোঁজা যায়।  
নাটকে পায় না। অমর লিখকের চরিত্র  
কল্পিত হইলে তিনি নাটকের নাটকের  
অহংমূল্য, তাই অমর লিখ আশোচ্য নাটকে  
উৎকৃষ্ট।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, “ঐতিহাসিক  
সত্যকেই বাহ দিয়া অমর লিখকের অস্বাভাবিক  
চরিত্র লইয়া প্রমাণের কি? নাটকেরই বা  
আবশ্যক কি? সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু দরিদ্র  
নয়, তাহার বিশাল পুণ্যকাব্যের বিভিন্ন  
শ্রেণীতে অনেক বস্তু বিবিত আছে, তাহারই  
একটা শ্রেণী লইলেই চণ্ডিতে পারিত, সত্যও  
বল্যই থাকিত?”

এ কথাই উত্তরে এই বলা হইতে পারে  
যে,—সমাজের মধ্যে যত উৎকৃষ্ট চরিত্রের  
সৃষ্টি হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ হিসাবে  
গুণ লক্ষণ পরিচালিত জন্ত মিত্র চরিত্রের  
অবতারণা না করাই ভাল। “মেবার  
পতনের” দ্বারা অমর লিখকের চরিত্রের অগুণ  
বল্যই প্রমাণিতও প্রকরণ সৃষ্টি হইতে পারে  
বটে, পরন্তু তাহা নাটক নয়। বিশেষতঃ  
ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস  
স্থাপন করিবাত্তর হেতু নাও থাকিতে পারে,  
তাই তর্কবৃত্তি মতামতের এই প্রকল্পনা।  
সংস্কৃত-সাহিত্যে অল্পবাহ প্রকল্পনারও দৃষ্টান্তের  
অভাব নাই। সাহিত্যবর্ণনে বিনয়িত কবি-  
রাজের লক্ষণই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ,—

“বৎসাবস্থচিতঃ বস্ত্র নারকস্য রসদা য়া

বিক্রমঃ ৩৭ পরিত্যাগাদমজ্ঞা বা প্রকরয়েৎ।”

নাটক বা রঙ্গের যে সমস্ত বস্তু অশ্লীল  
অথবা বিকৃত তাহা পরিত্যাগ করিবে।

অথবা সেই সমস্ত বস্তুকে অল্পতরুণে করিয়া  
করিবে।

সংস্কৃত সূত্রকাব্যের আর একটা বিশেষত্ব  
এই যে ইহার কতগুলি বাধাবাহ নিয়ম  
আছে। সংস্কৃত নাটকের সঠিকপ্রণালী এক-  
রূপই হইবে। সমস্ত প্রকরণ একশ্রেণীরই  
হইবে। ইহার ফলে সাহিত্যের মধ্যে  
যেমন একটা আভিভেদ ঘটিলে; তেমন  
বস্তুগুলি বেশ উজ্জল হইয়াও উঠিয়াছে।  
বাহ্যিক বস্তু বাধাবাহ নিয়মের মধ্যে,  
সংস্কৃত সূত্রকার মধ্যে রসভাবের ক্ষুদ্রি ঘটে  
না, রসভাব সঙ্কচিত স্থানিচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইলে  
বস্তুর উৎকর্ষের ব্যাঘাত ঘটে, তাহারের কথা  
আংশিক সত্য হইলেও ইহা নিশ্চয় যে উচ্ছৃঙ্খল  
অনিয়ন্ত্রিত পতি যেমন জাতির পক্ষে অগ-  
কারক, তেমন সাহিত্যেরও অগকারক।  
এইজন্য হিন্দু সাহিত্যে হইতে আরম্ভ করিয়া  
দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের মধ্যেও সংস্কৃত  
সূত্রকার বাধ্যপতিত। ইহার ফলে সাহিত্যের  
মধ্যেও নানাবিধ শ্রেণীবিশিষ্ট হইয়াছে সত্য,  
কিন্তু কোথার কোন খিচুড়ী পাকায় নাই।  
পরস্পর বেশ পার্থক্য অহুত্ব করা যায়।  
বস্তুর উৎকর্ষপেক্ষেও বিচার করা যায়।  
তাই সাহিত্যবর্ণনে বেশিতে পাই, অভিনেদ  
কাব্য বা রূপক প্রথমতঃ রসভাষে বিস্তৃত।  
যথা,—

নাটকসমগ্রকরণং

ভাববাহ্যোপদেশক্যঃ ভিন্নাঃ।

ইহানুগতবীয়াঃ

এহমসমিতি রূপকানি বস।

অর্থাৎ নাটক, প্রকরণ, ভাব, ব্যাখ্যাণ,  
সমবকার, ভিন্ন, ইহানুগ, অল্প, বাধি ও প্রথম  
ভেদে রূপক দশবিধ বিস্তৃত। রসভাষে  
রূপকে ভাগ করিয়াও ভাবের উচ্চা পতি

রক্ত না হওয়ার আগেও আঠার রক্ত ভাগ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই অষ্টা-বিংশ প্রকার দৃষ্টকাব্য সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতির বিনে অতিক্রান্ত হইত। সামাজিক-গণও প্রত্যেকের পার্থক্য অস্বত্ব করিয়া বখাষণা পুরস্কারদির দ্বারা সাহিত্যের প্রীতি করিতেন।

অধুনা সংস্কৃত-সাহিত্যের বিলোপাবশিষ্ট দ্বারা আছে, তাহার মধ্যে এই আঠার রক্ত ভাগ খুঁজিয়া পাইনা বটে; কিন্তু তৎকালে প্রচুর দৃষ্টকাব্য সময়ে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অধুনাতনকালে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহারাণ বতীশ্রোমহেন ঠাকুরের উদ্যোগে ও তলানীজন সাহিত্যসংগণের প্রচেষ্টায় বহু অভিনয়ের পুনঃসৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বহুপূর্ব পর্যন্ত নাটকাত্মক ছিল না। কতদিন ছিল না, তাহার নির্ণয় আমরা পাই হই না। কিন্তু প্রচুর বর্ষ পূর্ণ পড়ায় পড়ায় যে ভারতে একটা রূপকাভিনয়ের যুগ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাগাউক বাগলায় ৮২৫-কাল যুগ্মদল দ্বয়ের সমসাময়িক কালে এক-দিকে যেমন বঙ্গনাট্যাভিনয়ের সৃষ্টি হইল, ঠিক সেই সময়ে বা তাহার কিছুকাল পরে ২৪পরগণার অন্তর্গত ভট্টপলী গ্রামেও সংস্কৃত-ভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন নাটক, প্রদর্শন, কাব্য যে উক্ত গ্রামে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক সৃষ্ট ও অভিনীত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কিয়দিন পূর্বেও সংস্কৃত ‘অপেরা’ হইবে বলিয়া রিহার্সেল চলিতে ছিল, কিন্তু নানা বাধা হইয়া উঠে নাই। এই আলোচ্য নাটকও ভট্টপলীর সংস্কৃত অভিনয়ের ফলেই যে হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সেই সময়ে

সংস্কৃত নাটকাদি এখন অনেকাংশে বিস্মৃত। মহারাণা প্রতাপ সিংহের চরিত্র অবলম্বনে যে মনোহর নাটক সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অর্ধাংশ আমরা পাই বর্তমান। দ্ব্যাকাব্য কাদম্বরী অবলম্বনে যে রূপকের সৃষ্টি ও অভিনয় হইয়া ছিল, তাহাও আমরা খুঁজিলে পাওয়া যায়। তা ছাড়া অনেক প্রদর্শন এখনও বর্তমান আছে। বলা বাহুল্য আমাদের পিতার সমকালীন পণ্ডিত মণ্ডলীরা এই সমস্ত সংস্কৃত-ভিনয় করিয়া পৌরব বোধ করিতেন। এমন-কার দিনেও সংস্কৃত অভিনয় ব্যাপারে পণ্ডিত মণ্ডলীর তথা ছাত্র বর্গের কিছুমাত্রও অস্বাদ্য নাই। ৮পরগণী পুত্রার সময় বহু বেশ বিবেশ হইতে সামাজিকগণ আসিয়া আমরা পি সংস্কৃতভিনয় শুনিয়া প্রীত হইয়া যান। বলা বাহুল্য এ সময়ে সংস্কৃতভিনয় কেবল অশ্ল-পরিভূষিত বা বিলাসার্থ উদ্যোগ বলিয়া কোন দিন নিষিদ্ধ হয় নাই। সংস্কৃত শিক্ষাই এই অভিনয়ের মূল। অপ্রাণিক হইলেও এই ‘অমরমঞ্চল’ নাটকের যে একটা উৎপত্তিরও ইতিহাস আছে তাহা নির্দেশ করা গেল।

( ২ )

### মহারাজা অমর সিংহ

প্রথম অঙ্কের প্রথমই অমরসিংহ, চন্দ্রবেদী মানসিংহের চরিত্র সমরসিংহের সঙ্গে উৎকল-পুর রাজ্যের প্রাক্তনীমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রাজা সমরসিংহকে আত্মীয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কেনইবা না গ্রহণ করিবেন? কালাপতির প্রথম পুত্র জলময় হইয়া মরি-তাহেন, তাহার স্ত্রীর কিন্তু পাওয়া যায় নাই। কালাপতির দ্বোষ্ঠাপত্নী এই কারণেই পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বহুকাল অতীত তথাপি পুত্র আসিল না, আশা কীর্ণপ্রায়, হার যাক্তবর—পুত্রের আশা কি

চাভিতে পারে? স্ফটিক মানসিঃ স্বেপন বুলিলেন। আপন অপমানের প্রতিশোধের উপায় স্বরূপ চর দুর্জনসিংহকে সমরসিংহরূপে খাপন করিয়া রাষ্ট্র নিকট উপস্থিত করিলেন। আশ্চর্য্য রাষ্ট্র পুত্রসেবেহে অন্ধ হইয়া তাঁহাকেই পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মানসিংহের চাতুর্য্য কেহই বুঝিলেন না।

এদিকে মহাবতী মেবার রাজকন্যার পুত্রকে সমরসিংহের প্রত্যাগমনের কথা জ্ঞাপন করিলেন। অমরসিংহও সমরসিংহকে বিশ্বাস করিলেন। তদবধি সমরসিংহই তাঁহার বাহুবলিগের অন্ততম। আজ রাজ্য দর্শন প্রদর্শে অমরসিংহ তাই সমরসিংহকে সঙ্গে লইয়াছেন। অমরসিংহের বেশভূষা, পিতৃভক্তি কাণ্ডোত্তম কিছুমাত্রও সমরসিংহের জন্য অর্পিত করিতে পারে নাই। যখন বাংলা উপদ্রুপ রাজ্যের শেষ সীমা দেখিয়া বাস্পস্পর্শে বসিতেছেন—

“সদাগরা ধরা দেখাঃ রাজ্যমানসময়ঃ নব্যাঃ  
তৎকালকালন গানঃ কুসুমকরঃশব্দঃ।”

“লগ্নম মন্থর সময় হইতে যে সদাগরা দগা যে সমস্ত কাম্রিয়দের অবিক্রোড়ে রাজ্য ছিল, আজ তাদেরই পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্রাংশেই স্থান প্রাপ্তি ঘটিয়াছে” এই কথা শুনিয়া সমরসিংহ বলিতেছেন “এও থাকিবে না।” জনয়ের কথা জনয়ের রহিল সুগে চাটুবা। এইরূপে ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। এইখান হইতে প্রথমবারের আরম্ভ।

অমরসিংহের চরিত্রের উৎকর্ষের বীজ এই প্রথমবারেই প্রকাশ। তিনি পিতাকে বুলেন নাই, বেশ ভুলেন নাই, কাণ্ডোত্তম পিতার জ্ঞান তাঁহারও শরীরে বর্তমান। পিতার সেই শেষ কথা—

“চিত্তোবজ্ঞান্যারো ন পুনরুৎপদ্যং বিষ্ণুভূষণঃ  
অভিজ্ঞানেনে বিষ্ণু বিষ্ণু বিশিষ্য মম দেবহিতমিতি।”

শেষ শব্দায় শব্দন করিয়া বাস্পস্পর্শিতকর্মে প্রত্যাগমনঃ যখন অমলস্রাবী কথাগুলি বলিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, অমরসিংহ পিতার শব্দায় পার্শ্বে বলিয়া নিদ্রিতে তাহা শুনিয়া চিনেন, আরও তাঁহার জন্যে সেই কথা আলোড়িত করিয়া উঠিল। পাবান সমরসিংহ কিন্তু গলিল না! অমরসিংহ পিতার শেষ শব্দ লইয়া যুদ্ধোজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সামন্তেরা তাহা ছিল না। সামন্তসিংহের জন্যে রাজভক্তি দিল সত্য, পরন্তু তাহার মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মহাবতী ভারত সম্রাটের বিজ্ঞেয় যুদ্ধযাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইল না। কেবল সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল মাত্র। অমরসিংহ কি করিবেন, সামন্তদের মত লইয়াই রাজনীতি চর্চা তাঁহার কুলসীতি। এইরূপে তিনিও নিদ্রিত। কিন্তু নিদ্রিত বলিয়া তিনি বিলাসী নহেন। তখনও তিনি বেশোদ্ভারের চেষ্টা করত। একদিকে ভিন্নসেনা সংগ্রহ চলিতে লাগিল, অপরদিকে দুর্গাদি সংহার চলিতে লাগিল। মহারাণার যোগ্য মহারাষ্ট্রও গোপনে গোপনে রাজ্যের পথঘাট হরকিত করিতে লাগিলেন। প্রবলবেগে সমস্ত উজ্জয়গড় চলিতে লাগিল। রাজ্যের অপর কেহই ইহার কিছুই কারণ জানিতে পারিল না।

এই সময়ে সমরসিংহ রাণাকে বিলাসী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। সামন্তদের মধ্যে অন্তর্ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আজ রাজ্যের প্রাজ্ঞসীমা দর্শনের ছলেও তাহার প্রথম উদ্বেগ সাদিত হইবারও উপক্রম ঘটিল। ঠিক এই সময়ে মহারাণা শুনিতে পাইলেন।

“হে নাথ। অমরসিংহ তোমার হস্তে আত্মাকে সমর্পণ করিতে আসিয়া আবার

রক্ষিবার্ণ ও আমি জবনস্বাহতে পতিত হইয়াছি। শ্রীত বদেবশরণা আমাকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!”

অবশিষ্ট যেখানে পাইলেন—একটি ঘোড়ায় স্থায়ী রক্ষা তাঁহারই অভিপ্রেত অসিতেছেন। অল্প দূরে কতকগুলি লোকের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দেখিয়াই তিনি সেই দিকে বাণিত হইলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতেও হইল না। ঘোড়ায় নারী একটা বৃদ্ধার সহিত অবশিষ্টের সমীপে উপস্থিত হইল। ভীতা—বেগিন্তা নারীর মুখে এখনও সেই কথা।

“হা মাঘ অবশিষ্ট! তুহুজ্ঞেইবে মননে: সন-  
নিহা: ব্যগ্ধতা: ইত্যাদি।”

অমর অমর বিধা বসিলেন “ভর্তু! ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু চতুরা নারী সমরসিংহের নিকট অবশিষ্টের পরিচয় পাইয়া অচ্যুত দর্শন অস্ত্র আনন্দাতিবোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শোকাভুরা বৃদ্ধার মুখে অমরসিংহের ব্যাণার জানিতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি বুঝিলেন নক্সানে রাষ্ট্রের বংশোদ্ভব রাজসিংহ নামে একজন সামন্ত বাগ করেন, ইনি তাঁহারই কন্যা। একমাত্র তাঁহারই প্রেমে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পরণাম আসিরাছেন। পিতৃ গৃহত্যাগের অপর কারণও ছিল—রজনাদিপতির প্রার্থনামুগারে রাজসিংহ জবনকরে কস্তাকে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। সাক্ষীনারী বিচারিণী হইতে পারে না, তাই বীর্যর এট পলায়ন। বলা বাহুল্য কস্তার নাম বীরা। বীর্যর চরিত্র লইয়া নাটকের একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই এখানে বিস্তারপূর্বক একটু ইতিবৃত্তও বলা গেল।

অমরসিংহের চরিত্র অপূর্ণ। সমুখে প্রণয়-  
বিশী স্থায়ী রক্ষা। স্থলীলে তাঁহার অযোগ্য

নহেন। কিন্তু তিনি নিবাত নিষ্কম্প। তিনি সংবত, নিয়মপরতর, বলিলেন—বৃদ্ধে! পিতৃগৃহত্যাগে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চিত্তের উদ্ধার না করিতে পারিলে কোন ক্রীলোকই আমার স্পৃহা নহেন। অতএব ইনি আশাত্ত আমার অন্তঃপুরেই থাকুন।

কিন্তু তৎকালীন যুবতীর সেই,—

“অবশিষ্টবদনস্বাহাঃ

কণন্যাক্ষয়ণিঃ পুত্রজি—

মলমলস্বিত্যতঃ প্রভাতে

পরিব্রাজিক-ত-পত্নেন তুলাঃ

সুটনোমুখ পত্র স্বভাবতই স্থায়, কিন্তু প্রভাতকালীন অকণের মেঘাচ্ছন্নিত দর্শনে পশ্চিমীর মুখখানা যেমন কোন কণে আরক্ত ও পরকণে পুণরুজ্জ্বল হয় আজ বীর্যর সেই হর্ষণকার্য ভাব্যত্বিত মুখখানাও কি অমরসিংহের মনে একটুও বাগ বলায় নাই? কিন্তু তিনি বীর!

“জননী নিগর্ভব্রজা বলা বর্জিতব্রজাঃ

চিঃ চিত্তি পাশ্চাত্যী চিত্তা তস্য কিং তবৎ।”

মাতৃহুমি আজ নিগর্ভব্রজ; এ সময়ে ক্রী চিন্তা! হি! হি!! যৌবন-মূলত-চুর্কল জগৎকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি বীরবর্গে উঠিৎ গাড়াইলেন। কিন্তু বীরা! রাজসিংহের কন্যা নামে পরিচিতা বীরা! অগ্রাণিষ্ট টাকার লোভে পরকে তুলাইয়া আসিরা আপনি বজিল। কঠোর-দর্প-হারী স্থায় অমরসিংহকে দেখিয়া আপনার সমস্তই বিলম্বিত বিধা বসিল। হায় মানসিংহ! যে বেস্তাকে তুমি লক্ষ্য কর্তৃক মৃত্যুর লোভ দেখাইয়া তাহা দ্বারা অমরসিংহকে বিলাসী—হীন করিবার চেষ্টা করিতে ছিলে, আজ দেখিয়া বাও, ভোমার সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল।

( ৩ )

বিত্তরাজের মন্ত্রণা সত্য অমরসিংহকে আরও উজ্জলরূপেই দেখিতে পাই। আজ

চিত্তের উদ্ধারের মন্ত্রণা। সামন্তেরা সকলেই আসিরাছেন। অমরসিংহ বলিতেছেন—  
“সামন্তগণ! পিতার অন্তিম অবস্থা কি মনে পড়ে?”

সেই—“জাতিরদ্রোহীমহাশয়কৃত্যঃ  
মূলকলহতি মণাকতটাপ্ণলগ্নীম্  
হা বা চিত্তোর! ন ত্বোদ্ধরণঃ বহাহু  
দিবঃ বিলাপবহলাঃ—”

এইরূপ প্রতাপসিংহের শেষ অবস্থা যেন অমরসিংহের কথায় নয়নের সমুখে সামন্তদের চুটিয়া উঠিল। তাঁহারা যেন স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন—“হা! চিত্তোর! তোমার উদ্ধার হইল না”। সেই প্রতাপের ‘আত্মত্যাগ’ নয়ন ঘ’ হইতে অন্তিম মুক্তাঙ্গুল অক্ষধারাতলি যেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তখন লাজ্জকণ্ঠে বলিলেন—মহারাজ! “লতন্ত অরামঃ”। কিন্তু অরুণ থাকিলে কি হয়, ভীত সামন্তেরা বলী দিল্লীপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করিয়া চিত্তোর উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইল না। অমরসিংহ অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সফল হইলেন না। এরিকে সমরসিংহ অন্তর্ভেদের জন্ত প্রবৃত্ত হইলেন। তপসিংহের সঙ্গে ত তাঁহার একরূপ বিরোধই বাধিয়া গেল। মহাভিমাত্রী শক্ত তনয় তপসিংহ রাজাকে বলিতেছেন—

“রাজমহাপদুগোঃ পরবকনপতিঃ  
ব্রহ্ম কার্ণে নিরুদ্ভোত ভতোঃস্তর দিত্যবদ্য”।

বলা বাহুল্য সমস্ত সামন্তদের একথা অল্পমতই হইল। একে ত তাঁহারা সমরসিংহকে সন্দেহই করিয়া আসিতেছিলেন—তার পর তাহার এ প্রবৃত্তি সহ্য হইবে কেন? তেজপটু সমর সিংহের মুখে হঠাৎ চিহ্ন দেখা গেল। তারপর অনেক রাজনৈতিক কথার আলোচনা হইল, দেশের সমরভিনয়ের বিচার করা হইল, অনেক সম্মীচনাক্ষর বাক্যস্রোত বহিল,

কিন্তু সেই সামন্তেরা এক মুদ্রা ধরিলেন—‘দেশের একগুণে যুদ্ধ করিবার সময় নয়’ তাহা অনুরূপে রহিল। তাঁহাদের মনে সমরসিংহের ভেদনীতির কিছু যে বাগ রহিল না, তাহা নহে, তাঁহারা সঙ্কট হইয়া সভা হইতে বাইতে পারিলেন না, বলা বাহুল্য এই মন্ত্রণা সভায় যে সমস্ত রাজনৈতিক চর্চ্চা হইল—তাহা অতুলনীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত গ্রন্থকারের পক্ষে এইরূপ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলে হস্ত বিম্বিত হইবেন। কিন্তু বিশ্বাসের কারণ নাই—এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতই একদিন রাজ্যচ্যলক ছিলেন। বাক্যে কথা বাড়ুক।

তারপর সমরসিংহ হুযোগ পাইলেন—  
রাজাকে বলিলেন—দেব!

“মনস্তপস্যা বালা ধর্মলোপতরাভুয়া  
বোহরুহমাসায়া নানুনাগোপযাতিনী”।

মনস্তপস্যা সেই বালা বীরা ধর্মলোপ ভরে আশ্চর্য্যাতিনী না হয়, তাহা এখন আপনায় দেখা কর্তব্য। মহারাজার মনে সেই প্রেম-পরায়ণা সুন্দরী বীরার কথা মনে পড়িল। একে ত তিনি সামন্তদের ব্যবহারে বিরক্ত হইরাছেন, তাঁহার উৎসাহ নষ্ট, বীর্ঘ্য সঙ্ক-চিত্ত, অভিপ্রায় অন্তরূপ হইয়া উঠিতেছে এ সময়ে বিলাসের চিন্তাটা আশাই স্বাভাবিক—তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহাও দমন করিলেন। কত বড় আশ্চর্য্য তাহা এই ব্যাপারেই বুঝা যায়। ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল, প্রতাপ সিংহের দূতাত্ম্য-সারে রাজপুং হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরপেরে যে সমস্ত তৃণপুং রাজধানীর সূত্র ছিল, তাহাতে চটায় অগ্নি ধরিয়াছে দেখা গেল। সেই সময়ে চতুর্দিকে ভয়ানক জনসম্মর্দ উপস্থিত হইল। বংশগ্রহির ফোটন শব্দ, অগ্নিক্ষুদিলের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ, লোকের



হাংকার করত, পতনকারী চীৎকারশব্দ  
মিলিমা মিলিমা একটা অত্যাশ্রিত ঘটনা ঘটয়া  
গেল। সমরসিংহ ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন  
পলাইলেন। মহারাণাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন  
কণপরেই তিনি একটা ককণ ক্রন্দনধ্বনি  
শুনিলেন। দেখিলেন বীরার সঙ্গে  
যে যুদ্ধা আসিয়াছিল, সে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া  
বিলাপ করিতেছে। বীরার কথাটা হঠাৎ  
ভাংগার মনে পড়িয়া গেল। বীরার কিছু হয়  
নাই ত! হইলই বা, বাহার মাকড়সি আর  
মুখলাবৎ তার আবার স্ত্রী চিন্তা—খিঙ্ক  
আমাকে, এই বলিয়া তিনি সিংহনাদে  
বিপন্নাকে রক্ষা করিতে বাহিত চটলেন।

ঘটনার ঘট প্রতিঘাতে এমনি করিয়াই  
অমরসিংহের চরিত্র মলান্ হইয়া উঠিয়াছে।  
তুধু বীরাকে লইয়া একথা বলিতেছি না,  
যেখানেই অমরসিংহের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশ  
বাধা পাইয়াছে, যেখানে তিনি সহস্র উন্নতি-

কর কার্যে নিবৃত্ত হইয়া পড়িয়া অবসর  
হইয়া পড়িয়াছেন—সেখানে চরিত্রভ্রংশকর  
অনেক পদার্থ ঘটিয়া অস্বাভাবিক হইয়া উঠিলেও  
সর্বত্র তিনি আত্মপ্রয় করিয়াছেন। সর্বত্রই  
দৃঢ়প্রজ্ঞা ক্রমে জীবনের নীনাংশটাকে চাপা  
দিয়াছেন। মাহুকের চিত্তের সমস্ত অংশই যে  
উৎকর্ষ হইবে, এমন কথা নাই। ভাল মন্দ  
ভাবটা লইয়া মানবজীবন গঠিত। এই ভাল  
মন্দ ভাবটা প্রতিফল ও অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য  
দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়, এই পরীক্ষার  
দিন রথী, তিনিই প্রকৃত বীর। কেবল  
অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অনেকে হত  
ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে বীর বলিব  
না। আমাদের অমরসিংহ তুধু শোধে বীর  
নহেন, তিনি আত্মপ্রয়ও বীর। ক্রমেই  
আমরা অমরসিংহের অপর অংশ পাঠকবর্গের  
গোচর করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীপকানন কাব্যার্থী।

## ব্যক্তিগত স্বত্ত্ব ও সামাজিক বৈষম্য

সামাজিকসামান্যবাদীগণের গোড়ার কথা  
ব্যক্তিগত স্বত্ত্বকে উচ্ছেদ করা এবং তৎস্থানে  
সম্পদ প্রতিলিপি করা। অর্থাৎ ব্যক্তি তাহার  
স্বাবর অবস্থার সম্পত্তির উপর, স্ত্রীর উপর, পুত্র  
কন্তার উপর—কোন কিছুই উপরই স্বত্ত্ব স্থাপন  
করিতে পারিবে না। তৎস্থলে বৃহত্তর সমাজ  
অথবা হেট সেই স্বত্ত্বের অধিকারী হইবে। সেই-  
জন ব্যক্তিগতভাবে কাগরও স্বত্ত্ব না থাকিলেও  
সমষ্টিগতভাবে সকলেরই স্বত্ত্ব থাকিবে। এইরূপ  
স্বত্ত্বের কারণ এই যে, স্বত্ত্ব ব্যক্তিগত হওয়াতে,  
তাহার অপব্যবহার বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে।  
দৃষ্টান্তরূপে বলা বাহ পুত্রকে হুশিক্ষিত করা,

মাহু্য করা প্রত্যেক পিতারই কর্তব্য। কিন্তু  
পিতাপুত্রকে কেবল অর্থোপার্জনের যন্ত্ররূপে  
ব্যবহার করিতেছেন, এবং তদনুযায়ী শিক্ষার  
হযোগ স্বগ্রী করিয়া দিয়া বা না দিয়াই তিনি  
কাজ। ইহাই স্বত্ত্বের অপব্যবহার। এইরূপে  
স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রীর কর্তব্য, পিতার কর্তব্য,  
পুত্রের কর্তব্য, অধিকারের কর্তব্য, প্রভাবের কর্তব্য  
মহান-ব্যবসায়ীর কর্তব্য, ব্যবসায়ের নিম্নত  
শ্রমজীবীদের কর্তব্য, কোনটাই কোথায়ও  
ঠিকমত পালিত হইতেছে না। প্রত্যেকেই  
স্ববিধাবাদী—স্বার্থপর। তাই কর্তব্যের বিবেক  
না তাকাইয়া প্রত্যেকেই স্বার্থসিদ্ধির উপায়-

যত্নে আর একজনকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাঠিতেছে। তাহার বিবরণ কলম সমাজে চরিত্রহীনতা, অসামান্য, অসামান্য প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক বাড়ি-বোন আগ্রহ হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না।

তাই সর্বপ্রথমে এই ব্যক্তিগত দৃষ্টকে উচ্ছেদ করা আবশ্যিক। সমস্তের হাতে সেই স্বপ্ন স্থাপিত হইবে। তাহা হইলে সেখানে স্বার্থের প্রলোভন থাকিবে না। সুতরাং বর্তমানের বৈষম্য উৎসর হইয়া যাইবে। কোথাও কর্তব্যচ্যুতির সম্ভাবনা পর্যন্ত রহিবে না।

সম্মানমিতি প্রত্যেককে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার লইবেন। প্রত্যেকের জীবন-যাত্রাপ্রাণাণী নির্ধারণ করিয়া দিবেন, প্রত্যেকের গুণকর্ম্মাঙ্গণের অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা ও তাহার মাপকাঠি ঠিক করিয়া দিবেন। অর্থ বাহাতে কোন একমাত্রগায় অলভ্য হইয়া না উঠিতে পারে, তাহার অস্ত্র সকল প্রকার সতর্কতা ও ব্যবস্থা তাহা-মিথকে অবলম্বন করিতে হইবে।

আমরা স্বীকার করিতেছি, সামাজিক সাম্যবাদীদিগের উদ্দেশ্যটা খুবই সৎ। কিন্তু তাহাদের প্রস্তাবিত এই সম্মানমিতি লইয়াই একটু গোলে পড়িতেছি। সম্মানমিতি বা টেট অবজ, কতগুলি লোকের দ্বারা পরিচালিত হইবে, এবং তাহারা নিশ্চিতই জন-সাধারণ কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কিন্তু তাহাদের দেহচরিত্র না হইলে, পূর্বেজ্ঞ-উদ্দেশ্যটি কার্যে পরিণত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহাদের তাহাদের নির্দোষ-বাপা-য়ের মধ্যে কাহারও কোনরূপ স্বার্থও দৃষ্ট থাকিবে না, ইহা অসম্ভব করাও খুবই

কঠিন। যে দল যাঁহাকে মিথ্যা হুঁশিয়ারি পাইবে, সেই দল তাঁহাকে নিপাতন করিতেই উদ্ভিগ্না পড়িয়া লাগিবে। এমনও ত সেইজন্যই হয়। তবে সাম্যবাদীরা বলেন, তখন শিকার গুণে মানুষের ন্যে নাচা-পড়া কমিয়া যাইবে—হানি স্বার্থপ্রথিতা বলিয়া কোন ভাব থাকিবে না। কিন্তু তাহারা যেহেতু শিকার বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে ত্যাগের দ্বারা ভোগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না। বুদ্ধির উপর—জ্ঞানের উপর অতিমাত্রায় ভোর দেওয়ার আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু বুদ্ধি বা জ্ঞান কি কখনও ভোগবাদনাকে সংযত করিতে পারে? সে-ত ভোগবাদনাকে পরিত্যক্ত করিবার অস্ত্র প্রতি-নিষতই নানা উপায়—নানা বস্ত্র—নানা ব্রহ্ম প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত! বাহা ভোগের ইচ্ছা সংগ্রহ করিবে, তাহাই ভোগকে লম্বন করিতে যাইবে কেন?

কেহ কেহ বলেন, যেখানে ভোগ সমাজের কতিজনক বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইবে, সেইখানেই জ্ঞান তাহা সংযত করিবার আয়োজন করিবে। কিন্তু আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ হয়—সমাজের সর্ববিধভাবে কতিজনক এমন কোন ভোগ জ্ঞান কখনও আবিষ্কার করিতে পারিবে কি না। সুতরাং জ্ঞানাতীত, অতীন্দ্রিয়, অসীমের কথা—আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্ভা বাস্তবের সম্মুখে সর্বদা বিচ্যমান না থাকিলে, মানুষ কখনই ভোগ-নিবৃত্তির পথে—ধর্মের পথে—ত্যাগের পথে চালিত হইবে না। জ্ঞান হাজার তাহার ডঙ্কা বাজুক—বুদ্ধি হাজার তাহার অধ-ধন্ডা তুলিয়া ধরুক, কিছুতেই মানুষ সাম্যের ভাব—প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অঙ্গশাসনেই—সেটাকে বড়ই

সুসংস্কার বলা চোক না কেন—মাহুবেও পার্থিব চরিত্র যথার্থ ভাবে সংগঠিত হয়। তাহার অনীমে খাঁকিটাই মাহুব ভোগের উপরে ভ্রাতৃগণের ব্রহ্ম-পতাকা উজ্জ্বল দেখিতে পায়, তাহাতে বিবাস রাবিয়াই মাহুবেও অন্তরে যেহ প্রেম মদ্য দাক্ষিণ্যের উৎস খুলিয়া বাহ, মাহুব অতিমাহুবে পরিণত হইতে থাকে।

কিন্তু সাম্যবাদীদের শিক্ষার মধ্যে এইরূপ ধর্মজীবন-গঠনের কোন আয়োজন নাই। অথচ সমষ্টিগতভাবে বৈষয়িক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা এবং কাজে কাজেই ভোগতত্ত্বকে উচ্চ ও চরিতার্থ করিবার বিরাট আয়োজনের আবশ্যকতা আছে, একথা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হয়। অর্থের বৈষম্য বিদূষিত করিবার সময়ে ব্যক্তির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া স্বয়ং সমষ্টিতে অর্পণ করা হইতেছে। কিন্তু ভোগতত্ত্ব আশ্রয় করিবার কারণ যখন সমাজে রহিয়াই গেল, তখন ব্যক্তিকে তাহা ত চরিতার্থ করিতেই হইবে। সমাজ তাহার অন্ত যে অর্থ পরবরাহ করিতেছেন, তাহাতে তাহার খুলাইল না। তখন সে কি করিবে? সামাজিক শাসনের ভয়ে তাহাকে বক্র পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। বাহিরের শাসন—বাহিরের কড়া-কড়ির চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে তাহার অন্তর বিচা বোধ করিবে কেন? তাহার অন্তরতন্ত্র ও বলিষ্ঠত্ব সমুখে ত কোন একজন সর্বজন সর্বজনীন বিরাট পুরুষের সম্মুখীন হইতেছে না, কারণ তাহার শিক্ষার ভাণ্ডার অতিবৃত্ত স্বীকৃত হয় নাই! কাজেই সদস্য-বিচার-বুদ্ধি তাহার ভোগতত্ত্বের পথেই পরিচালিত হইবে। সমাজকে যেখানে ফাঁকি দিয়া কার্য সমাধা করা সম্ভবপর, সেখানে

ফাঁকির সহায়তা গ্রহণ করিতে তাহার চিত্ত বাধা পাইবে না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ধর্মশিক্ষা ত কেবল একটা প্রাণবতার উপর স্থাপিত। ওরূপ ভয় দেখাইয়া, বৃত্তকীর আশ্রয় করিল-চিত্তকে, ধীন বৃত্তিকে সংযমের পথে রাখা সম্ভব; কিন্তু যাহারা শক্তিমান—বুদ্ধিমান তাহারা উহা গনিবে কেন? সমাজের উন্নতি বুদ্ধিমান এবং সমাজের উপরেই নির্ভর করে। অতএব তাহাদের সম্বন্ধ ওরূপ শিক্ষার সাধিত হইবে না—ওরূপ শিক্ষা তাহারা গ্রহণই করিবে না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ধর্মকে প্রস্তারণার নামান্তর বলিলে, অজ্ঞান করা হয়। যাহার উদ্দেশ্য সৎ, তাহা কখনই ছলনা হইতে পারে না। মাহুবেও অন্তরে ইহার প্রয়োজন-বোধ সূর্য্যবাস আশ্রয় গ্রহিয়াছে। কেহ তাহাকে প্রেমের ভাবায়, কেহ তন্ত্রের ভাবায়, কেহ দৃষ্টির বা জ্ঞানের ভাবায় তাহাকে গাণ্ডা করিতে চাহিয়াছে। এসই পার্থক্যের জন্যই নানা দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি।

অতএব সমাজের সঙ্গে অনীমের সম্পর্ক রূপের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বাধ্যবাধি লইয়াই মাহুব সংপথ রূপে নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার উপাসনা, ধ্যান ধারণা ক্রিয়া কর্ম সমস্তই সেই মহান সম্পর্কে চিরমোহিত রাখিবার প্রয়াস। ইহাই ধর্ম সাধনা। এবং ইহার বলেই সে 'এক'কে বহুর মধ্যে দেখিতে পায়, বহুকে একের মধ্যে দেখিতে পায়। দেখিতে পায় বলিয়াই তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে কোথাও ভেদের বীজ—বৈষম্যের বীজ উদ্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং আশা যে সামাজিক বৈষম্য পান্ডাত্য সেনে মাধা খুলিয়া ধাক্কাইয়াছে, তাহাকে

উদ্ভূত করিতে চাইলে বাস্তব চাইতে কোন বাস্তব বা শালন প্রদর্শন করায় কোন ফল পাইবে না। অতঃপূর্বে, তাৎপর্য্যী দৃষ্টান্তাদি

বাস্তব জীবনে ও চাইতে পাইন করবার দিকেই বেশী যৌক্তিক দেখায় কোন কল্পনা

শ্রীকুব্জনাথ কাহিড়ী।

## মফঃস্বলের বাণী

### ১। বিংশশতাব্দীর 'প্রায়শ্চিত্ত'

সভ্যতার নামে উনবিংশশতাব্দী যে পাপ অর্জন করিয়া আসিতেছিল, বিংশ শতাব্দীতে সেই মায়াপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত হইতে বসিয়াছে। পাপের উপর মিথ্যার উপর ভোগের উপর মানব যে ইমারত গাঁথিয়া তোলে, তাহার অস্তিত্ব মধিক দিন থাকে না। একপক্ষ বৎসর দুরিমা মানব ধর্ম্ম কণ্ড করিয়া আশ্চর্য্যিকতা কুনিদা, আশ্চর্য্য উৎকর্ষ ত্যাগ করিয়া কেবল বাহ্য কিছু নীচতা, মিথ্যা-বাদিতা, ঘোষিকতা ও স্বার্থপরতাকেই প্রদর্শন দিয়া আসিয়াছে। তৎকাল আর বিংশ শতাব্দী সেই উনবিংশশতাব্দীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে।

বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক এবং কৃত্রিমতা লইয়াই উনবিংশশতাব্দীর বাহ্য কিছু সাধনা, বাহ্য কিছু উন্নতি, বাহ্য কিছু সভ্যতা। বাস্তবিকই কি উনবিংশ শতাব্দী, মানব জীবনের চরম বিকাশ? "ভোগে রোগ তথা" উনবিংশ-শতাব্দীর ভোগাশুভন একটা উৎকট ব্যাধির পূর্ণ পরিচায়কমাত্র। বিংশশতাব্দী সেই ভোগ রোগের প্রতীকার কল্পে আর অত্র চিকিৎসার সাহায্য লইয়াছে। সেই উনবিংশ-শতাব্দী বাহ্যকে উন্নতি বলিয়া এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছিল—সেই উন্নতি সেই অহঙ্কার আর কোথায় রহিল? সেই বৈজ্ঞানিক উন্নতি কি আর প্রকৃতির দক্ষণ

অভিসম্পাতে দুর্নিয়াম হইয়া বাইতেছে না? অতঃ কি সভ্যতাজিহমানী মানব আপনাতঃ স্রম দ্বারা পাবিতেছে না?

যদু-কৈটভের মেন ও হজ্জার কোমলে কঠোরের কলে কলে যে মেদিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তালা ত সভ্য মানবের দুর্ভাবগারে আজ মগ্ন প্রপীড়িতা ও লাগতাতাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্ববিচার-প্রাণিনী বহুত্বতা আবার কবোড়ে সৃষ্টিকর্তার সন্নিপে বাধা লইয়া অভিযোগ লইয়া প্রচারমান। অর-তুণিনী পূর্ণিবা কুনিদা বলিতেছে—“এই দুর্ভাগ্য বৈদিক নীতি-সম্পন্ন ভোগপ্রধান মানব সমাজ আমার গর্ভে আর কিছুই রাখিল না, ইংলান্ড আমারই গর্ভের সন্তান হইয়া আমারই বক্ষের রক্ত শোষণ করিতেছে! আমার গুহপান না করিয়া, পত্রবোহন না করিয়া, অন্নাহার না করিয়া, আমার স্বপ্নের রক্ত ও আমার বেহের মাংস ইংল্যান্ডের পানাহারের বস্ত্র হইয়াছে; অতঃব হে সৃষ্টিকর্তা নারায়ণ আমাকে রক্ষা কর।” স্বপ্নেরও অচলা মেদিনী এইরূপ চকলা হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিকই বিশ্ব-জননী অহঙ্কার আর দ্বিধা থাকিতে পারিতেছে না—রাসাতলমুখী হইবার মগ্ন ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন!

ধন রক্ত থাকিলেই কি মানব সভ্য? বনির তিবির গর্ভ বা সমুদ্রতল হইতে যদি সূর্য্য আহরণ করিতে পারিলেই কি মানব সভ্য?—

খনিজ কয়লা ও কেরোসিন লইচাই কি মানব সভ্যতা? টেলিফোন, রেলওয়ে ও বৈদ্যুতিক আবিষ্কারা দ্বারা কি মানব সভ্যতা? আর তাহারা চাষবাস করে, বহুতরার গর্ত অন্বেষণ না করিয়া বস্ত্র উৎকর্ষ সাধন করে, প্রকৃতিকে সেবাধারী না করিয়া জননীর স্তন্য পূজা করে, সহরে না আদিয়া পল্লী গ্রামে বাস করে, মাসে না খাইয়া দুগ্ধ বা নিরামিষ খায়, তাহারা অসভ্যতা?

ইহাই যদি সভ্যতা ও অসভ্যতার মাপকাঠি হয় তাহা হইলে এই অস্ত্রসারপুত্রা পাপ-ভারাক্কাটা পৃথিবীর প্রদরপরোবিগর্ভে প্রবেশ করিতে আর বহু বিলম্ব নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা অবশ্য তড়িৎ-বাহী বায়ু-পোত ও নৌশা-বস্ত্রের দ্বারা “বহুদৈব কুটুম্বকম্” এট মনো-নীতির মৌখিক বোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বমানবের ভিতর তাহা দ্বারা কতটা আন্তরিক সম্বন্ধ বা নাকীর টান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নির্জনে ভাবিবার বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান কতটা বিবর্তিতে আপনাকে আজ পর্যন্ত নিয়োজিত রাখিয়াছে, কতটা দুঃশীল হুঃ ও অশ্রুতের প্রকৃত অভ্যর্থনের সমাধান করিতে পারিয়াছে, তাহাও দেখা উচিত। উনবিংশ শতাব্দী অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অনেক আশা মিটানো, কিন্তু প্রকৃত কিছুই করে নাই। এই কৃত্রিমতার দ্বারা মানবের জীবনীশক্তির ক্রমশঃই ক্ষয় হইয়া অস্তিত্বেছে। এক শত বৎসর ধরিয়া মানবের শ্রম এবং অধ্যবসায় প্রকৃতিকে সাহায্য না করিয়া কৃত্রিমতাকেই প্রসার দান করিতেছে। আহারে বিহারে ব্যবহারে কৃত্রিমতাই আবাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে : এই কৃত্রিমতা সমূলে উৎপাটন করা একান্ত

আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে,—এই বিংশ শতাব্দীতেই হুঃ এই অকৃত কৃত্রিম সভ্যতার অধিপতীনা হইয়া যাইবে।

গরল এবং অমৃত—বর্ণ এবং নরক এই পৃথিবীতেই বর্তমান। মানবের দৈবী এবং অমৃত-সম্পত্তি ক্রিয়া দ্বারা ইহাতে কত সুখ, কত বা দশাংলার উৎপত্তি হয়। কেহ বা ইহার মননে লক্ষ্য আবার কেহ বিষ লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা বিজ্ঞান-বস্তুর দ্বারা ইহা হইতে কেবল বিষম বিষম-বিষই মনন করিয়াছে। তাহার ফলে আজ সমগ্র বিশ্ব সংসার জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিংশশতাব্দী তাই এই মহাপাপের প্রাক্কান্ত করিতে আজ ভীষণ হোম-হুত আদিয়া দিয়াছে, তাহাতে লক্ষ লক্ষ মানবের পতনাবের সাহসিত হইয়া যাইবে। এই প্রাক্কান্তের ফলে অমৃত ভবিষ্যতে একটা স্বকল প্রসবের সম্ভাবনা দেখা যায়। এই পতনাবের বিপজ্জনে মানব-জগৎ এক অপূর্ণ দেব-ভাবের স্ফুরে হইবে। তাহা দ্বারা আবার জগতে প্রকৃত আশ্রিত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। মৌখিকতা, কৃত্রিমতা এবং বৈজ্ঞানিক দমন করিবার জগতই বিংশ শতাব্দীর অকৃতময়। ভোগে মানব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, কেনা বেচায় মানব দ্বিগা-বাহী প্রবন্ধক হইয়া পড়িয়াছে, মৌখিক সভ্যতার অন্তরালে মানব অন্তরে বিবের ছুরি পোষণ করিতেছে। এই সব পাপগুলিকে সমূলে নির্মূল করিবার জন্য বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভেই বিশ্বনিষ্ঠার তাণ্ডব নৃত্যের এই অকৃত আয়োজন। দেহোন্মত্ত মানবের নহন আবার তাহার অন্তরাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হইবে—ইহাই বিংশশতাব্দীর আশার বাণী। ভোগকে উপলক্ষ্য করিয়াই মানব এক দিন

তাঁহার শক্তিব্যবহৃত ও অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছে। মানব কর্ম করিয়াছে কেবল ভোপের ক্ষত্র, অর্ধপরতা চরিতার্থ করিবার ক্ষত্র, তাপের ক্ষত্র বা বিপর্যয়ের ক্ষত্র নহে। বিজ্ঞান আজ এক নত বর্গ ধরিয়া কেবল মানবের ভোগলালসার বৃদ্ধি করিয়া আদিত্যে, প্রকৃত কল্যাণের পথে বিজ্ঞান পরিচালিত হয় নাই। তাই মানব জন্মে আজ এতাদৃশ অশান্তি, তাই মানব কোটিপতি হইয়াও নিষ্কিন্দ্র নিত্ৰা বাইতে পারিতেছে না, তাই অস্ত্রায় উপদ্রবের রাজ্য জগতে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পর ধৃত এই পরিপ্রায় জগৎ ভোগমগ্ন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কর্মের পথে চালিত হইবে।

২৪ পরগণা বার্তাবহ।

ময়মনসিংহের বাণিজ্য সমৃদ্ধি

"বাণিজ্যে বলতে লক্ষ্যী

তদর্থে কৃষি কর্ণি।

তদর্থে রাত্রে দেখায়

ভিক্ষাখ্য নৈব নৈব চ।"

কথাটা প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞান-প্রধান দেশেও কথাটা আদরণীয়, তাঁহারা হাতে কলমে এ কথার সত্যতার প্রমাণ দিতেছেন। কিন্তু এই মহাধন-বাক্যে অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিনই নিঃশেষ ও গরিব হইয়া পড়িতেছি। বাণিজ্য ব্যবসারে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, বাণিজ্য ও বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হয়, অপব্যয় অপচয় দূর করিতে হয়—এ সব আরাণ কেহ স্বীকার করিতে চায় না। হল্পে পড়িয়া ব্যবসারে হাত দিলেও ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধির অভাবে (faculty) অনেকই

কতিয়ন্ত হইয়া পড়েন। লেখা পড়া শিখিয়া অর্থোপার্জন, সন্মান ও প্রতিপত্তি লাভই যদি লক্ষ্য হয়, তবে বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প কোনও অংশে ছীন নহে বিব বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লাভ করতঃ শিক্ষিত যুবকগণ বাণিজ্যাদিতে ব্যবসায় বৃদ্ধি বাটাইলে আর্থিক হিসাবেও কতিয়ন্ত হইবে না। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাট—বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পই ধনাগমের একমাত্র উপায়।

ময়মনসিংহ জেলার প্রচুর পরিমাণে ধান, পাট, তিল, সরিষা, পেঁয়াজ, আখা, হলুদ প্রভৃতি কৃষিক্রমে উৎপন্ন হয়। কৃষি হিসাবে এ জেলা বলের অল্প জেলা হইতে কোনও অংশে ছীন নহে। কিন্তু এ জেলার অতি অল্প লোকেই এই কৃষিক্রমে উৎপন্ন লাভবান হইতেছেন। কৃষক উৎপন্ন শুল্ক অল্প জেলার ব্যাপারী ও মহাজনদিগের কাছে বিক্রয় করে, হুতরাং মাঝের বালাল ও কৃষক বাতীর অল্প কেহ এই লাভের ভাগ পাইতে পায় না, সে লাভও অতি সামান্য।

কিশোরগঞ্জের তিনমাল ব্যাপী স্থলন মেলায় ন্যূনাত্মক বণকোটি টাকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু এ মেলাবানী ইহাতে জোড়াপুতুল মাত্র, লাভের শতকরা এককড়ও পায় কি না সন্দেহ। হোসেনপুরের খোলমেলা, ভামগঞ্জ ও ইটালিয়ার মেলা, ভোগমেলা, মঠমেলা, প্রভৃতি অষ্টমী ও বাজারী মেলায়ও ময়মনসিংহবাসীর লাভের অল্প প্রায় শূন্য।

ময়মনসিংহের এইচ বহু যুগান্তি তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়ে ভারতবর্ষে একটা স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্যবসায় বৃদ্ধি বাটাইয়া তিনি সামান্য যুগধনে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কিশোরগঞ্জ

বহাটির পশ্চিমবাহ রক্তিত ভাস্কর্য্য পর্বাঙ্গ পড়িয়া অবস্থার ভাঙনায় ব্রহ্মপুত্র গমন করেন। তথায় কিছু টাকা জমািয়া কনট্রাক্টরী করিতে করিতে ব্যবসারে প্রবৃত্ত হন, শেষ-কালে তাঁহার কারবারে প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিত, এতখাতীত তিনি কিশোরগঞ্জে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি ধরিল করিয়াছিলেন অসুস্থতান করিলে দেখা যায় ১৯৩০ বৎসরে ব্যবসারীরা আশাতীত উন্নতি করিতে পারেন এবং গ্রাম্য লোকজনসহায়ণ ৮১০ টাকা মূলধনে পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকে।

এ জেলার পূর্বদিকদিয়া মেঘনা, পশ্চিমদিক দিয়া বম্বনা ও উঃ পঃ চটতে হঃ পুঃ দিকে কোণাকোণিভাবে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইতেছে, এই প্রবল ভলম্বোঃব্রহ্ম বাতীত ইচ্ছাধেব বহু উপনদী ও শাখানদী ঘলের মত এ জেলার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুবিভক্ত মলপথ মূলপথ ও রেলপথ আমদানী রপ্তানীর পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক, বিশেষতঃ মলপথে খরচ খুব কম পড়ে।

বরমোতা বম্বনার পাড় ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া ইচ্ছায় তীরে দিরাঙ্গগঞ্জ (পাখনা) বাতীত অল্প শ্রেষ্ঠ বন্দর নাই, মহম্মদসিংহ বাতীত ব্রহ্মপুত্রের তীরেও উল্লেখযোগ্য বন্দর নাই, মেঘনার তীরবর্তী ভৈরব বাজারই এ জেলার শ্রেষ্ঠতম বন্দর। দিরাঙ্গগঞ্জ প্রধানতঃ পাটের ব্যবসার স্থান, কিন্তু ভৈরব সর্লক্ষকার কারবারের কেন্দ্রস্থল। ভৈরব-নেত্রকোণা রেললাইন এবং ভৈরবের সহিত আসাম-বেঙ্গল রেললাইনের সংযোগ (ত্রিপুরা জেলার আখা-উড়া ষ্টেশন ভৈরব চটতে ২৪২৫ মাঃ) হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভৈরববাজার নারায়ণগঞ্জকেও পরাজিত করিতে পারিবে।

নেত্রকোণা মহকুমার উত্তরে গারোপাড়া-ডের পাহাঃপেশ তলের বাজার হইতে পাহাড়িয়া কাঠ তরই বাণ, বেত ও কুম্ভ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর হস্তী প্রত হইয়া থাকে, পূর্বাঞ্চলে খালিঘাটের পরগণা হইতে হাজার হাজার ঘণ বিত্তম্ব গুয়া দ্রুত রপ্তানী হইয়া থাকে। সদর মহকুমার হালুয়াঘাট তলকলেরও পাহাড়িয়া ধান, মরিচ আলুগুটা প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের কেন্দ্রস্থল। বাৎসরিক প্রায় কোটি টাকার বানই হালুয়াঘাট হইতে রপ্তানী হয়। জমালপুর মহকুমার নালিতাবাড়ী পাহাড়িয়া কাঠের প্রধান কারবার স্থান। খুস্রিয়া পরগণার গড় জয়নসাহীর প্রচুর শালকাঠ ও গড় গঙ্গানীর (মধুরপুর) অসংখ্য গম্বারি গছ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। এ বিল, নদী ও সরণার নানা জাতীয় অসংখ্য মৎস্য দৃষ্ট হয় (তন্মধ্যে মহাশূল ভারতবিখ্যাত) এবং প্রত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলার রপ্তানী হয়। বিলে বিলে পদ্ম, পানিকল ও সুম্ব পাওয়া যায় স্থানীয় মরিত্ত লোকেরা ইহা হইতে অর্ধোপার্জন করিয়া থাকে।

এ জেলার গ্রামে মাঠে বিলে, বনে, নদী ও পাহাড়ে এমন জিনিষ আছে—যাহা অভিজ্ঞ ও ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের হাতে পড়িলে বাণিজ্যস্বপ্নে একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিকে বুদ্ধি খাটাইবার লোকের অভাব।

মহম্মদসিংহের উৎসাহী কর্ম্মশীল যুবকবৃন্দ! এস অঙ্গর হও, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, শিল বাণিজ্য ও কৃষিতে মনোনিবেশ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করতঃ স্বয়ং দেখে স্বয়ং মনে দীপিকা নির্বাহ কর। সাতসমুদ্র ভেদনরী পার হইয়া, অজানা অচেনা দেশে গিয়া, কত

মনে কত উপায়ে অর্থোপার্জন করিতেছে আর তোমরা ঘরের কোণে বসিয়া পথেরদিকে চাহিয়া অলসভাবে কাল কাটাতেছ, উঠান ছাড়িয়া, গ্রামান্তরে জেলাস্তরে গিয়া, কৰ্মকিং বিশদ আপদের সহিত বৃত্তিমা জীবিকা নিরীহ করিতে পক্ষাৎপন্ন হও কেন? এ ভীতি কেন, পুরুষ সিংহ?

মহমদসিংহ জেলায় গ্রামে গ্রামে অসংখ্য শটির গাছ দুই হই, এ জেলায় ইহা অত্যন্ত অনাদৃত, কৃষক শতক্ষেত্র হইতে এই গাছ ত্যাগাইলে বাচে। কিন্তু এই অনাদৃত শটি হইতে শটির পলো প্রস্তুত করিলে দরিদ্র ও অসাধ্য শ্রীলোকের অর্থোপার্জনের একটা উপায় হইতে পারে।

শটির পলো প্রস্তুতের নিয়ম:—

শটির (হুইট) মূল বা মুড়াগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করতঃ টেকেতে বা অল্প উপায়ে ভালরূপে কুটিয়া একটা পায়ে রাখিয়া দিতে হইবে; ঐ পায়ে একপড়ায়ে জল দিতে হইবে যেন কুটিত শটি জলে ভুবিয়া থাকে। ১০।১২ ঘণ্টা পরে এই জল ভাল রূপে আঙড়াইয়া শটিগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে অথবা কাপড় ছাঁকা করিলেও হয়। এখন যে জল রহিল তাহাতেই পলো আছে। এই জল ৩.৪ ঘণ্টা দিতাইলে নীচে আঠার মত এক প্রকার পদার্থ পড়িবে—ইহাই পলো। তারপর এই জল ফেলিয়া নূতন জল বিধা কুটিতে হইবে। একত্র ৫০ বার জল পরিবর্তনে শটি সাদা ও তিক্ত স্বাদ হীন হইবে, পরে রোজে শুকাইলেই হইল—পলো। ইহাই বাজারে শটির পলো নামে বিক্রয় হয়।

শুককালেই মূল সংগ্রহের সময়। এ জেলায় প্রায় প্রতি গ্রামেই অন্ততঃ ৫০০ মণ শটির মূল সংগৃহীত হইতে পারে। হুতরাং আশ কাল

শটির পলো প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। পলো বিক্রয় করিলে আমরা ক্রোড়ান্ত হিতে পারি। বিক্রয় না করিয়া নিজ কাপে লাগাইয়া বার্ষিক অন্ততঃ ৩৪ টাকা পরচ বাঁচিয়া যায়। গ্রামে গ্রামে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হউক ইহাই আমাদের আশা। গ্রামের শিকত ও সমুদয় ব্যক্তিগণ নিরক্ষর ও অনভিজ্ঞ লোকদিগকে এইরূপ প্রস্তুত প্রাণী শিখাইবেন—ইহাই আমাদের নিবেদন।

প্রান্তবাসী।

### ৩। কৃষি

পিপুল।—অল্প পরিভ্রমে অল্প খরচে অত্যাশুভ লাভ জনক কৃষি, পিপুলের চাষ। ইহার চাষে অতি সামান্য খরচে অল্প দিনে প্রচুর অর্থ উপার্জন হইয়া থাকে। সামান্য সরস মৃত্তিকাতে (সচরাচর জনসাধারণ যে জমিতে পটোলের চাষ করিয়া থাকে) উত্তম রূপ চাষ দিয়া ঢেলা ভাষিয়া ধুলার মত করিয়া লইবে; আশ্বিন মাসের শেষ অথবা কাঠিক মাসের প্রথম ভাগে চারি হাত অন্তর সার করিয়া এক একটী লতা পুতিবে। যতদিন চারা সতেজ না হয়, ততদিন মধ্যে মধ্যে এক একটু জল পেচন করা বিধেয়। লতা বড় হইলে ধনিচা গাছ রোপণ করাই অথবা অল্প প্রকারের মাচা করিয়া দিবে। ধনিচা গাছ রোপণ করাই কর্তব্য। কারণ ইহা একটা প্রধান সার। ধনিচা হইতেই পূর্ববঙ্গে পাটের এত উন্নতি। পূর্ব বঙ্গের কৃষকগণ ক্ষেত্রের চারিদিকে ধনিচা রোপণ করিয়া থাকে। এই ধনিচা গাছ ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রেই পচিয়া মিশিয়া যায় এবং তৎপতিকেই পাট এতবড় হইয়া থাকে। পিপুল ক্ষেত্রে মাচা অথবা ধনিচা গাছ রোপণ করার আবশ্যক



এই যে, লতার অবলম্বন ও ছায়ায় প্রবেশন ইহাতে কোন পাইট খরচ করিয়া নিতান প্রভৃতির আবশ্যক নাই; একমাত্র ছায়া প্রযুক্তই হইবে যাহা উৎকল জমিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

একবার লতা খুঁতিলে মন বদলের নথ্যে আর কিছু করিতে হয় না; কেবল-যাহ জঙ্গল মারিয়া বেওয়া, নতুন লতা রাখিয়া পুরাতনগুলি কাটিয়া ফেলা ইত্যাদি। ফল পাকিলে লতা হইতে এক একটা করিয়া তুলিয়া তাহা শুক করিবে। অন্ন পরিমাণে শুক হইলে চটের উপর রাখিয়া সাবধানে মলিমা দিতে হইবে। এইরূপ দলিতে লিপুলের দানা গোল হয়। বাহার যেমন দানা ও যে লিপুল যেমন গোল সেইরূপ ধরেই ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রতি বিধাতে বৎসর প্রায় ছয় হইতে মণ মণ পর্যন্ত জমিয়া থাকে। ঢাকা জিলার নিকট-বর্তী গড় কাশিমপুর অঞ্চলে মণ হইতে পনের মণ পর্যন্ত কল কলিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বাজারে প্রতি তোলা ৩ পাই হিসাবে অর্থাৎ মন প্রায় ৫০ টাকা করিয়া

খুঁতরা বিক্রি হইতেছে। যদি প্রতি বিধায় কম পক্ষে পাঁচ মণ লিপুলও জন্মে এবং পাইকারী দরে কমপক্ষে ৩০ টাকা হিসাবে বিক্রি করা যায় তাহাণি প্রতি বিধায় ১৫০ টাকা লাভ হইতে পারে। এদেশে যেমন পটোলের চাষ সর্বত্র স্থানে, সেইরূপ লিপুলের চাষও সর্বব্যাপী হওয়া কর্তব্য।

ইহাতে আরও বিশেষ লাভ করিবার ১টি উপায় আছে। লিপুল ক্ষেত্রে আর বা অজ্ঞাত ফলের কলম বা চারা রোপণ করিলে ক্ষতি অল্প দিনের মধ্যেই সাজ সতেজ ও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। বৃক্ষ বলবান হইলে লিপুলের চাষ বন্ধ করিয়া দিলেই লিপুল ক্ষেত্রে একটা বাগানে পরিণত হইল। অথচ বাগান প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থ লাভ। আশাকরি স্থানীয় শিক্ষিত নেতৃবর্গ আপন আপন কৃষি ক্ষেত্রে উহার চাষ করিয়া সাধারণ কৃষকগণকে শিক্ষা দিবেন। এ জিলায় ইহার চাষ প্রচলিত হইলে কৃষকগণের একটা প্রধান অর্থ লাভের উপায় হইবে।

মালদহ সমাচার।

# গাহস্থ

আঁখি মেলে ভোমাঃ অনেক খুঁজেছি, আর আঁখি মেলে নয়,  
বাঁচিবেব ডাওয়া শেষ, সেপি যদি ভিতরে চাটিলে চয়।  
কন্ড অবিহু আকুল স্বপ্ন, ভিতরের নিকে কিবাহু নহন,  
নীলব, কবাই মুগের বসনা দেখারে নামান ভয়,  
অনেক খুঁজেছি আঁখি মেলে, সেপি আঁখি মুকে ঘি ০০।

বাঁচিব বিশ্ব ভূপ, আছে গো শ্রাব-আঁখাব শুধু,  
ভীম গভীর অতল বিরাট, সগতি কবিয়ে ধু ধু।  
তুমি ছড়ারি উঠ পাকলনো, ওকাব হ'রে কাগ গো নুনো,  
এ নাভিপথে স্ববয়শরে, আগ গো পূগাব বঁধু।  
লয়ে চেনে স্বাঃ এত তারা শত কলারভরা নধু।

এমনি কবিতা সকল বিশ্ব আমাতে উঠিবে জাগি,  
বিশ্বের বাল্য, এমনি কবিতা হ'বে তুমি অল্পবয়সী।  
বাঁচিবে চাটিয়া মেলে না তোমারে, নবন দুঃখিয়া বুকেছি এবারে,  
তোমার লাগিয়া ছিঁবি না আর সকলের ছাবে লাগি,  
আঁখাভের ঘন বিশ্বের স্র, আঁখাভে উঠিবে জাগি।

শ্রী কালিদাস রায়।

৬ষ্ঠ খণ্ড

৬ষ্ঠ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২১

পঞ্চম সংখ্যা।

## আলোচনা

১। কংগ্রেস কথা

সকলেই আশা করিয়াছিল এবার সমুদ্র-  
চুম্বিত যাত্রাক সহরে সাগরের খোলা  
হাওয়ায় কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের হৃদয়  
প্রশস্ত হইবে; বহুর পীচেক আগেকার স্বপড়া,  
কোমল, ঘন, অটনকা খন হইতে মুছিয়া

কেলিয়া আর তাই ভাই খাই খাই থাকিবেন  
না, সবাই এক মনে এক প্রাণে এক লাগনায়  
মাক্কুম্বির সেবার শক্তি সামর্থ্যের নিরোগ  
করিবেন। ববীয়নী এ্যানি বেনাভ সবাইকে  
মিলাইবার দস্ত অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন,  
আমাদের মাতঙ্গর মতিলাল ঘোষ মহাশয়

বুড়ো বয়েসে তোড় ভোড় বাঁধিরা মাস্তাকৈ  
হাজির হইয়াছিলেন। বাঞ্চালী জুপেন্দ্রনাথ  
বহু সভাপতি। হুতরাং অনেকই তাবিচা-  
ছিলেন এবার তাক। কংগ্রেস ছোড়া লাগিবে,  
একটা মত বেমনা আয়াম হইবে। হুগাটের  
বক্তা ভক্তের পর কবি রবীন্দ্রনাথ পাবনার  
প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে একটা  
পূর্ব খাঁটি সরল সভা'ঘোষণা করিয়াছিলেন।  
মুত জিনিষ তামিলে আর ছোড়া। সন্তব হয়  
না; কিন্তু যেখানে প্রাণের প্রবাহ অবসর  
হইয়া পড়ে নাই, জীবনীশক্তি যে ক্ষেত্রে  
সুগ্রহুচর, সেখানে ডাকাকৈ জুড়িতে কতক্ষণ?  
তখন অবসর বেশ এমন ঘুম পাড়ানী মাসী  
পিসীর পান্নে অবসর হইয়া পড়ে নাই। কবি  
তাই আশার আনন্দে মা ডেঃ বামী উচ্চারণ  
করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার স্ববীর্ষ  
অভিভাষণটা—কংগ্রেস তব্ব একটা জীবন্ত ও  
বাক্ত জিনিষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং  
এই ডাকার মধ্যে ছোড়ার অমৃত বীজ নিহিত  
রহিয়াছে—এই কথা বেশবাসীর কাণে পৌঁছা-  
ইয়া বিদ্যছিল। তারতবর্ষের অনেক স্থলেই,  
বিশেষতঃ বাঞ্চালার মিলনের অন্ত একটা  
জীৱ আকাক্ষা ও চাকলা হুটিয়া উঠিয়া-  
ছিল। কিন্তু এতদিনেও আমাদের ডাক।  
কংগ্রেস জুড়িল না। গন্তর্গমেন্ট বাঞ্চালাকে  
দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া ছিলেন, আবার বহুভব  
রহ করিয়া বাঞ্চাল্য ছোড়া বিদ্যছেন। কিন্তু  
কৈ! আমরা যেটা ভাঙ্গিয়াছিলাম সেটা কি  
এতদিনেও জুড়িতে পারিলাম? আর কবে  
যে পারিব তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন।  
সেখের বাঁহারা নেতা বলিয়া পরিচিত, আর  
বাঁহারা সেখের কল্যাণ চিন্তা করেন তাঁহার  
ভাবিরা সেখুন এই কংগ্রেসের ডাক। হাট  
কত বড় একটা অক্ষমতার অপবাদ।

• •

## ২। আয়ুর্বেদ সম্মিলন

এবার কলিকাতায় নিখিল ভারতীয়  
আয়ুর্বেদ সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া  
গেল। ভ্রমণপুত্রের রাত-বৈধ্য পণ্ডিত লক্ষ্মী-  
নারায়ণ দাসী তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে  
অনেক কাজের কথা বলিচাছেন; একটা আয়ু-  
রাসা গভীর আশা ও উৎসাহ অভিভাষণের  
ছত্রে ছত্রে হুটিয়া উঠিয়াছে। তারতবর্ষের  
নানা প্রদেশে হইতে অনেক আয়ুর্বেদজ-  
ব্যবসায়ী-প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। একটা  
কিছু করিতে চাইবে, পুরাতনকে নতনের সহিত  
মিলাইয়া তাহার বলধান না করিলে আর  
চলিবে না, ইহাই এই সব সম্মিলনের ভিত্ত-  
কার সভা। বর্তমানের অতিথ-সঙ্কেত এখন  
বাহিরের আক্রমণ ক্রমে প্রচণ্ড হইয়া  
উঠিতেছে, তখন আমাদের যেখানে বেটু-  
শক্তি সঞ্চিত আছে সেইটুকু বাঁচাইয়া পুষ্ট  
করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের সনাতন  
চিত্তির উপরে বাহিরের মাল মললা সংগ্রহ  
করিয়া ইমারৎ গাঁথিতে হইবে। কিন্তু এ  
কাজ কাহারও একলার সাধ্য নহে, এই  
জনাই আজ চারিদিকে জোট বাঁধিবার  
আয়োজন; আর এই জনাই জোট বাঁধাটাই  
আজকাল সর্বত্রই সিদ্ধির প্রাণবন্ধন।

• •

## ৩। রাষ্ট্রভ্রমণতে আমেরিকা

আধুনিক রাষ্ট্রভ্রমণতে আমেরিকা এক  
অভিনব আশা ও সত্যের প্রতিনিধি। এই  
আমেরিকাতেই বিশ্বের সকল জাতি হিরাট  
ও ব্যাপকমিলনে এক মহাজাতি গড়িয়া  
তুলিতেছে। এ জাতির সবটাই ভবিষ্যৎ।  
পশ্চাতের কোনও দুর্জয় বোঝার ভারে ইহার  
অগ্রগামী গতি ক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই।

আমেরিকা নতুন মহাদেশ। ইহার সভ্যতা নতুন, আর পেট সভ্যতার বাণী ও আশা চির নতুন। এইখানেই নিগ্রোক্রীতদাসের পাথরের বেড়ী, গলাব শিকল খুলিয়া তাহাকে মাছের মত গোটাকৃত অধিকার দিবার জন্য উত্তরেব ও দক্ষিণের জনপদসমূহ অসি-হতে আশ্রয়ের বন্ধুর সহিত জুড়িয়াছে। এইখানেই ইউরোপের অমরীন, খোজরীন, আশাহীন নরনারাগণ নবজীবনের নতুন সমৃদ্ধির নতুন নৌভাগ্যের সন্ধান পাইয়াছে। আভিজাত্য, বড় মাছবির হাঁকজমক এখানে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। কাজে কাজেই পৃথিবীর সভ্যতায়, মানব জাতির আশায়, আমেরিকার দান তাহার সম্পূর্ণ নিম্নব হইবে। আবার বিধাতার বিচিত্র বিধানে এইখানেই ভারতবর্ষ তাহার বিজয়ী সন্ধান বিবেকানন্দকে বিশ্বমানবের সভ্যায় যুগযুগান্তরকৃত উপনিষদের সত্ত্বাজের মিলনবাণী উপহার দিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। এই আমেরিকাতেই বিশ্ব-মানব ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়াছিল, আর ভারত-বর্ষ তাহার ভবিষ্যৎ নিয়তির সন্ধান লাভ করেন। এইখানেই আমাদের আত্মবিশ্বস্ত জাতির প্রথম আত্মোৎপত্তি, বাহিরের লোক আশার ও প্রশংসার কোলাহল তুলিয়া আমাদের আগিবার মুখের তন্মাত্রাহু দূর করিয়া দিয়াছিল। আবার এই আমেরিকার সার্বভৌম আলিঞ্চেই ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী, রুশিয়ান্ আলিয়া আমেরিকান হইয়া যায়। নিগ্রোও এখানে একপাশে আপনায় বাঁচিবার পথ করিয়া লয়। হুতরাং বিশ্ব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস, বিশ্বমানবের নৌভাগ্যের উপলব্ধি আমেরিকাকে ছাড়িয়া দিলে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এবং স্রমীপবর্তী

ভবিষ্যতে আমেরিকা গ্রাচা প্রভীচা উভয় মহাদেশের জাতিসমূহের জ্ঞানবিজ্ঞানের তীর্থ হইয়া উঠিবে।

### ৪। বিলাতের ভারতবাসী

স্বায়ত্তভাবে বসবাসের জন্যই হোক, বা শিক্ষা, ব্যবসা কিম্বা অন্ত কোন মতেই হোক, ইংলণ্ডে অধিবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ১২০৫ সালে ইংলণ্ডে নিবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বর্ত-মানে শিক্ষা বিষয়ে যে সব বাধা বিপরীত-হাছে তার অবিধামানেও তখন ছাত্রের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বর্তমানে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২০০০ হইবে। এদের অধিকাংশ লওনে বাস করে এবং ইন্স অফ কোর্টে আইন অধ্যয়ন করে। এডিনবরোতেও বড় কম হইবে না। অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ম্যানচেষ্টার, লীডস্, লিডারপুল, নিউকাসল্, ডাবলিন, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে আছে। কয়েকজন ডাক্তার ইয়র্কশায়ার, ল্যাংকাশায়ার প্রভৃতি স্থানে ব্যবসা চালাইতেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তারা এদেশের বসবাসী। যেমন যেখানে যেখানে বিশেষণ এই লোকসমষ্টি ধর্ম, রাজনীতি এবং প্রবেশগত ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যে বহু আড্ডায় এবং দলে বিভক্ত। ১২০৫ সালে ধর্ম ভারতবাসীদের কার্যকারণিতার বৎসামাত্র প্রভাব যত্নে বিস্তার করিত।

কিন্তু ১২১৪ সালে ইহা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণের মুসলিম-লিগের একটা লগুন শাখা গোলা হইয়াছে। এদিক্ আর্মীর আলি মহাশয় তার সভাপতি। ইহা ভিন্ন পাণ্ডাবের অধিবাসী খোজা কামাল

উদ্ভিনের তথ্যাবধানে ধর্ম প্রচাের একটা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। চব্বতশর আগে মুসলিম-লিগের বে প্রভাব ছিল এখন তা নাই। ক্রমে সমুদ্র ভারতবর্ষের জাতীয়তার প্রতি নিরপেক্ষ আসক্তি বাড়িতেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে একদল মুসলমানের উপর মুসলেম-লিগের আধিপত্য অতি প্রবল। তারপর, আছে "হিন্দু সভা" "আর্য্য-সমাজ" এবং "ব্রাহ্ম-সমাজ"—এই শেষেরটাই সর্বাধিক পুরাতন। কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয় কর্তৃক ব্রাহ্ম-সমাজ খোলা হইয়াছিল এবং এখনও রক্ষিত হইতেছে। "আর্য্য-সমাজ" কয়েকজন পাঞ্জাবী এবং বুদ্ধ প্রবেশবাদিগণ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। "হিন্দু-সভা" মুসলেম-লিগের দ্বারা প্রভাবশালী নয়। বে হিন্দুগণ লগুনে বাস করেন তাঁরা শুণে এবং মধ্যাহ্ন মুসলেম লিগের নেতাগণের সমকক্ষ নন। অধিকাংশই মাত্র নামে হিন্দু। বিধানে বা সহানুভূতিতে তাঁরা হিন্দুমাত্রণ্ড হিন্দু নন—এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বাসীন্দা বা ছাত্রগণের বিশেষ উৎসাহের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের "হিন্দু সভা"র সহিত ইহার হিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। কারণ ভারতীয় "হিন্দু সভা"র একটা সমগ্র ভারতব্যাপী সংগঠন নাই। কাজেই ভারতের বাহিরে হিন্দুর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য ইহার পড়ে নাই। এই ঘটনাগুলি প্রকৃত-পক্ষে হিন্দুর সমাজগত কণ্ঠস্বরের শোচনীয় প্রমাণ।

এই ধর্মাত্মক নায়কগণ ব্যতিরেকে লগুনে অন্তর্বিধ কতকগুলি সমিতি আছে। প্রকৃত্তে সামাজিকতাই উহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত্তপক্ষে উহারা স্থাপিত্য বা কার্য্য-ব্যয়ের স্বাভাবিক মতের সমর্থক নাত্র।

সমুদ্রগুলিই যেন বড়বড় এবং কলামটির জগৎ। এদের ভাষাভাষি এবং সর্বাঙ্গী-পূরণ ব্যবহার বেশি জববে আশাবিন্দু মাত্র থাকে না। "নিজে নিজেই" এভাবেটা "প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিকল্পে" এই ভাবের দ্বারা এতটা অনিষ্টকর নয়। বেশের নামে স্বার্থবাহনা চালান, অন্তের অহিত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা অপরকে অব্যাহত অবস্থায় ফেলা, অপরকে পক্ষান্তে ফেলার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, নেতৃত্বানীর ব্যক্তিগণের প্রভাবদৃষ্ট প্রাধান্য অন্তের মত অবগ্রাহ্য করা ইত্যাদি যেমন ভারতবর্ষে ভেদমি বিশেষণ্ড ঠিক সেই পরিমাণেই বিদ্যমান—বেশী হইবে কোন মতেই কম হইবার নয়। অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীরই পণ্য দ্রব্য দুইটি "ব্রহ্ম বাৎসল্য" এবং "স্বাভাবিকতা"। যেখানে তিনি সেই ধানেই এই দুইটি—আর সর্বা-ধিক। স্বার্থবাহনক বাধায়েই তিনি ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। অতি দুর্গতির কথা এই যে কোন কোন বংশীয়কে হয় সাক্ষ্য-স্বত্ব দোষারোপ করা বা হেয় জ্ঞান করা যেন তার একটা নিত্যনৈমিত্তিক অবস্থা প্রয়োজন।

ইংলেণ্ডে, প্রকৃত্তপক্ষে, লগুনের ভারতবাসী-গণকে নিঃস্বত্রে বিভক্ত করা বা হেয় জ্ঞান করা যেন তার একটা নিত্যনৈমিত্তিক অবস্থা প্রয়োজন।

১। বাহারা ব্যবসা বা অত্র কোন কার্য্য উপলক্ষে আসেন।

২। বাহারা এদেশে কোন ব্যবসা-সইয়া হারীভাবে বাস করিতেছেন।

৩। বাহারা কার্য্যকীর্তন হইতে অবসর সইয়া গন্তর্গমেষ্ঠের পেনশন বা অত্র কোন মতে এদেশে হারীভাবে বাস করিতেছেন।

৪। অনেকানেক গন্তর্গমেষ্ঠ কর্ত্তারী,

যেমন আই, এম্, এন্ এবং অন্যান্য অনেক ইহারা প্রাচ্যেই এদেশে আসেন এবং লম্বা লম্বা ছুটি এদেশে কাটাঁইয়া থাকেন। উদ্ভেদ্ত বিবিধ—স্বকীয় জ্ঞানের উন্নতি এবং সম্মান-গণের শিক্ষা।

৫। স্বাধী বা অস্বাধী পেশাবার রাজনীতি-বেস্তাগণ। ইহাদের দারবা ইংলেও বাস অথবা পরিমর্শন করিলে, বিশেষতঃ প্রকান্তে কোন রাজনৈতিক মিশন লইয়া আসিলে, স্বকীয় বেশবাসিগণের চোখে ইহাদের মান বাড়িয়া ঘাইবে—আবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ রাজপুরুষগণের সহিত মেশামেশিরও সুযোগ ঘটিবে।

৬। অনেকে ভারতীয় উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নম্বর এড়াইতে বিলাতে আসেন।

৭। ছাত্রগণ।

### লগুনে পেশাবার ভারত-প্রতিনিধি

যাহারা পক্ষম স্বেষ্টর অন্তর্গত তাঁহারা ই অতীব ভয়ানক। কেহ কেহ দেশ হইতে রানি রানি অর্থ উপার্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন কিন্তু ঠিক যতদিন এবং যতদূর তাঁহাদের নিজ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় ততদূর যাত্রা। ইহারা প্রতিনিধিক গ্রহণ করেন এবং নেতা বান্ধিয়া পরিচিতি হইতে চাহেন। কেহ কেহ দেশীয় রাজবৃন্দ হইতে নিয়মিত বা অনিয়মিত বৃত্তি পাইয়াও থাকেন। কেহ কেহ ছুই চাল খেলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা কর্তৃপক্ষের সহিত মেশামেশি করেন এবং রাজতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য পতঙ্গমেষ্টের কোন কাজ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন।

আবার জাতীয়তার সম্বন্ধগণের সঙ্গেও তাঁহারা বন্ধুত্ব রাখিতে সক্ষম করেন না। তাঁহাদের সংবাদ বাহির করা, তাঁহাদের নামে চান্দা সংগ্রহ করা, ব্যবহৃত লিখলন জুটান ইত্যাদি কার্যে তাঁহারা বিশেষ পটু। কিন্তু সব কাজের পিছনে সেই এক অভিসন্ধি—নিজ লাভ এবং নাম। অর্থ লাভ হয় ত অনেকের বিশেষ উদ্ভেদ্ত নয়। তাঁহারা অন্তরূপ লাভের আশা করেন। তাঁহারা বিখ্যাত লোকগণের সাক্ষাৎলাভ করেন, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ এবং সেই পরামর্শবাহী কাজ করিয়া নিজ প্রতিপত্তির বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা যুক্তি বা তর্কের খার খারেন না। তাঁহারা বলেন, “কোন কিছুর জন্য বাহির হইয়াছি এবং যে ডাবেই হোক তা পাইতেই হইবে।” ছেলের অগ্রপ্রাশন, মেয়ের বিয়ে, বাপ মার কাছে সূচি কি চিড়ে পাওয়াবে এই সমস্তার সমাধান আর রাজনৈতিক সমস্তার মীমাংসা করণের মধ্যে যে তফাৎ আছে একথা এই জাতীয় লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। আবার ইহাবিগণকে বিলুপ্তপ্রায় প্রতিযোগিতার ভাব দেখাইলে অথবা যতে বিভিন্নতা দেখাইলে অমনি একট্রিমিষ্ট, অপরিগ্রাহ্যমণী এবং অকাঙ্ক্ষণইর মার্ক। কপালে তার পড়িবেই। রাজনীতিতে যে ঐকান্তিকতা আছে একথা তাদের চিন্তাভ্রান্তিতে প্রবেশ করে না—কাজে তার কথা ত তাদের মুখে আসেই না। এই ধরণের রাজনৈতিক কাজই ইংলেও করা হইয়া থাকে—আর এর ফল অতীব পোচ-নীর। যে কেবল যুক্তি যুক্তি অসম্ভাব্য লইয়া জীবন কাটায় তার উপর ইংরেজের কোন সম্মান হয় না। দারা রূপা বা অসুখের প্রার্থী, দাহারা বিশেষ সুবিধা বা রেহাই

পাখার অল্প ইশরের নিকট প্রার্থনা করে  
তাহারা কোন কালেও মর্যাদার পাত্র হইতে  
পারে না। অবশ্যই ধাংলো-ইতিহাসগণ  
ইহাদিগকে খুবই পছন্দ করে। ইতিহাস  
অফিসও পিঠে হাত বুলাইয়া, মুচুকি হাসিয়া  
কাজ হাসিল করিতে কম করে না; কিন্তু  
স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে ঘৃণা। ঐহ  
অল্প কিছু করে না। যে আমোলনের  
ইহারা প্রতিনিধি এবং যে দলের ইহারা  
নেতা—তার প্রতি অলঙ্ঘ্য স্বাভাবিক হইয়া  
উঠে। ইহাদের ইজমিগুলি ইহারা অত্যন্ত  
ব্যবহার করিতে চাভেন না। চা, লাফিগন,  
জিনার, এ্যাট হোম এবং সন্নিহনীতে ইহারা  
প্রায়ই নিম্নরূপ পাইদা থাকেন—এতে নিকট  
দৈর চোকে ইহাদের খুব সম্মান বৃদ্ধি হইল  
বোধ হয়। এর কল হই এই—য য প্রাণান্তে  
এবং য য জানে মত্ত হওয়ার ব্যবহার এবং  
কথা-বাতীয়া ইহারা শিব স্বানীদের দ্বারা হইয়া  
উঠে—দেশের যুবকগণের উপর এদের যে  
সামাজ্য আদিপত্য থাকে তাও কালে লয়  
হয়। এই মহোদয়গণ কি ভাবে অপরের  
গ্রন্থদ্বার চালিত সমিতি ও সন্নিহনী নিকট  
স্বার্থের অল্প ব্যবহার করেন তাহা দেখিয়া  
সংলোকের মুখে তাজিল্যআপক হাদি তির  
অল্প কিছুই আসে না। আরও যুগার কথা  
এই—ইহারা অল্পের তাবনা চিন্তা গ্রহণ  
করে এবং নিম্ন বসিয়া চালাইতে চায়।  
বেশবাসিগণ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ পাতক  
এই দাবী করে। অথচ কোথা হইতে যে  
ধারণা গ্রহণ করিল তাহা প্রকৃত উৎপাদকে  
বা দেশীয় লোকগণকে জানাইতে বিন্দুমাত্র  
চেষ্টা করে না। এই উভয়কেই কার্যকলাপের  
বাহিরে রাখাই এই মহোদয়গণের প্রধান  
চেষ্টা। আর এক নিষ্ঠুর ব্যবহার এই যে

অনেক সঙ্কল্প মহিলাগণও এই মহোদয়গণের  
দ্বারা বাধ্য হইত হন।

• •

## ইংলণ্ডে ভারতীয় যুবক—

### সম্প্রদায়

এই কাত দেখিয়া দেশের ভবিষ্যতে হোশ  
হবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? চারিদিকে  
নীচতা ক্ষুদ্র বিষাসঘাতকতা। তির অল্প  
কিছু নাই। অধিকাংশ স্থলেই দেশভক্তি  
কেবল খৌ উচ্চ অভিলাষের যুগল মাত্র।  
কেবল নিম্নলিখিত, স্পষ্টবক্তা, কিন্তু প্রায়ই  
অবিবেচক যুবকদের সেন ও দেশের  
ভবিষ্যৎ বিষয়ক কথা। তিনাইই যনের এই  
অবস্থায় আশার রেখা উঠে এবং আত্মদুঃ  
উপস্থিত হয়। এই যুবকদের যে অনেক স্থলে  
একগুণে তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই  
নাই। তাহারা উৎসাহশীল, তাহারা দেশের  
প্রকৃত অবস্থা জানে না, কাজেই প্রতিপদে  
তাহারা অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। সঙ্কল্প  
পরিচালকের অভাবে, এবং যৌবনমূলত  
অহতব শক্তির অহুত্ব ভালবাসাপূর্ণ  
নিয়োগকারির অভাবে তাহারা প্রায়ই রাষ্ট্রীয়  
কর্মক্ষেত্রের হ্রসবে চলিবার সুযোগ পায় না।

নেতারা তাহাদিগকে ভালবাসেন না।  
তাহাদের এই যুবকগণের প্রতি সুবিবেচনা  
বা খেঁচোর লেশ মাত্র নাই। “কড়ি”র মত  
জীবনের দাবা খেলায় এই যুবকদের  
ব্যবহারই তাহাদের কাছে এদের একমাত্র  
প্রয়োজন। দৌহগুণে ইহাদিগকে শাসন  
করাই তাহাদের বাসনা। তাহারা সৈন্ত-ইন্ড  
শাসন নীতির স্বয়ংপাত করিতে চাভেন।  
তাহাদের কেবল যন্ত্রের প্রয়োজন—সংকারী  
দিয়া তাহাদের কি হইবে? তাহাদের উদ্দেশ্য

আদেশ প্রদান—কোন মতেই বৃষ্টিপরিচায়ক সহকারিতা তাঁদের চোখে লাগে না। অগাধ, অজান, অনভিজ্ঞ এবং অগতের জ্ঞানে অপরূপ বলিয়া এই বৃষ্টিগণকে অন্যথ্যসেই তাঁহারা সম্বোধিত করেন। কিয় নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইহাদিগকে দিতে, ইহাদিগকে শিখাইতে, তরু করিয়া বৃষ্টিভেদে, উপদেশ বা কার্যকলাপে ধৈর্য্য এবং আন্তরিকতা শিখাইতে—অসম্ভবক্ষেপন করা প্রয়োজন অনুভব করেন না। এই নেতার দল যদি মনে করেন যে বৃষ্টিগণ অন্ধের মত তাঁহাদিগকে অহরণ করিবে—তবে তাঁদের অপেক্ষা ভ্রান্ত আর স্তম্ভকে? কখনও কখনও অনেক ক্রীড়ার ভাগ্যে অন্ধের মত অহরণকারী ডল (কুটো) কিছু দেখেন। কিছু নেতা। কিছু নেতা? ইহাদের উদ্বেগ বহু, ইহাদের জীবন যেন একখানি উজ্জ্বল পুস্তক, ইহাদের চরিত্র নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ এবং উন্নত, ইহাদের ব্যবহার যথোপযোজ্য, ইহাদের জীবন এক ধারাবাহিক সার্থকতা এবং আত্মবিশ্বস্তির কাহিনী—তাঁহাদেরই ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চ অভিজ্ঞতাগ্ৰন্থ সাধারণ মর্ত্যগণ গত জীবনে বহু সম্বোধন করিয়া গিয়া থাকিয়া সন্নিহিত উপায়ে কার্য সমাধা করিয়া, অসুস্থ এবং অপরিচিত উপায়ে উপাধিকৃত ধনের প্রদান্য ভোগ সম্বোধন্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া, নীচ অন্তঃকরণ এবং অসুস্থ মস্তিষ্ক লইয়া, যখন সুবিধা, অভিসন্ধি, জ্ঞান, দেশভক্তি এবং বয়সের নামে সকলের হাত হইতে অনিচ্ছা ভক্তি এবং বস্ত্রতা আনা করেন তখন তার চেয়ে শোচনীয় আর কি হইতে পারে? আবার যাদের কাছ থেকে এই বস্ত্রতা আনা করেন তারা হয়ত অনেক বেশী শিক্ষিত, তাঁদের আশা অভিজ্ঞতা অনেক বেশী উন্নত। কেবল দোষ তাহারা বয়সে

কনিষ্ঠ—কারেই উপযুক্ত নেতৃত্বের বিবিধ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে নাই। ভারতবর্ষের হটক আর ভারতের বাহিরের হটক, ভারতীয় বৃষ্টিগণ এতদে মূর্ত্তি পূজ্য আর হইয়া পড়িয়াছে। কর্তৃপক্ষের হুগুমে তথ্যগুণে আর তাহারা কোন মতেই প্রভুত নয়।

অন্তঃকরণের বিস্তৃতি ভাব এবং অভিজ্ঞতার মহত্ব কেবল সুযোগ এবং কুটনীতিজন্য চূর্ণ ভ্রাম্যবশেষে বিনোদ হইতে দিতে তাহারা কোনমতেই রাজী নয়। কোন মতের গভীরতা এবং উদ্বেগের সূচিতার বিষয় আগে তাহাদের উপলব্ধি করাইতে হইবে। তরু করিয়া তাহাদের নিবের চালে তাহাদিগকে পরাভিত করিতে হইবে। তারপর তাহারা সম্মান করিতে এবং আদেশ পালন করিতে চাহিবে। বেশের প্রতি ভুলেযাওয়ার অম্বা: প্রমাণ এবং নবীন দলের প্রতি অরুচি ব্রহ্মের পরিচয় দিলেই ত তাহাদের অম্বা ভক্তি এবং সম্মানের পাত্র হওয়া যাবে। তাহাদের একত্বাধি, চপল এবং প্রগল্ভ অচ্যাপ্তগণি অতি অতৃপ্তিকর হইলেও তাঁর প্রতি ধৈর্য্য থাকা চাই। অবশ্যই নেতৃত্বের নিরস্ত্রিত ভাষা এবং স্থানিক পর্বাধিকারের পক্ষে এই পবিত্র অতীত অপ্রীতিকর। কিন্তু কথাবার্ত্তা এবং ভালবাসার তাহাদিগকে হাত করিতে হইবে। সর্বাধিক, গুরুতর কর্তব্য—নিজ জীবন এবং নিজ চরিত্র উভয়েই একেবারে সম্বোধনের সীমাবদ্ধ হইতে রাখিতে হইবে। মুক্তি নিজেই হটক, তরু প্রবল হটক, তরুর উত্তর দেয়াল অসম্ভব হটক, এ সব গুণ যথেষ্ট যদি জীবন, বিশুদ্ধ না হয় এবং অত্যাধিক নিঃসার্থক নবীনদের সম্বোধন্যে গণ্য না হয়—কোনমতেই তাহারা



কোন লোকের নেতৃত্ব স্বীকার করিবে না।  
কিন্তু এ গুণগুলি না থাকিয়া কেবল স্বভাবটী  
থাকে—তবে নবীনদের স্বাধীন ভক্তি পাওয়ার  
শুভ ই সম্ভাবনা।

### ৭। বর্তমান ভারতের নেতৃত্ব

অধিকাংশ কংগ্রেসের নেতৃগণই পুরাতন  
কালের শেখাংশ মাত্র। অনেকই অতি  
ব্যস্ত হইয়া জীবন কাটাইয়াছেন এবং এখনও  
মাত্র অবসরকাল সাধারণ কর্তব্যে ক্ষেপণ  
করিতে পারেন। স্ব স্ব ভাব এবং পারিবারিক  
ব্যর্থেই তাঁহারা অতীত জীবন কাটাইয়াছেন।  
তাঁহাদের বেশভূষা নিম্নতর গরের। বেশ  
ভুক্তি তাঁহাদের প্রাথমিক সঙ্কলিত করে  
না। ঘটনার জ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজনীতি  
বিজ্ঞানের জ্ঞানও পুরাতন ধরণের। তাঁহা-  
দের সাধারণ জীবনের ধারণা সবই সেকেলে।  
বেশী বস্তুতে গেলে—সম্মুখ দিকে দাবিত  
একদল পথদাতার মধ্যে তাঁহারা করে কটী  
নির্দেশক মাত্র। পথের পার্শ্বে সাক্ষীপাথ-  
রের ভায় তাঁহারা বিভ্রম। কিন্তু সেই  
সময় অনেক কালটী লোকে চলিয়া শেষ  
বলিয়াছে। নবীন মল উন্নতির পথে অগ্রসর  
হইতে হইতে চিন্তা এবং ভাবমগ্ন হইতে  
হইতে অনেক আগে গিয়া পড়িয়াছেন।  
তাঁহাদের কাজ সমাধা হইয়াছে। তাঁহাদের  
পক্ষে শুকস্বের ভাব ধারণ এবং সকলেই  
কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের পানে লাগিয়া  
থাকিবে এ আশা-পোষণ কিছু বেশী আশা  
বলিয়া বোধ হয়—এ আশার পরিণাম তাঁহা-  
দেরই নির্মল অমর। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক  
অবস্থা নেতৃগণের সহযোগী হইতে বাধ্য  
হন তাঁহাদের বিপক্ষীয় এবং কষ্টভোগ কম

হয় না। যদি তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে অচ্যুত  
থাকিতে চান এবং নেতৃত্ব অক্ষর রাখিতে  
চান তবে তাঁহাদেরকে অগ্রসর হইতে  
হইবে। এই অগ্রসর হওয়ার ব্যয় এবং  
সাধনের প্রয়োজন। কার্যকারীদের মধ্যে  
নিম্ন ও শাস্তি রক্ষার ক্ষমতা মধ্যে নিম্ন  
ক্ষমতারও প্রয়োগ করিতে হইবে। এমন  
কি সাধারণের স্বার্থে যেখানে বামা প্রয়োজন  
সেই ধর্ম্মিয়ারও হস্ত দিতে হইবে। কিন্তু  
তাঁহারা যখন জিন বৎসর আগে যে এক  
মার্টের কোণার প্রথম রাজ্যগণকর্তৃক স্থাপিত  
হইয়াছিলেন সেইখানেই থাকিতে চান, যখন  
তাঁহারা আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার বিপক্ষ  
বাদী হন, যখন নিজেদের যেখানে আছেন  
টিক সেইখানেই থাকার ব্যবস্থা করেন  
কি শুধুই অবৈধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে  
থাকা যায়? না, দুর্ব্বল এবং এমনকি পাগ-  
লামি বলিয়া বোধ হয়। কেহই তাঁহাদের  
কথা শুক্কেপও করিবে না—আদেশ পালন  
তরুর কথা। এ পরিণামে একটা কল  
অবস্থা হইবে। বাহ্যিক অগ্রসর প্রবণ তাঁহারা  
পথপ্রদর্শকগণকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া  
যাইবে। সুস্থ মনে এবং পরাক্রান্ত হইয়া  
তাঁহারা অবশ্যই প্রতিশোধে নিবদ্ধ হইবেন।  
এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশোধের  
সাফল্যও হইতে পারে।

বিলাতের ভারতীয় ছাত্রেরা বরকপুত্রের  
স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।  
কিন্তু অধিকাংশই বরকপন হইতে মু-  
খ্যত এবং স্বর্ধ বা সমাধের প্রতি ক্ষেপণও  
করে না। ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞগণ ছাত্র-  
গণের প্রতি বঙ্গমাত্র লক্ষ্যই করিয়া  
থাকেন। তবে তাঁহাদের সত্য-সমিতির  
কোন পূরণ করিতে বা সম্মিলনের একটা



ଦର୍ଶନୀୟ ଅସୋରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ভারতবাসী প্রকাশ করিতে ভারতবাসীর প্রয়োজন হইলে—রাজনীতিতে তাহারিগণকে জড়াইতে চাচ্ছেন। মাত্র দু'একটা ভিন্ন, লগুনে ভারতবাসীগণ কোন কালে ভারতীয় ছাত্রগণকে বাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ করা, বা তাহাদের পরিচর্য করিতে প্রয়াস পাওয়া, তাহাদের সঙ্গে মেশা বা কোনমতে তাহাদের কোন কাজ করিতে বিশ্বাস্য ব্যগ্রতা দেখান কি না সম্বন্ধেই বিষয়। যে যে সমিতিতে ভারতবাসী ছাত্রগণ প্রবেশ পাও সেখানে রাজনীতি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। লগুনে এমন কোন স্থান নাই যেখানে ভারতবাসী ছাত্রগণ ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে ব্যক্তি-বৃন্দের মধ্যে আলোচনা করিতে পারে। কাজেই সে যে নিজ বাণী মত গঠন করিবে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর বিশ্বাসের চোকে দেখে এ কথা আশ্চর্য্য ছইবার কোন কারণই নাই। প্রায় শতকরা ৯০ জন ভারতবাসী ছাত্রের রাজনৈতিক মত কংগ্রেস কার্যবিধির বিরুদ্ধবাদী। কংগ্রেসের ব্যবহারপ্রণালী ছাত্রগণ অতিশয় অপছন্দ করে—আর এ অপছন্দ ভাব তাহারা কোনমতেই গোপন করিতে চেষ্টা করে না।

## ৮। বিলাতে যুবকজীবন

প্রয়োজনমত চালনার অভাবে যুবকগণের সহজেই আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি আসক্তি জন্মে। ইংলণ্ডে যুবকগণের অভিজ্ঞতাকর কোন অর্থই নাই। ইংরাজ ছাত্রগণ সহ-পাঠীগণের মত দ্বারা চালিত হয়। আরও তাহাদের নিজ নিজ পরিবারের সম্পর্কও কম কার্যকারী নয়। ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে

এই বিবিধ প্রাধিকারই অভাব। বিশেষ একেবারে বিভিন্ন আচার ব্যবহারের মধ্যে অতি প্রথম প্রলোভনের মধ্যে তাহাদের নিজ সন্নিবিষ্ট জাত্যদের একমাত্র বন্ধ। এই ক্ষেত্রে, এতগুলি যে ব্যাপার পথে যায় তাতে কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নাই। কিন্তু এত অল্প সংখ্যক যে দুইশতাব্দীমুখী তাহাতেই আশ্চর্য্য্য মানিতে হয়। ২১ম জুন ১৯০৭ সালের বোর্ডের বাড়ীর উৎপত্তি কর্তৃপক্ষের এই ঘোষা আলোচনের এবং কতক পরিমাণ সহায়তার বাসনা হইতে হয়। প্রায়শ্চিন্ত লক্ষ্য হইয়াছে কোনমতেই বলা যায় না। ভারতবাসী ছাত্রগণের সহায়তা করা এবং আতিথ্য সংকার এবং এসেলে থাকা কালীন সম্মান-সম্বন্ধে ব্যবস্থা অতীব প্রশংসনীয় এবং সুঅভিপ্রেরিত কাজ সম্বন্ধে নাই। কিন্তু যে দোষে ভারতবাসী ছাত্রগণ ভোগে তার প্রতীকারের ব্যবস্থা ইহা হইতে বেশী হবার নয়। ভারতবাসী ছাত্রের সম্বন্ধে এই যে আতিথ্যের প্রধান উদ্দেশ্য তার রাজনৈতিক মত চালনা করা—এই আতিথ্যের উদ্দেশ্য হাত হুলাইয়া জাতীয়তাবাদ তরু করিয়া রাখা। মিটার সহকারে চা পান করা ইহা স্বাধীনতাকে ছুঁয়াইয়া দেওয়া। রাজনৈতিক অতিসন্ধি। এই সুন্দরীমানা তাব বিহারী দেখান তাহারা ছাত্রদের বিশেষ সুখার পায়। কারণ বাহাই হটক, দর্পণবেট দার্বৈদ্য এবং বতকটা কর্তৃপক্ষের শাসনাবধানে ভারতীয় ছাত্রগণের পরিচালনা কৃতকার্য্য হয় নাই। প্রবাসী ভারতবাসীগণও ছাত্রগণের তত্ত্ব বা ভালবাসা পাবার মত কিছুই করেন নাই। কাজেই ছাত্রগণ নিজেদের উপর নির্ভর করে এবং যথা ইচ্ছা পতিবিধি করে।

বিহারী লগুন পরিদর্শন করিতে আলেন

ভাষার জ্ঞানপত্রকে বড় একটা সংস্কৃত দিয়া যান না। উদ্ভাসের জীবন এবং চাপ চাপন ভারতীয় জীবনের রীতিনীতি এবং ভারতীয় বরষ পত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য—কলেই অগচ্চ এবং অতিমাত্র ব্যয় হ্রাস। অনেক বৈদেশিক নেতাগণ ইংলণ্ডে এভাবে অর্থ অপব্যয় করেন যেন দেশে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ইহার ফলে ছাত্রগণও এই ব্যবস্থার অভ্যাস-অনুশীলনে অত্যন্ত হ্রাস। এ অভ্যাস ভবিষ্যতে হ্রাস পায় হইয়া উঠে—কারণই দেশের পক্ষে স্রে অর্থব্যয়ের মধ্যে চিরকালের জন্য গণ্য হইবে। জীবনের অবশিষ্টাংশ অর্থ উপার্জনে এবং অর্থ উপার্জন করিয়া ভোগলিপ্সুর তৃষ্ণা-সাধনেই অতিবাহিত হয়।

লগুন ক্রমে যেন ভারতবাসীদের কান্না হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর পরিদর্শকের স্রোত বাড়িতেছে। ছাত্রদের সংখ্যাও কমে নাই। যদি এদেশে বাসকালে ভারতীয় ছাত্রগণের মিতাভ্যাস, জ্ঞান এবং প্রগতি বেশভক্তি বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য হয় তবে এখন সে সমর আদিয়াছে যখন বেশভক্ত ভারত-বাসিনীদের একত্র মিলিয়া ছাত্রগণের উপযুক্ত এবং সচ্ছন্দ পরিচালনার ব্যবস্থা করা উচিত।

• •

## ৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

আমাদের “সাহিত্য পরিষৎ” এবার বাইশ বৎসরে পঞ্চাৰ্পণ করিল। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা। যিনি সরকারীচাকরী গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির সেবা তুলিয়া যান নাই, বিদেশী ভাষার অসংখ্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মাতৃভাষার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বিরত হন নাই, সেই অসংখ্যকণ্ঠ বৈদেশ-সেবক ও সাহিত্য-বদী যদ্যেচক্ষু দস্ত মহোদয়

ইহার প্রথম সভাপতি। বিদেশী ভাষার, বিদেশী সাহিত্যের মোহমদিরা তখন শিথিলসমাজের চিত্ত উদ্ভাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কিছু পূর্বে বক্তব্যের প্রমুখ কয়েকজন মহাত্মা ‘রমনী বন্ধভাষা’র মন্দিরে শ্রদ্ধাধিনি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তখন ভাষার বিরাট নিষিদ্ধির আতান পাঠ নাই। কারণ কায়েই তখন যদ্যেচক্ষু মাটিতে প্রবেশের উপাধানে মন্দির গড়িবার সংকল্প দুই চারি জন ব্যতীত কাহারও হৃদয়ে জাগে নাই। বাঙ্গালীর ভাষা একদিন বিশ্বমানবের মহা-সভায় স্বয়ংমালা পাইবে, বাঙ্গালীর গান বাঙ্গালীর কাব্য, বাঙ্গালীর সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে আপনার দান পৌছাইয়া দিবে—এটা যে সেই আত্মবিশ্বস্তির সুগে বাতুলের কল্পনা! বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ দীর্ঘ দীর্ঘে বাঙ্গালার মাটি ও জল বাহু হইতে পুষ্টিকর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। বিদেশী মোহ ভাঙিয়া যখন বঙ্গবাসীরা, চিত্ত দেশের দিকে ফিরিতে ছিল, তখন পুষ্টির বিবিধ সন্ধান, সাধনার বিভিন্ন উপকরণ মাতৃভাষার এই পরিষৎ বেদীতলে আদিয়া জুটিতে লাগিল। সাহিত্যপরিষৎ নবযুগের একটা পীঠস্থান হইয়া উঠিল। ছাপাখানার সুগের বহুপূর্বে বাহারা বন্ধভাষার বই লিখিয়াছিলেন তাহাদের অবসর রক্তিত পুঁথিগুলি হঠাৎ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমরা বুকিলাম আমাদের সাহিত্য সেদিনকার নহে আমাদের চোখের পরমা পুল্লিয়া গেল। শতাব্দীর পর শতাব্দী বহিয়া কত ভক্ত সাধকের বাণী সেই উপেক্ষিত পুঁথিগুলির কর্ণপথে পুঞ্জীভূত হইয়াছে! এইসব পুঁথি প্রমাণ করিয়া দিল বাঙ্গালীর প্রাণ কখনও মৃত্যুর স্পর্শে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই, একটা প্রাণবান কাব্য,



ବଜ୍ରୀୟ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ-ଗନ୍ଧିର

সাধা ও স্মৃতি সাহিত্য চিত্রয়িতাই জীবনীপন্থি ও ভক্তি বিশ্বাসের প্রাচুর্যে দেশের স্রবণ ও সজীব জগৎকে আরও স্রবণ ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে। নৃতনের আঘাত, নৃতনের সংঘর্ষ তাই বাঙ্গালীকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে না; বাঙ্গালী তাই সকলের আগে আপনাকে সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল। তারপর যেদিন যেন “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক” বলি উঠিল, সেদিন সাধারণ লোক খেলিল তাহাদের চারিধারে মাতৃপুত্রার বহু পবিত্র পীঠও পূর্ণ হইতেই প্রস্তুত রহিয়াছে। “সাহিত্য পরিষৎ” আর বাঙ্গালীর কাছে একটা ‘একাত্তমি’ মাত্র নহে; ইহা একটা পুত্রার পীঠ। আর সাহিত্য পরিষদের দুই সংসদ সভা। বহু মেলায় সাধা পরিষৎগুলি ইহার প্রভাব ও কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। দেশের অনেক ধনশালী হুসন্তান পরিষদের মন্দির নির্মাণ, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন। বাঙ্গালী আজ কাল মিলিতে চায়, মিলিতে ভালবাসে। সাহিত্য পরিষৎ এখন মাতৃভাবাহুধক বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র “সাহিত্য সম্মিলনের” কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় মল্লানাম সফল কবি শিরোমণি কালিদাসের কাব্য ও নাটক সমূহের ব্যাখ্যার সময় বলিয়াছিলেন “দ্রব্যাত্ম্যবিষমুক্তিতাং কালিদাসস্য ভারতীং, ভাবম্। জীবনবিজ্ঞানম্”।

বঙ্গসাহিত্যপরিষৎও আজ সানন্দে লক্ষ্যধনি করিয়া যোষণা করিতে পারেন “অবজ্ঞা-বিষমুক্তিত বঙ্গের অতীত সাহিত্য অতীত দৌরবন্দ্যাদিনীকে আনি সজীবিত করিয়া তুলিবেহি।” আর বাঙ্গালী পরিষদের লক্ষ্যধনি কখন, তাহার ভ্রাম্যদিনী মাতৃভূমির

প্রায়ে নগরে ইহার কেন্দ্র বিস্তৃত করিয়া দিউন।

দেশের সর্বত্র একটা সাহিত্যসাধনার আকাঙ্ক্ষা আপাইয়া তুলুন। সাহিত্য জাতির জীবনের প্রতিবিম্ব। সাহিত্য বৈচিত্র্য ও রস ভগ্ননই হুটিয়া উঠিয়াছে, এখন জাতির জ্বর নব ভাব নব আকাঙ্ক্ষা ও নূতন কল্পনার আন্দোলিত হইয়াছে। আমাদের বর্তমানযুগ নূতন যুগের, “ব্রিটিশ কল্পনার বলবতী আকাঙ্ক্ষার যুগ। এখন চাই এই বিপুল শক্তির আত্মপ্রকাশের উপযোগী বিশাল বিচিত্র সাহিত্য। আর এই সাহিত্যের স্রষ্টাদের জন্য একনিষ্ঠ সহায়বান্ সাধক চাই। তাহারায় সারা জগৎ দিয়া অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংযোগস্থল উপলব্ধি করিবেন, আর তাহা হুটাইয়া তুলিবার জন্য ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে আপনাদের শক্তি উৎসর্গ করিবেন। শিক্ত বাঙ্গালীকে আজ এই কথাটি বৃষ্টিতে হইবে, নচেৎ তাহার সাধনার কেন্দ্র সর্বাঙ্গ হইয়া পড়িবে।

বাঙ্গালার সাহিত্য পরিষৎ ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যত্র দেশের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে; হুতরাং বাঙ্গালার ভাবুক ও কবীশ্বরের এই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

• •

## ১০। বাঙ্গালার একজন পরলোক-গত হুসন্তান

ইহাদের প্রতিভা, কর্মফলশ্রুতি ও চরিত্র-বল আশ্রয় করিয়া ইংরেজীলিঙ্গায় প্রথমযুগে বাঙ্গালার প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তারিত করিয়াছিল, তাহাদের একজন ডাক্তার অখোর

নাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি এস, সি, পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণী গ্রামে অখোর নামের গৃহস্থ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ অনেকই প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য ও বনবিহার রত বিক্রমপুর অঞ্চলে স্থায়িত্ব ছিলেন। অখোর নাথও বাল্যকাল হইতেই পিতৃহলের গুণগুলির পরিচয় লিখা-ছিলেন। ঢাকা কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাত কয়েন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানপিপাসা এখানকার শিক্ষার পরিতৃপ্ত হয় নাই। ১৮৭০ সালে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া অখোর নাথ বিলাতে পড়িতে যান। এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদিত লর্ডকেলভিনের নিকট বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়ে অধ্যাপক তাঁহার বীণক্তি ও গবেষণার বিস্তার প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। ১৮৭২ সালে বি, এস, সি পরীক্ষায় বহু ভীষণী ইংরাজ ছাত্রকে পরাভ করিয়া তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পদার্থ বিদ্যায় স্কোর্ফোর্ড পুস্তক "ব্যাক্টার প্রাইজ" ও তাঁহার "করভলগত হয়। পরে রসায়ন বিদ্যায় রুশিগ "হোপ প্রাইজ" প্রতিযোগিতায় কেব্রিড্জ ও লণ্ডনের খ্যাতনামা অধ্যাপক-দ্বিগে পুরস্কৃত করিয়া আমাদেব অখোরনাথ বিজ্ঞানমাগে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এডিনবরাহ এখনও অধ্যাপক ক্রামব্রাউন বলিয়া থাকেন অখোরনাথের মত শীমান্ ছাত্র। তিনি আর কখনও বেধেন নাই। আর্গান্ বিশ্ববিদ্যালয়েও অখোর নাথ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বদেধে জিহ্বিয়া তিনি নিমায়রাজ্যের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের অধ্যক্ষকের আহ্বানে হায়দরাবাদে শিক্ষা-বিভাগে কাধ্যগ্রহণ

করেন। তাঁহার কঠোর পরিচর্য ও অসাধারণ কাব্যরূপলভার রাজ্যের চতুর্দিকে বিভাগের সমুদ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া হায়দরাবাদে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নবমুগ আনিয়া দেয়। আজ যাঁহারা নিমায় রাজ্যের উচ্চপদ সমুদ্র অলঙ্কৃত করিয়া দেবীর সোকেব রাজ্যশাসন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেহেছেন, তাঁহাদের অনেকই অখোরনাথের ছাত্র। অখোরনাথ হায়দরাবাদে বিশাল বনশ্রুতির মত দগায়মান ছিলেন, আর সকলে যেন তাঁহার চারিধারে ছোট ছোট গাছপালা।

অখোরনাথ কখনও ভুলেন নাই তিনি প্রাচীন যুগের কাব্যসিগের বংশধর। তাঁহার চরিত্র অতীতদৌরবেব সমুদ্রভূমিতে বিনষ্টতা এবং বর্তমানের কর্তব্য বোধে অসাধারণ ঔদাধ্য লাভ করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদ, তন্ত্র শাস্ত্রাদি গভীর অন্বেষ সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই ভারতবর্ষের অতীত জ্ঞান-পরিমার কথা সগর্বে প্রচার করিতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইউরোপের রসায়নের সাধনায় নিশ্চেষিত হয় নাই। তিনি প্রাচীন তন্ত্র শাস্ত্র হইতে হিন্দু রসায়নের বিস্তৃত তথ্য সমুদ্র আবার অগস্তের গোচরে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন তাঁহার জীবনের অনেক সাধনাই অপূর্ণ রহিয়া গেল। আশা করি দেশের কোনও হৃদয়মান ভবিষ্যতে তাঁহার অসাধারণ চেষ্টা সফল করিবেন। অখোরনাথের ছাত্রতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইজু তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব প্রতিভাধারা ইউরোপে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। দেশের সাধনানিষ্ঠ তরুণ সন্তানের স্থান সূত্বে রহিল। কোথাও আমাদেব প্রতিভাশালী মুখবল। যে পুরুষদিত্বের জীবনের স্থায়ী

পঞ্চাশ বৎসর যুগ্মশিক্ষান বিজ্ঞানের গৌরব-  
বয়ের সফলতার সাধনার কাটাকাটে, সেখ  
জানযোগ্য কর্মবীরের পথাক কি আল কেহ  
অহসরণ করিবেন না ?

• •  
•

### ১১। সমাজ-বিজ্ঞান

মানুষের সামাজিকতা তাহাকে অসঙ্গ  
জীব হইতে বিশেষীকৃত করিয়াছে। সমাজ  
গঠিতে বাইরা মানুষ সমাজের নিকট  
আপনাকে অনেকটা সর্প করিয়া রহিয়াছে  
বটে, কিন্তু প্রতিদানে পাইয়াছেও অনেক  
বাঁহা সে কখনও আশা করিতে পারিত না।  
সমাজ মনুষ্যপত্নের পক্ষে একটা হ্রস্বকিত  
দুর্গবন্ধন—সেখানে সকলকে সর্গনা। শত্রু  
আক্রমণে প্রাণদানের ভয় প্রস্তুত থাকিতে  
হয়, কিন্তু সকলে সপত্র থাকার শত্রু সহজেই  
কিছু করিতে পারিবে না তাহাও নিশ্চিত।

পৃথিবীর নানাবেশে নানাপ্রদেশে মনুষ্য-  
সমাজ আপনা আপনি কালক্রমে গড়িয়া  
উঠিয়াছে। সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য সর্বদাই  
একরূপ, কিন্তু গড়িবার ও চলিবার ধারা  
সর্বত্র একরূপ নয়। যেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে  
এক একটা ভেদ ও বিশেষত্ব আছে, সমাজে  
সমাজেও ভেদময়। সুইটি সমাজকে আমরা  
সমাজ বলিয়া স্বীকার করি। বাকি, কিন্তু  
তাহাদের পার্থক্যও আমাদের দৃষ্টি এড়া  
না।

এইরূপে মানুষ-বৈচিত্র্যের দ্বারা সমাজ-  
বৈচিত্র্য সাদিত হইয়াছে। আবার প্রতিক্রিয়া-  
বিধানের সামাজিকবৈচিত্র্য মানুষকে বৈচিত্র্য  
দান করিয়াছে। মানুষ বহুদিন ধরিয়া কোন  
প্রকার আচরণ করিয়া তাহাকে সমাজের মধ্যে  
প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৈলিয়াছে, আবার সেই

চির-আচরিত প্রথা মানুষকে তাহার সমাজ-  
ক্ষেত্রের চারিদিকে বন্দিয়া রাখিতেছে।  
মানুষও তাহার সমাজের এইরূপ পারস্পর্য  
পাকোতে মানুষ সমাজকে গাঁড় করাইয়া  
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আবার সমাজ মানুষের  
বহু বৈচিত্র্য ও ব্যক্তি বিশেষত্বের মধ্যে একত্ব  
বান করিয়াছে

এক একটা সমাজ আপনার প্রথা-প্রাচীরের  
দ্বারা অত্র সমাজ- হইতে পৃথকীকৃত।  
আপনাকে রক্ষা করিতে বাইরা উহার অস্ত্রের  
ধিকে তাড়াইবার সময় নাই। মনুষ্য-সমাজ  
যখন সমাজ-আকার গ্রহণ করিয়াছে তখন  
সম্পূর্ণ চেষ্টা লয়েও উহার অজ্ঞাতসারে কতক-  
খাগ জুটি, কতকগুলি অল্প বিবাহ ও কুলস্কার  
কতকগুলি অসম্পূর্ণতা উহার সঙ্গে সঙ্গে আসে  
নাও কারণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। যতদিন অত্র  
কোন ভিন্ন সমাজের সহিত উহার কোন  
সম্পর্ক স্থাপিত না হয় ততদিন এগুলি ধরা  
পড়ে না, কিন্তু যখন মানুষ নিজের সমাজের  
বাহিরেও সমাজ ঘোষিতে পায়, নিজের আদর্শ  
ছাড়া মনুষ্যের আরও কতকগুলি আদর্শ  
ঘোষিতে পায়, তখন সে চেতনা লাভ করিয়া  
সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করে।  
এইরূপ আলোচনার ফলে সমাজ গঠনের একটা  
হতিশাস আবিষ্কৃত হয়। নানা সমাজের নানা  
আলোচনার সমবাহে সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি  
প্রতিষ্ঠা হয়।

সমাজ-বিজ্ঞান কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ  
বাহনত হইল, হহাতে মানুষের সর্বপ্রকার  
সামাজিক আচরণ ও মনুষ্যত্ব, বিধান ও  
প্রতিষ্ঠান বৃত্তিতে হইবে—মানুষকে বৃত্তিতে  
পেলে তাহার কোন দিক, কোন চেষ্টা, কোন  
চিন্তা, কোন ব্যবস্থাই বাই কেওয়া যায় না।  
যদিও সমাজ-বিজ্ঞান রাজনীতি (politics)



ও সমাজ-নীতির (morals) সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তবুও অগ্রাঙ্গ বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা না করলে উহা বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নীত হইতে পারে না।

সমাজ-পটন-নীতি—Social Architectonic) বাহার প্রবেশা বাহা মানুষ সমাজ গড়িয়াছে কেবল নীরবে পটন-কাষ্য সমাধা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে, কেন কি উদ্দেশ্যে গড়িয়াছে তাহার উত্তর বেধ নাই। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) ইহাকেই ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে, এবং সমাজসেবকের ব্যাবিগুলির উল্লেখ এবং হু-হু-র উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতেছে।

সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু কবে ইহা শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না। জীবন্ত মানুষের সমাজও জীবন্ত ভাবে অর্থাৎ গড়িয়া ও ভাঙিয়া (অবশ্য ঐতিহাসিক দ্বারা বজায় রাখিয়া) চলিয়াছে—সমাজের এই স্থিতিস্থাপকতা সমাজ-বিজ্ঞানকে কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া সমস্ত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া একটা অচল ও চিরন্তন বস্তু প্রকাশ করিতে বিবে না, সমাজের সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানেরও চির-জাগ্রত থাকিতে হইবে।

## ১২। সহর-বাস ও গ্রাম-ভ্রাণ

ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আমরা পাক্কাটা চিন্তা-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে থাকি। অনেক নতুন ভাব, নতুন আলোচনা-প্রণালী, নতুন ধর্মন-শক্তি আমরা লাভ করিতে আরম্ভ করি। ঐ পাক্কাটা ভাবের বস্তু প্রথম আমাদের সংস্কৃতিকে আকুল করিয়া তোলে—সহরে সহরে ছুণ,

ক্লাব, সুবাস-পত্র, মাসিক-পত্র, সমবার, টাউনহল, বাগ, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সার্কাস, আটমুল, বাছুর, ট্রাম রেল, ঘোড়ার গাড়ী, ইলেকট্রিক লাইট ও ক্যান প্রভৃতির আধো-জন হইতে থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে আমরা পাক্কাভাষিত হইতে আরম্ভ করি। ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাসেও বোধ হয় এই প্রথম দৃষ্টান্ত যে ভারতবর্ষ বিজেতার নিকট সম্পূর্ণ বিলিন্ত ভাব দারণ করিয়াছে।

যাহা হউক এই সমস্ত আন্দোলন-আলোচনা ও অস্থান-প্রতিষ্ঠানের চেউ ক্রমশঃ সহর হইতে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল, সহর বাহা প্রচার করিল, বাহা সহরের লোকে ব্যবহার করিল, তাহা অর্থাৎ বিনা বাকাবাধে গ্রামে গ্রামে প্রবীষ্ট হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। তার, রেলপাড়া, শীমার, সুবাস-পত্র ইত্যাদির সহযোগে সহরের খবরবার্তা গ্রামে পৌছাইতে আরম্ভ করিল। গ্রামের খবর পদা বরঙ করিয়া মজা লুটিবার লজ্ঞ সহরে আনিতে লাগিল, গরিবেরা জীবন দাতার লজ্ঞ গ্রাম ছাড়িল। কেহ কেহ বাড়ী ঘরে সুদুপ লাগাইয়া কিছুদিন বেধিবার লজ্ঞ সহরে ছুটিল, আর ফিরিল না, কেহ একেবারে ঘর-বাড়ী, ভিটে-আসবাব বেচিয়া মুক্ত-কস্তা লইয়া সহরে বাস আরম্ভ করিল। বড় বড় বাড়ী সব জনহীন ও অশুলময় হইতে লাগিল, মুকরিদী দলদামে পূর্ণ হইতে লাগিল, বাগ-বাগান আপাহার তরিয়া উঠিল, ঘরে পেচক, চতুই, ছাঁটা ইত্যাদির বাসস্থান হইল, বান্যজের পতিত থাকিতে লাগিল, এবং দেবদেবির সকল আনন্দহীন হইয়া চান-

চিকার সম্পত্তি হইল। তখন কাচারও জলকষ্ট হইলে গ্রামের নোম বিয়া সহস্রাতিমুখে চলিল, কাচারও অর্ধকষ্ট চটলে চাকরীর উদ্দেশ্যে সহরে চলিল, কাহারও মানসিক কষ্ট চটলে মনকে লাঠাইয়া লইবার জন্য সহরে আসিলেন, কাহারও পরীর অস্থির ও চলা-ফেরার অস্থিবিদ্য হইলে মফঃস্বলের এস বাহুর লোম বিয়া সহস্র-যাত্রা করিলেন। ভ্রমলোকের সহরে চাকুরী হইল, তাঁহার। বেশের মধ্যে গণ্যমান্ত ও নেতা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার। বেশের জন্য ক্রটিতে লাগিলেন ও সরকারের নিকট আবেদন করিতে ছুক করিলেন—এদিকে গ্রামের উদ্ভাবিত সমাজ-পুত্র সকল উপায়গুলিই তাঁহার। অবহেলা করিয়া নষ্ট করিলেন। দুর্গোৎসবের গৃহ-বিগ্রহের, পূজা পার্বণের, গুরু-পুরোহিতের, স্নান-বিবাহের, খোপা-নাগিত, কামার কুমোরের খরচ কমিয়া গেল। একদিকে মাথা পাতলা হইল বটে, কিন্তু অত্রদিকে বিলাসিতার জন্য বিয়েটার, সার্কাস, বাডোৎসব, নাচ-গান ও মদের খরচ বাড়িতে লাগিল। গ্রামের আড়ম্বরহীন ও বাস্তবাহলাশুস্ত্র কীড়া, কৌতুক লোপ পাইল। ব্রত, উৎসব, পূজা ও সামাজিক অছটান প্রকৃতি সমাজ-সেবার দ্বারগুলি কচ্ছ হইয়া গেল। গ্রামে থাকিলে গ্রামের লোকের জন্য ভাবিতে হয়, এখন সহরে আসিয়া সে সমস্ত ভাবনা আর রহিল না, নিজের ভাবনাই সবার চেয়ে বড় হইল।

এইরূপ ব্যবসায়ের বাড়িতে, সরকারের আফিসে চাকুরী ও আদালতে ওকালতি করিবার জন্য, মুন্সিফগিরির কাজে, আফিসের ও স্থলের কাজে লোক সহরে আসিয়া খুব কালের লোক হইয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের সেই চির-পুরাণো কবি-

কার্য আর ভাল লাগিল না। গ্রামের নদী ও পুকুরের মিঠে জল ও তাহা মাছ, বাগানের ফল ও শাক-পাচী, স্বচ্ছন্দভোগী গরুর দুগ্ধ, মাঠের মুক্ত বায়ু, সমাজের ঐতিবন্ধন আর কাচারও ভাল লাগিল না। বৃদ্ধা মাতা ও বিধবা ভগিনী এবং প্রাপ্তদেহবনা পত্নীকে রাখিয়া লোক সহরে চলিল, বৃদ্ধ পিতাকে নিরাস্রবে করিয়া পুত্র চাকরী আরম্ভ করিল, ভাই ভাইয়ের ঘেহের কক্ষ হইতে অন্ত্র প্রস্রাব গ্রহণ করিল। কামার সহরে আসিয়া কুমোরের কাজ আরম্ভ করিল, তাঁতি সহরে আসিয়া জুতা সেলাই করিতে লাগিল, মালা আসিয়া কেরিওয়াল। শাঙ্গিল, চর্খকার আফিসের শিগন হইল, গুচ্ছাকুর অস্থপায় দেখিয়া মহাশয় খরিলেন, পুরোহিত কাপড়ের-বোকান খুলিলেন। পূর্বতন সমাজের সকল বন্ধন, সকল স্বপ্ন, সকল বল, ও সকল সরলতা এখন একেবারে চলিয়া গেল। খাওয়ার নোবে ও খাওয়ার অভাবে অন্তরোগে ধরিল, চোখের দুষ্টি-শক্তি কমিয়া গেল, পরিভ্রমের ক্ষমতা নষ্ট হইল, আনন্দ দিবার ও পাইবার উপদ্রুত মানসিক অবস্থা আর রহিল না।

অনেক দিন গেল। তারপর, সহরের সম্পূর্ণ আলোক প্রাপ্ত হইয়া মাঝে মাঝে কৌতুকবলমতঃ অথবা সহরের একত্রেইমিতে বিরক্ত হইয়া কেহ কেহ ছুটি বা পর্যোপলক্ষে 'বেশের' বাড়িতে পমার্শণ করিতেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে তেমন কিছুই নাই। হস্তরাগ্ধি তিনি সেখানে নিজেকে সর্বদাই একা একা মনে করিতেন। কাহারও সঙ্গে মিশিতে নিজের ইচ্ছা নাই, কেহ মায়ে পড়িয়া মিশিতে আসিলে তাহাও গৃহস্থ করিতেন না। গ্রামের সবাই চাষা, ছোটলোক, স্বর্ণ ও নির্দোষ। গ্রামস্থল

নিভাভই গান্না কেন না সেখানে চলাফেরার  
স্থান্য নাই, পার্ক নাই, গ্যাস্ লাইট নাই,  
থিয়েটার নাই। যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে  
তাহাতে ভক্তলোক থাকিতে পারে না, তাহাতে  
আবার অলভাবের মত বোধবনে ও অকলে  
ঘেরা, পুত্রে ভাল জল নাই, পথ কাটা এই  
সবের সমুদ্রই ত গ্রামে আসিতে ইচ্ছা হয় না।  
বসন্তকালে হাওয়া খাইবার লন্ (lawm) নাই,  
পার্টেন পাটির উপযুক্ত দায়গা নাই, ভাল  
পিনিশ বা বজুরা নাই, আমোদ করিবার,  
হাসিবার ও হাসাইবার লোক নাই, সেখানে  
কি ভক্তলোকের চলে ?

### ১৩। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ

আমরা বাঙ্গালার-বাহিরের খবর বিশেষ  
কিছু রাখি না। বাঙ্গালার কথা অবশ্য আমরা  
আজকাল নানা প্রকারে আলোচনা করিয়া  
থাকি। কিন্তু ভারতবর্ষ বলিলে যে বাঙ্গালা  
ছাড়া আরও অনেকটা বুঝায়, ভারতবর্ষের  
সভ্যতা ও উন্নতি যে বঙ্গ দেশের এবং সেই  
সঙ্গে অন্তর প্রবেশগুলির শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম,  
বুদ্ধি ও কর্মশক্তি দ্বারা ই নিরমিত হইবে,  
আমরা বাঙ্গালা দেশে বসিয়া এই সরল  
সত্যটি অনেক সময় মনে রাখিতে পারি না।  
ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ যে একটা ভৌগোলিক  
নাম মাত্র নহে একটা জীবন্ত ইকো অস্থ-  
প্রাপিত, প্রাণের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল এবং বিশেষ  
ও বিচিত্রতার অধিকারী এক অখণ্ড মহা-

সত্তার সূত্রে পুঙ্গব সমস্ত মহাদেশ একত্রে  
ভাবুক মাতেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের  
উচিতগণের গতি ত এই দিকে। এই মহা-  
ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠার প্রকল্পই ত মজিব বহ-  
শতাব্দী ধরিয়া বিচিত্র আয়োজন আরম্ভ  
করিয়াছে। পৃথিবীর স্তম্ভ দেশ চাইতে স্তম্ভ  
বিচিত্র উপাদানটী না ইহারই স্তম্ভ এখানে  
আদিয়া জুটিয়াছে। আজ বাহারা ভবিষ্যৎ  
ভারতের কথা জাবিবেন তাহাদের এই মহা-  
ভারতবর্ষের সাধনা ও সিদ্ধির কথা এমনই  
করিয়া নিরন্তরে মাঝে বুঝিতে হইবে।  
ইহাও প্রাণের মূর্ত্ত করিয়া দিতে হইবে,  
জিন্দা ও করুনা বিশ্বভোড়া না করিলে  
চলিবে না। এই ভারত সমস্ত। যে  
একতর বিশ্ব-সমস্তা! ইহার সমাধান যে  
প্রাণে বিশ্ব-সমস্তার সমাধান। এই তথ্য  
আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হওয়া চাই।  
ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ অতীত মহাবীর অব-  
দানে, বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ  
হইবেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মের ও মহামানবের  
মুক্তির অমৃত বীজ তাহার বসন্তপ্রসন্ন কর-  
পুটে ধারণ করিয়া এক পুণ্য যুগের মঙ্গল  
উদার তাহার ভৈরব কণ্ঠে মাঠে: বাণী  
উচ্চারণ করিবেন। এই মহাভারতবর্ষের  
উদার নিরন্তর ভারতবাসী যদি না যুগে যুগে  
তাহার প্রদান ও সফল ছোট হইয়া পড়িবে;  
সে কেবল চারিদিকে বিভেদ বিচ্ছেদ ক্ষুদ্রতঃ  
ও খণ্ডতা দেখিবে।



## স্কটল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়

(৩৯৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ প্রকাশিত আগের পর)

### (৮) সমাজ-তত্ত্ব

সর্বদমেত তিনটি উচ্চস্থান হইতে এডিন-বারার দৃষ্ট দেখিলাম। সেদিন রাত্ৰিকালে কাস্‌ল-পার্কের সমীপস্থ কলটন্‌পাহাড় হইতে নগরের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম অংশ-গুলি দেখিয়াছি। উর্দ্ধ হইতে নগরের আলোকমালা পৃথিবীর তারকারাজির দ্রাব দেখিতে পাইয়াছিলাম। কাল চিড়িয়াখানার পাহাড় হইতে নগরের পশ্চিম অঙ্গল এবং সন্নিহিত কৃষিকৃষি মাত্র দেখিয়াছি। আজ নগরের সীমা ছাড়াইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলাম। সেখানে এক পর্বত পৃষ্ঠে উঠিয়া পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত নগরের অর্ধাংশ দেখা গেল। অপরাহ্ন কাস্‌ল এবং কলটন্‌পাহাড়ের উত্তরদিকে। সে অংশ এখন হইতে দেখা গেল না। মোটের উপর বৃত্তিতে পারিলাম, মধ্যযুগের বুদ্ধবীতি বিবেচনা করিলে এডিন-বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত নগর ছিল। তিন দিকে পর্বতপ্রাচীর একদিকে কোথাসাগর মধ্যস্থলেও পর্বত তাহার উপরই দুর্গ ও নগর নিশ্চিত হইয়াছিল। এই কেন্দ্র-নগরের চারিদিকে কৃষিকৃষি ছিল। এখন সেখানে নতুন নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

আজ গেভিঞ্জের বাড়ীতে চা-পানের নিয়ন্ত্রণ ছিল। আরও দুই তিনজন লোক উপস্থিত ছিলেন। একজন চিকিৎসক। ইনি প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য হইতে চিকিৎসাস্থানের ইতিবৃত্ত সঞ্চলন করিতেছেন। ইনি বলিলেন “গ্রীকেরা

যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছিল, দেখিতেছি, আমরাও প্রায় সেই সকল বিষয়ই এখনও আলোচনা করিতেছি। আমাদের নব্য এবং নব্যতর পণ্ডিতেরা যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, বুঝিতেছি, সেই সকল তত্ত্ব গ্রীকেরা বহু পূর্বেই আলোচনা করিয়া-ছিলেন। আমি দ্বীতীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্যালেনের এর গ্রীক হইতে অস্থবান করিতেছি। তাহাতে অনেক আধুনিক মত দেখিতে পাইয়াছি। এমনকি অস্থবানকার্যে আমার আগ্রহ বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্যালেনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানিতে পারিলে প্রাচীন ইতিহাসের দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে।”

একজন রসমণিও চা-পান করিতেছিলেন। ইনি গেভিঞ্জের নগর-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ গ্রন্থনে সাহায্য করিতেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি কুগোল-বিজ্ঞান শিখিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে গেভিঞ্জের শিষ্য গ্রন্থ করিয়া ইহার সঙ্গেই কথ্য করেন। গেভিঞ্জের পুত্র, কস্তা এবং পত্নীও ইহার বদ্ধ।

আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া গেভিঞ্জ আমাদের তাহার ইতিহাস-বিজ্ঞানের সারকথা বুঝাই-লেন। মধ্যযুগের প্রথম অবস্থা হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা কিরূপ অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশপাথন করিয়াছে তাহার বিবরণ প্রদান করিলেন। গেভিঞ্জ সকল জিনিষই চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া

থাকেন। কাগজ পেলিলের সাহায্য না লইয়া ইনি কোন ভাষা প্রকাশ করেন না। কথা বলিতে বলিতে ছদ্ম সত্যখানা চিঠির কাগজে ছবি আঁকা হইয়া গেল। সভ্যতাবিশ্বের খারা বুকাইবার অস্ত্র এইরূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থানী নিত্যই কাঁচাকরী।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসবিষয়ে আলোচনা হইয়া গেলে পর অগতের বিবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা হইল। ইনি কয়ানী বার্ষনিক কহুতের নিয়মে বিজ্ঞানসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানগুলিকে বিক্ষিপ্তভাবে না বেধিয়া ইনি পরস্পরসাপেক্ষভাবে বিবেচনা করেন। ইনি বৈজ্ঞানিকমহলে প্রযুক্তিগতনীতির বিশেষ পক্ষপাতী নহ। ইহার মতে কোন বিদ্যার আলোচনাকালে অস্ত্রাত্তর বিদ্যা ভুলিয়া থাকা উচিত নহ।

বিজ্ঞানসমূহের পরস্পরসাপেক্ষতা সম্বন্ধে ইহার মত একটি বহুভাষ্য বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

“This multifarious division of labour, with its corresponding specialisms, arose to promote civilisation, and to further the productivity of each individual life; yet now it overpowers the individual, and is more than threatening the community. \* \* \* \* The advancing sciences are coming to realise their manifold connections, their profound and intimate unity; the art no longer content with the separate pursuit of technical perfection, are striving towards har-

mony; and this, with widening aims, of expression and of citizenship. This humanising and reunion of the Sciences, this kindred orchestration and application of the arts, are now seen as the essential problem and movement of our time.”

পাস্তাত্ত অগতঃ এক্ষণে একটা বিরাট বিশ্বব চলিতেছে। ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা এবং ভবিষ্যৎপ্রতিদ্বন্দ্বিতা গেল্ডল তাঁহার Sex নামক নবগ্রন্থাশিত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“The essential transition is that in progress within the Industrial Age itself, that between its initial lower phase and the incipient higher one—is a word, from the past century of paleotechnic industry, mechanical, militant, monetary, to the opening one, that of a neo-technic civilisation, founded upon more skilled and scientific industries and arts, and aiming towards truer peace than any which can be guaranteed by armour; and towards these ends sustained alike by synthetic intelligence and by creative Idealism. On one side is the present dominant Civilisation—of Coal and steam, of machinery and cheap products, of expanding markets and widening empires—themselves groaning un-

der ever increasing armaments, torn by fiscal disputes, and ruled by the financiers' assumed omnipotence. \* \* \* Even the 'progress' of which it has boasted so much is too little to be estimated in quality of life, however easily in quantity. wherever any

words be said of progress in quality of civilisation and of life towards its ideals, then there is silence; or if that will not answer, a very tumult of utilitarians and paleotects crying out with one voice 'Away with these Utopians!'

Yet the advance quietly making in our own generation, since Ruskin was thus hooted out of Economics is that his prophecies of the final social economy we here call neo-technic are actually coming to pass. \* \* \* The practical Utopians are already at work, and even drafting. their historic estimate of the receding utilitarians. \* \* \* This central antithesis of paleotechnic and neo-technic, thus involves the passage from the predominant mechano-centric thought and philosophy of industrial man to the originative, bio-centric instinct and inspiration of domestic woman. Thus, in a word, we find ourselves meeting Bergson upon a fresh path.

(৯) কৃষি-শিক্ষা ও শিল্প-কলেজ  
ম্যাগ. কার্ণেলি কটল্যাণ্ডবাদী দরিদ্র চাক্রগণের মাত্র ১০০,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে মহাসিনের প্রথম খনডাওয়ার হইতে মূলম্যান ছাত্রেরা যেরূপ প্রতিপালিত হয়, কটল্যাণ্ডও সেইরূপ অধিকাংশ বিদ্যার্থীই এই খনডাওয়ার হইতে কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাত্র সাহায্য পাইয়া থাকে। উক্ত শিক্ষার মাত্র একরূপ সুবিধা মাত্র কোন সমাজে নাই। এখানকার নিয়মিকা দেখিলেও দরিদ্র পরিবারের কোন বাধা ঘটে না। বাস্তবিক পক্ষে, কটল্যাণ্ডের গবর্নেন্ট এবং ধনী মহাজনেরা দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি সুবর্ণ যত্নে পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এদেশে শিক্ষা-বিভাগের মাত্র যেরূপ আগ্রহ, ইংলণ্ডে সেজন্য নাই।

কেবল তাহাই নহে। দেশীয় কৃষকগণের অবস্থা উন্নত করিবার মাত্রও কটল্যাণ্ডে যারপূর্য নাই প্রদান দেখিতে পাইতেছি। কৃষিক্ষেত্র, কৃষিকর্ষ, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে এখানকার গবর্নেন্টের এবং শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি অত্যন্ত বেশী। ইংলণ্ডে কৃষির মাত্র দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু এত বেশী বোধ হয় নাই।

কৃষিকর্ষের মাত্র কটল্যাণ্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবাডিন নগর হইতে উত্তর কৃষিবিভাগ, গ্লাসগো হইতে পশ্চিম কৃষিবিভাগ এবং এডিনবারা হইতে পূর্ব কৃষি-বিভাগ পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিন কেন্দ্রে স্থানীয় সুবিধা অসুবিধা এবং অযোগ্য জুয়েগ বিবেচনা করিয়া কৃষকগণের মাত্র ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া কৃষি কলেজ ও আছে। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রের অন্তর্গত মেলায় মেলায় বিভিন্ন

পরীক্ষা-কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে কবি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা কৃষকগণের সঙ্গে মিলিয়া উন্নত কৃষিপ্রণালীর পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কৃষিকৌশলগত বক্তৃতা দ্বারা নূতন নূতন সারের কথা, বীজের কথা, কলম করবার কথা, গভীর চাষের কথা এবং অগ্ৰাভ্য প্রযোজনীয় কথা বুঝান হইয়া থাকে। এই সকল কৃষকের সম্মানগণকে মঞ্চস্থল হইতে কেন্দ্রের বড় কলেজে পাঠাইয়া শিক্ষিত করাও হয়। কলকাতা পণ্ডিতে ও কৃষকে সর্কদা লাংগো দেখা যায়, এবং কৃষক বিষয়ক নূতন জ্ঞান দেশের সর্বত্রই অতি অল্পকালের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। বিগত ১৯১৫ বৎসর হইতে এই প্রণালীতে কার্য চলিতেছে।

এভিনবারা কেন্দ্রের কৃষিকলেজ দেখিলাম। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, পরীক্ষা-গৃহ, অস্থ-সন্ধানালয় সবই এখনও ক্ষুদ্র—কিন্তু বিস্তৃত করা হইতেছে। মেওল-তরুর নিরমাত্ম-সারে মেঘ আভির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের ফল পরীক্ষা করা হইতেছে। কেবুলেও ইহা দেখিয়াছিলাম। এখনও কল বুঝা বাটতেছে না। যব উদ্ভিদের ও কলম করার কল এবং সংমিশ্রণের প্রভাব পরীক্ষা করা হইতেছে। অধ্যাপক মহাপ্রণ সংগ্রহালয়ে লইয়া যাইয়া সেগুলি দেখাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইংলণ্ডে আমেরিকার সুখার বাবারের আন্দার্যজনক কৃষি-প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে কি? বার্ষিক নব নব জাতীয় উদ্ভিদ সৃষ্টি করিতেছেন। আপনারা তাঁহার নিয়ম অঙ্গুলণ করিয়া কোন কল পাইয়াছেন কি?” একজন অধ্যাপক বলিলেন “মহাপ্রণ, আমরা আমেরিকানদের কথা বিশ্বাস করি না। অর্থাৎ বার্ষিকের New Creations

বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া কালিকর্ণিয়ার তাঁহার কৃষিকৃষি দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু বার্ষিক সেগুলি দেখা হইতে স্মরণ হইলেন না।”

কলেজের সম্পাদকের সঙ্গে অনেককাল আলাপ চলিল। ইনি বলিলেন “কৃষিক্ষেত্র কলের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃহৎ কৃষিকৃষিতে কলের সাহায্য লইলে সুবিধাই হয়। বেশী লোক নিযুক্ত করিতে হয় না। কাজেই অনেক লোক কর্মহীন হইয়া পড়ে। অথেষ্টে কথা না পাইয়া লোকেরা অষ্ট্রেলিয়া, ক্যান্ডাডা, ইত্যাদি উপনিবেশে চলিয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসরে এত লোক দেশত্যাগ করিয়াছে যে, কোন কোন জেলায় প্রায় শতকরা ২৫ জন লোক কম দেখা গিয়াছে। এই অবস্থা অতীব শোচনীয়। গবর্মেন্ট বাধ্য হইয়া জনগণের দেশত্যাগ বন্ধ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে দেশের ভিতর কাজের সম্ভান করিয়া দিতেও বাধ্য হইয়াছেন। নূতন কাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিকৃষি ও গৃহপালনের কর্ম নির্বাহিত হইয়াছে। গবর্মেন্ট এক্ষণে কৃষির কতিপয় ক্ষুদ্র অহুষ্ঠান প্রবর্তনে উৎসাহ দিতেছেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি এই বলিলেন যে, বাস্তবিক ভাবে লোকেরা বড় বড় অহুষ্ঠানের দিকে হুকিয়াছে। তাহাতে কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইত্যাদি প্রচলন বাড়িতেছে। কিন্তু গবর্মেন্ট আইন করিয়া ছোট ছোট কারখানার তৈয়ারী করিতেছেন! বড় বড় কারখানার সঙ্গে ছোট কারখানগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসী হইতে পারিবে কি? বাস্তবিক পন্থির বিরুদ্ধে এই কৃত্রিম অহুষ্ঠান ভাগিবা হইবে না কি?”

ইনি বলিলেন “কতকগুলি কারখানার আছে যাহাতে ক্ষুদ্র আয়োজন এক্ষণে অসম্ভব।

সোপান, ঘর, শস্ত, ইত্যাদি পদার্থের চাব আকাল বৃহৎ ক্ষেত্রেই হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে এই সমুদয়ের আবাদ করিয়া ফল পাওয়া যায় না। গবর্নেন্ট তাহা চেষ্টাও করেন না। কিন্তু পশুপালন, গো-দোহন, ডিম্বের চাব, শাক সব্জী, ফলফল ইত্যাদি কতকগুলি কারবারে বড় অহুষ্ঠান প্রয়োগ করা কঠিন। করিলে লাভও হয় না। এই সমুদয় কার্যে মালিকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থনিষ্ঠির প্রবৃত্তিই বিশেষ কার্যকরী। এই সকল ক্ষেত্রে চাকর লাগাইয়া কাজ করিলে ফল পাওয়া যায় না। কারণ কঠোর চোখ সর্বদা এইদিকে রাখা আবশ্যক। কারেই ক্ষুদ্র অহুষ্ঠান এই সকল কৃষিক্ষেত্রে টিকিয়া যাইবে। সুতরাং ক্ষুদ্রে বৃহতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন আশঙ্কা নাই। বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র কৃষির অহুষ্ঠান সন্তোষে চলিতে পারে।"

এইরূপে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কটল্যাণ্ডে Small Holdings রক্ষা করা হইতেছে। তাহার ফলে বেশভ্যাগী জনগণের সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে।

এই কৃষিক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়। গবর্নমেন্টের টাকায় ইহা পরিচালিত হয়। কিন্তু গবর্নমেন্টের শালন-বিভাগের সঙ্গে অথবা শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে বিশেষ বাধ্য-বাধকতা নাই। কলেজের গুরু স্বতন্ত্র পরিচালক সমিতি নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কৃষিশিক্ষাও দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-ছাত্রেরা ভিন্নী লাভ করে। সুতরাং ইহার অধীনে কৃষি-বিষয়ক ল্যাবরেটরী, অল্পসংখ্যক ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই কৃষিক্ষেত্রে অতি নিকটবর্তী হওয়ায়

উভয়ের কিছু লাভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা মাত্র ল্যাবরেটরী ভাল করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে—আবার কলেজে অল্প কতকগুলি ভাল করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উপায়ে উভয়ের একই ল্যাবরেটরী তৈয়ারী করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কলেজের ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। অপর কলেজের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে কাজ করে।

এই স্থিতি এডিনবারার শিল্প-কলেজেও দেখা যায়। এখানকার হেরিফট-ওয়ার্ট শিল্প-কলেজ হুগ্গিন্স। ইহাতে মূদ্রন, পুস্তক বানান, কাগজপ্রস্তুতকরণ, ঔষধপ্রস্তুতকরণ, গনিজ পদার্থ পরীক্ষাকরণ ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পকর্ম শিখান হয়। এতদ্ব্যতীত মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার কোন কোন বিভাগ শিখান হয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হেরিফট-ওয়ার্ট কলেজের একটা বন্ধোবন্ধুত্ব করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে কারখানা ও ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করিবার ব্যয় উভয়েরই মধ্যে বিভাজিত হইয়াছে।

এই কলেজে রাতে প্রায় ২৫০০ ছাত্র শিক্ষা লাভ করে। দিবাভাগে ইহার ছাপাখানায়, ডাকখানায় অথবা অল্প কোন মোকামে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে। রাতিকালে নুতন নুতন বিদ্যা শিখিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির পথ প্রস্তুত করে। কেহ ব্যবসায় লিখে, কেহ ছাপাখানায় ছ' এক বিভাগের কাজ লিখে, কেহ বই বানাইতে লিখে, কেহ রাসায়নিক কক্ষে অভ্যস্ত হয় ইত্যাদি। দিবাভাগে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ২৫০।



কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অনেককণ খরিশা কারখানা ও ল্যাবরেটরীগুলি দেখাইলেন। পূর্বে যন্ত্র-বিজ্ঞানবিষয়ক এডিনিয়ারিংয়ের কারখানা কখনও দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম। এডিনিয়ারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিজ্ঞান এখনও শিখান হয় না। যন্ত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ সযত্নে কয়েকজন ছাত্র শিকা করিতেছিল। ইটা বুঝাইবার যন্ত্রটা দেখিলাম।

মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল এডমিনিস্ট্রিং বিভাগবিষয়ক কারখানায় একটা নূতন নিয়ম দেখা গেল। প্রিন্সিপ্যাল বলিলেন “বড় বড় কলগুলি অনেক সময়ে একস্থান হইতে অল্প স্থানে সরান আবশ্যক হয়। কিন্তু সাধারণ ল্যাবরেটরীতে সে গুলি সরাইবার সুবিধা থাকে না—মেজের সঙ্গে কলগুলি গাঁথা থাকে। আমরা একটা নূতন নিয়ম করি-রাছি। মেজেরে রেল পাতা আছে। তাহার উপর বসাইয়া যেত্রণ ইচ্ছা কলগুলি ঘুরাইতে কিরাইতে পারি।”

এখানকার কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতেও দুই একটা নূতন নিয়ম দেখিতে পাইলাম। ঘরের দ্বিধিত বায়ু তাড়াইবার জন্য টেবিলের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে একটা করিচা আবৃত হিষ্ট আছে। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরকার বড় নলের যোগ আছে। তাহাতে সর্বদা কল ঘুরিতে থাকে। তাহার ফলে হাওয়া নলের ভিতর বিধা বাহিরে চলিয়া যায়।

কারখানা ও ল্যাবরেটরীর সকল বিভাগ দেখিয়া অধ্যক্ষের সঙ্গে তাহার কামরায় কিরিয়া আসিলাম। অধ্যক্ষ বলিলেন “মহাশয়, লোহা লঙ্ঘন লাগে সরঞ্জাম ত দেখিলেন। আমরা এই সমুদ্রের বন্যাসত্ত্ব উচ্চশ্রেণীর আবোজনই করিয়াছি—ছাত্রদিগকেও সাধ্য-

মত উন্নত শিক্ষা দিয়া থাকি। কিন্তু এই শিক্ষার ফলে দেশের কোন প্রকার মঙ্গল হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আমাদের সমাজ ও পরিবার ক্রমশঃ অধ্য-পাতে যাউতেছে। কেবল মাত্র টাকা রোজ-গার করিতে পারিলেই কি সুখী হওয়া যায়? আমাদের মহত্ববই যে লোপ পাইতেছে। কল কারখানার প্রভাবে মানুষ স্বকীয় শিল্প-জ্ঞান এবং পৌনর্য্যাকৃতি ভুলিয়া যাউতেছে। আজকাল ক্রমশঃ বিপণকে কোন কলের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় মাত্র। নিম্ন গাতে কোন কাজ করিতে হয় না—বৃদ্ধি পাটাইয়া কোন লম্বতা পূরণ করিতে হয় না। কলের দাম স্বল্পে মানুষেরা নিষ্কৌণ্ডভাবে কারখানার মধ্যে কাজ করে। কলগুলি মানুষের কর্ণে সাহায্য করে না—মানুষই কলের কেনা চাকর। এমন কারবার নাই যেখানে মানুষের মহত্ব লুপ্ত না হইতেছে। কল কারখানা সকল শিল্পকেই প্রাবৃত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। স্বত্বের কার্য এবং ইট তৈয়ারী করা ব্যতীত অল্প কোন শিল্পে হাতের কাজ এবং কলাজ্ঞান দেখাইবার অবসর সম্প্রতি পাওয়া বাইবে না। অল্প সকল বিভাগে মানুষ জীবনহীন বস্ত্রবস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর ফ্যাক্টরীর কুলীগণের চিত্র কল্পনা করুন। আপনি কখনও নীড়ু, ন্যাক্টোর বা বামিংহামে গিয়াছেন কি? এই সকল স্থানে গেলে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবেন না। কারখানাগুলি দেখিবেন। তাহা হইলে আমার কথা বৃদ্ধিতে পারিবেন। মানবের জীবন কত নিশ্চয় আমরা পাপবিক ও ভুগিত হইতে পাবে তাহা নিম্ন চোখে দেখিতে পারিবেন।

মালগুলামের মালগুলি যে অবস্থায় থাকে অথবা কারখানার কল ও যন্ত্রগুলি যে ভাবে গাড়াইয়া থাকে ফ্যাক্টরীর মজুরেরা ঠিক সেই ভাবে জীবনধারণ করে। আকাশে ঘন কক্ষ ধূম রাশির আবরণ নিয়ে যোজনবিশ্রুত লম্বা লম্বা কুলীগৃহ তাহার মধ্যে নগনানগীপণের আবাণমূল। কানোয়াবেরাও ইহা অপেক্ষা দাবীনভাবে বজ্রস্রোতে স্থখে জীবনগাপন করে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, আল-কাল নাফি ইংলণ্ডে এই কলকারখানা প্রাণিত শিল্পজীবনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে? ছোট ছোট কুটির শিল্প প্রবর্তনের উদ্যোগ চলিতেছে। ফ্যাক্টরীর পরিবর্তে পরিবারগত শিল্পপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে?” ইনি হাসিয়া বলিলেন, “কিছুপ ভাবেন? যেমন সুখ করিয়া বড় ঘরের মেয়েরা নিজ হাতে ফিতা বা জ্যাকেট তৈয়ারী করেন সেইরূপ! তাহার দ্বারা তাঁহারী নিজ অভাব মোচন করিতেছেন সে কথা ভাবেন না। বৈঠকখানায় পোষাকী আসবাব স্বরূপ সে গুলি রাখিয়া থাকেন যাত্র। ইংরাজ সমাজেও আলকাল কোথাও বা কুটির প্রতিষ্ঠা হইতেছে—কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মাদী পরিবার বহু হইয়া ছোট ছোট শিল্পের আয়োজন করিতেছে—কোথাও বা বিশাল ফ্যাক্টরীর পরিবর্তে ক্ষুদ্রায়তন ফ্যাক্টরী তৈয়ারী হইতেছে। আমার মতে কয়েক জন লেখা পড়া জানা লোক হস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কাসলে পড়ে যোহন্তর আন্দোলনও চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত শিল্প ও ব্যবসায়ের সংসারে বিন্দু মাত্র পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। এই সকল নূতন প্রয়াসের কোন প্রত্যয় দেশের আর্থিক

অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বড় বড় কারখানার কক্ষান্তি কাঁচাখা-কেরা মাঝে মাঝে পল্লীতে ঘাইয়া এই নূতন প্রয়াসের অগ্রগতিবর্ণন দেখিয়া আসেন। ফিরিবার সময়ে মুচুক হাসিয়া নিঃশেষের অশ্রুস্রাববিধরে আশাবিত হন। মহাশয়, এই নূতন প্রয়াসগুলি ছেলে খেলা মাত্র।

হাঃ! ঠিক, আমরা নূতন আদর্শ কাণ্ডে পণ্ডিত করিতে না পারি, পুরাতন প্রথাই অসম্পূর্ণতা গুলি ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাপান, চীন ও ভারতবর্ষে আমাদের বর্জনীয় ধোর সমুদেহই অগ্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্যের কথা, আমরা যে গুলি ছাড়িয়া দিই প্রাচ্যের সেই গুলি গ্রহণ করে!”

( ১০ ) মগুর-পর্য্যবেক্ষণালয়

সেদিন রাত্রে কন্টন পাহাড়ের উপরে গাড়াটয়া এডিনবারার আলোকমালা দেখিয়া-ভিলাম। আজ দিব্যভাগে এখন হইতে ফোর্ড উপসাগর দেখিতে পাইলাম। কন্টন পাহাড় কাসল পাহাড়ের পূর্ব দিকে এবং কিছু উত্তরে অবস্থিত। এখন হইতে নগরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল অংশই দেখা যায়।

এই পাহাড়ে কয়েকটা ঘেঁষিবার জিনিষ আছে। প্রথমতঃ, নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ, দ্বিতীয়তঃ নেলসন মজুমেন্ট। লণ্ডনে যে ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ট্রাকাল্গার কোয়ার এবং তাহার মধ্যে বিরাট তত্ত্ব প্রদত্ত করা হইয়াছে, সেই ঘটনার স্মৃতিই এখানে এই উচ্চ স্থতিগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। সমুখে লিখিত আছে—“কটল্যাণ্ডবাসী নেলসনের জন্য শোকপ্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই গৃহ নির্মাণ করেন নাই। যুদ্ধ জয়লাভের কলে

জাতীয় নৌবহু বৃদ্ধি পাইয়াছে সেজন্যও। আদিদাম। কালনের প্রাচ্যের পরিবেশেই জাহাজ। এই মহামেট প্রস্তুত করেন নাই। অধ্যাপক গেভিয়ার "নগর-বিজ্ঞান"-আলম অবস্থিত। গেভিয়ার জাহাজ তির্যকীবনের অঙ্কিত বিজ্ঞান, বৃদ্ধি, অর্থ সমগ্রই এই বিজ্ঞানালয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন। গেভিয়ার এখনও বেশী গ্রন্থ লিখেন নাই। ইহার প্রকাশিত পুস্তক অল্পমাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার চিত্রার ফল বহু লোকই পাইয়াছেন। ইহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া অনেকই 'মাহু' হইয়াছেন। আমাদের অধ্যাপক শিল্পের কথা মনে পড়ে।

এই পাহাড়ে আর একটা বিশেষ দর্শনীর বস্তু আছে। অটোবল শতাব্দীতে কটল্যাণ্ডে সকল বিষয়ই গ্রীক আদর্শে নিঃশ্রিত করা হইত। এডিনবারাকে উত্তর ইউরোপের এবেল নগরে পরিণত করা ভবনকার লোকের লক্ষ্য ছিল। সেই যুগের সাহিত্য, দর্শন, কলা ইত্যাদি সকল বিষয়ে 'ক্লাসিক' রীতি প্রবর্তিত হইত। সেই আমোলনের প্রভাবে এবেলের "গ্যাক্রোপোলিস" ভবনের ভিত্তি এই পাহাড়ে একটা বিশাল অট্টালিকার নির্মাণ আরম্ভ হয়। তাহার ১২টি দ্বার প্রস্তুত বহু অর্থব্যয়ে নিশ্চিত হইয়াছে। গৃহের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করা হয় নাই। ইতিমধ্যে স্ত্রীর গুহাণ্টার স্তরের প্রাকৃতিক হ্রদ এবং শিল্পে সাহিত্যে, দর্শনে, ক্লাসিক রীতির বিরুদ্ধে যৌবনের বিদ্রোহ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই বিদ্রোহের নাম "রোমান্টিক।" গ্রীক যুগের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহবাদীরা নব্যযুগের ধারণা ও রীতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে গৃহ-নির্মাণ-ব্যাপারেও বেধিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর গুহাণ্টার স্তরের পরামর্শে এডিনবারার জেলখানা প্রস্তুত করিবার সময়ে নব্যযুগের গণিক রীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। কন্টন পাহাড়ের পাদদেশেই এই গৃহ অবস্থিত। এক্ষণে ইহা দেখিলে নব্যযুগের চূর্ণ বা ভাঙ-প্রাসাদ বস্তু মনে হয়।

কন্টন পাহাড় হইতে কাসল পাহাড়ে

আদিদাম। কালনের প্রাচ্যের পরিবেশেই জাহাজ। এই মহামেট প্রস্তুত করেন নাই। অধ্যাপক গেভিয়ার "নগর-বিজ্ঞান"-আলম অবস্থিত। গেভিয়ার জাহাজ তির্যকীবনের অঙ্কিত বিজ্ঞান, বৃদ্ধি, অর্থ সমগ্রই এই বিজ্ঞানালয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন। গেভিয়ার এখনও বেশী গ্রন্থ লিখেন নাই। ইহার প্রকাশিত পুস্তক অল্পমাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার চিত্রার ফল বহু লোকই পাইয়াছেন। ইহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া অনেকই 'মাহু' হইয়াছেন। আমাদের অধ্যাপক শিল্পের কথা মনে পড়ে।

এই নগর বিজ্ঞানালয়ের নাম "মাইটলু কটল্যাণ্ড" পর্যবেক্ষণ-গৃহ। নগরের ভূতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস এবং সমাজ-জীবনের খাতিয়া বৃদ্ধিবার জন্য এই ভবন নিশ্চিত। ইহার ভিত্তরে প্রাচীন ও আধুনিক কটল্যাণ্ডের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহালয়ে "ভৌগোলিক মিউজিয়াম" "ঐতিহাসিক চিত্রশালা" রূপে বর্ণনা করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে, সাধারণ লোক ইহার ভিত্তর আসিলে কোন বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইতিহাস সম্বন্ধীয় এবং ভূগোল বিষয়ক ল্যাবরেটরী বিবেচনা করিবে।

প্রথমে ভেতালার ছাদের উপর পেশাদার। সেদিন গেভিয়ার গৃহে আকস্মিকভাবে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি এখানে কাঁচা করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে আদর্শালয়ের একজন ব্যক্তিও দর্শক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুইটি রমণীও দেখিতে আদিয়াছেন।

ভেতালার ছাদের বেড়ালে এডিনবারার ভূতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সমীপবর্তী পাহাড়ের বৃত্তিকা বিস্তার বেষ্টন

টিক সেইরূপ প্রস্তর-বিভ্রালের দ্বারা প্রাচীর প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রাচীরের তরঙ্গলি দেখিলে এডিনবারার পাহাড়গুলির স্তূত্ব বুঝা যায়।

এখান হইতে উক্ততম গোলাঘরের উপর উঠিলাম। ক্ষুদ্র গৃহ চার পূর্বাভূতি— তাহার কেন্দ্রস্থলে ছিহ্ন—ছিহ্নের উপর এক-খানা পেন্স বসান আছে। সেই লেন্সকে দড়ির সাহায্যে ঘুরান কিরান যায়। এবিধে গৃহের ভিতর একখানা গোলাভূতি টেবিল স্থাপিতহে, ইহাকে উঠান নামান যায়। আমাদের প্রবর্ষক লেন্সটা ঘুরাইতে কিরাইতে লাগিলেন—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নগরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব টেবিলের উপর পড়িতে লাগিল। এই গৃহে ষাড়াইয়া সমস্ত নগরের স্মৃতিকা, পর্কত, উপশাপর, রাস্তাঘাট, ট্রাম, মোটরকার, রেলপথ, বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ, দুর্গ, লোকের গতাগত কলের ধুম, তুলনতা, পশু-পক্ষী সবই দেখিতে পাইলাম। কেবল তাহাই নহে—লেন্সের ভিতর দিয়া প্রতি-বিম্বিত হইবার কলে বস্তুগুলি অতি সুস্পষ্ট কর্ণে চিত্রিত দেখাইতেছে। ভূনিলাম অনেক চিত্রকর আনিয়া এপান হইতে নগরের বিভিন্ন অঞ্চলের শোভা বুঝিয়া যান। এই গৃহের নাম “ক্যামেরা”, একজন ক্যামেরা পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। ক্যামেরা হইতে নামি-বার সময়ে গোল গৃহের চারিধারে বারান্দায় ষাড়াইয়া নগরের সকল অংশ দেখিয়া লই-লাম।

ক্যামেরার নিম্নতলে ভূগোল শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি বৃত্তান হইয়াছে। ভূগোল কেবল মাত্র নবনবী পাহাড় পর্ক-তের বিষয় নয়। গেভিজ ভূগোল বিভাগে অতি বিস্তৃতভাবে দেখিয়া থাকেন। আকাশ-

তত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব সকলই ভূগোলের অন্তর্গত। এই গৃহে সংক্ষিপ্তরূপে সকল বিষয়ই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য সংগ্রহ অতি সামান্য ধরনের—মোটের উপর, আদর্শ ও কার্যপ্রণালী বুঝিতে পারা গেল।

ভাণ্ডার নিম্নতলস্থ গৃহে এডিনবারা নগরের সকল প্রকার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভিন্ন, মাপ, ফটোগ্রাফ, মডেল, ইত্যাদির সাহায্যে নগরের স্থিতি, ঠিকানা, ও প্রতিস্থাপন বুঝা গেল। পৃথিবীর মধ্যে কি উপায়ে কখন এডিনবারা মানববসতির উপযুক্ত হইল, তাহার পূর্বে কি ছিল, পরে কখন কোথায় পল্লী গঠিত হইল, পল্লী কিরূপে নগরে পরিণত হইল, তাহার পর নগরের দুর্গ, প্রাণাধার মন্দির, বিজ্ঞানর কেন কোথায় কি সীতীতে প্রস্তুত করা হইল—এই সকল কথাই এই গৃহের প্রদর্শিত বস্তুর কাহিনী। এডিনবারা গৃহের দ্বার কটল্যাণ্ড-গৃহও এইরূপ গঠিত। প্রাচীন স্মৃতিস্মৃতিমা ও ক্রেন্টিক এবং আইরিশ ভাষা লম্বু হইতে স্ট অ্যান্ড্রাস লোকেরা কিরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছে, চিত্রের সাহায্যে সেই লম্বুর বুঝিতে পারিলাম। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মানচিত্র দেখা গেল—যুগে যুগে কটল্যাণ্ড অগতের সভ্যতাধারার কোন্ কোন্ অংশে অবস্থিত ছিল সেগুলি মানচিত্র হইতে সহজেই বুঝা যায়।

ইতিমধ্যে গেভিজ আনিলেন। গেভিজ-জের গৃহ এখান হইতে এক মিনিটের পথ। গেভিজ ভাণ্ডার পরিকল্পিত গৃহের খুঁটি-নাটি সকল বুঝাইতে লাগিলেন। কোন্ চিত্রের কি অর্থ, এবং কেনই বা তাহা অমুক স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইত্যাদি আত্মবিশ্বাস অনেক কথা বুঝিয়া লইলাম।

পূর্বে তাঁহার সঙ্গে কথা বাস্তব যে সকল  
তথ্য অনিবার্য সে গুলি আদ্য ইহার সংগ্রহ-  
সময়ের চিত্র, পুস্তক, কটোগ্রাফ এবং মাপ  
দেখিবা—শেষভাবে বুঝা গেল।

গেভিয়ার দার্শনিক কল্পিত পিত্ত। ইনি  
ফরাসী পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া  
থাকেন। ইহার মতে ফরাসী জাতির  
সংক্ষেপে ব্যক্তিগত ষটল্যাণ্ডের সভ্যতা গঠিত  
হইয়াছে। প্রাচীন-কালের রাজসভা  
হইতে, রাষ্ট্র মন্ত্রী, ধর্মপ্রচারক নক্স, দার্শ-  
নিক কার্নাইল এবং উপস্থাপিক ষট পঞ্চাশ  
সকলেই মুখ্যতঃ অথবা গোপনতঃ ফরাসী  
প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই কথা গেভিয়ার  
মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই। যাহা হউক,  
কল্পিত "ইতিহাস-বিজ্ঞান" এবং "বিজ্ঞানের  
বিবর্তন" গেভিয়ার চিন্তারাজ্যে দুইভাবে  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার "আউটলুক  
টাওয়ার" গঠনে কুপোলবিজ্ঞান "বিজ্ঞানের  
পরম্পরা-সম্প্রদায়" বিনয়রূপে প্রমাণিত  
হইয়াছে। কোন বিজ্ঞানই যে অসম্ভব বিজ্ঞান  
হইতে অসম্ভবভাবে আবিষ্কৃত হইতে পারে না,  
এই ভৌগোলিক সংগ্রহালয়ে গেভিয়ার তাহা  
বুঝাইয়াছেন।

ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনাও গেভিয়ার  
কল্পিত পদ্য অঙ্গুরণ করিতেছেন। অবশ্য  
নূতন চর্চার ফলে ইনি কতকগুলি নূতন  
দিকে তথ্যগোষ্ঠী সাধাইয়া গুছাইয়া মত  
প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার চিন্তার  
"কাঠামো" ইংরাজ পণ্ডিত ক্রেন্ডলিয়ার  
সম্পাদিত কল্পিত New Calendar of  
Great men or "মহাপুরুষ পত্রিকা" আদর্শে  
গঠিত। এই আউটলুক টাওয়ার-পুর্বে  
মানবসভ্যতার ইতিহাস-ধারা চাট ও মান-  
চিত্রের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। চিত্রগুলি

দেখিলে বুঝা যায় কল্পিত আদর্শ ইনি  
কতখানি গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু  
কেন্ কেন্ বিষয়ে ইহার আভাস তাহাও  
খরিতে পাওয়া যায়। New Calendar of  
Great men গ্রন্থে বীজবর্ণের জীবনকথাই  
বিবৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভূমিকার  
চিত্র জনসাধারণ এবং সভ্যতাগ্রাহকের  
লক্ষণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু  
গেভিয়ার চর্চায় এই গ্রন্থের বিবরণই  
বিশেষরূপে পাইতেছি। ইনি বীরপুরুষগণের  
নাম বেশী উল্লেখ করেন না।

অন্য বিকালে অধ্যাপক নিকলসনের সঙ্গে  
দেখা হইল। ইনি ধর্মবিজ্ঞান মহলে প্রসিদ্ধ।  
ইনি বলিলেন "ভারতীয় ধর্মবিজ্ঞান অথবা  
সাধারণ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি নিত্য  
অনভিজ্ঞ বলিলেই চলে। তবে গুণানকার  
মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা  
করিয়াছি। কিছুকাল পূর্বে ভূমির কর বিষয়েও  
চর্চা করিয়াছিলাম। গবর্নমেন্টের প্রকাশিত  
কাগজ-পত্র ব্যতীত আমি বিশেষ কিছু  
জানি না। প্রথমতঃ বন্দোপাধ্যায়ের সূত্র  
গ্রন্থ দেখিয়াছি।" অক্সফোর্ডের এল্ডওয়ার্থ,  
কেম্ব্রিজের ক্যানিংহাম এবং এডিনবার্গের  
নিকলসন তিনজনই এক গোত্রের লোক।

### ( ১১ ) জীবন-বিকাশের নিয়ম

আমি অধ্যাপক গেভিয়ার সঙ্গে ভাষা ও  
স্টেট্যাগুজ নগরব্যয় দেখিতে গেলাম। ঐ  
দুই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিক্কে ইনি  
আমি পরীক্ষা করিবেন। পথে দুইটি দেখিবার  
জিনিষ পাওয়া গেল। প্রথমতঃ এডিনবার্গের  
নিকট কোথ উপসাগরের (এবানে কোথ বলে)  
উপরকার সেতু। ইহা ইকিনীয়ারিং বিজ্ঞান  
এক বিরাট নিদর্শন। দ্বিতীয়টিও সেতু, ইং  
ভাণ্ডার নিকট নদীর উপর বিস্তৃত। গেভিয়ার

রেলপথের দুইধারের পাছাড় মুক্তিকা ঘরবাড়ী ইত্যাদি দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন।

ভাতি নগরের লোক সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু বিস্তারে নগর বেশ বৃহৎ—নদীর ধারে পরিত পায়ে নগর অনেকদূর পৰ্য্যন্ত লক্ষ্যমান। সেহু হইতে নগর পানিকটা সোপানের মত দেখায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষাবিজ্ঞানেই সময় কাটান গেল। কয়েকজন অধিবিক্কাবিত্ত পত্রীতত্ত্ববিৎ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল। ল্যাবরেটরীগুলিও দেখিলাম। গেভিঙ্গ সংক্ষেপে নিয়মবধি অধ্যাপকগণকে পত্রীক্ষাপ্রণালী বুঝাইয়া দিয়া আমাকে উত্তান দেখাইতে লাগিলেন। উত্তান-রচনায় তিনি কি নিয়মে অগ্রণর হইয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ইহার মতে উপানরচনা এবং নগরগঠন এক জাতীয় কার্য। দুই কার্যেই এক অর্থ, এক রীতি অল্পময়ণ করা কর্তব্য।

জীবনের বিকাশ, জীবিত অবস্থার লক্ষণ, জীবজন্তুর স্থপ হুঃখ, প্রাণীমাজের স্বাস্থ্য ও শক্তি এই সকল তত্ত্ব মনে না রাখিলে নগর রচনা এবং উত্তান রচনা স্বফল প্রদান করে না। লোহা লতড় ইট কাঠ, কল কল্লা ইত্যাদির সমাবেশ প্রথা স্বতন্ত্র। সে প্রথা এই সকল জীবজন্তুর পরিবেশ কার্যে প্রয়োগ করা অসুচিত। সে প্রথা একিন-চালিত কারখানার বেশ স্বফল প্রদান করিতে পারে।

প্রকৃতি বৈচিত্র্য ভালবাসে—নানা প্রকার বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করে। অগুণ্ডে কত উদ্ভিদের উৎপত্তি দেখিতে পাই—নরনারীর বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই! স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিলে পৃথিবীতে অসংখ্য চরিত্রের বিকাশ

সামিত হইবে। একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য হ্রাস নাও দেখিতে পারি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমরা যখন একটা কৃত্রিম আবাস প্রস্তুত করিতে বসিয়াছি তখন তাহার অস্ত্র কোন্ পথে চলিব? কলকারখানার নিয়ম অল্পময়ণ করিব? না প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অল্পময়ণ করিব? প্রথম নিয়মে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, ঐক্য, সৌগন্দ্য ইত্যাদি পাইব; দ্বিতীয় নিয়মে বৈচিত্র্য, অসামঞ্জস্য, অনৈক্য এবং বৈসাদৃশ্য পাইব। যদি একমাত্র বাধা-বাধি মানিয়া চলি, তাহা হইলে শৃঙ্খলা আনিতে পারি, কিন্তু তাহাতে প্রাণের স্বাভাব, স্বাভাবিকতার স্বাভাব, স্বাধীনতার স্বাভাব আনিতে পারে। আবার যদি স্বাভাবের উপর নির্ভর করি তাহা হইলে আপাত্তা পরগাছা জমাল অসংখ্য জুটিতে পারে,—উত্তান জমলে পরিণত হইবে, নগর অনগণের হটগোলে পরিণত হইবে। কাজেই মানীকে দুই নিয়মই মানিয়া চলিতে হয়—কোন একদিকে খুঁকিলে দোষ থাকিঘা যায়। রাষ্ট্রাধিপকেও নগর গঠনের সময়ে শাপনের শৃঙ্খলা এবং অনগণের স্বাভাব ও স্বাধীনতা দুই-ই রক্ষা করিতে হয়।

গেভিঙ্গ এই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাগানের চিত্তর ঘুরিতে ঘুরিতে এক একটা ভিন্দি দেখাইয়া নগর ও পত্রীর (অর্থাৎ মানবীর মোচাকের) নানা দৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। সোকাগলের স্বাভাবিকতরস্থিত নর্দমা, গলি, জমাল, আত্মকুড়, বিলাসস্থান ইত্যাদির দৃষ্টান্ত বাগানের নানা গাছ পাতা রক্তা ইত্যাদি হইতে পাওয়া গেল। গেভিঙ্গ মানবমাজের জীবনকে উদ্ভিদ সমাজের জীবনের অল্পতপ সর্বদাই বিবেচনা

কিরিয়া থাকেন। তাঁহার নগর-বিজ্ঞান এবং বাগান-বিজ্ঞান দুইই গ্রাণ-বিজ্ঞানের নিম্নে অঙ্গশাসিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ হইতে নিকটবর্তী একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিতর পেলাম। এই বিদ্যালয়ের সম্পর্কে একটা ক্ষুদ্র বাগান প্রস্তুত করা হইবে। বিদ্যালয়ের মাঠেরেয়া গেভিঞ্জের নিকট পরামর্শ চাহেন। বাগানের মালী, কয়েকজন শিক্ষক এবং আমরা দুইজনে অধির উপর উপস্থিত হইলাম। নিত্যজই ক্ষুদ্র দান অথচ তাহাতেই একটা উদ্ভান তৈয়ারী হইবে: ছাত্রেরা উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য এট উদ্যানে তরলতার পরিচয় পাইবে—এই উদ্দেশ্যেই উদ্যান রচনা করা হইতেছে। কোথায় কোন্‌ গাছ বসিবে, কোথায় একটা চৌবাচ্চা কাটা হইবে, কোথায় বানিকটা কোণ রাখা হইবে, কোথায় একটা অল্প পাহাড় তৈয়ারী করিতে হইবে ইত্যাদি নানা কথা আলোচিত হইল। বাগানের চারিদিকে যে সকল বাড়ী-ঘর ও রাস্তা রহিয়াছে সেইসব বুঝিয়া শুনিয়া উদ্যানের আকৃতি স্থির করা হইল। কোন্‌ দিকে সূর্য্যের আলোক ও তাপ বেশী, কোন্‌ দিক হইতে বাতাস বেশী আসে তাহাও বিশেষ-রূপে বুঝিবার পর উদ্ভিদ সমাবেশের প্রণালী নির্ধারিত করা হইল। বাগানের দৌর্ভাগ্য উদ্ভিদের বৈচিত্র্য এবং বিদ্যালয়ের কার্যোপ-যোগিতা কোন্‌ দিক্‌ই অবিস্মৃত হইল না।

(১২) সেন্ট হ্যাণ্ড্রুজ নগর

ভাঙি হইতে সেন্ট হ্যাণ্ড্রুজ আসিলাম। রেলের আশ পাশ লাগিল। টেনদীর সেতু পার হইয়া ভাঙির অপর পার দিয়া গাড়ী পথ। গাড়ী হইতে সমস্ত ভাঙি নগর দেখা যায়।

সেন্ট হ্যাণ্ড্রুজ অনেকদিনকার পুরাতন নগর। মধ্যযুগের বাড়ীঘর যাতা যিচ্চা এখনও আছে। এগারকার কলেজগুলি অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কলেজের দ্যায় নিশ্চিত। কিন্তু সেন্ট এণ্ড্রুজের কলেজ সমুদ্রে ছাত্রেরা বাস করে না। আজকাল ভাঙি এবং সেন্ট এণ্ড্রুজের সকল কলেজই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় ১০০ বৎসর পুরাতন।

সেন্ট হ্যাণ্ড্রুজের ভিন্ন ভিন্ন কলেজে এবং কলেজের প্রাঙ্গণে বানিক লগ ফুরিয়া কিরিয়া দেখিলাম। পরে দুই তিনটা উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিষয়ক উদ্যানে প্রাণবিজ্ঞান চর্চা করিলাম। গেভিঞ্জের নৃশন নৃশন তথ্য শুনা গেল। পিনীলিকা, মাকিকা, কীট পতঙ্গ প্রদর ইত্যাদির সঙ্গে পুষ্পপাত্রেয় সম্বন্ধ বিষয়ে গেভিঞ্জের সঙ্গে আলোচনা হইল। পুংলিখ উদ্ভিদ এবং স্ত্রীলিখ উদ্ভিদের লক্ষণ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। আর্থেটন, লক্ষ্যকৃমি, আলোক উত্তাপ ইত্যাদির প্রভাবও আলো-চিত হইল। গেভিঞ্জ বলিলেন “এখানে প্রাণ-বিজ্ঞানের এই সকল তথ্য ও তথ্য বেশী শিখান হয় না। কেবলমাত্র লতাপাতা ফুলফলের আকৃতি, গঠন, বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রপুত্রের মনোযোগ আকর্ষিত করা হয়। আমি কিন্তু জীবন-বিকাশের কথাই বিশেষ গুরুত্ব করি।” আমি বলিলাম “ভারতবর্ষেও আজকাল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সবিশেষ প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু প্রাণবিজ্ঞানের অংশ বেশী শিখান হয় না। যেমন ইংলণ্ড, তেমন ভারতবর্ষ। এখানকার আদর্শই আমাদের ওখানেও অবলম্বিত।”

বাগানের নানা অংশ দেখাইতে দেখাইতে অধ্যাপক বলিলেন “কি বলেন, মহাশয়,

বাগানের মালী কখনও একত্রে লোক হইতে পারে কি? গাভপালার সঙ্গে সঙ্গী বাস করিতে করিতে স্বাধীনতার প্রতি, স্বাভাবিকতার প্রতি, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিত্বের প্রতি ভাঙার লক্ষ্যন যতই বাড়িতে থাকে না কি? মালীর আদর্শ শিক্ষকেরও থাকে কর্তব্য। মালী যেমন প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য দয়বান্, প্রত্যেককে যথাগত্ব বাধীনভাবে নিজের মত গড়িয়া উঠিতে অবসর ও সুযোগ দেয়, শিক্ষকেরও ছাত্র সব্বদে তাহাই করা কর্তব্য। কোন এক বাধা পথে বহুসংখ্যক ছাত্রকে চালাইতে চেষ্টা করা উচিত নয়।

বাগান দেখিয়া অধ্যাপক কাগজ পরীক্ষা করিতে গেলেন। অন্ত্রান্ত অধ্যাপককে তার দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তার পর আমরা অধিবিশ্ববিদ্যালয় দেখিলাম। নানা প্রকার হাড়, হাড়ের চিত্র, হাড়ের মূর্তি লক্ষ্যন রহিয়াছে। এখান হইতে একজন তত্ত্বলোকের বাগান নার্সারি ও আবাস দেখিতে গেলাম। ইহার সম্মুখে অনেকগুলি পরম ঘর আছে। কোনটার মধ্যে কলা, কোনটার মধ্যে কুমড়া চাষ চলিতেছে। ইহার কোন কোন ক্ষেতে পাকা টুবেরি ফলিয়া রহিয়াছে। টুবেরি লতানে গাছ—ফলগুলি অর্ধ মিট, অর্ধ অন্ন। কিন্তু বিলাতের লোকেরা এই ফলের নামে জিজ্ঞাসা জল ফলে। দেখিলাম মাটির উপর গাছগুলি লতাওয়াছে—জাল দিয়া সমস্ত ক্ষেতটা আবৃত। কতকগুলি টুবেরি চুরি করিয়া থাওয়া গেল। নার্সারির ভিতর নানা প্রকার ফুল গাছও আছে। এই গুলি সহরের তত্ত্বলোকেরা কিনিয়া থাকেন।

নার্সারির পরে আবাসভূমি। অধ্যাপক বলিলেন, “এখানে নানা প্রকার পশুর ও

ফলের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং গুণ পরিবর্তিত করিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “লুবার বার্সাক্সের নিয়মে এখানে কাজ হইতেছে কি?” তিনি বলিলেন “লুবার বার্সাক্সের নিয়মে হইবে কেন? পৃথিবীর সকল দেশেই লুবার বার্সাক্স আছে, অল্প ফলকে মিষ্ট করা, বড় বীজকে ছোট বীজে পরিণত করা, শব্দটুকু নিশ্চল করা, ক্ষুদ্র ফলকে বৃহৎ করা সকল দেশের কৃষকেরাই জানে। আমেরিকার লোকেরা মূর্খ। এজন্য লুবার বার্সাক্স এখানে “এরোতোহপি জন্মায়তে”!

সেন্ট চ্যান্সেলর কটল্যাণ্ডের বর্ধকেন্দ্র ছিল। মধ্যযুগে এখানে স্বচ্ছ জাতির জীবনযাত্রা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইত। শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সকল বিষয়েই ইহার প্রাধান্য ছিল। সমুদ্রকূলে ইহা অবস্থিত। এ জন্য বীষণপক্ষী স্বভাবতই গড়িয়া উঠিয়াছিল। নৌশিল্প ও অর্থবয় বাণিজ্য ইহার বিশেষত্ব ছিল। এক্ষণে বীষণপক্ষী পোচনীয় অবস্থায় দেখিলাম—নরনারীর মারিত্রা অপরিণীয় বোধ হইল।

ধর্ম সংস্কারের যুগে এখানে প্রবল সংগ্রাম হইত। তত্ত্বজ্ঞানের বর্ধসংস্কারক জর্জনফ্স কটল্যাণ্ডের আধুনিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তিনি মামুলি রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করেন। উত্তেজনার ফলে সংস্কারকেরা প্রাচীন ধর্ম-মন্দিরাদি কুমিসাৎ করে। আশ্চর্যকাল ভারত-বর্ষে প্রাচীন প্রাঙ্গণ, মন্দির, মসজিদ ভূপ ইত্যাদি বেদন ভয় রূপিতে পরিণত, এখানেও সেইরূপ ভয়রূপ বোধিতে পাইলাম। বিরাট ধর্মমন্দিরের কোন কোন প্রাচীর মাত্র বিদ্যমান, কোন কোন পূর্ণগৌরবের চিহ্নমাত্র



দেখিতে পাওয়া যায়। কুটুম্যেও বন্ধকলহ লোমহর্ষণ কাণ্ডের উৎপত্তি করিয়াছিল। ইংলেণ্ডে এত শোচনীয় ব্যাপার ঘটে নাই।

একটি মন্দিরের তদারকশে দেখিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে অব্যাপক বলিলেন “এই মন্দির কুটুম্যবাসীরা প্রিয় রাজা রবার্ট ক্রন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগকে ব্যানকবার্ণের দ্বন্দ্ব পরাভূত করিয়া জাতীয় কীৰ্ত্তিস্তম্ভরূপ এই ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টান পুরোহিতেরা তাঁহাকে দৃঢ়-কালে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুণ্ডরীকরূপই জয়ন্ত এই মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।”

আমি বিজ্ঞাপা করিলাম “আজকাল আপনারা কু ইংরাজদিগের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ব্যানকবার্ণের কথা এখনও মনে আছে কি?” ইনি বলিলেন “নিশ্চয়। গত কলা আমাদের জাতীয় উৎসব ছিল। ব্যানকবার্ণের দৃঢ়বিল আমাদের জাতীয় স্মৃতিতে ভাগরূপ। আমরা ইংলেণ্ডের সঙ্গে এক রাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছি। কিন্তু ব্যানকবার্ণ তুলিতে পারি নাই। ইংলেণ্ডের সঙ্গে আমরা যত মারামারি কাটাকাটি করিয়াছি, পৃথিবীতে অন্য কোন ছুই জাতি এত করিয়াছে কিনা জানি না। এদিকে আর আমাদের ঐক্য স্থাপিত, তথাপি ইংলেণ্ডের পরাজয় ফল এখনও আমরা গাহিয়া থাকি!”

ইচ্ছাতির ব্যানকবার্ণ উৎসবে বসি ইংলেণ্ডের আগন্তিক না করেন, তাহা হইলে মূলমানেয়া হিন্দুর পিষাণী উৎসবে আগন্তিক করেন কেন?

সেন্ট গ্র্যাণ্ড হইতে এডিনবারা কিরিয়া আসিলাম। রেল হইতে অব্যাপক প্রান্তর-গুলি দেখাইয়া বলিলেন “এই সমস্ত

কুমিগুলি উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর কনিয়ার ক্ষেত্রের মত। ছাত্রদিগকে সমস্তল ক্ষেত্রের ধারণা করাইবার জন্য এই সকল মাঠে লইয়া আসি।” ধানিক পথে সমুদ্রের ধারে অনেক ধানি নিম্ন কুমি দেখা গেল। অব্যাপক বলিলেন “এ দেখুন কুটুম্যেও হওয়াও। হওয়াওের সমস্ত অংশই সমুদ্রের জল হইতে নীচে। আমাদের এই অংশও সেইরূপ। সমুদ্রকূলে উচ্চ ও বিলুপ্ত প্রাচীর তৈয়ারী করিলে আমরা ওলন্দাজদিগের মত হইয়া পাইব।” আমি বলিলাম “এ অকল ইংলেণ্ডের বিরুদ্ধপর।”

( ১৩ ) ফরাসী দার্শনিক বার্গ-সোঁ

ফরাসি বার্গ-সোঁ আজকাল ইউরোপের দার্শনিক মহলে শির্ষ স্থানীয় কীৰ্ত্তি ভোগ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে অকলকোড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এবার গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে এডিনবারায়ও তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে, ছুটির পর আবার হইবে। ইহার বক্তৃতা ফরাসী ভাষায় হইয়া থাকে। বলিবার ভঙ্গী এবং রচনা প্রণালী চিত্তাকর্ষক।

ইউরোপে “একমেবাদিতীয়” রূপে পূজা পাওয়া সহজ কথা নয়। বার্গসোঁ সেত্ব পূজা পাইতেছেন না। তাঁহার দর্শনবাদ সর্বত্র বিনা আপত্তিতে গৃহীত হয় না। তাঁহার চিন্তার ভিতর কতখানি নিঃশব্দ এবং কত-খানি পরকীর, তাহার সমালোচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক পদবরণ মূল্যই বা কতটুকু—ভবিষ্যতে বার্গসোঁর প্রভাব বাড়িবে কি কমিবে সমালোচকেরা তাহাও বুঝাণ্ডা করিয়া দেখিতেছেন।

দার্শনিক কোন কোন দার্শনিক বলিতে-ছেন “কাণ্টের পর পান্ডাক্তা জগতে বার্গসোঁর

সম্মান চিন্তাবীর কেহ লক্ষ্যেন নাই। আধুনিক মণনের মধ্যে একমাত্র বার্মগোত্তরই টিবিয়া যাইবে।" বিলাতের পণ্ডিত হ্যাম্পডেন বলেন "বার্মগো' নূতন কিছুই শিখাইতে পারেন নাই, আখ্যাপি বৈদ্যাত্তিক শোপেন হোয়রের কথাই বার্মগো' করানী ভাষায় প্রচার করিতেছেন"। এনিকে আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত জেম্‌স্ বার্মগো'র শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেম্‌স্‌র বক্তৃতা ফলেই করানী দার্শনিক অ্যাক্সফোর্ডে নিযুক্ত হন। অথচ জেম্‌স্ ও বার্মগো' দুই ভিন্ন পথের পথিক! করানীরাই কি বার্মগো'কে সর্বাধিসম্মত গুরুরূপে গ্রহণ করিতেছে? তাহা নহে। প্রবীণ করানী দার্শনিকেরা বলিতেছেন "বার্মগো' নাত্তিকতার নূতন অবতার।" পক্ষান্তরে যুবক করানীরা বার্মগো'কে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচারক রূপে পূজা করিতেছেন। ইহারা বিবেচনা করেন বৈজ্ঞানিকতার পরিবর্তে ভাবুকতা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। এই ভাবুকতার প্রচার বার্মগো'তত্ত্বে ইহারা পাইয়া থাকেন।

বার্মগো'তত্ত্ব সম্বন্ধে একরূপ মতবৈচিত্র্য বড়ই বিশম্বদনক। সত্য সত্যই বার্মগো' একটা নূতন বাণী প্রচার করিতেছেন। তাহা বুঝতে যাইয়া নানা মূল নানা কথা বলিতেছেন। এই নূতন বাণীর প্রচারক আরও অনেকই আছেন—অবস্তা সকলেই এক জ্যেষ্ঠ অঙ্গগত নন। তাহার গতশতাব্দীর ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, সাম্রাজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রভাবপ্রাবৃত মানবজীবন পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে সমস্ত সভ্যতা, আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে বঙ্গব ওষপ্রতিষ্ঠার মতোপ স্তম্ভে হইয়াছে। মানবের উদ্বেগ ও লক্ষ্য নানা ভাবে আলোচিত

হইতেছে। এই আলোচনাপ্রণালীগুলি পূর্বতন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র—প্রাচীন পূর্বতন প্রণালীর প্রতিবাদস্বরূপ প্রযুক্তি। সেই পুরাতন রীতির সাহায্যে মানবজীবন বুঝা যাইবেনা—এই ধারণা ইহাদের সকলের মধ্যে বদ্ধমূল দার্শনিক ও হুসুমার পিঞ্জের সমালোচক গোল্যাওবানী নীট্‌সে, ভার্মাগির চিন্তাবীর পন্‌সেন ও অথকেন আমেরিকার জেন্‌স্, এক বিলাতের ত্র্যাভগে ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই নব্যদর্শনের বিভিন্ন প্রচারক। আরাদের রবীজ্ঞানাত্মক এই নব্য চিন্তাবীরগণের সঙ্গে আসন পাইয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ এক্ষণে নূতন নূতন প্রধায় জীবন-সমালোচনা চাছেন। এই জন্তই তাহারা ভারতীয় চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া "গীতারঙ্গির" সম্বন্ধনা করিয়াছেন।

বার্মগো' নব্যদর্শনের যে পথে চলিতেছেন তাহা আমাদের ভারতীয় পদ্ধতির অনেকটা নিকটবর্তী। এডিনবারার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ইনি এ কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রযুক্তি Intuition বা "অন্তর্দৃষ্টি" তবে হিন্দু দার্শনিকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন—এইরূপই ইহার মত। কিন্তু ইনি নিম্নগ্রন্থে "ইন্‌টুইশন" সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি আমাদের পরিচিত "অন্তর্দৃষ্টি," "নির্নিধ্যাসন" "ধ্যান" ইত্যাদি হইতে বহুদূরে। ইনি পাকাত্য মহলের Observation, Experiment, Inductive, Deductive, *apriori*, *aposteriori* ইত্যাদি আলোচনা প্রণালী অথবা আমাদের "প্রবণ" "মনন" ইত্যাদি প্রণালী ছাড়াইয়া বেশী উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, এই অন্তর্দৃষ্টি-তত্ত্ব ইউরোপে নিত্য নূতন নয়। আখ্যাপি মেলিন ও শোপে-

নগোয়ার গ্রাম একশত বৎসর পূর্বে এই প্রাণী দার্শনিক সংসারে প্রবর্তিত করেন। ইহার হিন্দু-সাহিত্যের নিকট কলী ছিলেন। সে স্বপ্ন স্বীকৃত হইয়াছে। বার্গসৌ গেলিকের ফরাসী শিল্প স্নাতকসার নিকট এই নৃতন বিদ্যা পাইয়াছেন।

আমি 'আউট লুক টাওয়ার' বার্গসৌ-তত্ত্ব লম্বা আলোচনা হইল। গ্রাম ত্রিভুজ উপস্থিত—প্রাণী-লোকের সংখ্যাই বেশী। গেলিক সভাপতি। অস্ত্রান্ত সকলে ইহার সান্নিধ্য—কেহ ডাক্তার, কেহ শিক্ষক, কেহ এডিনিয়ার, কেহ খনিজ্ঞানবিৎ, কেহ উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ ইত্যাদি। এতল সান্নিধ্য-সম্মিলন আউটলুক টাওয়ারে প্রতি সপ্তাহেই হইয়া থাকে। এক এক বার এক এক বিষয়ের আলোচনা হয়।

গেলিক বার্গসৌর সকল কথা গ্রহণ করেন না। প্রাণ-বিজ্ঞানের হিলাবে বার্গসৌ-তত্ত্ব টিকিবে না অস্ত্রান্ত গেলিক সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাহেন না। মাহুত, মাহুতের জীবন, মাহুতের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, এই সকল বিষয় বার্গসৌ কর্তৃক নৃতনভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জন্যই গেলিক বার্গসৌ-

তত্ত্বের আদর করেন। জীবনের কথা খিনিই গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করিবেন তিনিই গেলিকের ভক্তিভাজন।

গেলিক বলিলেন, "বার্গসৌ সমাজজীবন এবং বর্তমান মানবের কর্তব্য লম্বা একদণ্ড কিছু বলেন নাই এবং বলিতে চাহেনও না। কিন্তু তাহার চিন্তারূপির প্রয়োগ কি এখনই করা যায় না?" একজন বলিলেন "টিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক হইতে বার্গসৌতত্ত্বের সমালোচনা আমি করিতে ইচ্ছা করি। আগামী সম্মিলনে তাহা করা যাইবে।" আর একজন বলিলেন, "নগর বিজ্ঞানের বার্গসৌ আখ্যায়িকাকে কি উপদেশ দেন তাহার আলোচনাও সেই দিন করা যাইবে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন "মহান্যায়গণ, আপনারা বার্গসৌকে একটা মহাদার্শনিক বিবেচনা করিতেছেন কেন? আমি তা ইহার মন্তব্য খুঁজিয়া পাই না। বরং মনে হইতেছে ইহার প্রভাবে দর্শন অবমানিত হইতে যাইবে। আমার ইচ্ছা আপনারা ইহাকে প্রাণ-বিজ্ঞানের সমালোচনাও নকড়া ছকড়া করিয়া ফেলুন। ঐশ্বর্যবাক্যের পর এডিনবার্গের আগিলে ঘেন জাহার প্রতিপত্তি না থাকে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

## ভক্তলোকের কৃষি

আজ কাল অনেক ভক্তসম্প্রদায়ই পেটের দ্বায়ে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ কৃষি-কর্ম্মে তিরোহিত করিতে না পারিলে ভক্তসম্প্রদায়ের পক্ষে কৃষিকার্য্যে হাত দেওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। দেশের

সমবেত শক্তি, বস্তু ও অর্থ নিয়োগিত না করিতে পারিলে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তির সম্যক তিরোহানে আদৌ সম্ভবপর নহে।

ভক্তসম্প্রদায়ের কৃষির পক্ষে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার অভাব। মূল কলমে সাধারণতঃ আমরা বে শিক্ষা প্রাপ্ত

হই তাহা কেরানিসিরির পক্ষে উপযুক্ত হইবে।  
 লেও স্বাধীনভাবে জীবিকাার্জনের পক্ষে  
 আরো প্রচুর নহে। অতিকাল প্রতি বৎসরে  
 হাজার হাজার ভর সন্ধান বিবিকাগলের  
 ছাপ লইয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু সে অনীত  
 বিভাগ ব্যবহার দ্বারা পেটের ভাত বোতগার  
 করিবার অযোগ্য আর নাই বলিলেই হয়।  
 মেডিকেল ও ইন্জিনিয়ারিং কলেজে নির্দিষ্ট-  
 সংখ্যক ছাত্র গৃহীত হইয়া থাকে। তাহারও  
 উদ্দেশ্য সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী।  
 সকলেই জানেন চাকুরীর বাজার আজকাল  
 অভিশয় নশা। তা ছাড়া, আবাদের দেশের  
 অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা যেমন,  
 তাহাতে তাহাদের পক্ষে মেডিকেল বা ইঞ্জি-  
 নিয়ারিং কলেজের ব্যয়ভার বহন করা অস-  
 ক্ষম। বৎসরে দুই তিন কিস্তিতে উকীল  
 মোক্তারের হাট্ট হইতেছে। দেশের লোক  
 আর কতই মায়া মোহন্য করিয়া উৎসর্গ  
 বাইবে? তাই উকীল মোক্তারেরও আর  
 ভাত হুটিতেছে না। অফিসে কেরানিসিরিও  
 আর মিলে না, কাজেই অনেকে নিজেদের  
 বে দুই চারি বিঘা ভোত রসোজ আছে  
 তাহারই চাবাবাদ করিয়া পুত্র পরিবারের  
 গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিবার জন্য চেষ্টা  
 করিতেছেন। কিন্তু বি, এ, এম, এ, উপাধি-  
 ধারী হইলেও কৃষিবিষয়ক অনভিজ্ঞতা তাহার  
 প্রধান অন্তরায় রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে।  
 General Education এবিষয়ে তাহাকে  
 খুব কমই সাহায্য করিয়া থাকে। বাহার  
 Chemistry, Botany প্রভৃতি শাস্ত্র কঠিন  
 করিয়া প্রতিযোগী পরীক্ষার বিশেষ কৃতিত্ব  
 প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রকৃত ব্যবহারিক  
 জ্ঞানের অভাবে তাহাদের অবস্থাও  
 আশাশ্রয় নহে। ভক্ত সন্ধানের পক্ষে কৃষিকার্য

শিক্ষিবার কোন ব্যবস্থাই এ হতভাগ্য দেশে  
 এখন পর্যন্ত অচলিত হয় নাই। পুনা ও  
 সাবুর গবর্ণমেন্ট কৃষি বিভাগে ২৪ জন  
 ছাত্র লওয়া হয়—কিন্তু সমগ্র বঙ্গবঙ্গের  
 তুলনায় তাহা কিছুই নহে। এই সমস্ত কৃষি-  
 বিভাগের ছাত্রদিগকে বেশিা বোধ্য হয় না  
 যে প্রকৃত হাতে কলমে ইচ্ছাঃ বিশেষ কিছু  
 শিখিয়া থাকেন। গোটা কতক ল্যাটিন নাম  
 আওড়াইতে পারিলেই শিক্ষার সার্থকতা হয়  
 না। পুনাতে যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা কায  
 হয় তাহাতে দেশের অল্পকুল ও প্রতিকুল  
 অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় বলিয়া  
 বোধ হয় না। ফলতঃ এখানে যে শিক্ষা  
 প্রদত্ত হয় তাহাতেও লম্বা চণ্ডা রিপোর্ট  
 লিখিতে পারদর্শী সরকারী কন্সট্রাক্টর  
 তৈয়ারী করা হয় মাত্র। স্মৃতিতে পাই দেশের  
 কৃষিবিষয়ক উপদেশ ও অন্তর্বিধ সাহায্য  
 দানের ক্ষত্র প্রত্যেক জেলার গবর্ণমেন্ট এক  
 এক জন Fieldman Demonstrator  
 নিযুক্ত করিয়াছেন। পাবনা জেলাতেও নাকি  
 একজন আছেন। কিন্তু দূরদৃষ্টবশতঃ আশ্রয়  
 কখনও তাহার সম্মান লাভ করিতে পারি  
 নাই। সেদিন বিভাগীয় কৃষি ইন্সপেক্টর  
 বাবু ভবতোষ দত্ত মহাশয় আমাদের কৃষিক্ষেত্র  
 (শিরাইল লক্ষী কৃষিক্ষেত্র—হরিপুর পোঃ  
 পাবনা) পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। ভব-  
 তোষ বাবু বলিলেন কাগজে কলমে লম্বা  
 চণ্ডা রিপোর্ট পাঠ করিয়া থাকিলেও  
 জেলার মাফিল্টেট হইতে আরম্ভ করিয়া  
 বানার দারোগা পর্যন্ত কাহারও নিকট  
 পাবনার এই Fieldman Demonstrator  
 মহোদয়ের সন্ধান পান নাই। গবর্ণমেন্ট  
 হইতে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন  
 করা হইয়াছে। কৃষকগণকে স্বল্প ব্যয়ে

উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ ও অভ্যাস সাহায্য করা এই সমস্ত আদর্শক্ষেত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিন্যাস সাহায্য। একবার এই সমস্ত আদর্শক্ষেত্রের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা আর বিতীহবার উত্তর সহিত ব্যবহার করিতে চাহিবেন না। উদাহরণ স্বরূপ আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। গত দুই বৎসর আমাদের কৃষিক্ষেত্রে সোলআলু বপন করিয়া বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে রাজসাহীর Agricultural Supervisor মিঃ এন্স, এন্স, গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আমার কিছু গল্প ব্যবহার হয়। গত জুলাই মাসে গুপ্ত সাহেব আমাকে চিঠি লিখেন যে যদি তাঁহার নিকট বন্দন বীজ আশু ক্রয় করি, তবে কৃষি বিভাগীয় একজন কৃষিকারী বিনা ব্যয়ে আমাকে আশু বপনাদি সাবতীর কাজ শিখাইয়া দিবে। ঐ সন্তে আমি তখনই ১০/ মণ বীজ আশুর অর্ডার দেই এবং আশু বপনের জন্য অমী প্রস্তুত করিতে থাকি। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আমি গুপ্ত সাহেবকে ক্রমাগত কয়েক খানা চিঠি লিখিয়া কোনই উত্তর পাই না। অবশেষে অক্টোবর মাসের ২০শে কি ২১শে তারিখে আমি হার্জিলিং হইতে হঠাৎ এক চিঠি পাইলাম যে আমার নামে ১০/ মণ বীজ আশু রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান হইয়াছে। তখন আশু বপনের সময় সম্পূর্ণ অতীত হইয়াছে। প্রথমে কিছু বিব্রত হইলাম বটে। কিন্তু শেষে আশু বপন করিয়া অসুট পরীক্ষার ইচ্ছায় কৃতসংকল্প হইলাম। পার্সেল ভেদিত্তারী লইবার জন্য ট্রেনে লোক পাঠাইলাম—আমার লোক কয়েক দিন ট্রেনে বসিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিল,—আশুর নামে কোনও বোঝা ধরায় নাই। এদিকে আশু

বপন প্রণালী লেগাটবার জন্য ভবতোষ বাবু আনিয়া চাষির। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্রীড়ক গুপ্ত সাহেবকে চিঠি লিখিলাম। কোনও উত্তর পাঠিলাম না। অগত্যা ভবতোষ বাবু ফিরিয়া গেলেন। তারপর, গুপ্ত সাহেবকে দুইখানা চিঠি লিখিলাম—কিন্তু কোনও উত্তর পাই নাই।

যদি বাস্তবিকই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র-সম্প্রদায়ের অন্নসংস্থানের উপায় করিতে চয়, তবে কৃষি-শিক্ষা প্রদানের তার বেশবাসীর নিষেধ চাওতে লইতে হইবে। খাটতে না পারিলে মরিব আমরা; সুতরাং আমাদের অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত আমরা নিজে না করিয়া যদি চিরকালই হস্তকরে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া যা হওয়া কাহিতে থাকি, তবে চিরকালই আমরা রোদন করিতে থাকিব। সব দেশেই জনসাধারণই সাধারণের হিতকর কার্যের উৎসাহিতা হইয়া থাকে কিন্তু এ পোড়া দেশে সবই বিপরীত।

আমার বোধ হয় প্রত্যেক মেলায়, এবং সমস্তবর্ষ হইলে প্রত্যেক মহছুমাহ এক একটা কৃষিবিভাগীয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অনেক ভয় করেন, ছাত্রের অভাব হইবে। কিন্তু সাহায্য দেশের নাকীর পতি বেশ ভাল করিয়া টিপিয়া যেখিয়াছেন, তাঁহারা সাহস দিবেন যে ছাত্রের অভাবে এখন আর কৃষি স্থল উঠিয়া যাইবে না, আজকাল আমাদের ছেলে-পিলেরা অনন্তোপায় হইয়া হাইস্কুলে পড়িতে বাধ্য হয়। ভাল কৃষিবিদ্যালয় পাইলেই অনেকই সেখানে ভর্তি হইবে সন্দেহ নাই। অনেক মহরেই ছুই বা ততোধিক বেশরকারী উচ্চ ইংরাজি স্থল আছে। সুবিধা হইলে ইহাদের একটিকে কৃষি-স্থলে পরিণত করা যাইতে পারে। যদি তা না হয়, তবে নুতন স্থল স্থাপন

করা যাইতে পারে। ভরসা কঠি, গবর্ণমেণ্ট ও এতদ্বন্দ্বিত্বক আশাহুত্বপ সাতাগা করিলেন।

যে সময় পূৰ্বক বিশেষ হইতে কৃষি-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া দেশে বেকার বলিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে একদিকে যেমন তাঁহাদেরও অগ্রসংস্থানের বাবস্থা হইবে, অপর দিকে তাঁহাদের অন্তত বিদ্যাও দেশের মঙ্গলদায়ক করিতে পারিবে। কিন্তু দেশের কৃষকগণকে অবহেলা করিলে চলিবে না। পুষ্কায়াক্রমিক অভ্যাগণের ফলে উগাদের যে সহজাত অভিজ্ঞতা। হুঁম্বিয়াছে, তাহা পুৰ্ণপূর্ণ বিদ্যার অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। এই সমস্ত কৃষককে যদি শিকিত ব্যক্তির পথ্যবাক্যে নিযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে অতিশয়ই কৃষি কার্যের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

কৃষি কার্যের দ্বিতীয় অন্তরায়—জমি। আমাদের দেশের জমি বড়ই টুকুড়া টুকুড়া এবং পরস্পর হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এজন্য অনেক অসুবিধা হয়। উচ্যন্তে সমস্ত জমীর সমানভাবে তথ্যাবধান হইয়া উঠিতে পারে না—আবার খরচও পড়ে বেশী। কৃষি-কার্যের প্রধান শত্রু অনাসুতি। সমস্ত জমি যদি এক Plot এ হয় তবে কৃষ প্রস্তুতির দ্বারা অনেকটা অনাসুতির দ্বািত হইতে এড়াইতে পারা যায়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হইলে পূৰ্বক পূৰ্বক কৃষ খনন করিতে হইলে খরচাও পোষায় না। তবে এক গ্রামের সমস্ত লোকে এক মতাবলম্বী লটলে, অনেকটা সুবিধা করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের এখনও সে অবস্থা আইসে নাই।

ভঙ্গলোকের পক্ষে আবশ্যক পরিমাণ

জমি সংগ্রহ করা এক মগামারী ব্যাপার। দেশ হইতে মঙ্গল প্রকার শিল্প বাণিজ্য লোপ পাটগাড়ে। কামার, কুমার, খোশ, নাপিত, তাঁতি, জোলা, সকলেই আজ কাল কৃষক। কাজে কাজেই জমির দর অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। গরীব ভদ্র সম্ভানের পক্ষে এত উচ্চ মজুর দিয়া জমি পত্তন লইয়া তাহাতে লাভবান হওয়া অসম্ভব।

বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারগণ কলির এক আচ্ছাদ্য ভীষ। পিতৃপিতামহের অধ্বিত বিগতবল সম্পত্তির চোবৎকাৰী ছাড়া আর কোনও সরল খামোর অবস্থানে উন্নতপ্রবৃত্ত বৃত্তি ব্যক্তির বাবস্তার করা ইহাদের কোঠীতে লিগে নাই। উগাদের প্রভাবের ও স্বার্থপরতার নিরক্ষর দুৰ্দল পত্নীবাণীর মধ্য হইতে উত্তরাধিকার আইন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে—রক্তের সম্পর্ক হুঁম্বিয়া গিয়াছে। পিতৃহীন নাবালাক পুত্র এবং বিধবা পত্নী ইহাদের আইনে কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পাঠিতে পারে না। যথায়গে ইউরোপে প্রত্যেক বড়লোকের কতকগুলি Livered Retainers অসিত—বুনিবের হাণ্ডাক্সা যে কোন কাজেই ইহারা কোনর বাঁধা লাগিয়া যাইত। আনাখের ছোট ছোট জমীদারদের প্রজ্ঞারও তাই। একগ্রামবাসী হইলে কি হয়, গ্রামের বতগুলি জমীদার থাকে, প্রজ্ঞাসাধারণের যথোত্তত্তটী মল অবজ্ঞাস্বামী। কাজেই গ্রামের কোনও প্রকার উন্নতি অসম্ভব। জমীদারেরা নিরক্ষর প্রজ্ঞার নিকট যখন এত সুবিধা পায়, তখন পারতপক্ষে ভঙ্গলোককে জমি পত্তন করিতে চায় না তা সে বেশী নজরই দিউক—আর বেশী খালাসাই দিউক। অনেক সময়ে জমি পত্তিত রাখে, তথাপি ভঙ্গলোককে

জমি পত্তন করিবে না। কারণ তাহার। জানে যে একবার শিক্ত ভ্রমলোককে জমি পত্তন করিলে, সে ইচ্ছামত তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না, বা আদালতেও তাহার দ্বারা যিখ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারিবে না। হুতরাং আজ কাল, ভ্রম সন্তানের লক্ষে জমি সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন।

চতুর্থ অন্তরায়—রূপায় চাকর। ভাল চাকর সংগ্রহ করা বড়ই দুর্ভর ব্যাপার। দেশের একটা এমনি অবনতি ঘটিয়াছে যে ঝাঁটি লোক পাওয়া বড়ই কঠিন। তারপর সম্ভ্রান্তি একটা নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে যে রূপায় চাকরকে এককালীন এক বৎসরের অগ্রিম মাহিনা দিতে হয়। মনে করুন, চাকরের মাহিনা মিটিল মাসিক পাঁচ টাকা—বৎসরে ৬০০। এক জনের যদি একশ পাঁচ জন চাকরের দরকার হয় তবে তাহাকে এক মিনে ৩০০০ টাকা দিতে হইবে। এতখাতীত বৎসরব্যাপী খোরাক পোষাক ত আছেই। এত টাকা সব সময়ে সংগ্রহ করা বড় সোজা কথা নহে। এদেশে ভ্রমের হার বেঙ্কন উচ্চ, তাহাতে কাজ করিয়া কোন ব্যবসায়ে লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কলকথা ভ্রমের হার না কমিলে

এদেশে কৃষিই বল আর শিল্প বাণিজ্যই বল, কিছুই উন্নতি হইতে পারিবে না।

পঞ্চম অন্তরায়—পাট মজুর। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে আজ কাল দেশে সকলেই কৃষক—কাজে কাজেই পাট মজুর পাওয়া কঠিন ব্যাপার। সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মজুরের দরও বাড়িতেছে। তাহাতেও ক্ষতি হইত না কিন্তু প্রকৃত সাধু লোক আজকাল বড় একটা মিলে না। সকলেই কাকি দিবার তালে থাকে। দিন হিসাবে আজুরা দিবার প্রথা থাকতে মজুরদের এই কাকি দিবার প্রযুক্তিটা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কোনও রকমে দিন কাটাইয়া দিতে পারিলেই পুরা আজুরা মিলে। যদি দিন হিসাবে আজুরা না হইয়া ক্রতকার্যের পরিমাণ অল্প-সারে আজুরার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলেই এ অস্থিখা দূরীভূত হইতে পারে। তাহা হইলে প্রকৃত গুণেরও আদর হইবে। বর্তমান নিম্নমাত্রার লব ঘোড়াই বিশ টাকার মিক্রীত হয়।

কয়েক বৎসর হাতে কলমে কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে কয়েকটা অস্থিখা ভোগ করিয়াছি উপরে তাহা বিবৃত হইল। এই সমস্ত অস্থিখা দূরীকরণের জন্য দেশবাসীকে জ্ঞান করিতেছি। •

শ্রীমদ্ব্যথনাথ মজুমদার।

## জাঞ্জন রুশিয়া

১। রুশ-ঐতিহ্যের পূর্বভাষ্য  
কোন জাতির সাহিত্যের পরিচয় প্রদান  
করিতে হইলে, তাহার জাতীয় ঐতিহ্যের

বিষয় উত্থাপন না করিলে চলে না—সাহি-  
ত্যের সঙ্গে জাতীয়-জীবনের এমনি অবিচ্ছেদ্য  
সম্বন্ধ। বিশেষতঃ রুশ-সাহিত্যিকগণের কাহা

কলাপ যে জাতীয় জীবন-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন তাহা বিংশশতাব্দির যুগে উল্লেখ করাই বাহুল্য। মাত্র। উনবিংশশতাব্দির শেষভাগ হইতেই রুশ-সাহিত্য অতি বিপ্লব ভাবে বিব-সাহিত্যের দৃষ্ট আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে; ইতিপূর্বে এই সাহিত্য একটি ঘোর অহুঙ্করণ-প্রবৃত্তি ও সত্যোন্মেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। করাদো ও আর্খানগো প্রভাব রুশ জাতির অস্থি-মস্তক প্রভৃতির প্রবেশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই জাতি কখনও নিজেদের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। এক দিকে অতি প্রভাবশালী রাজত্বের ঘনবদ্ধাচারিত্য, অত্রদিকে বিদেশীয় অহুঙ্করণ-প্রবৃত্তির বাহুল্যে এই জাতি পদে পদে অন্তর্নিহিত নির্যাতন ভোগ করিতেছিল।

কিন্তু আর এই জাতি আপনাদের স্বল্প নির্ভর করিতে পারিয়া সময় ইউরোপ যুগে সর্ববিষয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষত গতিতে বাকী প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা ধারাবাহিক পর্যালোচনা করিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

রুশ-সাহিত্য এবং রুশ-সভ্যতা যুগ-পরিবর্তক পিটার দি গ্রেটের শাসন-কালেই ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। আর যে গোগল (Gogol) টুরজেনিক (Tourgeniiff) ডস্তয়েভস্কী (Dostoyevsky) ও সলোভিন লিও টলষ্টয়ের (Leo Tolstoi) নাম জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার আদি কারণ যে মহাত্মা পিটারের একমাত্র অধ্যবসায় তাহা সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক স্রোত্রেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবল রুশ সাহিত্য কেন ?—রুশ জাতীয় জীবন ও পিটারের সময় হইতেই ইউরোপীয় সভ্যতার ও হুঙ্কতির আলোকে গঠিত হইতে থাকে।

পিটার এবং আর্কহর্জ-প্রিয় শাসন-কর্তা না হইলেও, পিটারের পারিষদবর্গ সর্ব বিধেই ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। পিটারের সময় হইতেই রুশিয়ার স্রো-বাণীমতা প্রথা প্রচলিত হয়—ভাইভোর্স-প্রথাও প্রচলিত হয়—পিটার এবং তাহার পরীকে পরিচাল্য করেন।

জগতের ইতিহাস সকল আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জাতীয়-জীবনে যে মাত্রায় হুঙ্কতি বৃদ্ধি পায় তদনুসারে জ্ঞানোত্তর কমিষা আসে। এক হিসাবে পিটারের সময় হইতেই যেমন রুশ জীবনে হুঙ্কতির অত্যাশান, অস্ত-বিকে তেমনই জ্ঞানোত্তর অধঃপতনও দৃষ্ট হয়। পিটারের পূর্বে, শুক্ল-রুশের প্রতি ভক্তি একান্তবত্তী পরিবার, আহার বিহারে পরিচ্ছদে অনাড়ম্বর, এমন কি জারও সামান্য মানবের দ্রব্য জীবন-পাত করিতেন। তখন বর্ধমানো-চনাই সাহিত্যের বঙ্গাবলম্ব ছিল। কৃষিকার্য্যও বেশজাত ত্রব্যের দ্বারা ই সকল অভাব এবং আগ্রহের পূরণ হইত। ইউরোপের সঙ্গে সভ্যতা-হিসাবে কোন সঘনাই ছিল না। সময় ইউরোপও রুশিয়ার সঙ্গে একরূপ অজ ছিল।

আজিও রুশ জাতির মধ্যে, ইউরোপ অনেক বিষয়ে অজ্ঞাত। তাহার কারণ কি ? তাহার প্রথম কারণ ঐতিহাসিক-বিস্ময়তা। কেবল দুই শত বৎসর ধরিয়া, পিটারের সময় হইতেই রুশিয়া ইউরোপীয়-ইতিহাসে বোগ-মান করিয়াছে। তৎপূর্বে, বেশ বিশেষে বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সঘন, দোত্য ও বিশেষের নরপতিগণের সহিত রুশ-রাজ কুমারীগণের কতিপয় বিবাহ বন্ধনই ইউ-রোপের কর্ণগোচর হইয়াছিল। রুশিয়া আপনাদের ধর্ম কয়েই তখন আবদ্ধ ছিল,



ইউরোপের আচার ব্যবহার তখন তাহার অস্তরে প্রবেশ করে নাই।

দ্বিতীয় কারণ চত্রেতে ভাষা-গত-বিভিন্নতা। সমগ্র ইউরোপ এক আধাবংশোদ্ভূত হইলেও, কণ ভাষা সাক্ষরিক শাখার অন্তর্গত কিছু ইউরোপের অন্তর্গত ভাষা লাতীন ও জর্মান-শাখাে বিভক্ত। পুরাতন লাতীন-সভ্যতা একমাত্র রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্যের জাতির মধ্যে বহু-প্রার্থক্য সত্ত্বেও আচারে ব্যবহারে তাহানিয়কে এক পরিবার-গত করিয়া কেনিয়াছিল। কণ-জাতি-বাইলেভাইন সভ্যতার স্তিত্তর দিয়া ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার কিছুদংশ গ্রহণ করিলেও, ইউরোপের লগ্নে জাতীয়তার ক্ষেত্রে এক সমবেদনাত্মক আবহু হইতে পারে নাই। কণ ভাষাও সমগ্র ইউরোপের পক্ষে এক অবোধা কটশাখা বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত; তজ্জন্ত রুশিয়া ইউরোপের ঐতিহাসিক-ক্ষেত্র হইতেও অনেক দূরে পড়িয়াছিল।

তৃতীয় কারণ, চরিত্র-গত বিভিন্নতা। ইউরোপের অন্যান্যের জাতির লগ্নে তাহা-বিগের চিন্তার পার্থক্য। কণ-জাতির লগ্নে অন্ত্যাবধি ইউরোপে কতদূর অসম্ভব ও কাল্পনিক ধারণা প্রচলিত হইতেছে তাহার ইঙ্গিত নাই। Prince Viazemsky তাহার "Lettres d'un Veteran russe" নামক পুস্তকে-লিখিতেছেন;—"If you want an intelligent Englishman or Frenchman to talk nonsense, let him emit an opinion on Russia; it is a subject which intoxicates him and at once clouds his intellect." তাহা হইলেও ইহা অস্বীকার করা

যাব না যে Ralston Leroy-Beaulieu Rimbaut প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও পর্যটক-গণ আনানিয়কে কণিগা-লগ্নে কেবল কতক-গুলি মিথ্যা ও ভুল ধারণাই দিয়াছেন। অরল; বদকাল উপভোগ-লগ্নক ও উড়া পর্যটকগণের কণ-বৃত্তান্ত যে ভ্রান্ত মন্তব্য-লগ্নে পূর্ণ তাহা Prince Viazemskyর কথাবাহারী নিতান্ত মিথ্যা নহে।

কণিয়া লগ্নে অপর জাতির ধারণা বাহাই থাকুক, বস্তুত্ব সত্ত্বে, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক লগ্নেবাহার যথা দিয়া আয়ত্তা কণিয়ার ভালর দিকটাই দেখাইতে চেষ্টা করিব—কেমন করিয়া কণ-জাতি এবং কণ-সাহিত্য আঙ্গ সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল? তাহারই একটা হিলাবের পরিচয় দিব।

দৌলদর্ঘ্য এই বিশ্ব-লগ্নারকে সকল বিভিন্নতা হইতে একই অণীমের অলগ্নে আকর্ষিত করে—দৌলদর্ঘ্যের মোহিনী শক্তিতে পৃথিবীর সকল লগ্ন—সকল ব্যবধান এক হইয়া যায় এবং শিল্পই যে সেই দৌলদর্ঘ্যের প্রতিমূর্তি বা উপাদান তাহা কে অস্বীকার করিবে? এবং সেই শিল্প মোহাই যে আবার সাহিত্য সর্জাপেক্ষা প্রচাণ সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম লগ্ন তাহাতেও লগ্নেই নাই। এই লগ্নান লগ্ন-শিল্প ও সাহিত্যাত্মশিল্পনের দ্বারা আয়ত্তা বহু-পার্থক্য ও ব্যবধান ভেদ করিয়া বিভিন্ন প্রজাতির জাতির অন্তরেও প্রবেশ করিতে পারি। কণ-সাহিত্যিক Wolconosky লি-তেছেন, "Art is one of the greatest powers which work at the destruction of those barriers which have been erected against human intercourse by national distinctions."

জাতীয়তা বলিয়া সকলের অন্তরে একটি বস্তু আছে তাহা যেন এবং সময়ে সভ্যতার মধ্যেই মানবধ্বংস; কিন্তু বিজ্ঞান এবং শিল্প যে সকল গভী ও ব্যবসানের বাহিরে অবস্থিত করে—এই গভীর সত্যটি আমরা বারবার তুলিয়া ঘাই। কতবার একদেশ-বর্নিতা আদিয়া আমাদেরকে সম্ভবতঃ জুঁমি হইতে বিচ্যুত করিয়া যায়। তৎক্ষণ কবি কিশা শিল্পীকে আমরা অনন্তর আপন হইতে নামাইয়া একটা জাতি ও দেশের বলিয়া প্রতিপন্ন করি কিন্তু বাস্তবিকই কি ইহা সত্য! স্মিথ চংকে দেখিলে ইহা ওই রূপই দেখায় বটে কিন্তু মানব ও অগ্রভূতির দৃষ্টিতে যেনিলে কবি বা শিল্পীকে জাতীয়তার গভীরে ফেলিয়া আমরা কোন রূপবেশ করিতে পারি না। অনন্তর বা অন্তরের প্রাণে কবি বা শিল্পীর আপন; জগৎমান বধায় হউক না কেন তিনি কাহারও পর নহেন—তাহার অধিকার জগতের সর্বত্র—সর্বজাতির উপরই তাহার একহস্ত প্রভাব! তাই Dr. Munster বলিয়াছেন :—“Great artists have no country.” ভারতের কালিদাস আর বাস্তবিকই জগতের কালিদাস—ইংলণ্ডের শেক্সপিয়ার আর জগতের শেক্সপিয়ার, ফরাসীর ভিক্টর হুগো আর জগতের আরাধ্য দেবতা, কিশোর টলষ্টয়ের নাম আর কেবল যেন কাল পাঞ্জের ভিতর আবদ্ধ নহে, তাহার প্রভাব জগতের সর্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে।

অতএব, আমরা মানব ও অগ্রভূতির চক্ষেই রূপ-সাহিত্য ও ভদ্রসংস্কৃত ঐতিহ্যের কথা আলোচনা করিব।

বর্তমান সময়ে, দুইটি তরু আমেরিকের মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়া আমেরিককে মহা-বিশ্বমে ফেলিয়াছে, তদ্ব্যতীত একটি জাতীয়তা,

অপরটি বিশ্ব-মানবতা! উত্তারোত্তর সর্গ প্রকারে রূপের সঞ্চে সম্বন্ধ আমেরিকের বাড়িয়া উঠিতেছে, আর যেন আমরা নিশ্চেষ্টভাবে এবং সঙ্কট চিত্রে আমেরিকের বহু জাতীয় বিশিষ্টতা ও সর্গভীর বস্তু আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছি না। সর্বদেয় হইতে আশ্রয় তুলিয়া জানায়েবণে শিক্ষিত মানব-সমাজের যেন একটি মহা আগ্রহ দেখা যাইতেছে। হইতে পারে, বৃদ্ধ বিগ্রহ, যাপ ও অপরাধের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তা কথটি এখনও তাহার প্রাধান্য রাখা করিতেছে কিন্তু শিল্প বা বিজ্ঞানরূপ সম্ভবতঃ ক্ষেত্রে জাতীয়তা কণাটি ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। নদী পর্বতের না সমুদ্রের?—ইহাব উত্তর দেহুত হুজর, তেমনি সাহিত্য দেশ জাতির অন্তর্গত না সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন, ইহার নামাংলাও তরুত। ব্যক্তির এবং জাতীয়-যেও ভিত্তির উপর সাহিত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও, বিশ্ব ও অনন্তের দিকেই সৎ-সাহিত্যের লক্ষ্য।—পর্বত হইতে উঠিলেও নদীর যেমন সাগরের দিকে লক্ষ্য! মানবের প্রতিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন যে সত্তা তাহা কেবল তাহার জগৎমির উপভোগের অঙ্গ স্বভিত হই না, তাহার ব্যাপ্তি সর্বদেয় ও সর্বকালে।—আমরা এই মহান সত্যটি স্মরণ করিয়া রূপ-সাহিত্যের গতিবিধি পর্যালোচনার প্রবৃত্ত হইব।

এই বিস্তৃত আয়োজনের পূর্বে আমরা সম্ভব পাঠকবর্গকে রূপ ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম পূর্ণাঙ্গান বিব। রূপ-ঐতিহ্যের কুচ্যটিকাঙ্ক প্রভাত-প্রারম্ভে আমরা করিকের (Rurik) নাম দেখিতে পাই। ইনি একজন নরওয়ে-দেশীয় নরমান রাজপুত্র, সামান্য জাতিগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাহার রূপ নামক

নবমান অশুভরূপকে লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নভগরড (Novgorod) নামক স্থানে বসবাস করেন। ইং ৮৬২ খৃষ্টাব্দের কথা। তাঁহার বংশ কনিয়ার যোড়শ পতাবীর শেষ-কাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৮৭ খৃষ্টাব্দে কিভের গ্রাণ্ড ডিউক, ড্রাভিমীর (Vladimir) কনিয়ার প্রথম খৃষ্টাব্দে আনয়ন করেন। "Will of Vladimir Monomah"—সেই মহাযুগের একখানি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। কিন্তু ত্রয়োদশ পতাবীর প্রারম্ভে তাতারগণের কঠোরত্ব হওয়ায় প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া কনিয়া কোনরূপ উন্নতির আলোক দেখিতে পায় নাই। তাতার অধীনতার নিম্নে তদানীন্তন কনিয়ার খৃষ্টীয় সভ্যতা কোনরূপ মাথা তুলিবার সুযোগ পায় নাই।

অতঃপর ড্রাভিমীর প্রতিষ্ঠিত কিভের (Kiev) খৃষ্টীয়-তত্ত্বের অধঃপতন ঘটিলে মস্কো (Moscow) জাতীয় পুনরুত্থানের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। তৎকাল মস্কো কনিয়ার দ্বন্দ্ব বলিয়া সম্বোধিত হয়। Grand Duke John III. চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সমগ্র কনদেশকে তাতার-অধীনতা হইতে উদ্ধার করেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে জন চতুর্দশ (called the Terrible) মস্কোর প্রথম আরুণে অভিষিক্ত হন।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ক্রিক-বংশ লোপ পাইলে কনিয়ার মহা হুমুস ও বিপ্লব উপস্থিত হইল।—মস্কো পোলিশ-পৈত্রগণের দ্বারা আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অশান্তি ও বিস্ত্রেরে ভর বিখ্যাত বলিয়া কন-ইতিহাসে এই সময় Times of confusion বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মাইকেল রোমানভ (Romanov) কন-সিংহাসন গ্রাপ্ত হন।

রোমানভের পুত্র এলেক্সিসের (Alexis) সময় হইতেই কনিয়ার বিনোদ্য সভ্যতা ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রথম প্রবেশ করিতে থাকে। গোলোম্বা, ইংরাজ এবং জার্মানগণ বাণিজ্য বাণদেশে যত্নে। নগরীতে সমবেত হয়। এলেক্সিসের পুত্র পিটার দি গ্রেট কন—ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করেন। কনিয়ার কবি পুস্কিন (Pushkin) পিটার সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত স্ততি কবিতাটি রচনা করিয়াছেন।

ইংরাজী অর্থবাদ, কথা :—

Academician, now a hero,  
Now carpenter, now navigator,  
With his all comprehensive soul,  
On the throne he was a constant.

Workman.

প্রত্যেকখানী মহাযুগের পিটার কনিয়ার ছত্রিশ বৎসররাজত্ব করিয়া কনজাতির অপূর্ণ পরিবর্তন-সাধন করিয়াছিলেন। কনিয়ারকে তিনি কনস্কারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া ভগ্নের সম্মুখে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই ইউরোপের দিকে কনিয়ার পলায়ন-দ্রষ্টব্য করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পিটারের অধীনে কনিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

পিটারের রাজত্বকাল পর্যন্ত আমরা পাঠকবর্গকে কনিয়ার ন্যকপট ইতিহাস জ্ঞান করিলাম। এইবার আমরা কন-সাহিত্যকে আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় করিতে বর্তমান কন-সভ্যতা ও চিন্তার কেন্দ্রে অবতরণ করিব। ইহা দ্বারা আমাদের পূর্বাখ্যাপিত দৃষ্টি ও অনুভূতি প্রশস্ত স্পষ্ট ভাবে উন্মোচিত হইয়া পড়িবে। তাহাতে বোধে বর্তমান জাতীয়-দম্ভা দেখা যাইবে তাহা পূরণ হইতে পারে, এইরূপ আশা করা যায়।

(২) রুশ-সভ্যতার বর্তমান সমস্তা

আমাদিগের বর্তমান সভ্যতাক্ষেত্রে যেমন দুইটি বল হইয়াছে, তদ্বৎ একটা আশাশ্রয় অপরটি স্বতন্ত্র, একটি অহঙ্করণ-প্রিয়, অপরটি পুরাতন-প্রিয়, তেননি রুশ-সভ্যতার ক্ষেত্রেও আমরা দুই প্রকার বল দেখিতে পাই। তদ্বৎ প্রথমটি পুরাতন-স্ত্রী স্লাভোফিলিস্ (Slavcanophily) অপর সম্প্র-বাদ, অহঙ্করণ-পাক্ষাত্য সভ্যতাভিমাত্রী অস্ত্রোভোদাল (Zapadniki)।

পিটার বি গ্রোটের রাজত্ব কাল হইতেই পাক্ষাত্য-অহঙ্করণ-প্রিয়তা বহুকদমীল রুশ-জাতির মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ কবে, তৎকাল আভিভাত্যগরী স্লাভোফিলগণ পিটার-কেই সর্বাগ্রে ঘোষী করেন। স্লাভোফিলগণ পাক্ষাত্য-প্রিয়তাকে একতর দাপন বলিয়া বিবেচনা করেন। অহঙ্করণ-প্রিয়তা একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতিকেও কিরণ বস্ত্রতাপর দাপন হীনবীৰ্য্য করিয়া তুলে, তাহা আমরা রুশ-ইতিহাসেই বিবেচনার উপলব্ধি করিতে পারি, আমাদের জ্ঞান পরাবীন জাতির ত কথাই নাই। সর্কোপরি অহঙ্করণ-প্রিয়তার জ্ঞান পরাবীনতা আর বিতীয় নাই, ইহাতে মানবের নিম্ন বলিতে আর কিছুই থাকে না।

একটা জাতির স্বাভাবিক গতির প্রতি-রোধক বলিয়া স্লাভোফিলগণ পিটারকে দেশের সর্কনাগকারী বলিয়া অপর্যায়ী করেন। Danilevskyর (দানিলেভ্‌স্কি) Russia and Europe নামক গ্রন্থে এতদ্বৎভাবে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। দানিলেভ্‌স্কি বলেন, পিটার ইম্পেরোরের সহিত প্রেম পড়িয়াছিলেন, পিটার জাতীয়জীবনের মূলোচ্ছেদ করিয়া রুশ-স্বত্বিকার অঙ্গপণ্ড

ভিন্ন দেশীয় সভ্যতার পরগাছা লগাটাইছিলেন। রুশিয়ার জ্ঞানিত ও পবিত্রতার ধনসম্ভারক বলিয়াও তিনি পিটারকে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

যে দেশ সভ্যতার আদিম উদায় ধর্ম ও পবিত্রতাকেই মূলমন্ত্র করিয়া বহুতায়তন হইতেছিল, যে জাতি খৃষ্টধর্মোদ্ভাষিত শান্তি ও নির্দিবাদকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিল, পিটার তাহার আশ্রয় পরিবর্তন করিয়া বিশেষীয় সভ্যতাত্ত্ব অধীনতায় আবদ্ধ করিয়া রুশিয়ার জাতীয়তাকে নিকী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অষ্টাদশশতাব্দীর এই দুর্দমনীয় পাক্ষাত্য প্রযুক্তিকে প্রতিরোধ করিতে নিকোলাস রাজত্বকালে মহাপ্রভাবশালী স্লাভোফিল-ধর্মীগণ দেখা দিল। সমগ্র রুশিয়া অহঙ্করণ-প্রিয়তার মোহমহিয়ার আঁঠেস্ত ছিল, স্লাভোফিলগণের অভ্যাসে রুশিয়া আবার নব উজ্জ্বলনার ধোয়ায়বোধে জাগিয়া উঠিল। স্লাভোফিলগণ প্রাধান্য হইতে হুটীর পর্ষা সমগ্র দেশবাসীর সহায়কৃতি পাইল। রুশিয়ার পুরাতন, রুশিয়ার ইতিহাস, রুশিয়ার প্রাচীন-তম স্মৃতি সফল, রুশিয়ার নিম্নর বাহ্য কিছু আবার বীরে বীরে স্লাভোফিলগণের অগ্রিময়ে তদ্বাবরণ ভেদ করিয়া জলিয়া উঠিল। রুশ-প্রতিভা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেষ্টন প্রাপ-পাত পরিপ্রভ সহকারে রুশজীবনের পুনরুদ্ধার করিয়াছে তাহা যেখিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। তাই La Littérature Russe নামক বিখ্যাত গ্রন্থে Comte De Vogüé লিখিতেছেন :—( রুশানীর অহঙ্করণ )

The fact that Russian genius has won for itself a great position in European literature is one of the

most notable phenomena the history of the last quarter of the nineteenth century. Until very lately Russian literature had been content to accept with docility, the theories and the literary formulae of the older European civilisation ; but at last it became conscious of its own power, extended its influence beyond the national frontiers and now it repays its debts to Europe, enriching us by the gift of new ideas and new forms of expression.

কেবলমাত্র আত্মবোধ ও আত্ম-সম্মান বলেই আরু কশিয়ার সমগ্র অগভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। স্লাভোফিলগণ জাতীয়-সম্মান-জ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। যে ইউরোপীয় সভ্যতা কশিয়ার এক সময়ে সর্ক-বিষয়ে বন্ধনস্থরূপ ছিল, আর সেই ইউরোপ সাহিত্যক্ষেত্রে কশিয়ার দিকে নৃতনত্বের মন্ত্র তাকাইয়া আছে। বিদ্যমানবতা জাতীয়তার ভিতর হইতেই উঠে; নদী যেমন পর্বত হইতে উঠে! অহুসরণপ্রিয়তার ক্ষেত্রে বিদ্যমানবতার ভয় নহে। Charity begins at home.

Anatole Leroy-Beaulieu এই Slavophilগণের পক্ষসমর্থন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Empire of the Tsars and the Russians এ লিখিতেছেন :—

"Thank to them (Slavophiles) Russia has recovered her national consciousness which threatened to become obliterated under a vain

and sterile cosmopolitanism. At one time it was a wholesome reaction of 'home' against 'abroad'"

তাই সমগ্র কশিয়ার প্রতিধ্বনি-স্বরূপ J. Aksakov তাঁহার বিখ্যাত 'Russ' গ্রন্থে লিখিতেছেন :—

"At home, at home" must be found the inspiration of Russian life."

স্লাভোফিলগণ কশিয়ারকে Holy Russia বলেন এবং পান্চাত্য বাহ্য। কিছুকে rotten West বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। সর্ক-বিষয়ে এই পান্চাত্য-বিষেদই কশিয়ার জাতীয়তার পুনরুত্থান ঘটাইয়াছে।

এক কথায় স্লাভোফিলগণের ধর্ম Drang nach Osten (Eastward Push) বা Aux Lux Oriente (Light from the east once more)। ইহার কশিয়ারকে প্রাচ্য-সভ্যতার অন্তর্গত করিতেই চায় এবং পান্চাত্য সভ্যতা হে কশিয়ার পক্ষে একটা অবাস্তব বিষয় তাহাও প্রতিপন্ন করিতে চায়।

কশিয়ার আর একদল লোক আছে, তাহার Zapadniki (westernists)। তাহাদের স্বপ্ন হইতেছে "Europeans sum et nihil Europaei a me alienum esse puto" ইহার ইংরাণী হইবে এইতরু—All Europe's interests must also be Russia's, her wishes must be our wishes, her aspirations—ours অর্থাৎ "সর্কবিষয়েই আমরা ইউরোপের অহুসরণ করিয়া চলিব।" ইহাই তাহাদের আদর্শ।

এই উত্তর স্রোতই কশিয়ার প্রবলভাবে বর্তমান। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় এই যে এই

উভয় দল পঞ্চাশ প্রতিনিধী হইলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার বেগের অল্প একটু ভাণে কার্য করিয়া আসিতেছেন। তাই Prince George Wolconosky তাহার Lowell Lectures এ বলিতেছেন:—

In these—their works in behalf of Russian science—the Slavophiles co-operated with their adversaries 'Westernists'. An out-burst of scientific activity was displayed by numbers of professors and writers, who with incredible energy in ten or fifteen years raised historiography and philology in Russia to the level on which they stood in Western Europe.

উভয় দলের এই সাহসিক্য ভাব কণ-সভ্যতা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক অকৃতপূর্ণ যুগান্তর আনিয়ন করিয়াছে। নিম্ন এবং অহুকরণ-প্রিয়তা লইয়াই বর্তমান কণ-বাসিনগণের জীবন-সংগ্রাম। বাণান্নিকগণের সহিত রাডো-কিলগণের যনাত্তর না ঘুটিলেও কনিয়া তাহার বর্তমান সাধন ওইতে কখনই ছাড়া হইবে না। কনিয়া সর্ববিষয়েই আজ স্বাধীন হইতে চুটিয়াছে, সর্ববিষয়েই কনিয়া তাহার নিম্ন চাৰ। পিটার কনিয়ার মধ্যে যে স্বাধীনতা আনিয়ন করিতে ইউরোপের অধীনতা বীকার করিয়াছিলেন, সে স্বাধীনতা কনিয়া লাভ করিয়াছে। এক্ষণে কনিয়া ইউরোপের অধীনতা হইতে মুক্তি চাৰ—পিটারের স্বাধীন-সলিলকে বুঝাইতে চাৰ। তাই নব্য রাডো-কিলগণের উৎপত্তি। অহুকরণকারী বাণান্নিক-সম্প্রদায়ের আবশ্যকতা কণ-সভ্যতাপক্ষে এখন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া গতিতেছে—

পুণ্যজন বাণান্নিকগণ সম্প্রদায়ের অপেক্ষা নব্য (Neo) রাডো-কিলগণের প্রাধিকার বাড়িতেছে। অহুকরণকারীগণের কার্য শেষ হইয়াছে এখন কনিয়ার অন্তর্গতি আসিয়াছে। টিউটনিক সভ্যতা এখন আর তাহার অভিগ্রেস্ত নহে। এখন এই পবিত্র ভূমি নিজেই নিজের মত করিয়া গঠিতে চাৰ। তাহার জান-গবেষণা যে কোন অংশে ইউরোপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে, ইহা রাডো-কিলগণ বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই সর্ববিষয়েই কনিয়ার আজ অকৃতপূর্ণ স্বাধীন! তাই রাডো-কিলগণের অন্তরে উদীপ্ত হইয়া Danilevsky বলিতেছেন:—

Having no part either the European good or the European evil, how can she belong to Europe? Neither true modesty nor true pride allow her to assume that she does. Only low-bred upstarts push their way among their betters.

কণ-সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে আমাদের বিগের বর্ষের নব্য-বাণান্নিকগণেরও চৈতন্য-স্ফার হইতে পারে। কিন্তু যেহিমা শিথিলতার আমরা পায় নহি, আমাদেরকে চৈতন্য শিথিতে হইবে। না জানি কোন ভবিষ্যতের পক্ষে কনিয়ার রাডো-কিলগণের দ্বার এই অধ্যায়ের বাহানী জাতির মধ্যেও ওইতপ নৃতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে। হিন্দু কিস্টই নাই কিন্তু স্মৃতি আছে—অতীত আছে—পুণ্য আছে—পূর্ণ পুণ্যের তপ্পন এখনও শেষ হয় নাই—স্মৃতির মুহুর্তে বর্তমানকে গঠিয়া তুলিতে হইবে—স্মৃতিকে ভুলিলে চলিবে না, স্মৃতির স্মৃতি অতীতের স্মৃতিটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না। পিতৃপুত্র

আমাদের নিজস্ব সামগ্রী! "Retour aux croyances ancestrales" ইহাই বর্তমান যুগে সকল জাতি বুঝিতে শিখিয়াছে, ফরাসী বুঝিয়াছে অক্ষয় বুঝিয়াছে রূপ বুঝিয়াছে। হেগেল (Hegel)র জ্ঞান এবং মর্শন যেমন টিউটন জাতির প্রাধান্যের অধরনি করিয়াছে, স্নাতোফিল-বন্দী কনগণও হেগেলের অহুকরণে স্নাতোফিল জাতির অধরনি উচ্চারণ করিতেছে। সকলেই আপনাকে বড় করিতে চায়—জাতীয়তা এবং অতীত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চায়। কেবল আমরাই হুকটির মোহে অহুকরণ-প্ররত হইয়া পিতৃ বর্ষকে তুলিয়া আছি। কনিয়া আপনাকে ইউরোপীয় বলিতেও লজ্জিত। বাপাদনিকীর্ণ বলেন, কনিয়া ইউরোপের পালিত সন্তান। স্নাত-পঞ্চদশমর্যক দানিলেভ্‌স্কী ইহাতে একটু ফরাসী রস-সংযোগ করিয়া বলিতেছেন, il faut les épouser (we must become wedded to them) অর্থাৎ আমরা ইউরোপীয়ানগণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ বদ্ধ। বাপাদনিকীর্ণের বিশেষত্ব যেমন বিশ্ব-মানবতা ও ইউরোপের অহুকরণ-প্ররত, স্নাতোফিলগণের বিশেষত্ব তেমনি জাতীয়-পৌরব-প্ররততা ও বৃত্তীয় বন্দী-হুমোদিত দীনতা (Christian humility). স্নাতোফিলগণ বলিয়া থাকেন—“ We are great because we are humble ” Wolconosky অর্থাৎ রূপ আদর্শ তুলনা করিয়া লিখিতেছেন,—Only with this difference that what in the Germans was condemned as national conceit because it (the doctrine of Hegel and Schelling) stood on a purely rationalistic basis without

any religious element, being transplanted to Russian ground, was set up as a mark of Christian humility.

কনিয়ার বর্তমান আত্ম-বোধ হেগেলের জ্ঞানহুমোদিত হইলেও মর্শের সঙ্গে ইহা বিশেষভাবে সংস্থাপিত—ইহাতেই কনিয়ার বিশেষত্ব! কিন্তু কনিয়ার আত্ম-বোধের সঙ্গে সঙ্গে আলোকের পার্শ্বে অন্ধকারের স্তম্ভ আর এক ভয়াবহ চিত্র ধীরে ধীরে কনিয়ার জাতীয় জীবনকে অস্ত্রাবধি ও কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা নিহিলিজম্ অর্থাৎ খাটি কন-উচ্চারণে “ nihilism ” (কন বর্ণ-মালাদ হর উচ্চারণ উষ এবং তৎপরিবর্তে হ উচ্চারণিত হয়)।

হেগেলের স্বকণ্টিল-বর্ষ এবং ক্যান্টের মর্শনের (individualism) মর্শ ডেন করিয়াই কনিয়ার এই অভিনব নিহিলিজমের জন্ম। ফরাসী এবং জর্মানিতে ইহার বীজ তেমনি মাথা তুলিতে না পারিলেও এই স্বাধ-বর্ষ প্রদীড়িত কনিয়ার নিহিলিজম বড়িভাঙতন হইবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিল। নিহিলিজম কবাটির উৎপত্তি কিন্তু Ivan Turgenev এর Father & Sons নামক এক নভেল হইতে, বাহার কথা আমরা পরে বলিব। এই নিহিলিজম কিন্তু সদয় বিশেষে তিনটি আকার ধরিয়াছে। প্রথম বধন নিহিলিজম কনিয়ার বেণা বেষ, তখন ইহার সঙ্গে কোন স্বাক্ষরিতিক বাপারের সম্বন্ধ ছিল না। ইহা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কতিপয় ছাত্র ছাত্রীর আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রথম স্বেপিত হয়। তাহার পর ইহা বাপাদনিকী ও স্নাতোফিল সম্প্রদায়-বধের মধ্যে ভুল আশ্বোলন আদরন করে। ইহাই

হইতেছে নিহিলিজমের দ্বিতীয় আকার। কল দেখকগণের অধিকাংশই নিহিলিষ্ট, তৎক্ষণ প্রায় কেহই সাইবেরিয়ায় নির্ধ্যাতন-স্থব হইতে বঞ্চিত হই নাই। Turguenief এ Bozárov চরিত্র ও Pissemsky's Helen চরিত্র এই নিহিলিজম ব্যাপার যে কি ?— তাহার দুইটি অপূর্ণ নির্দর্শন। ১৮৭৭—৭৮ খৃষ্টাব্দে হইতেই এই প্রচ্ছন্ন-বস্তাব নিহিলিজম তাহার তৃতীয় মূর্তি ধারণ করিল—তখন হইতে বেন অগ্নিমূর্তি দেখা দিল—বড়ঘর, গুপ্ত হত্যা ভিনামাইট ও ভয়-প্রদর্শন ইহার অজানা-কল্পনার বিষয় হইল। এই অগ্নি মূর্তির আবার তিনটা দিক বাহির হইল

১ম দিক—Speculative radicalism

(আমূল-পরিবর্তন পক্ষপাতিতা)

২য় দিক—Socialistic apostolate

(সমান-অধিকারের পক্ষপাতিতা)

৩য় দিক—Revolutionary terrorism

(বিরোধোৎকট ভয়-প্রদর্শিতা)

একজন নিহিলিষ্টকে তাহাধের নিহিলিজমের মর্ম কি ? জিজ্ঞাসা করা হইলে সে নিম্নলিখিত উত্তরটি দিয়াছিল :—

“Take earth and heaven, take state and church, Kings and God and spit on it all—that is our symbol”

Page 204, Part. I.

Leroy Beaulieu's *The Empire of the Tsars.*

এই খৃঃ-কার খৃঃই নিহিলিজম। নৈরাত্তবার লইয়াই ইহার সূত্রপাত—সর্ববিষয়ের প্রতি আক্রোশ ও ঘৃণা যেন ইহার মূল মন্ত্র। স্বভাবতঃ কণগণ বিনরী এবং শুক্লজনের প্রতি প্রণত; কিন্তু বাহ্যায় নিহিলিষ্ট তাহার ভয়

ভক্তির দ্বারা দিয়াও যাইত না। নিহিলিজমের উদয় হইতেই কলিয়ার বহুতর ভাব-বৈষম্য দেখা যায়—অনেক আবেগনা এবং আগ্রহ। কলিয়ার জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। মহামতি Leroy-Beaulieu তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এই ভাব-বৈষম্যের এক অপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন আমি তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সঞ্চার করিতে পারিলাম না যথা :—

Morally, and phisically, in man and nature alike, the two extremes meet to the most naïve (artless) veneration, political as well as religious corresponds the most hare-faced cynicism, (ঘৃণা) intellectual and moral. (see Page 205 P.I. Ragozins, translation.

চরমপন্থী নিহিলিষ্টগণ সর্ব বিষয়েই বিদ্বেষ ও কোপনস্বভাব ধারণ করিয়াছিল।

যাহা হউক আমরা এই নিহিলিজম সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না। এই নিহিলিজম একটি প্রােহেলিকা মাত্র—ইহাতে অসন্তোষ ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। সত্য সত্যই Joseph de Maistre ইহার নাম রাখিয়া-ছিলেন Nothingism (rienisme)। বাপান-নিকীও slavophil এই উত্তর দলের দ্বন্দ্বের উপরেই ইহার বৃদ্ধি, এই নিহিলিজমরূপী দ্বন্দ্ব-বাহ উভয় দলেরই ধর্ম—তাহাতে একদল ইউরোপকে কলিয়া হইতে বহিষ্কৃত করিতে প্রয়াসী, অপর দল কলিয়ার বিশেষত্বের লোপ করিয়া ইউরোপকে সর্ববিষয়ে সর্ব সর্ব করিতে সমর্থিক উৎসাহ। তাই Leroy-Beaulieu বলিতেছেন :—Between the two hostile camps (Zapadniki and



slavophilism) nihilism stands up, grown tall in their shade, under cover of their wringles,—nihilism which sports the armour of both and taking its cue (লেখুড়) from the negative portions of both their

doctrines, denies Russia with one breath and the west with the next ইহার উপর আর অধিক কিছু আমাদের বলিবার নাই।

( ক্রমশঃ )

শ্রীঅকিকন দাস।

## বিবাহ-বিধি

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিবাহ-কাল নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটি প্রবল মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একমত পূর্বতন প্রথার সমর্থনকারী, আর একমত বালা বিবাহের বিরোধী।

যদিও এখন পাত্র কস্তার অভিভাবকগণ, তাহাদের বয়স, স্বাস্থ্য, কুলশীল দেখা অপেক্ষা আপনাদের আর্থিক সুবিধা দেখাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, বিশেষতঃ কস্তার পিতা, বর্ধরক্ষক, সমাজ সংস্কারকগণের হুক্তি উপদেশ অপেক্ষা ‘হুতুকাচার’ অধিক দৃঢ়-‘অর্থ’ পণের গণ্ডী পার হইবার উপদেশ-বাতার উপদেশের হুক্তিবাদী স্বীকার করেন, তথাপি সংস্কারকগণ আপনাদের কর্তব্য বিস্মৃত না হইয়া কুল-নির্বুল হুক্তি, তর্ক, শাস্ত্রবচন প্রমাণ প্রভোগে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে ক্রটি করিতেছেন না।

একজন এটর্নী বেই বালা বিবাহের সমর্থন করিয়া লিখিলেন, তখনই অন্য পক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে কথিবাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া অতিজ চিকিৎসকগণের মতামত পর্ষাদ লইয়া তাঁহার সম প্রবর্ণনের চেষ্টা করিলেন। = কিন্তু ফল উভয়তাই যে সমান হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অবশ্য ‘পুস্ত্রার্থে ত্রিগতে ভাষণ’ এই প্রচলিত শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন মন্ত যদি বিবাহের আবশ্যক হয়, কিংবা হুতুকাচারে সংস্কার-ধর্ম প্রতিপালন মন্ত যদি সংস্কারধর্ম আবশ্যক হয়, তবে ত্রী পুত্র উভয়েই পুস্ত্র-জননশক্তি বিকাশের এবং সংস্কার-ধর্ম প্রতিপালনের উপযুক্ত সময় যৌবনই বিবাহের প্রশস্তকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মানব-সমাজে বিবাহ বিধি যে কারণেই প্রচলিত হউক, ইহার ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠতম ফল সন্তানোৎপত্তি; তাই দম্পতির মিলনের পর আত্মীয় বান্ধব সকলই সন্তানের আশা করেন এবং সন্তান বাহাতে রূপান্তরিত ও দীর্ঘ-জীবী হয়, এ কামনাও করিয়া থাকেন। মানবের এই আশা আকাজকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রীয়তত্ত্ববিদ মহর্ষিগণ দম্পতির বিবাহাদির কাল নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় শুভাশুভ আলোচনায় মন্ত আত্মকর্তব্য প্রথম এই ব্যবস্থা নিরর্থক অথবা উপেক্ষণীয় নহে।

হুতুকাচারের আদ্য সন্তানের রক্ষা ও প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দিয়া, তাহার শিক্ষাদি সম্বন্ধে সজ্ঞপণে উদ্দেশ্য হইয়াছে,— “নজিমন্তকৈনং জ্ঞান্য যথার্থং বিজ্ঞাং

গ্রাহয়েৎ। অথানৈ পক্ষবিশ্ৰুতিবর্ষাৎ স্বামিন  
বর্ষাৎ পত্নী মাংসহেৎ....."। শারীর স্বান,  
১০ অঃ।

অর্থঃ (পুঙ্খোক্ত প্রকারে প্রতিপালিত)  
স্বামীরকে নশ্চিনালী জানিয়া তাহার বর্ণগত  
বিভা শিক্ষা দিবে। বিভার শিক্ষার পর  
পক্ষবিশ্ৰুতি বর্ষাপ্রাপ্ত যুবকের ভ্রাতৃ স্বামিন-  
বর্ষাৎ পত্নীর বিধান করিবে। তাহাই  
আত্মকৌশলের নির্দিষ্ট বিবাহকাল।

পুঙ্খের পক্ষবিশ্ৰুতি বর্ষ এবং শারীর স্বামিন  
বর্ষ বিবাহযোগ্য কাল নির্দিষ্ট হইলেও ইহা  
গর্ভাধান বা গম্পান্তির মিলন কাল নহে। সে  
কারণ বিবাহকাল নির্দেশের পরেই পরবর্তী  
লোক উল্লেখ হইয়াছে,—

উনবোড়শ বর্ষায়া সম্ভ্রাপ্তঃ পক্ষবিশ্ৰুতিম্।

যত্মাধতে পুমান গর্ভঃ সূক্ষ্মঃ সবিপদ্রভঃ।

অন্তঃ বা ন চিরং জীবন্ত্যৌবেধ্যা দুর্জলে-  
শ্রিতঃ। শারীর, ১০ অঃ।

অর্থঃ পক্ষবিশ্ৰুতি বর্ষ অগ্রাপ্ত পুঙ্খ যদি  
বোড়শ বৎসর নানা নারীতে গর্ভাধান করে;  
তবে সেই গর্ভ গর্ভাধনেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়,  
যদি বা বিনষ্ট না হইয়া সন্তান প্রসূত হয়, তবে  
সন্তান দীর্ঘজীবী হইবে না অথবা দুর্জল  
উজ্জ্বল লইয়া জীবিত রহিবে। \*

স্বপ্নোক্ত বিবাহ ও গর্ভাধান বিধির  
সময়ের পার্থক্য হইতে আমরা কয়েকটি  
আলোচ্য বিষয় পাইতেছি, অতঃপর সেগুলি  
সংক্ষেপে এবং বর্তমানকালে এই বিধানোক্ত  
বিবাহ প্রচলনে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি সংক্ষেপে  
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

পুঙ্খই বলিযাছি, বাল্য অপেক্ষা যৌবন  
কালই বিবাহের আবশ্যকতা অধিক দেখা

যায়, শারীরতত্ত্ববিদ মহর্ষিগণ বোধ হয় সেই-  
ভ্রাতৃ যৌবনেই বিবাহ কাল নির্দেশ করিয়া-  
ছেন। বলা আবশ্যক আমাদের বাল্য  
যৌবনাদি একমাত্র কাল বা বয়স সাপেক্ষ নহে  
বরং দেহের অবস্থা সাপেক্ষ বলা যাউতে  
পারে। দেহের অপূর্ণ প্রথম অবস্থার নাম  
বাল্য, পূর্ণ বা মধ্য অবস্থার নাম যুব এবং  
পরিণতি বা ক্রয়ের অবস্থার নাম বৃদ্ধ;  
দেহের এই অবস্থা তিনটি সাধারণতঃ মহাত্মের  
যে কালে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই বাল্য।  
যৌবনাদির কাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।  
আমরা এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই  
যে, বয়স হিসাবে যৌবনের কাল পাইয়াছে  
কিন্তু যুবত্ব বা দেহের পূর্ব পর্য্যন্ত, তাহা-  
দিককে তি আমরা যুবক বলিতে সম্মত করি  
না। সেই প্রকার অকালে যাহার দেহের ক্ষয়  
ভাব আদিয়া ইচ্ছিত সকল শিথিল করিয়াছে,  
দেহের জীর্ণভাবে আদিয়াছে, বয়স তাহার  
যাই অল্পহুণ হউক আমরা তাহাকে স্থির  
বলিতে সক্ষম করি না।

বাল্যযুবাণি দেহের অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও  
অধিকাংশের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা কাল বা  
বয়ঃক্রম দ্বারা সচরাচর নির্দেশ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুঙ্খের-  
বোড়শবর্ষ এবং শারীর স্বামিনবর্ষ হইতে যুবক  
প্রকাশক চিহ্নসকল দেখিতে পাওয়া যায়  
সুতরাং এই বোড়শ এবং স্বামিনবর্ষই সাধারণ  
হিসাবে নরনারীর যৌবনের প্রারম্ভকাল  
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নরনারীর  
বোড়শ ও স্বামিনবর্ষ যৌবনের আরম্ভকাল  
হইলেও পক্ষবিশ্ৰুতি এবং বোড়শবর্ষে তাহার  
পূর্ণত্ব দেখা যায়। শারীরতত্ত্ববিদ মহর্ষিগণ

\* প্রযোজ্যে এই সোক্ত অবলম্বন করিয়া প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিদগণের বিবাহকাল নির্দেশের প্রমাণ  
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিবাহকাল নির্দেশের ভ্রাতৃ উক্ত হয় নাই, গর্ভাধানকাল, নির্দিষ্ট  
বলা হইয়াছে।

পুরুষের পূর্ণযৌবনে এবং নারীর প্রারম্ভ-  
যৌবনে বিবাহকাল নির্দেশ করিয়া, উভয়ের  
পূর্ণযৌবনে গর্তাধানকাল নির্দেশ করিয়াছেন,  
যেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এখন প্রথম আলোচ্য বিষয় এই যে,  
পুরুষের দ্বারা নারীর পূর্ণযৌবনে বিবাহকাল  
নির্দেশ না করিয়া প্রাক্ যৌবনে নির্দেশের  
কারণ কি? বেধাভূত পূর্ণাবস্থা বা যৌবনে  
বিবাহনিমি প্রাপ্ত হইলেও নারীর পবিত্রতা-  
রক্ষা রক্ষা যৌবনের প্রথম অবস্থায় বিবাহকাল  
নির্দেশের আবশ্যক যেখিতে পাওয়া যায়।  
স্রীজাতির যে ঐশ্বর্য্যময় রজঃস্রাব প্রবর্তন ও  
লক্ষ্য হইতে তাহাদের যৌবনশুভকালের  
প্রকাশ হয়, তাহা উল্লেখ প্রধান হওয়ায়  
উক্ত প্রধান ভারতীয় ললনার (শ্রীতপ্রধান  
দেবীরা অপেক্ষা অল্পকালেই) সাধারণতঃ  
বাদ্যবধৌ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই রজঃস্রাব  
হইতে যেমন নারীর গর্তাধানি আশ্রয়  
পরিপূর্ণ হওয়ায় বাল্যাবস্থা অতীত হইয়া  
যৌবনের আরম্ভ হয়, সেই প্রকার যৌবন-  
কালীন কামনা সমূহেরও প্রবর্তন হইয়া  
থাকে। কামনা স্বভাবস্বল হইলে স্বপ্ন-  
বিকৃতি হওয়া অনস্বয় নহে এবং তাহা হইতে  
গর্তোৎপত্তিও হইতে পারে। স্বপ্নে উল্লেখ  
হইয়াছে,—

কুতুম্বাত্যুমানারী যুগে বৈশ্বনবাবধৌ ।  
আর্জবঃ বায়ুবাবধৌ কুতোগর্তঃ কয়োতিহি ।  
যাগে যাগে বিবর্তিত গতিভাঃ গর্তলক্ষণং ।  
কলমঃ বাহতে তন্ত্রা বর্জিতা পৈত্রিকৈ গুণৈঃ ॥

এই উপায়ে গর্তদৃষ্টান্ত স্থলত না হইলেও  
রজঃস্রাবনারীর পূর্বোক্ত কারণে এবং আহার  
বিগারের অপচায়ে গর্ত সমলক্ষণযুক্ত রক্তস্রাব  
ব্যাধির অভাব দেখা যায় না।

চরক সংহিতায় উল্লেখ হইয়াছে,—

অশুভ্ নিরুৎসবঃ পবনেন মাধ্য্য্য-গর্তঃ

বাবস্ত্রভাঃ কথ্যতিং ।

গর্তস্ত রূপং হি কয়োতি তন্ত্রা তদাশু-

গম্যাবি বিবর্তমানং । শাঃ দ্বাঃ ২ অঃ

অর্থাৎ (বাদ্য এবং কামনা দ্বিবিধ বিহার  
অপচায়ে যেহেতু অভ্যস্তরূপ বিগত) বায়ু  
দ্বারা নারীর অন্তঃপ্রাণিত রক্ত হইয়া তখন  
সেই বিবর্ত আশ্রয় ক্রমণঃ বর্জিত হইয়া গর্তের  
আকার ধারণ করে। ইহা প্রকৃত গর্ত না  
হইলেও পার্শ্বরূপে অনাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা  
গর্ত বলিয়া বিবেচনা করে। রজঃস্রাব নারীর  
কামনা স্বভাবস্বল হইয়া বলিয়া আমরা  
আহুর্জবদ্বিধা দ্বারা কুতুম্বাত্যুমানারী রূপে  
পতি সম্বন্ধন ব্যবস্থা যেখিতে পাই, কারণ  
কামনার উল্লেখ কালে পুরুষাত্তর বর্ণন  
অপেক্ষা বামী সম্বন্ধনই ইষ্টপ্রদ। তাই  
তাহারা বলিয়াছেন,—

পূর্জঃ পশ্চাদ্ভুতাত্যুমানারী বাদ্যনং নর মললা ।

তাদুগ্ধ জনয়েৎ পুত্রঃ ভর্তারঃ বর্ণয়েততঃ ।

স্বঃ শাঃ ২ অঃ ।

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে আর্জব  
প্রবর্তনের পর আহার বিবাহের ব্যতিক্রম  
হইতে নারীর এই সমুদয় বিগতি উপস্থিত  
হইয়া লোক সমূহের কারণ হইতে পারে;  
বিশেষতঃ দুর্বল জন্ম যৌবন লক্ষণাধিতা  
রূপেই হইয়া ও পবিত্রতা উভয়ই নষ্ট হওয়া  
অসম্ভব নহে। একান্তই আহুর্জব প্রচারণ  
মহাবিগত রজঃ প্রবর্তনের পূর্জই বাদ্যন বর্ণের  
প্রারম্ভে স্রীজাতির বিবাহকাল নির্দেশ  
করিয়াছেন।

২য় আলোচ্য;—নারীর বিবাহের দীর্ঘকাল  
পরে যৌবন বর্ণে গর্তাধান কাল নির্দেশের  
উদ্দেশ্য কি?

রত্নঃ প্রবর্তনের পর দক্ষিত বসঃ হইতে নারীর গর্ভাশয়াদির ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে, এই পুষ্টিসাধনের অবকাশ কতই তৎকালে সম্পত্তির মিলন বাহনীয় নহে সাধারণতঃ ষোল্ল বর্ষের শেষ বা ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারম্ভ হইতে আর্ন্তর্য প্রবর্তিত হইয়া, তাহার এবং গর্ভাশয়াদির সম্পূর্ণ পোষণ দ্বিত পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক হয়। শ্রেষ্ঠতম রত্নঃ ধাতুঃ পরিপোষণ দ্বিত এইকাল পর্যন্ত ক্রমশঃ নারীর দৈহিক পুষ্টিও সম্পাদিত হয়; তাহার পরে বোড়শবর্ষে ধাতু পূর্ণতার সহিত স্নেহ পূর্ণতারও অবদান দেয়া যায়। এসময় সম্পূর্ণ ধাতু অবদান সম্পন্ন। বোড়শী রমণীই গর্ভাশয়নের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাণি নারীর বোড়শবর্ষে গর্ভাধান বিধি সাধারণ বিধান বলিয়া বৃত্তিতে হইবে। সে কারণ যদি কোন নারীর আভাবিক আর্ন্তর্য বাহ্যাবশতঃ বোড়শবর্ষের পূর্বেই আর্ন্তর্য এবং গর্ভাশয়াদির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় অর্থাৎ আহার যেরূপ পূর্ণতা সাধন এবং প্রতিমাণে উপযুক্ত পরিমাণে বিভক্ত আর্ন্তর্যের প্রবর্তন হয় তাহা হইলে সে রমণী বোড়শবর্ষের পূর্বেও গর্ভাধান যোগ্য হইবে। এই কথাটি বুঝাইবার দ্বিত হুস্তে পূর্ণোক্ত গর্ভাধান কাল নির্দেশক স্কোরের শেষে উল্লেখ হইয়াছে,— ‘ভাস্মাত্যন্ত বাল্যায় গর্ভাধানং ন কারয়েৎ’ । যে রমণীর দেহ এবং ধাতু পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে তাহার বোড়শবর্ষ প্রাপ্তি না হইলেও অত্যন্ত বাল্য বলিয়া সম্বোধন করিবার কোন কারণ নাই।

৩য় আলোচ্য বিষয়ঃ—স্রোতিষ্ক হইতে স্বভাবতঃ বলবীর্ধ্যবান পুরুষের নারী অপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ ও গর্ভাধান কাল নির্দেশ

পের কারণ কি? ইহাখন পাঁচ দ্বিত যে প্রকার মাতার পরিপূর্ণ আর্ন্তর্যের প্রয়োজন হয়, সেই প্রকার পিতার শুক্রদাত্তরও পূর্ণতার আবশ্যক হইবে থাকে। আশ্চর্যজনক বাহ্যে নারীর দ্বিতীয়, স্রোতিষ্কান চারিতে যেজন অল্পকালে বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সৌম্যশীতল শুক্রদাত্ত সে প্রকার দ্রুতভাবে বিকাশ বা পূর্ণতা পায় না সাধারণতঃ বোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শুক্রদাত্তর বিকাশ হইয়া পক্ববিশিষ্ট বর্ষে পূর্ণতা সাধিত হয়। সে কারণ আমরা পক্ববিশিষ্ট বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত পুরুষের দেহের পুষ্টি দেখিতে পাই। হুস্ত-কারও বলিয়াছেনঃ—

‘পক্ববিশিষ্টতয়া বর্ষে দুমান্ নারীত্ব বোদ্ধম। সমস্তাগত বীৰ্য্যোক্ত জানীয়াৎ কুললোভিবন্ধুঃ’  
হুস্ত, ৫৫ অঃ

হুস্তায় পুরুষের পক্ববিশিষ্ট বর্ষ বয়ঃক্রমই বিবাহ এবং গর্ভাধানের উপযুক্ত কাল। এই নির্দিষ্ট পক্ববিশিষ্ট বর্ষের দুানে (এক বিশিষ্ট প্রকৃতি বর্ষে) পুরুষ গর্ভাধান যোগ্য না হইলেও বিবাহ যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাও দুইটি কারণে সমর্থন যোগ্য নহে।

১ম—পক্ববিশিষ্টবর্ষ পর্যন্ত পুরুষের যেজন যেরূপ ও ধাতুর পুষ্টি হয়, সেই প্রকার পুষ্টি মেধা বৃত্তি প্রকৃতিরও উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। হুস্তায় এই কাল পর্যন্ত পুরুষের বিন্যাসিকার প্রশস্তকাল বলিতে হইবে। দেহ, ধাতু, বৃত্তি প্রকৃতির নির্মলতা রক্ষার দ্বিত শিক্ষাকালে ত্রুচ্চর্য্য ত্রাতাবলম্বন সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য এবং হিতকর, ইহা বোধ হয় নুতন করিয়া প্রমাণের আবশ্যক হইবে না। একদ্বিত শিক্ষাকালে বিবাহ বিধান না দিয়া হুস্তকর বলিয়াছেনঃ—

‘শক্তিমকর্কৈনং জায়া দধ্যাবর্ষঃ বিদ্যায়াঃ গ্রাহয়েৎ।’

অবাসৈ পকবিশ্বেতি.....ইত্যাদি; এখানে 'অব' শব্দের অর্থ বিতা, শিকার অন্তর্য। সুতরাং শিক্ষাকালে বিবাহ প্রণয় নহে।

২য়—শরীরের পূর্ণ বিকাশ না হইতে যদি কোন একবিংশতি বা ছাব্বিশটি বয় বয়স যুবকের সর্ভ নিষিদ্ধ। যাদববায়ী। কুমারীর উচ্চ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তবে বালিকার পূর্ণবয়স কালমধ্যে যুবকেরও অক্ষত থাকে ও দেহের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইতে পারে নত, কিন্তু স্বাভাবিক ধাতুগীত। অথবা ব্যাধি প্রভৃতি হইতে যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, অথচ স্বভাব অশুদ্ধ উচ্চারণ হেতু নারীর আর্ন্তবের পূর্ণতা সাধিত হয়, তবে সেই পরিপূর্ণ যৌবন। নারীর সহিত দুর্বল ধাতু পুরুষের মিলন কখনও শুভগ্রহ হইবে না। সুতরাং শিক্ষা এবং ধাতু-পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুরুষের বিবাহকাল নির্দেশ হইয়াছে ব্রহ্মতে হইবে।

যদি স্বাভাবিক শুক্রাধিতার আদিকাব্যন্তঃ পকবিশ্বেতি বর্ণের পূর্ণতা কোন পুরুষের দেহ ও ধাতুর পারিপূর্ণতা দৃষ্ট হয় এবং সেকালে যদি শিক্ষাগ্রহণ না করে, তবে সেই পুরুষের নিষিদ্ধ সময়ের পূর্ণতা বিবাহ হইতে পারে। বাহ্যিকের এইরূপ কারণে পকবিশ্বেতি বর্ণের পূর্ণতা বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই সময় পুরুষের অন্তর্গত হস্ততে পকবিশ্বেতিবর্ণ গর্তাধানযোগ্য কাল বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। নতুবা পকবিশ্বেতিবয়স যুবকের যাদববায়ী। কুমারীর পানিগ্রহণে উনত্রিশবর্ষ গর্তাধানযোগ্য কাল হইত, পকবিশ্বেতি বর্ণে গর্তাধান উল্লেখের কোন কারণ থাকিত না। ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে ত্রীপুরুষের যৌবন কালে বিবাহবিধি আত্মকেন্দ্রের অভিজ্ঞা,

কেন্দ্র নারীর বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও পরিচরিত। লিখান বক্ত যৌবনারম্ভের প্রাক্কালে বিবাহ কাল নির্দেশ হইয়াছে; কিন্তু অপর রাস্য কঠব্য তাগাদের দেহ, ধাতুসম্পূর্ণ না হইলে গর্তাধান যোগ্য হইবে না। এমন আলোচনা করা কঠব্য হস্ততোক্ত বিবাহবিধান বর্তমান সময়েপযোগী হইতে পারে কি না?

ধাতুর বিকাশ এবং পোষণ মন্ত্র পূর্ণতা বিধান বর্তমান সময়েপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক লোকচরিত্র আলোচনা করেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন, দেশের অধিকাংশ লোকই অশুদ্ধ পালন তুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সে হিসাবে পূর্ণতা বিধান বিবাহের পর অশুদ্ধ পালনের অভাব স্বাভাবিক বলি-  
য়াই মনে হয়।

একথা শুনিয়া হস্ত বালা-বিবাহের বিরোধী সম্প্রদায় বলিবেন, বাংলা-বিবাহ যোগ্য করিয়া নরনারীর পূর্ণযৌবনে বিবাহবিধি প্রচলিত হইলে অপরিণত দেহ ধাতুর সম্মিলনে বাধা দেওয়া হইতে পারে।

বাহ্যিক সম্পূর্ণদেহধাতু বিশিষ্ট নরনারীর মিলন কামনা করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল বোকার করি, কিন্তু দেশে অশুদ্ধ প্রতিপালন শিক্ষা না দিয়া একমাত্র বিবাহ কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জাতীয় দুর্বলতার প্রতীকার মন্ত্র তাহার হানি নির্দেশ করা হিতকর হইলেও মীলতা রক্ষা মন্ত্র অনেক সময় লক্ষ্য কথা প্রকাশ করিতে পারা যায় না; তবে তাহারা বিজ্ঞাপনের আলোচনা করিবেন, তাহারা দেখিবেন কোন্ রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন আজকাল বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা ধাতুকর অনিত কুৎসিত রোগ প্রতীকারের বিজ্ঞাপন হইতে কি দেশবাসীর চরিত্র অনন্যতম পরিচয়

পাওয়া যায় না? আর এটি ব্যাধি আর বিবাহিত নরনারীরই হয়, 'জাঙ্গা ও নড়ে' এমনই আর 'গাঙ্গা' তাদের উপর লক্ষ রাখিয়া কার্য করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বলিয়াছি। যুবক যুবতার বিবাহ দানের চেষ্টা না করণা বেশে বাহ্যতে যথা রীতি ব্রহ্মচর্য প্রতিপালিত হয়, ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় বিলাসিত, দূর হয়, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত আহার বিহার গৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা ও আলোচনা করিলে বরং অধিক স্বপ্নের আশা করিতে পারা যায়। আর বাহ্যের দীর্ঘজীবী যুগল কখনো করেন, উহাদিগকে ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন এবং সেহ-যাজ্ঞ-পোষক আহার

বিহার গ্রহণের সঙ্গিত জাত সন্তানের জন্ম উপযুক্ত পাতের ও প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করিতে চাইবে। বর্তমান কালে বাক্তি ও পরিচর্যা বিব্রাটের স্থানের দুর্বলতা ও আত্মহীনতার মাত্রতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমুদয় বিষয়ের প্রতীকার না করিয়া কেবল কতকাবস্থায় কল্যাণ-লাভে, অথবা বহিঃশ্রী নারীর বিবাহ দানে, বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না; আর যদি ইহার প্রতীকার করিতে পারা যায়, তবে হৃৎতোক্ত বিবাহবিধি প্রতিপালন দেশের অহুপাযোগ্য বলিষ্ঠ বিবেচিত হইবে না।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

## আসামের পথে

### ভ্রমণের উপকারিতা

যখন ইংরাজি শিক্ষার শিকিত হইবার জন্ম কলিকাতায় গাদি তখন দেশভ্রমণে যেকি এক অনির্জয়ী আনন্দ তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সে আজ অনেক দিনের কথা। তৎপরে পুথকেও পড়িয়াছিলাম যে ইউরোপের শিকিতদিগের দেশ ভ্রমণ শিক্ষার একটা দিক। তারপর যখন বৃত্ত মহাস্থা আলেকজান্ডার টমরি একদিন ভ্রমণের উপকারিতা, আবশ্যকতা ও মহত্ব-জীবনে ইহার কাব্যাকারিতার বিষয় প্রাচল্য বিপর ও গজবিনী তাবাদ বৃদ্ধিহা দিলেন তখন হইতে সকলের মনে না হউক আশার মনে সে বাণনা অনেক দিন হইতে অস্পষ্টভাবে জ্বলিয়া

বেগকে অগ্নে অগ্নে বর্জিত করিতেছিল। তিনি যখন বলিলেন যে Travelling is itself Education—"ভ্রমণ পড়াইনই শিক্ষা" তখন বাস্তবিকই ইহা জ্বল-জ্বলিতে আঘাত করিল। আকাক্ষা ভাগিন বটে উপায় কোথায়? অর্থও নাই সুযোগ নাই বিশেষতঃ আজ কালকার দিনে ভ্রমণে বাহির হওয়াও বিপদ-দুষ্ক তাই তখন হইতেই মনে কেমন একটা অস্থিরতা আনয়ন করিয়াছে বলিয়া আজিও সেই উপায়ের অংশস্থানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই—আমিন! ভগবানের প্রেরণাধীন জীবনে আশাশ্রুণ মুহুরি হইবে কি না! তবে কাব্যবাণমণে যখন আসামে আনিতে হইয়াছে, তখন ইহার বাদ্য কতকাংশে

আবাসন করিয়া সেই বৃত্ত মহাস্বাক্ষে সচক্ষি প্রকৃতি তার এমন বিশেষ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে আমাকে নিরুৎসাহ বৃত্তিলাভ পাবী হইতে হইবে।

### ভারতবর্ষ

#### মানবের প্রতি প্রকৃতির দান

এখন বুঝিতেছি হিন্দুধর্মে তীর্থ-পথ-টনের উদ্দেশ্য, এমন বুঝিতেছি সন্ন্যাস-জীবনের নীতিমতায় কি আনন্দ, এখন বুঝিতেছি কবিদিগের প্রকৃতিজ্ঞানে কি পত্রীর বিজ্ঞান নিহিত। প্রকৃতির সম্মান প্রকৃতির ক্রোড়ে, প্রকৃতির আব্রাহাম্যে, প্রকৃতির নির্ধন বাহু ও বাহাদুরিতে আনন্দ উপভোগ করেন। প্রকৃতিই তারার লালন পালন কর্তা। প্রকৃতিই তারার শিক্ষক—প্রকৃতিই আবার শাসক। এই প্রকৃতিতে আশ্ব-বিশিষ্টনই জীবনের সকল স্রবের শেষ। এই মিলনেই জীবনের বার্থ আশ্রয়। প্রকৃতির সম্মান—কি স্বাধীন, কি সরল, কি অকৃত্রিম—মনের কোন গোপন নাই—তাই লম্বাই হানি মূল। কৃত্রিমতার মিথরিষ ছুরী ইচ্ছাদিগের মনপ্রাণে আঁকিও বিধাক্ত করে নাই, গোলাপ ফুলের পাশড়িতালি এখনও ভীটনষ্ট নয়। সবই সতেজ সকলই জীবন হুতলা করিতেছে। সুনিখিল বিভ্রম উল্লুক বাহু, বেগবতী স্রোতস্বতীর বজ্র সলিল, নিখরিশীর ক্ষীণতল মল, প্রান্তঃ সন্ন্যাস পানীর কাকলি, ব্যাঘ্রের পঙ্খ, হাতীর কুংহিত, অবেগের রেখা, এই সরলতাকে আরও মধুর করিয়া তুলে। প্রকৃতি আপন মনে আপন প্রাণে বীণা তানে নানা পানে যে কি এক মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন তাহা। একমাত্র উপলব্ধির বিবরণ, বলিয়া লিখিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা ভাবার নাই। তাবুকের ডাবের, কন্দীর কঁধের চিত্তার গাভীধোর, কবির কবিরের, মূল কেন যে

আমাদের ভারতবর্ষ প্রকৃতির রমা কানন, লাল্য নিকতন। কোথাও উল্লুক পক্ষত, কোথাও দীর্ঘ নদী, কোথাও শত স্রোত। সুবিস্তৃত প্রান্তর কোথাও বা নিখরিশী নিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পরিবৃত্ত। অধিত্যকা, কোথাও বা উন্নতশীর্ষ বিন্যাস শাস্ত্রী তরু পরিপূর্ণ উপত্যকা, কোথাও বা বহু জনাকীর্ণ কোলাহল পূর্ণনগর, কোথাও বা শত স্রোত তরু-নদী-শুভ ধূলিধূসরিত মলকুমি। মা অম্বার সর্বত্রই বিরাজিত। বড়কতু নানাভাবে নানারূপে মাকে সাজাইয়া মায়ের তপনধুরী বনেই বিশেষী সকলেরই নিকট দ্বন্দ্বধাক্ষক। মার এই রূপে ঘোষিত হইয়া মার নিকট যে থাকিয়া মার সম্মান হইতে বাহ্য করিয়াছে তাৎপকেই মা ক্রোড়ে স্থান বিধাছেন। সকলেরই সমান আদর—আদর পর ভেদ নাই; আশ্রয় দত্ত কৃত্রিম পুত্রের মধ্যে পুত্রপুত্রের বহুর তারতম্য নাই। মার বাহিক, আভ্যন্তরিক সব ধন ঐশ্বর্যই বা সকলকে সমানভাবে ভোগ করিতে বিধাছেন। কেহ মাকে ঘর করে না—কেহ বা মাকে মা ভিন্ন জানে না—কেহ মার হৃৎপে হৃৎবিত কেহ মার অর্থেও লোভে লুভ—কেহ মার স্বাভাবিকতার প্রায়শী—কেহ মাকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া মার ঘণা সর্বত্র আশ্রয় করিতে প্রায়শী—মার তাহাতেও কোন ভাবান্তর নাই—সন্তানের হৃৎপে লম্বাই হুংগিত। মায়ের এই নৈসর্গিক দোন্দর্গাও সম্মানবিগের অতি লাভের আশায় মানিকে হীনবীধ হীনদোষ হীনপ্রভ হইয়াও

বিলাইতা নিতে সূঁচীত নন—মাথের অতুল-  
শোভাও সম্পদশালী বলগাওা ঘণ-ণ, মাথের  
পরশোণা নদ নদীর স্রোত বহুকারি প্রকাণ্ড  
সেতু প্রকৃতি নানাবিধ বহুবায়নিক বহন  
মা নির্ঝাকো সজ্জ করিতেছেন।

মাথের আমার কতলক্ষ্যন—কেহ অশিক্ষিত  
কেহ অশিক্ষিত কেহ অশিক্ষিত কেহ অশিক্ষিত—  
—কেহ বলিষ্ঠ—কেহ চৌমবীর্ষ্য—এই লক্ষ্যন  
জলি একত্র বহনে বহু হইয়া যে মাথের  
স্বপ্ন শোভা বহন করে না, টহাই মাথের  
জুখে—মায় অতি প্রাচীন লনাতন প্রথা—  
একত্র পরিবার। তাই মাথের মণ্ডলী প্রথা,  
তাই মাথের গ্রাম্য পদ্ধতি। এমন  
অশিক্ষিতেরা, অধিকতর ঘন সম্পদ সংগ্রহ-  
কারিরা, মাকে ঘর চির নির্ধারিত গৃহবাসের  
পরিবর্তে নৃতন বাগাবাড়ীতে আনিবাহে।  
মা আমার, ইহাতে সজ্জ নন—মা এখানে  
স্বপ্ন শান্তি স্বস্তি পান না—মা তাই তাহার  
পরিচিত পল্লী এত ভালবাসেন—মা চির-  
কালই অশিক্ষিত লক্ষ্যনদিগের সহায়—চির-  
দিনই তাহাদের জুখে কষ্টের সহিত একত্রে  
বাগ করিতে ভালবাসেন—তাই লহর ও  
পল্লীবাসী উভয়েই মাথের লক্ষ্যন হইলেও  
পল্লীবাসীতে যেন মাথের স্বরূপ, মাথের গুণ-  
বলী, মাথের দৌলদত্ত অধিকতর পরিমাণে  
প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

### পল্লী ও লহরে তারতম্য

এই পল্লীবাসী মাথের জ্ঞান কেমন সরল—  
কেমন সর। প্রহ্ম—ছলা কলা হাবভাব  
কিছুই জানে না। লহরবাসী ভক্তদিগের  
স্বপ্ন ঐশ্বর্যে পল্লীবাসী ঐশ্বর্যিত নদ—বহু  
তাহাদের মেগ, কলো, বলজ প্রভৃতি মারাত্মক  
ব্যতির সদয় নিষেধের স্বর সূঁচীরে আপনা-

দিককে বিপদমুগ্ধ করিয়াও সানরে বাপেন  
ও পরিত্রাণ করেন। লহরের পরিত্রাণ  
তাগানের ঘন কলুষিত নদ তাই জাতঃস্র,  
জাতঃস্রেরই সূঁচী খারপ করিয়া আশ  
প্রকাশ করিয়া থাকে—লহরের চোবা চূত  
লেহ পেহ নানাবিধ রূপায়ক খালাখানোর  
ও দূষিত বাহু ও কৃত্রিম পানীধের পরিবর্তে  
মাথের বিত্তম বাহুতে, বিত্তম পানীধে, বিত্তম  
ও অকৃত্রিম খাবো মাথের ক্ষোভে জাতঃস্রের  
পর্ণ-সূঁচীরে থাকিয়াও কেমন লবণ জ্ব হইতে  
থাকেন—তখনই—কেবল তখনই তাহার  
বৃষ্টিতে সক্ষম হন যে তাগানের জাতঃস্র আছে  
—তমি আছে নিষেধের পল্লীবাস কি মনোরম  
—কি হুগের—কি শান্তির। অল্পদিন পরেই  
সে লব স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হই—এই  
অকৃতজ্ঞতার মা আমার বড়ই দুঃখিত।

এতদিন মাথের লহরবাসী লক্ষ্যনদিগের  
সহিত থাকিয়া যেন বড়ই অপান্তি ভোগ  
করিতেছিলাম—মাথের পল্লীবাসী লক্ষ্যনের  
উনার জগদ আমাকে তাই যেন অতি সাবধে  
আপনার ঘন বলিয়া নিত্য আপনার করিয়া  
তুলিয়াছে। এখানেই দেখি প্রাণের প্রকৃত  
বিনিময়—এখানেই দেখি জগদের প্রকৃত  
আপত্তি—এখানেই দেখি প্রকৃত মনের বিল।  
আমি আমি আমার অশান্তি তাহাঙ্গের নিঃস্র  
হইতে যে কি অনৈম্য ভোগ করিতেছি  
তাহা অনির্ভর্য্যনীয়। আমার মাথের রূপে  
আমি একে ঘোহিত তাহাতে এই আদর  
ঘর একপ্রাপ্ত। ইহার তুলনার লহরের  
ভালবাসার সহায়কৃতি অতি সামান্য।

মাথের এই লক্ষ্যনদিগের সহিত বাহাদিগের  
পরিচয় লইব, মাথের এই অতুলনীর ঐশ্বর্য-  
রূপ দৌলদত্ত বাহাঙ্গ দেখিবার স্বযোগ পান  
নাই তাহাদিগকে ইহার সহিত পরিচয়



করাটাই; নিতে পারিলে আমি আপনাকে বজ  
জান করিব। যাদের সকল সম্মানেব সচিব  
পরিচিত না হইলে ভাই ভাই মিলিত হইবার  
আগা কেবোথার—ছিঃ ছিঃ ইত্যদ্যঃ বিক্ষিপ্ত  
স্বল্পবরের স্বজ্ঞান। অচেনা সম্মানসিগের  
ইমিলনই একান্ত অন্তিমাবৃত্ত—এখন ভাট  
ভাট ঠাই ঠাই, তেব নাই তেব নাই  
যত্নের উপাশনা।

আমি কয়েক বৎসর হইল আশামী  
ব্রাতারা আমাদের সতিত একত্রিত  
হইয়াছিলেন—ভ্রমর তাঁহাদের কতক  
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। বর্তমানে  
পুনরায় তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের পৃথক  
শাসনাধিনে বিভক্ত হইয়াছেন—তাঁহারা যে  
ভাবেই থাকুন তাঁহারা ভারত যাত্রার  
সন্ধান—আমাদেরই ভ্রাতা—তাঁহাদের পারি-  
বারিক জীবন, তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের  
বেলা, তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাঁহাদের  
জাতি সম্বন্ধে, চলা ফেরা আমরা যদি  
জাতীয় ভাবে জানিতে না পারি  
তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের ভ্রাতা  
বা তাঁহারা আমাদের ভ্রাতা বলিয়া  
পরিচয় দেওয়া অসম্ভব—যদিও আমরা পক্ষে  
সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র  
প্রকাশ করি কঠিন তথাপি ভবিষ্যতে  
কাঙ্ক্ষারও কোনরূপ সাহায্য হইলেও হইতে  
পারিলে তাই আমাদের যথা পক্ষি আমাদের  
বাৎসল্য ব্রাতাধিষেয় নিকট তাহাদিগকে  
পরিত্রিক করিতে চেষ্টা করিব।

## আমাদের ইতিবৃত্ত

আসায় কথ্যটি অহম বা খলম লক্ষ্য হইতে  
উৎপন্ন কারণ এখনও এখানে "ন"কে ইহার।  
"হ" বলিয়া উচ্চারণ করে। অহম একপ্রকার

অন্যথা ক্রান্তির নাম। ইহাও পাতটই  
 পক্ষতের পুটে পড়াছই সুবি মুংরাথ  
 নামক স্থান হইতে আসিবা উপর আসায়ে  
 একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। অহম বা  
 অশম ক্রান্তির বালস্থান বলিয়া ইহা প্রথমতঃ  
 অশম নামে পরিচিত হয়। তৎপরে সেই  
 অশম শব্দ হইতে আসাম নামের উৎপত্তি  
 হইয়াছে।

আলায়েব কামরুপ রাজ্য বহু প্রাচীন এবং অতি প্রসিদ্ধ। কামরুপের অতি প্রাচীন এবং পৌরাণিক রাজা নরকাপুর অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি প্রাগজ্যোতিষপুরে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাগজ্যোতিষপুর বর্তমান গোহাটীর নাক্ষত্র। এই সময়ে কামরুপরাজ্য পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্বে দিকরবাসিনী বা বিক্রাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

করতোয়া সমারত) ঘাতদিক্বর বাদিনাং  
কায়কশেতি তং লোকো গাধস্তি যিগ্নিনশ্বিনী।  
করতোয়া নদী রামপুর, বগুড়া ও পাবনা  
জিলা দিগা আর দিফাই নদী বর্তমানে নদিয়ার  
নিকট দিগা প্রবাহিত হইয়াছে; হতরায়  
কায়করণ রাজ্য বর্তমানে সমগ্র আশাম  
উপত্যকা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ছিল।

বৃত্তিৰ বয়স সত্যাবীৰ্তে চীনদেশীয় প্ৰসিদ্ধ  
পৰিত্ৰাৰক্ষক হিউয়েংলং গ্ৰাণ্ণ্ৰোত্যতিবপুৰে  
আগমন কৰে। তখন হুয়াৰ ভাৱৰ বৰ্খা  
কামৰূপেৰে ৰাখা ছিলেন। প্ৰসিদ্ধ বৌদ্ধ  
জুপতি ঈলামিতা মলম্বে বৌদ্ধধৰ্মেৰে বে  
মহাসভায় আহ্বান কৰেন তাৰাতে ভাৱৰ  
বৰ্খা উপস্থিত ছিলেন। এই বংশীয়েৰে হুয়াৰ  
উপাধি চাৰণ পূৰ্বক হাৱাৰ বৃত্তাব পৰ্য্যন্ত  
কামৰূপে ৰাজত্ব কৰেন, পৰে পশ্চিম দেশ  
হইতে আগন্তু পিণ্ডোতি নামক একজন

সমাপী কামতপের রাজ্য হন। পরে পণে বংশীধোরা রাজ্য করেন। গোখাল ও ধর্মপাল রাজ্য করিয়াছিলেন—ধর্মপালের কয়েকটি কাস্তিগ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তেজপুরের ধর্মপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা ইহার প্রমাণ দৃঢ় করিতেছে।

ইহার পর পেন বংশ কামতপের রাজ্য হন। রাজা নীলধর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া স্বীয় রাজ্যের পশ্চিমাংশে কামতাপুর রাজধানী স্থাপন করেন। এই অল্প ইহার কামতেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার সময় ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা আবুলফাজল খিলজি কামতপ আক্রমণ করেন। ইহাই মূলময়ান-বিপ্লবের প্রথম আশ্রয় আক্রমণ। ইহাতে মূলময়ানেরা পরাজিত হন।

১২৮০ খৃষ্টাব্দে মলেন্দাহ কামতাপুর আক্রমণ করিয়া—কামতাপুরে নিজ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সময় হইতে পেন বংশের রাজত্বের অবসান হয়। পরে আগাধের বার জুঁঞার রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইহার পর কোচবংশীও রাজ্যদ্বিগের রাজত্বের আরম্ভ। বর্তমান কোচবিহার রাজ্য এই কোচবংশীধের। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশ অব্যাপি কোচবিহারের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত।

এই কোচ বংশীধের অন্ততম রাজা বণিত নারায়ণের সহিত দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বণিত নারায়ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পথেই তাঁহার মৃত্যু হয় ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বণিত নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই কোচবংশীধবিপ্লবের স্বাধীন রাজত্বের অবদান হয়।

মূলময়ানেরা রাজ্যমাটির নবাবের উপর

রাজ্যের ভার দিয়া এবং কচুবাড়ের পুর পরীক্ষিত নারায়ণ—তৎপুত্র বণিত নারায়ণকে শাসনকর্তা হইতে আঁতরাইয়া (বর্তমান মনমা) নদীর মধ্যভাগের ভূমির জমিদারী-স্বত্ব প্রদানপূর্বক বংশে প্রস্থান করেন। বিজিতনারায়ণ বিজনী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তি ইহার বংশকে লিচ্ছন্য-ট্যেচন্দ বংশে। বর্তমান বিজনীগ্রাম ইহারই বংশধর। এই বিজনী রাজপুত্র কোচবিহারের সঙ্গে।

### বিজনির রাজধানী অভয়াপুরী

অভয়াপুরী বর্তমানে এই বিজনী রাজ্যের রাজধানী। বর্তমানের রাজ্য কচুবাড়ায়ণ পারিবারিক কোন কারণে আত্মহত্যা করায় তদীয় অন্ততমমহিষী অচেতেশ্বরীর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ইহা আসাম বেঙ্গল রেগুমেণ্টের বর্নাই নীও টেমেন হইতে দক্ষিণ পূর্বে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। বিজনের পর জুয়ুয়া রাজধানী স্থাপিত হয়। জুয়ুয়া ১৩০৪ সালের সূর্যমন্ডল বিধ্বস্ত হইলে এইখানে বিস্তৃত প্রাক্তর থাকার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহার চারিদিকেই পর্বত। প্রকৃতি যেন অভেদ ভূর্গে ইহাকে রক্ষা করিতেছে। এখান হইতে জুটানের পারাড় অতি নিকট। রাজধানীর চতুর্দিক দিয়া সুবঙ্গা নামক নদ একটি প্রোতখণ্ডী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা যেন ইহার পরিখা। এইস্থান রক্ষপুত্র নদ হইতে ১০ মাইল দূরে। গোয়ালপাড়া মহকুমা ইহার অতি নিকট। গোয়ালপাড়া জিলার পূর্বভূমি ইহার আশ্রিত।

বর্তমানের রাণীমাতা অপুত্রক। ইহার দশা দক্ষিণে প্রজাবর্গ নানাবিধ হুখ হুবিধা

ভোগ করিতেছে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি লনতই রাজবায়ে চালিত হইতেছে। আসামের মধ্যেই এগানকার ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয় একমাত্র অবৈতনিক হইয়া বিজ্ঞানীয় পূর্ণ দৌরবের শিক্ষা দিতেছে। স্বাধীনতা বোধেই ভক্তিযতী—প্রতাপ গৃহ প্রতিষ্ঠিত কেবল পুরা হইয়া থাকে। শারদীয়া ও বাদন্তী পূজায় ভিন্ন দেশীয় প্রধান পণ্ডিত ও উপাধিধারী অধ্যাপকদিগের বিদ্যায় একটা বেশিবার জিনিস—মলে মলে লোক আসিতেছে—খাবার তত্ত্বাবধান লইবার সবস্তুই বন্দোবস্ত আছে। প্রায় ১৪১২ হাজার টাকা কেবল খিনায়েই ব্যয় হয়।

প্রতাপ শিবাভোগ নামক একপ্রকার সজ্জার নিয়ালদিকে ভোগ দেওয়া হয়—ইগাতে এ বেশে নিয়ালদিগের প্রতি আসামের এক অদ্ভুত ভক্তির সূচনা করিতেছে। আসামবাসীদিগের বিশ্বাস যে নিয়াল মহাদেবের অংশস্বত্ব—বিজ্ঞানের পূর্ণপুরুষগণ বিশেষ নিব ভক্ত ছিলেন—যেহ হয় তাহারই শেষ এইখানে আদিবা ঠেকি-যাচ্ছে। নিয়ালগণ অমীত বলদশায় ইহাই ইচ্ছাঙ্গের বিশ্বাস। ইগাতা না পারে এমন কায় নাই বলিয়া ইগাতা প্রকাশ করে।

বর্তমানের রাষ্ট্র প্রাককার্য্য এবং পরিবর্তন করেন। তিনি যেমন দয়াবতী সেইরূপ ধর্মপরায়াণ, বাগবিদ্যা হওয়ার অমিত তেজের অধিকারিণী—নিজের তেজ পাকীয়া নিজের প্রজাবর্গের প্রতি যদিও প্রদর্শিত হয় না তথাপি সর্বস্বের নিকট নিজের দান মধ্য-দায় বানিজ্যক কোন কাজ করিতে রাজী নন। কমিশনার কুলার সাহেবের সহিত লাক্ষ্য ব্যাপার ইহার প্রমাণ দিতেছে।

এখানে সত্যাহে দুইটা দাবার বসে। এই

দাবারে নানাবিধ লোকের আগমন হয়—এই দাবারে বিদ্যালয় আদালত প্রভৃতি স্থানের লোকচরিত্র জাত হইবার অনেক উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

এখানে টাকা পরদার অধিক চলন নাই। পূর্বে প্রচলন ক্রমে জিনিসের পরিবর্তে জিনিসের বিনিময় হইয়া থাকে অত্যাধি এখানে আদ্য পরদার চলন নাই।

### লৌকিক চরিত্র

লোকগুলি এক কথার বড় পক্ষপাতী—জিনিসের দুইবার দাম নাই—একবার দাম বলিবে তাহার কখনই স্বপ্ন নাই—ইহাতে বলা যায় যে লোকগুলি সত্যবাদী—সং-স্থানে পার্শ্ববর্তী লোকদিগের চরিত্রই এই। ইহারা খুব বলিষ্ঠ—অবচরীত। নৈতিক সাহসের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বিলাসিতা ক্রমে ক্রমে চুকিতেছে—বাজার করিয়া বাড়ীতে দাইবার সময় হয় কোন একটা কাচের পুতুল বা একটা লাবান কাহারও না কাহারও চাই। বিলাসিতার মাধুরীতে বিভ্রাণের ছাত্র বৃন্দ খুব দৌধন হইয়া উঠিতেছে। বিলাতী শিক্ষার সহিত বিলাতী হাব ভাব সব দেখা দিতেছে। হায়। ইগাতা এখনও বৃদ্ধিতেছে না যে ইহার কিসের পরিবর্তে কি করিতেছে।

অবস্থাপের লোক অধিক না হইলেও কাহারও একেবারে অবস্থা ব্যাপার নয়। মোটা ভাত মোটা কাপড় সকলেরই হুটে।

এখানকার লোক বড়ই আপত্তিপরায়াণ। জমি অনেক পণ্ডিত—আবাদ না হওয়ায় রাজ্যের আয় অনেক কম। কেবল বন-করের আর সর্দাপেক্ষা বেশী।

নিজের আবিস্কৃতির অতিরিক্ত যেন

কমল করিবে না এই ইচ্ছাধিনের দায়ণ। গত প্রাণ হওয়ায় ক্রমে পার্শ্বতীর স্বামিনতা অলম্ব্য আলমাপরতন্ত্রতার কারণ বলিয়া কেহ হারাইতেছে।  
কেহ অতমান করেন।

হানসী বাঙ্গালীবর্গ হওয়ায় তিনি পত্রের মূলা ক্রমণই বাড়িতেছে। বাঙ্গালীর জাতিজাতাই ইহার কারণ। বাঙ্গালীর প্রতি ইহার দৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী যেন সংক্রামক ব্যাধির স্তর সরলতা নষ্ট করিতেছে—তাহাদের বেশাদেশি লোক কিছু কুটিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকের ঘরবাড়ী অতি সুস্থ। লোকগুলির আকার অবস্থার যেমন নিজেদের ঘরবাড়ীও সেই রূপ। ঘরবাড়ী দেখিয়া কেহ অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইবে না। টিনের চলনই বেশী। কুমিল্পের ভয়ে পাকাঘর হয় না। স্বস্তর ও হস্তী পুরুষ অতি বিরল।

### গ্রামাশোভা

গ্রামগুলির শোভা অনির্বচনীয়। বাঙ্গালীর সব বৃক্ষলতা এখানে বর্ধমান। সেই রসাল আম, সেই কটকিত কাঁটাল, সেই সব—আম গাছ বড় বেশী ঘাঘ না। এখানে কমলা লেবুর গাছ পর্যাপ্ত।

### পণ্যদ্রব্য

পান ও সুপারি এখানে মহার্ঘ,—অথচ ইহার পান সুপারির অধিক উক্ত। এখানে “ভোপ চাউল” নামক এক প্রকার স্বস্তর সুগন্ধি চাউল দ্রব্য। পুরু দুধ ‘দই’ অপেক্ষা মহিষের দুধ হই অধিক প্রচলিত।

ক্রীড়ার মধ্যে ফুটবলই অধিক প্রচলিত—বাড়ীতে ভাস পাণার পরিবর্তে ৫ গুণী লইয়া বালকদিগের একপ্রকার খেলা সমাধিক উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে এখানকার লোকের চাকরির প্রতি তত আগ্রহ ছিল না। এখন অনেক চাকরি

### পোষাক পরিচ্ছদ

পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তত আগ্রহ নাই। পুরুষদের বাঙ্গালীদের স্ত্রী পোষাক—মেয়েদের পোষাক বা পরিচ্ছদ বিভিন্ন, ইহার। কাঁকালে কাপড় না পরিয়া বুকের উপরে কাপড় পরিধান করে। মাথার উপর ইহারের বোঁপা। বকের অর্ধাংশ ইহারের উম্মুক। ইহার মহিলাদের স্যামিক পরিলে বেরণ হয় কতকটা সেইরূপ। লক্ষ্যহীনতার কতকটা আভাস হুচনা করে। পরিধানের কাপড়কে ইহার “শান্তলী” ও মণ্ডকের উপরে (যদি কাহারও থাকে) কাপড়কে ইহার “পান্তলী” বলে—বোঁপ হয় “পা” ও “গা” হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কারণ গা ও পা তাকা হয় বলিয়া বোঁপ হয় ঐরূপ বলে।

নিজেদের দেশের এটি সূতার পরিবর্তে অশ্বাণ সূতার প্রস্তুত আলোয়ান প্রকৃতির সম্মান বেশী। সূতার অধিক চলন নাই। নিজেদের সস্ত্র কাপড় ও এটি প্রায়ই প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

এখানকার লোক কিছু অধিক ধর্মতীত। প্রত্যেক পল্লীতে হরি সংকীর্তনের সস্ত্র খুব বড় “আটচালা ঘরের স্ত্রী” এক এক বানি ঘর আছেই। ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর বা ত্রুত পার্কিন উপলক্ষে সকলে মনের আনন্দে খুব হরি সংকীর্তন করে। শব্দরবেণের উৎসব নামক একটা উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে নারিকেল অগ্রাহ্য না হইলেও দুগ্ধাপ্য হইয়া বর্তমানের “লেমনড ও সোডা” অমৃত জুলা বোধে বাওয়া হয়। দিগারেট ও চুট অতি দূর পূর্ব পল্লীতেও

চলন হুটোয়াছে বটে কিন্তু লোকগুলি তত মন্যপায়ী নয়।

### অধিনিগের আশ্রম

ব্রহ্মপুত্রের বাকী উপলক্ষে বোম্বী গোপা নামক পাহাড়ে অনেক লোকসমাগম হয়—তথায় পূর্বকালে কবিরা কেমন ভাবে প্রকৃতির দূত্রে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া সংসার তুলিয়া একমাত্র সনাতন পরম ব্রহ্মে বিলীন থাকিতেন তাহার কথকিং আভাস পাওয়া যায়। সম্মুখে বহুমূর বিদ্যুত ব্রহ্মপুত্রনদ, পার্শ্বে পর্বত, দূরে অতি দূরে আর কিছুই নয়—কেবল আকাশ—দুঃ। কালের মোতের স্রাব ব্রহ্মপুত্রের পর-জ্যোত মানবকে কালের অনিত্যতা ও দুঃ-বর্তী আকাশ—অসীমের সূচনা করে—দুঃটি অতি মনোহর—মন মাতান হৃদয় ডোলান—আপনা হারাণ এক্ষণ দূত আর দেখিরাছি বলিয়া মনে হয় না। এখানে থাকিলে মানব সংসারের সব জালা ত্যাগ বাহন। তুলিয়া যায়—যেন অনন্তের সঠিত নিত্যের আশ্রায় অনন্তব্যাপী অনন্তকে নিশাটেতে বাসনা হয়। বস্ত্র ভবি, বস্ত্র বোম্বীগণ, তোমাদের আরাধনার স্থান কি পবিত্র—কি মনোহর—কি হৃদয়—আপে পাশে ব্রহ্মপুত্র কলকল করিয়া বহিয়া তোমাদিগকে মানবজীবনের হৃদিনের কোলা-হলের অনিত্যতা সূচনা করে যায়। উত্তর পর্বতের গায়খোদিত ক্ষুদ্র গুহাগুলি তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা অধিক করিয়া দিতেছে।

পথে গ্রাম, পর্বতের গায়ে গ্রাম, আরা কি শোভা যেন ছবিখানি—নীচে নদী উপরে পর্বত—আপে পাশে চতুর্দিকে সুবিস্তৃত প্রান্তর—চড়াইয়ের উপরস্থিত ক্ষুদ্র পল্লীর শোভা বর্ণনীয় নহে; উপলব্ধির বিষয়।

পর্বতের উপর যেখের দূত কি মনোরম—

তাহার উপর পূর্বাংশের সূর্য্যোদয়—মন যেন একেবারে বিমোহিত করে। বর্ষার দিনে পাহাড় সব সাদা—যেন কুছটিকাধ আবৃত, বৃক্ষগুলি যেন তত্ত্ব বেশ পরিবৃত্ত, তাহার উপরে সূর্য্যের কিরণ, আরা কি দূত! বর্ষাতে রৌদ্রের প্রায়শ্চৈ পাহাড়ে ঘোঁষায় ঘোঁষায়—যেন কেহ আশ্রয় দিরাছে—বাস্তবিক প্রকৃতির দূত অতি মনোরম।

দূরে পর্বত—পাহাড়ের সূর্যের উপর বৃক্ষাবলী—তাহার উপর যেখের কেনা, তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ—নিরে নদী যেন এক-গাছি রূপার হার—কি শোভা!

পাহাড়ের উপর হইতে প্রান্তরের শোভা অতীব মনোমুগ্ধকর—.....। সাধাছে সূর্য্যোদয়ের কিকিং পূর্বে পর্বতের উপর হইতে পশ্চিমাংশের শোভা কি অনির্জনচরী—দিনমণি অল্পে অল্পে কেমন হৃদয়ভাবে অধ্যানিতভাবে—অন্ধকারে বিলীন হন। কেমন পায়ীর কলরব—কেমন বস্ত্রপত্তর কোলাহল—অন্ধকারের কেমন খেলা—যেন অল্পে অল্পে নির হইতে আক্রমণ করি-তেছে—শেষে পথপ্রান্ত পথহারা পথিক! এখানেই বাস্তবিক বৃত্তিলাম—

“যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ  
সে জানে কুখর শোভা বিচিত্র কেমন!”

### শিবলিঙ্গ

বিজনীর রাত্বেদানী—অভয়াপুরীর নিকট বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ; পূর্বে অন্দের দ্বারা চিহ্নিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চিম্বর কীষ্টি এইরূপে নানাভাবে নানা প্রকারে সংস্কারের অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে। তাহার নিকটে প্রকাণ্ড নীধি—কোন্‌কালের কেহ বলিতে পারে না—প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের এটিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বাহনীয়। বিজনী বহু

প্রাচীন রাণা—হিম্মু গ্রামান্ত তিরদিন বর্তমান  
এখনও হিম্মুর ফ্রিডা কলাপের চিহ্ন—পলেন্দ্র  
পাহাড়ে, অহাটেন্দ্র পাহাড়ে  
রাণামাটী প্রকৃতি হুচনা করিতেছে বেশের  
এইখানেই গ্রাম—এইখানেই ইতিহাস।

### গ্রাম ও গ্রাম্য-শোভা

ধরমপুর, মানন্যকরী প্রকৃতি গ্রামগুলির  
নামের সহিত নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য  
নিহিত আছে বলিয়া বিশ্বাস। এখানকার  
লোকে এ সব কিছুই জানে না। ইহারা  
এখনও পূর্বকালের লোক—এখানে এখন  
অস্তিত্বমানের বিশেষ্য কিছু  
জীবনের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই—  
বিশেষ্য শিকার অর্থাৎ বোম্ব হু ইহার প্রধান  
কার্য। এখানকার লোকে সানানিধি অন্যত-  
র জীবন যাপন করিতে ভালবাসেন।

বিবাহ ব্যাপারে পণ প্রথা নাই। বর  
কজার অবস্থার উপর সব নির্ভর করে।  
তোমার ইত্যাদি খুব উত্তমরূপে করিতে হইলে  
৫০, ১০০ টাকার বেশ ভালরূপ হয়।

ঘানের বড় বেশী প্রচলন নাই। অথ ও  
হাতীই বাতায়াতের একমাত্র ভরসা।

এখানে নানাবিধ পুণ্য দেখা যায়। এখানকার  
“নাটপদ্রঙ্গ নাঅক পুণ্য” অতিথ্য  
হুগু, নগী বা পুষ্করিণী নাই—হুগের অলই  
ব্যবহার্য—অল কথকিং কটু। পরমের সময়  
ভরানক পরম—শ্রীতের সময় ভরানক শ্রীত।  
পার্বত্যের প্রদেশের শ্রীতিই এই।

পতীর অঙ্ককার রাস্তা পক্ষান্তের  
উপলব্ধি আর বড়ই হৃদয়—যেন আকাশে  
আগুন লাগিয়াছে—সব লাল—লালের রেখা  
যেন সব দিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। অঙ্ককারে  
আলোর শোভা বিশেষতঃ উকে অতি উকে  
পাহাড়ের উপর বড়ই আনন্দপ্রদ।

### কামাখ্যা দর্শন

হিম্মু এক প্রধান ভাঁব—আলিামের এক-  
মাত্র ভাঁব। কামাখ্যা দর্শনের অনেক দিন  
হুচেই আকাশ; জাগিতেছিল হুযোগের  
অভাবে ঘটিয়া উঠে নাই। কথার বলে ইচ্ছা  
থাকিলে সব হয়, বাস্তবিক কথা। ঈশ্বরে  
বিশ্বাস ও জরয়ে অন্য উৎসাহ থাকিলে  
ঈশ্বর নিজেই তাহার সহায় হন—এখানেও  
তাঁহাই হইল—কোথা হইতে কোন্ হুযোগে  
নিজ গোহাটীবালা একটী সমস্ত ব্রাহ্মণ-  
বংশের সমস্ত এখানে পড়িতে আগিল।  
বালকটী একে পঞ্চ-প্রাণ, তাতে সম্বলন,  
হুযনীত ও হুযল। তাহাকে মনের কথা  
বলায় সে তাহার কতি করিয়াও কল্পনাতীরে  
বাস্তব হইল—উভয়ে উভয়ের সহায় হইলাম।  
যাহা এতদিন অনির্দিষ্ট ছিল তাহা এখন  
নির্দিষ্টের মধ্যে দ্বারা দিল—পদব্রজে প্রকৃতির  
শোভা দর্শন করিতে করিতে রেল ষ্টেশনের  
দিকে ছুটিলাম—যেন কত আশা, কত  
আকাঙ্ক্ষা; নিরাপত্ত সময়ের বহু পুণ্য  
ষ্টেশনে পৌছিলাম। উভয়ে স্থানীয় জমিদার  
কাছারীতে বিশ্রামস্থে কতকাংশ সময়  
অতিবাহিত করিয়া ষ্টেশনে পৌছিলাম।  
নৃতন বেশ, নৃতন আকাঙ্ক্ষা; যাহে  
পাশে যে দিকে দৃষ্টিপাত কর না কেন  
হয় অত্যাচ্ছন্ন পাহাড় নয় প্রশস্ত দিগন্ত-  
বিস্তৃত প্রান্তর দৃষ্টিপথে পতিত হইবে—  
অনন্তের অনন্ত মহিমা একালের একি  
হুযোগ! বাহার চক্ষু আছে তাহার বিস্তৃত  
ফ্রিডা কলাপের মহিমা ও গাঢ়াধা দর্শন  
করিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিতে  
কি হুযোগ! বহুদূর বিস্তৃত বেতপুশ-  
যুক্ত কাশবনের কি শোভা। প্রকৃতি  
যেন হাদিতে হাস্যময়ী, এই কাশবনের

সীমানার উত্তর মণ্ডিবর্ণ পক্ষতঃ শ্রেণী ;  
শ্রেণীর পর শ্রেণী ; কেহ মাথা উঁচু করিয়া  
কেহ নীচু করিয়া গাঁড়াইয়া আছে ; এক  
শ্রেণীতে গাঁথিয়া চলিতে কি এক স্তম্ভের  
শোভা হইয়াছে ।

রেলপাড়ী কোথাও পক্ষতের পাদদেশ  
দিয়া, কোথাও উৎকৃষ্ট ভেদ করিয়া চলি-  
য়াছে । যেখানে দুই ধারে পক্ষত  
মাক্ষণানে রেলপথ সেখানকার শোভা কি  
অনির্বচনীয় ! দুই ধারে দৃষ্টিবদ্ধ, মাঝখানে  
অন্ধকার ! এইরূপে আমরা আশ্রিত গাঁওয়ে  
আসিয়া উপস্থিত হইলাম । সন্ধ্যাকাল ;  
রজনীর প্রভাতীকায় প্রকৃতস্বপ্নবতী পশ্চিম  
গগনে নানারক্কে নানাবর্ণে পত্রের মণ্ডিত  
করিয়া কি এক শোভাই না ধরিয়াছেন !—  
আবার এখানে প্রচণ্ড বেগবান ব্রহ্মপুত্র  
নদ দুইধারে দুই পাড়া ভেদ করিয়া  
স্বকীয় বেগে চলিয়াছে ; দুই পক্ষতের মাক্ষ-  
ণানে নবের শ্যামল রঙের শোভা ; তাহাতে  
পশ্চিম গগনের অন্তোদুগ্ধ সূর্য্যকিরণের রাজ্য  
শোণার কিরণ পঙ্কিত হইয়া কি এক অনি-  
র্বচনীয় শোভাই না সৃষ্টি করিয়াছে পর  
পারে আমাদের চিত্র ঈশিত কামাখ্যাদেবীর  
পাড়া ; এখান হইতেই পাড়া দৃষ্টিগোচর  
হইয়া মনে এক অকৃত্রিম আনন্দ বান করে ।  
কালপাহাড়ের কথা, হিমসুর হিমসুখের প্রতি  
আশঙ্ক, সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনাথ  
অত্যাচার প্রকৃতি কত কথাই না স্মৃতিপথে  
উদিত হয় ।

এইরূপে নানাভাবে চমক বশন আন্দোলিত  
তখন টীমারে আমাদিগকে ব্রহ্মপুত্র নদ পার  
হইয়া অপর পারে আসিতে হইল ; এস্থানের  
নাম পাচুয়া ; এই পাচুয়ার পরই কামাখ্যা  
ষ্টেশন ; কামাখ্যা দেবীর নামাঙ্কণের

পাহাড়ের নীচেই এই ষ্টেশন করা হইয়াছে ।  
পাচুয়া হইতে অতি অল্প সময়ে আমরা  
কামাখ্যার উপস্থিত হইলাম ; কামাখ্যার থাকা  
অনুবিধা বিবেচনা করিয়া সৌধাটীতে থাকিব  
স্থির করিয়া আমার সেই প্রিয় ছাত্রের  
বাড়ীতে রওনা হইলাম । সৌধাটী আসামের  
একটি প্রধান নগর—শিলং আসামের রাজ-  
ধানী হইলেও সৌধাটী প্রকৃতপ্রভাবে ইহার  
রাজধানী ; এখানে আকস্মিক আগলত, স্কুল  
কলেজ হালপাতাল প্রভৃতি সবই । কেবল  
সাধারণ ও রাজপুরুষদিগের থাকিবার অল্প  
শিলং নগর ।

এখানে সন্ধ্যার কিছু পরে আসিয়া উপনীত  
হইলাম ; ষ্টেশন হইতে ছাত্রের বাড়ীতে  
চলিলাম সেখানে যত্নের বা আত্মত্যাগের কোন  
ক্রটি হইল না । এখানে আসিয়া আমার  
এই শিক্ষা হইল যে মানব অবস্থার দাঁস  
হইলেও বড় ঘরের ছেলের নগর কখনও  
ছোট হইতে পারে না ; অবস্থার সহিত  
সৌজন্যের কোন সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া  
আমার বিশ্বাস নাই, এখানে আসিয়া তাহা  
স্বাভাবিক বস্তু হইল । শ্রীমানের বহিঃ  
অনেকদিন হইল পিতৃবিয়োগ হইয়াছে এবং  
সেই পিতৃবিয়োগের সহিত অবস্থাবিশেষ  
ঘটিয়াছে তথাপি শ্রীমানের মাতার তত্ত্বাবধি  
ও ব্রততিপথে আমি আত্মব্যাখ্যিত হইলাম ।  
শেবে জানিতে পারিলাম যে শ্রীমানের পিতা  
বহিঃ একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িক ব্যক্তি  
তথাপি তিনি কিছুই লক্ষ্য করিতে পারেন  
নাও কারণ তাঁহার আয় সংকীর্ণ ও দরিদ্র-  
প্রতিপালনে সব ব্যয় হইত ।

পরদিন প্রাতঃকালে পদব্রজেই কামাখ্যা  
দর্শনে চলিলাম । সৌধাটী হইতে কামাখ্যা  
তিন মাইল দক্ষিণে । নদীর ধার দিয়া রাজ্য

—রাঙবন্দ—অতি হৃদয় শোভা! মনের  
এক হৃৎকেন্দ্রে অতি অল্প কালের মধ্যে  
কামাখ্যার পাগড়ের পঙ্কজবর্ণে আঁসি-  
উপস্থিত হইলাম।

কামাখ্যার পাগড় উত্তিবার প্রথম কটকের  
ধারে আঁসি। একবার চারিদিকের শোভা  
দর্শন করিলাম। বড় নন্দনপ্রীতিকর—  
পক্ষিতে উত্তিবার রাস্তাটা অত্যন্ত হৃদয়-  
প্রসন্ন দিয়া বাধান! সূর্য্য কিরিতা উচ্চ  
নীচ হইয়া কেমন উত্তিগাছে। হৃৎধারে গুলন  
চাঁপা ফুলের গাছ—মাথের পূজা এই ফুলেই  
বেশি হয়—এত ফুলের গাছ একস্থানে আমি  
দেখিগাছি কি না সম্মেহ।

ইহার স্বেচ্ছা মন প্রাণে এক অপূর্ণ  
পবিত্রতা আনয়ন করে। রাস্তার মাঝে মাঝে  
ভয় অর্হত সব দেবদেবীর প্রতিমূর্তি। এই  
রাস্তাটা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ সম্বন্ধে এক  
কিংবদন্তী আছে। বিশ্বকর্মা একদিনেই এই  
রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এইরূপে আমরা প্রান্তরের পর প্রান্তরের  
দ্বাশ দিয়া উত্তিরা প্রায় তিন মাইল চলিয়া  
কামাখ্যার মন্দির প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম।  
এই মন্দির ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান  
একটা প্রকাণ্ডকার পাগড়ের উপরে এক  
প্রকাণ্ড গ্রাম। মাথের দেবীত পুরোহিত  
পাণ্ডা সবাই এখানে বসবাস করে—ভাষ্যদের  
সামাজিক বৈবাহিক নিত্যনৈমিত্তিক সব ক্রিয়া  
এখানেই সম্পন্ন হয়। প্রায় ২০০ পাণ্ডা  
মাথের সেবা করিয়া এখানেই এইরূপে প্রতি-  
পালিত হয়।

রাস্তার আমাঘের পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ  
হইল। পাণ্ডাপণ দেখিলাম বেশ ভদ্র;  
অধাকাজ্ঞা নাই। বেশ সৌন্দর্যের সাহিত  
আমাদিগকে গইয়া সৌভাগ্য কুণ্ড

নামক মাথের মন্দিরের সমুদয় পুষ্করিণীতে  
লটরা সেলেন; সেখানে স্নান করিয়া মস্ত-  
পাঠান্তর মাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য  
আমরা মাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপনীত  
হইলাম।

সেখানে অবিবাহিত কস্তার বেশির ভাগ  
দেখিলাম। মেয়েরা কি সরল; কি সাধা-  
সিধে; কোনরূপ পাপ সঙ্কোচের ভাব যেন  
মনেই নাই। মাথের নক্তির কি অপূর্ণ  
দৃশ্য।

এখানে গুলন চম্পার মালা ক্রয় করিয়া  
মাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মাথের  
মন্দিরে আলোক ভিন্ন প্রবেশের উপায় নাই।  
ঘোর অন্ধকার। যেন পাতালপুরী। আলো-  
কের সাহায্যে মাথের দর্শনলাভ করিলাম।  
মা বর্ণ-মাতৃতা; সমুখে পাতাল হইতে জল  
উঠিতেছে; সেইখানেই মাথের অঙ্গ বিশেষ  
পতিত হইয়াছিল। অদৃশ্যভির ঘিন এখান  
হইতে রক্ত উৎপিত হয়। এই সময় মাথের  
এখানে মহামেলা। এই সময়ে এখানে অনেক  
হাড়ীর সমাগম হইয়া থাকে।

মাথের মন্দিরের পার্শ্বে কোচবিহারের  
রাজার ও তাহার রাস্তার প্রতিমূর্তি খোদিত  
দেখিলাম। পাণ্ডারা বলিলেন যে মাথের  
শক্তিতে আবশ্যক করায় কোচবিহারের রাজা  
ও রাজপুত্রের পাষণ্ডমূর্তি হইয়াছে। ইহার  
এখানে আদতে নিষিদ্ধ। মাথের এই মন্দির  
কিন্তু ইহাদের অর্থে পুনঃ সম্ভূত।

মাথের মন্দির দেখিয়া আমরা ভুবনেশ্বরের  
মন্দির দেখিতে চলিলাম। হুঁ! পক্ষতের  
সঙ্কোচ পুত্রোপার স্থাপিত। এ স্থানের  
শোভা অত্যন্ত মনোরম। এ স্থান হইতে  
ব্রহ্মপুত্রের শোভা এক আনন্ডনয়। ব্রহ্ম-  
পুত্র নগ যেন বারিয়ার কোড়ে রক্তধারায়



স্বয়ং বলসাকারে শোভিত-রহিয়াছেন; এ স্থান হইতে তেজপুর সহর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদিগকে একদিনের মধ্যে কামাখ্যা ও বশিষ্ঠাশ্রম দেখিতে চওঁয়াই আমরা এখানে আর অপেক্ষা করিবার অবসর পাঠিলাম না। এখানে হইতে শীত শীত কাৰ্য্য শেষ করিয়া আমরা পাণ্ডুঠাকুরের বাড়ীতে রওনা হইলাম সেখানে তাহাদিগের যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়া আমরা পুনরায় গৌগাটীতে রওনা হইলাম।

### বশিষ্ঠাশ্রম

গৌগাটী হইতে আমরা পন্থান্ত্রে বশিষ্ঠাশ্রম রওনা হইলাম। এই বশিষ্ঠাশ্রম গৌগাটী হইতে ১৩ মাইল উত্তরে; এ স্থানটী নির্জন-তার তাক্ষসভূমি; কবির সাধনের প্রকৃষ্ট স্থান। চারিদিকে পর্বত; শাল তম্বালাদি বনে স্থানটির নির্জনতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। যেমন প্রকৃতির শোভা সেইরূপ নির্জনতা; পানীর কাহুদি, ব্যাঘ্রের গর্জন মাজে নীরবতাকে মাঝে মাঝে ভঙ্গ করিতেছে। বশিষ্ঠাশ্রমের দেখিবার প্রধান বিষয় জুন-প্রস্রাভ। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি হেমন্ত কি বসন্ত সব সময়ে জলের পতন লব্ধ—হ হ স্বরে জল পড়িতেছে—বিষয় নাই। কোন সময়ে ইহার অল্পতা দৃষ্ট হয় না এই ইহার বিশেষত্ব। এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংসা করে না তবে আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক পুজাদির ব্যাঘ্রাত হইলে ইহারা উপদ্রব করিয়া লগতকে পুরোহিত-দিগের কাৰ্য্যনির্বাহিতা বাধা দেয়।

বশিষ্ঠ বেখানে সিঁড়িলাত করিয়াছেন সেখানে একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের অপরদিকে সাধাবশের থাকিবার জন্য একটী বাসস্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানে রাজি বাগ করা চলে—কিন্তু এখানে বাঘ-জবা কিছুই পাওয়া যায় না। বাঘা জবাঘি

গৌগাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়।

বশিষ্ঠাশ্রমের অপর দিকে অল্প দূরত্বের সাহুদেশে অকম্বলতর ঘর দৃষ্টিগোচর হয়।

বশিষ্ঠাশ্রম দেখিলে কবিদিগের আশ্রমের পবিত্রতা ও নির্জনতার কথা মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়; লোকে লোককোলাহল পরিত্যাগ করিয়া কেন যে বনগামী হয়, কেন যে প্রকৃতির কোড়ে আপনাকে বিলাইয়া দেয়, কেন যে অনন্ত গগনের সহিত মিশাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহার কারণ উপলব্ধি হয়; নির্জনতার যে শান্তি ও হৃৎ আছে তাহা এই স্থানে আদিলে বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়। নির্জনতার যে মনের আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায় তাহা এই স্থানে আদিলে বেশ উপলব্ধি করিলাম।

### গণেশ মূর্তি

অত্যা পুরী হইতে তিন মাইল দক্ষিণ। লালমাটির নিকট। মূর্তিট পাথরের—গণেশের তঁড়, হাত প্রকৃতি সব আছে। অনেক দিনের বলিয়া বোধ হইল। হৃদয় কাককাৰ্য্যে মন্দিরের পাথরগুলি খোদিত ছিল—বর্তমানে কুমিকম্পে সব তাহা বিঘাটিতে পড়িয়াছে। একখানি প্রকাণ্ড পাথরে হৃদয় পদ্মফুল খোদা রহিয়াছে। আর একখানি পাথরে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, অগস্ত্যাদিগের মূর্তি খোদিত। এই সব মূর্তি দেখিয়া প্রকৃতভাবে পতিতগণ স্থির করিতে পারেন ইহা কত দিনের এবং কোন্ রাজার সময়ের। পাথরের মন্দিরে খোদাই ও কাককাৰ্য্য তাহাদের অনেক লোক) দিতে পারে।

### রামমূর্তি

এইখানে একটী প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছ

আছে—ইহা বহু প্রাচীনত্বের সূচনা করে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তি আজিও বর্তমান। এখানে পূর্বে যে মন্দির ছিল তাহার প্রমাণ আছে। একটী দেওদলের চিহ্ন বর্তমান। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় এই স্থান বহু প্রাচীন—বর্তমানে এটী সকল হিন্দুদের

দেওব সূচনা করে মাত্র। উৎসাহের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত সচিত্র ঐতিহাসিক সত্য। তবে কাহার কর্তৃক বাতির চর্চা? দেশ অসাড় তাই পুরাতত্ত্বি এখনও এটীভাবে পুরাতনের লক্ষ্য। দিতেছে যাহা। উৎসাহে কত সত্য।

ত্রি

## পল্লীগ্রামে দুগ্ধ-সমস্যা

অরুণোদয়ের স্নায় বিস্তৃত শুষ্ক সংগ্রহ-সমস্তাও দিন দিনট কটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। সহরের অত্যাচারে পল্লীবাড়ারেও অব্যাহ ভেজাল ও মিশ্রণ চলিতেছে। তাহাও আবার এত দুর্খল্য যে সাধারণ লোকের ত দূরের কথা, মধ্যবিত্ত গুহলোকেরও আবশ্যক পরিমাণ তাহা কিনিয়া পাইবার ক্ষমতা নাই। দীর্ঘ দিন অব্যাহত হেতু চমকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহুস্ত্রীপুরুষগণ দুগ্ধের আবাদ তুলিয়া গিয়াই থাকিবেন। শিশু সন্তানগণকে দুধ না খাওয়াইলে চলে না—তাই দুই এক বিহ্বল “বাঝারে” দুগ্ধের সহিত এক বাটী এতকট বা বালি নিশাইয়া কোনও রকমে উদর গহ্বর ভর্তি করাইয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ভাগ্যবান ব্যক্তির সন্তানেরা তুলিষ্ট চটাইই প্রথম বিহ্বল দুগ্ধের অন্ত সাত সমুদ্র তের নদী পারে অদূর হল্যাও ও হাইল্যান্ডের প্রতি লোমূণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৎস্ত ও মৃত্ত ত বাঝালা দেশ হইতে চির বিদায়ই গ্রহণ করিয়াছে। দেশে গোহালা আছে—কিন্তু তাহাদের গরু নাই। কলিকাতা হইতে টিনের ঘি তাহারা আমদানী করিয়া

থাকে। সাপ বাত, প্রকৃতি যাহা কিছুই চর্কি, ঘির মত দেখা যায় এবং শোরঙা, কুম্ববীজের তৈল, ও গোহাট্ট অবল প্রকৃতি এই আমদানী করা ঘির প্রধান উপাদান। মৎস্ত ত মক্শলে একবারেই দুগ্ধাণা। দীঘরবংশ বাঝালা দেশ চটতে নির্মূল হইতে বসিয়াছে। যাহারা এখনও টিপ, টিপ করিয়া অলিতেছে, তাহাদেরও ব্যবসায়ের মানাঙ্গল অস্বাভ উপস্থিত। মানাঙ্গি কারণে বাঝালা দেশের স্বাভাবিক পণ্যপ্রণালী নদী নালা খাল দিল সমস্তই অলি শুকতোর। যে মাক্স পাওয়া যায় তাহাও আবার সহরের লক্ষী বরপুত্রগণের অন্ত বাপাতীরা লইয়া যায়। হুতরাং মক্শ-বলবাসিনদের অদূরে অটরতা। দুধ বি মাছেই বাঝালীর নদীর। এই তিনটী ব্যবসারই দুগ্ধপন অভাব হইয়াছে। বাঝালী বাচিবে কিসে?

৩০৪০ বৎসর পূর্বেই বাঝালা দেশের এমন চর্কণা ছিল না। তখন ঘরে ঘরেই অন্ততঃ ২১০টী দুগ্ধবতী সাতী থাকিত। দৈনিক ব্যবহারোপযোগী দুগ্ধের অন্ত সাধারণতঃ কাহাকেও বাঝারে দোড়াইতে হইত

না। প্রত্যেক দিবস পরিবারের গাভী পরিচর্যা। একটা স্বল্প প্রতিপাল্য কর্তব্য। কার্য বিবেচিত হইত। আশ্বিনের পূর্ণমাসীরাষ্ট্র যত্নে গাভীর সেবা তত্ত্বাধা করিতেন,— তাহাতে উগাধের লক্ষ্যবোধ ছিল না—যা সম্বন্ধেও লায়ব হইত না। ভাতের ফেন প্রভৃতি ও তরিতরকারীর পরিচর্যা অংশ উহার। সমস্ত রাখিয়া দিহেন—সম্বা। বেলা মাঠে চটতে গরু বাড়ীতে ফিরিলে উহার। নিজ হস্তে সেগুলি গরুকে পরিচোবপূর্বক ঝাওরাইয়া আশ্বপ্রদান অসুচব করিতেন। গাভী পরিচর্যা। তাহাদের নিকট একটা প্রধান পূণ্যকার্য বিবেচিত হইত।

তখন ভ্রলোকের পক্ষে গরু বাছুর রাখিবার অনেক সুবিধাও ছিল। চাকর-বাকর, মুটে মজুর এত দুর্লভা ও দুস্তাপ্য ছিল না, যা এত দায়িত্বজ্ঞানহীনও ছিল না। একজন চাকর রাখিলেই তখন যাকারী রকমের গৃহস্থের ব্যবসায়ী কার্য নির্বাহিত হইত। মূনিও চাকর সকলেরই একটা দর্শক ছিল। মূনিও চাকরকে নিজের পরিবারের লোকের মত দেখিত—চাকরও মূনিবের ছন বাইরা ছন হারামী করিত না।

আজ কাল যেমন হাড়ী জোষ চণ্ডাল পর্যন্ত পেটের ভাতের ভগ্ন লাগলের "বুঠা" ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তেমন ছিল না। সকলেরই জাতিগত শৈল্পক বসাদার ছিল, বন্ধারা অন্যায়সেই তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহিত হইত। জমির উপরে তখন এতটা চাপ ছিল না। আশ্বরাই সেবিরাছি যে তখন প্রত্যেক ভিন বৎসর আশ্বিনের পর একটা মাঠ ভিন বৎসর পতিত রাখা হইত। ইহাতে যে শুণু সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নশক্তি বৃদ্ধি পাইত, তাহা নহে; শত্রু জাতির গো-

মহিষাধি সেই উৎকৃষ্ট যানে বেজামত আশার বিহার করিয়া সবল ও হুণুট হইত। কাজে কাজেই তখন ঘাসের এত অভাব ছিল না।

তখন প্রত্যেক গ্রামেই ২-৪ জন গো-বৈদ্য পাওয়া যায়। ইহার। পৃথক শ্রেণীভুক্ত ছিল না। সকল শ্রেণীর লোকেই আগ্রহ করিয়া সম্বাধি পণ্ডর চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করিত, গো-চিকিৎসা একটা বিশেষ পূণ্যজনক কার্য বিবেচিত হইত। এমন কি হুণুর রাষ্ট্রিতেও খবর পাঠিলে গো-বৈদ্যকে নিজেই শত শত কাষ ফেলিয়া গ্রামান্তরে চিকিৎসার ভ্রম বিনা ওহর আপনিত্তে যায়তে হইত। চিকিৎসার পারিশ্রমিক স্বরূপ লে একটা কপর্দকও গ্রহণ করিতে পারিত না, এমন কি যে বাড়ীতে চিকিৎসা করিত, সে বাড়ীতে গো-বৈদ্যের এক ছিলিমি ডামাক পর্যন্ত থাকারও নিরম্ব ছিল না। লোকের বিশ্বাস ছিল, চিকিৎসার ভ্রম আহুত হইয়া না গেলে বা চিকিৎসার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে, মর এবং ঔষধের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্রাতি বৎসর ঐতিহ্যসত্তে নদীয়া ঘণোহর প্রভৃতি স্থান হইতে গোচিকিৎসক গোয়াল-পন ঔষধপত্র সমতবিবাহারে গ্রামে গ্রামে আগমন করিয়া অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যাধি চিকিৎসা করিত। এই সমস্ত চিকিৎসকগণ বেলপাছিয়া হইতে বেঙ্গেল ও মার্টিকিকেট প্রাপ্ত না হইলেও, ইহাধের চিকিৎসা যে অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ সুকলগ্রস্থ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিভূদিন পূর্বেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ১-২ জন "খর্ষের বাড়" দেখা যায়। ইহার। বজ্জন্ম আহার বিহার করিয়া সবল ও হুণুট হইত এবং উৎকৃষ্ট বৎস উৎপাদন করিয়া গো-জাতির উন্নতি সাধন করিত। হিম্মুর

পক্ষে “ব্রহ্মোৎসর্গ” জ্ঞান একটি অবজ্ঞা-করণীয় কার্য—হিন্দুসমাজকেই পিতৃপুত্রবধের স্মৃতি কামনাও ইহা করিতে হয়। ত্রিকালদর্শী হিন্দু কথিগণ ক্রিয়ামাতৃক ভারতবর্ষের কৃষি-কার্যের প্রধান সহায় ও শ্রীবন দায়েরের জ্যেষ্ঠ উপায় গোজাতির উন্নতি বিধানের জন্যই এই অশেষ মঙ্গলকর বিধানের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন। “ধর্মের বাঁহকে” কেহই বাঁদিয়া রাখিয়া অস্ত্র কার্যে নিযুক্ত করিতে সাহসী হইত না—ইহারা যে শস্তের হানি করিত তাহাও লোকে বড় একটা গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সব বিবয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। আজ কাল পল্লীগ্রামের প্রায় শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকসমাজে শ্রুতিপরাধন হইয়া সহরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা পিতৃ মাতৃ জ্ঞানোপলক্ষে ব্রহ্মোৎসর্গ করেন কি না, তাহার বিচার এখানে নিশ্চয়োজ্ঞান। বাহারা এখনও অবস্থা-বৈগুণ্যে পল্লীর মাঝা মমতা কাটাইতে পারেন নাই, তাহারাও সূঁছির ঘোবে সনাতন হিন্দু ধর্মকে ঠাকি দিতে বাইয়া নিজেস্বীয় ঠাকি পড়িতেছেন। ঘেনের নিত্য জুতাগ্যবশতঃ এমনই কি রীতি প্রচলিত হইয়াছে যে আজ কাল অনেকেই সজ্জিত বাক্য সঙ্গেও পিতা-মাতার ঐচ্ছিক কার্যাবলি প্রায়ই নৈহাটী প্রকৃতি স্থানে তিল তুলসী ও পবিত্র পঞ্চোদক ব্যাধা শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কলতঃ পল্লীগ্রামে এখন আর ব্রহ্মোৎসর্গ জ্ঞান অজ্ঞাতি হয় না বলিলেই হয়।

পূর্বে প্রায় সকল গৃহস্থেরই কিছু না কিছু বাস খামার ছিল—তাহাতে যথেষ্ট খেদারী মটর প্রকৃতি কলাই পাওয়া বাইত। বাড়ী-ভেই এই সময় কলাই জাঁতার শিবিয়া দাইল প্রস্তুত হইত এবং খোসা, কুঁচি প্রকৃতি পরি-

ত্যক্ত অথবা দুইবতী গাড়ীকে যত্নসহকারে রাখান হইত, এগুলি অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং উচাতে দুধের পরিমাণও বাড়িত। কিন্তু আজ কাল এই প্রকার সমূল পরিবর্তন হইয়াছে। বাড়ীতে দাইল তৈয়ারী উৎপাত অপেক্ষা এখন অনেকেই নগর পরমা ফেলিয়া দিয়া বাজার হইতে তৈয়ারী দাইল কিনিয়া আনা প্রথমে মনে করেন। হুতরাং গৃহস্থের লাভের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীরও একটি পুষ্টিকর খাদ্যেরও অভাব হইয়াছে।

সর্গ জ্যেষ্ঠী সকল প্রকার ব্যবসায় এক-কালীন লুপ্ত হওয়াতে সকলকেই এক জমীর উপরেই নির্ভর করিতেছে। হুতরাং আজ কাল আর সময় মাঠ খুঁজিয়াও মাংস বিয়া পতিত জমীও ঘেঁষিতে পাওয়া যায় না। গরু ত দুধের কথা, মাছবেরও বাহিরে এক পাও ধাঁড়াইবার স্থান নাই বলিলেই হয়। উৎসুক স্থানে ও বহুস্বয়ং চরিতে না পারিয়া গো-জাতির মাংস যে তরু হইবে তাহাতে আর আশঙ্কা কি ?

চাকর মহুরের খেতপ দর ও আদর বাড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থলোকের চাকর রাখা দার হইয়াছে। অনেক সময়েই পরমা বিয়াও চাকর মিলে না। এই সময় খেজালং সহ করিতে না পারিয়া অনেকেই গরু বাছুর বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছেন।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমাদের গৃহস্বামীগণও আর মোমাতার দ্বয় তদ্বির করা নিজ পদোচ্চিৎ কার্য মনে করেন না। বড়টা সময় তাহারা গরুর জন্য নষ্ট করিবেন, তখন উল, কার্পেট বুনাইলে, বা নডেল নাটক পড়িলে অধিকতর উপকার হইবে বলিয়া তাহাদের ধারণা। বাড়ীর কর্তাসপণও প্রায় সকলেই চাহুরীদ্বীবি। সারাদিন

কৰ্মৰূপে খাটুৱা ক্ৰান্ত বেহে বধন বাড়ীতে  
কিৱেন, তখন আৰু তাঁহাৰ এলমত বিষয়ে  
তথিৰ তদাৱকৰ কক্ষা থাকে না।

শিকা বিজ্ঞাটোৱে ঢেউ যেন শুধু তথা কথিত  
শিক্ষিত সম্প্রদায়ৰে মধ্যেই আবদ্ধ আছে,  
তাহা নহে—সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণ পথত ইহাৰ  
আবাস্ত পৌছিয়াছে। সকলোই এখন বড়  
হইবাৰ প্ৰৱাসী—পয়সাৰ কাৰালী। যবৈ  
খাইয়া বনৈৰ মহিৰ তাড়াইতে কেহই রাজী  
নহে। স্তত্ৰাং বে গো-চিকিৎসাৰ দ্বাৰা  
পত্নী উপাশ্ৰিত হয় না, তাহা আৰু আজ  
কাল কেহই শিখিতে চায় না। তাহাৰ  
কলে এই দুখৰ দোষীৰ বিজ্ঞাটী আমাৰে  
দেখ হইতে একেবাৰে লোপ পাইতে বসি-  
য়াছে। যবসাদাৰ পোৱালা গো-বৈদগ্ধৰণও  
এখন কালমাহাশ্বেদ, পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়ি  
চাকুৰীৰ উমেছাৰী কৰিতেছে। স্তত্ৰাং  
আজকাল গৰু মহিৰাদিৰ কোনওৰূপ ব্যৱসায়  
হইলে ব্ৰত্ৰা ব্যতীত আৰু উল্লৰ পত্ৰান্তৰ নাই।

জেলৰ সদৰ ও মহকুমাৰ ২১ জন পাল কৰা  
পত্ৰ চিকিৎসক আছেন বটে; পল্লী-গ্ৰামেৰ  
কৰ জনেই তাহা অবগত আছে, আৰু সময়মত  
কেই বা তাঁহাৰে সাহায্য লইতে পাবে।  
গৰু ব্যৱসায় হইলে সহৰে সংবাদ পাঠাইয়া  
তথিৰ তদাৱক কৰিয়া সৱকাৰী পত্ৰ-চিকিৎ-  
সকে অনাইতে যে সময় লাগে ততক্ষণ চৰত  
ব্যাপিগ্ৰস্ত গৰুটী “ভাগাড়ে” আশ্ৰয় গ্ৰহণ  
কৰিব। এতব্যতীত সৱকাৰী পত্ৰ-চিকিৎ-  
সকেৰ দ্বাৰা চিকিৎসাৰ আশ্ৰয়লিক ব্যৱসায়  
বহন ও আবস্তকীয় তিনিশাৰি সৱব্ৰাহ কৰা  
হৱিৰ নিৰক্ষৰ পল্লীবাসিগণেৰ পক্ষে সম্পূৰ্ণ  
অসম্ভৱ।

জুখৰে সহিত বলিতে হইতেছে যে আজ  
কাল সম্প্রদায় বিশেষৰ মধ্যে গো-খাদকেৰ

সংখ্যা ক্ৰমেই বাড়িতেছে। গো-মাংসেৰ  
বিশেষ গুণনা তৃত্তিকৰ কোনও আশা আছে  
কি না জানি না, কিন্তু “বেগুৱাৰি” খণ্ডেৰ  
বাড়গলি আৰু আজ কাল টিকিতে পাৰিতেছে  
না। এতদ্বাৰা তাঁহাৰা যে নিৰ্ভৰ পাৰে  
নিজেই কুঠাৰাঘাত কৰিতেছেন, ইহা তাঁহাৰা  
বুজিবাও বুজেন না, এতদপেক্ষা আক্ষেপ  
ও কোভেৰ বিষয় আৰু কি হইতে পাৰে?

প্ৰাণীমাত্ৰেই পক্ষে পুষ্টিৰ বাধ্যও যেমন  
প্ৰয়োজনীয়, বিত্তত্ব জলও সেইৰূপ দৱকাৰ।  
দেশেৰ এমনি দুৰ্দ্ধিণা হইয়াছে যে পল্লীগ্ৰামে  
বিত্তত্ব জপেৰ কথা শুনিমহে অনেকৰ চক্ষু  
হিৰ হয়। মাছবেৰই বাইবাৰ জল নাই—  
তাতে আবায় গৰুৰ জন্ত বিত্তত্ব জল। পূৰ্বে  
নদী নালা খাল বিল বিত্তত্ব ছিল। গৰু  
বাছৰ এই দমত জল পান কৰিত। এখন  
এশমিতে জল নাই—পচা কাল আছে—গৰু  
বাছৰকে প্ৰাণেৰ দায়ে তাহাই পান কৰিতে  
হয়।

আমাৰেৰ দেশেৰ গোজাতিৰ অবস্থা  
পূৰ্বে কেমন ছিল, আৰু এখনই বা কেমন  
আছে তাহা সংক্ষেপে বৰ্ণিত হইল, কিন্তু  
এখন উপায় কি? গো-জাতিৰ সহিত মাছৰ  
মাত্ৰেই শুভাতত যে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে  
সম্বন্ধ। শুধু কৃষক বা নিৰক্ষৰ লোকেৰ  
উপায় নিৰ্ভৰ কৰিয়া থাকিলে বা তাহাৰিগকে  
অব্যচিতি উপদেশ দিলে কিছুই লাভ হইবে  
না। দেশজিভেদী শিক্ষিত ভদ্ৰ মহোদয়-  
গণকেই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে।  
গোজাতিৰ উন্নতিবিধানৰে জন্ত বাহা বাহা  
দৱকাৰ, নিজে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

প্ৰথমেই বাস্তৱ কথা বলিতে হয়। সম্প্ৰতি  
গবৰ্ণমেণ্টেৰও দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে।  
জমীদাৰগণকে গোচৰ জুৰি বাধিতে বাধ্য

করা যায় কি না গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গবর্ন-মেন্টের এ প্রস্তাব কার্যকরী হইবে না। দেশের বর্তমান অবস্থায় গোচারনোপযোগী বিকৃত জমি কোনও ভদ্রমানের পক্ষে আছে বোধ হয় না—বা প্রজাদের নিকট ছাড়াইয়া লইলেই বা তাহাদের কি উপায় হইবে। কলকাতা এতদ্বারা কোনও লাভ না হইয়া বরং নানাবিধ গোলমালেরই সৃষ্টি হইবে। অঞ্চল গুলির খাদ্য সংগ্রহেরও ব্যবস্থা চাই। আমাদের বোধ হয় কৃষকগণকে কিছু কিছু ঘাসের আবাদে প্রবৃত্ত করা হইতে পারিলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকগণ যেরূপ রক্ষণশীল তাহাতে তাহাদিগকে শুধু মুখে উপদেশ বিলে হইবে না। আজ কাল প্রায় প্রত্যেক জেলার সমরে ও মহকুমাসমূহের গবর্নমেন্টের কৃষি-বিভাগের এক এক কণ্ঠস্বরী (Fieldman Demonstrator) নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষকগণের অধিতে বাইরা তাহাদিগকে কৃষিতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই ইহাদের কাজ। ইহাদের সাহায্যে এই কাজটী অনায়াসে হইতে পারে। প্রথমে প্রথমে বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করিতে হইবে। একবার ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিলে দেখা দেধি তখন সকলেই অন্ততঃ নিজ নিজ প্রয়োজনোপযোগী ঘাসের আবাদ করিবে। আজ কাল অনেক শিক্ষিত ডব্রলোকের দ্বারা প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। ইহারা চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে আরও বেশী ফল লাভের সম্ভাবনা। ইহারা নিজেরাই কিছু কিছু ঘাসের আবাদ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। কৃষকগণ বাহ্যতে বাড়ীর নিকটে অল্প মূল্যে বীজ পাইতে পারে তাহার

ব্যবস্থা করিতে হইবে! নিরক্ষর লোকেরা যে ১০১২০ জোশ হাটরা সহরে বাইরা হোটেলের পরমা দিয়া দরবার করিয়া ঘাসের বীজ আনিবে একদম আশা করা বুঝা। প্রত্যেক পানায় এক একটা বীজের ভিণ্ডো বোলা দরকার। তার পরেই বাঁড়ের কথা। আমাদের দেশের গোমাতার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই বাঁড়ের উৎকৃষ্টতার প্রতি যত্ববান হইতে হইবে। আজ কাল আমাদের শিক্ষিত মহলে বিশেষতঃ ভিক্ট্রি বোর্ড ও মিউনিসিপালিটিতে হিসাব, কামস্কাটিকা, হেনোলু প্রভৃতি কঠোরকারিত্ব স্থান হইতে বাঁড় আমদানীর কথা শোনা যায়। এতদ্বারা যে বিশেষ উপকার হইবে বোধ হয় না। বাঁড়কে সদা সক্ষম রাখিয়া রাখা যায় না বা রাখিলেও তাহার শরীর টেকে না। এই অন্তই শাস্ত্রকারগণ “ধর্মের বাঁড়ের” বন্ধন ব্যবস্থা করেন নাই। আর আশুগা বাঁড় পাইলেই লোকের ঘরিতদ্বারা রসনা পরিতৃপ্তির জন্য লোলুপ হয়, তবে আর উপায় কি ?

হিসাব প্রকৃতি স্থান হইতে বাঁড় আনাইলে বাহালা দেশের আবহাওয়া যে উহার সহ্য হইবে তাহার প্রশ্ন কি ? খেপানেই ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছে, সেখানেই অকৃত-কার্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের গোমাতার উন্নতির জন্য ১৯১১ বাঁড়ের দরকার হইবে না। সাধারণ লোকেও এত দাম দিয়া তাহা কিনিতেও পারিবে না। তবে বড়লোক বা জেলা বোর্ড মিউনিসিপালিটি ইচ্ছা করিলে আনাইয়া বেধিতে পারেন। কিন্তু সর্ব প্রথমে বেশী বাঁড় গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বাহাতে ধর্মের বাঁড় গুলি অকালে নিহত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা

সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন। এবিষয়ে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে হিন্দুধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিবেন এমন ভরসা নাই। বরং অনেক স্থলে হিন্দু বিপত্নীত হইবারই সম্ভাবনা। বাকালার দেশের অধিবাসী গাংখার অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান—তাহারও আবার পোনের আনাই কৃষি ব্যবসায়ী। হুতরাং গোষ্ঠাতির উন্নতি অবনতির সহিত যে তাহাদেরও উন্নতি অবনতি নিত্যস্থানান্তরিত ভাবে বিকশিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস মুসলমান নেতৃগণ—এবিষয়ে চেষ্টা করিলে অধিকতর স্বচ্ছ লাভের সম্ভাবনা।

হিন্দুগণ গুরুকে দেবতা মনে করেন। কিন্তু আজ কাল এই দেবতাজ্ঞান অনেকের মনে মনেই থাকে—প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে এই দেবতাজ্ঞানের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের মর্যাদা বাহ্যতে রক্ষিত হয়। শাস্ত্রকে কান্না না দেওয়াই হিন্দুর কর্তব্য। ধর্মার্থে উৎকৃষ্ট ঝাঁড় বাহ্যতে বখাবিধি প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইয়া দেশের ও দেশের উপকার করিতে পারে তাহা করা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ বাহ্যতে ঝাঁড়ের পরিবর্তে কড়ি গ্রহণ না করেন এবিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি সর্বপ্রায়ে প্রয়োজনীয়।

আমাদের নিজেদের অমনোযোগে জাতীয় সর্বপ্রকার অচ্ছটান প্রতিষ্ঠান দিন দিনই সূত্র হইতেছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার আমরা বিশেষতঃ আমাদের পুরুলসনাগণ আর কোন মতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। একতর তাঁহাদিগকে অবশ্য মোবী দাবার করিতেছি না। আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি ও যে শিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতেছি ইহা তাহারই অবশ্যজারী কল। দেশীয়

গাছ গাছড়ার ব্যবহারে আমাদের শক্তপ্রণি আঁতকে উঠে, কিন্তু তাহাই আবার সাহেবের মুখে ইংরাজী নামকরণ প্রাপ্ত হইয়া বিলাতী শিল্পিতে জাহাজে চড়িয়া আসিলেই আমরা তাহা গ্যালনে গ্যালনে গলাধঃকরণ করিতে কিছু মাত্র বিধা বোধ করি না। আমাদের এই অজ্ঞার ও অসম্মত সাহেবীমানাই আমাদের অনেক গুণ হ্রাস। দারিদ্র্যের মুখ্য কারণ ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যাুক্তি হইবে না। কিছু দিন পূর্বেই একটা হুম্বর পত্ত চিকিৎসা প্রথা আমাদের দেশে ছিল—ইহা যেমন এক দিকে অস্বাস্থ্য সাধা ছিল—অপর দিকে ইহার উপকারিতাও তেমনই বেশী ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ইহা ছিল না—কিন্তু সেই পোষে ইহাকে মারিয়া না ফেলিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার ক্রয়োমতি সাধন করা বাইতে পারিত। এখনও এই চিকিৎসা শাস্ত্রটী বেশ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই—এখনও ইহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর। জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে ইহা করিতেই হইবে। আজ কাল পরীগ্রামে শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ঘোণাচরাগ্নি তত্ত্ব সন্তানের অভাব নাই। ইহারা চেষ্টা করিলে নিরক্ষর লোকদিগের নিকট হইতে অনেক অভ্যাবতকীয় ও মহৎকরকারী তথ্য শিখিয়া লইতে পারেন। পরে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে তাহার আরও উন্নতি সাধন করা বাইতে পারে। এই কাজটী অনতিবিলম্বে আরম্ভ করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

কল কলা কৃষিমাতৃক দেশের কৃষির প্রধান সহায়, জীবনধারণের একমাত্র উপায় গোষ্ঠাতির উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে আর গতান্তর নাই। এতদিন আমরা নিজের বুদ্ধির গোবে বাহাই করিয়া থাকি তাহার

পুনরুৎপত্তি দ্বারা স্বেচ্ছা সন্নিবিষ্ট করা  
বুদ্ধিমানের কাৰ্য্য নহে। এখন যখন আনন্দের  
ঐক্য বৃত্তিতে পারিচাছি, তখন হিন্দুসুন্দর্য্যমানে  
এক হইয়া জাতীয়ভাবে এক মনে এক প্রাণে  
এই জাতীয় হিতকর ত্রুটি ত্রুটি হইতে হইবে।

বুধা জ্ঞান কল্পনা বা বাক্য বিতর্ক আর  
সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমরা উভয়  
সমাজেরই নেতৃত্বের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ  
করিতেছি। •

শ্রীমদ্বাখ্যনাথ মজুমদার

## মনোবৃত্তিভেদ-রহস্য

বিষয়টীা পরমপিতা পরমেশ্বর আশ্রয়।  
সীলা খেলার নিমিত্ত যে সকল অভ্যাস  
কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে  
মানব সর্বোচ্চ বিশ্বরজনক। ইহাকে স্ব স্ব  
বিভিন্নপথে পরিস্রমণ করিবার জন্য একটী  
অতি বিচিত্র ও জাগতিক ব্যাপার গ্রাহক  
স্বয়ং অতি বৃহৎ পদার্থ দিয়া সৃষ্টি  
করিয়াছেন—এই পদার্থটা মানব-মন নামে  
অভিহিত, ইহার গতি অতীত বিচিত্র। এক-  
মাত্র এই গতি-বৈচিত্র্যই সংসারে স্ব স্ব দুঃখাদি  
নানাবিধ বিপরিত ধর্মের কারণরূপে নীতি  
হইয়া থাকে।

একপ্রকার এই গতিবৈচিত্র্যের কারণ অজ্ঞান  
করিতে চেষ্টা করা বাউক। যদিও ইহার  
প্রকৃত রহস্য মানব-মন-কর্তা ভিন্ন আর কেহই  
নিঃসংশয়িতরূপে স্থির করিতে সমর্থ নহেন,  
তথাপি শাস্ত্রবৃত্তি সাহায্যে ইহা আলোচনা  
করিতে করিতে অগণপিতার অনন্ত বহিয়ার  
কণামাত্র যদি উপলব্ধি করিতে পারি, এই  
আশায় বিফল বর হইলেও, সাধ্যমত চেষ্টা  
করিতে পরাধীন হইব না ?

সাধারণতঃ বৃত্তিতে পাতা যায় পূর্বজন্মের  
সংস্কার ও ইচ্ছাভয়ের শিক্ষা, সংসর্গ ইত্যাদি  
হইতে প্রধানতঃ নানাবিধ মানসিকবৃত্তি

সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সনসর্গ শিক্ষা ও সংসর্গ-  
বশে সনসর্গ সংস্কার পরিপুষ্ট হইয়া তৎ তৎ  
বৃত্তিকে প্রবল করিয়া থাকে। এই বৃত্তি  
বিকাশবিষয়ে ইচ্ছা ও পরম্পর পরস্পর এক-  
স্বত্রে অচ্ছেদ্যবন্ধনে গ্রথিত রহিয়াছে। মনই  
বিবিধ বৃত্তির জনক, বর্তমান শিক্ষাদি পরিপুষ্ট  
ইচ্ছার বৃত্তিগুলি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার  
সকলের বিশেষ ক্ষুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।  
ইহা প্রধানতঃ বিবিধ কারণ হইতে সমুৎপন্ন  
হয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে যথা,—  
প্রথমতঃ, পূর্ব পূর্ব জন্মের প্রবৃত্তি-প্রসূত গভীর  
সংস্কার অগ্নিমধ্যস্থ লৌহখণ্ডের স্তায় ইচ্ছাভয়ে  
মনের উপর কার্য্য করিয়া থাকে অর্থাৎ যেমন  
একখণ্ড লৌহে কতগুলি গভীর ও অগভীর  
রেখাপাত করিয়া প্রচ্ছলিত অগ্নিকুণ্ডে কিঞ্চৎ-  
কাল নিক্ষেপ করিয়া পরে শীতল হইলে  
যেখিঁতে পাওয়া যায় সে আরির উত্তাপে উক্ত  
লৌহখণ্ড ইবং গলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত  
অগভীর রেখাগুলি বিলুপ্ত করিয়াছে এবং  
অস্তিত্বগুলি স্ব স্ব গভীরতার তারতম্যানুসারে  
শীত ও অশীতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে;  
দেহরূপ পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারগুলি  
গভীর ও অগভীররূপে মনে অঙ্কিত  
থাকিয়া দৃঢ়রূপে অগ্নিতে কণকাল অবস্থান



করিয়া স্বীয় কক্ষল ভোগ করিতে ভগবদীচ্ছার দেহধারণ মাত্র গর্ভবান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে, গত কয়েক অপেক্ষাকৃত অগভীর সংস্কারগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং গভীরতাম্বায়ে কতকগুলি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট-রূপে মনোমগ্নে থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, জীবোৎপত্তিকালে জনক জননী হইতে কতকগুলি বৃত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, এই বৃত্তিগুলি আবার পূর্বজন্মের বসন্তাভীর বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া বিশেষরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে।

সেবকর সন্নিগণ বহুপূর্বে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং আধুনিক বিজ্ঞ বহুদশী চিকিৎসকগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, জনকজননীর সঙ্গতাবস্থায় যে প্রকার মানসিক বৃত্তি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, গর্ভস্থ জ্ঞপ্ত ও তাদৃশ বৃত্তি পরিমুখ্ত হয়। এই নিমিত্ত পূর্বে হইতে অন্ত্যাস দ্বারা মনকে লব্ধি-প্রবণ করা একান্ত আবশ্যিক। প্রধানতঃ এই কারণে পিতার বিভিন্ন প্রবৃত্তিসম্পন্ন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহজন্মের শিক্ষা ও সংসর্গ সৌন্দর্য-কারণরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। তাহার হেতু এই যে, অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় পিতা পুত্রগুলিকে এক প্রকার শিক্ষা ও সংসর্গ প্রদান করিলেও কেহ ক্রোধী, কেহ লোভী, কেহ ইহী ইত্যাদি নানাবিধ প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে পূর্বজন্মের প্রবৃত্তি ইহজন্মের জনক-জননী সংক্রামিত বৃত্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে তির বোধ হয় আর কিছুই স্থির করা যাইতে পারে না। হৃৎস্রাব সন্ধানের দৃষ্টবৃত্তি দমন করিতে হইলে ভাবী মাস্তাপিতার সঙ্কতি-সম্পন্নতা। সর্বপ্রথম আবশ্যিক। ইহাতে প্রথমতঃ ভাতকের পূর্বজন্মাবস্থিত অঙ্গবৃত্তি

অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে; দ্বিতীয়তঃ বর্তমান জন্মের স্থানিকা ও সংসর্গ সেই অঙ্গ-প্রবৃত্তিকে ক্ষুদ্রীকৃত হইতে বাধ্য প্রদান করিয়া থাকে।

উক্তবিধ কারণ মাত্র জীব প্রধানতঃ অনন্ত প্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, এই মনোবৃত্তির অসমিষ্টতা হেতু তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয় অর্থাৎ ইহজন্মের গভীর অঙ্গ প্রবৃত্তিগুলি মনে সঞ্চিত সংস্কার হইয়া পরজন্মের বীজরূপে অবস্থান করে। এইরূপ জন্মসংস্কার চলিতে থাকে, এই দারাবাহিকতা একমাত্র জ্ঞানলাভ দ্বারা নিবারিত হয়। অন্তর্থা সম্পূর্ণ অঙ্গভব—ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সীতার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যথা :—

হৈবধাসি স্মিদ্ধোহিরিভংসাৎ কৃততেজস্বিন।  
জ্ঞানারিঃ সর্বকর্মাণি ভংস্যাৎ কৃততেত্তথা ॥

৪-৩৬।

অর্থাৎ হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মে পরিণত করে, সেইরূপ জ্ঞানারি সমুদায় পুণ্যাপুণ্য কর্মকে ভস্ম করিয়া কলে। এই জ্ঞানের স্বরূপ বেদান্তদ্বারে এইরূপ ঘোষিত পাই যথা—“ব্রহ্মৈব নিত্যং বহু, অস্তং সর্বমনিত্যম্” ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, অপরায় সমস্তই অনিত্য। এই প্রকার সূক্ষ্ম উপলব্ধিকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়, এই জ্ঞান যুক্ত জীব মাত্রই এক, হৃৎস্রাব ইচ্ছাতেই সমস্ত জীবের ঐক্য দৃষ্ট হয়। জ্ঞান ভিন্ন কোন বিষয়ে জীব একমত্ত হইতে পারে না। উক্তরূপ জ্ঞান ভিন্ন ঘটজ্ঞান, ঘটজ্ঞান প্রকৃতিকে প্রকৃতজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান বলা যায় না—ইহারা জ্ঞানাত্মক মাত্র—ইহা মানসিক বৃত্তি পার্থক্যেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে জীবমাত্রই এই প্রকার জ্ঞানবিষয়ে

যাণী। এই প্রকার বৃত্তির অনৈক্যই সংসার  
সৃষ্টি করিয়া থাকে। হুতরাং সংসারে প্রকৃত  
শান্তি পাওয়া যায় না।

পিতামাতা হইতে জীব যে মনোবৃত্তি  
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ছায়াগোপ্যকৃতি প্রকার-  
জন্মে তাহা বলিতেছেন যথা—

জন্ম ব ইচ্ছা রমণীধরেনা অচ্যাপো হ যন্তে  
রমণীয়ং 'বোনি মাগন্তেহন্ ০ ০ ০ ০ ব ইচ্ছা  
বাপুচ্চরনা অচ্যাপো হ যন্তে বাপুং যোনি-  
মাগন্তোরন্ ০ ০ ০ ০ । ছা অঃ ৫ প্র  
১০ম ৭৪

ইহা হইতে বৃত্তিতে পারা যায় যে, বাহারা  
পুণ্যকর্মোচরণ করে তাহারা সমস্ত পুণ্য  
যোনি ও বাহারা নিম্নিত কর্মোচরণ করে  
তাহারা নিম্নিত যোনি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ  
যোনি প্রাপ্তির ব্যবস্থা কেন হয়, দেখিতে  
চেষ্টা করা হউক, আরও কোন স্থানে উক্ত  
আছে “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” অর্থাৎ  
পিতার সমস্তপুণ্য এমন কি কখনও কখনও  
আকৃতি পর্যন্ত পুত্রে সংক্রামিত হয়।  
হুতরাং যে জীবের প্রতি ভ্রুতি এইরূপ ব্যবস্থা  
করিলেন তাহাকে নিম্ন কর্মোচরণ মাতা-  
পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মাতা-  
পিতা হুত্বা বা হুত্বা হইলে সমস্তপুণ্য হুত্বা  
বা হুত্বা হইতে ভাগবিনের নিকট বহু-  
প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং  
আপনাপন কর্মকল স্রষ্টাকল্পে ভোগ করিতে  
সমর্থ হয়। ইহাতে পূর্ণজন্ম কর্ম জন্ম  
জাতকের বৃত্তিঃনিম্ন হুত্ববৃত্তি বা হুত্ববৃত্তিক  
ইহাযে জনকজননী হইতে প্রাপ্ত হুত্ববৃত্তি বা  
হুত্ববৃত্তি—এই দুই সংমিলন দ্বারা জীবের  
কর্মকল ভোগ করিবার জন্ম এইরূপ যোনি-  
প্রাপ্তির ব্যবস্থা যে নাহে নির্দিষ্ট হইয়াছে,  
তাহা অস্পষ্ট ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

সীতারও এই ভ্রুতির প্রতিফলিত ভ্রুতিতে পাওয়া  
যায়, যথা—

“তানহঃ বিনতঃ কুণ্ডলং সংসারেন্ নরাধমাম্ ।  
কিপাম্যগন্তনভতানমুখীষেব যোনিহু ॥  
আত্মহীং যোনিমাপন্ন। নুচা ভ্রমনি ভ্রমনি ।  
মামপ্রাটপাব কৌন্তেহ ৷ ততো বাস্তাধম্যং

পতিম্ ॥ ১৬ অঃ ১১, ২০ ॥

আমি সেই লবল দেগাম্বনর বৃত্তি কনু  
বিশেষী নরাধমদিগকে সংসারে কুণ্ডলপ্রকৃতির  
যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি।  
হে কৌন্তেহ! সেই যুগল জন্মে জন্মে  
আমাকে না পাইয়া (আমাকে পাওয়া দূরে  
থাকুক মংপ্রাপ্তিযোগ্য মহাব্যসেহও না পাইয়া  
তবগেহ) নিকট গতি প্রাপ্ত হয়। এই  
উক্তি হইতে কুণ্ডলপ্রকৃতির নিম্নিত যোনি  
প্রাপ্তির কারণ পূর্ণবৎ বৃত্তিতে হইবে। সেই-  
রূপ আবার পুণ্যকারীর পুণ্যযোনি প্রাপ্তিরও  
প্রতিফলিত সীতার বহিরাছে যথা—

প্রাণাপুণ্যকৃত্যং লোকোহুবিষা লামতীঃ সমাঃ ।  
ভুচান্য শ্রীমত্যাং গেহে যোগন্তৌহুভিভাযতেঃ  
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি বীমতাম্ ।  
এতচ্চি হুত্বভিত্তং লোকে জন্ম বদীদৃশম্

অঃ ৬—৪১, ৪২ ॥

ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই বৃত্তিতে পারা  
যাইতেছে মাতাপিতার সমস্তপুণ্য জাতকে  
সংক্রামিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে  
মাতাপিতার উপরই মনোবৃত্তি বিশেষ নির্ভর  
করিতেছে। এই প্রকৃতি আবার বেশ, কাল  
শিক্ষা, সঙ্গের ইত্যাদির সাহায্যে আরও  
বিকশিত হইয়া উঠে; হুতরাং দেগাবিও  
উপেক্ষণীয় নহে।

আজকাল অনেক মাতাপিতাকে পুত্রাদির  
অন্যব্যবহার জন্ম এইরূপে হুত্ব প্রকাশ করিতে  
দেখা যায় যে আজ কালের ছেলেরা মাতা-

পিতার কথা অগ্রাহ্য করে ও তাঁরাবিশেষকে  
অভক্তি করিয়া থাকে। তাঁরাবিশেষ এই  
আক্ষেপের বিশেষ সারবত্তা আছে বলিয়া  
মনে হয় না; কারণ, ইহা তাঁরাবিশেষের মোটামুটি  
জ্ঞান। উচিত যে, নিম্নবীজ রোগণ করিয়া  
স্মৃতি অনুসন্ধানের আশা করা কিরূপ সম্ভব  
ও স্বাভাবিক। তবে পুত্রাদি সম্বন্ধে ইহার  
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাই  
বলিয়া ব্যতিক্রম কোন বিধি বা সাধারণ নিয়ম  
হইতে পারে না। বাহা হউক উক্ত  
ব্যতিক্রমের কতকটা কারণ, ভাতকের  
পূর্বস্মরণকৃত স্মৃতি বা স্মৃতি ও তাহার ফলে  
গর্ভপ্রবেশ কালে যাতাপিতার বা গর্ভবাস  
কালে ভাতার সঙ্গদগ্ভাব্যের ইহা ভিন্ন বোধ  
হয় অন্য কারণ দ্বারা করা কঠিন হইয়া উঠে।  
সাধারণতঃ ধনবান কৌশল্যার মত অনন্যমনসী  
হইলে স্ত্রীরা চন্দ্রের তুল্য পুত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা  
স্বাভাবিক। যথেষ্টরূপে বসন্তের উপচোগ যে  
কেবল মাত্র সন্তানের বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ  
তাহা নহে প্রত্যুত পারীক্ষিক পঠন বৈদ্য-  
কণোপও এক মাত্র হেতু। হস্তরাং ঐ ভোগ  
বিষয়ে সংঘত হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

মনোবৃত্তির একতার অভাবই নানাবিধ ভেদ  
বা অভাবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই  
অভাবাদি পূরণে সম্ভব চেষ্টা করিলেও কোনই  
ফলোদয় হইতে পারে না। মনোবৃত্তির ক্ষমতা  
অস্বাভাবিক, এই বৃত্তি জীবকে কীট, পতঙ্গ যোনি  
হইতে দেখে যোনি পর্যন্ত সমস্ত যোনিতে স্রমণ  
করাইতে সমর্থ অর্থাৎ জীব এই প্রকৃতির  
সাধাব্যে কীটাদি হইতে দেবতা পর্যন্ত হইতে  
পারে। পীতাম্বা আমরা শব্দই দেখিতে পাই  
যথা :—

“হং বা বাপি অরণ্য ভাব্য ত্যক্তান্তে কলবরম্  
তন্তমেবৈবতি কৌশল্যে সমা ত্যক্তাবজাবিত্তঃ।

অং ৮ স্লোঃ ৩।

‘হে কৌশল্যে জীব দেহভাগ কালে যে যে  
ভাবে অরণ্য করিয়া থাকে স্মৃতির পর সেই সেই  
ভাবে দেহ ধারণ করিয়া থাকে, ইহা হইতে  
বুঝা যাইতেছে, বহুবিধ অন্নের মানসিকবৃত্তি  
বহুবলী একমাত্র কারণ রূপে নির্দিষ্ট হইয়া  
থাকে। এই সম্বন্ধে মহর্ষি ভরতের কথা মনে  
পড়িয়া গেল হস্তরাং না লিখিয়া থাকিতে  
পারিলাম না—কোন সময় মহর্ষি ভরত বন-  
মধ্যে একটা সন্তঃ-প্রসূত হরিণশিশু প্রাপ্ত হইয়া  
তাৎক্ষণিক লালন পালন করিতে লাগিলেন;  
ক্রমে তাৎক্ষণিক এত আসক্ত হইয়া  
পড়িয়াছিলেন যে, স্মৃতিকালে তিনি সেই  
সুগন্ধি বিষমক চিন্তা করিতে করিতে দেহ  
ত্যাগ করিলেন ফলে তাহার কণ্ঠের তপশ্যা।  
সম্বন্ধে পরম্পরে তাৎক্ষণিক হৃদয় সেই ধারণ  
করিতে হইয়াছিল, মহাত্ম্যভাবিতে এই  
প্রকার ঘটনার অভাব নাই। বাহ্যিক  
শব্দই বুঝা যাইতেছে, স্মৃতিসাধন চিন্তাই  
ভাবী অন্নের ভিত্তি। এই আশঙ্কা এমন  
হইতে পারে যে বৃত্তি কখনই অর্থাৎ যেমন  
কখনও যাইবে বৃত্তিও তাহার অঙ্গসংগ  
করিবে? না এইরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে,  
যদি বৃত্তি কখনই হয় তাহা হইলে সীতার  
ভগবদ্ভাক্যের আনন্দক্য হইয়া পড়ে যথা,  
“অপি চেৎ স্মৃতিভাক্যে ভগ্নন্তে মামনন্তভাবঃ।  
সাপুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ণ্য ব্যবসিতোহি সঃ।

অং ৯ স্লোঃ ৩০।

যদি কেহ অনন্তভক্তি হইয়া আমাকে  
ভজনা করে, তাহা হইলে সে অতীব সুখ-  
সিদ্ধিভার হইলেও তাৎক্ষণিক সাধু বলিয়া  
বিবেচনা করা উচিত, যেহেতু তাহার নিষ্ঠুর  
(ধারণা) সাধু। বৃত্তি কখনই হইলে দ্বা-  
চারী কখনও অনন্তমানে ভগবদানুগমনের সমর্থ  
হইতে পারে না, হস্তরাং সীতারাক্য অর্থ

শুভ হইয়া পড়ে। আরও দেখা যায়, “অম্মণ্যাব্য কথ্যনি” ইত্যাদি “কায়েন মনস্য বুভাঃ” ইত্যাদি “মুকঃ কৰ্মফলং ত্যক্তা” ইত্যাদি ( অঃ ১০, ১১, ১২ ) আঙ্গিক বহিত কৰ্ম ব্যবস্থা নিরর্থক হয়; হুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনোবৃত্তি প্রাচল্যঃ কৰ্মনিষ্ঠ নহে। আরও ইহা অনেকেরই মৈন-খিন জীবনে উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়াও মন বিবদান্তর লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াও কৰ্মাধীন বৃত্তি স্বীকার করা বিশেষ অযৌক্তিক।

সংকৰ্ম মনের মলিনতা দূর করে। মন নির্মল হইলে জ্ঞানের পূৰ্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞানের ক্ষুদ্রণ হইলেই সমস্ত মনো-বৃত্তির একতা সাধিত হয়। এইরূপ পূৰ্ণ জ্ঞানাবস্থাই জীবের মুক্তাবস্থা। হুতরাং কৰ্ম যে একান্ত প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভাগ ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন বখা,

“ন কৰ্মণামন্যাত্মৈককৰ্ম্যং পুণ্যবোহুভূতে।

ন চ সন্ধ্যাপনাসেব সিদ্ধিঃ সধবিগচ্ছতি।

অঃ ৩, শ্লো ৪।

অতএব সদ্যকরণে চিন্তিত্ত্বির ভক্ত জ্ঞানের

ক্ষুদ্রণ পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম বিহিত কৰ্ম সকল করা আবশ্যক, নতুবা চিন্তিত্ত্বির অভাবে জ্ঞানের বিকাশ চটবে না। এটি ভগ্নট বলিয়াছেন কৰ্মের অহুতান না করিয়া কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ( চিন্তিত্ত্বি বাস্তীত ) কেবল সন্ধ্যাপন দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না। হুতরাং মানব জ্ঞানপথে যতট অগম্য হইতে থাকে, মনের অনৈক্য সামসারিক অশান্তি, বাহ-অগন্তের আঙ্গিক প্রভৃতি ততই বিদূষিত হয়, হুতরাং অজ্ঞাতের গ্রন্থও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে। বিভিন্ন মনোবৃত্তি ছেঁড়, অনন্ত জয় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কষ্ট ভোগ চইতেছে— ইহার ভক্ত আমরাই দায়ী আমরা বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছি আমরাই তাহার কলভোগ করিতে বাধ্য। সে ভক্ত অহুতর হইয়া একান্ত চিত্তে কাতরতা সহকারে অগংপিতার কৃপাবিশুভিত্তা করিলে তিনি অবশ্যই কৃপা করিয়া তাহার সামগ্রী তাহার করিয়া লইবেন, তিনিই বলিয়াছেনঃ—

“যে তু সৰ্গানি কৰ্মাণি যদি সংতস্ত মংগরঃ।

তেষামং সমুচ্ছৰ্ত্তা বৃত্তান্সারঙ্গাংগাং।”

• • • • •

শ্রীবলরাম অলক বেদান্ত কবিরায়।

## মহারাজের বর্তমান কৃতী-সন্তানগণ

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্ত্রাব্

রায়কৃষ্ণ গোপাল ডাণ্ডায়কর।

(১) পুস্তকবিদ (২) বিদ্যাহরারী (৩) ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক (৪) শিক্ষক (৫) গ্রন্থকার।  
যে বিদ্যাবিদ্যালয়ের সর্গপ্রথম গ্র্যাডুয়েট-  
(বি, এ, ১) হিসেবে অন্ততম। আমাদেও

কানুন—১০

বেশের বর্গীয় রাজা রাধেক্ষাল মিঞা মহাশয়ের স্ত্রাব্ পুরাতত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের ভক্ত ইহার পাক্যাত্য পণ্ডিত সমাজে বিশেষ খ্যাতি আছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিহাসবিদ-  
হিসেবে মধ্যে ইনি একজন সর্গপ্রধান।

মহারাষ্ট্রের ও বম্বে প্রদেশের বর্তমান সমাজ ও বর্ণশাস্ত্রিক এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তক-বিশেষ নেতা। ইনি প্রাচীন সমাজের সংস্কারকর্মের অগ্রদূত এবং এক্ষণে আমাদের দেশের ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাপ্রেরের দ্বারা ঐ সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেশক।

দ্বৈতবাদ, পূনার 'ডেকান কলেজ' যোগা-তার সহিত সংযুক্তভাবে অধ্যাপকতা করেন। বম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাইন্স চ্যান্সলার এবং প্রাদেশিক ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ইহার সংযুক্ত ব্যাকরণ আমাদের দেশে বিদ্যালয়সমূহ মহাপ্রেরের 'কৌমুদী ব্যাকরণের' দ্বারা বম্বে ও মাদ্রাস অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে।

এখনও প্রাচীন বয়সে দ্বিগুণ কর্মপটু আছেন এবং প্রতিদিন নিরমিতরূপে অধ্যয়নে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। ইনি 'ডেকান্ এডুকেশন সোসাইটীর' (যে সমিতির দ্বারা 'কান্ত' 'সন কলেজ' পরিচালিত হইতেছে) অধ্যক্ষ এবং তাহার কার্য এখনও সক্রিয় করিয়া থাকেন। সরকারি কার্য হইতে অবসর লইয়া পুণ্য বাস করিতেছেন।

## ২। শ্রীযুক্ত সারু নারায়ণ গণেশ চন্দ্রাবারকর

(১) বিচারপতি (২) সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক (৩) বিদ্যাহরাদী। ইনি কতক অংশে আমাদের শ্রীযুক্ত ভানু আভতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা এক কালে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, একাধিকবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাইন্স চ্যান্সলার ও হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত ভানু চন্দ্রাবারকর দ্বারা

কালের অল্প প্রধান বিচারপতির কার্য করিয়াছেন; বম্বে হাইকোর্টের ইনি সর্ব-প্রথম বেনীয়ার প্রধান বিচারপতি।

হাইকোর্টের জজ হইবার অনতি পূর্বে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। যৌবনে বম্বে প্রদেশের সকল প্রকার বৈশ-হিত্তিক কার্যে অগ্রণী ছিলেন এবং এক সময়ে 'ইন্ডুপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। ঐ অকালে সকল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক কার্যে এবং প্রাচীন সমাজে ভক্ত্যের দ্বারা রান্নাক গোপাল ভাণ্ডারকারের পর ইনিই সর্বপ্রধান নেতা।

ইনি বিচার কার্য হইতে অবসর লইয়া ইন্দোর রান্নো বেগদানের কার্য করেন।

## ৩। শ্রীযুক্ত বাল কল্যাণর তিলক

(১) দেশহিতৈষী (২) রাজনৈতিক দলের নেতা (৩) সম্পাদক (৪) বিদ্বান (৫) পুণ্য-তত্ত্ববিদ। মহারাষ্ট্রে শিক্ষা বিভাগের বিষয়ে সর্বপ্রথম আন্দোলনকারীদিগের অগ্রদূত এবং 'নিউ ইংলিশ স্কুলের' (যাহার প্রসারে 'করগুসন্ কলেজ' স্থাপিত হয়) সংস্থাপকদিগের একজন। উত্তরকালে 'করগুসন্ কলেজ' গণিতের অধ্যাপকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন। শিক্ষকতার কার্য ত্যাগ করিয়া সংসার পত্র পরিচালনা কার্য গ্রহণ করেন এবং 'কেশরী' ও 'মারঠা' পত্রিকাভ্যেয় সম্পাদক হন। মহারাষ্ট্রে আধুনিক জাতীয় উদ্বোধনার এক জন সর্বপ্রধান প্রবর্তক। ইহার পরিচালনার 'কেশরী' পত্র মহারাষ্ট্রে বিশেষ কথ্য ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক দুই দলের মধ্যে এক দলের সর্ব প্রধান নেতা। রাজস্বোদ্যে উত্তেজক বলিয়া দুইবার ইহার রাজদণ্ড হয়।

অল্পদিন হইল রক্তবেশের প্রাচীন রাজধানী মাঝালায় হইতে দণ্ড ভোগ করিয়া পুণ্য নিম্নালায়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিনি ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বে স্থপতিত এবং ইহার "ঐবিক যুগের আবাসিগের ঘেক নিবাস" (Arctic Home of the Aryans of the Vedas.) নামক পুস্তক পাস্চাত্য বিদ্য সমাজে স্থপতিত। কারাগারে অবস্থানকালে ঐ পুস্তক এবং অস্ত্রাশ্র পাণ্ডিত্য-পূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে

(১) বেনাহিতৈষী (২) রাজনীতিবিদ  
(৩) অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ (৪) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য  
(৫) শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণের অব্যবহিত পরে ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সভ্য হইয়া বিশ বৎসর বাবৎ অতি অল্পবেতনে ঐ সমিতির কার্য, 'মিউ ইংলিশ স্কুলে' শিক্ষকতা ও "ক্যুরগুলন কলেজে" অধ্যাপকতা করেন। ঐ সমিতির সম্পাদকের ও কলেজের অধ্যাপকের কার্য অনেক কাল করেন। ইহার ইতিহাস ও অর্থ শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে খ্যাতি ছিল। আমাধের বেনে এক সময়ে পি ঘোষের পাণ্ডিগণিতের বৈদ্যপ প্রচলন ছিল বাকিভাবে ইহার পাণ্ডিগণিতের সেইরূপ আধিপত্য আছে।

রাজনীতি ও অর্থ শাস্ত্র বিষয়ে ইনি মহা-মতি রাণাডের প্রিয় শিষ্য এবং তাঁহার উপদেশমালায় 'সার্বজনিক' সভার সভ্যরূপে কিছুকাল ঐ সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। পুণা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। গত চতুর্দশ বৎসর বাবৎ

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। একবার কংগ্রেসের সভাপতি এবং কয়েক বৎসর বাবৎ ইহার অগ্রতম সম্পাদকের কার্য করিয়াছেন। জাতীয় রাজনৈতিক দুই দলের মধ্যে এক দলের একজন সর্বপ্রধান নেতা।

'সার্বজনিক কলেজের' কার্য হইতে অবসর লইয়া 'ভারত সেবক সমিতি' (Servants of India Society) সংস্থাপন করিয়া বেনে সেবার নিরত আছেন। বেনহিতকর কার্যের মন্ত্র পুনঃ পুনঃ ইংলণ্ডে এবং একবার দক্ষিণ আফ্রিকার গমন করেন। সমাজ চাকরি কমিশনের (Public Service Commission) সভ্যরূপে ইংলণ্ডে গমন করিয়া ছিলেন।

৫। শ্রীমতী রমাবাই রাণাড়ে

(১) বেনহিতৈষী (২) গ্রন্থকর্তা। শ্রীশিক্ষা বিস্তার ও শ্রীলোকদিগের হিতার্থে বিবিধ কার্যে উৎসাহবতী। "সেবা-মদন" নামক শ্রীশিক্ষা বিস্তার ও শ্রীলোকদিগকে সেবা দর্শে দীক্ষিত করিবার মন্ত্র স্থাপিত সমিতির নেত্রী। এই সমিতির পুণানগরস্থ শাখা ইহার নিজের বাগীতে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহার উন্নতি করে অনেক অর্থ দিয়াছেন, অনন্যাত্ত হইয়া চেষ্টা এবং অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। এই শাখা সমিতির কার্য বধাই নগরস্থ মূল সমিতির অপেক্ষা উত্তম। ইনি স্বীয় পরলোকগত পতি মহামতি রাণাডের জীবনী সম্বন্ধে একাধনি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছেন। শ্রীলোক-দিগের স্বত্বীয় সকল প্রকার হিতকর আচরণে অগ্রণী।

\* এই প্রবন্ধটি ভাণা হংকায় পর ইহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইল। ইহার সম্বন্ধে বারাক্ষরে অনেক কথা বলিবার ছিল।

## ৬। শ্রীমতী পণ্ডিতা রমাবাই

(১) লোকচিত্রতত্ত্বাবলম্বিনী (২) বিদূষী।

ইনি অল্পবয়সে বিধবা হইতা স্বীয় পিতার নিষেধ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বিদূষী হইয়া বেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। ইনি বহন কলিকাতায় আসেন সেই সময় সংস্কৃত কলেজে এক সতায় বাছালায় পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে অধ্যয়ন করেন এবং স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করেন। পরে ইনি আসাম অকলে গিয়া এক বাছালী হুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পতিয় বৃত্তায় পর পুটপুট গ্রহণ করেন এবং এক মাত্র শিশু কন্যাকে লইয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমন করেন। বেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুণা নগরে একটা বিধবা আশ্রম স্থাপন করেন। এখন এতদ্দেশীয় বৃত্তান বালিকাদিগের জন্য এক বৃহৎ অনাখ্যাজয়ের পরিচালনা করিতেছেন। এই আশ্রম পুণা হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। সেখানে প্রায় দুই হাজার বালিকা বাস করে। ইহার কন্যা, কুমারী মনোরমা জননীর কার্যের প্রধান সহায় এবং তাঁহার অধীনে কয়েকজন হুরোগীহান মহিলা কাৰ্য করেন।

## ৭। শ্রীযুক্ত ধোণ্ডো কেশব কার্ভে

(১) ত্রীশিকাবিতারনিত কন্দবীর।

(২) সহায় সংস্কারক। তাঁনি প্রথমে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটিতে' যোগ দেন এবং ঐ সমিতির সভ্যরূপে অতি অল্প বেতনে বিশ-বৎসর ধাবৎ সমিতির কার্য 'নিউ ইংলিশ স্কুলে' শিক্ষকের এবং 'কাণ্ড'গন কলেজের' অধ্যাপকের কার্য করেন। এই কার্য করিতে করিতেই বিধবাবিগের শিক্ষা দিবার জন্য "অনাথ বালিকা-আশ্রম" এবং কুমারীদিগের শিক্ষার জন্য, অন্নদিন হইল, "নিফাম কান্দমঠ"

স্থাপন করেন এবং উক্তদের পরিচালন করিতেছেন। এই কার্যে ইহার নিষ্ঠা আশ্চর্য-রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

ইনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকর্মের অগ্রতম এবং নিজের বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। ইনি নিরন্তরী ও অত্যন্ত বিনয়ী।

## ৮। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে

(১) গণিতশাস্ত্রজ্ঞ। (২) কলেজের অধ্যাপক।

বছাই বিশ্ববিদ্যালয় হটতে সম্মানের সচিব বি এন সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ভারতগবর্ণ-মেন্টের বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে শিক্ষালভ করিতে যান। সেখানে কেব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণিতের সর্কোপেক্ষা কর্ত্রি পরীক্ষা, Mathematical Triposএ সর্ক-প্রধান স্থান অধিকার করিয়া Senior Wrangler হন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু এই পরীক্ষার সর্ক-প্রথম উত্তীর্ণ হন। তিনি সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পরাঞ্জে ব্যতীত, এবং তাঁহার পরে মাত্র দুইজন ভারতবাসী এই পরীক্ষার সর্কপ্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন। এই পরীক্ষা এখন উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পরাঞ্জে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফেলোসীপ' প্রাপ্ত হন। বেশে কিরিয়া আসিয়া 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটির' সভ্যরূপে অতি অল্প বেতনে 'কাণ্ড'গন কলেজের' গণিতের অধ্যাপক হন। এখন ইনি ঐ কলেজের অধ্যাপক করিতেছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক এবং প্রাথমিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

৯। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ আপ্টে

(১) সাহিত্যিক, মহারাষ্ট্রের আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। ইনি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক বলিয়াই খ্যাত। ইহার উপন্যাস সকল মহারাষ্ট্রের সকলের নিকটই স্থপরিচিত, এবং প্রধানতঃ ইতিহাস ও সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। উপন্যাসের একগানি মাসিক পর সম্পাদন করেন। একবার মারাঠি সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পরীক্ষক এবং সম্রাতি মারাঠি

সাহিত্যের অধ্যাপক নিৰ্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি বাহলা ও দ্রাবীড় সাহিত্যে অভিজ্ঞ।

১০। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কানীন্যথ  
রাজবাবু

ঐতিহাসিক। ইনি প্রাচীন মারাঠি লিপির হটতে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রবৃত্ত্য-বিশ্ব বলিয়াও ইহার খ্যাতি আছে। মহারাষ্ট্রের “ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল” নামক সমিতির সঞ্চালকান্য কর্মী।

শ্রীঅমূল্যচরণ বহু।

## নাট্য-সাহিত্যে “অমরমঙ্গল”

(পূর্বাঙ্গবৃত্ত)

মহারাজা অমরসিংহ

(৪)

সেই গৃহদাহের পর মহারাজা অনেক কষ্টেই জানিতে পারিলেন। যুদ্ধের হইয়া বীরের সহচারিণী সেই বৃদ্ধা যত্নাকালে অল্পতাপ বশে মহারাজা মানসিংহের সমস্ত অয়োগই বলিয়া ফেলিল। মহারাজা জানিলেন—বীরা একতাপকে রাজসিংহের কস্তা নহে; কিন্তু বারাননা, রাজসিংহের কস্তা হলে তাঁহাকে জ্বলাইবার ভয় মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। ইহা তিনি বুঝিলেও বীরের সেই প্রণয়োগ্রাসিনী যুদ্ধা হৃদিত মধ্যে যে স্নেহভাও ও তাঁহার প্রাত নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে—বীরের দ্বারা তাঁহার কখন অনিষ্ট ঘটবে না। ব্যতীক বারাননা হইয়াও বীরা দাক্ষী পতিব্রতা রমণীর মতই নানাবিধ গুণে গৌরব-যুক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একজন রাজবাটীর সকলেই তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। মহা-

রাজী তাহাকে প্রিয়লবীর ভায়ে পাৰ্শ্বচারিণী করিয়া লইয়াছিলেন। বীরাও যে মহারাজাকে জ্বলাইতে আসিয়া আপনি মজিয়া গিয়া অল্পতাপে শুষ্কা—পরিজা হইয়া উঠিতেছিল, তাহাও সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারও মনের মধ্যে এই কথাই বাজিতেছিল—‘যে কিস্তি রাণাকে আপনার পরিচয় দেওয়া যায়।’ তাহার স্নেহ হইয়াছিল—যদি কোনরূপে মহারাজা, মানসিংহের চক্রান্তে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তখনই মানসিংহের ব্যাপার বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাকে তাহা বুঝাতে হইল না। যত্নাকালে সেই বৃদ্ধাই মহারাজাকে সব বুঝাইয়া দিল। বীরের পরিজ চরিত্র ও শেষ উদ্বেগ বলিতে জ্বলিল না। এই বৃদ্ধাই পূর্বে বীরের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যখন বুঝিল যে, তাহা দ্বারা মানসিংহের বিশেষ অনিষ্ট ঘটবে, তখন তাহার স্নেহ স্বসভা করিয়া মহারাজার পর্ণ-কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল।



কিন্তু পাণের কল কলিতে বিলম্ব ঘটিল না, সেই অগ্নিতেই বৃদ্ধ মরিল।

তারপর রাজ্যের চারিদিকে বড় বড় প্রাসাদ নিৰ্মিত হইতে লাগিল। মহারাণার অস্ত্র পুথক প্রভৃতি রক্ষা নিশ্চিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে বিলাস বাসনের চিত্রলম্বু ছুটিয়া উঠিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের সময়ে যে লম্বু নিয়ম বিদ্যবদ্ধ হইয়াছিল,—সেই সমস্ত উদ্ধৃতি প্রায় বোঁচু হইল। সেই পূর্ণ ভোজন, সেই পূর্ণকুটীরে বাস, সেই বিলাস-ভোগ বর্জন প্রভৃতি চিত্তের উদ্ধারের অগ্নিতে আরও হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল মহারাণা বিলাসী অসংঘমী হইয়া উঠিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া সুনীরা একদিন ত ভগবান্ একলিখনাথে প্রথান পুরোহিত মহারাণার উপর অত্যন্ত স্নেহ হইয়া উঠিলেন, একদিন নির্জনে মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাণা আর কি বলিবেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। সেই প্রাসাদ শ্রেণীর মধ্যে গুপ্ত পূর্ণকুটীরই যে তাঁহার আশ্রয়স্থল, সেই অনন্ত বিলাস বাসনের মধ্যে যে নিয়ম পরামর্শ, প্রতাপের প্রযুক্তিত ব্রত তাঁহারই অবলম্বন, তাহা পুরোহিত বুঝিয়া হর্ষে পুলকিত হইলেন। শুকনিলে অমরসিংহকে এই কপটচারণ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যকথা—দেশরক্ষা—সামন্ত-দের আদেশ ভাব্য এই কপটচারণও তিনি করিতেন না; কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন—“ইহাই বর্ষাকার একমাত্র পথ।” তাই অমরসিংহ ইহা গ্রহণ করিতে যিধা বোধ করেন নাই। এই ব্যাপারে অমরসিংহের গুরুত্বও বেশ বুঝা যায়।

এই ঘটনায় আমরা বুঝিতে পারি যে অমর-

সিংহের ইতিহাসকে চরিত্র কল্পিতার মধ্যে বাস্তবিকতা কিছু নাই। গ্রন্থকার ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অমরসিংহের উদ্দেশ্য অশুদ্ধ। এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া সামন্তেরা কেন, সাধারণ সকলেই অমরসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক উপরোক্ত ব্যাপারটি আমরা নাটকের তৃতীয়াঙ্কের বিস্তৃত ও অন্ত্যায় কয়েক স্থল হইতে বুঝিতে পারি।

এদিকে মানসিংহ যেখানে আসিয়া মহারাণীর কোণলে শিক্তিত শুকপক্ষীর মুখ-নিঃসৃত,—

“স্বর্ধাংশাবতঃ সত্ৰীবাশ্যামান্ কুলোত্তমঃ।

নাগানি জবনভালপঙ্ক্তিস্থা ভোক্তৃর্মুহুতিঃ।”

অর্থাৎ স্বর্ধাংশের কুন্তলবস্ত্র সত্ৰীবাশ্যামান রাজবংশে উপর প্রত্যাপ শিক্ত কদাপি জবন-ভালক মানসিংহের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আর ভোজন করিতে পারেন না। এই কথা যেখানে সেখানে সুনীরা মহারাণা হইয়া উঠিলেন। তারপরই আবার রাজপুরোহিতের গালি কাইয়া মহা উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—

কুর্কোদিত্তাশপায়াঃ কুন্তলমলতঃ তৎ

প্রত্যাপকং পুত্রং

কুন্তলং বাশ্যামবায়ং বিগতকুলমিদং

ধ্বংসীকৃত্যং কৰোমি।

বীরপাণ ৫৩শতকপ্রভৃতি কুলত্বাৎ

ছিন্নমুণ্ডাবলীভিঃ

বাপ্তা মেবারকুমি মম লম্বন সমনোক্তিতা

ক্রোধবেগম্।”

(অর্থাৎ সেই গর্কোদ্ভূত প্রত্যাপ পুত্রকে দিল্লীশ্বরের চরণপদে নত করিব, লম্বন বাশ্যাম-বংশের কুলগৌরব হীন ও বর্ধা ধ্বংস করিব।

৫৩ এবং শত বংশের ছিন্নমুণ্ডসমূহারা

বাগ্মা যেবার ভূমি হমবৎ আমর ক্রোধের  
বেগ অহুভব করিবে।” প্রতিজ্ঞাকৃত্য কোন  
কল সিদ্ধ হউক বা না হউক মানসিংহের  
প্রয়োগনৈপুণ্য সমস্ত নাটকের মধ্যেই অহুভব  
করা যায়। মানসিংহের চরিত্র বিভাগের  
সময় আমরা এ বিষয় বিস্তারিত বলিব।  
প্রতিপক্ষ তুর্কল হটলে নাহক চৌন হটয়া  
পড়েন, প্রতিপক্ষকে অভ্যস্ত নগণা করিয়া  
নাহককে উদ্ধ করিলে সেই উদ্ধতা হ্রস্বস্পর্শ  
করে না। এমনকি একদিকে যেমন অমর  
সিংহকে উদ্ধ করিয়া গড়া হইয়াছে, অপর  
দিকে তেমনি মানসিংহকে তাহার ধোয়া  
প্রতিপক্ষ করা হইয়াছে। এইজন্য আমরা  
যাত্রাপ্রতিষাভবলে অমর সিংহের উদ্ধতা  
বেশ অহুভব করিতে পারি। যাউক  
সেকথা।

তারপর মানসিংহ যেবারের বৃত্তান্ত বৃদ্ধি,  
শুশ্রূচরদিগের সহিত কথাবার্তা করিয়া  
চিত্তের নগরে বক্ষা স্থানসমূহ দেখিয়া সেনা-  
পতিকে বখাযোগা উপদেশ দিয়া প্রেরণ  
করিলেন। ইতার পর আর মানসিংহকে  
যেবারে আসিতে হয় নাই। সকলেই বৃদ্ধি  
যেবাগক্রমণের বিলম্ব নাই। মহারাণারও  
অতীষ্টসিদ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল। সামন্তেরাও  
দেখিল উপায় নাই। তাহারাও তখন হুঁ  
করিতে সম্মত হইল। এই সম্মত দেখিয়া  
তিনি একদিন মহারাণা দেবীকে বলিলেন।  
“প্রিয়ে !

কলক বুদ্ধিঃ নশলাহনসা

ভেজোবিত্ত্বিঃ ক্রমশো যানক্তি ।

মযাপি বোহঃ যান প্রবাহে।

রিপুক্ষয়ৈব সমাং যুক্তি ।”

অর্থাৎ চন্ডের কলক বে পরিমাণে বুদ্ধি  
পাচ, সেই পরিমাণেই সঙ্গে সঙ্গে ভেজোবুদ্ধি

পায়। আমারও এই বে যানপ্রবাহ, তাহাও  
রিপুক্ষয়ের নিমিত্ত আমাকে উদ্ধ করিয়া  
তুলিতেছে। তাহার এই বে—আমারও  
ভেজবুদ্ধি হইয়াছে, আমিও প্রক্ষয় করিতে  
পারিব।”

রাজার এই চন্দ্রবাসিন্তা বর্ণনে বিদ্যুৎ  
মানসিংহও দিল্লীর যেমন স্বেদোৎপত্তি  
মেবারাক্রমণের জন্য অভিযান করিলেন,  
ওজন সামন্তেরাও রাজার সঙ্গে মিলিত হইয়া  
হুঁ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাজার  
একবাসনে সামন্তদের নিত্রা ভাঙ্গিল, দেশের  
মধ্যেও একটা লাভা পড়িয়া গেল। তাই  
রাজা বলিতেছেন,—“রিপুক্ষয়ৈব সমাং  
যুক্তি।”

এদিকে হস্তচাগিনী বীরার কথাও কি  
রাজার মনে পড়ে না ? পড়ে বৈকি ? করি  
কৌশলে এই বলে আবার বীরাকে আনিয়া  
ফেলিচাছেন। এস পার্থক্য রাজার অবস্থাটা  
দেখা বাউক। পূর্বে আমরা বীরাকে রাজ-  
কন্যা বলিয়া জানিয়াছি। রাজাও তাহাট  
জানিয়াছেন। এখন তিনি তাহাকে বারাকনা  
বলিয়া জানেন। এত অবস্থা পরিবর্তনে  
তাঁহার চিন্তের অবস্থাটা কিন্তু, তাহা বৃষ্টিতে  
কতি কি ?

তখন বীরা আপন মনে গান গাহিতে  
ছিল,—

“ন স্থং কামেন স্থং বিধয়ে

স্থমিহ কেবল মমলে হ্রদয়ে ।

পরমপতির্মম ভবতু প্রণয়ঃ

পরমপতির্মম ভবতু প্রণয়ে ।

পরমপতির্মম ভবতু প্রণয়ঃ

পরমপতির্মম ভবতু প্রণয়ে ।

এই পান সুরলব সত্কারে ভাবে বিভোর  
হইয়া বীরা পাঠিতেছিল। রাজা অন্তরালে  
দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে  
বীহার সেই ব্যাধনামুগ্ধি তিরোহিত হইয়া  
যেহুমুগ্ধির মতই বৃষ্টি হুটিয়া উঠিতেছিল।  
ভাববিভক্ত প্রেমোন্মাদিনী বীরা সত্যই বৃষ্টি  
যেহী। তাহার প্রেমে কানুন্ন নাই, রূপে  
আনন্দি নাই, মনে ভোগলিপ্সা নাই, কাম-  
পঙ্কণী এই প্রেম একদিকে যেমন অত্যাগ,  
অন্তরিকে আবার তেমনিই নীরব। রাজাকে  
তখন তাহার প্রয়োজন নাই। স্মৃতি তাহার  
ধ্বংস নাই, সে আপনাত ভাবে আপনিত  
বিভোরা। তাহার দ্বন্দ্ব বিষল, প্রেম অমল,  
তাগার ত্রিবিধ দুঃখ হুৎ অন্তরেই বর্তমান।  
একবার তাহার কামনা প্রেম। প্রেমই  
তাগার একমাত্র আশ্রয়, প্রেমই তাহার  
জীবনের প্রতি, প্রেমই তাগার জীবনের রতি  
এমনি ভাবেই সে প্রেমের মধ্যে ব্যক্তিরা  
উঠিয়া আত্ম মহারসী হইয়া উঠিয়াছে।  
ব্যাধনামুগ্ধা হইতে পারে, সমাজের পরি-  
তাক্ষ হইতে পারে, কিন্তু সে কি কখনও  
পরিভ্রা হইতে পারে না? লোকের চক্ষে সে  
অশ্লীল্য থাকিলেও সমাজের সম্মুখে সে  
পতিতা থাকিলেও তাহার যে একটা আশ্রয়  
আছে, তাহারও যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহারও  
শুদ্ধির উপায় আছে, একথা কি কেহ  
অস্বীকার করিতে পারেন? তাই শাস্ত্র-  
ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হতে পতিতা ও  
মহারসী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া  
পতিতা চরিত্রযোগ্যতা যেহী হইলেও  
তাগাকে যে ধরিয়া আনিয়া লক্ষ্য রমণীর  
স্বাভাবিক অধিকারে অধিকারিনী করিতে  
হইবে, ইহার পক্ষপাতী আমরা নহি।

মহারাণার পার্শ্বে রাণীও দাঁড়াইয়াছিলেন,

বীহার পান ভরিয়া রাণী তাহার প্রশংসা  
করিয়া উঠিলেন।

মহারাণা বলিলেন,—“প্রিয়ে! ইহমণি  
স্বদেশ্যপরিচয়ম্বেব নিবেদ্যত। কথমন্তথা  
ব্যাধনামুগ্ধা এতদূর্ণী ভাবপরিভুক্তিঃ সত্ত্বতি!  
বুদ্ধঃ বলাচিবুদ্ধমতিবুদ্ধৈঃ “নন্দগর্ভা দোষ-  
স্তপাতবজ্জীতি”।

এই কথা শ্রাব্যই বুঝা যায় যে রাণী বীরাকে  
বেশ ব্রুতিতে পরিচয়ছেন, আরও বুঝা যায়  
রাণী তাহার চরিত্রে সন্তোষান। এই সংক্ষিপ্ত  
উত্তরে রাণীর অবস্থাপ প্রশংসিত না হইলেও  
আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, পূর্বে রাজার  
মোহমগ্নিত যে আনন্দি ছিল, তাহার ক্ষত  
তিনি দ্বন্দ্বের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারায়ে  
বসিয়াছিলেন, দিন দিন দ্বাতপ্রতিদ্বাতে  
দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়াও সম্পূর্ণ দ্বন্দ্ব  
হইতে পারেন নাই। যে মোহমগ্নিতে তাহার  
অসৌখ্য—অপার গাভীরা—নিষ্কলত চরিত্র  
দ্বন্দ্ব হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা  
একদম কাটিয়া গিয়াছে; বীহার অবস্থার  
পরিবর্তনও যে এই মোহমগ্নীকরণের হেতু  
তাঁহাও নিশ্চয়, তথাপি একদমে একবারিতে  
বাস করিয়া, সর্ববিধ আধীন, কামতার অধীন  
হইয়া, বোড়নী হুগ্ধী নারীর দ্বন্দ্বের আরাধ্য  
হইয়া কে কবে লালসা ত্যাগ করিতে পারে?  
প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন সহজ ব্যাপার  
নহে। যে পারে সেই মহান্।—আজও  
অমরনিংহ বীহার অনলসারী অমরাগোষাতে  
ভাসিয়া যান্ নাই। বৃষ্টি দ্বন্দ্বের কোণে  
চেউও লাগে নাই তাই বলিতেছিলাম, অমর-  
নিংহ ‘মহতো মহারান্’।

তারপর অমর সিংহের গুরুভক্তি ও দেব-  
ভক্তিও কম নহে। এই ভক্তিযোতে তিনি  
মহাই নত। অহংকার নাই, অতিমান নাই

কষ্ট স্ববেশে নাই, সমস্তই ভগবানে সমর্পিত ।  
তাই তাঁহার মুখেই শুনিতে পাই—

“ৎ দেবানবিনতি নৈবমুন্যো নোবা

বিদিয়েচ্চরি-

র্ষদোজনাতিরোমকূপ নিকরে

ত্রয়াণ্ডেকাটিঃসলা ।

যো বাণাময় বিরণেহপাবিতথো মায়োজ্বিতো

মায়িকঃ

সর্কান্ধ্যময়ঃ সনঃ পশুপতিঃ শ্রীভো-

গুরোরশিবা ৷”

অর্থাৎ ‘ঐহাকে দেবতার। বৃষ্টিতে পারেন না, মূনিরাও পারেন না, ব্রহ্মা চরিত্র পারেন নাই, ঐহা হার রোমকূপের মধ্যে কোটিব্রহ্মাও অহনিশ স্নানমান, বিনি মাতামহশরীরী, কিন্তু সত্য, মাতাচার্য। পরিত্যক্ত অথচ মায়িক, এইরূপ সর্কান্ধ্যময় পশুপতি গুরুর আশীর্বাদে আজ আমার প্রতি প্রসন্ন ।’ উরু স্রোকের মধ্যে ঐশ্বর সযত্নে যে দার্শনিক দিচ্ছাত্ত প্রকট হইয়াছে, তাহা বৃষ্টিপূজার পরিপন্থিত্ব একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ? হিন্দু কোন দিন পৌত্তলিক নহে। তাই রাজা অমরসিংহ একলিঙ্গ মহাদেবের বৃষ্টির মধ্যে বিশ্বরূপের প্রতীক্ষা করিয়াছেন ।

(৫)

আজ সামন্তেরা রাজার দর্শন কামনা করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন । রাজা বিলাস হৃদে উপস্থিত । অমরসিংহ প্রমুখ মানসিদের আরও দুই চারিজন গুচ চর যজ্ঞভাবে দেখানে উপস্থিত । দুই চারিজন চাটুকারও উপস্থিত । মহারাণা অমরসিংহের বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত আছেন । তিনি এতদিন স্বেযোগ অবশেষ করিতেছিলেন । তাই তাহাকে কিছু বলেন নাই । সমরসিংহের ব্যবহারে তিনি যনে যনে কেবল হাস্য করেন । আজও সমরসিংহ সামন্তদের বিকছে

গুই চারিটা কথা বলিয়া ফেলিল । রাণাও উপেক্ষা করিলেন ।

এমন সময়ে একজন চাটুকার বলিল,  
“মহারাজ ! বাজে কথা ছাড়িয়া দিউন ।  
স্বয়ং ত্যাগ করিয়া তৎপ তত্ত্বনা করিবেন না ।”  
আর একজন চাটুকার সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিল,—

“বৃষ্টি-মুখ-মণ্ডলঃ কনকময়-কুণ্ডলঃ

ভাগ্যবতি মম জঘনবাসঃ ।

চলনলিন লোচনঃ তরুণজনকোচনঃ

ভাববতি মন্থর বিলাসঃ ৷”

এমন সময়ে মেঘধো কই শব্দে উজ্জ্বলিত হইল,—

“বা পেনলা পুলিন জুমিরশেষশোভা

দেবপ্রত্যাপ নৃপতন্তরপাথ পূতা ।

দেইশক মঙ্গল কথা মুখরা পুরাসীং

সা কামসীত মলিনায়া বাটাব্ বিততি ৷”

যে ‘পেনলা’ হ্রদের পুলিনজুমি শেষে পোড়ায় অলসত, যে স্থান দেব প্রত্যাপসিংহের চরণ চিহ্নে পবিত্র, যে জুমি একদিন দেশের মঙ্গল কথাও মুখর ছিল, সেই পবিত্র জুমি আজ কামকলুধ সীতধনিতে মলিন হইয়া কতগুলি বিলাসী বিটের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে—সামন্তেরা ইহা চিন্তা করিতেও অক্ষম ।

রাজা শুনিয়া স্বগত বলিতেছেন—“হে সামন্তগণ ! তোমাদের আচরণই এই পরিবর্তনের মূল । কিন্তু পরিবর্তন হইল কাহার ! ভাবের না চরিত্রের ? সামন্তেরা বৃষ্টিদাছিল চরিত্রের ! তাই মুখে মানিয়া লইয়া রাজা তাহাদের পরীকার অস্ত্র আবার বলিতেছেন,—

“তো তো সামন্তাঃ । কথমনবসরে শ্রীমতা-  
মজ্ঞাপননং ৷”

সেকথা শুনিয়া শালুহুপতি বলিতেছেন—

“বেব! নাথমনবানবোহ্মরাগমননা, যতঃ—  
স্বমেকঃ স্বাবীনো মরপতিরপি কত্রিগকুলে  
স্বমেকঃ সর্কোবাঃ নিগমপথ তাত্য প্রভবদি।  
পবিত্রা দেবারকিত্তিরপি চ তে মূলপুত্রাং  
ইমাং খ্যাতিং হস্তং তব, জবন রাজো  
ব্যবসিতঃ।”

এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই, রাজা  
অবজায় বলিলেন,—“শালুহুপতি! তাহার।  
চিরকালই এইরূপ করিতেছে, অতএব আমার  
শাস্তিভঙ্কের প্রয়োজন নাই।” সকলে হুঁশিল  
রাজা প্রকৃতই বিলাসী, পুনর্বার শালুহুপতি  
লক্ষ্যতনয় তপসিংহ এবং বাম্বাঠাছুর অনেক  
উগ্র কথা শুনাইলেন। পূর্বের সেই নিশ্চেষ্ট  
সামন্তেরা আর নাই। এক্ষণে তাগদের  
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। দেশের যৌবন,  
বংশের মান মর্যাদা, আর্জের রক্ষা, বীৰ্য্যোচিত  
বশঃ সমস্তই এক্ষণে তাগাদের উপর নির্ভর।  
তাহারা কি আর চূপ করিয়া থাকিতে পারে?  
বাম্বাঠাছুর যখন শেষে তাঁর ভাবায় বলিলেন—

“দুগতে! তবৈব পুরতো কুলাঙ্গণ

জবনৈবলেন দ্রুত-ধর্ম-সম্পদঃ।

তবিত্যব এব তদ্বোহো মহিষ্যে

স্বর বিগ্রহাংচরণ মর্দিতানিবঃ।”

তখন তাহা শুনিয়া রাজার বুকটা জ্বালা  
করিয়া উঠিল। অহনিশঃ! এইকথাই তিনি  
ভাবিতেন। আজ সামন্তদের মুখে নিজের  
প্রাণের কথা, নিজের রক্তের অস্বস্তি আচরণের  
আবেগ তাহাদের মুখিতে পারিয়া তিনি  
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখনও  
পরীক্ষা শেষ হয় নাই। চূপ করিয়া শালুহু-  
পতির অভিশ্রাব জানিবার জন্য উদ্গীৰ  
হইলেন।

তারপর শালুহুপতি রাজাকে হীনবীর্য্য,

প্রণয়হীন, দেশের কার্যে জরহীন বলিয়া  
ভিত্তিকার করিলেন। রাজাও তুলিলেন।  
এইরূপ উজ্জ্বল সমুদ্রের মধ্যে রাজার জ্বরহতাব  
প্রকাশের জন্য মধ্যে মধ্যে বগত প্রত্যুজ্জি  
নিবেশ আছে—তাহা দ্বারা এই সমস্ত ঘটন  
পরস্পরায় রাজার প্রাণটা কেমন আকুল  
হইয়া উঠিতেছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।  
কিন্তু সামন্তেরা তাহা কিরূপে পারিবে?

এমন সময়ে সমরসিংহ অবসর পাইলেন,  
ভাবিলেন, রাজাও নীরব, নিশ্চেষ্ট, বিলাসী,  
সামন্তদের কথায় নিশ্চয় বিরক্ত হইতেছেন,  
অতএব এই সময়ে অন্তর্ভেদ অস্ত্রাটীয়া দেওয়া  
যাক। তখন শালুহুপতিকৈ বলিলেন—

“বেধুন চিত্তার প্রয়োজন নাই? দিল্লী-  
ধরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া একটা কর দিতে  
আপত্তি কি? আশ্রয়কর অপেক্ষা এইরূপে  
আশ্রয়কাই শ্রেয়ঃ।”

এই কথা শুনিয়া মহারাণা ক্রোধে অগিয়া  
উঠিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার  
বগত উজ্জ্বল গুহর,—

“মঃ হুরাশ্বন্! এবং ক্রবতন্তে ন বিদীর্ঘ  
সহস্রধারসনয়াঃ।”

লম্বা সিংহের এই কথা রাজার প্রাণে  
কিছুপ আঘাত করিল—তাহা কেহই বুঝিল  
না। কিন্তু এই কথায় দুইটা ফল কলিল—  
লম্বা সিংহের দুর্জীব আসর হইয়া উঠিল,  
সঙ্গে সঙ্গে সামন্তদেরও পরীক্ষা শেষ হইল।

শালুহুপতি বলিতেছেন,—

“অরে! কপট কজুক! কিছুচোতে করমদী-  
কৃতোতি, আঃ পাপ। কৃত্য। চণ্ডাল।

কতং বহুঃ কিমুহুরপতে নাপতনু মুচ্ছ

ইত্তে।

বুঝাএত্যা কিমু বহুদতী স্বাং বি বরাগ্রসিঃ।

বৃদ্ধ: কিবা সকল ভগতামীর: সৰ্জনাকী  
বস্ত্রে দণ্ডং ন ধনু বিবধে তৎক্ষণাৎ ঘোর  
রূপং।”

অর্থাৎ অরণ্যভিত্তি বস্ত্র কি ধাতু হইয়া  
গিয়াছে? তোর মথকে যে পড়িল না?  
বহুমতী কি মৃত্যুপ্রাপ্ত? তো'কে যে গ্রাস  
করিলেন না? ভগতের কর্ত্তা সৰ্জনাকী  
ঈশ্বর আজ কি হস্ত? যখন তুই কর দানের  
কথা বলিলি তৎক্ষণাৎ তিনি তোকে কেন  
ভয়ঙ্কর দণ্ডমান করিলেন না?

অভিমানী শালুগ্রাপতি দেখিলেন, সময়  
সিংহের কথাই রাজা নিশ্চয়, নও ত মিলেনই  
না, পরন্তু যেন সময় সিংহের বাক্যে সম্মত!  
তিনি রাজার জবাব আনেন না, তাই ভাবি-  
লেন, কে আর নও দিবে? তাই তাঁহার  
ভগবানের উপর নির্ভর। কিন্তু ভগবানও  
নীরব। তাই পরকণ্ঠেই তিনি ভাবিলেন—  
'আমিই নও দিব' আশ্রয়ত 'সাক্ষাৎ প্রত্যাপা-  
জ্ঞ' আমাঘের ভয় কি?

গোষ্ঠার বাসীরা কুণ্ডের আর সঙ্ঘ হইল না।  
তিনি শালুগ্রাপতি প্রভৃতির ইতস্ততঃ  
দেখিয়া স্বয়ং—

“ভংগাবাহতি পাতিতস্ত বনং বধনু মুখঃ”  
হুট্টিয়ে।

ডাক্ জৌনিরূপদানজনন ইব প্রাপ্যনু  
হরামোঘতে।”

বলিয়া জগদনন্দনের প্রাপ্যবরণে অস্বাভাব্য  
কীর্ষি অবলম্বনে দাবিত হইলেন। তুই  
একবার হানাহানির পর সময়সিংহকে ধরিয়া  
কেলিলেন। সময় সিংহের আশা ছিল,  
রাজা সহায় হইবেন, কিন্তু রাজা সময় সিংহের  
মুখে ধর্ম্মের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হালিয়া বগত  
ভিরঙ্কর করিয়া—গৃহ যথাস্থ বৃহদর্পণে মুখ  
বর্নন করিতে উঠিলেন। তাঁহার এই

উপেক্ষা কাহার সঙ্ঘ হইল না। সকলে  
ভাবিল হায়! রাজা এমন নিবীৰ্য্য!

শালুগ্রাপতি তখন সিংগবিন্দু জ্ঞানমুগ্ধ  
হইয়া হস্তমুগ্ধ বৃহৎ বস্ত্রের দ্বারা বর্নন থানা  
চূর্ণ করিয়া দিলেন! বর্নন ভাঙার কারণটা  
তখন,—

“রে বর্নন! স্বমসি নিখল বাহুমুষ্টি:  
অন্তনিতান্ত মলিনং তু ভবান্য বিপ্রঃ।  
যত্রাজ নাম বিদিতং কুলকঙ্কণাং  
এনং দখালি জবয়ে পণিকেষ বস্ত্রাং।”

অর্থাৎ রে বর্নন! তোর বাহুমুষ্টি বড়ই  
নিখল! কিন্তু আজ মুষ্টিতেছি তোর অন্তর  
নিতান্ত মলিন। তাহা না হইলে এই রাজার  
নামে পরিচিত কুলের কঙ্কণ বস্ত্র ব্যক্তির  
প্রতিমুষ্টি পণিকার দ্বারা বস্ত্রপূর্ণ জবয়ে ধারণ  
করিয়া রহিবাছি—অতএব তোর দণ্ডই  
জ্যেষ্ঠ:। বর্ননের কোন অপরাধ থাকুক বা  
না থাকুক রাজা যে আজ ‘কুলকঙ্কণাং’  
বর্ননের শাসনে রাজারও শাসন হইল কি?  
শালুগ্রাপতি হুঙ্কার হইল না। রাজা তখনও  
কথা কহিলেন না। শালুগ্রাপতির আর  
সঙ্ঘ হইল না। তিনি সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ  
সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে, কিন্তু রাজা  
তখনও নীরব! তখন কোথায় উত্তেজিত হইয়া  
অত্যন্ত হুট্ট কথা বলিতে লাগিলেন। রাজাকে  
গালি দিলেন, প্রতাপ চরিত্র জ্বলনা করিয়া  
রাজার অপকথ দেখাইয়া দিলেন। প্রতাপের  
আগনে একজন ভীককে উপবিষ্ট দেখিয়া হুঙ্কার  
হইয়া উঠিলেন। ইচ্ছাসন অপেক্ষা যে আগন  
তাঁহাদের নিকট জ্যেষ্ঠ, বাহা তাঁহাদের কত  
আগরের, কত সম্মানের, কত পূজার, সেই  
আগনে ‘আজ একজন ভীক? হি! হি! হি!।  
তিনি কোতো, রোষে জ্ঞান হারা হইয়া বলিয়া  
কেলিলেন,—“এই ভীক যদি জীবনকরে না

বা—তবে ইহার সিংহাসন কাড়িয়া লওয়া হউক।

মহারাজাও দেখিলেন,—এট স্বযোগ। বলিলেন “শালুখাপতি! সতাই বলিচ্ছাছ, আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যতদিন যখন বাহিনী আমার শত্রুবাতে বিপ্রান্ত হইয়া এই দেশ হইতে পলায়ন না করে, আমিও যতদিন চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিতেছি—ততদিন পিতার আদেশ ম্পর্শ করিব না।”

তার পর আর কি! তিনি বিলাস বেশ ধুলিয়া কেলিলেন। রাজার বীরযুগ্মি সকলের সম্মুখে বাহির হইয়া পড়িল। বিলাস বেশান্তগুচ্ছ খড়গ বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—

“হে খড়গরাজ! অনেকে ধৃতোহসি নিত্যং  
তৎসদ্বিত্ত্বমপি নাপহিত্য। ত্রিপূনাং  
নিকোষ এব ভরবোহসি দুঃসামোহসি  
‘তন্নিহিব অবি দৃঢ়া মম তস্তিরতঃ।’

পিতার নিকট তাঁহার এই খড়গভক্তি অত্যন্ত। এই খড়গ তাঁহার দৃঢ় ভক্তিত আচ্ছিন্ন নুতন করিয়া যেতিনি এই ভক্তি দেখাইতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সামন্তেরা দেখুক—তাহারা শিক ককক—তাহারা অহুতব ককক প্রতাপ-পুত্র পিতার আদর্শ অধ্যাপি কুলে নাই, পিতার পুণ্যমরীমুখিত তিনি কেমন অহনিশ বৃক করিয়া রহিয়াছেন—তাহাই আজ খড়গভক্তির ছলে সামন্তদের মোহনিত্রা দ্রষ্টকরণ মন্ত্র প্রকাশ করিতেছেন। প্রকারান্তরে সামন্তদের উৎসাহ বৃদ্ধিও যে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই তাহা নহে। তারপর পূর্ণাপর সামন্তদের ব্যবহার স্বরণ করিয়া—তাঁহার ত্রুতের সম্পূর্ণ অঙ্গরণে পূর্ণ মত্ততগ মনে করিয়া একটু অভিমানভরেই আবার বলিতেছেন

“উদগ্যারতা,—

সামন্তা মদহুত্রতা রণভুবং গচ্ছত তিষ্ঠত বা -

পৌরা মে সমরাস্থপালন বিধিং বাহুত

সেচ্ছত বা।

সৈন্তং কিকন সামন্তত্রস্ত বা মা বা

তথাপ্যাস্তনা

বাবজ্ঞীব মহং ধৃতোহসি সময়ে সাক্ষী

ভবন্তীশ্বরঃ।”

প্রতাপসিংহের মতই প্রতিজ্ঞা, সামন্তেরা আমার অহুগত হউক বা না হউক, পৌরবর্গ আমার নিয়ম সমুৎপালন ককক বা না ককক, সৈন্তেরা আমার অঙ্গরণ ককক বা না ককক যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আমার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিব না এই ত্রুতে লেখর সাক্ষী হউন।

সামন্তেরা শু বিশ্বসে অবাক হইয়া গেল, কোথায় বিলাসী রাজা, আর কোথায় এই বীরযুগ্মি! তাহাদের পূর্ক ব্যবহারের প্রতি মহারাজার আবার তীব্র কটাক, তাহাদিগকে একেবারে অবনত করিয়া ফেলিল। লজ্জায়, কোড়ে, তাহারা মরমে মরিয়া গেল। এক মুহূর্তে এমন হইবে কে জানে? আজ যেন তাহাদের সম্মুখে প্রতাপসিংহ স্বর্ণ হইতে নামিয়া আসিয়া অমরসিংহের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা তখন সকলে এক-বাক্যে বলিল,—“মহারাজ! আমরাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সর্কথা আপনার ত্রুতাবলম্বন করিব।” তখন সকলে একভাবে বিতোর, এক চিত্তার উন্নত, তাহারা শ্রষ্টই ত্রুনিতে পাইল যেন আকাশে দুম্বুভিধনি থাকিয়া থাকিয়া বাজিতেছে। এই দুম্বুভিধনি তাহারা প্রতাপসিংহের আশীর্কাদের মতই গ্রহণ করিয়া অধ্বনি করিয়া উঠিল।

তারপর মহারাজার আদেশে সমরসিংহ

কারাগারে নীত হইল। তখনই ও ব্যাক্তাঙ্কর বখাযোগ উপদেশ পাইয়া প্রস্থান করিল। পরে মহারাণা শালুগ্রামপতিকে হৃৎকর আয়োজনাদির কথা বলিয়া সেনা সফারের উপায় নির্দেশ করিলেন। এই ঘটনায় আমরা অমরসিংহকে বাস্তবিক বড়ই মনোহর দেখি, কোথায়ও চরিত্র ক্ষুদ্র হয় নাই, কোথায়ও একটু কালিমা পড়ে নাই। একদিকে যেমন ইতিহাসের সঙ্গে মূল ঘটনাস্থল সামঞ্জস্য রাখা হইয়াছে অপরদিকে তেমনি অমর চরিত্র উন্নতও হইয়া উঠিয়াছে। সামন্তদের পূর্ক চরিত্র একটু ইতিহাসের হিসাবে ক্ষুদ্র করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নায়ককে উন্নত করিতে হইলে অপর অঙ্গের যদি আংশিক হানিও হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, অপর অঙ্গ উৎকৃষ্ট করিয়া নাটকের বাহ্য প্রাণ—সেই প্রধান নায়কের চরিত্র হীন করা কদাপি কর্তব্য নহে।

আরও একটা কথা বলা আবশ্যক, এই নাটক বীররসাস্রিত, বীররসের প্রধান আশ্রয় নায়ক, রসের পরিপুষ্টির নিমিত্ত নায়ককে উৎকৃষ্ট করা চাই, নচেৎ বীররস ভাল জন্মে না। বিশেষতঃ নাটকে যখন ধীরোদাত্ত নায়কের আবশ্যক তখন নায়ক কাপুরুষ হইলে বীররস ঘাটি হইয়া যায়। অন্যস্তম্ভাধা, কমা, গাজীর্থা, মহাসম্ভ, বিনয়াজ্বর গর্ক এবং দৃঢ়তাবলখন প্রভৃতি প্রধান গুণগুলি ধীরোদাত্ত পাত্রেরই থাকে। এই দৃঢ় এতল বীররসের প্রধান অবলম্বনও বটে। বাহ্য হউক অমর মঙ্গলের চতুর্থাঙ্ক এইখানেই শেষ। অবশিষ্ট আর চারি অঙ্কের মধ্যে মহারাণা আরও উজ্জল।

দেবীর রণক্ষেত্রে অমরসিংহের সহিত দিল্লী-বরের সেনানীগণের হৃৎকর কথা ইতিহাস

বিস্তৃত। মানসিংহের পরামর্শে—দিল্লী-বরের অগণিত বাহিনী তথায় উপস্থিত। অস্তপাল দুর্গ-সদ্বিধার পরিমার্গের বাস্তবায়নে অমর-সিংহের শক্তিত্রিভঙ্গসেনা সজ্জিত, দক্ষিণ গিরিমার্গে তান বহু সৈন্যগণের সহিত বর্ধমান। গিরিমার্গের সম্মুখে বিরাট বহন-বাহিনী। অমরসিংহের অধিগ্রহণ উত্তর পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষকে টিপিয়া মারিবেন। বাস্তবিক তাহার এই উদ্যোগ প্রাতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কোথায় ভাবিয়াছিল—বিলম্বী অমরসিংহের হৃৎকর সজ্জা আরম্ভ হইতে না হইতে একদল মেবারের সিংহ উপস্থিত হইবে, তাহা না হইয়া একি? কিন্তু তাহার হটিবার নহে। অগণিত সৈন্য ও অসাধ্য অস্ত্রপক্ষে সজ্জিত তাহাদের বাহিনী অপরাধের—ইহাই ভরণ।

তারপর ভীষণ হৃৎকর বাধিয়া গেল। এই হৃৎকর বর্ণনার কবি যে তাহা কামান গর্জন-ধ্বনির বহর বেধাইয়াছেন, তাহা অপূর্ণ। যথা,—

“সিঙ্ঘে: কলোল-কোলাহল-বহল-চলঘটি-

বেলাতিঘাত—

হ্রাসস্তকারি সেনা কলকল-সময়া তোড়-

নবোপমবিধি।—

প্রত্যজ্ঞাভোদ—নির্ঘোষতপত-কুলিগোদ-

গর্জনােকোপ বীধ্য

শব্দদ্বায়া পূর্ণবোয়ী শ্রুগদবিষমহো ভ্রমতে

লোভতেহি।”

সমুজ্জের কলোল কোলাহল, হৃৎকরবোয়ী ভীমনিদ্রা, এবং মেঘনিঃসৃত শত শত বজ্রের নির্ঘোষও প্রাতিপক্ষের কামানের গর্জনের নিকটে পরাকৃত। এই কামানের গর্জন ভনিয়াই শত্রুভ্রমত ভগসিংহের অব পরিভ্রমত ও পলায়নের হইল। পলায়নের সময়ে



পাষাণে অলিত চরণ হইয়া সে ত পড়িলই, প্রত্যুত তপসিহেরও একটা চরণ ধোঁড়া হইয়া গেল। এই অবস্থায় তপসিহে হুহু ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন তিনি মধ্যে বৃক্শলেন—বহুদিন মুখে অনভ্যাস্ত ব্যাকার তাঁহার এই পরাভব। এই কথাই অমরসিংহ সামন্তদ্বিগকে পূর্বে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহাদের ত্রুষ্টি ঘটিয়াছিল। আজ কল হাতে হাতে কলিল। শুধু তপসিহের কথা বলিতেছি না, সমস্ত সৈন্ত ও সেনানীয়েই এই অবস্থা। তপসিহে তাই স্বরণ করিয়া রণস্থলের একপার্শ্বে একঘণ্ড পাষাণের উপর বলিয়া দ্রুপ করিতেছিল।

এমন সময়ে সেই পথে অসামান্য অমরসিংহ বাহির হইলেন। তাঁহার মুখে অলত উৎসাহ, হৃদয়ে অসীম বৈরাগ্য, বাহ্যতে অনন্তবীরাগ্য, তরবারী-ধারী হস্তধারী উড়ে উড়োলাত করিয়া তিনি সৈন্তদ্বিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন—মহামুখী ভাষা প্রত্যেকের বাহ্যতে নবীনবল আনিয়া দিতেছিল।

“তো তো মেবারবীরাঃ সমরয়িমমহো

যুযাক্রীড়লীলা

যাথকেনং বিহার ত্রিগণপুরাণং বৈশম্বকা

ব্রতং বা।

বীকলং জয়তুমিচ্ছবন পৰতঠৈরুঃসঠৈঃ

পীড়্যমানা

নিঃশব্দং রোষিতীং যলিন মুখকটী

রক্ষতৈন্যং হুপুত্রাঃ।”

যে তলিল সেই আবার কিরিয়া ধাক্কাইল। সেই সময়ে হুহুকেয়ে একটা ভীষণ সমর্দ আনিয়া উপস্থিত হইল। স্বপ্নেরই তিনি দূরবীক্ষণ দ্বয় সাহায্যে দেখিলেন—পার্শ্ব ভিল সেনা তরঙ্গায় হইয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি জানশূন্য সেইদিকে দাবিত হইলেন।

মুখে উৎসাহবাণী, প্রতাপসিংহ যেন সাক্ষাৎ রণে দণ্ডায়মান। তাই তপসিহের মনে প্রতাপচিহ্ন চোড়িত হইয়া উঠিল। আক্সাণে, বিশ্বদে, গর্কে তপসিহে আবার তেজস্বী হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তপসিহের মুখে অমরসিংহের যে বীরত্ব ব্যাক্ত ছবিটা উল্লাসিত হইয়াছে, তাহা কি বিলানী অমরসিংহের সম্বন্ধে?

“তদেব রূপ কৌশলং স চ পরাক্রমে ত্রুসহঃ  
তদেব গতি লাঘবং প্রহরণেহু সৈব দ্বিষ্টিঃ।  
তদেব গুণ সাহসং পরগুণে ল এবাবগঃ  
দ্রুতিবিশদি ব্যক্তর মহো, সনাথা বয়ং।”

আমরা অমর চরিত্রে পূর্কে যে সমস্ত গুণ দেখিয়া আশিষ্টাছিলাম, পাঠক! আবার দেখুন অমর সিংহ কত বড়। তাঁহার হৃদয় কত মহান, কিন্তু তিনি কত করিবেন! অসামান্য বিপক্ষ সেনানীর মধ্যে তাঁহার দ্রুতিমেঘ-সৈন্ত কতক্ষণ টিকিতে পারে? তিনিও অসামান্য লান করিতেছিলেন, কিন্তু সৈন্তেরা তাহার মত নহে। তিনি দ্বিতীয়াঙ্কে হুহু করিতে বিমূখ সামন্তদের উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা বৃষ্টি কলিয়া উঠিল—

“ভেবচ্ছেদপরা চিরাদমিলতা তীক্ষ্ণা সদা

বর্ততে

ভুগর্ভে নিষিতা তু কণ্ঠবিরতা নাস্তং

কলহান্তরা,

এবং বীরকুলং মহারি বিজয় ব্যাপার

কৌতুহলাহ

বাগ্র্য ভাতি তত্তত্ত্বা নমপয়ং গেহেবসং-

নীবতি।”

তরবারি কাছে লাগাইলেই চিরকাল তীক্ষ্ণ থাকে, তাহাকে কলিয়া রাখিলে ঘরিতা ধবে। সৈন্তেরাও নিরস্ত হুহু ব্যাপারে অধ লাভ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে,

কিন্তু তাহাদিগকে কাজে না লাগাইয়া বলাটাই রাখিলে দুর্দশ হইয়া পড়ে, পরে যুদ্ধ দেখিলে অকৰ্মণ্য হইয়া পড়ে। আজও তাই অমর সিংহের সৈন্য অকৰ্মণ্য গ্রাহ্য। তাহার প্রতাপ-সিংহের মৃত্যুর পর আর যুদ্ধ করে নাই, বণ-কৌশল, ঔষধ, গাভীৰ্বো, উৎসাহ, প্রকৃতি বীরগুণ পূৰ্ণের মত আর তাহাদের ছিল না। তাই তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। উপায় নাই, অমর সিংহের স্ত্রী সৰ্ব্ব্ব দ্বার। সুলীষাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ-সিংহ অরণ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অমরসিংহকেও স্ত্রী সাথের মেবার ত্যাগ করিয়া চিরন্তনের বনবাস অবলম্বন করিতে হয়। আজ এই ভীষণ মুহূর্ত্তে মহারাণার কি উদ্ভবের অবস্থা, তাহা লেখনী যুগ্মে বুঝান কঠিন। কিন্তু ঘটনা ঘটয়া গেল অপূৰ্ণ। বনস্থলের সমুদয় একটী বৃক্ষে সহসা বৈষ্ণবদ্বারী ভগবতীর আবির্ভাব ঘটয়া গেল। আজ মেবার জননী দিব্যমুষ্টি অবলম্বন করিয়া সন্তানদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—

“সুপুত্র সুপুত্র পুত্র! যাতব্যং মামবেক্য  
ভাষন্ত সমর ভীতিং যাত বৈরিক্যায়।

সকল বিজয় যাজ্ঞাত্যৰ্থমন্তোভ্য পক্ষাদ্  
বরমুচিতমভীষ্টৈঃ প্রার্থয় ধ্বং মন্যে ॥”

“হে পুত্র সকল! তোমরা জ্বলন কর।

আমি তোমাদের জননী—আমার দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া তোমরা সমরভীতি ত্যাগ কর, শত্রু করেের নিমিত্ত আবার দৌড়াও, বিজয় লাভ করিয়া আসিও। তোমাদের অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।”

এক দিন ‘শ্রী’ এইরূপই বুকখাখায় আরোহণ করিয়া কৌলদায় সেনা তাক্কাইয়াছিল—সে দিন সে ও গাছের ডাল নাড়িয়া অকল

উড়াইয়া বলিয়াছিল—“বেশের শত্রু মার! হিন্দুর শত্রু মার!” যাত্যমুষ্টির আবির্ভাব হইলে সন্তানের কি আর জ্ঞান থাকে? সে তখন সৰ্ব্ব দ্বার ও মারের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইল। যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়া গেল। এই সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে অবস্থা ঘটিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। একদিকে অগাধ চক্রবৎ মহারাণার রণমধ্যে ঘূর্ণন, অপর দিকে আবেগে আবেগে সৈন্তের সম্মুখ, কোথাও কামানের বুধে অগণিত সৈন্য, কোথাও বিপক্ষ কামান কাড়িয়া লইয়া মহারাণার সৈন্তের আনন্দে অগ্রসর। এক কথায় এমনভাবে যুদ্ধের বর্ণনা সহজ নহে, কবির কৌশলও নহে। তারপর রণস্থলে ঘন সৈন্য সমূহ ধ্বংস হইয়া গেল। মহারাণাও সৈন্তক্ষয় করিয়া ঘন ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কাজগুরু তিনি তখন সমুদ্রত।

দ্বির দীর গাভীৰ্বো তিনি বলিতেছেন,—

“আসীৎ সৈন্তং রিপুণাং করিতুরগং-

ভটব্রাত্যাদাত্যপূর্ণং

শত্রুগ্রাস্যভীষং শতগুণমধিকং মামকেভ্যো-

-বলেভ্যঃ।

ভগ্নিশাষ্টাবশিষ্টং ভ্রমাত ভূগলিব্যবস্তীভং

কপেহিন্দু

হস্তকাজপ্রভাবজ্বলনবিগিতো

নাধুন্যাত্যমতি ॥”

বাজার সঙ্গে সৈনিক বেশে হুলা ছিল। হুলা মহারাণীর সখী। এই হুলাও আজ যুদ্ধ করিয়াছে, যে দেশের মেয়ে মানুষে পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে জানে, সে দেশের কি সহসা পরাভব আছে? তাই রাণা হুলাকে বলিতেছেন, “হুলা! মেবারভূমির ইহাই মহিমা, যে বেখানে তোমার মত কুলান্না

পূর্ববের বেশ ধরিয়া ত্রীজনমূলত লক্ষ্য। ও কোমলতা ত্যাগ করিয়া পতবীরবৎ শৌক্য অবলম্বন করিয়া হুচ্চ করিতে পারে।' তপু হুৎলা এইরূপ করে নাই, মহারাষ্ট্রের কীষ্টির কথা কি পাঠক বুঝিতে পারেন নাই? তিনিই ত বৃক্ষশাখায় চড়িয়া হুচ্চের গতি ফিরাটরা দিয়াছেন। তাই রাজা হুৎলাকে ভিজালা করিতেছেন, "হুৎলে! পূর্বপ্রত বাকা প্রকৃতি দ্বারা মনে হয় আমি হুৎলের পঞ্চাঙ্কাবে চলিয়া গেলে আমার সৈন্য সমূহ ভয়প্রাপ্ত হইয়া তাহারিণের বৈষ্ণোর ভক্ত তোমাদের স্বামিনী বৃষ্টি মেবার ভূমির অধিকৃতা দেবীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন?"

মহারাষ্ট্রের চরিত্র অনন্তশাধারণ। মহারাণা এইরূপ সংঘর্ষিত পাইয়াছিলেন বলিয়া সমাই আশ্চর্য্যেরবে ফীত। বাস্তবিক এই মহারাষ্ট্রের ভক্ত রাজা অনেক সময়ে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। আমরা দেবীর চরিত্র লম্বালোচনার সময় তাহা পাঠক বর্ণের পোচর করিব। নাটকের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের অতিথ সর্ক-হুৎলেই বিদ্যমান অথচ তাহার আবির্ভাব অতি অল্প। এখনি তাহে মহারাষ্ট্রের প্রয়োগ সমূহ চিত্রিত করা আছে যে, তাহা অতিক্রম বলিয়া প্রথমে নজরে পড়ে না, কিন্তু ফলকালে তাহা মহান্ হইয়া সর্কজ সকলকে বিস্মিত করিয়া থাকে।

রাস্তার এই অদ্ভুত ব্যাণার দেখিয়া কনিদা রাজা বলিতেছেন,

"দেবি!

ক। তে জগা স্বমণি বক্ষননী প্রজানাং

মেবার রক্ষণ বিধৌ বিধিনা নিমুক্তা।

দেবপ্রত্যাপনপুণ্ডে: সদৃশীভূত। স্ব

যতে কৃতং তদহুচ্চপমহোতবৈব।"

ত্রীবাণীনতা এমনি তাহেই বিতে হয়, রমণী বাহাতে যাত্মমুখিতে সকলের অন্তরে পূজ্যমানা হইলেন, দেহে, প্রেমে, কোমলতায় সুহৃদমানসি কোমলা অথচ বৈষ্ণৌ, বৈষ্ণৌ, বৈষ্ণৌ পূর্ববের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইলেন, তবে ত দেবের মঙ্গল। বিলাস বেশ ভূষার রমণীকে সজ্জিত করিয়া পিঙ্কার নামে বিকৃতকলি করিয়া ফেলিয়া ত্রীবাণীনতা দিলে হুৎও অগাধি বাহিরেও অগাধি। তাই রাজা বলিতেছেন, দেবি! তুমি যে মেবারের জননী তোমার লক্ষ্য কি? রাণী রাজার নিকট পিবিয়াছেন আপদ্বর্ষ অহুনারে এইরূপ বাবহার করা চলে, তাই সেই কার্যের পর আমার ভেমনি হুহুম কোমলা হইয়া লক্ষ্য অধোবদন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আপদ্বর্ষ অহুনায়েই হুৎলাও হুচ্চ করিয়াছিল। এই থানেও পক্ষযাত শেষ। আমরা বারান্তরে রাজার শেষ চরিত্র দেখাইব।

শ্রীপকানন কাব্যতীর্থ।

## মফঃস্বলের বাণী

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বর্তমান  
স্থিতি ।

শাকে শিখিরেবেবেধু বিধৌ লম্বত রবৌ যুগে ।  
প্রাণাধঃ কারয়ামান ঐধর ছিল কুণতি ৮  
বিজাবানীঘরেনাপি ঐধরেন কৃতঃ মুখা ।  
প্রাণাধঃ কৃতনাথস্ত শাকে বাণ ত্রয়োমসৌ ৯

যেহিনীপুর জেলায় অন্তর্গত কেশপুর  
থানার অধীন ব্রাহ্মণজুনি পরগণার মধ্যে  
বাজার আড়ারার জয়পুর গ্রামে প্রান্তরের  
মন্দিরে শ্রীশ্রী/জয়চণ্ডী মাতা বিরাজিত্য।  
একশ্রে মাতার মন্দিরের ছাদের উপরে একটি  
অবধি বৃক ও একটি বটবৃক উৎপন্ন হইয়া  
তাহা অতিশয় জীর্ণ করিয়াছে। মাতার  
মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিবার জন্ত অন্ততঃ  
১০০০ এক হাজার টাকার আবশ্যক। উক্ত  
মাতার যে সকল কুলম্পতি আছে তাহাতে  
মাতার নিত্য সেবা ও পূজাদি নির্বাহ করিয়া  
কিছুই উদ্ধৃত হয় না। এই জন্ত এই মহৎ  
কার্য সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব-  
সাধারণের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা  
বাহাতে এই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সিদ্ধিহানের  
কীর্তি বজায় থাকে দয়া প্রকাশ করিয়া য য  
সাধারণজনে অর্থ সাহায্য দানে চিরায়ত্ত্বহীত  
করিবেন। আশিও মাতার মন্দিরের সাহায্য  
কারিগণের মঙ্গল কামনার ত্রিসন্ধ্যা মাতার  
নিকট বর প্রার্থনা করিব।

শ্রীশ্রী/জয়চণ্ডী মাতার পরিচারক—

শ্রীঅধিনাথ চন্দ্র দেবশর্মা।

বনাম ব্যাত মহাত্মা শ্রুতি—কবিকঙ্কণ  
চণ্ডীর নাম বনবাসী শিক্তি সমাজে যে

সুপরিচিত তাহা আর ত্রুটবার করিয়া বলিতে  
চটবে না। বনবাসীর সুশোভনকারী বন-  
সাম উক্ত শ্রীশ্রী/জয়চণ্ডী মাতার মন্দিরে সিদ্ধি  
লাভ করেন। তিনিই মহাত্মা কবিকঙ্কণচণ্ডী  
নামে অক্ষর কীর্তি লাভ করিয়া বর্ণে অনন্ত  
স্বয় ভোগ করিতেছেন। এবং আমাদের  
জন্ত অতুল্য ধন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি  
গিয়াছেন কিন্তু মা জয়চণ্ডী বহিয়াছেন; যে  
মা বনরামকে অক্ষর কবি কীর্তি দিয়া কৈবল্যও  
প্রদান করিয়াছেন, যে মায়ের অতুল স্নেহের  
পরিচয় পাইয়া কবিকঙ্কণ আমাদের জন্ত  
তাহার কীর্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার  
সেই বেমহা দয়াময়ী মাকে আমরা আমাদের  
সম্মুখে পাইয়া তাঁহার কৃপা দেখিয়া কেমন  
করিয়া থাকি বল বেধি? মায়ের গৃহ জীর্ণ  
হইয়াছে এখনই তাহার সংস্কার না হইলে  
তাহা কুণতিত হইবে। সম্ভ্রামণ উদ্ধৃত  
হও, মাকের জীর্ণ গৃহ সংস্কার জন্ত য য সাধা-  
মত অর্থ সাহায্য করিয়া আপন আপন কর্তব্য  
সাধা কর।

দেবীর গৃহসংস্কার জন্ত দেবীর সেবাইত  
আশীর্বাদ লইয়া আপনার মূহে গৃহে সমু-  
পস্থিত হইতেছেন। দেবীর প্রতি বৃত্তিপাত  
করিয়া সেবাইত মহোৎসবের তিথ্যের তুলিতে  
কিছু কিছু অর্পণ করিয়া দেবীর রূপালাভ  
করন ইহাই প্রার্থনা।

যিনি বাহা দান করিবেন যেহিনীপুর  
হিঠেবীতে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা  
হইবে।

অর্থপ্রেরণের ঠিকানা।

জমিদারী কোম্পানীর মেদিনীপুরের আম-  
দোক্তার বাবু নটর চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের  
নামে অর্থ প্রেরণ করিতে পারেন।

## ২। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গগ্ৰহে অধুনা এদেশে  
বাঙ্গালাভাষার বহুল প্রচলন হইয়াছে।  
বাঙ্গালাভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানুসারে  
অবশ্য শিক্তিত্ব্য ভাষা (Compulsory  
subject) বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়ায় বর্তমান  
সময়ে শিক্ষার্থী ছাত্র মাত্রকেই ইচ্ছা হই বা অনি-  
চ্ছায় কিছু কিছু বা বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা করিতে  
হয়। বর্তমানযুগে বাঙ্গালাভাষার বহুল প্রচ-  
লন হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশেষ অগ্রগতি  
করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে প্রকৃত প্রস্তাবে  
মাতৃভাষার আশাহুত্ব পুষ্টি সাধিত হয় নাই।  
আজ প্রায় ৭৮ বৎসর হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে  
বঙ্গভাষার প্রবর্তন হইয়াছে, কিন্তু এই কতি-  
পয় বৎসরের শিক্ষার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের  
পরীক্ষোত্তীর্ণ শত সংখ্য ইংরাজী শিক্ষিত  
যুবকের মধ্যে, আমরা কয়জন মাতৃভাষার  
একনিষ্ঠ সেবক বা প্রতিভাশালী বাঙ্গালা-  
লেখক পাইয়াছি তাহা বিশেষতঃ পর্যালো-  
চনার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার  
প্রবর্তন সত্ত্বেও, আমাদেরিগের যুবকগণের  
জাতীয় ভাষা সম্পর্কে তাদৃশ অনভিজ্ঞতার  
কারণ কি?

বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ ইংরাজী বিদ্যালয় ও  
কলেজে বঙ্গভাষার প্রবর্তন করিলেও, আমা-  
দের মনে হয়, ইংরাজী ও অন্তান্ত বিদ্যার শিক্ষার  
নিমিত্ত ছাত্রগণের বেতন প্রাপণ বহু, মাতৃ-  
ভাষা অস্থানীয় তাহার লভাংশও নাই।  
আর এক কথা,—বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা  
অবশ্য পঠিতব্য সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ

অস্থানীয়নাথ সঘৃণিত ব্যবস্থা বিধানে অধ্যাপি  
আশাহুত্ব মনোযোগী ঠন নাই। বিশ্ববিদ্যা-  
লয়ের প্রবর্তিত বাবস্তীয় পঠিতব্য বিষয় যদিও  
সমভাবে শিক্ষা দিবার বৈধি প্রচলিত আছে,  
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার অগ্রগতিবর্ণও দেখা  
যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ভগ্ন অধুনা  
চারিটা বিষয় অবশ্য পঠিতব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত  
আছে। এই অবশ্য শিক্তিত্ব্য বিষয় চতুর্ভেদে  
মধ্যে অন্তান্ত বিষয়ের অস্থানীয় অন্ত যে  
অর্থব্যয় করা হয়, বাঙ্গালাভাষার অস্থানীয়নাথ  
কিন্তু তাহা হয় না। গণিত, ইংরাজী ও সংস্কৃত  
প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার ভগ্ন উচ্চ বেতনে  
অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু অনেক  
বিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার ভগ্ন কোন  
শতত্ব শিক্তকই নিযুক্ত করা হয় না। অনেক  
হলে, গণিত বা সংস্কৃতের অধ্যাপকের উপরই  
নামে মাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার ভার  
অর্পিত হয়। বহু বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন  
এক ঘণ্টা মাত্র বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইয়া  
থাকে। ফলে, বিদ্যালয়ের বালকেরাও  
বাঙ্গালাভাষার অস্থানীয়নে আর তাদৃশ বহু লয়  
না। তাহাদের বিশ্বাস যে মাতৃভাষার তাহারা  
সকলেই এক এক জন দ্বিগুণ পঠিত। অথচ  
একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে  
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বাঙ্গালাভাষার  
অস্থানীয়গণের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।  
অধুনা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণও বালকদিগকে  
মাতৃভাষা শিক্ষাদানে এত বীতশ্রদ্ধ কেন,  
তাহা জ্ঞাবহন করাও হুষ্টি। যে ছাত্র-  
সমাজ লইয়া দেশের ভবিষ্যৎ “জাতি”  
সংগঠিত হইবে, আপনাদিগের মাতৃভাষা  
সম্পর্কে তাহাদের এবিধ অনভিজ্ঞতা  
জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির এক বিশেষ  
অবরোধ।

আমাদের যে মাতৃভাষা বাঙালী, আর বিশ্বনাথ সম্প্রীতি—পাক্তাঃ জগৎহেতু লক্ষ্যপাত্তা, ছাত্রসম্প্রদায়ের নিকট তাহার তত্ত্ব লক্ষ্য নাই, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যখন মাতৃভাষার প্রবর্তন হয় নাই,—তখনও যে ভাষার বিশেষ দৈনন্দিন ছিল, তাহা বলা যায় না। পাক্তাঃ ভাষা, যখন বক্তার জায়, সমাজের চতুর্দিকে কুল কুলু রবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, ঠিক তখনই মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীন, কালীপ্রসন্ন, জুগেব, যোগেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি বাঙালীসাহিত্যের মহারথিগণ আবির্ভূত হইয়া জাতীয়ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আজ শিক্ষিত সমাজের ঘরে ঘরে মাতৃভাষার দীপনের ব্যবস্থা লেখক ও যে বাঙালীভাষার প্রকৃত পুষ্টিসাধিত হইতেছে না, ইহার কারণ অগ্র-সন্ধান করিলে দেখা যায়, শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই আজ ভাষাভ্রমণের একদম বন্ধ। ইহার প্রতিকার করে সজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হউন, ইহাই আমাদের সনির্কণ্ড প্রার্থনা।

জাতীয়সাহিত্য ও জাতীয় ভাষার সহিত জাতীয় উন্নতির এক অবিচ্ছেদ্য সংঘ। অসংখ্য রাজ্যভাষা ইংরাজী আমাদের কাছে না শিখিলে চলিবে না। কেন না, অর্থকরী বিদ্যার প্রভাবই ইহানীঃ বেশী। কিন্তু একথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে, যে মায়ের সন্তান, তাহার জনমে তাহার মায়ের দাবীই সর্বাধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও দেশের স্বাধীন ইহা বুঝিয়া তৎপ্রতিকারকরে সমুচিত বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন করুন,—ছাত্রগণ মাতৃভাষার অধ্যয়নী হউক,—জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হউক, ইহাই জ্ঞান-বিশ্বের একমাত্র কামনা।

ছাত্রগণের ভাষা শিক্ষার পক্ষে আর এক প্রধান অন্তরায় বর্তমান পাঠ্যবিভাগ। ছাত্র-গণকে আজ কাল বিভাগে যে এত রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হয় যে,—ছাত্রগণ অনেক স্থলেই পঠিত পুস্তকের প্রকৃত স্বাদ বা সার গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। পাঠ্য-নির্দাষ্টকরণের ত্রুটিয়া ইহানীঃ কত অপাত্তা যে পাঠ্য হইয়া বাইতেছে, আর কত পাঠ্য যে অপাত্তা হইয়া বাইতেছে, তাহা নির্ণয় করাও প্রসাধ্য। কত বিভাগান্ত ভট্টাচার্য্য এখন বিভাগবিধি, কত অকবি কবিত্তর, কত ভ্রমহীন মূর্খ এখন সত্যসত্যি প্রকৃতি উচ্চ উচ্চ উপাধি কৃষ্ণে কৃষিত হইয়া গ্রন্থকাররূপে যে আমাদের ভবিষ্যৎশ্রেষ্ঠ বালকগণের মস্তক চর্কণ করিতেছে, তাহারও ইচ্ছা নাই। বালক-গণকে মাতৃভাষার অভিজ্ঞ করিতে হইলে অতি ঘরের সহিত পাঠ্য নির্দাষ্টন করিতে হইবে। দৈনন্দিন, অক্ষরভূমার, বাক্য, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন প্রভৃতি বাঙালী সাহিত্যের আদর্শ লেখকগণের এম তাহাদিগকে পাঠ করিতে হিতে হইবে। অত্যা ছাত্রগণের ভাবানভিজ্ঞতা দূরীকরণের কোন উপায়াস্তর নাই।

পরিতাপের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উচ্চ শিক্ষিত যুবক বাঙালী ভাষায় একঘানা পত্র লিখিতে দিয়া ইংরাজী উঠেন। তাহার বাঙালী ভাষার গুরু করেন,—কিন্তু মাতৃ-ভাষার বিষয়ী। বাঙালী ভাষাকে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের দুহিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক ইংরাজীপ্রিয় অনেক নব্য যুবক ইংরাজী ভাষাকেই বাঙালীর মাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বেশীকণ ইংরাজী পড়িয়া অনেক যুবক মনে করেন,—তাহারা ইংরা করিলেই বাঙালী ভাষার দ্বিবিধী

লেখকরূপে পরিচিত হইতে পারেন। অধুনা বাঙ্গালানাহিত্যে এই শ্রেণীর লেখকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। দুঃখের বিষয় ইহাদের লেখা না হয় ইংরাজী,—না হয় বাঙ্গালী। এই শ্রেণীর লেখকগণের স্বঘটিত উচ্চ, ইহাই কামনা।

কোমলমতি ছাত্রগণের মস্তকে পাঠ্য পুস্তকের কিরূপ শুকতার অর্পণ করা হয়,— এক্ষণে সে বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলি আলোচনা করিব। বিজ্ঞানার্চাধ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় “বঙ্গভাষার বিজ্ঞান-চর্চা” নামক একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—“বর্তমান কালে ইংরাজী শিক্ষার অল্প আদায়গিকে যে উচ্চশ্রদ্ধা দিতে হয়, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বয়স ছয় বৎসর হইতে না হইতেই আমরা শিশুর হস্তে First Book of Reading প্রদান করি; আট বৎসর বয়সের সময় Third Book পড়াই। অন্তঃপর ক্রমান্বয়ে উচ্চ শ্রাণের সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে Grammar, Composition, Phrase, Idiom, Homocryms, Row's Hints প্রকৃতি আপিসা বালকগণের হৃদে ঢাণিয়া বসে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস, সংস্কৃত আছেই। এই তরুণ বয়সেই বালকগণ এক ইংরাজীর বোকা বহন করিতে করিতেই ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া পড়ে। Matriculation পাশ করিয়া বাহারা I. S. C. পড়িতে যার তাহাদেরও নিকৃতি নাই; পর্তুত প্রায় ইংরাজী সাহিত্যের বোকা তাহাদিগকে ব্রিহমান ও বিম্বল করিয়া তোলে। I. S. C. শ্রাণের পক্ষে সত্য সত্যই এই চাপ অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আবার ঐ ইংরাজীর উপর Mathematics, Chemistry,

Physics, Botany এবং তাহাদের Practical আছে। কাজেই অনেক সময় কলেজে ১০টা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত শ্রাণের পর শ্রাণ চলিতে থাকে। ইহার ফলে জীবদেহ ভয়বাহ্য ও কৌণদৃষ্টি যুবকের দলে বেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইং-বিশ্বকে তিল তিল করিয়া হস্তা করিতেছি।

• • Shall ও Willএর প্রভেদ ও Appropriate Prepositionsএর পার্থক্য নিরূপণে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহার ক্ষত্র প্রবেশনীর বিষয়ে নিবেদন করা উচিত।” অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, তাহার উপর ছাত্রগণের পাঠ্যবোকা বিবৃত করিতে প্রয়াস পাওয়া যুক্তিযুক্ত মাত্র। অনাবশ্যক পুস্তক বাহাতে ছাত্রগণের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে না পারে, বিখবিশ্বাশ-কল্প-পক্ষ সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, ইহাও আমাদের কাতর প্রার্থনা। বারম্বারে পাঠ্য-গ্রন্থাদি সম্পর্কে আমাদের আরও কোন কোন বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

## ২৪ পরগণা বর্ত্তিবহ

### গো-জাতির উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যিক

পৃথিবীস্থ দাবতীয় জীব-জন্তুর মধ্যে, উপ-কারিতার গোজাতির স্থান অনেক উচ্চে এমন কি, কৃষিকর্ষণ বস্ত্রচালন, ভারবহন, দ্রুত যাতায়াতি বিবিধ পুষ্টিকর স্বাস্থ্য দান; ইত্যাদি অনেক কল্যাণকর কার্য দ্বারা উহার। প্রতিনিষত আমাদের বেতন হিতসাধন করিতেছে তাহার তুলনাই হয় না। স্বতন্ত্র পণ্ড হইলেও, অন্তঃপ্রাণের কার্যতপে গোজাতি মানবজাতির অধিতীয় স্বাধিকার স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। এবং

তৎকালে কৃতজ্ঞতার নিবন্ধন স্বরূপ উগ্ৰাধের প্রতি যথোচিত স্নেহ ভক্তি আদর যথ প্রদর্শন করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কৃতজ্ঞ-রূপ পূর্জতন আধ্যাত্মবিগণ তত্ত্বদেস্তেই এমন সুকৌশলপূর্ণ শাস্ত্রশাসন প্রবর্তন করিয়া ছিলেন; বাহ্যরূপে হিন্দু যাজ্ঞেই গো-জাতিকে দেবতার দ্বারা ভক্তি ও মাতাপিতার দ্বারা লালন পালন করিতে অভ্যাস হইয়াছিল। পরম ধর্ম-জ্ঞানে গ্রাম প্রত্যেক হিন্দু সন্তানবৎ গো-পালন করিতেন অথচ তাহা যেমন তেমন ভাবে হইবার উপায় ছিল না। অপালন বা অথহে গরুর মৃত্যু হইলে, তৎকাল গো-স্বামীকে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

একদিকে যেমন প্রত্যেকেই গোপালন করিতে বাধ্য হইতেন; অপর দিকে শাস্ত্র-কারগণের প্রবর্তিত অশ্বপালন কলে, কুমারিগণ গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত পরিমাণ নিকর গোচারণ কুমি দান করিতে বাধ্য থাকিতেন। পিতৃ মাতৃ স্নানোপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দুকেই স্নানকলাক্রান্ত হুব বৎস উৎসর্গ করিয়া দিতে হইত। ধর্মলাভ লালসার সম্পদ গৃহস্থগণ কখন কখন দ্রুতবতী গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। এই সকল মধ্য ব্যবস্থার গুণে গৃহস্থগণের পক্ষে গোপালনের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। কেন না, গো বাড়ের ভিত্তি গোচারণ কুমি এবং বকুন। গাভী সমূহকে উপযুক্ত সময় মেল দিবার জন্য ছুটপুট উৎসর্গের বাঁড় সর্বত্র পাওয়া যাইত। অর্থাভাবে বাহারা গাভী ক্রয় করিতে অসমর্থ হইতেন; তাহারো দানে প্রাপ্ত হইয়া গাভী সংগ্রহের অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারিতেন, সুতরাং ভ্রূতবনী শাস্ত্রকারগণের কল্যাণকর ব্যবস্থার কলে

পূর্জকালে এ দেশের কোনখানে কাহারও পক্ষে পুষ্টিকর প্রচুর গব্য সামগ্রী পাঠিতে এবং পরিজ্ঞেমের কারণে গোজাতির সাহায্য পাইতে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইত না।

কিন্তু কালধর্ম অথবা শিকা ও সংসর্গগুণে বর্তমান হিন্দুজাতির সরল ও স্বাভাবিক ধর্ম বিশ্বাসে তাঁটার টান লাগিয়াছে। তাই এখন আর নিত্যক দায়িত্বকা না হইলে শুধু ধর্ম বিশ্বাসে কেহই গোপালন করে না, গো দান সে ত একচ্ছিন্ন উত্তিগাই পিঠাছে, গোচারণকুমি জমাথ বিলি করিয়া লাভবান হইতে কোন কুমারীই সুযোগ ত্যাগ করেন না, ব্রূতবৎসর্গ কঠিন কঠিন এখনও হুৎ বটে কিন্তু তৎসঙ্গে শাস্ত্রোদ্দেশ্যের কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। বর্তমানকালের ধর্ম কল্মসবই লোক বেগানো, গোবৎস স্তব্রায় ব্রূতবৎস যেরূপই হউক না কেন, পরমা কল্ম হইলে, তাহাই গ্রাম উৎসর্গের জন্য মনোনীত হইয়া থাকে। দ্ব্যধের বিষয় যে এইরূপ অল্প প্রেমীর বাঁড়গুলিও উৎসর্গের পর বেজাচারগণের জন্য মুহূর্ত্ত মাত্রও অবসর প্রাপ্ত না হইয়া, কলাইধানার আশ্রয় গ্রহণ পূর্জক অভিরে উৎসর্গকারীর পিতৃ মাতৃ কুলের উদ্ধার সাধন করে। সুতরাং এব-অকার বাড়ের দ্বারা গোজাতির বৃদ্ধি বা উন্নতির কোন আশাই নাই। অতএবে ধর্ম-কল্মস সম্প্রদায় বৎসামাত্র সুবিধার জন্য মাঝে বাছুরগুলিকে ছোড়াইয়া আবারে পরিণত করিতে একটুকুও ইতস্ততঃ করিতেছেন। অধুনা ভারতের প্রাচীন ও উপনিবেশ গোমাংসভোজী মহাস্বাধ্যায়কর্ষক কিতাবে প্রতিদিন গোমূল নিমূণ হইতেছে তাহার বিস্তারিত বিবৃত অনাবশ্যক। বাহা হউক, এই সকল নানা উৎপাতে এখন আর ১০২০ খান



গ্রামের মধ্যেও একটি যেমন তেমন বাড়িও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হুতরাং প্রধানতঃ বঁড়ের অভাবেই আজকাল গোবৎস ধ্বংস হইবার উপক্রম চইয়াছে।

একেইত বর্তমান দিন কালে, গোখানোর অভাব অপ্রতুলতা নিবন্ধন এবেপের পক্ষে গোপালন নিত্য কঠকর হইয়া পাড়াইয়াছে, তত্পরি সর্বত্র বঁড়ের এইরূপ অভাব থাকিলে দাওয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াও ২১টি গাই পুঝিতে চই। করেন দার পড়িয়া তাহারও সে প্রকৃতি লভ্য না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এতদ অবস্থায় এ দেশের গোবৎস আর অধিক দিন বজায় থাকিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। অথচ কৃষিসম্পন্ন এ দেশের পক্ষে কৃষিকার্যের প্রধান গরু। ম্যাগেরিয়া বিষ লক্ষিত বাঙ্গালী ঈর্ষ্যেহে দুহুর্ জীবন রক্ষার উপায়ই বা পুষ্টিকর গরু লামগ্রী ছিল আর কি আছে? এক কথায় বলিতে গেলে গোষ্ঠাতীর জীবন মরণ, উন্নতি অবনতি, দ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের জীবন মরণের অতি নিকট সুবন্ধ, হুতরাং উহার না থাকিলে, অথবা উহাদের অল্পতা বা অবনতি ঘটিলে, আমাদের পক্ষে কি মহানিষ্ট সংঘটিত হওয়া সম্ভব, প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তির বীরচিত্তে তাহা চিন্তা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারের পদ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু নিত্য জুগের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে এতদ প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আজকাল অনেকেই উৎসে। প্রশ্রয় পূর্বক বাজেকাতে ও বাজে কথায় আলোচনার সময় নষ্ট করিতেছেন।

যাহা হউক, এখনও যদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এ সবকে যেনবানীর কিঞ্চিদমাত্র চৈতন্ত সকার হয়, তাহাও নিত্য প্রবন্ধর মনে

করিব। কিন্তু শুধু দেশের লোককে উত্তেজিত করিয়া এক মাত্র তাহাদের কর্তব্যেই প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলে উদ্বেগ সিদ্ধির সাহায্য হইবে না। ইচ্ছা হইলেও অনেক বিষয় ক্ষমতার বর্ধতা লব্ধ তাহারিগকে পশ্চাৎপদ থাকিতে হয়। হুতরাং সর্বাংশে সর্জনশ্রেণে প্রমাণিতব্যী লম্বায় সবর্ণমেন্টকে উৎসু করিয়া উহার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের লব্ধ বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

বিভাগীয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটি সমূহ নিজ নিজ তহবিল হইতে হউক কিবা করদাতাগণের নিকট হইতে কিছু কিছু কর সংগ্রহ করিয়াই হউক গ্রামে গ্রামে অথবা প্রত্যেক ইউনিয়নে ২১টি করিয়া বিশেষ জেন্দীর বলিষ্ট বঁড় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া উহারিগকে প্রচুর ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি প্রতাপালনের ব্যবস্থা করিলে উহাদের সংগ্রহে অবনতি ও উৎস্রগ্রাহ গোষ্ঠাতির উন্নতি ও বংশবৃদ্ধির প্রভুত সাহায্য হইতে পারিবে।

গোষ্ঠাতির উন্নতি ও বংশবৃদ্ধি হইলে যে দেশের লোকের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা বিভাবিত ব্যাখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা অনাবশ্যক মনে করি। আশা করি আমাদের বাধরপণ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব বাহাদুর আপোনে এই কল্যাণকর কার্যে মনোযোগী হইয়া অসংখ্য লোকের অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

পুর্কোপ্তিযিত মত বাক্তরকার ব্যবস্থা সুক্তি-লম্বত বিবেচিত হইলে কিন্তু লম্ব উপায়ে উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে পশ্চাৎ তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

বরিশাল হিতৈষী।

৪। পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

১। খেতপ্রদর—পাবনিক জলে পিচকারী করিলে, খেতপ্রদর আরোগ্য হইয়া থাকে।

২। খেতপ্রদর রোগে কটকারী পিচকারী বিশেষ উপকারী।

৩। ২ আউল জলে ৫ গ্রেন সোচাগা পলাইয়া সেই জল পিচকারী করিলে সন্ধ্যাই উপকার হয়।

৪। খদির সিদ্ধ জলে দিবসে ২১০ বার পিচকারী করিলে খেতপ্রদরজনিত স্লেদ-নিসরণ নিবারণ হইয়া থাকে।

শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ—মুক্তাধুরির পাতা। পেষণ করতঃ গরম করিয়া গুচ্ছবেলে প্রলেপ দিলে, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়।

শিশুদিগের বৃকে সর্দি—পান গরম করিয়া তাহাতে তৈল মাখাইয়া বস্তুর উপর গুণ্ডে গুণ্ডে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার বর্ণে।

সর্দিবসা—সর্দিতে বগ টন্ টন্ করিলে ঘোষাল ফল চূর্ণের নস্ত গ্রহণে কক নিঃসারিত হইয়া উপকার হয়।

সর্দি—সর্দির প্রথম অবস্থায় কর্পূরের পুঁটুলি করিয়া আজ্ঞান লইলে কিম্বা কর্পূরের নস্ত লইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

স্তনে ঝুনকো—ভিনিষার গরম করিয়া তাহাতে বস্ত্রখণ্ড দিষ্ট করিয়া, তত্বারা ২৪ ঘণ্টাকাল স্তন ভিঝাইয়া রাখিলে ঝুনকার উপকার হয়।

হাত পা মচকান—কোন স্থানে খেবলাইয়া বা মচকাইয়া গেলে, কাঙ্কশটি অয়েল মালিস করিলে বিশেষ উপকার হয়।

হাঁপানি—২ আউল সোরা, ২ আউল জলে জ্ব করিয়া লইবে, পরে লোবেলিয়া, ট্র্যায়ে-নিম্ব কালচা প্রত্যেক চূর্ণ ২ আউল ঐ জ্ববে মিশ্রিত করিয়া গুচ্ছ করিবে তাহার পর ৫

কোঁটা অবেল ছানিসি সংযোগ করিয়া শিশির ভিত্তর ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিবে। হাঁপানির প্রবল অবস্থায় কোন একটা পাতে ঐ গুড়ার কিছু পরিমাণ লটখা আরিসংযোগ করিবে যখন উহা হঠাতে ধূম বাহির হইবে নাক মুখ দিয়া সেই ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানির যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়।

ভগম্বর—

১। সন্ধান পাতার কুঁড়ি ও বট পাতার কুঁড়ি বাটিয়া বাতি করিয়া ভগম্বরের ছিঁড়ের ভিত্তর পাঁচ সাত দিবস দিলে ভগম্বর ভাল হয়।

২। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বীরাঙ্গনের স্রাব উপবেশন অভ্যাশে ও বিরচন এবং বমন করাইলে রোগের উপকার হয়।

৩। সস্তীমূল কাঁচা হরিজা ও কৈলাপাছের নামলা (জ্বর) সমভাগে বাটিয়া ভগম্বরের ছিঁড় দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৪। গুচ্ছবেশে জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৫। শুঠ, পুনর্নবা, বটপাতা ও তুলক সমভাগে গ্রহণ পূর্বক বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভগম্বর রোগ আরোগ্য হয়।

৬। খেত আকস্মের আঠা, মনলাগিছের আঠা, দাকচিনি, হরিজা, এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহা এক-খানি নেকড়ায় মাখাইয়া গুচ্ছ করত তত্বারা বাতি নিৰ্গাণ করিয়া সেই বাতি-জালিয়া তাহার ধোঁয়া ভগম্বরে লাগাইলে ভগম্বর আরোগ্য হয়।

৭। পাখার রক্তের সহিত কেঁচো সিদ্ধ করিয়া তাহার লেপ গ্রহণ করিলে ভগম্বরের উপকার হয়।

৮। বিভালের হাঁড় ত্রিকলের কাছে  
মর্দন করিয়া তাহার দ্বারা লেপ দিলে ভগ্নদ্রব্য  
আরোগ্য হয়।

৯। পিপুল ও ত্রিকলা প্রত্যেক দুই  
তোলা গুণ্ণুল সহ তোলা এই সকল দ্রব্য  
দ্বুতের সহিত মাড়িয়া একতোলা পরিমাণে  
বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহা শীতল আলের  
সহিত সেবন করিলে ভগ্নদ্রব্য রোগ আরোগ্য  
হয়। ইহা দ্বারা অর্শ ও গৃহ রোগেরও  
বিশেষ উপকার হয়।

১০। ত্রিকলের সহিত কুঙ্করের হাড়  
সেবন করিয়া তাহা দ্বারা লেপ দিলে ভগ্নদ্রব্য  
জাল হয়।

১১। তিল, হরীতকী, নিমপাতা, হরিদ্রা,  
বচ, জুল এই সকল দ্রব্য সমভাবে লইয়া  
বাটিয়া লেপ দিলে ভগ্নদ্রব্য আরোগ্য  
হয়।

গীতের নালি দ্বা—রহন হিং এবং আক-  
শের আঠা একত্র করিয়া গীতের গোড়ায়  
মাড়িতে লাগাইলে আরোগ্য হয় এবং শোকা  
মরিয়া পড়িয়া যায়। (২) তেঁতুল পাতা  
ও লবণ একত্রে বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে  
কথঞ্চিৎ জালা করে বটে, কিন্তু বিশেষ  
উপকার নর্শে।

৫০

বঙ্গব্রত

## নিম্নোক্তাতির কর্মবীর



—  
বুকার টি ওয়াশিংটন

# গাহত্র



“বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পৃথাত্বমি। এই দেশ দিক  
গঙ্গাসঙ্গমভূত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্ভূতা ক্ষেত্র.....সাখ্যাসূত্র  
প্রণেতা কপিলদেব অত্র সকল দেশ ভাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন,  
তাহারই অংশাবতারগণ ছায়দর্শন বাগ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে  
অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রীতিপ্ৰিয়মুখপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।.....  
চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম  
পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—স্বক্সানুসন্ধ্যা তর্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-  
মার্গাবলম্বী শক্তিসমুদায়ের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও  
দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

কল কথ্য, সভ্যযুগে সরস্বতা-সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন  
এই যুগে ভাগীরথী-সম্ভ্রান্তদিগের প্রতিও সেই কার্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে।  
ইহাদিগেরই দেশে পূর্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।”

৩ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( “পুষ্পাভলি” )

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| ৬ষ্ঠ খণ্ড | চৈত্র, ১৩২১ | ৪ষ্ঠ সংখ্যা। |
| ৬ষ্ঠ বর্ষ |             |              |

## আলোচনা

১। নব্যবাস্তবালীর উপনিবেশ  
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবার পঞ্চাব বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ে রদায়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার  
জন্য আহূত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আচার্য্য  
জগদীশচন্দ্র ও পঞ্চনন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত  
হইয়া তাহার নূতন আবিকারগুলির বিবরণ  
চৈত্র—১

বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালী  
এক দিন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাও অগ্রাণী ছিল।  
আজিকার এই বরমুখোজ্ঞাতি কথেক পড়াশী  
পূর্বে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান, বর্মীপ,  
বলীদ্বীপ ও মালয়ে প্রিধ্য তাহাদের উপনিবেশ  
পড়িয়া তুলিয়াছিল। আর তাহারাই বর্ধ-

প্রচার, ব্যবসাবিভাগ ও বিবিধ উপলক্ষে এসিয়ার সভ্যতা আপনাদের দানে পুরিষ্ট ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। এসিয়ার কীবনে আদর্শের যে বিরাট ও গভীর ঐক্য আজ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, যে ধর্মাত্মবোধ এসিয়ার আভিগণের সভ্যতার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়া। বহিরাগ্রে, তাহাতে বাঙ্গালীর চিত্তের বড় কম নহে। আমরা এই সব তুলিয়া একেবারে জানে ও কর্ণে পল্ল হইতে বলিয়া আছি বলিয়া, কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের “আত্মবিস্তৃত আভি” বলিয়া দ্রুপ করিয়াছেন। আপনাদের প্রসিদ্ধ ভাবুক ও কাকুরা তাঁহার Ideal of the East নামক চিন্তামূলগ্রন্থে এসিয়ার অধ্যাত্মবোধ ও আদর্শে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাঙ্গালীর দান স্মৃতি কর্তে স্বীকার করিয়াছেন—

Down to the days of the Mahomedan conquest by the ancient highways of the sea, the intrepid mariners of the Bengal coast, founding their colonies in Ceylon Java and Sumatra, leaving Aryan blood to mingle with that of the seaboard races of Burmah and Siam, and binding Cathay and India fast in mutual intercourse.”

আরও বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতা তাহাকে উপনিবেশ গড়িবার দ্বার ভাঙিয়াছেন। এবার বিশ্বভ্রমণের মানবজাতির আশা আকাঙ্ক্ষার তাহাকে কুমার বাণী উপহার দিবার দ্বার, বহাযানবের বিরটের পথ বাঙ্গাইবার নিমিত্ত ভাঙ পাঠাইয়াছেন।

তিনি-নিবিশেষক বর্ষসপ্তমে বিবেকানন্দকে

পাঠাইয়া বিশ্ববর্ষে কবিদিগের ধর্মের ছাপ দিয়াছেন। জগৎজনাথ তাঁহারই কোণে বিশ্ব-ধর্মের ভারতীয় বর্ণন শাস্ত্রের মহিমা ছুটিয়া তুলিয়াছেন। আবার চরীশ্রমার্থের কবিতা ও গান আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন ধর্ম ও উপনিষদের উদার অধ্যাত্ম ভাব এবং চিন্তাভাবন গণতন্ত্রে সাহিত্যকে মহামানবতার অভিমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অগণীশতন্ত্র জড়বিজ্ঞান-সম্বন্ধ গম্ভীর প্রতীককে এক নৃতন বাণী শুনাইলেন। জড়বিজ্ঞানের সাহায্যেই তিনি জড়বিজ্ঞানের উপাসকদিগের চোখ ছুটাইয়াছেন। ভারতবর্ষের এই সাধক সন্তান আজ প্রাণের লজ্জা কি ব্যাপক ও গভীর করিয়া দিয়াছেন। তিনি পরিতর্কণে বলিয়াছেন “আমি জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বাংলা প্রকাশ করিয়াছি, নত নত বৎসর পূর্বে আমার পূর্বপুরুষ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।” বিশ্ব-বিজ্ঞান পাকাতা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাঁহাদের জানে-ব্রাহ্মে ভারতবর্ষের জানের উপনিবেশের স্থান করিয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বুঝাইলেন রসায়ন ইউরোপের একচেটিয়া নহে। প্রাচীনযুগের কবিগণ রসায়নে কতটা অগ্রগত ছিলেন তাহা এখন স্পষ্ট হইল। পরকে বুঝাইবার আগে যন্ত্রের-লোককে বোকা চাই আর পূর্ব পরিবার উপযোগী হইবার দ্বার আমাদের নিজের ঘরে আগ্রহ, চেষ্টা ভ্রাম ও সচল চাই। শিকারীপন আর বৃকে আশা বাগাইয়া তুলুন। ভারতবর্ষের নব্য-বিদ্যাধিবৃত্ত এখন নৃতন সফল ও ত্র্যাপের দীক্ষা লইয়া এই ব্রত গ্রহণ করুন। আর যে বিশেষ তাঁহাদের ভাঙ পড়িয়াছে।

## ২। পরলোকগত বদেশসেবক

মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে আর ইংলন্ডে নাই! কি বলিয়া বুঝাইব গোখলে মহোদয়ের মৃত্যুতে দেশের কি ক্ষতি হইল? যখন দেশের পক্ষে হু হু স্বার্থে জুঝিয়া যত্নে ও স্বজাতির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, নিজের স্বখস্বচ্ছন্দ্য, গৌরব আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলকে গ্রাসে করিয়া ফেলিয়াছে, নিজের গৃহপ্রাচীরের সন্ধ্যা পক্ষীয় বাহিরের কথা কেহ ভাবিয়া দেখে না, সেই ক্ষত্রে গোখলে মহোদয়ের মৃত্যু দেশের কি বিষম ক্ষতি! কে আজ তাঁহার স্থান পূরণ করিবে? লাহিতের, নিগুণীতের, নিরন্তর যত্ন কে আজ আপনার বুকের যত্ন ভাল করিতে আগ্রহের হইবে? স্বজাতির পক্ষা, যত্নের বেবনা আজ কাহার বুকে তেমন ভীতভাবে বাধিবে? সবকাজ দূরে ফেলিয়া, সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়া মাতৃভূমির কোন তরুসন্ধান আজ মাতৃচরণে আপনাকে উৎসর্গ করিবে? তেমন অসাধারণ প্রতিভা, প্রখর বুদ্ধি ও প্রচণ্ড চরিত্র বল লইয়া কে এখন এই দুঃস্থ বদেশসেবকত্বের গুরু অগ্রসর হইবে? জিহ্বাকোটা নরনাচারী অত্যাচার, দারিদ্র্য, অবনতির কথা কাহার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া ফেলিবে? সার্বভৌমত্ব আজ কি ভীত বেবনার আর্দ্রনাভ কৃটিয়া উঠিয়াছে! দেশের অত্যাচারী আজ মহাপোকে ও ব্যাভুলতায অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধি-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতসন্ধানগণ চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। তাহাদের এমন অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ, সর্বজাগ্রি হৃদয় ভারতবর্ষে আর কেহ নাই!

## ৩। জীবনকথা

গোখলে ইংরাজি ১৮৮৫ সালে কোলাপুরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘৃণে জন্ম গ্রহণ করেন। বাক্য-লার পুত্রবলিহ বিজ্ঞানগণের যেমন দারিদ্র্যের কষ্ট হাতে হাতে বুঝিয়াছিলেন, এবং বাংলায় অত্যাচার যত্ন করিয়া সর্বত্র বিলাইয়া দিয়া দারিদ্র্যের হাহাকার খামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাংলাবাধেই বুঝিয়াছিলেন কি জীবন ধীনতার পক্ষে দেশের লোক ভুবিতেছে। উত্তরকালে যখন যত্নের সেবকত্বের তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান এবং বিফল মনোরথ হইয়াও অক্লান্ত উৎসাহে, অপরাধিত আশার সর্বধর্মঘেটের ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে হুক্তির পর হুক্তি, হিসাবের পর হিসাব বেশিয়া নিরন্তর নির্ভীক বেশবাসীর মঙ্গলের জন্য ব্যগ্রভাবে তর্ক করিতেন, তখন তিনি সেই আগ্রহ হইলেন। হইতে দূরে প্রতিপালিত দরিদ্র বাপমার দরিদ্র সন্ধান এবং দেশের দেবার দারিদ্র্য অত্যাচারী গোখলে। বোধ হয় হু হু সমৃদ্ধি, বিলাস বিস্তারের সম্পর্কযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি এমন ভীত ভাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা অহনিশ ভাবিতে পারিতেন। গোখলে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে বোম্বাই এলফিন-টোন কলেজ হইতে বি. এ. উপাধি গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁহার ভীতবুদ্ধি, প্রগাঢ় প্রবীণতা, প্রখর প্রতিভা প্রকৃতি ও প্রবলী প্রকাশ পাইয়াছিল। যে ক্রিয়াটৈর্ঘ্য নানা বিপদীয় ও পরামর্শের মধ্যে তাঁহার আশা ও উদ্যম বাচাইয়া রাখিয়াছিল, পঠক-নাতেই বিনয়, মাধুর্য্য সৌম্য প্রকৃতি নানা-গুণের সহিত তিনি সেই অনন্ত সাধারণ গুণের অহুশিলন করিয়াছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য ও উদ্য-র্ঘ্যের মধুর সমাবেশকেই বিশ্বদৃষ্ট নেতৃত্ব

সাহেব গোথলে চরিত্রের "Sweet reason-ability" এবং Sweetness and light" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আর ইহাই তাঁহাকে নানা অবসাদ, বিকলতা ও প্রতি-কূলতার মধ্যে অবিস্তারিত ও কর্তব্যনিষ্ঠ রাখিয়াছিল। একটা প্রতিষ্ঠান ও আরত-ব্রতের অভাবে হৃৎ এইশব শুণ 'বারের' কাকন বরল নিকল আবর্তে তলাইয়া যাইত। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে পূর্ব হইতেই শ্রীযুক্ত আপু, আগরকার ও তিসক গ্রন্থ মহারাত্রের স্বনন্দানন্দ একটা ত্যাগনিষ্ঠ সেবার ক্ষেত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

• •

৪। দাক্ষিণাত্য শিক্ষাদানসমিতি গোথলের অগ্রবঙ্গিণ মহারাত্রের শিক্ষা-বিভাগের উদ্দেশ্যে "দাক্ষিণাত্য শিক্ষাদান সমিতির" প্রতিষ্ঠা করিয়া মারাঠা যুবকদের মধ্যে একটা নবজীবন সঞ্চার করেন। এই অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক তাঁহার সমস্ত উৎসাহ ও শক্তি লইয়া এট প্রতিষ্ঠানের বেনীতলে আত্মোৎসর্গ করিয়া যারিত্র-ব্রত গ্রহণ করেন। এই সমিতির সভাপন অমৃতঃ বিনবন্দর কাল তাঁহাদের 'কান্ত'ন কলেজে' ১৫ টাকা বেতনে অধ্যাপনা করিতে বাধ্য। গোথলে ইংরাজী সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও অর্থ শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে সবিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তাঁহার সর্ব-ভোসুখী প্রতিভা, কঠোর প্রমথীলতা ও উন্নত চরিত্রের প্রভাব কান্ত'ন কলেজের ছাত্রগণকে সজীব ও উদার করিয়া তুলিয়া-ছিল। সবদর সময়ে তিনি মহারাত্রের ঘরে ঘরে গিয়া এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সফল-

তার অল্প অর্থ ভিক্ষা করিতেন। কি বিষয় উপেক্ষা, নিষ্ঠুর উপহাস ও অপমান তিনি মাথা পাতিয়া লইতে বিকল্পিত মাত্র করেন নাই। অল্প কান্ত'ন কলেজ সববিধেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-মন্দির। ইহার বর্তমান অধ্যাপক ভারতবর্ষের প্রথম দিনির গাংলার শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম পরাম্পে তাঁহার গুরু উপযুক্ত শিষ্য। তিনি সেই পঁচাত্তর টাকা আর অধ্যাপকের বৃত্তি পঁচিশ টাকা মাত্র লইয়া "কান্ত'ন কলেজে" যারিত্র-ব্রতচারী অধ্যাপক! অধ্যা-পনার কঠোর দায়িত্ব ও পরিজ্ঞানের মধ্যেই গোথলে দেশের বৃহত্তর এবং মহত্তর সেবার জন্য আপনাকে গড়িয়া তুলিতে ছিলেন। পরিণেমে এই দেশ-সেবাব্রতের একাগ্র সাধ-নার জন্য তিনি বিনবন্দর অধ্যাপনার পর ২২৭ টাকা পেন্সন গ্রহণ করিয়া আপনাকে রাস্ত্রনোতি সম্বন্ধীয় কাজে যোগ দান উৎসর্গ করেন।

• •

#### ৫। মহাদেব গোবিন্দ রানাডের শিক্ষা

গোথলের জীবনের প্রারম্ভে মহাদেব গোবিন্দের সাহচর্য্য ও শিষ্য এক অপূর্ণ ঘটনা। আলত, অটনক্য, অজ্ঞতা ও হীনতার নিমজ্জিত মারাঠা ব্যক্তিকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও ত্যাগনিষ্ঠ চরিত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে কর্তৃত্ব ও মহত্বের উপযোগী করিতে হইবে—এই মহাপুরুষের ইহাই জীবনের একমাত্র আশা ও সাধনা ছিল। ইহার চরণ তলে বসিয়া বিবিধ শুণাধার ত্যাগব্রতচারী গোপাল কৃষ্ণ গোথলে হৃদয় চতুর্দশ বৎসর কাল



প্রাচীন যুগের নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দে  
কঠোর সাধনা করেন তাহার ফলে তিনি  
অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ  
দেবকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই হস্তচাপা  
দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে  
পারিয়াছিলেন, এবং এইরূপ দৃঢ় সাধনাই  
ভারতবাসীর সমক্ষে বশেষ দেবাকে ধর্মের  
পবিত্র আগনে বসাইয়াছে। রাণাড়ে লোক  
বাঙ্কিতে পারিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও  
অসাধারণ লোকচরিত্রজ্ঞান কি অপূর্ণরূপেই  
বাঁছিয়াছিল! যখন যুবক গোথলের পরাজয়  
ও নৈরাত্তের অবশ্যে দেখা ও বিদ্যাপ টলিত  
তখন এই বিজ্ঞ মহাশয় নেতার দৃঢ়তা ও  
আত্মশাসনীয় তাঁহাকে আবার আরও তত্বের  
অহুতানে প্রবর্তিত করিত। বাস্তবিক  
রাণাড়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ-সাক্ষ্য প্রকট  
কীষ্টি গোথলের চরিত্র গঠন। নিজের  
জীবনের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বিধা আর একটি  
একাগ ও পক্তিশালী স্বরূপে মাতাইয়া  
তোলা, নিজের আদর্শ, নিষ্ঠা, চরিত্র, ভ্যাপ  
ও কার্যের দ্বারা আর একটি বীরস্বরের  
নীক্ষা ও সাধনা এমন সাক্ষ্যোগ্রুণ করার  
সৌভাগ্য ইহার ঘটে সেই গুরুতর জীবন  
সার্থক। আর এই অবসর ভাতিকে নবজীবনের  
নবীনপঙ্কিতে সজীবিত করিতে হইলে  
সেইরূপ গুরুতরই প্রয়োজন সর্বত্র।  
গোথলে রাণাড়ের দৃঢ়তার পর তাঁহার  
নীক্ষার ফল কি আবেশপূর্ণ তাহার প্রকাশ  
করিয়াছেন!

• •

#### ৬। জীবনের কাজ—কংগ্রেস

১৯০৭ খৃঃ অব্দে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের  
বিষয় অহুতানের জন্ত যখন বিলাতে

ওয়েলবি কমিশন বসিল, তখন যুবক গোথলে  
বেতন নিশ্চিন্ততার সহিত ভারতবাসিন সম্বন্ধে  
পুথ্যপুথ্যরূপে হিসাব নিকাশ দেখাইয়া  
—কিন্তু সাময়িক বিভাগে অল্পসংখ্যক  
বাহ্য্য ঘটতেছে, উক্ত পদসমূহ হইতে ভারত-  
বাসীদিগকে দূরে রাখা হইয়াছে, দরিদ্র  
এবার করভার কিন্তন দুর্গত হইয়াছে প্রকৃতি  
—বিবিধ জটিল বিষয় বেশ প্রাক্কল রূপে  
বুঝাইয়া যেন। ওয়েলবি কমিশনে গোথলের  
সাক্ষ্য ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে  
তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা সর্বসাধারণের  
সমক্ষে বেশ হুস্পষ্ট করিয়া তোলে। তিনি  
সারাজীবন কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন।  
অল্প বয়সেই ইহার সম্পাদকের কাণ্ডের  
গুরুতর তাঁহার স্বচ্ছ পড়ে। তিনি সে  
দায়িত্ব বখালায় পালন করিয়াছিলেন।  
১৯০৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি  
রূপে বেশ দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্তব্য  
পালন করেন। কংগ্রেস গোথলের জীবনের  
সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।  
আজকালের কংগ্রেসওয়ালগণের মধ্যে  
তাঁহার মত কংগ্রেসের কাছে এতটা সমর,  
পক্তি ও পরিভ্রম কেহই যেন নাই। আর  
এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিভ্রমের জন্য তিনি  
তাঁহার দেশের স্বাধীনতা অধিকার করিয়া-  
ছিলেন। তাঁহার মত, তাঁহার সিদ্ধান্তই  
আজকাল কংগ্রেসে গৃহীত হইত।  
কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই তাঁহার প্রভাব  
বেশ হুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তাঁহার  
স্বদেশসেবা আর দশটা কাজের মধ্যে একটা,  
অথবা অবসর বিনোদনের সামগ্রী ছিল না।  
তিনি সারা বছর ধরিয়া ইহার জন্ত ব্যটিতেন,  
তিনি দিনের বহুত। যুগ্মিত পোলিটিক্যাল  
পার্কণের অবশ্যে সব ব্যটিয়া কোলিয়া

আহার স্বার্থের সন্ধানে ঘুরিভেঁদে না।  
আজকাল কংগ্রেসের জীবনীশক্তি কী  
হইয়া পড়িতেছে, দেশের সহিত ইহার চিত্তের  
যোগ কবেই শিথিল হইতেছে, কংগ্রেসের  
কালকর্মে একটা অধঃ পতনের ভাব দেখা  
দিয়াছে এবং নবাসম্প্রদায়ের উৎসাহ  
কংগ্রেসের কাছে তেমন জাদিয়া উঠে না—  
এই সব লক্ষণগুলি তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত  
করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের লোকের  
কাছে ইহাকে পরিচিত করিবার জন্য, কংগ্রেস  
দেশবাসীর আপনার জিনিষ, সাধারণের  
স্ব স্ব হুঃখ লইয়াই এই বৈঠক, আমাদের  
সকলেরই ইহাকে অথও সম্পত্তি বলিয়া  
ভাবিবার অধিকার রহিয়াছে। এক ভারত-  
বাসীর দেশের কাছে মিলিবার ইহাই  
একমাত্র বিরাটক্ষেত্র, ইহাকে বাচাইয়া  
রাখা ও শক্তিমান করিয়া তোলা আমাদের  
সকলেরই কর্তব্য, এই সব অতি প্রয়োজনীয়  
কথা দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য এবং  
ইহার কর্মক্ষেত্র উদার করিয়া দিবার নিমিত্ত  
কর্তৃমান কংগ্রেসওয়ালারা নেতারা এখন কি  
পথ অবলম্বন করেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

• • •

#### ৭। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা

গোলালকৃষ্ণ মোখলের জীবনের আর  
একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ইণ্ডিয়ান লেজিস্-  
লেটিভ কাউন্সিল। ১৯০০-১৯০১ খৃঃ অব্দে  
বোম্বাই ল্যাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি  
বেরূপ নিপুণতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের  
পরিচয় প্রদান করেন তাহাতে ১৯০২ সালে  
বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নামজাভা মন্ত্রকের  
ফিরোজ সা খেটার পরামর্শের পর মোখলেই  
বড়লাট কাউন্সিলে তাঁহার প্রবেশের বৈশিষ্ট্য-

কারী সদস্যবৃন্দের মূখপাত্র স্বরূপ প্রেরিত  
হেন। তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁহার  
এই সদস্যগিরি নিরবচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন।  
কাউন্সিলে বহুতর বক্তৃতায় তাঁহার অর্থনীতি-  
শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি,  
বক্তৃতা নৈপুণ্য ও ভবিষ্যৎদর্শিতা প্রকৃতি  
গুণসমূহের প্রকট পরিচয় দেশের লোক  
পাইয়াছিল। মোখলে একাই একমুখ ছিলেন।  
যোটা বেতনভোগী বড় বড় সাহেব কর্ম-  
চারীরা তাঁহার প্রশংসা ও তর্ক সমূহের উত্তর  
দিতে পদদ্বন্দ্ব হইয়া পড়িতেন। তিনি  
বার বার বিফলকাম হইয়া ঘরে ফিরিতেন।  
কিন্তু সবাই বুদ্ধিত তাঁহার বক্তব্যগুলি  
কিছুণ অকাটা পারবান। মোখলের বহুতর  
বক্তৃতা তাঁহাকে বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত  
করিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী তখন  
বুদ্ধিমান হইয়া তাঁহার 'কেবো (practical)  
জ্ঞান'টা তেমন পরিপূর্ণ হয় নাই, তাঁহার  
বাস্তবতা-পাণ্ডিত্যে, সমস্যা-নৈপুণ্যে আর  
বেশী দিন চিন্তা ভাবিবে না "ক্যাটিন ও  
কিগার" বাঙ্গালী তেমন কার্য্য করিতে  
পারে না, যেখানে স্বতন্ত্রা-বুদ্ধি এবং  
পঞ্জীরতার দরকার সেখানে বাঙ্গালী হুটয়া  
যাসে। এক প্রদেশে বহু ব্যক্তি তাঁহার  
কোন বাঙ্গালী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ভারত-  
বর্ষের অর্থনীতি সমস্যা পড়িত। বোম্বাইতে  
পারিয়াছেন? ইহাতে যে বছরের পর বছর  
ধরিয়া বুক, পেপেটবার ও রিপোর্টের  
বিরট তুলু খাটিয়া আরম্ভ করিতে হয়,  
তাঁহা তাঁহা পল্লবগ্রাহিতা যে এখানে থৈ  
পায় না! বাস্তবিক বাঙ্গালীর এ লক্ষ্য যে  
কবে কোন প্রশ্নভানের ক্ষেত্র সাধনায়  
দূর হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। রাজ-  
দিন প্রাপণে ব্যটিয়া মোখলে তাঁহার বহুতর

বক্তৃতা প্রস্তুত করিতেন। সরকারী কাগজ পত্রে নির্ভর করিয়া তিনি যখন সরকার পক্ষের প্রস্তাব ও চুক্তির বিকল্পে তর্ক করিতেন, তখন বাঙালী বিষয়ে অস্বাভাবিক হইয়া তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কঠোর অসম্মিলিতা ও বশেষের প্রতি নিবৃত্ত প্রকার পরিচয় পাইত। গোথলের বড়ো বক্তৃতা প্রত্যেক দেশভক্ত ভারতবাসীর পাঠ্য। একান্ত কর্তব্য কিন্তু সাধারণ হুক্তি, সত্যের বেদনা, নির্ভীক মতা ও অচ্যুত ঈশ্বর সেই দুই বক্তৃতার পক্ষে পক্ষে দৃষ্টিগোচরিত। তাঁহার স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই বিশ্ববে প্রচার মন্তক নস্ত করিত। পৃথিবীর রাষ্ট্রসংগঠিত আশাব্যবহার গোথলে যে কোনও বাস্তবপূর্ণ পক্ষের সৌন্দর্য বুদ্ধি করিতে পারিতেন, আর ভারতবর্ষেও তিনি স্বদেশ সেবার ও সাধনার একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন।

কলতার-প্রদীপিত ভারতবাসী কল্পিত দিন দিন বাড়িতেছে। ছবিতেছে, আর সাময়িক বিভাগের খরচ কিছপ আত্মাধ বাড়িতেছে এই কথাগুলি গোথলে বার বার নির্ভীকভাবে সরকারী কাউন্সিলে প্রমাণ করিবার জন্য বক্তৃতা করিতেন। কত তীব্র মেধ, কঠোর প্রতিজ্ঞা তিনি অমানববনে সহিয়া যাইতেন। বাস্তবিক তাঁহার ধৈর্যের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। লোকের স্বভাবের বাহ্যতে লাগব হয়, লজ্জা কোমার ঘেঁষা ইচ্ছাষ্টে ক্রিয়াক্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের নীচ কৃষকসম্প্রদায়ের জন্য সেই-রূপ ব্যাক খোলা; বেগে খাল খনন নহনদীর লুপ্তকার প্রকৃতির দ্বারা অনারুণের দিনে ক্রিয়াকর্মের সুবিধার জন্য প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা; উন্নত বঙ্গবিজ্ঞান সম্বন্ধী এবং বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রবর্তন; এই বহু-

রোগজীর্ণ জনসমষ্টির স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা; লবণের কর এবং অস্ত্রান্ত বহুত্বের হ্রাস প্রভৃতি অনেক কল্যাণকর প্রস্তাব তিনি কাউন্সিলের বৈঠকে বাণিজ্য করিতেন। যখন বক্তৃতা সমাপ্ত হইয়া বাঙালীরা বিচলিত হইয়া পড়েন এবং একটা তীব্র অশান্ততার প্রভাব দেশময় ব্যাপ্ত হয়, পূর্বমুখে যখন বিবিধ যখন নীতির প্রবর্তন করেন এবং পূর্ববঙ্গালায় ফুগার সাংস্বেদন কঠোর শাসন আরম্ভ হয়, সেই সময় গোথলে মহোদয় কাউন্সিলে এবং বিলাতে বাঙালীর স্বপক্ষে বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার বিস্তার প্রমাণ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ল্যাট কাউন্সিলে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বাখাতা মূলক।

• •

### ৮। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন-বিষয়ক প্রস্তাব

দেশের গভীর করা ৫০ জন মাত্র লিখিতে, অর্থাৎ নাম লিখিতে ও পড়িতে পারে, আর ইহার বাহিরের বিরাট জনসমষ্টি একবারে অক্ষর পরিচয় বর্জিত! ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, জাপানে এবং ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জ আইনের সাহায্যে বাধ্য করিয়া লেখাপড়া শিখান হয়। ব্রিটিশ শতবর্ষমুখের মত মূল্য ও উন্নত শতবর্ষমুখের বাহ্যতে এই প্রাচীন জাতিকে অক্ষর আইনের সাহায্যে শিক্ষার পথে অগ্রসর করিয়া তোলা, আমাদের দেশবাসীগণের এই পোচনীয় অজ্ঞতা বাহ্যতে দূর করিবার একটা উপায় হয় গোথলে তৎকাল তাঁহার আইনের বঙ্গ কাউন্সিলে বাণিজ্য করেন। ভারতবর্ষের বহুস্থানেই গ্রামে নগরে তাঁহার প্রভাবের সন্ধান করিয়া বহু সভা হয়। তিনি স্বয়ং

অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া তাঁহার প্রত্যাবের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইয়া যেন। দেশের চতুর্দিকেই এই প্রত্যাব বেতন আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সমর্থিত হইয়াছিল তাগাতে কেবল কেবল ভাবিয়াছিলেন পঞ্চমেন্ট কিছু না করিলে হইত আমরা আপনাতাই এ বিষয়ে কিছু করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু সত্য সমুখা রাখিল করিয়াই অন্তিম অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়েও আমরা কর্তব্য দাখ করিয়া বসিয়া আছি। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহ গোখলের পাতুলিপির প্রতিবাদ করেন এবং পরে ইহা বড়লাট কাউন্সিলেও প্রত্যাখ্যাত হয়। গোখলে অবশ্য একজন বিষয়ে ধর্মিবার পাত্র ছিলেন না, তিনি বাচিয়া থাকিলে আবার তাঁহার বসন্তা রাখিল করিতেন। এখন ইহাই ভাবিয়া যেবিবার বিবর শিক্ষিত ভারতবাসীরা তাঁহাদের নিজ চেষ্টায় তাঁহাদের স্বজাতীয় কোটা কোটা নরনারীর এই পশু মোচন করিবার ক্ষমতা কোনও উপায় করিতে পারেন কি না। স্বদেশবন্ধু গোখলে

"এই সব সূত্র জান মুকমুখে দিতে হবে ভাষা।  
এই সব সত্য শুক তর বৃক ধনিয়া তুলিতে  
হবে আশা।"

এই সাধনাও ভগবান্দা সইয়া বিকলতার বিফলতা সহিয়া তাঁহার বাহা করিবার ছিল করিয়া গিয়াছেন। গোখলের শোকে বাহাতা আত্ম বিলাপ করিবার ক্ষমতা করিতেছেন, তাঁহার একবার ভাবিয়া ধৈর্যবিনে শিক্ষার প্রদান দ্বারা চাকারকরা নিরক্ষর ১৯১ জনের অজ্ঞতা ও নিরাশার আধারে শিক্ষার আলো জালিবার ব্যবস্থাও করিতে পারিলে দেশের এই পরলোকগত ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী সত্যানের স্মৃতির প্রতি প্রকৃষ্ট সম্মান দেখান হইবে।

মুক্তগর্ত বক্তৃতায় এইরূপ কর্মবীরের সম্মান অদ্বিতীয়।

### দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতসন্তান

বহুদিন হইতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সন্তানেরা নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। দিনের পর দিন কঠোর আইন প্রবর্তিত হইয়া তাহাদের সেখানে ভিটান ভার করিয়া তুলিতেছিল। মহাপ্রাণ গান্ধী এবং তাঁহার সঙ্গিগণ প্রাণপণ করিয়া সেই সব কঠোর আইনের বিরুদ্ধে জুড়িতেছিলেন। ভারত-বর্ষেও তাহার এক একটা দাক্ষা আদিয়া পৌছিতেছিল। শেষকালে ব্যাপার বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল। প্রবাসী ভারতবাসীরা অবশেষে "প্যানিভ রেমিসট্যান্স" অর্থাৎ অত্যন্ত আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে বাঁধা আরম্ভ করিলেন। গান্ধী, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণ বারবার জেলে গিয়া সাধারণ লোকের মনে একটা প্রবল উৎসাহ ও মূঢ়তা জাগাইয়া তুলিলেন। গোখলে ভগবান্দা সইয়া চিকিৎসকের বাধা নিষেধ না মানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার স্বদেশবাসীর বতটুকু সুবিধা করিতে পারেন তাহার ক্ষমতা প্রটোরিয়াম ট্রান্সভাল গভর্ণমেন্টের বড় বড় কর্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন লোকে বুঝিল বৃষ্টি বা একটা কিছু আপোষ হইয়া গাইবে। কিন্তু আবার কঠোর আইনের বস্ত্র ছাড়ার করিয়া উঠিল। এবার লর্ড এমন্টহিল, গোখলে প্রকৃতির সহিত বৃষ্টি করিয়া গান্ধী বিপুল প্যানিভ রেমিসট্যান্স জুড়িয়া দিলেন। হুজুর, হুজুর নরনারী আদিরা ইচ্ছাভেদে ক্ষমতা কাব্যও সাধারণ

পাতিয়া লইতে রাজি হইল। কিন্তু তাহাদের  
অল্প টাকা চাই। গোথলে মতোবধ বেশে  
আসিয়া ভারতবাসীর ঘরে ঘারে ভিক্ষাপত্র  
হস্তে লইয়া আমাদের প্রবাসী ভাই বোনদের  
অল্প অর্থ ভিক্ষা আদায় করিলেন। তখন  
পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কার্যে তিনি ব্যস্ত,  
জংগলের দ্রিষ্টা দুর্কল হইয়া পড়িতেছে,  
পরীক্ষার যোগে ও পরিভ্রমে অবসর। কিন্তু  
বায়ের প্রতি দৃষ্টিতে না করিয়া যত্নে  
এই বরণ্য সন্ধান অধ্যয়ন সভা সমিতিতে  
দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তৃতা  
আদায় করিলেন। ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষই  
একটা ভীষণ সমবেদন। ছুটিয়া উঠিল।  
ভারতবাসী ধনী নির্ধন অকাতরে অর্থ  
দান করিয়া দেখিল ভারতে এক গভীর এক-  
প্রাণতার মধুর মৃত হুগাইয়া তুলিয়াছিল।  
বড়লাট লর্ড হাডিং মুক্তকণ্ঠে প্রবাসী ভারত-  
সন্তানদের প্রতি তাঁহার সহৃদয়ত্বিত ঘোষণা  
করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিশনে  
ভারত প্রবাসীর স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত তার  
বেজামিন হবার্টসনকে পাঠাইলেন। ত্যাপত্র  
কর্মযোগী গোথলে নিজের সঙ্গে টাকার দায়িত্ব  
বোঝান্ধা গ্রহণ করিয়াছেন, দিনরাত মৃত্যুর  
শঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া ঘরে ঘারে অর্থভিক্ষা  
করিয়া বেড়াইতেছেন, কালেকাছেই রানি  
'রানি টাকা' আসিয়া স্তুতিতে লাগিল।  
যেথিতে যেথিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা  
উঠিয়া গেল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গোথলে  
দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারত সন্তানদের কাহিনী-পূর্ণ  
একএকটা "বুলেটিন" প্রকাশ করিয়া দেশের  
লোকের নিকট তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা স্পষ্ট  
করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বাস্তবিক  
তখন আয়ারল্যান্ড বৈদেশিক নিগম  
আগ্রহে তাহাদের দীর্ঘতাই বোনদের কথা

মানিবার অল্প সংখ্যকের প্রতীক। করতেন।  
দক্ষিণ আফ্রিকার গোথলে এমন অনেকটা  
মিটিয়াছে। গোথলে মৃত্যুর শূন্যে তাঁহার  
পরিভ্রমের ফল দেখিয়া গিয়াছেন। ইহাই  
একটি আমাদের সাধনা।

### ১০। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

যখন সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে তদন্ত করিবার  
অল্প কমিশন গঠিত হইল, গোথলের নাম  
সমস্ত তালিকাধ দেবিয়া লোকেরা তাহাছিল  
ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া বলিবার অল্প অল্পতঃ  
একজন সর্বাংশে উপযুক্ত লোক কমিশনে স্থান  
পাইয়াছেন। বিলাতে গিয়া তখন বয়সে  
আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্রদের অনেকের  
পক্ষেই কঠোর "নিভিল সার্ভিস" পরীক্ষা  
দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। বহু মেধাবী  
ছাত্র এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চস্থান  
অধিকার করেন, তাহাদের তীক্ষ্ণ প্রতিভার  
পরিচয় শিক্ষিত লোকেরা পান, কিন্তু বিলাত  
বাণ্যার ও বিলাতে বাবিতা পড়ার খরচ  
যোগাইবার ক্ষমতা কমিশনের আছে? অত  
অল্পবয়সে কাহারও কাহারও অতিভাবক  
বিশেষে ছেলের পাঠাইতে নারাজ, এবং  
কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা  
অগ্রাহ্য করিয়া বিলাত বাণ্যার যত্নে উঠে না।  
হাতে বিলাতে ও এখানে নিভিল সার্ভিস  
পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এবং  
তীক্ষ্ণ ছাত্রদের দায়িত্ব, সামাজিক বাধা  
প্রকৃতি তাহাদের নিভিল সার্ভিসের অন্তরায়  
হইতে আর না পার সেইজন্য দেশে অনেক-  
দিন থরিয়া আশ্রয় চলিতেছিল। কমিশনে  
আমাদের গোথলে ছিলেন, সুতরাং আমরা  
তাহাছিলাম এবার ভারতীয় ছাত্রদের এই

বিষয় অস্থিহাঙ্গুলির স্বভাব একটা কিছু প্রতীকার হইবে। তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, চিকিৎসকেরা বার বার খাটিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন ঘোষলে প্রতিকূল সাক্ষীদের কুটুভুক্তি নিরন্তর উদ্ভব হইতেছে। কহিতেন এবং নিজে গ্রন্থ করিয়া অনেকে সতল সত্যকথা বলিবার সুযোগ দিতেন। চণ্ডাৎ বুদ্ধ বাচিয়া বাগ্ধায় কমিশনের কাজ স্থগিত হইয়া সেল এবং রিপোর্ট বাহির হইতে বিলম্ব ঘটিল। গোথলের স্বাস্থ্য ক্রমেই আপদাঙ্কনক হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কতদিন তাঁহার বন্ধুদের কাছে প্রাণের বেদনায় আক্ষেপ করিতেন “হয় ত বা জীবনের এই কর্তব্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কমিশনের রিপোর্টে আমার যশেবাসীর হইয়া কত কথা বলিবার রহিয়াছে কত বিকটভুক্তি বণ্ডন করিব মনে করিতেছি, কিন্তু জানিনা এই কর্তব্য্যপালন করা এজীবনে খট্টা উঠিবে কি না।”

এই আক্ষেপের কথাগুলি গোথলের বন্ধুদের ব্যাঙ্কল করিয়া তুলিত, তাঁহার্য্য শরীর খেদের সহিত নিরন্তর বিকটবনার কথা তাবিতেন। হায়! আত্ম গোথলে নাই। কমিশনের রিপোর্টে আদ্যদের হইয়া কে তেমন সারবান্ ও একটা মুক্তি প্রার্থন করিবেন? কাহার অগাধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি ও একনিষ্ঠ বেশ-তক্তি কমিশনের সিদ্ধান্তে ভারতবাসীর স্রাব্য দাবীগুলি সরল করিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিবে? ভারতবর্ষের বহু সরকারী বিভাগের উচ্চ কাৰ্য্যগুলি ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে, এক ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বরচে ও বেদের অবস্থা বাহ্যিক। বুকেই সেইরূপ লোকের দ্বারা কাজ চালাইবার প্রচুর সুযোগ মিলিবে, আদ্যদের বেশবাসিগণ স্বত্বহীন ও

দায়িত্বশূণ্য কর্তৃক পাইলে তাঁহার চরিত্রের উচ্চ গুণগুলি অতিরিক্তমধ্যেই ফুটিয়া উঠিবে, তাঁহার্য্য দায়িত্বজ্ঞানের ও চরিত্রবলের পরিচয় নিবার সুযোগ পাইয়া আদ্যদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিবেন—এই সব কথা গোথলে বাচিয়া থাকিলে একটা মুক্তি দেখাইয়া বলিতে পারিতেন।

• •

### ১১। ভারতসেবক সমিতি

আদ্যদের দেশের একটা মত অভিশাপ যিনি বড়, তিনি একলাই বড়। তাঁহার চরিত্রের গুণগুলি আর দশজনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে না। সাধারণ লোক, তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র সর্কারী আটপোরে জীবন লইয়াই ব্যস্ত মহৎ চরিত্র আদ্যদের কাছে সম্মানের ও স্রাব্যের মিলিবে মাত্র। সাধারণের জ্বরে মহত্তের ভাব ফুটাইয়া তোলা তাঁহাদের কার্য্য মহত্তের আরম্ভকার্য্যের সংযোগ ঘটান অথবা মহত্তের সাধনা ও সম্বলের প্রসারের জন্য নিজেদের জগৎ স্থলিয়া দেওয়া আদ্যরা দেখিতে পাই না।

বড়লোকেরা বেন উচ্চর মত আদ্যদের দায়িত্ববান্ হুটিয়া আসিয়া পড়েন, ভারতের জালিয়া শেষ হইয়া যান। আদ্যরা বানিককণ একটা উত্পাদ ও দীপ্তি ভোগ করিয়া লই আর দুই একবার বিশ্বের চাহিদা থাকি। সে আশুন সে উচ্চনা আদ্যদের প্রাণে ছড়াইয়া পড়ে না, আদ্যদের ক্ষুদ্রতায় অভিজ্ঞত হীন-স্বার্থ-সর্কারী-জীবনগুলিকে লুপ্তি করে না। বেশে কত বড় বড় সম্বল দেখা বিদ্যাহে, কত বড় কাজ আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের আদ্য করিয়া গেলি আসিয়াছি, তাঁহাদের সম্বল সম্বলই প্রায় হুটিয়া গিয়াছে—এই একমাত্র অস-

বস্তী আনিয়া সেই সব ত্রুটির ভার ও মাথা পাতিয়া লব নাই। অর্পণ দাননঃ অসমাপ্ত কথের সিদ্ধির লক্ষ্যে আর বশতেনের প্রাণে আগ্রহ আনিয়া উঠে নাই, একটা মহত্বের স্বাক্ষরও আমাদের হৃদয় মহত্ব লাগে না। যতদিন আমরা একত্র থাকিব, মহৎকার্য্য, মহৎসুত্র যতকাল থাকি বিশেষের চেষ্টায় সীমার মধ্যেই রহিয়া যাইবে এবং সমাজ যতদিন রক্ষণাবের এক রাজির দর্শকের মত একটা উদাসীন বিষয় ও প্রশংসার করতালি দিয়া প্রভাতেই 'খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড়ের' মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করিয়া কেলিবে, ততদিন এই দেশের চারিদিকেই আমরা বিকলতার ভয়ঙ্কর, বারংবারের বিক্ষিপ্ত কড়াল দেখিব !

..

## ১২। সাহিত্য সংরক্ষণ-নীতি

আমরা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া কল-সাহিত্য সংরক্ষণ নীতির প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। বাহিরের ভাল ভাল ভাব ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দ্বারা বঙ্গভাষাভিজ পাঠকেরা আনিত্তে পারেন সেই কথার সবিত্তরে আলোচনা করিয়াছি। পাকাতা দেশের অনেক চিত্রাশিল্প ও জ্ঞাতব্যতা পূর্ণ পুস্তক আমাদের দেশের মৃত্তিমের ইংরাজী নবীণেরা মাত্র পড়িয়া থাকেন। বহু দেশের অসংখ্য গ্রন্থ নদীর মত জ্ঞান-রাশি বহিয়া আনিয়া আমাদের জাতির হৃদয়সমূহে ঢালিয়া দেয় না—কতদিন আমরা মাতৃভাষার সাহায্যে বিস্মের বৃত্ত, বৃত্ত ভাব ও জ্ঞানের পরিচয় লাভের বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আমরা ক্র.জ.সি. পিছাইয়া থাকিবই। ইংরাজী কখন কবে ? আর ইংরাজী ভাষা

লিখিত বিষয়গুলি আহরণ করিতে কি বিষয় পরিশ্রমই না করিতে হয় ! আমাদের নিজের ভাষায় উচ্চ বিষয় সমূহের পুস্তক থাকিলে কত অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে কত বেশী লোক আর জ্ঞানলাভ করিতে পারিত ! আমরা ইংরাজী ভাষায় বড় বিষয়গুলি লিখি। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখযোগ্য করণনা পুস্তক রচিত হইয়াছে ! বঙ্গভাষা ভারত-বর্ষের সকল ভাষার অগ্রণী। বাঙ্গালী ভাষার মাতৃভাষাকে বতটা পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছে ততটা ভারতের অল্প প্রদেশবাসিনগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ত এই অবস্থা। সাহিত্য-পরিবহ সাহিত্য-পাঠন এমন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন পুষ্টির লক্ষ বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অল্পবয়সের এবং দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ গ্রন্থনের বন্দোবস্ত করন, দেশের মধ্যে ইহার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা লইয়া নিযত তোলা পাড়া ককন এবং দেশের কৃত-বিদ্য ও শক্তিশালী লেখকগণ দ্বারা এই কার্য্যে হতক্ষেণ করেন সেই বিষয়ে লম্ভে হউন। এখন সাহিত্যক্ষেত্রে "সংরক্ষণ-নীতি" নিত্যস্বই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের চিন্তার রাজ্য বহু বিদ্বত হইয়া পড়িবে, আমাদের জনসাধারণ বহু বছরে জ্ঞানের লগতে একশতাব্দী অগ্রসর হইয়া আসিবে। আজ যে সাধারণ বিষয়ে কিছু একটা বৃত্তিতে হইলে পরের দুরূহ ভাষার পরণাপর হওয়া ছাড়া আর গতি নাই, এবং সে লক্ষণ কেবল মাত্র জনকতকের পক্ষে উন্মুক্ত। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা হইলে আমাদের এই দুর্গতি মোচন হইবে। ইংরাজী জ্ঞানবশিত বিরাট

জনমভুলী কোট বড় অনেক বিষয়েই শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। জনসাধারণের জন্মে ভাষার বিস্তার না ঘটিলে, বিবিধ ভাষার সমাবেশ না হইলে আর যে কোটী কোটী লোকের সত্যতা ঘুচিবে না, তাহাদের কর্মশক্তি ও যোগ্যতা ক্ষুণ্ণি পাইবে না। সংস্করণীতি অহুসারে কয়েক বছর কাল চলিলেই আমরা বুঝি আমাদের আশে পাশের লোকের জ্ঞানের পরিধি কতটা বাড়িয়া গিয়াছে। যে সব বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আমাদের উন্নতির পথে বাধা বলিয়া চৈত্রিতেছে সেটা আপনা আপনি দূর হইবে। বাঙ্গালা ভাষার পাঠকেরা বিনা আশ্রয়েই প্রচুর উন্নতি করিয়া ফেলিবেন। তখন বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর সমস্ত কর্মের একটা বিস্তৃততর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাস্তবিক এখন আর আমাদের সাহিত্য-সেবিত্বের এবিষয়ে উদ্বাসীন হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা আপনারা নিজেদের যোগ্যতা ও শক্তি অহুসারে কিছু কিছু কালের ভার গ্রহণ করুন। বাঙ্গালী আর চাষা তুলিয়া এবং বানশীল খনো মহোদয়গণ অর্থদান করিয়া এই ব্রত পালনের নিমিত্ত সুযোগ্য লোক নিয়োগ করিবার জন্য কৃতদয় হউন। কলম্বল আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পর যেমন মানুষ বৃত্তিল পৃথিবী আরও কতবড়, তেমন বঙ্গভাষার বিবিধ সাধারণ এবং উচ্চ বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বিপুল বাঙ্গালী পাঠক সম্ভব হইবে পৃথিবীর জ্ঞানের রাজ্য কি বৃহৎ এবং আনন্দকাল যাত্রার সাধারণ পাঠক কতখানি জ্ঞান ও চিন্তা আপনাদের সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। তার পর বহু বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটিবে, বহু

সত্যতা ও নীচতা আপনা হইতেই অপ-সারিত হইবে। বাঙ্গালীর চিন্তা বাঙ্গালীর কর্মশক্তি তখন অসংখ্য দিকে ছুটিবে। এই কাজটি ঘর হুলস্থল হইতেই তবে জ্ঞানের অসংখ্য আধার ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইবে এবং সেই সকল অন্ধকার কক্ষের রক্তরাশি আমাদের জনসমষ্টির চোখের সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

### ১৩। বড়লোক

আমি বেশেদের একটা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠি-  
য়াছে—মহুদ হইতে হইবে। বড় হইতে হইবে।  
যারাজের বড়লোক কাহারো পেন বিষয়ে  
আলোচনা করিব। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাদের  
কাজের আভাস দিব। বাহারা প্রকৃত বড়-  
লোক তাহাদের কাছে গেলে আমরা আমাদের  
চরিত্রের দীনতা তুলিয়া মহুদের আশ্রয় পাই।  
এইরূপ লোকের সংসর্গ একটা পূর্ণ সম্পদ  
বৃত্ত। কারণ আমরা রাতদিনই শুনি আমরা  
নীচ, আমরা অপহর্ষ, আমরা একেবারে  
মহুদ্যনামের অযোগ্য। কিন্তু যিনি প্রকৃতই  
মহাপুরুষ তিনি তাহার ব্যবহারে, কার্যে ও  
আলাপে বুঝাইয়া দেন কেহই হীন বা অকর্মণ্য  
নহে, সকলে বহু সন্তোষের অধিকারী। বাহারা  
আহার নিত্যসহ সময় কাটাইয়া বেশ তাহার  
তাহাদের যুগ্ম গুণগুলিকে আপাইয়া তুলিবার  
চেষ্টা করে না। অনেক সময় তাহার ভাবিতে  
পারি না তাহাদের মধ্যে কোনও গুণ প্রচ্ছন্ন  
রহিয়াছে। বড়লোকেরা উজ্জল দীপালোকের  
সদৃশ আশ্রয়ঘরের রক্তগুলি দেখাইয়া দেন।  
তাঁহারা নিজে বড় হইয়া সন্তুষ্ট নহেন।  
সবাইকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে, সকলকে  
উচ্চ টানিয়া লইতে হইবে, এবং অন্য সকলে



ছোট থাকিয়া গেলে তাঁহাদের নিজের জীবনই যেন অসুখ রহিয়া গেল। বড়লোকদের চরিত্রের গুণগুলি দীর্ঘে দীর্ঘে সংক্রামিত হইতে থাকে। কারণ মানুষের ইহা একটা স্বাভাবিক ধর্ম যে, সে সব সময়েই মহত্বের স্পর্শ অহত্ব করিতে পারে, উচ্চ গুণসমূহ চেষ্টা করিলেই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। এই লক্ষ্যই আমরা দেখিতে পাই একজন বড় কবীর চারিদিকে আর গণজন কবী আসিয়া জুটে। সামান্যতাত্ত্বিক এমার্সন বলিয়াছেন “মহাপুরুষেরা সাধারণ লোকের প্রতিমূর্তি।” তাঁহাদের মহত্ব ও সাফল্য প্রমাণ করিয়া দেয় সাধারণ লোকের চরিত্রে সেই সব গুণ নিহত রহিয়াছে। তাঁহারা মানুষের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলেন। নিরাশ মানুষ বুকে তাহারও জীবন বার্ষ নহে; তাহার মধ্যেও বড় বড় গুণ রহিয়াছে। তবে যে, সে, লোক প্রথমে বড়লোকদের চরিত্রের গুণগুলি বুঝিতে বা সেইগুলি আয়ত্ত করিতে পারে না। বর্ষার জলরাশি মাটির উপর দিয়া বহিয়া যায়। গভীর স্থানে সেই জল আশ্রয় লাভ করে। পরে এক একটি জলাশয় হইতে সহস্র লোকের তৃষ্ণা দূর হয়। সেইরূপ মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনেকের হৃদয়েই স্থান পায় না। বাহ্যের হৃদয় সজীর কেবল মাত্র তাহারাই সেগুলি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। তাই আয়ত্ত করিতে হইলে, মহৎ গুণ নিজের চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে একটা প্রবল সত্য ও একটা সাধনা চাই। বাহ্যার সেই কঙ্কবহল ত্যাগাত্মক সাধনায় অগ্রসর হইতে পারেন, একটা অজের আশ্রয় প্রত্যয় ও ঐখ্য বাহ্যের জীবনের ভিত্তিকৃতিকে দৃঢ় করিয়া রাখে, সেই সব পুঙ্খকায়ময়ের উপাসকগণই মহতের মহত্বের প্রেরণায়

নিজেরা বড় হইয়া উঠেন। “বড় হইতে হইবে” “মহত্ব বা না জাগাইলে চলিবে না” বলিয়া একটা রব তুলিলেই কাজ হইবে না। প্রাণের ভীত ব্যাঘাত ও দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যখন ভাবায় আশ্রয় প্রকাশ করে, তখনই সেই কপার জোড় আসে এবং সেই বাক্য প্রাণবান হইয়া উঠে। নচেৎ একটা ভাঙা কুলি আড়চাইয়া সেলে লাভ কি? হৃতরাং যেখানেই মহত্ব উদ্বেগের চর্চ্চা, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা, সেখানে বড় হইবার মালমসলাগুলির বোঝাবর ও সেইগুলি সংগ্রহের চেষ্টা চাই। বড় হইবার সাধনা যে মানুষের সাধনা জীবন জুড়িয়া বসে। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজগুলির ভিতর দিয়াই মানুষের বড়ত্ব বাড়িতে থাকে। দিনের পর দিন ব্যাপিয়া এক একখানি করিয়া পাখর সাজাইয়া গেলে তবেই উচ্চতম পাখরের হৃদয় নিমিত্ত হয়। বাহ্যের প্রাণের আগ্রহ ও সত্নে বড়ত্বের জোড়ার লাগিবে, তাহাদের কাছে জীবন পরিপূর্ণতার দিব্যোন্মোক্তিতে উজ্জল হওয়া চাই। সেই সব হীনতা ও বার্ষের সম্পর্কমুক্ত জীবন তাহাদের বিরাট আদর্শের দিকে দৃষ্টির রাবিশ যদি প্রতি-মূর্তিটিকে মার্শক করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের প্রত্যেক বাক্য, চিন্তা ও কাজ যদি আদর্শের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে তবেই তাহারা বড় হওয়ার সাধনার সফল হইতে পারিবে আর এইরূপ জীবনের সাধনা জনসাধারণকে উচ্চ জ্বলিতে টানিয়া তুলিবে।

“বৃদ্ধাচারতি শ্রেষ্ঠত্তমবেত্তরোজনঃ

স বৎ প্রায়ণ ককতে লোকত্তমজবর্ততে

শ্রেষ্ঠের আচরণ, শ্রেষ্ঠের কাজ ইত্যসাধারণ মানিয়া লয়, এবং তাহাই ক্রমে সকলের আচরণে ও কাজে আপনাকে হুপ্রতিষ্ঠ করে।

পরিণেবে বিপুল মানবপরিবারে সেই মহাশেষ  
দীক্ষা একদিন ছুটিয়া উঠে। বড় হওয়া তাই  
একটা দুঃসংসাধনা এবং বড় হওয়ার সাধক  
মাহুকের পরমসম্পদ, তাহার আশার ও শক্তির  
আশ্রয়ভূমি।

## ১৪। সাহিত্য-সম্মিলন

রাঢ়ে কেবলমাত্র ছগলিতে সাহিত্য-সম্মিলনের  
অধিবেশন হইয়াছে। এবার বর্ধমান  
বৈঠক বলিবে। আমরা ইতিপূর্বেই সাহিত্য-  
সম্মিলন, ইহার প্রয়োজনীয়তা, কার্যপদ্ধতি,  
উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সমিতিতে আলোচনা  
করিয়াছি। এবার একটা বিষয় বিশেষ  
করিয়া বলিব। সাহিত্য-সম্মিলন সাহিত্যিক-  
দের একটা বড় এবং দায়িত্ব সমাবেশ।  
মাতৃভাষা বাহারা ভালবাসেন, বাহারা  
বহুদেশের সাহিত্যের সেবা করিয়া থাকেন,  
তাঁহাদের অনেকেই এই সম্মিলনে যোগদান  
করেন। আর এ তিনিঘটা আমাদের সম্পূর্ণ  
দায়িত্ব। হুতরাং এই উদ্যোগ নিরত্ন বিশদ-  
ক্ষেত্রে কিছু খাঁটি কাজ হওয়া নিতান্তই  
আবশ্যক। মাতৃভাষার অনেক তত্ত্ব অল্পবয়স্ক  
সেবক এইখানে বছরের প্রতিদিনকার পার্শ্ব-  
সতীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্রতা তুলিয়া একটা বড়  
জিনিষের আশ্রয়, একটা আত্মোৎপত্তির  
অহুকৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। মাতৃ-  
ভাষার, বহুদেশের সাহিত্যের মিলনপ্রাঙ্গণে  
উদ্যোগ মাতৃভাষার পরিচয় পাইবার দ্রুত  
বাঙ্গালীর প্রাণ বছরে এই দুই তিনটা দিন  
ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাহিত্য সম্মিলনটা  
একটা দ্রুত তেজোজ্জ্বল। এখানে সবাই  
পরস্পরের সহকর্মিতা ও সহযোগিতা লাভের  
অধিকারী। কিন্তু এখন বেশিবার বিষয়

আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন একাধটা কতদূর  
করিয়া উঠিতে পারেন। সবাই যে আশ  
মিলিতে চায়, 'মিলনের' আকাঙ্ক্ষা যে আশ  
বাঙ্গালীর প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।  
হুতরাং সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষজ্ঞের সাধা  
প্রসাধা লইয়া কি বেশী কাজ করিবেন? এই  
intellectual democracy টিকে পড়িয়া  
তোলা সাহিত্য সম্মিলনের একটি বিশেষ  
সার্থকতা। কর্মকর্তাদের সঙ্গীতে ইহার  
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পত্র কব বৎসর  
করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে, কিন্তু  
সাহিত্যিকদের মিলন হয় নাই। আমরা আর  
কতদিন এই বিষয়ে উদ্যোগী থাকিব? আর  
এ বিষয়ে অনমনোযোগী হইলে সম্মিলন কমে  
লোকের কাছে আকর্ষণ হারাইবে। আমাদের  
জাতীর জীবনেও বিকাশ যে সব কাজের ও  
প্রচেষ্টার সম্বন্ধে ছুটিয়া উঠিয়াছে আর  
তাঁহাদের সবগুলিই অকালব্যর্থকো স্থবির  
হইয়া পড়িয়াছে। সর্বত্রই আমাদের প্রতিকূলতা  
খুব উৎসাহ ও আনন্দ কোলাহলের সহিতই  
হইয়াছে। কিন্তু সেই উৎসাহ ও উত্তেজনা  
দিন দিন না বাড়িয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সব বতঃপ্রবৃত্ত অগ্রগতি বর্তমান  
মানুষকে আনন্দ দান করে, ততদিন মানুষ  
ইহাদের দ্রুত জন্মে ও ইহাদের চায়। আশ  
সবদিকেই আশ্রয়ের জীবন এখন নিরাকরণ  
ভাবে আনন্দহীন ও নীরস হইয়া উঠিয়াছে  
যে আমাদের এই বাস্তবহীন সহজ অত্যাব  
নির্দেশিত জনমগণী বছরে দুই চারিটা দিন  
দুঃখ মৈত্রী তুলিয়া একটু আনন্দের দ্রুত  
ব্যাকুল হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর জাতীয়  
জীবনে সাহিত্য একটা পক্ষিমান জিনিষ হইয়া  
উঠিতেছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর  
আশা বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষা আশ আশ্রয়কে

প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালী আর তাহার বেশের সাহিত্যে একটা অপূর্ণ বৈচিত্র্য ও সরলতার সন্ধান পাইয়াছে। তাই সাহিত্য-সম্মিলনে এত লোকের সমাবেশ। সম্মিলনের উদ্যোক্তারা এখন ইহাটুকু আনন্দের ও মিলনের শ্রীকেন্দ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করুন। বাঙ্গালীর প্রাণের আনন্দের অঙ্গ এই গভীর ব্যাকুলতা। যদি সম্মিলন মিটাইতে না পারেন, তবে বীরে বীরে এই অজুতান নীরল ও প্রাণ-হীন হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালীর অনেক প্রচেষ্টাই শেষকালে একটা ধলের এবং অনকতক উৎসাহশীল পাণ্ডার ক্ষেত্রে চাপিয়া জীবন্ত হইয়া কোনও মতে টিকিয়া আছে। সাহিত্য-সম্মিলনের এখনও পুরা আশা। আর ইহাতে যে সব আশার তরী 'অথ যা' বলিয়া তাদান হইতেছে সেগুলি খেন চড়ায় আটকাইয়া না যায়। কর্তৃকর্ত্তীপণ ইহার বৈচিত্র্য ও সরলতা রক্ষা করুন, ইহাকে একটা বিপুল গভীর আনন্দের মিলনকেন্দ্র করিয়া তুলুন। হৃৎস্পন্দ চপিয়া গেলে আর আসিবে না।



### ১৫। চীন ও জাপান

জাপান আর শিকার ও শক্তিতে পৃথিবীতে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। পরাক্রান্ত হুগিয়া যে দিন জাপানের কাছে হার মানিল সেই দিন জাপান পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের মধ্যে স্থান লাভ করিল। কিন্তু জুংখের বিষয় জাপানের অকৃতসম্মে এসিয়া তাহার নিজের কল্যাণের বিশেষ কিছুই বুঝিয়া পায় নাই। বুকের নিষা অধ্যাক্ষ-তুনি এশিয়ার সন্ধান জাপান পাকাত্যামোহে এবং বার্ষিক দুইনীতির অঙ্গসরণে প্রাচ্যের লোকের কাছে মূল্যগ্রহ

না চউয়া একটা মুখকেতুর মত প্রতীয়মান হইয়াছিল। বহুদিনের বার্ষিক্যচাণের অবসর চীন যে দিন নবযৌবনের শক্তি অল্পত্ব করিতেছিল, যখন চীনের আট্ট শতীরে নতন আশার তপ্ত শোণিত সঞ্চারিত হইতেছিল, তখন এশিয়ার এই নবীন শক্তি চীনকে বন্ধুর চক্ষে দেখে নাই। জাপানের কুখ্য চীনকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। জাপান এখনও তাহার নিরস্তির বেগ পায় নাই। তাহার নব আশ্রিত ক্রাস শক্তিতে তপ্তপ্রান্তিত প্রাণের ত্যাগ, লগ্নম ও উত্তীতির সৌম্যবোধি দেখিতে পাই না। সে যেন জোপটাই চিনিয়া বলিয়াছে। জোপের পরপাবে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার উপরে ত্যাগের যে স্বাভাবিক ভাণ্ডার নির্মল জ্যোতিঃ ছড়াইয়া দিয়াছে, জাপান এখনও তাহার শাস্ত্র লাভের অঙ্গ তপস্তা করে নাই। তাই আর চীনের নানা স্বভাবের মধ্যে জাপানের তর্জিন পঙ্কম একটা মত স্বভাবটি। চম্পিন কোটা লোক লইয়া যে বিপুল আতি আগিয়া উঠিতেছে তাহার আশ্রয়প্রতিষ্ঠার পথে কত বিঘ্ন কত প্রতিকূলতা। কত লক্ষট কাটাইয়া কত বিপদ ঠেলিয়া আর আপনাদের বাঁচিবার পথ করিতে পারিবে! জাপান যদি বহু-স্বভাবীর স্বপ্ন ও বহুকালের ঐক্য ও প্রকৃতি-বেশিতা তুলিয়া কেবল নিম্নের মেলিহান বিজ্ঞার বিস্তারই করে তবে চীনের মুক্তির পথ যে আরও গহন হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক চম্পিন কোটা লোককে প্রাচ্যের স্বাধীনতা ও বহুপুঞ্জের আশ্রয়বিস্তৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মকালকার অতিম সঙ্কটের দিনে শক্তিম্যান করিয়া তোলা যে মানব আতির ইতিহাসে একটা কত বড় কাণ তাহা কি আবার বলিবার প্রয়োজন হইবে? চীন

একটা প্রকাত ও গভীর ভিত্তির উপর  
ধোঁড়াইয়াছিল বলিয়া এত নিশ্চয় প্রতিজ্ঞাতার  
মধ্যেও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহার চারি  
বারে সে যে দুর্ভাগ্য প্রাচীর গড়িয়াছিল আর  
তাঁহা পরাইয়া ফেলিয়া আসে। ও বাতাসের  
পথ না করিলে আর ত তাহার স্বাস্থ্য ঠিকিবে  
না। নুতন করিয়া তাহার বরণা জানালা  
ছুটাইতে হইবে।

আধুনিক প্রণালী  
বর্জমানের তত্ত্বগুলি এখন তাহার আয়ত্ত করা  
চাই। চীন বন্ধন হইতে তাহার অঙ্গসর  
হওয়া বন্ধ করিয়াছে, বাহিরের জগৎটা যে  
তারপর ক্ষতবেগে ছুটিয়া অনেক বিষয়ে বহু-  
দূরে গিয়া পড়িয়াছে। আর বিলম্বে যু-  
ক্তকার শান্তি চীন স্বাভাবিকই ভোগ  
করিতেছে। তারপর এক বন্ধ যাপনের  
জাপান যদি সংস্কৃত বংশের সম্পর্ক ও প্রতি-  
বেশিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া অনন্যসংসার চীনকে  
চাপিয়া ধরে তাহার সড়ট বাড়াইয়া তোলে  
তবে ত আর চীনের অবস্থা আরও সড়টময়  
করিয়া তুলিবে। একজন এই বিপদের কথা  
বুঝিয়াছিলেন। তিনি জাপানের ভাবুক কবি  
চিঅামিত্তী ও লাক্ষ মহাশয় ওকামুরা  
তাঁহার কথা মনে পড়িলে প্রাণ ভরিয়া ওঠে,  
চোখে জল আসে। তিনি এসিয়ার মধ্যবাসী  
বুঝিয়াছিলেন। এসিয়ার অধ্যাত্ম ঐক্য  
তাঁহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

তাই তিনি আশ্চর্য কর্তে ঘোষণা করিয়া-  
ছিলেন "Asia is one", তাই তাঁহার গ্রন্থের  
প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাচ্যবিশ্বের আশ্রয় উন্নয়ন  
অনবিকল্প ঐক্য। হাব! তিনি আর  
একগুণে নাই। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে  
তাঁহার দেশবাসী তাঁহার উদারবাণী বুকে  
নাই। আরও লোকে তাঁহার কথা বুঝিবার

কোনও চেষ্টা করিতেছে না। তাই চীন  
জাপান সমন্বয় ক্রমেই আশ্রয় বিষয় হইয়া  
উঠিতেছে। চীন এখনও বয় শাঘলাইয়া  
নইতে পারে নাই। এসিয়ার দুপাক্ষের  
অভিযোগ অস্ববিধব ও মনৈক্য আর চীনের  
নব্যযৌবনের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।  
চীনের আপনার ঘরে এখন ঠেকাঠেকি  
লাগিয়াছে, অর্থভাতার রিক, প্রমাপ্ত  
এখনও নব্যচীনের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাল  
করিয়া বুকে নাই। বিপুল চল্লিশকোটি লোক  
সমষ্টিকে নুতন ভাবের ভাবুক, নুতন নীক্ষার  
নীক্ষিত, বর্জমানের জ্ঞান বিজ্ঞানে শক্তিশালী  
করিয়া তোলা কত ভক্ত ত্যাগী সন্তানের  
নিঃস্বার্থ সাধনায় সম্পন্ন হইবে তাহাও ত  
ভাবিবার বিষয়। তাহার উপর প্রবল জাপান  
যদি এমন করিয়া বাঁকিয়া বসে, তবে ত  
চৈনিক সমন্বয় একটা মহা সন্ধীনা ব্যাপার  
হইয়া উঠিবে, এবং ইহার বিপরীত পন্থাও  
বাড়িবে। এত বড় একটা জগদ্বন্দ্ব পাথরের  
চাপ হৈলিয়া উঠা যে কি বিষয় অনর্থ,  
ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক সেই বৈদ্যমান্য  
মধ্যস্থিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে  
জাপানের ভাবুক সন্তানসমূহ জাপানের নিরুত্তি  
বুঝিয়া, এসিয়ার সত্যতার অধ্যাত্মবাসী উপলব্ধি  
করিয়া যদি স্বর্গীয় ওকামুরার মত তাঁহাদের  
দেশবাসিদিগকে সেই কথা বুঝাইয়া দিতে  
পারেন, জাপানের এই সর্বমানে নীতির  
পরিচাঘ দেশের লোকের কাছে বেশ  
পরিকট করিয়া তুলিতে পারেন, আর  
সকলের আশ্রয় অর্থ নব্য জাপান যদি সেই  
বাঁধা মানিয়া লয় তবেই এই সড়টের  
একটা স্বার্থ এবং সুখকর মীমাংসা হইতে  
পারে।



## সভাপতির অভিভাষণ \*

আসেবিত্তঃ শীতলপারাবিহ

মাবাল্যমথ প্রপিত্য চাচে ।

সাহিত্যসম্মেলন কক্ষকালে

যাক্ষ্মমাত্মা খলিতঃ কথঞ্চিৎ ।

সর্গবিয়মিনাশন দেব গণপতিকে নমস্কার  
যিনি এই মেলায় পূর্ণবর্ণিত প্রান্তে জীবন-  
শিখরে অবস্থিত হইয়া নিম্নের এবং মাতাপিতার  
প্রভুরময়ী মৃষ্টিব হস্তপদাদি ভগবাক্যেরও  
নির্দিষ্টে সম্পাদন করিতে দিগা দীর্ঘ বিশেষণের  
শার্ককতা অব্যাহত রাখিয়াছেন ।

দেবদেবের মণ্ডলেবকে প্রণাম করি—যিনি  
কাজাড়ের পশ্চিম প্রান্তে মহাবি কপিল কর্তৃক  
ঘোষের মোক্ষবিধানার্থ সংস্থাপিত হইয়া  
সম্প্রতি বীর অধিষ্ঠানকৃষি আশ্রমটিকে ক্রমশঃ  
মোক্ষের পথে অগ্রসর করাইতেছেন ।

অভ্যাপত্তি ভগবতীকে ভক্তিভাবে বন্দনা  
করিতেছি—যিনি হেড়ম্বাবীরগণ কর্তৃক  
খণ্ডাঙ্গণা বণচণ্ডী নামে মাইবন্ধের পাষণ  
মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইয়া  
ধাকিলেও কোনও ভিন্নধর্মাবলম্বী কর্তৃক সাহ  
ওয়াস্টার স্বর্গের “এন্ড অব শীয়ারটাইন” এর  
অঙ্কুরণে উপজ্ঞানের নারিকা সাক্ষিরা  
মহামতি গেইট সাহেবের “আসাদ-ই-তিব্বতের  
পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছেন ।

দীলামব ভগবান্ ত্রিবিম্বুর নাম সূচনায়  
স্বরণ করিতেছি—খানপুরস্থিত বাহার ইষ্টক  
মন্দির অজ্ঞাত ঘণি প্রাসাদের সঙ্গে দুর্দিসায়  
হইবার পূর্বে সম্রাতি মহামাত্য গবর্ণমেন্ট  
কর্তৃক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনবস্ত্র সংরক্ষিত  
হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।

প্রজারি সর্গপাশ দেব ভাস্করকে প্রণত  
হইতেছি—বাটার নামধারী বংশোদ্ভূত  
কামরূপাধিপতির তাম্রপালন অস্ত্রত্ম আবিষ্কৃত  
হইলেও এই শিলচর সত্তর হইতেই প্রাণিবাহ্যী  
চিত্রসহ প্রচারিত চণ্ডাতে প্রাচীন ইতিহাসের  
এক বিশিষ্ট অধ্যায় উদ্ভাসিত হইয়াছে ।

এইরূপে পঞ্চদশতার নমস্তারাকে একজন  
মহাপুরুষের পবিত্র নাম সান্নিধ্য গ্রহণ  
করিতেছি ; এবাবৎ তীর্থাঙ্কে সংশ্লিষ্টের  
আশ্রয়েই প্রান্তরে আত্ম হইতে দেখিয়াছি,  
কিন্তু সাহিত্যের মঙ্গলসেও তিনি তেমনই  
আবাহন যোগ্য । তাই এস, ত্রিনৌরাক !  
তুমি নববীণচক্র হইলেও আমাদের ত্রিষ্টেই  
ছাওয়াল, তোমাকে আমরা কুলিতে পারি  
কি ? বিশেষতঃ স্বর্ণপংক্তিকার্য সমবতীর্ণ  
তোমাকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালীর সাহিত্য  
গড়িয়া উঠিয়াছে—আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-  
সহ তোমাকে স্মরণ করিতেছি । বিধিবশাৎ  
বঙ্গপ্রদেশের বহিষ্কৃত হইলেও যে আমরা  
এই অকলের লোক বাঙ্গালী বলিয়া পরিচি-  
দিত্তে পারিতেছি—হে মহাপ্রভো, সে  
প্রধানতঃ তোমারই যোগাই দিয়া । এই যে  
স্বয়ম্যোপত্যকার আগে পাশে অবস্থিত  
পার্কভাষ্যান্তির মধোণ বন্দীর ডাবা ও  
সাহিত্যের একটা সম্পর্ক ঘটাইছিল, তাহা  
তোমারই মাহাত্ম্যে এবং আজ যদি কোনও  
কোনও স্থলে ঐ সম্পর্কের বিলোক ঘটতেছে  
যেখি, তবে তাহা তোমার আদর্শ হইতে  
আমরা হ্যুত হইয়াছি বলিয়াই বুঝিতে  
হইবে ।

অতঃপর এই সম্মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত সম্মাননীর সভ্যমহোৎসবপক্ষে যথোচিত সম্বন্ধাদি সজ্জাযথ বিজ্ঞাপিত করিতেছি। তাঁহারা যে রূপা করিয়া এই অধোগ্রাণ্যকে এতবড় সম্মানের পরে বৃত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে বিনীতভাবে ক্ষম্যের স্তম্ভজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অস্ত্রয় বাহাই করিয়া থাকি না কেন, এই অকলে সাহিত্যের আশ্রয়ে আর সর্বপ্রথম হওয়ামান হইয়াছি : আমার অক্ষমতা নানা প্রকারের ; জানি না যে দ্বিতীয় আমার খাড়ে চাপিয়াছে তাহা কতদূর প্রসঙ্গাধিত হইবে। তবলা, আপনাতা আমার আশ্রয় ; কোনরূপ ক্রটি হইলে স্বজন ভাবিয়া সার্বজন্য করিয়া বাইবেন।

সভ্যমহোৎসব, আর আমাদের এক মহা উৎসবের দিন, পরম আনন্দের দিন সম্ভব হইবে। কিন্তু এই উৎসবের দিনেই অনতি-চিরমুখ্যত বিয়োগ-বেদনা লাগিয়া উঠে—তাই দেখা যায় বাড়ীর একটিকে উৎসবানন্দের ঢাক ঢোল বাজিতেছে—অপরটিকে অতিদুঃখ ব্যক্তির নাম ধরিয়া আক্রমণ হইতেছে। আর এই শুভসম্মিলনের আনন্দের দিনেও তাঁহাদের শোক ভূতি আশ্রয়ের মনে উদ্ভিত হইতেছে—তাঁহারা বিগত বর্ষদ্বয়ের মধ্যে এই অকল অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বানিয়াচকের মহামহোপাধ্যায় কালীকিশোর ভট্টরায় আর পণ্ডিত সভ্য উপস্থিত হইয়া ঐহটের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন না—মৌলবীবাআব্বের সজীশচন্দ্র করকে আর হুজুর পণ্ডিতশাস্ত্রের সুযোগ অধ্যাপক পদে সমালীন সেবিয়া সৌরব অলুচব করিতেছি না। প্রাণল কবিতালেখক কৃষ্ণাবনচন্দ্র গোপ "সেবিকা" নাম আশ্রয়পক্ষে উপহার দিয়া চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছেন

হুবা স্ববক্তা বহুশব্দসম অবিদ্যাপত্র দত্ত ও অধিকাংশর দাম এ দুইটি মাদিক-ঘোড় হারাইয়া ঐহটজননী যে অপ্রতিদ্বন্দ্ব করিতেছেন তাহা এখনও শুকাই নাই। আর এক ব্যক্তির নাম এক্ষেত্রে সর্বপ্রাণে গ্রহণীয় ছিল—কিন্তু রাগবি জনক উত্তর চরিতে সীতাবেশীর নিমিত্তে খেদ করিয়া বসিয়াছিলেন—“ঈশ্বরকে নির্ধারণতাপঃ পরি-  
ণতঃ যেন লক্ষ্যে বহুদ্বন্দ্বাক্রমিতুংমপি ন  
শক্যতে।” আমাকেও বলিতে হইতেছে  
“তাই মহেন্দ্র, তোমার অস্ত্র যে আর প্রাণ  
খুলিয়া বিলাপ করিতেও পারিতেছি না!  
তুমি না তোমার বালাবকুদ্রিপকে নিধা  
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, বালাগায়েনের শিকার  
কেদ্রস্থলে পূর্ণবধে—বখানদত্ত ঐহটে—লইয়া  
আসিবে? তোমার দ্বারা অসুপ্রাণিত হইয়া  
তোমার কোনও বন্ধু লিখিয়াছিলেন—“যে  
ঐহটে ঐহটচন্দ্র, বখানখ নিরোমণি, রাগ-  
ঘোড়ী দিবাসিংহ বর্তমান যুগের চাপকাত্তর  
বুদ্বিঃ প্রভৃতি অস্ত্রগাছিলেন, রাগনৌতিতে  
ধর্মনৌতিতে ভাষাত্তে জানবতায় যে ঐহট  
একদিন বালাগা যুগান্তর উপস্থিত করিয়া-  
ছিল, আমরা সেই ঐহটে অসুগ্রহণ করিয়া  
যদি আবার বিনশতাত্তর বালাগা প্রসঙ্গে  
জানে ও প্রতিজ্ঞা আশ্রয় জালাইয়া না  
দিত পারি তবে আমাদের অন্ধলে অসুগ্রহণ  
করাই ভাল হইত।” তাইরে, সেই আশ্রয়  
তুমি ঐহটে—বসিগকে আসিয়া বিভাবিতরপ-  
ত্রত গ্রহণ করিয়া উজ্জ্বলহিতা প্রচারার্থে  
“মৈত্রী” পরিচালন করিয়াছিলে ; কিন্তু হায়  
আর যে বলিতে পারি না! ঐহটের হুতাশ  
যে তুমি প্রতিজ্ঞার পথ ছাড়িয়া তির দিকে  
চলিয়া গেলে, তাহার ফলে তোমার গোচনীর  
পরিণাম ভূটিল।

এট গেল ক্ষতির কথা। এখন লাভের দিকটোও কিঞ্চিৎ দেখা দাউক। কবিমণ্ডল সাহিত্য সম্মেলনের পর এট অকলে সাহিত্য-চর্চা অনেকটা বেশ ক্ষুদ্র পাইয়েচে। বঙ্গ বঙ্গের হাওয়ায় আমগাছে মুকুল বাঁধি হু হু তখন অসুস্থমান হু যেম কতই ফল হইবে—বৃষ্টি তারার ডারে গাছ ডাখি পড়িবে—তৎপর দেখা যায় গ্রাণি গ্রাণি মুকুল করিখা পড়িয়া যায়—আবার হুটটা টিকরাহ পরিণত হয় তাহারও কুঠিভাগ কচি অবস্থায়ই বৃষ্টি-তলে নিপতিত হয়—আবার ওঁশাও অনেক পড়িয়া নষ্ট হয়, অল্প কয়েকটি মাত্র পাকিবার অবশ্য পায়। প্রকৃতির নিরমই এই; তাই ত্রিষ্টোত্রের সর্বত্র, যৌলবীজাভারে, ঢাকাঢাকিণে এবং এই শিলচরে সাহিত্যসভার লক্ষ্যসংবার শুনিয়া ছুট হইবার কিছু কাল পরেই যখন তাহাদের আর কোনও সংবার পাই নাই, তখন বিস্মিত বা ছুঁবিষিত হই নাই, একতর ঘটিবেই। তারপর ইমানীঃ কবিমণ্ডলে একটি সাহিত্য সম্মতি চলিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি—আশা হয়, এটি বা টিকিতেও পারে। দোভাঙ্গ-বণতঃ অধুনা ত্রিষ্টোত্র-কাছাড়ে অনেক-গুলি ভাল ভাল গ্রেস আদিয়াছে। হাতের কাছে উত্তম গ্রেস থাকিলে বা হু তাহার অনেকটা হইতেছে—দুইচারিগানি ক্ষুদ্র মধ্যম বৃহৎ পুস্তকও প্রচারিত হইতেছে। আবার ত্রিষ্টোত্রের স্থানের—কলিকাতাদিহ গ্রেস হইতেও ত্রিষ্টোত্রের অনেক গ্রন্থ চাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতির প্রকাশিত এই সমস্ত গ্রন্থের নাম আমি বলিতে পারিব কি না। সম্ভব, তবে হুটটা অবগত আছি বলিব। তদন্তে ত্রিষ্টোত্র মহেন্দ্রনাথ কায়াসাংখ্যাতীর্থ মহাপ্রবোধের প্রণীত “মানা মহাপ্রজ্ঞা” সর্বাঙ্গ উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। ইহা “বঙ্গ-

বাসীরা” দ্বারা একটি বহুল প্রচারিত বিশিষ্ট পরিচয় উপঢৌকনরূপে বিতরণিত হইয়া গ্রন্থকারকে স্নানাদিত করিয়াছে। আবার বোধ হয় পূর্ববক্তের কম ব্যক্তিই ত্রিষ্টোত্র সৌভাগ্যের অপিকারী হইয়াছেন। কায়াসাংখ্যাতীর্থ মহাপ্রবোধের প্রণীত “বিশ্বব্রহ্মের উপদেশাও” বিশেষতঃ উল্লেখের উপযুক্ত; ইহা পড়িয়া বৈষ্ণব তুল্য হইয়াছি। ইহার প্রকাশ ব্যবস্থার কথা তেমনই ছুট হইয়াছি; মনিসন্তান ত্রিষ্টোত্র মহেন্দ্রনাথ সেন তদীয় পিতৃজ্ঞান উপলক্ষে আহুত সারস্বতবর্ণকে বিদায় দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই—তাহাদের কাছ হইতে সং-সাহিত্যের পাতায় কিঞ্চিৎ ‘আমার’ করিয়া তিনি এক অভিনব সাধু-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্য-তীর্থ ত্রিষ্টোত্র পরচর্য চৌধুরী মহাপ্রবোধ “ব্রহ্ম-চর্চা” বিষয়ে অতি প্রগোজনার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমাজের হিতসাধন করিয়াছেন; ত্রিষ্টোত্রের অপর সাহিত্যমহারণ ত্রিষ্টোত্র অচ্যুত-চরণ তত্ত্বনিধি মহাপ্রবোধ প্রণীত “সাধু চরিত” ধানিও অতি সমরোপযোগী হইয়াছে—এত ‘মেকি’ বাজারে এই একটি খাতি সাধুর কাহিনী—সাধারণের শিক্ষা-গ্রন্থ হইবার কথা। তিনি “ত্রিষ্টোত্র চরিত” লীলা লহরী” ও “ত্রিষ্টোত্র চরিত” রচনা করিয়া সংগ্রহের সংখ্যা বর্দ্ধন করিয়াছেন। শেখোক্ত ধানি “চরিত-মাণিকা” গ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যা হওয়াতে আশা হয় এতাদৃশ গ্রন্থ আরও প্রচারিত হইবে। কবিমণ্ডল সাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্যসংবার ত্রিষ্টোত্র সত্যীশচন্দ্র দেব মহোদয় একখানি “নীতি-সম্বর্ত” লিখিয়া স্বীয় উচ্চশিক্ষার ও উন্নত চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ত্রিষ্টোত্র হরনারায়ণ সেনের “পুণ্যপুণ্য”, ত্রিষ্টোত্র লাবণ্যসুন্দর-চক্রবর্তীর

"পূণ্যস্থতি," শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্যের "সুহৃৎ" ও "মোহমূলক," শ্রীকৃষ্ণ সতীশচন্দ্র দাসের "ঐক্য," শ্রীকৃষ্ণ সারদাচরণ কবির "কৃতবোধ," শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্রসুন্দর কবির "শ্রীভাটলী-সমালোচনা," শ্রীকৃষ্ণ উদয়চাঁদ সারদা "প্রাণের চিহ্নাব," প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক আমাদের শ্রীচৈত্র অধিবাসী কর্তৃক সাহিত্য-চর্চায় নিরর্থনবস্তুর প্রকাশিত হইয়াছে।

কাছাড়ের শ্রীকৃষ্ণ মণিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "হীড়িষ-ভাষ্যগ্রন্থ" খানির সুন্দর "কৃষিকা" সহ বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমান সোবিন্দ্রনাথ পাটৌ "কৃষকলিতা" নামক একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেশব নাথ ভট্টাচার্য্যের "শিক্ষা-বর্ষণ" ও শ্রীমান জগদীশ দেবের "শিক্ষাধানের পদ্ধতি" আর এক সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নূতন পুস্তক বাজীত শ্রীচৈত্র দুই এক খানি প্রাচীন লিখিত গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানাথ চৌধুরী কর্তৃক পিতৃদেবের রচিত "পদ্মপুরাণ" মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া প্রকৃত বংশধরের কার্য্য করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ রমণীমোহন দাস তঞ্চনীর মোক্ষী জে-পোপাল রায় রচিত "বিদ্যোদয়" খানির কৃষিকা লিখিয়া প্রকাশককে উপসাহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক বর্গত পিতৃ-দেবরচিত "জীবনশ্রীতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈত্র হইতে মাসিক পত্রিকা প্রকাশার্থ করিয়ঙ্গল সমিতিতে একটি প্রস্তাব হয়; উহা কার্য্যে পরিণত হয় কি না চেষ্টা করিবার ক্ষমতা যদিও স্বয়ং উক্ত সমিতির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ পরমহংস চৌধুরী মহাশয় শ্রীচৈত্র সত্তরে গিয়া সভাপতিপূর্ব্বক এই প্রস্তাব বিক্ষিপ্ত সাধারণের

নিকট পেশ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে কোনও ফল হয় নাই। তবে তদবধা কাছাড় 'নেতাজীকৃষ্ণনাথোজী'; তাই শ্রীচৈত্র দ্বারা হইবার কথা ছিল বলি। তাহা শ্রীচৈত্রের কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তি কর্তৃক "বিজয়া"র লগ্নি পতনে তাহা কথঞ্চিৎ সংসাধিত হইয়াছে। উহাতে, এবং পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জুবনমোহন বিদ্যারথ কর্তৃক সম্পাদিত "সুহৃৎ"র শ্রীচৈত্রের অনেক বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি নূতন করে সাহিত্যালোচনার প্রবৃত্তি হইয়াছেন। 'সুহৃৎ' কর্তৃক পরিচালিত পুস্তক বিতরণ মূল্যে এতদকালে সাহিত্যচর্চায় পথ প্রদর্শিত করিতে চেষ্টা করিয়া ধন হইয়াছেন; আশা করি তাহারা বঙ্গবাসী-বহুমতী-হিতবাদী প্রভৃতির দ্বারা উপহারবস্তুর বিনা মূল্যে অথবা 'সুহৃৎ' ব্যতীত 'নারদীপুণ্ডরীক' রামসুন্দরের প্রদানী ইত্যাদি এতদেবের পৌরবের মিনিসপলি প্রচার করিতে বদ্ধ পরিকর হইবেন। 'মাসিক' পত্র প্রকাশের চেষ্টা আরও হইয়াছিল; শিল্পের মৌলবী-বাজার ও করিমগঞ্জ হইতে, এবং শ্রীচৈত্র সত্তরেও মোসলমানগণের পক্ষ হইতে মাসিক পত্রিকা প্রচারার্থ কল্পনার কথা শুনিয়াছি—বিজ্ঞাপনও যেন দুই এক স্থলে বেধিয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকৃত কার্য্য হয় নাই। পূর্ব্বকই বলিয়াছি প্রকৃতির এইরূপই রীতি; তাই হতান না হইয়া বরং আশা করিতেছি যে সত্তরই একখানি সুপরিচালিত মাসিক পত্র শ্রীচৈত্র অঞ্চল হইতে প্রচারিত দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

পুস্তকপাঠ সংস্থাপনে সাহিত্যের অপেক্ষ উপকার হয়; সে বিষয়ে যৈনাগ্রামে একটি অস্থায়ী কথ্য জানিয়াছি; এবং পঞ্চবস্তুর অনিপণ্ডিত লাইব্রেরীর ইষ্টকালয়ের প্রবেশ-



উদ্ভব লাভের লক্ষ্যেই হইবার সংবাদে আনন্দ লাভ করিয়াছি।

যেমন কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তির পর-  
লোক সময়ে সম্ভব হইয়াছে, তেমন জীহট-  
জনীর দুইটি, হুমদানের বংশ প্রকাশে  
পূর্ণকিত হইতেছি। জীমান্ বিপিনবিহারী  
দে এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায়  
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া বহু বৃত্তি বর্ণরোপা-  
পনক পুরস্কার পাইয়া অল্পকালের গৌরব বৃত্তি  
করিয়াছেন। অবসর প্রাপ্ত স্থল ইন্সপেক্টার  
মৌলবী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব  
স্বাভাবিক শিক্ষারতিক্রমে অর্জনক টাকা  
দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল  
করিয়াছেন। ভগবান্ কখন যেন ইহাদের  
গৌরবময় দৃষ্টান্তে আমাদের বালকেরা ও  
আমরা—বিস্মৃত ও মোহলমান সকলেই অশ্রু-  
প্রাণিত হইতে পারি।

মাননীয় সভ্যমহোদয়গণ, আমার কাছ  
হইতে আপনারা বহিঃস্বাক কোনও প্রত্যত  
বা অপরিবিধ কোনও গবেষণামূলক প্রবন্ধ  
প্রত্যাশা করিয়া থাকেন তবে অতি বিনীত-  
ভাবে বলিব যে আমি আপনাদের ঐ অভিলষ  
পূরণ করিতে সমর্থ হইব না। নমস্কার দ্বারা  
প্রত্যত সাধিয়াছি—অল্প প্রত্যয়ের গবেষণার  
কাৰ্য্যভারও শ্রীমঙ্গলপ্রায় দেবের উপর অর্পণ  
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আপনারা আমার  
আজীব স্বপ্নন, আপনাদের নিকটে বিদ্যা  
ফলাইতে আসি নাই—বড় বেশী নাইও যে  
ফলাইব। দুই একটা মনের কথা জনের  
ব্যথা আপনাদের কাছে বলিব—তাঁহাও ঠিক  
সোছাইয়া বলিতে পারিব বলিয়া দৃঢ়ব করি  
না। যাঁহা হউক এখন আমার কথাটি বিনীত-  
ভাবে আপনাদের নিকটে উপস্থাপিত করি-  
তেছি।

এই যে আপনারা সাহিত্যসম্মিলনে সমাগত  
হইয়াছেন, 'সাহিত্য' জিনিসটা আমাদের বেশে  
—আমাদের সমাজের মধ্যে এখন কি অবস্থায়  
আছে তাহা একটু প্রাধান্য করিয়া দেখিয়াছেন  
কি? আমার তো বোধ হয় প্রকৃত প্রাণের  
'সাহিত্য' আমাদের দেশ হইতে ক্রমশঃ লোপ  
পাইতেছে। সংবাদপত্রে বা মাসিককাগজে  
আমরা প্রবন্ধ লিখিতেছি—মুদ্রাধিকার জন্ম-  
তায় আমরাও একখানি পুস্তকও ছাপাইতেছি  
বটে; কিন্তু আমরাই আমাদের বাংলা জীবনে—  
৩০১৩ বৎসর পূর্বে—যে সাহিত্য আমাদের  
সমাজের স্তরে স্তরে অস্থায়ী দেখিয়াছি,—  
তাঁহা এখন কোথায়? কথটা আরও বোলসা  
করিয়া বলিতেছি।

সর্বসাহিত্যের অধিকাংশই দেবী সরস্বতীর  
দুইটি গুণ—সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্র অর্থাৎ  
সাহিত্য।

সঙ্গীতঃ কাব্যশাস্ত্রক সর্বভাষাঃ শুভবদ্যম্।

একমাপাতমধুরমন্ত্রনালোভনাসুতম্।

তাই জননীর স্রুতির একহন্তে বীণা,  
অপর হন্তে পুস্তক। সুগবাহী—সেই সঙ্গীত  
ও কাব্যের অবস্থা পূর্বে কি ছিল, আর আজ  
কি হইয়াছে?

মাত্রেয় কাছ দিয়া চলিয়াছি, দ্রষ্টপুট গক-  
গুলি বজ্রদে, চিরিতেছে। কাছে রাখাপদ  
বৃক্ষতলে বসিয়া একজন বাঁশ বাজাইতেছে,  
আর সঙ্গীরা গান ধরিয়াছে—“কম্বোরেই তলে  
—ভাক্ছে বহু আর গো প্যারি মলে।”  
এখন পোচারপের মাঠ হাল-আবাহী জমিতে  
পরিণত; গো-বৎসাদি অধিকতাল দার—  
রাখলে বালকেরাও ক্ষুধীহীন অবস্থায়—গক  
বাঁহাতে অণরের ক্ষেতে গিয়া না পড়ে উজ্জ্বল  
লম্বাশত। গ্রামের ভিতর দিয়া বাইতে  
প্রাণনঃ দেখা বাইত পাড়ার মহিলারা কোনও

একটা পার্শ্বাঙ্গুষ্ঠান উপলক্ষ করিয়া স্ত্রী-  
জোকারে পক্ষী মুদ্রিত করিয়া তুলিয়াছেন—  
কখনও বা কল ভরিতে চলিয়াছেন—“আমি,  
কুক, ঘাই ধলো, মান বাণিও বহুনার কুলে—”  
পুষা বরিষা গান বরিষাছেন, কখনও বা গৃহ-  
মধ্যে বসিয়া বালিকা অথবা স্বর্গকে সাধাইতে  
গিয়া গাইতেছেন “সাজ সাজগো বিনোদিনি  
বেলা বয়ে যায়।” বিবাহ উপলক্ষ চাইলে  
তো কথটি নাই—অনেক সামান্য ব্যাপারেও  
তোল পানাই কান্দী লইয়া নাগারচি উপস্থিত  
হইয়া তাহাদের গানের সঙ্গে তাল কাড়াইয়া  
বাইত—মহিলাদের তাত্তে কত আমোদ!  
বালিকারা ঐ ‘তালে তালে নৃত্যও করিত  
যেথা বাইত। এখন বিবাহ ভিন্ন নাগারচির  
ডাক পড়ে না—গানও মামুলি এক দুইটা  
বেন সেবা ছুগাইবার মতন হইয়া থাকে।  
আবার বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী অথবা  
সম্মিলনী পুরস্কারপ্রাপ্তা বাহারা, তাহারা দুই  
আবর পড়িয়াই জোকায় দেওরাটা অত্যাভা-  
সনে করেন; গানও পুরুষোচিত দুই একটা  
শিখেন, তা নেহি ঘাইকা—নেহি স্বরকা।

পূর্বে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের, এমন কি  
একোচ্ছিন্ন লাভেরও পূর্ক্যেহে রাস্তিতে স্ত্রীমা-  
পুষা হইত—রাস্তি ভরিয়া সকলে পক্ষিবিশ্বক  
মালশা গান করিতেন—রামপ্রসাদের সঙ্গে  
সঙ্গে রামদুলাল, রামহৃদয়, রামকুমারের  
রচিত গানও স্ত্রী হইত। আর স্ত্রীমুদ্রিতে  
অনেক বিভীষিকা দেখেন। যদিও পিতৃ-  
পিতামহের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে  
বলিয়া কোনও কোনও সময় পুষা হয়—  
তাহাতে বড়জোর সম্বৎসর। কান্দার বাজে  
তাহাও বলিমানের সময়। সন্ধ্যার পর  
প্রারম্ভ: পাড়ার কোনও না কোনও স্থানে  
নারায়ণপেবা, হারবলুট, বাউল কীর্তন, গিবে

আরতি ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া খোল ঢোল  
করতাস, রসমাদুরী বহনী প্রভৃতি সংযোগে  
আবাল-বৃদ্ধ-যুবক সম্মীতাঙ্গুষ্ঠান করিত;  
পক্ষীতে বেন একটা আনন্দ লহরী খেলিত,  
এখন তৎপরিবর্তে অগড়া কৌদলের কলরব  
অথবা মঙ্গললির কিংবা মোবছমার পত্নার্ম  
চলিতেছে দেখা যায়।

পূর্বে ধনার জাজ, বিবাহ অথবা কোনও  
কামা ব্যাপার—যথা নৌকানুজা, মহাভারত-  
পাঠ সমাপ্তি, ইত্যাদি উপলক্ষে দেহবিশেষের  
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের একত্ৰ সমাগম হইত,  
তাহাতে পাশ্চাত্যলোচনা হইত—ব্রাহ্মণ ভিন্নও  
বৈষ্ণবকাস্তানি তাবৎ লোকে বিচারবিভক্তি  
তর্কিতেন, পাণ্ডিত্যের প্রতি একটা প্রভাব  
ভাব পরিপোষণ করিতেন। এখন কামা  
ক্রিয়া প্রায় সেবাই যায় না, আছে মাত্র লাভ  
ও বিবাহ, বাহা না করিলে চলে না; আবার  
উহাও অনেক সময়ে গঙ্গাভীরে গিয়া অহুত  
হয়—অতএব ব্রাহ্মণদিগের ডাক বড় পড়ে না।  
যদিও বা কেহ যেনে থাকিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত  
নিমন্ত্রণ পূর্ক্যে প্রাঙ্গণির অহুতান করেন,  
তাহাতে এখন বিচার বিতর্ক উঠিয়া গিয়া  
সর্গ-পাণ্ডিত্যমানসিনী বস্তুতার আবির্ভাব  
হইয়া থাকে।

সেকালে বিবাহাধি ব্যাপারে ভট্টপণ গিয়া  
কবিতাপাঠ করিতেন—কর্তার অবস্থানগারে  
‘বিদাহ’ পাইতেন; কবিতাও কতবিধ বিভিন্ন  
রসতাব-পদবিত্ত বিষয়ের অবতারণা হইত।  
এখন কর্তার কবি রামকুমারের অগ্রকরণে  
বণেন—“বাহুনের বেই না কাণাকড়ি, ভাটের  
বিমুর্কি?” তাই ভট্টপণও ক্রমশ: কবিতার  
খাতাপত্র কখনোনাও ললে বিশদ্বন্দ দিয়া—  
বিদ্বন্দের দাবি ছাড়িয়া কবিত্ব গ্রহণ পূর্ক্যে  
অগ্রবস্তির পথ দেখিতেছেন।

বন্দ্যের প্রারম্ভে ক্ষেত্রের কাক সাঁরিয়া  
 বন্ধ বিজ্ঞানের পরেই যখন বর্ষাব টল টল  
 অগ্নে প্রজ্জ্বলিত নৌকা চলিতে লাগিল, মনসা-  
 পূৰ্বা আসিল, তখন পদ্মাপূরণ গানের ধূম  
 পড়িয়া গেল। পূরহরণ বড় বড় উখার  
 পলোটার নৌকার সাঁরাগাছি জল-জমণে  
 পাড়ায় ঘুরিয়া মাগাবদি কাল পণ্ডিত জানকী  
 নাথের অথবা নারায়ণদেবের ভবিষ্যুক্ত সরল  
 কবিতা ঢোল মন্দিরা প্রকৃতি সহযোগে  
 গাইত; আত তাহা দেখা যায় কি? আবার  
 বড় বড় নৌকাগুলি চিড়িত করিয়া লোকজন  
 তাহাতে উঠিয়া গান ধরিয়াছে—“শ্রাম বন্দ্যের  
 সাঁরিয়া, জল ভরিতে বাই গো কদমতলা  
 বিয়া।” এক এক স্থলে ৩০০ সংখ্যক  
 ঘোড়ের নৌকা একত্র হইয়া বাইচ খেলিত,  
 এখন সে স্থলে ২০ খানিও হয় কি না সন্দেহ।  
 তখন ময়ূরপক্ষী বোড় ময়ূরপক্ষী ইত্যাদি  
 নানা কিছিরের নৌকা ঐক্যপথে সমাগত  
 হইত; তাহাতে ঢোল-মন্দিরাদি সহযোগে  
 সাঁরিয়ান হইত—এ সকল নৌকা এখন আর  
 দেখা যায় কি? তারপর দুর্গোৎসব  
 আসিতেছে, মাসখানিক আগ হইতেই বিরহ  
 সখীসংবার গানের মন্ত্র চলিল; রাত্রির প্রথম  
 প্রহর অতীত হইতে না হইতেই পাড়ার  
 কোন বাড়ীতে বসিয়া খোল বেহাগা লইয়া  
 রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত রোজ এইরূপ  
 চলিত; কত বন্দনা টধা বিরহ মান মথুর  
 খোলা আটক নানা প্রকারের গান প্রস্তুত  
 হইয়া অত্যন্ত হইত। দুর্গোৎসবের নবমী-  
 রাত্রি হইতে বিরহাদিশমীর দিবস বিলম্বনের  
 আগ পর্য্যন্ত প্রতি পরোতে কোনও এক  
 বাড়ীতে দুই দলের গান হইত, উত্তর-  
 প্রকৃতিতে তৎক্ষণাত্ গান বিরচিত ও গীত  
 হইত। আবার ছত্ৰপাচালীও হইত;

একদলের একজন হইতো রাবণ শাশিধা  
 অপরদলের ভক্তানারকে হনুমান শাশাইচ—  
 সেই হনুমানও প্রকৃতিতে দশনানের বগ  
 কৃৎসা প্রকাশ করিত। ইহাতে রমিকতাটা  
 ঘোটা রকমের হইত সন্দেহ নাই কিন্তু রচনা  
 ভঙ্গীতে নানারসভাবের ও অহুপ্রাপ্ত যমকের  
 আবর্তিতাবে শ্রোতৃবর্গের চমৎকার লাগিত।  
 হায় সেই সকল এখন কোথায়? আমাদের  
 গ্রামে ২০১২ট। সখীসংবারের রল দেখিয়াছি  
 এখন বোধ হয় ২০১টি আছে কি না সন্দেহ।  
 এক দলের দলপতি একজন মোলসমান  
 ছিলেন—তারার শিতার ঐ সব ছিল। এট  
 সকল সখীসংবার দলে ইতর ভক্ত সকলেই  
 সমভাবে যোগ দিয়া আমোদ পাইত—এই  
 অর্থমত দলে নিাঁশা গান করিয়াছে—এবং  
 ভনিয়াছি আমাদের দানবীয় শ্রীকৃষ্ণ কামিনী  
 বাবুও দলপতি হইয়া সখীসংবার রচনা করিয়া-  
 ছিলেন। সেই আমোদ আজ তেমন আছে  
 কি?

কেবল দুর্গোৎসবেই নহে—লক্ষ্মীপূর্ণিমা  
 ভামাপূৰ্বা লগন্ডাজী পূজা রাদপূর্ণিমা, এমন  
 কি সরস্বতী পূজা পর্য্যন্ত ঐ সখীসংবার চলিত  
 তারপরে বোলধাতার হোলির ধূম লাগিত—  
 তাহা বোলপূর্ণিমাতোই পর্য্যবসিত হইত না,  
 পক্ষম বোল নবম বোল ওরূপ পক্ষকাল এই  
 উৎসব হইত। এখন বোধ হয় পূর্ণিমার দিবসেও  
 কোনপ্রকারে এই মহোৎসব নিত্য নীরবে  
 সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্ধনেশে চড়ক-  
 পুন্ডার করেকদিন শিবের কীৰ্ত্তন চলিত;  
 আমরা বড়শুকোড়ান দেখি নাই, তবে পাছ  
 দেখিয়াছি; ঢাকের বাজনা ও কালীর নাচও  
 দেখিয়াছি। এখন উহার প্রায় বিলোপই  
 ঘটিয়াছে।

এতব্যতীত বিবাহাদি উৎসবে যাত্রাওঘালা-

ঘের পান হইত; তাহারা সামান্ত খোল-  
চোল-মন্দিরা-বেলাল। নিম্ন। কতকগুলি  
শিল্পীর চুড়ী ও ছিটের শাড়ী সঞ্চাল করিয়া  
৮.১০ টাকা বামনায় কি হুন্সর পান করিত;  
শ্রোতৃবর্গ নিশ্চয় হইত। শ্রুতি স্মৃতি, তন্ত্রের  
পানে অক্ষরবর্ণ করিত, প্রেমামনে হরিকরনি-  
মিত। এখন সে স্থলে অপেরা চলিতেছে—  
তাঁহার সাজপোষাক লটবহরা-ই বা কত; এই  
স্থানের সময়ে একটা কোয়েল গেল ও ত এক  
গোক এত আলবাব চলে কি না সম্ভেহ।  
ধনী বাড়িতেকে এতদূর দল সংগঠন করাও  
কঠিন, আবার অভিনয় বড়লোকের বাড়ী  
বাড়ীতে উৎসবান্তে ইহাদের বাসনা হওয়াও  
অসম্ভব। কল এই চলিতেছে, পূর্বে বড় বড়  
এমনমাত্রেরই দু একটা বাজার দল দেখা বাইত,  
এখন সারা মূলুক খুঁজিয়াও একটা অপেরা  
পারি পাওয়া যায় কি না সম্ভেহ। আর  
ইহাতে বক্তৃতার ভাগই সম্বন্ধ হওয়াতে,  
আমাদের এদেশের লোকেরা অভিনয়ে  
পশ্চিমবঙ্গের তাহার অপটু অল্পকরণে কেবল  
উপহাসান্দ্রমাত্র হইয়া থাকে—তন্ময় গন্ধিন  
দ্বারা শাস্তিকরণেও রোমন্থীরের অবতারণ।  
করিয়া বিরক্তির উৎপাদন করিয়া থাকে।  
পানে এক পাল ছোকরা, মোহার জুড়ি,  
অনেক বেহালা সঙ্গীত পরিভাষী হারমো-  
নিয়াম, ঢোল তবলা প্রভৃতিতে মিলিয়া একটা  
হট্টগোল করিয়া তোলে—ভাগ্যে একটা  
বিকটভাবের আবর্তিত হয় যাত্র। এই  
অপেরার সঙ্গে আর এক জিনিষ আছে,  
খিমেটার; এটাও বিদেশের আমদানী।  
এতদ্ব্যতীত বস্ত্রভাবে আর কিছু বলা  
অনাবশ্যক বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই স্থলে আর  
একটি হাল আমদানির নামগ্রহণ না করিয়া  
পারি না—তাহা ‘সঙ্গীত-সম্ভারক’ গ্রামো-

ফন; কলে আমাদের অনেক বনিয়াদি জিনিষ  
নষ্ট করিয়াছে; এই কলের পানের কুপায়  
পানের, বিশেষতঃ শ্রমীর লক্ষ্যভেদে যে কত-  
দূর হানি ঘটতেছে তাহার পরিমাণ করিবার  
সময় এখনও আইসে নাই, কিন্তু শ্রুতিই আসিবে।

যাত্রা ছাড়া রামায়ণ গান, তন্ত্রিয়ার গান,  
গুরুমার গান—যাহা মানসিক উত্তরাই (মনসা)  
পুত্রায় হইত—সামির গান ইত্যাদি কত কি  
দেখিয়াছি; ঐ সকল এখন কৈ, দেখিতে পাওয়া  
যায় কি? সত্যনাথায়ণের পাঁচালী, শনির  
পাঁচালী, মিনাখের পাঁচালী, ইত্যাদিতে লোকের  
যে ভক্তি রসসিক্ত কবিতার ক্ষুধা দেখা  
যাইত, তাহা আর দেখি কি? কথক ঠাকুরের  
পুরণ কথা; কুমারী সখা বিধবা সর্গাষদ্বার  
শ্রীপণের নানাবিধ ধর্ম্মাঙ্গীতের ব্রত কথা;  
বুধ বুধাগণের কথিত নানা প্রস্তাব কাহিনী  
অবলম্বন করিয়া যে বিশাল কথা-সাহিত্য  
সময়ের তরে তরে নরনারীর মুখে মুখে  
প্রচলিত ছিল সেই সকল সেল কোথায়?  
কথায় কথায় ‘পই’ (পত) মিঠান্ (মুঠাত)  
ইত্যাদিতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ উপদেশ  
প্রচারিত হইত তাহা এখন শুনা যায় কি?  
ছেলেদের স্নোক কঠাকঠি, লুককণের হেগালি-  
প্রলম্ব, বর্ষায়নের ‘কাবি’ এগুলির দ্বারা কি  
বুস্তার তালাও আধুনিকেরা জানে কি?

আবার ধনীপুত্র পালা এম্বরত তৈয়ার  
করাইতেছেন, রাজমিস্ত্রীগণ ছাত পিটাইতে  
কি হুন্সর সারি গাইত! এখন তৎপরিবর্তে  
টিনের ঘর বানাইবার সময় হাতুড়ি পিটার  
আওথানে কণ কাটিয়া যায়! সহযোগে তখন  
সরকারি রাস্তা ইট পাথর কেলিয়া পালা  
করিবার কালে ঐতদু সারি স্তমিতায়, এখন  
দীম রোলারের বিকট বর্ষর ও উৎকট  
চীৎকারে পরিভ্রাষি ভাঙিতে হয়।

পথ চলিতে চলিতে—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পরে—লোকে একটা গানের পথ ধরিত। এইরূপ, নৌকা বাহিতে বাহিতে গল্প লোকস লইয়া কেতে ঘাইতে বাহিতে, এমন কি বসিয়া কাজ করিবার সময়ও লোকের মুখে গীতের পদ শুনা হইত—ত্রীলোককে তাদৃশ ক্ষুষ্টির সহিত যুগ্মকরে একটা গানের রাসিনী ধরিয়া কাজ করিতে দেখা ঘাইত। জামাতা বা নুতন ছুঁইব বাড়ীতে আসিলে গীত-ছোকারে তাহাদের আগমন বার্তা পল্লীতে ঘোষিত হইত—এইরূপ সামান্য কারণেও গৃহে গৃহে সন্ধ্যাতের ক্ষুব্ধ হইত এখন এইরূপটা আর বড় দেখা যায় না।

ছাপার পুথি আমাদের বাংলাকালে বেশী আমদানি হয় নাই; বিজ্ঞানস্বরের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বটন্তনার প্রকাশিত শিশুসাধক ক্রতি-বাসের ভ্রাম্যে ও কল্লিগাসের মহাকায়ত ব্যতীত আমরা খুব কম গ্রন্থই দেখিয়াছি। ঐগুলি আগ্রহের সহিত সামান্য লেখাপড়া-জানা মুদি দোকানদারগণ পড়িত; এমন কি নৌকার মাঝিমাঝিকেরও ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়িতে শুনিয়াছি। এখন পাঠশালাগুলির দ্বারা অশিক্ষিত অল্প বিজ্ঞার বলে ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত রাশি রাশি নভেল-নটিক সাধারণে পঠিত হইয়া সমাজের ভবিষ্যৎ পরিষ্কৃত হইতেছে। মোদলমানগণও উহাদের মোদলমানী কেতাব—হালদুয়বী, কাদাঙ্গলু আবিদা প্রভৃতি পড়িত; বিশেষতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার নাপরী হরহ ইংরাজ অনাধানে আরম্ভ করিয়া কেলিত এবং ঐ অঞ্চলের মূত্রিত গ্রন্থ বহু লোকেই পড়িতে পারিত। ইংরাজও এখন পরিবর্তনের স্রোতে ডালিতে বসিয়াছে; তবে হিন্দুদের অপেক্ষা একটু কম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোট কথা এই যে আমার কায় এসবর অনতিক্রোড় ব্যক্তিও বাংলাকালে যেরূপ সন্ধ্যাত সাহিত্যের প্রদার, সমাজের প্রত্যেক গুরে ঘেঁষিতে পাইয়াছে, এখন তাহা নাই। মনে রাখিবেন এই সাহিত্য খাটে ধরের রিমিশ, দুই একখানি ছাপার পুস্তক ব্যতীত অন্তস্থানের আমদানি আমাদের সমাজের মধ্যে অতি কমই হইত। ঐ সাহিত্যের বিনিময় আমাদের খুব সমাজের লোকেরই তৈয়ারি ছিল। বাহা হউক ঐ সাহিত্যের দশা কেন এমন হইল! লোকের মনে যে ক্ষুষ্টি ছিল, যে রূপ ছিল তাহা দ্বারা ঐ সন্ধ্যাত-দুর্ভিট সাহিত্য পোষিত হইত; সেই ক্ষুষ্টি, সেই রূপ পেল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি চেষ্টা করিব—জানি না কতদূর স্কৃত-কার্য হইব।

সমাজের মূলস্থিতি পল্লীগ্রামগুলির শ্রীমন্তা—পল্লীজীবনের ক্ষুষ্টির অভাব—সম্বন্ধে দেখিতে পাই, সচরাচর দুইটি কারণ নির্দে-পিত হইয়া থাকে; এক শিক্ষিত ও পদস্থ লোকেরা পল্লী ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করিতেছেন, অপর লোকের অরচিত। দিন দিনই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে; আগে এই দুইটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহা বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে আমাদের এতদঞ্চলেও ইংরাজ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খুব ব্যাকুন্নি পরিভ্রমের উপ-ক্রম করিতেছেন। পূর্বে বিষয়কার্য-উপলক্ষে লোকে সহরে গেলে কদাচিৎ পরিবার সঙ্গে নিত, দুটি পাইলেই বাড়ী আসিত, কার্যকাল ছুটাইলে স্বকীয় সমাজের মধ্যে আসিত। বস-বাস করিত। এখন পিয়াস। পথান্ত পরি-বার সঙ্গে নেয়—সকলেরই ঘেন বাড়ীর প্রতি

চান একটু শিখল হইয়া' বড়িতেছে। ইহাতে কালে পল্লীর পরিণাম কি হইবে, কেহ যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে চান একবার পশ্চিমবঙ্গে গজাভীরে—বেখানে বাস শূন্য-শূন্য বলিয়া আমরা মনে করি—গ্রাম বিশেষে গিয়া দেখিতে পারেন। ছুই বৎসর হইল আমি রামপ্রসাদের বাস্তবিতা দেখিবার জন্য একটি গ্রামে গিয়াছিলাম—গ্রামই বা বলি কিরূপে নামটি তো। হালিসহর—বিউনি-সিপানিটি পর্যন্ত আছে। কিন্তু বাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষে জল আইসে, এ যেন মহা-অশ্রু! হৃদয় দালান কোঠা কলহুলের বাসান শুষ্ক প্রাচীরে ঘেরা—কিন্তু তাহাতে লোকজন নাই। অধিকাংশ বাড়ীতেই জ্বল হইতেছে, পরিচার্য করিবার কেহ নাই। দিবা দুইপ্রহরের সময়ে সেই সহরের বড় রাস্তা দিয়া চলিয়াছি কিন্তু লোকজন অতি কমই দেখিলাম। দ্বিজপা করিলে জানা যায় ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে—বাহারা বিশেষে থাকেন তাহারা বাড়ী আইসেন না—ইত্যাদি।

ভগবৎকৃপায় আমাদের গ্রামগুলি এখনও তেমন অবস্থাপন্ন হয় নাই, কিন্তু কালে যে না হইতে পারে তাহার ভরসা কি! আমাদের শ্রীষ্ট অকলের কোনও কোনও আশে কালান্ধররূপী ম্যালেরিয়া অনেক অনিষ্ট করিয়াছে সম্বন্ধ নাই এবং কখন কখন কলেরা প্রকৃতিও আসিয়া লোকসংহারে যোগ দেয়। কিন্তু এখনও এ অকলে গ্রাম ছাড়িয়া লোকে গলাইয়া যািতে ততটা ব্যাকুল হয় নাই—বধিও চাকরিজীবী কেহ কেহ সহরে স্থায়ী বাড়ী করিতেছেন। তাই সময় থাকিতে এবিষয়ে আমাদেরকে সাবধান হইতে হইবে। সহরে বাহারা বাড়ী করেন

তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন; এক রোগের আক্রমণভয়; অপর পল্লীর নৈতিক অবস্থার শোচনীয়তা। কিন্তু তদাট্যে দেখিতে গেলে এই উভয় কারণের মস্ত তাঁহাবাই সর্বমোদে দায়ী। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামদেশের উপকারার্থ কি করিতেছেন? এটী ধরুন, পানীয় জলের অভাবই প্রধানতঃ পীড়ার কারণ; তাঁহারা আপনাদের জন্তাহানে নিখুঁত পানীয় জলের নির্মিত জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছেন কি? যে পীড়ার ভয় করেন, তাঁহারা চিকিৎসার নিমিত্ত ঔষধালয় স্থাপনার্থ চেষ্টা করিয়াছেন কি? আমি অল্পম সময় প্রবাসী ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি না—উহারা হয় ভো সহরে বাড়ী বানাইয়া থাকিতে উৎসুকও নহে। কিন্তু ষাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহাদিগকেই উপলক্ষ করিয়া বলিতেছি তাঁহারা মনে রাখিবেন যে পীড়া কেবল গ্রামদেশের মস্তই সৃষ্ট হয় নাই সহরেও দিয়া আক্রমণ করে; তবে সহরে প্রতিবেদক কারণ থাকায় তেমন লক্ষ্যপ্রসব হয় না; গ্রামে সেই সকল ব্যবস্থা করিলে সহরের ভ্রাব গ্রামও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে। গ্রামের নৈতিক আবহাওয়া ভাল নয়, এটা স্বীকার করি; কিন্তু সহরের অবস্থায় যে ইহা অপেক্ষা বিশেষ ভাল দেখা যায় না। শিক্ষিতবহুল সহরে অশিক্ষিত ছুরি পল্লীগ্রাম অপেক্ষা পাণাচোর কম হয় না—প্রলোভনের বস্ত্র বস্ত্র এখানে সমধিক; এবং সহরের উচ্চশিক্ষিতে ও পাড়ারগণের অশিক্ষিতে ব্যক্তিগতভাবে তুলনায় আমার ভো বোধ হয় আধ্যাত্মিক হিসাবে শেখোক্ত ব্যক্তির পরজন্মের কোনও সম্ভাবনা নাই। আর যদি প্রকৃতই গ্রামের নৈতিক

অথবা অপেক্ষাকৃত সাধারণই হয় তবে শিক্ষিত সাধারণের কি উহা উচিত নয় যে তাহারা গ্রামে গিয়া স্বীয় জীবনের উন্নতির আদর্শ প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের উন্নতি বিধান করেন? কলকথা তাহাদের সহস্রবাদের এই উদ্দেশ্য কারণই ঠিক নয়; প্রকৃত কারণ বাহ্য, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্রত্বজনিত বিষয়ে অপর যে একটি কারণ উল্লেখ করা হয় তৎসম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব। আগে অস্বচ্ছিন্নতা পরে অস্বচ্ছিন্নতা। পেটে ভাত না থাকিলে সব রসেরই ক্ষয় হইবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। পরন্তু এই চিত্তাটি আবহমান কাল হইতেই সংসারের লোকের চিত্তে আছে—জগদ্বস্থা “ক্ষুধা” রূপে সর্বত্রুতে থাকিবে। তাহাদিগকে কণ্ঠে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। তবে আলি এই অস্বচ্ছিন্নতা গুরুতর হইয়া উঠিল কেন? এই অস্বচ্ছিন্নতার গুরুত্বের কারণ অহুগম্যতা করা কর্তব্য এবং তাহার অধবেশন করিতে সিদ্ধা আমরা বাহ্য পাই তাহাই সর্বকারণের কারণ—পল্লী ছাড়িয়া সহর বাণেশ্বরও কারণ—বেশের আধিব্যাধিরও কারণ এবং সহর ও পল্লীগ্রাম সর্বত্রই যে তুল্য নৈতিক অধোগতি দেখা যায় ইহারও কারণ।

আমাদের বেশের ও সমাধের প্রাণ বসতি কি? তাহা তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে ‘দুর্ধ’ই সেই বস্তু বাহ্য মৌলিক অর্থেই ধরিয়া থাকিবার অবলম্বন। সেই জিনিষটি হারাইয়া আমরা কৌত হইয়াছি—আমরা ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছি। আমরা সম্মতি যে শিক্ষাবীক্ষা লাভ করিতেছি তদ্বারা আমরা বিদ্যানু ও বুদ্ধিমান হইতেছি সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের বর্ণভাব

ইহাধারা উপচিত হয় না—যতিক্ষেপে টকা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া লুপ্ত হইতে বলিতেছে। শ্রুতি যাহাকে “রসো বৈ সঃ” বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন—ইহা সেই বটে; এবং এই রস যদি শুকাইয়া যায় তবে রসাত্মকবাক্য যে কাব্য বা সাহিত্য তাহা থাকিবেই বা কিরূপে?

প্রশ্ন হইতে পারে তুমি কোন ধর্মের কথা বলিতেছ—হিন্দু ধর্ম না মোসলমানের, ব্রাহ্মণের ধর্ম না বৈষ্ণবের, শাক্তের ধর্ম না বৈষ্ণবের। এতদ্বত্তরে আমার বিনীত বক্তব্য এই যে আমি কোনও বিশিষ্ট ধর্মের কথা এখানে বলিব না, বলিবার স্থলও ইহা নহে এবং ভাদৃশ ধর্মব্যাখ্যানের আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী। যদি কোনও সমাধের কথা আমি বলি তা নিম্ন সমাধেরই এবং কোনও ব্যক্তির প্রতি যদি ইঙ্গিত যেনে, বুদ্ধিযেন ইহা আমার নিষেধ প্রতিই করা হইতেছে।

যে ধর্মের কথা আমি বলিতেছি তাহা মানবাত্মার সাধারণ ধর্ম—কেবল মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা তাহার বিকাশ দেখিতে পাই না, অথবা তাহাকে বিকশিত হইতে দিতেছি না। আমি সেই ধর্মের বা ইমানের কথা বলিতেছি, বাহ্য হিন্দু-মোসলমানকে সত্য পরলতার সংঘম, সহিষ্ণুতা, দয়ালুতা, পরোপকারিতা, ইষ্টানিষ্টতা, সমান-সেবাপ্রদায়িতা, প্রকৃতিতে প্ররোচিত করে; বাহার বিকাশ হইলে আমরা পরস্পর মাত্র-মাত্রি কাটাকাটি হইতে, জাল ষোড়াতুরি মালিমামলা হইতে, পরস্পর পরস্পর হইতে, নিম্না কুৎসা কীর্তন হইতে কাত হইয়া সমাধে শান্তি আনয়ন করিতে পারি। আমি সেই ধর্ম লক্ষ্য করিতেছি, বাহ্য দ্বারা প্ররোচিত হইয়া মোসলমান হিম্মদার হিন্দু ব্রাহ্মণকে

প্রবৃত্তি দিতেন, হিন্দু অমিত্যেও মোসলমান প্রকার মসজিদ তৈয়ার করিতে সাহায্য করিতেন; হিন্দু মোসলমানের মোহরম উৎসবে লাঠি খেলাইত, মোসলমান হিন্দুর সঙ্গে খোপ দিয়া মনসার ভাসানে নৌকায় বাইচ্ খেলিত; মোসলমান ধনী পুতুর কাটিয়া হিন্দুর অলপনার্থে ভ্রাণ দিয়া, রূপ দেওয়াইতেন। হিন্দু ধনী বিবাহাদি উৎসবে মোসলমান প্রতিবেশীর জুরিভোক্তনের ব্যবস্থা করিতেন। সেই ধর্মতাব কোথায়? বাহার প্রেরণার জাতীয় বিজ্ঞা লক্ষণার্থে বাড়ী বাড়ী টোল-মোক্তবের পড়ুয়ার বাসা দিয়া হিন্দু মোসলমান কৃতার্থ হইত, তাই বেদান্তের বেণু সুতু-খের পাড়াপড়শির অর মোসাইতে পারিলে নিরুকে বস্ত্র মনে করিত। হার কোথায় সেই ধর্মপ্রানতা। বাহাতে লোকে বিন্দুগ্রস্ত ও শোকক্রিষ্ট হইয়াও অকুট বা নদিবের মোহাই দিয়া চিত্ত প্রবৃত্তি রাখিত; লেখাপড়া না শিখিলেও সামান্য লোকের মুখ দিয়া পতীর জ্ঞানের কথা হুটিয়া বাহির হইত; পরের শ্রিত্ব দিখিলে হঠাৎ বই ক্রিষ্ট হইত না; আপন শৈল্পিক ব্যবসারে ঘোটা ভাতকাপড়েই লুপ্ত থাকিত।

মেশবৎসল কবি বা রাজনীতিক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম ধর্ম করিয়াই দেশটা পেল, এখন ওগুহ ছাড়, আপন পাপে, উন্নতি দেওয়া এই পথ অবলম্বন কর। এই উদ্দেশ্যের বাহ্য কল তাহা চক্ষের উপরই দেখিতেছি—আর না; গোহাই ধর্মের—এমন বনিয়াদি ধর্মের দিকে একটু কিরিয়া চাও; হে রাজনীতিক, হে কবিবর, জনতে ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া কেহ যতলে দায় নাই—যদি দিয়া থাকে, জানিবে তাহা ধর্মের নামে অ-ধর্মের আচরণ করিয়া, আঁকও মনে

রাখিবে যে মানব-জীবনে যেমন ধর্মপরীক্ষা হয় আপন বিপদ ইত্যাদি বিভীষিকাত্তেও দৃঢ়তা থাকে কি না দেখা হয়, জাতীয় জীবনেও তত্ত্ব; আমরা এই পরীক্ষার পরের খাতা নকল না করিয়া যদি হঠাৎ নথর কমও পাই—যদি গ্রিক থাকি, তাহা হইলে আমরা সেই মহামাষ্টার বিশ্বব্রহ্মের কাছে 'গ্রেপ' পাঠরা হইলেও পাল হইব পরন্তু সেই পরম পরীক্ষকের নিকটে নকল ধরা পড়িলে ফেইল নিশ্চিত।

লভ্য মহোৎসবগণ, ধর্মের ভিত্তি স্বয়ং শাস্ত তপস্বানু—সেই দৃঢ় ভিত্তির উপরেই আমাদের পূর্ন-পুঙ্খগণ সমাধ-সৌধ নিৰ্মাণ করিয়া গিয়াছেন; কালক্রমে তাগতে লোপা ধরিতে পারে, আশাছা অশ্রিতে পারে; ভট-চারিখানি ইটুও খসিতে পারে; সমাক-তক্তের তাহা পরিহার রাখা, যেরামত করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা অজ ঘোহাছা আমরা বিলাসতপ শাবল অথবা পাণ্ডাত্য ভাবতপ ভিনামাইট ঘারা এই ভিত্তি উড়াইয়া দিতে বসিয়াছি। এই ভাবের আবেগে বিলাস বাসনার চালিত হইয়াই আমরা পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিতে উপক্রম করিতেছি—আত্মীয় স্বজন জাতি গোত্র ছাড়িয়া নানাবিধ বোগান্ত পরম্পর সহায়কৃতপ্ত জনতার মধ্যে অবস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা বার্ষপর, আন্তরিক হইয়া নিজের মাতৃ স্ব-হৃবিবা হৃদে—মেশের কথা ভাবি না। আর গ্রামদেশেও এই বিলাস বিধ শিক্ষিত সহর-বাসিন্দের আদর্শে লক্ষ্যমিত হইয়াছে। যদু ব্দ আচরিত জেট: তত্ত্ববেবেত্তরোজন:। তাই পল্লীগ্রামেও আমরা নিত্য আহার্য খাদ্যাদি শস্তের চাব ছাড়িয়া বিধা বস্তুবলা টাকার অল্প পাটের চাব করিতেছি, খড়ের



ঘর ভাঙিয়া টিনের ঘর করিতেছি, তুলসী  
বৃন্দাবন ছাড়িয়া পাভাবাহারের উপবন  
বানাইতেছি; স্রোতলোককে শাখা চুটি ছাড়িয়া  
লোণার গথনা পরিত্যক্ত করিতেছি;  
দাবান, পদ্মটোল, জ্যাকেট, প্যানিগাড়া  
ইত্যাদি আনিয়া দিতেছি; হেকিম কবিরাজ  
ছাড়িয়া ডাক্তার ডাকিতেছি, মুষ্টিযোগ  
ছাড়িয়া পেটেট ঔষধ আনাইতেছি; মা  
তরীকে তড়াইয়া স্রোতের মাখায় তুলিতেছি;  
সকল ঘালের ব্যবস্থা না করিয়া সমস্ত  
জমিতে চাষ করিতেছি, গৃহদেবতা  
আখড়ায় পাঠাইতেছি, পাচটাকা দিয়া  
পঞ্চাশটাকা মারিবার অস্ত্র বোমা-  
কোম্পানীতে টাকা দিতেছি, আরও যে  
কত কি করিতেছি তাহার পরিসংখ্যাকে  
করিব? অন্য বিলাসোপকরণ সংগ্রহের  
নিমিত্ত ব্যাকুলতাই অপ্রচিন্ত্যকে গুরুতর  
করিয়া তুলিতেছে—তাছাড়া লোক লম্বা-  
পরিপূত হইয়া ক্ষুধিহারা হইয়াছে—তাই  
সমাজের স্তরে স্তরে প্রাণে প্রাণে যে সাহিত্য  
বোধিয়াছি তাহা এখন আর দেখা যায় না।  
তাই, চাই ধর্ম; ধর্মের ভাব সমানস্তর  
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাস-বিষের ক্ষয়  
হইবার কথা। ধর্মচরিত্র দ্বারা, চরিত্রবলে  
যেহেতু জীবনীশক্তিও সমুদ্রধান হইয়া উঠে—  
তাছাড়া শারীরিক পীড়ার বীজাণুগুলিও  
সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। বোধবোধ  
ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ এই সকল দ্বারা অপেক্ষা-  
কৃত কম আক্রান্ত হন। আবার ধর্মচারবান  
হইলে কেবল যে নিজে নীরোগ হইবে এমন  
নহে আমাদের সমস্ত সমাজও সুস্থ সবল  
হইবে, বেশে অকাল মৃত্যুর হাধাকার কমিয়া  
বাইবে। ফলতঃ আমাদের ধর্মশাস্ত্র স্পষ্ট  
বলিয়াছেন—

আচারায়ততেজ্ঞানু বাচারাশীপিতাঃ প্রমাঃ  
আচারায়ন মক্ষ্য মাচারোহস্তালক্ষণম্ ।

ফলতঃ ধর্মচার শ্রীক থাকিলে সমস্তই  
ভাব্য হইবে, আপাতঃ বাহ্য কিছু অমঙ্গল  
দৃষ্ট হইবে—তাহা ধর্মপ্রভাবে দূর হইয়া  
বাইবে। এ বিষয়ে পুরাপত্তিহাসে বহু  
বাহিনী আছে। এখানে একটি গল্প বলিব  
—বোধ হয় তাহা অনেকেরই জানেন। কোন  
সুপতি নতুন হাট বসাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,  
যে ঘা' আনিবে, বিক্রীত না হইলে সরকারে  
তাহা কিনিয়া রাখা হইবে। এক ব্যক্তি  
একটি অলম্বীর খুঁটি লইয়া আসিল; এটা  
কেহই কিনিল না, প্রতিজ্ঞিত অহুসারে রাখা  
তাহা কিনিয়া গৃহে নিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ-  
লম্বা বাহির হইয়া বলিলেন “মহারাজ,  
অলম্বীকে ধরে আনিয়াছ, আমি থাকি কি  
প্রকারে? এটা কিরাইয়া দেও নচেৎ  
চলিলাম।” রাজা বলিলেন আমি প্রতিজ্ঞা  
কর কারো ধর্মভংগ করিব না, এখন তোমার  
ইচ্ছা। লম্বা চলিয়া গেলেন। ইঙ্গ, চঙ্গ,  
ইত্যাদি—রাজ্যে সকল দেবতাই আছেন  
কি না?—সকলেই আসিয়া একে একে  
রাজার নিকট বিদায় লইয়া গেলেন; লম্বা  
চলিয়া গেলে তাহার থাকেন কি করিয়া?  
সরুশেষ ধর্ম ব্রহ্ম আসিয়া বলিলেন “মহারাজ  
সমস্ত দেবতা গেলেন, একা আমি কিভাবে  
থাকি?” তখন রাজা বলিলেন, “তমো তুমি  
যাবে কোথায়? তোমারই ভ্রত যে আমি  
অলম্বী আনিয়া যেরে তুলিয়াছি—তাই লম্বা  
গেলেন, ইঙ্গ গেলেন, চঙ্গ গেলেন সকলই  
গেলেন, খাউন, কিন্তু তোমার পানে চাহিয়া  
আমি সকলকে দাঁতে বিদ্যাছি—তুমি গেল  
চলিবে কেন? তোমাকে আমি কখনও  
দাঁতে বিতে পারি না।” ধর্ম রাজার দৃঢ়তা

ভুট্টে হইয়া ফিরিলেন । তখন ক্রমশঃ অস্ত্রাস্ত্র বেঘড়া, পরিণেশে স্বঃ গ্রামলক্ষ্য ও আসিধ্যা স্বাক্ষর্যে এইটী হইলেন—রাঙা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন, ধর্মের দ্বয় হইল । তাই বলি ধর্ম থাকিলে সকলই থাকিবে—যের অন্নও থাকিবে আবির্ভাবি প্রকৃতি অমল দ্বয় হইবে ; সমাজে আবার প্রাণ ফুটি পাইবে আমাদের পক্ষীয়ামতলিতে পুনঃ উৎসব-আনন্দের সঙ্গীত-সাহিত্যের লহরী খেলিবে । ধর্মাত্মক নারায়ণ বা নারায়ণীর একদিকে লক্ষ্য অপরদিকে সরস্বতী—সেই ধর্ম বধন অধিষ্ঠিত হইবেন, লক্ষ্য ও সরস্বতী আসিধ্যা আনন্দগকে অবস্থাই অন্ন ও আনন্দ্যধিবেন ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, 'ধর্ম' কিস্তি পোষিতে পারেন, কি করিলে তিনি আইসেন ? উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে 'ধর্ম' প্রতি মানবাত্মাতেই আছেন ; আমাদের মোহ অজ্ঞানতা ইত্যাদির দ্বারা অপ্রাণিক আত্মতা আছেন মাত্র । এই সকল আবরা যদি সরাস্রিতে আত্ম করি তবেই আমাদের মধ্যে তাঁহার বিকাশ দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইব । তদন্ত উদ্দীপনার প্রয়োজন লক্ষ্যে নাই । সেই উদ্দীপনা সাহিত্যের দ্বারাই হওয়া উচিত । ফলতঃ আনন্দকাল যাহা কিছু প্রচারিত হইতেছে তাহা প্রধানতঃ সাহিত্য দ্বারাই হইতেছে ; এই যে ধর্মতাব ও বিলাসিতা তাহাও অনেকটা সাহিত্যের ভিত্তির দ্বারাই চুঁকিয়াছে মূলকলেবরের পাঠ্য পুস্তকের কথা আশি বলিতেছি না ; বৈদিক সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা, নাটক নভেল, প্রবন্ধপুস্তক, কবিতা, লক্ষ্য, ইত্যাদি দ্বারাই বিশেষভাবে আমাদের মতিগতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছে । এখন যদি পরিবর্তনের স্রোতটাকে কিরাইতে হয় তবে তাহাও সাহিত্যদ্বারাই প্রধানতঃ

করিতে হইবে । তাই আপনারা সাহিত্যাস্রবী মতোদয়গণ, ইহাতে প্রাধান্য করুন । আমাদের বঙ্গীয় সমাজের পূর্ণতম প্রাণবানী—অপেক্ষাকৃত অল্পতম দেশের লোক ; আমরা কি করিতে পারি, এই বলিয়া নিশ্চেষ্টে বসিয়া থাকিবেন না ; আমাদের বক্তব্যের প্রাণে যে একটি দুবকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা স্মরণ করুন । বঙ্গ তাহাতে উল্লেখ নাই এমন একজন শ্রীহৃৎ হুস্তানের কথাও মনে করুন । প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া অশেষ প্রভু গদ্যর মলে নামিয়া তপস্বী করিয়া সমাজের সংস্কারার্থে একটি শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন—তাঁহার আবাহন প্রার্থনাই করিয়াছি । এই সময়কার শ্রীহৃৎ বাসীরা নবদীপে গিয়া কত দিকে কত সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । আলো আমাদের আমাদের মধ্যে এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ঘেঁষিতেছি তাঁহার বক্তব্য ও লেখনী সকলদিকে সমগ্র ভারতবর্ষের তরঙ্গ উঠিয়াছিল—বাঁও তাঁহার মতের সঙ্গে আমাদের মতৈক্য না থাকিতে পারে । অতএব প্রার্থনা, সমাজের অবস্থার দিকে চাহিয়া আপনাদের শাক দাগাইয়া তুলুন । আপনারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে আশোলন তরঙ্গ তুলিলে দেশের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে । বঙ্গের অনেকের সমাজের বর্তমান অবস্থার ভাবব্যপ্ত তাবিয়া ব্যাহুল হইয়াছেন । প্রাণতম সাহিত্যমহাশয় শ্রীহৃৎ অক্ষয়চন্দ্র সরকার পক্ষীয় সমাজের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্যে সাহিত্যসাধনে বহুশঃ বক্তব্য করিয়াছেন । 'নব্যভারত' পত্রের প্রাচীন সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকার ছাঁচ, গঠন, বিলাসোপকরণের বিজ্ঞানাদি বর্জন করিয়া এক মহৎ দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন করিতেছেন। এইরূপ আরও অনেক বিশেষ প্রাণ সাহিত্যসেবক দেশবাসীর নোকা-বক পরিণাম ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছেন। চলুন আমরাও তাহাতে যথানক্তি যোগ দিয়া আমাদের উদ্ভিত বিলাসিতা-বর্জন তথা ধর্ম-ভাবের উদ্দীপনা কল্পে বস্ত্র করি অবশ্যই ইচ্ছিত ফল লাভ হইবে। একা কাউন্ট টলস্টইয় কসীর সমাজের কত উপকার করিয়াছেন! যদি ইউরোপ হঠাৎ দূরীভূত আনিতে হয় তবে এতাদৃশ মহাস্ত্রার আদর্শই আমাদের সাধনশাসিত সমাজের কলানকর। তাই বলি প্রাণপণ চেষ্টা করিলে একজনেও বন্ধন এত করিতে পারে, তখন সমবেতভাবে অধ্যবসায় দ্বারা সমাজ ও তদাশ্রিত সাহিত্যকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে অবশ্যই পারা যাইবে।

এইরূপ চেষ্টা করিলে, সফলতা লাভের আর একটা প্রবল কারণ ঘটিয়াছে। যে ধর্মাত্মকে ও বিলাসিতার বিধে আমাদের সমাজের প্রাণ তীন তাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহাতে যে বৈদেশিকেরাও অক্ষুণ্ণিত-হইতেছে না, তাহা নহে—বরং সমগ্র পৃথিবীময় এই বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যখন মহামারী দ্বারা কোনও আত্মপা উপক্রম হয় তখন যদি দৈবাৎ কোনও পরীতে আত্মন লাগে তাহা হইলে যোগের বীজাণু নাকি সেই অগ্নিতে আকৃষ্ট হইয়া পুড়িয়া কয় প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি মারাত্মক কমিয়া যায়। বিধিবশতঃ পৃথিবীর এক বিশাল অংশে এক মহাদাবানল জলিগা উঠিয়াছে। যে জাতিগণ-

জাতির মধ্যে দাম্পত্যবন্ধনের শিথিলতার কথা বলিতে গিয়া এক ব্যক্তি হিসাব করিয়াছেন যে ৩৪ বৎসরের মধ্যে জাতিগণে এমন কোনও ব্যক্তি থাকিবে না যাহার একবার না একবার ডাইডোল না ঘটিয়াছে, এবং যে জাতিগণেরা শ্রম বিজ্ঞানে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া যও যাক্যের বিলাসিতার প্রব্য-পঙ্খার সত্ত্বায় যোগদায়িত্ব, তাহাৎপেরই ধ্বংসের দগ্ধ এই প্রলোভনশ্রম লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিয়া সমগ্র ইউরোপময় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শৌণ্ডাগোর বিষয় যে আমাদের বাক্যের জাতি এই মহাপ্রসঙ্গ ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা সক্ষমতাকরণে মাননীয় কামিনীবাঈর বাক্যের প্রতিশ্রুতি করিয়া বলিব “যতোদধর্ম ততোদধর্মঃ।” আমাদের রাষ্ট্রের জয় হউক; ধর্মের জয় হউক; এই বিশাল অগ্নিকাণ্ডে যেন সমস্ত অধর্মের, সমস্ত বিলাসিতার বীজ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় যেন পৃথিবীময় ধর্মের অত্যাশ্রয় হয়, সংঘের দিকে যেন লোকের মতিগতি প্রবর্তিত হয়। চলুন এই সময় আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ ধরিয়া দেশে যথোচিত উদ্দীপনার চেষ্টা করি—যে পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তন প্রত্যাশা করিতেছি—সেইটা যখন আমাদের এখানে পৌছিতে তখন আমরা যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় না থাকি। এবং আমরা যখন অপ্রস্তুত অবস্থায় না থাকি। এবং আমরা যখন অপ্রস্তুত অবস্থায় না থাকি।

ধর্মঃ প্রবর্তিতঃসমাগ বিলাসিতাবিনশতঃ।

কায়শক্তিঃসমাগৈব সমাধো দত্ততান পুনঃ।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মাণঃ।

## জাগ্রত রুশিয়া

( ৪৪৪ পৃষ্ঠা পূর্ণ প্রকাশিতের পর )

### রুশিয়ার জ্ঞান ও অস্ত্র-প্রকৃতি

ব্যক্তিগত জীবনের ত্রাণ জাতীয় জীবনও অনবরত পরিবর্তনশীল। তজ্জন্ত আর যে জাতির সন্মুখে আমরা একটা দিচ্ছো উপনীত হই কাল হয় ত তাহা মিথ্যার পরিণত হয়। এক এক যুগে এক এক জাতি জগতে প্রাধান্য লাভ করে। পনের শতাব্দীতে ইতালীয়গণ ইংরাজ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল; আবার এ যুগে ইংরাজ জগতের সর্বাধিক উন্নত জাতি। তেমনি যে রুশিয়া নানা কারণে এতদিন মাঝা তুলিবার অবসর পায় নাই, আর তাহা নবজীবন লাভ করিয়া সমগ্র মানব-জগতকে সভ্যতার একটি নূতন পথ দেখাইতে অগ্রসর।

নারীবিশেষের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাতির অদ্বার্য পরিণতিত হয়। রুশিয়ায় এক সময়ে নারী-জাতির দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না আর তথায় নারী-জাতি কিন্তু উন্নত তাহা J. Novicow's নিম্নলিখিত উক্তিতে বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়।

Generally speaking, the intellectual emancipation of the Russian woman, at the present time, seems to us in advance of that of the German, French, Italian or English woman. The American woman alone, with her high mental culture seems to us able to bear comparison with the Russian.

নারীবিশেষের এইরূপ জাগ্রতা-বহা একটি জাতির জাগতিক উন্নতির পূর্ব লক্ষণ। অবশ্য আমি কনিষ্ঠার আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলিতেছি না।

পুণ্ডিত রুশিয়া দাসত্ব প্রথার (serfdom) উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে একরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। নব কনিষ্ঠাও সবেমাত্র তাহার বাল্যলীলা শেষ করিয়াছে এখনও রূপ-চরিত্রের সম্যক পরিপূর্ণতা হয় নাই। তজ্জন্ত তাহার সমালোচনার দিনও আসে নাই।

তাই বলিয়া তাহার অতীতের বৃত্তি গোপন করিলে চলিবে না, একটি জাতি সহস্রাবধীন ভাবে মৃত্যু উত্তোলন করিয়া উঠিলেও জননীর গুণের ত্রাণ অতীতের রূপ সে কখনও পরিণাম করিতে পারে না।

রূপ-সভ্যতা এবং জাতীয়তা বহনতাবীর ইতিহাসের সঙ্গে, দেশস্বাতন্ত্র্যের বৃত্তিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অবিচ্ছেদ্য সন্মুখিত। বিগতেরই উপর রুশিয়ার বর্তমান নববিধান দৃষ্টাংগমান।

রুশিয়ার মানব-প্রকৃতি বৃদ্ধিবার অগ্রে আমরা ইহার বেশ-প্রকৃতি বৃত্তিতে চোঁটা করিব। প্রথমতই রুশিয়ার মানচিত্র দর্শন করিলেই আমরা দেখিতে পাই, ইহার অপরিমেয় বিস্তৃতি ব্যতীকটি ঘোঁষার মাইল। Alexander Von Humboldt এর মতে ইহা চত্বের অপেক্ষাও বৃহৎ। তাহার পর রুশিয়ার বল বাহুর উগ্রমূর্ত্তি।—যেমন দাক্ষিণ্য তেমন দাক্ষিণ্য—বসন্ত নাই বলিলেই

হয়। ক্রিয়ার সবই চরম—স্বাধীনতা অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে এই স্থলেই কণ-প্রকৃতির বিচরিত। অপরি-  
বেশ বিদ্যুতি বশতঃ ইহার সভ্যতা তেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই—ক্রিয়া অসংখ্য আতিতে পূর্ণ তন্ত্র সভ্যতারও ভারতম। প্রকৃতির অবাচিত কণাও মানবের উন্নতির অস্তরায়। তাহার শাস্য কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং ভারতবর্ষে তাহার উদাহরণ স্থল। সঙ্কলিত বশতঃই এই সব দেশসমূহের এতাবস্থ দুর্দশা ও শিথিলতা; মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃ অদৃষ্টবাদী ও অলস। বাহ্য হউক, এই বিদ্যুতি শোহাব্দেবের ত্বষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার উন্নতির একশ্রেণী অস্তরায় না হইয়া অগ্রসর হইতেছে।

Montesquieu বলিয়াছেন যে অসত্যের উত্তরদিকবর্তী মানবজাতিগণ প্রায়ই কঠোর, সাহসী এবং স্বাধীনচেতা হয়। তাহা ইউরোপের পক্ষে হইতে পাবে কিন্তু জুয়ারায়ুত শিতপ্রধান ক্রিয়ার পক্ষে নহে। তথাকার দেশ-প্রকৃতির ভার মানব প্রকৃতিও নিরানন্দ-ময়। মানসিক অস্থিরতা কণাধীনতার একটি প্রধানতম লক্ষণ—এই অস্থিরতাবশতঃ তাহার লক্ষ্য এবং অধ্যবসায়েরও তেমন দৃঢ়তা ও সুস্থলতা দেখা যায় না—সে জীবন কখনও প্রফুল্ল, কখনও চির বিষাদময়। কখনও বহুমাণ বাবৎ মন্তত্যাগী কখনও বা দিন রাত ধরিয়া মন্যমানে রত। এইরূপ কখনও গুঢ় পরিভ্রমী, কখনও অলস অকর্মণ্য অবস্থায় বিনপাতপ্রিয়। চোঁটার এই যে একটি বিশৃঙ্খল ভাব ইহা কণাধীনতার একটি অন্ততম লক্ষণ।

জলবাহুও বাক্য নির্দয়তাবশতঃ কণাধীনতার আর একটি প্রধান গুণ যে তাহার

অসাধারণ কষ্টপন্থিত্ব। কণাধীন যেমন সহিতে সক্ষম, তেমনই অকাতরে মর্জিতেও প্রস্তুত।

Education was entirely religious. In families, no book was to be found but the Bible.....Submission to parents kept up the purity of manners. Families lived together under the same roof and that tightened the bonds and the discipline of one was a stain upon all the rest, the surveillance was very rigorous. Implicit obedience to old people was obligatory and on feast days the young members had to go and present their homage to the senior member of the family

—Tissot.

ইহাই ছিল ক্রিয়ার আদিম সভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

মৃত্যুর সময়েও একটা ত্যাগের ভাব বৈরাগ্যের ভাব এই শীতলশীতলজীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই একজন বলিতেছেন,—

Nowhere does the Russian's genuineness, earnestness, simplicity shine forth with a steadier and clearer light than on the deathbed, the battle-field, the scaffold.

বন্ধন হৃৎকের সময়েও ত্যাগ-শক্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-বাত-সহনশক্তি কণ-শৈল্যগণের সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। তুরষ্ক বাতীত চাকলা-প্রধান ইউরোপীয় সভ্যতার এইরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা জুআশি নমনশীল হয়

না। এতাদৃশ গুণ সম্বন্ধে রূপবাসিনগণ দুঃ-  
বিগ্রহের ভেদন পক্ষপাতী নহে। স্বভাবতঃ  
শান্তিগ্রন্থ বলিয়া এই জাতি দুঃকে গ্রাণের  
সহিত যুগ করে, কেবল জারের আবেশ  
প্রতিপালন করিতেই তাহারা দুঃ করিতে  
অবতরণ করে। কিন্তু অপর জাতির দেখা-  
যেহি এ বর্ষভাব রূপগণের দ্রব্য হইতে শীত  
শীত অন্তর্হিত হইতেছে।

যে-প্রকৃতির কঠোরতাবশতঃ রুশিয়ার  
মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ দয়ালু। সত্যিকৃত  
মানবস্বভাবকে কঠোর না করিয়া অপরের  
দুঃখে দয়ায় ত্রবীকৃত করে। দুঃখ যে কি  
তাহা রূপজীবনকে শিক্ষা দিতে হয় না;  
তাই দয়াহীনতা সেই জীবনের সহচররূপে  
পরিণত হইয়াছে। প্রতিবেশীর অভাব-  
মোচনে সে জীবন কখনও পশ্চাৎপদ হয় না।  
প্রতিবেশীর রক্ষণ, পারিবারিক সুখ চিন্তা,  
দরিদ্রের প্রতি দয়া, অভাগার প্রতি যত্ন।  
রূপজাতির চরিত্রের বিশিষ্ট নিদর্শন। ইউ-  
রোপের অগ্রাঙ্গ জাতির অপেক্ষা তাহারা কম  
নিষ্কর (Expansion of Russia by  
Alfred Rambaud ১৪৪ পৃষ্ঠা প্রট্যা)।  
রুশিয়ার নিহিলাভম প্রকৃতি বাক্যের অধ্যাতি  
স্বন্ধেও রূপবাসিনগণ বর্ষভৌক ও শান্তপ্রকৃতি।

রূপবাসিনগণের আর একটি সহৎ গুণ এই  
যে তাহারা পথিককে কখনও বিপদায়ন করে  
না। রাজ্য হিন জনহীন প্রান্তর পথ দিয়া  
যাতায়াত করিলেও পথিককে Sicily,  
Greece, Naples ও Spain রাজ্যের যত  
আপদগ্রস্ত হইতে হয় না—কতেন্দ্র ভিন্ন  
রুশিয়ার আর কোন স্থলে পথিককে বিপদে  
পতিতে হয় না।

রূপবাসিনগণ প্রাচ্যবাসীর ভায় অদুঃখবাসী।  
যাহা হইবার তাহা হইবে, ইহাই তাহাদের

জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি কথা। তাই Nobikov  
উহার The Russian people নামক  
গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—He (Russian)  
seems to be constantly asking him-  
self 'What is the use?'—to be con-  
stantly consoling himself with the  
reflection that "such is the inevit-  
able order of things"...The "Go-  
ahead" of the Americans has its  
counterpart in the Russian "avos"  
(à la grace de Dieu' of the french  
and 'Quien sabe' of the spanish  
is an analogous expression.  
'Perhaps it will succeed; let us  
risk it' is the complete meaning  
of the word "avos").

অতিবিশংকার রুশিয়ার আর একটি  
জাতীয় পরিচয়। নিঃস্বের অবস্থার দিকে  
লক্ষ্য না করিয়াও এই জাতি অতিবিশংকারে  
তৎপর। ইহার আর একটি গুণ, যে অগ্নির  
দ্বিত্ব অশেষ ইহার স্বভাব নহে। ব্যক্তিকে  
ইহার সমাজ কখনও শীতন করে না—  
ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য এবং দোষ সমাজ সত্তাই  
ক্ষমা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা  
লাভের জন্য এই জাতি সকলকেই সামাজিক  
স্বাধীনতা দান করে। রূপগণ দুঃক্ষেত্রে  
যেমন বৈধর্ম্মশীল ভেদনি শব্দের প্রতিও দয়ালু।  
১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফরাঙ্গী-বিদ্রোহ ও ফিনিয়ার  
দুঃখের সময় রুশিয়ার এতাদৃশ সমানবতার  
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃক্ষেত্রে  
এবং দুঃকালে তাহারা নিষ্ঠুর হইতে পারে,  
কিন্তু দুঃখ জরী হইলে তাহারা শত্রুপক্ষের  
সহিত বিশেষ সম্মানবাহার করে।

এইবার আমি বর্তমান রূপজাতির মানসিক

পতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। উনবিংশ-শতাব্দীর অর্ধভাগ হইতে কণ-চিত্তাশীলতা পরিপক্বতালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে কণজ্ঞাতি তেমন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অসুযোগিতা পায় নাই। যুগ্মাধিকার পরাধীনতাই তাহার একমাত্র কারণ। Decartes, Leibnitz, Spinoza বা Hegel-এর দর্শনের দ্বারা কোনরূপ স্বাধীন গবেষণা অসীম প্রভাবশালী জারের সাম্রাজ্য হইতে বাহির হইবে কিভাবে? স্বাধীনতার ক্ষেত্র না পাইলে জাতীয় আদর্শ তেমন যত্নক উত্তোলন করিতে পারে না। এখন কুশিয়া তাহার যত্নকেই উদ্ধাবনীপতি সমাক বিকাশ করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

Heine বলিয়াছিলেন জার্মানীর প্রকৃত দর্শন Pantheism (অর্থাৎ ঈশ্বরবৎ দেবতা)। কিন্তু কুশিয়ার সম্বন্ধে এইরূপ একটি যীমাংসায় উপনীত হওয়া অতীব দুঃস্থ। কণ চিত্তা-শীলতার পতি mysticism (গূঢ়ার্থবাদ) বা Positivism-এর (প্রত্যক্ষবাদ) দিকে তাহা সম্বন্ধে বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ কণ প্রতিভাকে Mysticism-এর চক্রেই বেঁধিয়া থাকেন। রাস্ত্রনৈতিক ব্যাপারে ইহা কিয়দংশে সত্য হইলেও কুশিয়ার মানসিক পতি কেবল Realism-এর (দৃষ্ট অদ্বৈতের স্বতন্ত্র সত্তাবাদ) দিকে নহে পরন্তু Positivism-এর দিকে বিশেষ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে। Odessa J. Novicow সাক্ষ্য দিতেছেন যে,—

A large number of Russians regard metaphysical and mystical abstractions with a contempt as profound as it is unfeigned.

Leroy-Beaulieuও বলিতেছেন যে,

—No nation has a less metaphysical turn of mind or takes less thought of the essence of things .....The whole nation is pervaded more or less by a conscious positivism. Was it not a Russian who said that a piece of cheese was worth more than a Pushkin?

এই দৃষ্টান্ত-প্রস্তাব-বাদ কুশিয়ার সাহিত্যে শিল্পে, চিত্র-কলায় সমালোচনায় ঐতিহ্যে ও ভ্রমোত্তাপ ভাবে বেঁধিতে পাওয়া যায়। কণ-বাইরন Pushkin এবং Lermontov-এর প্রতিভা, যাহা উনবিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে ধরিয়া কণ-সাহিত্য দৌরবাহিত করিয়াছিল, বিবেচনের আমদানী—কুশিয়ার নিজস্ব নহে। এক্ষণে একমাত্র বাস্তবিকতাই কুশিয়ার জাতীয় আদর্শ—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই কুশিয়ার প্রকৃত আদর্শ। তত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক লেখক-গণের মধ্যে কণগণ Zola-র লেখাই সর্বাঙ্গিক। গ্রন্থসা করে। Zola ভ্রমের স্বপ্নে দ্যত না পড়িত হন কুশিয়ার তত্ত্ববিক ত্রাহার পুস্তকরাশি পঠিত হয়। কণবাসীরা তাহাকে “The Hercules of naturalism” বলিয়া সম্বোধন করেন। (Boborykin.)

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কুশিয়ার চিন্তার পতি, হেগেলের পথই অসুসরণ করিয়াছিল তাহার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে Buchner, Moles Chott, Feuerback ইত্যাদির Materialism (পুস্তকবাদ) হেগেলের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। Pesemski বলিয়া এক ব্যক্তি এই যত্নের প্রচেষ্টা হইলেন। কিয়দংশে এই Materialismই কুশিয়ার নিহি-লিজমের অন্তর্যাত। অভাববিশিষ্ট কুশিয়ার দর্শনশাস্ত্রের তেমন স্বাধীন যীমাংসক আদ-

প্রকাশ করেন নাই যদিও যগজ্ঞা Tolstoi  
দর্শনের কিঞ্চিৎ পূর্ণাঙ্গায় দিয়াছেন।

Novicow কবিয়ার ভবিষ্যৎ দর্শন সম্বন্ধে  
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তিনি  
বলিতেছেন "It seems to me that Mo-  
nism ( সৰ্ব্ব পদার্থের একত্ববাদ ) will be  
the future philosophy of Russia"

জাতীয় চরিত্র এবং প্রকৃতি নির্বাহ করিতে  
দিয়া Leroy-Beaulieu মহোদয় বলিয়াছেন  
"The Russian soul is melancholy"  
এই নিরানন্দ্যের ভাব কবিয়ার অল বাহুর মত  
মানব প্রকৃতিতেও সঞ্চারিত হইয়াছে। এই  
নিরানন্দ্য এবং অবশ্য কবিয়ার কাব্যে এবং  
সঙ্গীতে (Piesni, Herzen বেগান সমূহকে  
sounding tears বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)  
পূর্ণাঙ্গায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। নেপোল  
এবং sicilyর আনন্দ-সঙ্গীত Canzonis  
বিশগীত হইতেছে—কবিয়ার বিদ্য-গাথা  
Piesni। ইহা শুধু পেন কবিয়ার সাধারণ  
বেগবাসীর মঞ্চ বাধা। সাহিত্য এবং  
মাঞ্জিত কবিতা-রাগির মধ্যেও ঐ নিরান-  
ন্দ্যের ছর আরও বেশ তিক্তভাবে প্রতি-  
ফলিত হইয়াছে। Lermontof, Pushkin,  
Nekrassof এবং Viutcheffএর কবিতা-  
রাগি কেবলি তিক্ত নৈরাশ্র এবং অবসাদ  
ভির আর কিছুই নহে বলা,—

In Russia there is no law,

Only a post and on it a crown

—Pushkin.

এই সব কবিরিগের অধিকাংশই অজ্ঞান;  
এবং ইহাদের মূঢ়তাও বড় বিবাহ সূচক।

Herzenভাইয়ের The Russian people  
and socialism নামক পুস্তকে লিখিত-  
ছেন,—

Sadness, scepticism, irony these  
are the three chords of Russian  
poetry our laugh is but an un-  
wholesome grin. ইহার সত্যায়ত্তা  
আমরা Gogolএর পুস্তকের অনেক স্থলে  
হাস্য-পরিহাসের ক্ষণ-বিবাহী তীব্রতার  
ভিত্তর অচ্ছন্ন করিতে পারি। কণ  
লেখকগণ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারেন না  
বলিয়াই তাহারিগকে ধায়ে পড়িয়া। Mys-  
ticismএর ( প্রচ্ছন্নতার ) আশ্রয় বা সাহায্য  
লাইতে হয়। কণদীবনের ঐকান্তিক অব-  
শ্য হইতেই জাতীয় সাহিত্য এবং চিত্রায়  
এইরূপ প্রচ্ছন্নতার উৎপত্তি। Jukovsky,  
Gogol, Dostoyefsky, Tolstoi প্রকৃতি  
জাতীয় লেখকগণের অধিকাংশই মনের ভাব  
ব্যক্ত করিতে না পারিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নতাব  
ধরিয়াছেন।

এই বিবাহ এবং প্রচ্ছন্নতাব যেমন কণ-  
সাহিত্যিকগণের ভিতর দেখা যায় তেমন  
নিরক্ষরগণের ভিতরও এই নৈরাশ্র এবং  
অসুস্থবাস নিরীক্ষিত হয় এবং এই উচ্চ  
মনোভাবের সংযোগে একটা উপেক্ষা বা  
বৈরাগ্য আনিয়া স্নাত প্রকৃতিকে অলস  
করিয়া তুলে।

এই উপেক্ষাবশতঃ কি কীড়াহলে কি  
জনতার এমন কি যগপান কালেও কণ-  
প্রকৃতি স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা হইতে বিচ্যুত  
হয় না। বালকগণের ভিতরেও মৌরাস্বা  
স্বভাব খুব অল্পই মননগোচর হয়। নির্জন  
প্রকৃতির স্রাব কবিয়ার জনায়ত্তাও নীরব  
এতই নীরব যেমন কুয়ারাবৃত পথের উপর  
পদক্ষেপ। A crowd, silent as nature  
herself,—as the snow, which, in the  
streets of cities muffles the sound



of footsteps (L. Beaulieu) কপিয়ায় অসামান্য বিদ্যুতিৎ এই নীরবতার একটি কারণ কপিয়ার অনন্যো এই অনীম বিস্তার কখনই পূর্ণ করিতে পারে না। কপিয়ার সর্ব বিষয়ে এইরূপ নীরব ভাব সম্বৰ্ণন করিয়া Beaulieu মহোদয় কপিয়ার প্রতি একটু তীব্র কটাক্ষপাত করিতে তুলেন নাই। তাঁহার অন্তর্ভুক্তি বলিতেছে:—*Flat and bare, dull and inert, this nature (Russian) has not much to stimulate the mind with little nourishment for poetry and art.* কিন্তু Zenaide A. Ragozin মহোদয় এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া লিখিতেছেন,—

"It is natural for a foreigner to think so, whose necessarily transient stay could not attune his soul to the tranquillity and inner silence—recueillement which would open it to the subtle charm, the mystery of local influences repugnant, moreover, with their northern and oriental melancholia to his Latin temperament. But we are passionately fond of our steppe, our plains, our woods and even a cursory acquaintance with our poets, novelists and painters would suffice to show that art and poetry find therein ample and substantial food.

Ragozin মহোদয় স্বয়ং কপিয়ান অন্তঃকরণে আমরা তাঁহারই অভিমতের অঙ্গমোদন করি। আমাদের মূল বুদ্ধিতে আমরা হতাশ বুদ্ধিতে পারি তাহাতে ইহাই বোধ হয়, কপিয়ার

বিবাহ-ভাবই কপ কবিতায় বিশেষভাবে জনক। যেখানে বসন্ত বার মাস, সেখানে কোকিলের আধর কোথাও? কপিয়ার একমাস যদি বসন্ত প্রাকৃতিক হয় তাহাই নয়মাস নাকপ নীত ভোগী কপ-কবিশ্বের কল্পনা আহরণের পক্ষে যথেষ্ট।

কপিয়ার বসন্তের বসন্ত সমাগম হয় তখন কবি হইতে চাষার মন পর্যন্ত আনন্দে আগ্রস্ত হইয়া উঠে। কপ-কৃষকগণের আনন্দ লক্ষ্যেই ত্রিগায়ার তখন বিগত তত্ত্বাবহিত হইতে থাকে। মার্ক মাসের প্রারম্ভেই তাহার বসন্তের আগমনী গাহিতে থাকে "Come O spring, beautiful spring, come with joy, bring flax tall-grown and plenty of grain"—চিরস্বাক্ষর—চিরজুয়ার তখন কপিয়া হইতে বিবাহ লয় এবং কি দেশ প্রকৃতি, কি মানব প্রকৃতি এক অভাবনীয় আনন্দ-মুষ্টিতে প্রকাশিত হয়। কপগণ প্রকৃতির এই নব উদ্বোধনকে ঈশ্বরের পুনরা-বর্তাব বলিয়া বিবেচনা করে। ১লা May কপিয়ার সর্বত্রই উৎসবের অবকাশ ঘোষিত হয়। কপ কৃষকগণ নব-কিশলয় চান করিয়া নীত বে বিগত হইয়াছে ইহা পরস্পরকে জানান এবং এমনকি বৃদ্ধও এই বলিয়া বিশ্বনিরস্তাকে প্রার্থনা করে "I thank Thee Lord, that Thou hast vouchsafed to let Thy servant behold Thy spring once more!"

প্রকৃতির নব অস্তঃপ্রকৃতির কেমন হৃদয় সম্বদ, তাহা নবভাবমুগ্ধ কপিয়ার মানব-জীবন হৃদয় পুষ্টির দ্বারা পরীক্ষা না করিলে সহজে বুঝা যায় না। যে আতি একসময়ে কেবল অহঙ্করণপ্রিয়তার প্রাবল্যে ইতস্ততঃ অস্থির হইয়া বেড়াইতে ছিল আজ তাহা

তাহার জীবনের উদ্বেগ বুঝিয়া পাইয়াছে, বুঝিয়াছে কোথায় তাহার সম্ভাব্য পথ! তাই কাঁদায়ও দিকে না চাহিয়া কনিয়া আপন অধাবলায় বলে এ বিশ্বজগৎকে সভ্যতার আর এক নতুন রাস্তা দেখাইতে অগ্রসর। প্রাচ্য ও প্রান্তীচ্য সভ্যতার সমগ্র অজ্ঞাতসারে এক-মাত্র নবজীবনদম্পর আত্মীয় কনিয়াতেই সম্ভব! ধর্মের উপর, স্রষ্টাব্যের উপর, সমাজ-ত্বের উপর, নিম্নাধারপত্রের উপর বিব-হিতার্থে অচিরায় উনবিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও কোমন্ডের প্রত্যক্ষাবহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক নতুন আকার ধারণ করিবে। ধর্ম এবং বিজ্ঞান এক করিবার লক্ষ্যই কনিয়ার নব অভ্যাস। আত্মীয়ের পালা সাফ হইলে, বিবহেবতার পূর্বা কনিয়ার পালা পড়িবে। আত্মীয়ের বৈজ্ঞানিক শক্তিতে অগতাকে গঠিত করিবার তার পাইয়াছিল কিন্তু এতদিনে বিজ্ঞান তাহার সর্বনাশকারী ভাব ধারণ করিয়াছে। এইবার বিজ্ঞান মানবের কোতুকাবহ না হইয়া ভয়াবহই হইবে। মানব বুঝিবে যে ভোগান্তক বিজ্ঞানের অপেক্ষা লগতে আর এক মহাদুঃখের পরিভাষ্য রহিয়াছে—তাহা ত্যাগান্তক আধ্যাত্মিক শক্তি। এই সম্ভবতাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক শক্তির সমস্তে ক্রটিমতাত্ত্বিক আত্মিক-বিজ্ঞান-শক্তির মতক অবশ্য সমস্ত হইবে। সেই মহা দিনের বৃত্তি আর অধিক বিলম্ব নাই। যুগে অনেক জাতি এই হ্রস্ব ধরিয়াছেন বটে কিন্তু বেধে হয় কণ-জাতি তাহা কার্যে পরিণত করিবার অগ্রহুত হইবে। সমগ্র মানব পরিবারের ভিতর স্রষ্টাব্যে আশ্রিত করিবার লক্ষ্যই নব-কনিয়ার আল বিয়াট আবেগন। আত্মীয়ের দ্বারা ভোগ প্রধান বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার ঘটয়াছে, কনিয়া তাহার

সম্ভাবনার করিবে। ভোগ-শক্তির অপেক্ষা তাপ শক্তি যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠতর স্রষ্টা-তাপায় কনিয়া অচিরায় তাহারই পরিচয় দিবে।

### সুভি আদর্শ

পাকাতা লগতে অগত কোমন্ডের বান জতি উচ্চ। ইনি প্রত্যক্ষাবহের প্রবর্তক। ইহার বিজ্ঞানসমূহের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত। লাত করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেমন করিয়া মানবসামাজকে স্থাপিত করিতে হয়, মহামতি কোমন্ড ইহাতে তাহারই বিশেষণ করিয়াছেন। কণজাতি অগত কোমন্ডের Cours de Philosophie Positive নামক গ্রন্থের সহায়তার অনেকাংশে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইতিপূর্বে কনিয়ার বুঝকের ভাগই অধিক ছিল। অগত কোমন্ডের মতে জাতীয় উন্নতির তিনটি ধারা নির্ণীত হইয়াছে। এই তিনটি ধারার ভিতর দ্বিতীয় মানবজীবনকে ক্রমোন্নতি-মার্গে উঠিতে হয়। ধর্ম, ধর্ম-তত্ত্ব (Religion), মনতত্ত্ব (metaphysics) এবং প্রত্যক্ষাবহ (Positivism)। উন্নতিশীল জাতিগণকে প্রথমতঃ ধর্মতত্ত্ব ও মনতত্ত্বের ভিতর বহ-শতাব্দী বাগন করিয়া ক্রমোন্নতির তৃতীয় মার্গ প্রত্যক্ষাবহে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাই কোমন্ডের জতিব্যক্তি। অগত কোমন্ডের পর “Buckle এর History of Civilisation” নামক গ্রন্থ পাকাতা লগতে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল। Buckle এর মতে—Progress is always in the inverse ratio of the influence of theological conceptions—এই বৃদ্ধি সমগ্র ঐষ্ট লগৎ বড় আদর্শের সহিত প্রথম

করিয়াছিল। যথেষ্ট প্রভাব দূর করিতে পারিলেই যে জাতীয় জীবন আগ্রস্ত হইয়া উঠে, ইহাই পাক্কাভা জাতি সমূহের মনে বদ্ধবুল হইয়া গিয়াছিল। John Stuart Mill মহোদয়ও এই সময়ে ইউরোপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ তিনি বিশ্ব-মানবতা ও স্বাধীনতার প্রধান পাণ্ডা সাধিয়া ছিলেন। Büchner প্রকৃতি আরও অনেক পুত্র বৃহৎ সমাজ-তত্ত্ব এই সময়ে পাক্কাভা জগতের সভ্যতাত্ত্বীর কর্ণধার হইয়াছিলেন। Nicholas I এর সময় হইতেই এই সব প্রভাব রুশিয়ার মহা আন্দোলন উপস্থিত করিতে থাকে—এই জগৎ এই সময় 'the mad time' নাম ধারণ করে। সাহিত্যিক এবং ছাত্রমণ্ডলীর সব আগ্রহের ভাব বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। অনেকেই তখন কোমত প্রকৃতির মতামত না পড়িয়া শুনিয়াই সমাজসংস্কারক হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যেমন আমাধিপের ভিতরে অনেকেই জগতের বিভিন্ন সামাজিক ইতিহাস না পড়িয়াই সমাজ দলভে মহা ধূরন্ধর ও বক্তৃত্তা বাঙ্গীল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই হটকারিতার ফলে রুশিয়ার সামাজিক জীবন বড়ই বিবমর হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজ-সংস্কার নিহিলিগমে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর রক্ষণশীলতার তত্ত্ববন্ধন মহাত্মা Count Dimetri Tolstoi শিক্ষাবিজ্ঞানের মন্ত্রপাণ্ডা হইয়া রুশিয়ার উচ্চত জাতীয় জীবনকে সংবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রুশিয়ার অগত কোমতের প্রত্যক্ষবাদ পৃথীত হইলেও ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাব হইতে রুশিয়া ইউরোপের জ্ঞান নাত্তিক-তাবাপন্ন হয় নাই। এখনও তবাহ ধর্মের বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন, দৌহর্দ্য বিশেষ-

ভাবে বেগা ধার। তাই এই জাতির বেকনত্ববন্ধন স্নাতোকিলপন ইউরোপের দুর্গমতা বেরাইয়া বলে:—"The nations of the west began to live before us, and are consequently more advanced than we are; but we have on that account no reason to envy them, for we can profit by their errors and avoid those deep-rooted evils from which they are suffering. He who has just been born is happier than he who is dying." কম উচ্চাশার কথা নহে।

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর জাতিনীতে প্রথম বিশ্ব-মানবতার বিক্ষেপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়; এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র ইউরোপে জাতীয়তার ভাব সংক্রামক হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। অল্প স্বদেশবৎসলতাই তখনকার ধূম্য হয়। জাতীয় বিশেষত্ব, দেশীয় পতাকা, প্রাচীন বেশপ্রথা ও নানাত্তপ কুসংস্কার ও জাতীয় দৌরব বলিরা বিবেচিত হয়। এই নৃতন আন্দোলনে ভাল মন্দ উভয় কলই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সময়ের একটি বিশেষ কল হইতেছে হেগেলের বর্ণনাবাদ।

Hegelian philosophy enunciates an Absolute Reason developed through incarnations of National Civilisations, each better than the last, a synthesis of the series of progressions will exceed and comprehend all of them and produce Universal peace. Hegel saw in Germany the last national civilisation.

হেগেল বলিলেন জাগতিক ইতিহাসই "Pro-  
gress in the consciousness of free-  
dom" ( Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit)। হেগেলের বর্ণনাপত্র ঘোষণা  
করিতেছে যে অগতের ইতিহাসের প্রত্যেক  
স্থগেই এক একটি জাতি বাস্তব জীবনে অশেষ  
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার আদেশ পায় এবং  
অশ্রুপার জাতি সেই নির্দিষ্ট জাতির সভ্যতা  
ও উন্নতির ক্রীতদাস বা অহুকরণকারী হইয়া  
অগতে নির্ধারিত ভাবে মৃত্যু সম্বত করিয়া থাকে।  
এই অশেষ বুদ্ধিমত্তাকে হেগেল Weltgeist  
( the Absolute Reason ) বলিয়াছেন।  
হেগেলের মতে এই "অনন্ত প্রজ্ঞা" প্রথমে  
প্রাচ্যে আবির্ভূত হয় তাহার পর গ্রীসে,  
তৎপরে রোমে এবং অবশেষে জাৰ্মান  
জাতিতে; এবং ইহাই ধারণা করা হয় যে  
এই অনন্ত শক্তির আভিযাত্রি এক্ষণে চরম  
সীমায় উপনীত হইয়াছে। হেগেল বলেন  
জাৰ্মান জাতিতেই এই অনন্ত প্রজ্ঞা (Welt-  
geist) উচ্চতম বিকাশ এবং পরি-সমাপ্তি  
প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমান কনিয়ার ধারণা অন্ততঃপ।  
কনিয়া যে অগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ  
করিবে, ইহাই কল্পনের উচ্চাশা। কপ  
ঐতিহাসিক মহামনা Karamzin এই বলিয়া  
ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে হয় Clio ( ইতি  
হাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশেষ ) নীরব  
হইবেন কিবা কনিয়াকে অগতের জাতীয়  
ইতিহাসে প্রথম এবং উচ্চতম স্থান দিয়া  
মানব সভ্যতার উপলংকার করিবেন। যত্বে  
অগে-হিটলরী মার্মনিকগণ হেগেলের অজ্ঞাত-  
বাক্যে সম্মত হইলেন না। হেগেল বলিয়া-  
ছিলেন "এই অগৎ মানব এবং কল্পনে

নষ্ট।" Slavophil-চুড়ামনি Assakov  
ইহার প্রভুত্বেরে বলিয়াছিলেন 'yes, we  
Russians are the Beyond-men' এবং  
Dostoievski কল্পজাতিকে Pan-hu-  
man বলিতেও সন্তোষিত হন নাই। প্রাক্তো-  
কিলগণ হেগেলের শুকতর বিষয়টির স্বপ্ন  
গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু জাৰ্মান জাতি যে  
অগতের শিখ স্থান পাইবার যোগ্য এই  
ধারণার পোষকতা করিলেন না। হইতে  
পারে বর্তমান সভ্যতার ইতিহাসে টিউটনগণ  
সৰ্বপ্রধান কিন্তু অগতের শিবর্জনের এখনও  
শেষ হয় নাই। হেগেলের ধারণা নিত্যন্ত  
অসম্পূর্ণ! বিশ্বমানবতাও মানব-সভ্যতার শেষ  
সীমা এখনও অগতে আনিয়া উপস্থিত হয়  
নাই, অতএব সভ্যতার সাধু-উদ্দেশ্য এখনও  
অসম্পূর্ণ। জাৰ্মানীর ভোগমূলক গতি কান্ত  
হইবার আর বিলম্ব নাই। জাৰ্মানীর সভ্য-  
তার উত্থান এক্ষণে পতনোন্মুখ। ইহাই কপ-  
গণের বিশ্বাস। আত্মিক উন্নতির অধঃপতন  
অবশ্যজারী।

যৎ জাৰ্মান গণিত Frederic Reimer  
জাৰ্মানসভ্যতার কেন্দ্রস্থল Berlin সম্বন্ধে  
নিয়মিত সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছেন।

"We may perhaps to a certain  
extent, apply to the Berlin of our  
days what Droysen said of the  
last period of Greece light,  
deprived of every moral sense,  
without virtue or religion, Hellen-  
ism is being transformed into  
that piquant, witty dissolute mean-  
ness, which constitutes the last  
stage in the life of nations."

—Visso's The Germans and the  
Russians.

এইরূপ সভ্যতা নষ্ট হইয়া আশ্বিনী যদি আর সমগ্র জগতের Weltgeist এর ঈশ-হান্না হন, তাহা হইলে আশ্বিনীর পতনের ও প্রাচ্য-জগতের আর বহু বিলম্ব নাই। বর্তমান বিশ্বেশক্ত্যাবীর মহা কুলকেন্দ্র যে ভোগ ধর্মী ঈশ্বরায়ণ ইউরোপের বহুবংশের ধর্ম-সম্পাদন করিবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যের পরিণাম হয় না। Prince Odóevski দেখাইতেছেন,—

Western Europe presents a strange, saddening spectacle. Opinion struggles against opinion, power against power, throne against throne. Science Art and Religion, the three chief motors of social life, have lost their force. We venture to make an assertion which to many at present may seem strange, but which will be in a few years only too evident. Western Europe is on the high road to ruin! We Russians, on the contrary, are young and fresh and have taken no part in the crimes of Europe. We have a great mission to fulfil. Our name is already inscribed on the tablets of victory, and now we have to inscribe our spirit in the history of the human mind. A higher kind of victory—the victory of science, Art, and Faith—awaits us on the ruins of tottering Europe. বর্তমান যুদ্ধে Prince Odoves-

কির উপরের কথাগুলি কিরূপ ভাবে লক্ষ্য দিতেছে তাহা লন্ডনের পাঠক মাস্টের বিশ্লেষণ দৃষ্টিতে পারিতেছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

সমগ্র ইউরোপীয় জগতের মধ্যে দুইটি সভ্য মানবজগৎ বিদ্যমান করিতেছে। তন্মধ্যে একটি প্রাচ্যোভ্যাপার Gracco-slavonic ; এবং অপরটি পশ্চাত্য ভাবাপার Roman Catholic ও Protestant—এই উভয়ের ভিত্তিই খ্রীষ্ট-ধর্ম কিন্তু পশ্চাত্য ভাবাপার হইয়া এই উভয় ধর্মবাদেরই খ্রীষ্ট অপেক্ষা পথতানকেই অধিক প্রভুত্ব দিয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্মের পোহাই দিয়া এই উভয় মতাবলম্বীরা জগতে যতপ্রকার অশান্তি বিগ্রহ ও অভ্যাজারেরই সৃষ্টি করিতেছে। অপরদিকে Gracco-slavonic জগৎ রোমক সভ্যতার নিকট হইতে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন Byzantium এর খ্রীষ্টপন্থ্যতার নিকট হইতে বর্ধাৎস ভোগ, পোহাচ্চা সম্বন্ধিত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধিও সেই পূর্বতন প্রথা লক্ষণ পোষণ করিতেছে। Gracco-slavonic জগতকে পোপের বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রোটেস্ট্যান্টগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ভোগ করিতে হয় নাই। তন্মত রুশিয়া প্রভু প্রাচ্য বৃত্তীর জগৎ এখনও বিকৃত ভাবাপার হয় নাই এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মূল—দয়া ভোগ, নম্রতা, আত্মজীব প্রভৃতি তাহারাই রক্ষা করিতেছে। তাহারের কোনরূপ ধর্মনশাস্ত্র না থাকিলেও তাহারাই অবিলম্বে জগতে এক মহাধর্মন সৃষ্টি করিবে দ্বারা প্রতীচ্যের সৃষ্টিবাহ অপেক্ষা এক বিশ্বব্যাপী শান্তি আনন্দ ও কল্যাণের রাশ্য স্থাপন করিয়া প্রাচ্যের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিবে। সৃষ্টি অপেক্ষা বিশ্বাসই সেই ধর্মের ভিত্তিবরণ হইবে এবং তদ্বারা

অগতের অধুনা ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহাদির যুদ্ধক্ষেত্র ঘটিবে। নব কশিয়ার উপর সেই মহাভাব পড়িয়াছে।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই এই মহা-ভাবের সূচনা হয়—কশিয়ার নবজীবন জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন St. Petersburg Gazette এই বার্তা সমগ্র কশিয়ার ঘোষণা করে।

“The bell has sounded! It is not the death-toll of a dying race but the call to re-awaken to new life, ring out to all slavonic peoples: a re-born regenerate life the eve of which we celebrated on the 19th February 1861.”

It was a breath of life which wafted the nation on a new course; the trumpet, as of the last judgment, which has aroused the dead.” —Dr. Julius Eckardt Modern Russia

ইতিপূর্বে কশিয়া পাকাতো সভ্যতার অম্বুজকরকারী হইয়াই বিচরণ করিতেছিল। কখনও জার্মানি কখন বা ফ্রান্স কশিয়ার উপর প্রভুত্ব করিতেছিল। রুশ-সম্রাজ্ঞী Annea সময় জার্মানির প্রভাব কশিয়ার এমনি বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে রাষ্ট্র-বিগ্রহ যাতীত ইহার হস্ত হইতে কশিয়া নিজের পার নাই। সব বিভাগেই Biren প্রভুত্ব জার্মানগণ কশিয়ার হস্তাকর্ষ্য বিখ্যাত হইয়া গাঁড়াইয়া-ছিল। অন্তঃপর সম্রাজ্ঞী Catherine II এর সময় কি বেগদুবার, কি আচার ব্যবচারে, কি সাহিত্য সম্বন্ধে ফ্রান্সের প্রভাব কশিয়ার সর্বোৎকর্ষ হইয়া গাঁড়ায়। উন্নতবংশীয়গণ

যাক্তায়া পরিভাষ্য করিয়া করানী ভাষা, ফরাসী সভ্যতা ও সাহিত্যের পুষ্টি-শোষণকতা করিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী Catherine, Voltaire এর বন্ধু হইয়া পড়েন, কশিয়ার Court theatre সম্রাজ্ঞীর নিকট মনিষ্যের প্রদর্শন ও Cornille এবং Racine এর ট্রাজিডি সকল নিঃসিন্ধুত্বপে অভিনীত হইতে থাকে।

এইরূপে চারিদিক হইতে অপর জাতির প্রবল সভ্যতা-স্রোত জাগিয়া কশিয়াকে একরূপ বিকৃত ও অম্বুজকরপ্রিয় ক্রীতদাস করিয়া তুলে। এমন কি কশিয়ার জাতীয় কবি Pushkin তাহার যাক্তায়া তুলিয়া করানী ভাষাতে রচনা করিতে লজ্জিত বোধ করেন নাই। তাই অতি দূঃখের সহিত Mackenzie Wallace মহোদয় তাঁহার Russia গ্রন্থে লিখিতেছেন :—To obtain the title of the Russian Racine, the Russian Lafontaine, the Russian Pindar or the Russian Homer was at that time the highest aim of Russian literary ambition. ফোগলের সময় হইতে রুশ-সাহিত্যে এই অম্বুজকরের প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্টীয়ত্ব হয় এবং ‘নিজস্ব’ বলিয়া একটি সামগ্রী কশিয়ার সাহিত্যপ্রদানকে উজ্জল করিতে থাকে।

বাইবলের সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয় যে দুষ্ট বেথিয়া তিনি কোন বিষয় বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ইহাতে মনোভাষ্যের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যতক্ষণ এই মন কোন বহিঃবস্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বী-নিবদ্ধ হয় ততক্ষণ সে কোন আশ্চর্য (original creation) দান করিতে বা জন্ম দিতে পারে না। একটি ব্যক্তির পক্ষে যেমন

একথা খাটে একটি জাতির পক্ষেও উদ্বাহ ঘণাঘা প্রতিপাত্য হয়। বৈদেশিক অত্যাচার-মোহগ্রস্ত জাতির আপনাতর বনিবার কিছুই থাকে না। ফ্রান্সই সেই অধীন জাতির উৎপাদন শক্তি ও উদ্ভাবন-শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়,—বন্ধা নাগরিক গ্রাম সেই জাতি ভগ্নতের কোন কল্যাণেই আসে না। কেবল অত্যাচারপ্রিয়তাই সেই জাতির লক্ষ্য হয়।

কিন্তু এই অত্যাচারপ্রিয়তা নব রুশিয়ার আগন্তকের সঙ্গেই দূর হইয়া গেল। যখন প্যারিসে করাসী বিপ্লব বাধিয়া উঠিল তখন St. Petersburg হইতে করাসী আন্দোলনের খুঁচা কমিয়া আসিল। কোন ভাব রুশিয়া যেমন গ্রহণ করিতে অগ্রসর, তেমনি তাগি করিতেও অগ্রসর। যে সমস্ত জন-নেতাগণ স্বাধীনতা ভুলিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন করিতে ছিলেন তাঁহারা অব্যবহিত দূর এবং মুক্ত হস্ত লব্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের করাসী আক্রমণ ও করাসী কর্তৃক যত্নের অধিকাংশ রুশিয়ার চৈতন্যপূর্ণ করিয়া দিল। ঐ সময়ে কেহ করাসী সভ্যতার নাম পূর্বাভাসে যুগে আনিতে যেন-শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত।

সাহিত্যও নূতন ভাব ধরিল। Zhukovskii, Pushkin, Lermontov প্রভৃতি কবিশ্রম অত্যাচারপ্রিয়তাকেই লক্ষ্য করিয়া চলিয়া ছিল; কিন্তু পোশনের সময় হইতে সাহিত্য নব বসনে সজ্জিত হইল, সাহিত্য প্রাণ পাইল। সাহিত্যে ব্যক্তিগত আর স্থান পাইল না। বিজ্ঞান কেবল পুঁথিপত্র পণ্ডিতের তিতর আবদ্ধ না হইয়া মানবজীবনের বস্তুরূপে কর্তৃকক্ষে অবতীর্ণ হইল—

"Science has now descended from

the heights of philosophic abstraction into the arena of real life." জাতিরিক্ত কর্তব্যের উৎসব পড়িয়া গেল, কি লম্বা কি রামনোতি, কি সাহিত্য, কি ইতিহাস; সর্বত্রই জাতীয় দমনী ক্রীড়া করিতে লাগিল।

রুশিয়ার

এইরূপ :—

"Literature has come to look at Russia with her own eyes and sees that the idyllic romantic personages which the poet formerly loved to describe have no objective existence. Having taken off her French glove, she offers her hand to the rude, hard-working labourer and observing lovingly Russian village life, she feels herself in her native land. The writers of the present have analysed the past, and having separated themselves from aristocratic literatures and aristocratic society, have demolished their former idols"

বর্তমান জন-সাহিত্যের দ্বারা দেশের কথা দেশের ভাষা আপাইয়া সাহিত্যের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছে। দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও একদিন চণ্ডিলাল রামপ্রসাদ গ্রন্থ কবিশ্রম পাথারের উপযোগী করিয়া বঙ্গবাসীর সেবা করিয়াছিলেন। চণ্ডিলালের পানে রামী রমকিনী, মোঘালিনী প্রভৃতি পতিভাগ্য স্থান পাইয়াছিল—রামপ্রসাদের আত্মল আত্মানে অতি বড় পাষণ্ড-জ্বর বিষম-বৃদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিও বিবেক-বৈরাগ্য অত্যাচার

করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙ্গালার উজ্জ্বল  
প্রান্তরে ও কুব্জের মুখেও রামপ্রসাদী সুর  
ভনা হইত—এখনও ভনা বায়—

“যন তুমি কৃষ্য কাম ভাননা।

এমন মানব আমি হইল পতিত আবার করলে  
কলতো লোণা।”

এখনও গন্ধার বকে মাক্সি ঘাটার মুখে  
কত অচেনা কবির স্মৃতি পান ভনা দায়।

বকের আধুনিক কবিতায় সে ভাব নাই—

কবিতা যেন খোস-পোষাকী হইয়া পড়িয়াছে—  
হুই পাচ জনের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

যে কবির কবিতা সঙ্গীতধারণের সম্পত্তি নহ,  
তাঁদের আবার বুলা কি? আর চণ্ডিদাস  
রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণের একখানি  
পানের বুলা লক্ষ টাকা ধিলেও ধিলে না।

এমনটি আর হয় না। কেমন করিয়া হইবে!

যে কবিগণের আত্ম-গরিমাই লক্ষ্য—যাহারা

নাম কিনিবার জন্যই ব্যস্ত তাহাদের ভরষ

দিয়া কেমন করিয়া প্রাণের কথা বেশের বাধা

জাতিয়া উঠিবে? বেশের মাটি না পাইলে

কবিতা হুঙ্কার প্রদব করে না—বর্ধা কবিতা

জগৎজ্বির কোড়ে পল্লীজননীর প্রাণেই

বর্দ্ধিত হয়। আধুনিক কবিতা পরগাছা—

বিশেষীর উচ্ছ্বিষ্টে পুই;—কেমন করিয়া এমন

অব্যক্ত সামগ্রীতে অন্তরের নৈবেদ্য—প্রাণের

স্থূনা মিটিবে! যে দিন এই বাঙ্গালার মাটি

পত পত কুব্জের কর্ণে কথা কহিতে শিখিবে

যে দিন গন্ধার বকে মাক্সিদের কর্ণে কোন

কবির রচিত স্মৃতিপান উথিত হইবে—যে

দিন বেশের হুঙ্কারে গাথা সঙ্গীতধারণের

কর্ণে হাটে মাঠে গোষ্ঠে প্রচারিত হইবে, যে

দিন বাঙ্গালী কবি এবং সাহিত্যসেবীগণ

বাঙ্গালীর কাহিনী প্রাণের কথার ব্যক্ত

করিতে পারিবে সে দিন বুঝিবে—বেশ জাপি-

দাছে—বেশে বাথার বাবী ঘিলিয়াছে। এক  
সময়ে কন-সাহিত্যের দুর্দশা দেখিয়া কন-  
সাহিত্য বীর Wolkonsky তাঁহার জলধ  
ভাষায় বলিতেছেন;—

“Literary forms were coming from  
abroad ; poetry had to gush out of  
the soil. Just so in nature invigora-  
ting light comes from above, active  
force comes from the earth. The  
earth had not yet spoken.”

এক সময়ে কণিয়া, আমাদিগেরই এতাদৃশ

বর্ধমান অবস্থা ভোগ করিতেছিল কিন্তু

আজ কণিয়ার আর সেজন্য ভাব নাই—আজ

কণিয়া সঙ্গীতধারণে বাধীন-পতাকা জুলিয়া

উন্নতিমার্গে ক্ষত-নকত্রবেগে ছুটিয়াছে।

বড় ধুংসের বিষয়, ইউরোপে যাহা পুরাতন

ও পরিত্যক্ত আবারেই যেন—বিশেষতঃ

বাঙ্গালী যেনে তাহা নূতন ও পুঞ্জনীর বলিয়া

গৃহীত হয়। বিষ্ণু আমাদিগের উদ্বেগবহীন

অহঙ্করণ-প্রসূতায়। বিচার না করিয়াই

আমরা অপর আঁতের ম্যানির অহঙ্করণ করিতে

ভালবাদি। আমরা জগতের উত্থান

পতনের ইতিহাস পাঠ করি না—অপর

আঁতির ধোব জপের সম্যক বিচার করি না—

হটকান্ধতার সহিত অপরের আদর্শ গ্রহণ

করি। আমরা Materlink-এর Mystic-

cism লইয়া এখানে মস্ত সাহিত্যিক বনিয়া

যাই—কিন্তু মৈত্ৰলিঙ্কের বুদ্ধকি ইউরোপে

যে জন্মপাই পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে তাহা

আমাদিগের কল্পনাসাহিত্যিক খবর রাখেন?

“Anatole France, Pierre Loti, Ma-

terlink stand to-day isolated out

of all touch or sympathy with the

youngsters.” ( Georges Chatterton



(Hall) নব্য দলের বর্তমান অধিনায়ক হইতেছেন—M. Henri Bergson তাঁহার 'L' Evolution Creatrice' বাস্তবিকই ইউরোপের ভাবমগ্ধে সুপ্রান্তর উপস্থিত করিয়াছে। নৈরাত্তবাব, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি তিরোহিত হইয়া এক্ষণে ইউরোপে কণ্ঠের প্রাধান্য ও উৎসাহের বান্ধী বিঘোষিত হইতেছে। আর অপরিণামধনী আমরা ইউরোপের উজ্জ্বল লইয়াই সমুদ্র আছি।

### স্মৃতি-জাতির জাতক

অনেক পঞ্চাটক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, —“From Tatra to the Black mountain, from the Giant Alps to the Urals, resound the words—Heaven for the slavs”। এই হুমহান স্নাত-অগ্ন্য আশ পৃথিবীতে স্বর্ণরাজ্য স্থাপনার জন্ত উৎসৃষ্ট। সমগ্র এশিয়া-মণ্ডকে কশিয়ার ভাবে অগ্রসারিত অগ্রসরিত করিবার জন্ত সমগ্র স্নাত-অগ্ন্য অগ্ন্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ল্যাটিন এবং টিউটনিক জগতের দ্বারা গুটীকৃত কিছু সার্থকতা হয় নাই, গুটী-ধর্মের কোন আদর্শই নাস্তিকতাবাদ্যপন্য স্থল বিধানী ইউরোপ গ্রহণ করে নাই তৎপরি-বর্তে অর্থ এবং ব্যবসায়ই পাশ্চাত্য-জগতের ধর্ম ও লক্ষ্য হইয়াছে। এই ব্যবসায়াত্মিক নৃদ্ধির দ্বারা ইউরোপের সমতা এবং সৃষ্টিলা-লোপ পাইতে বসিয়াছে। স্বার্থ এবং লংঘনই ইহার বিবময় ফলস্বরূপ হইয়া জাতিগত ব্যক্তিকে প্রকৃত এবং অগণ্য মানব পরি-বারকে দুর্দ্বন্দ্ব এবং দারিদ্র্যের উত্থান পুষ্টি রহিত আবার্তে নিক্ষেপ করিয়াছে। পরিশ্রমী ব্যক্তিগণ দাব্যের দ্বার পাবে ফেলিয়া দিনান্তে ভাল করিয়া খাইতে পাইতেছে না এবং আর এক শ্রেণীর অগণ লোক অর্থবলে দিয়া

আহার-বিহারে লক্ষবিধ জাগতিক সুখভোগে দিনপাত করিতেছে। Greater Russiaর প্রণেতা Wirt Gerrare তাই অতীব দুঃখের দহিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—“The commercialism of the United States of America, of England and her colonies is widening the gulf between the classes, is making the few rich, richer—the many poor, poorer still. The despairing poor of all Anglo-Saxondom might see in “Orthodoxy” (Russian) an aspect of Christianity not only new to them, but one they could accept. At the right psychological moment some such wave of religious emotionism as the world has several times seen will again quicken Europe... and unite all to one creed. If it should be Russian orthodoxy that triumphs Russia will become the world power.” (Page 288 )

এই বিপ্লবভাবীর সভ্যতা-ক্ষেত্রে কশিয়া ধর্মের জ্ঞাতপদে, নক্সবৎসে উন্নতির সোপানে উন্নিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে যে প্রতিরোধ কশিয়া জগতের শিবহান অধিকার করিবে তাহাযে অনেক আশা করিতেছেন। তাহার একটি বিশেষ কারণ, এই জাতির অসাধারণ জাতক্য ও একতা। স্নাত-অগ্ন্যতের সর্বত্রই এই জাতক্য ও একগোত্র-ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। ইহা কেবল কশিয়ায় নহে স্নাত-জাতির দ্বারা বিশ্বমাত্র চিহ্ন রহিয়াছে তাহার জাতক্য কথাটি আত্ম-পুষ্টিক উজ্জল হইয়া উঠিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক সভ্যজগতের সকল স্থানেই প্রাত্যহিক বড় আত্মা এবং বার্ষিকপত্রের বিশেষ প্রাক্কর্ষণ। কেবল সময় স্নাত-জন্য জুজুমান প্রাত্যহিকের দৃঢ় বন্ধনে এমনও একীভূত। "জাই জাই ঝাই ঝাই"—একথা কণিগায় খুব অল্পই ভ্রত হয়। কেবল কণিগা কেন?—Croatia, Dalmatia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Bulgaria যেখানেই স্নাত-জন্য, সেখানেই Brat (ভ্রাত) কথাটি অল্প অল্প এবং নিম্নের কৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। স্নাতপনের এই প্রাত্যহিকের মাতৃকোভ হইতেই পটিলকিত হয়। বিগত তুর্ক যুদ্ধের সময় আর্মার উহার সবিশেষ পরিচয় পাই। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাত্যহিক রক্ষা করিবার জন্য এই প্রাতিয় কি প্রবল আগ্রহ তাহা নিম্নলিখিত কথাতুলিতে প্রকাশ পায় :—

"'Not for king and fatherland ! nor for the Cross of Christ ! but for Jivan Rescue Jivan' was the shout of the contingent which wrested a captured gun and a comrade from the Turks at Veless, leaving one-third of its number on the field."

প্রাত্যহিকের মর্যাদা যুদ্ধে বলিয়াই এই প্রাতি বিগত তুর্ক যুদ্ধে আর্মারটাকে এত তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল। এই প্রাত্যহিক কেবল পিতামাতার রক্তের সঞ্চ বা জুজু সম্পর্কীয় পতীর ভিত্তর আবদ্ধ নয়; পিতামাতা হইতে বিভিন্ন পরিবারে—পরিবার হইতে প্রাতি-বেশ্যে—প্রতিবেশী হইতে সময় স্নাত-প্রাতিতে—সমগ্র স্নাতপ্রাতি হইতে সময় মানব সমাজে এই প্রাত্যহিকের তড়িৎ প্রবাহিত। প্রাত্যহিকের এই জুজুমান আদর্শ সময় বার্ষিকতা-বা

পত্র জগতের অহুত্ব করিতে এখনও বিলম্ব আছে।

এই প্রাত্যহিকের অল্প নিম্নের অল্প সময় স্নাত-জন্য একটি ক্ষমতা রাখে। পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাই যদি যুগী হয় তাহা হইলেও সে মুক্তি পায়—গ্রাম্য পকারে হইতে (Zadruga-family government) খুব অল্প আত্ম বা অভিযোগ রাষ্ট্রধারে পৌছিতে পায়। স্নাত-কৃৎকরণ প্রাত্যহিকের অপরাধ এবং দুর্জলতা পদে পদে ক্ষমা করে। স্নাত-গণের একটা বিশ্বাস এই যে, যে আইনের ক্ষমতার দ্বারা অপরাধীর দোষ সংশোধিত হয় না। তজ্জন্মই তাহার দোষ ক্ষমা এবং সহিতুতাই অপরাধ সংশোধনের প্রকৃত উপায় বলিয়া মনে করে। অপরাধী বৈক-বসন্তঃ একটা পাপ করিয়া কেহিয়াছে তজ্জন্ম আর কি হইবে?—এই বলিয়া স্নাত কৃৎকরণ আশ্রয়দিকে প্রবেশ দেয়। অপরাধীর উপর কোনরূপ আইনের কৃষ্টিলা বা প্রতিহিংসার ভাব তাহার মনেই আসে না। তাহা ছাড়া অপরাধীর কার্য অপেক্ষা উদ্বেগের উপরই অধিকতর আস্থা স্থাপন করা হয়। বৈক-কৃষ্টিলাক এবং দুর্জলতাকে তাহার ব্রহ্মা করে না তজ্জন্ম ক্ষমা ও দয়া উৎস তাহারে দ্রব হইতে কল্প তরু হয় না। অপরাধীর অপরাধ তরুতর হইলেও প্রাতিই মুক্তি পায় এবং অপরাধীও দ্বিতীয় বার অপরাধ করে না। অতুৎকানের দিকেই এপ্রাতিয় লক্ষ্য—বিশ্বের দিকে নহে। স্নাত কৃৎকরণের ভিত্তর এই ক্ষমতা তাব বড়ই প্রবল। সর্বোপরি বর্তমান বর্তমান-স্নাতগণ এই আদর্শের উচ্চতম নীমা উপ-নীত। তিস্ক কোথাও তিস্ক করিতে বাধ্য পায় না—অন্ত-খণ্ড এবং মুকরণ রাজ

হিন তিকা করিতে পারে। অতিথি বিমুখ হইয়া।

সঙ্গীপেক্ষা শিশু ও বালকদিগের প্রতি স্নাত পিতামাতাগণ বিশেষ যত্ন করেন। তাহারা সন্তানদিগকে ভৎসনা করেন বটে কিন্তু মারেন না। মাতার অপেক্ষা পিতার যত্ন অধিক। সন্তানদুজ্জ্বল কোলে পিঠে মাথু করিতে বড় বড় স্নাত কণ্ঠচারণ লক্ষ্য বা মানহানি বোধ করেন না। পিতার এতাদৃশ যত্ন ও দৃষ্টিবশতঃ পুত্র-কন্যার শিক্ষার কোনরূপ ব্যতিচার ঘটে না। স্নাত-আদর্শ অপেক্ষা ইউরোপীয় আদর্শ কত নিম্নে তাহা জ্ঞাপন করিতে আশ্রয় একজন slav-অধ্যাপকের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"From English literature we know a good deal about English schools and do not wonder that all the public men in England are so gloomy and grave. Their education seems, from first to last, to be based on rigid repression of every natural feeling. The entire system would seem to us cruel and abominable. The term 'bully' has no equivalent in our tongue. Is it really believed that such treatment hardens or can make heroes of children? And again, the affected contempt of all home ties, what does it signify? Why should a boy be ashamed to love his mother and cherish his sisters? Surly this is perverted civilization."

(The soul of southern Slav. F. Review Oct. 14. (Page 646)

বলি ইহাতে আমাদের পাকাতা আদর্শ-অনুপ্রাণিত বাবু মওলীর চৈতন্য উৎপাদন হইবে কি? পরের বেদিয়া যদি আমরা না চৈতন্য লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের তদ্ব্যপায়ী জাতির মৃত্যু। তির আর অল্প উপায় নাই।

Elizabeth Christitch মহোদয়া উক্ত প্রবন্ধের আর এক স্থলে বলিতেছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা লংঘন করিতে পারিলাম না কারণ তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক উপকারে আনিতে পারে যথা—

"The southern slav is certainly unabashed in demonstrating his affections. Neither Paris clothes nor a polyglot education can hinder men from embracing when they meet after a long absence." আর অধ্যাত্ম আমরা বিশ্ব-বিজ্ঞানস্নেহ দুই চারিটি তত্ত্ব পাউলেই পিতৃ-পরিচয় বিতেও লক্ষ্যবোধ করি। হায় অদ্ভুত শিক্ষা, তোমার পথে কোটী কোটী প্রণাম করি।

স্নাত-স্বা জাতির ভিতরেও এই অদ্ভুত-পূর্ণ স্নাত-অহুসারের আশ্রয় নিবর্জন পাওয়া যায়। তাহাদিগের নিকট পতি অপেক্ষা স্নাত বড়—"God can give another husband, but never another brother" ইহাই স্নাত-ভগ্নাত্মের উক্তি। ইউরোপের স্নাত পতিপত্নীর ভিতর যেমন চক্ষু-লক্ষ্যহীন আশ্র-সর্ব্ব প্রকাতভাবে স্নাত-স্নপ্তে দেখা যায় না। স্নাত-স্নপার ইউরোপীয় আদর্শ অনুকরণ প্রেম-বৈচিত্র্য এখনও প্রকট হয় নাই। তথ্যস্বা অপেক্ষা স্নাত পরিবারের দায়িত্ব অধিক বলিয়া পরিগণিত হয়।

সংগেদের যেমন আপনার সামগ্রী, Pobratimstvo (elective brotherhood) ভগ্ন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও সংগেদের হইতে ভিন্ন নহে। মত পায়ে উভয় বন্ধুর বস্ত্র মিশাইয়া এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে হয়। স্ত্রী পুরুষের ভিত্তরেও এই ভিন্নহাবী ভ্রাতা-ভগ্নীর ভাব স্থাপিত হইতে পারে, স্নাতকগণের চক্ষে ইহার অপেক্ষা পবিত্র ও অবিচ্ছিন্ন আর কিছুই নাই। এইজন্য ভ্রাতাকে বলে 'Pobratim' এবং ভগ্নীকে বলে 'Posestra' ইহারা কখনই বিবাহ-পণে বদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য ভ্রাতা ভগ্নীর এমনি পরস্পর বিয়ল দেয়াহুয়োগ যে ইহাভীষনে তাহাদের সেই পবিত্র সম্বন্ধ হইতে কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। স্বামী কিবা স্ত্রী ইহাতে কোনরূপ সম্বন্ধ বা যেরূপ পোষণ করে না। কস্তার উপর নিভার দেহরূপ অধিকার Posestra উপর Pobratim এরও তেমনি অধিকার। Pobratim তাহার Posestra র অন্ত স্বামী নির্বাচন করিয়া থাকে, Posestra ও Pobratim এর অন্ত উপযুক্ত পত্নী নির্বাচন করে। বাল্যকাল হইতেই এই অপূর্ণ-ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হয়; বিবাহাবস্থার পর অধিক বয়সে Probratimstvo—সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া যায় না। স্নাতক জন্মে পাক্যভাতা সত্যতা প্রবেশ করিয়া এই পবিত্র আশ্রম একপে কলুষিত হইতেছে। অল্পকাল হইল একটি বিব-বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহার Posestra র নিকট জন্মের গুপ্ত ভালবাসা পত্রের দ্বারা নিবেদিত করিয়া আশ্চর্য্যতা করিয়াছিল। সত্যতালোক-প্রাপ্ত সহরবাসীর ভিতর এই অপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের স্নাতক-গণতে ক্রমশঃই তিরোহিত হইতেছে কিন্তু পল্লীতে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং দিবা এখনও অটুট রহিয়াছে।

বিগত বাঙাল-যুদ্ধে সম্পূর্ণ অনীকিনীই Probratim সমূহে পূর্ণ ছিল। কি সেনাপতি কি সামান্ত সৈনিক, সকলেই এক ভ্রাতৃত্বের অভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ক্ষুত্র মটিনোগ্রনদের ভিতর কোনরূপ সাময়িক অহুশিলন বা মহানার প্রয়োজন হয় নাই এক ভ্রাতৃত্বের অহুত্ব ভলেই এই মাতি সূত্র হইয়াও মহায যোদ্ধা হইতে সমর্থ হইয়াছিল। যুদ্ধে একটি সংগেদের মৃত হওয়ায়, একজন সৈনিক সমরক্ষেত্রে হইতে তাহার বন্ধুকে এই মর্মে লিখিয়াছিল:—"I have no body in the world. My only brother was killed at Monaster." স্নাতকগণের ভিতর এই প্রবাদটি সচরাচর শুনা যায় "Brat Je mio, koji vere bio" অর্থাৎ A brother is a brother of whatever creed. ৭র্থ তির হইলেও তাই এক। এমন ভ্রাতৃত্ব ভগ্নতের আর কতাপি নয়নপোচর হয় না। বিগত বঙ্গ-যুদ্ধে যখন সার্কিয়ার সমরগতিব সেনাপতি Stepa Stepanovitchকে তাহার সৈন্তগণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিমগকে বীরত্বের পুরস্কার দিবার অন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তখন উক্ত সেনাপতি এই বলিয়া সমরগতিবকে জানায় যে তাহার সৈন্তগণের সমবেত চেষ্টায় বীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে অতএব নির্দিষ্ট ব্যক্তিমগকে পুরস্কৃত বা পদোন্নত করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। সেনাপতির এই উক্তি সেনাগণের ভিতর কোনরূপ অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এই স্নাতক ভ্রাতৃত্ব একপ্রাপ্ততা ও একনিষ্ঠতা এমন যে আলম সময়ে ইহাদের সকলেই যে এক জননী অহুত্বের সন্তান তাহা অন্যায়সেই

বুঝিতে পারা যায়। বিপর্যয় ও আনন্দকর্তার ক্ষেত্রেই ইচ্ছার একতা এবং ভাবের মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি হইয়া উঠে। এই ভাবের বিশ্ব-মানবতার সিদ্ধা পূর্বাধসিত হইয়াছে— তাই পরামিত পক্ষের প্রতি সমগ্র প্রান্ত জাতির বিনীত সম্ভাবনার। Apsarov কণিয়ার গল্পী জীবনের আদর্শ লক্ষ্যে বলিতেছেন—

"The principle of the Russian Village commune could be extended indefinitely—nationally and internationally—and, that accomplished, the reign of universal peace would ensue." যথেষ্ট Tolstoi-এর ও এই সর্বজনীন ভাব বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে জীবনকে আনন্দভাষা করিয়া দিয়াছে। সামগ্রিক পল্লীর আদর্শ কিরূপ ভাবে বিশ্বের এই বিরাট

লক্ষ্যের লক্ষ্যপিত হইতে পারে তাহাই বর্তমান জাগ্রত কণিয়ার কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে। সকলেরই মূখে এই বিশ্ব চিন্তার সুর ধনিত হইতেছে এবং স্রাভগণই যে তাহার অগ্নুত! ইচ্ছাই বর্তমান কণিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কোন-রূপ স্বার্থপরতা ও সর্বাধিকতা তাগাদের এই বিশ্ব-গ্রামা আশাকে কলুষিত করে নাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সম্মেলনের সম্ভাব্যমান হইয়া স্বমগন কণিয়ার ঘোষণা করিতেছে—

"আমিই তোমাদের মিলন ক্ষেত্র—প্রাচ্যের ধর্ম এবং প্রতীচ্যের বিজ্ঞানকে মানব জীবনে সংস্থাপিত করিবার জন্য আমার নব অভ্যুত্থান, এই বিশ্ব আমিই পবিত্র ভ্রাতৃত্বে এক করিব। কোনরূপ মলিনতা বা সর্বাধিকতা আমার জীবন এবং নীতিকে আশ্রয় করিবে না।"

শ্রীঅকিকন দাস।

## রুরোপ ভূখণ্ডের দু একজন ধনকুবের

রুরোপে সম্ভ্রুতি যে কাল সময় বেধেছে, তাহাতে অনেকের মত কত অর্থ যে নিত্য ব্যয়িত হইতেছে কল্পনা করিয়া উঠাই দুষ্কর। বড় গোছের একটি মাত্র গোলা ছড়িতেই হাজার হাজার টাকার টান পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও দিনের পর দিন বুদ্ধিয়ারার স্রাব কখন কখন এইরূপ সব গোলা ছোড়াছড়ি চলে। একখানি বড়দের জাহাজ নিখোঁপে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যায় এবং এক-দিনের মধ্যেই তাহা হয় ত অলসমাধি পায়। নানাক্রম অকৃত পক্ষিসম্মল বৈজ্ঞানিক অথ

পত্র ও যন্ত্রাতির নিখোঁপ ও ব্যবহারে এবং লাখ লাখ দৈন্তের ভরণপোষণ ও শুদ্ধিয়ার এত অর্থের প্রয়োজন হয় যে কমলার রূপাবলিত ঐশ্বর্যাবিহীন কোন জাতিই আজকালকার দিনে ঐকরূপভাবে বর্ধিব্যবহার পরিচয় দিতে সমর্থ নহে।

কমলার রূপাদৃষ্টি আজকাল প্রতীচ্যভূমির উপর নিপতিত। প্রতীচ্যভূমি তাই আজ ঐশ্বর্যবোধে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। বর্তমান-কালের ধনকুবেরগণেরও তাই উহা বিশেষরূপ লীলাক্ষেত্র। রূবের যে কমলার অলঙ্কার;

সম্পূর্ণতার সময় উত্তার নিখিৎক কৃষকের  
পূরাও করিতে হয়।

কৃষকের যক্ষণের অধিপতি। যক্ষণ  
সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এষ্ট, ইহারা শুধু  
নিখিৎকা করিবারই বেড়ান, বাঘের নাম নাই।  
কৃষকের তুলনা দিতে হলে লোকে বলে,  
“যেন যক্ষের স্ত্রীর ঘন আঁকড়িমা পড়িয়া  
আছে।” সংসারেও কেবা দাশ, বায়কুঠমণই  
সাধারণতঃ ঘনসঙ্কেত সমর্থ এবং সমাধে ছোট  
খাট কৃষকের রূপে পরিচিত হন।

যক্ষমাত্রই যে কৃষকের শিরোমণি তাহা  
নহে। যক্ষের ঘন শেষে কোন কোন লোক  
কখন কখন কেঁপে উঠেছে, কিম্বন্তি একথাও  
সময় সময় রটনা করে। ভগ্নবস্তীর দশা হলে  
যক্ষরাশিও মুক্তহস্ত হন। কমলার কৃপা না  
হলে উত্তার নিখিৎক করিবেন কি? কাহার ঘন কাঠকে দিঘেন? কমলার কৃপা  
লাভই যে মূল।

ভারতের উপর যখন কমলার কৃপা ছিল,  
ভারতের ঐশ্বর্যও তখন অসংখ্যসীম বিস্তার  
উৎপাদন করিত। লোকে তখন বলাবলি  
করিত ভারতের পথঘাট গোবা ঘিয়া বাঁধান,  
ভারতের গাছে মধু (ইক্ষু) ও পণ্য (কার্পাস)  
অল্পে, গাছের উপর পেয়লা ভরা কুটি ও  
সরবৎ সাধান আছে (নারিকেল) ইক্ষু  
হলেই পেড়ে ধাত। ভারতে আসিবার  
একটা সোণা রাত্তা বাহির করা, মস্তুর সাধন  
বা শরীর পাতনের উপযোগী একটা মহৎকার্য্য  
বিবেচিত হইত এবং এইরূপ চেষ্টাকালে  
আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার চরে গেল  
এবং এখনও উত্তার এক নাম West Indies  
বা প্রতীচ্য ভারত। আমাদের দেশের উপর  
যখন কমলার কৃপা ছিল তখন দু হাতে টাকা  
ছড়িয়েও লোকে গরিব হ’ত না। বগীরা

এসে ভগ্নশেঠের দু কোটি টাকা লুটে লয়ে  
গেলেন, মূলগমন ঐতিহাসিক লিখেছিলেন  
উত্তারা এসে শেঠেরের শুধু দুই খাটি খাস  
ছিঁড়ে লয়ে গেছে। আমাদের এখন “শে  
নগন কথা শুধু আছে মনে।” কোটিপতির  
দৃষ্টান্ত দিতে হ’লে আনাদিগকে আজকাল  
প্রতীচ্য ভূষণে সন্ধান লটতে হটবে।

উল্টে লোক রচয়িতা রহস্য করে বলেন,  
“কৃষকের তুল্য আর দাতা কে?” নিজ মনের  
অন্ত প্রায় কিছুই ব্যর্থ না করে যথাসমর্থ  
অপরের ভোগের জন্য যিনি বেবে যান, তিনি  
যদি দাতা না হন তবে দাতা কে? দাতারাই  
বরং কৃষক, কারণ উত্তারা ইচ্ছায় হাতের  
স্বপ্টা করে লয়ে, অস্বাস্থ্যের কোটিপতি হয়ে,  
পূর্ণরূপের দানটা স্বয়ং সমেত আদায় করে  
লন।

কবির দৃষ্টিতে এইরূপ দাতা সাব্যস্ত হলেও,  
সাধারণ লোকে কিন্তু স্বতঃনি কাঠকেও  
স্বচ্ছায় কিছু দান করিতে না বেগে স্বতঃনি  
তাহাকে কৃপণ বলিতে ছাড়ে না। কোন  
কোন দাত্তশ্রেষ্ঠেরও এই অস্ত্র জীবনব্যয়ানের  
পূর্বে কৃপণ অপব্যয়টা ঘুচে না। লোকে  
পেবে দেখিয়া অস্তিত হয়, বাহ্যিক কৃপণজ্ঞানে  
একদিন উপেক্ষা করা হতেছিল তিনি  
বাস্তবিক একজন বিলাসবিহীন ত্যাগীর  
শিরোমণি, দৃঢ়লংকায় অসাধারণ পুংকব।

কশিয়ার “সলোদোনীকভ্” (M. Solodovnikov) এইরূপ একজন অসাধারণ কৃপণ।  
দোস্তলা একটা জীর্ণ ঘরে ভাড়া ছুটা আসবাব  
পাত্রের মাঝে দাতা জীবনটা কাটিয়ে যেন।  
লোকের সঙ্গে বড় মিশিতেন না। মাঝে  
পাশে বেড়াতে-গিয়া দুরোপের অস্ত্র রান্না  
ঘরে এসে একখানি খবরের কাগজ বাহির  
করিতে সাধ হয়ে ছিল। “কশিয়ার সচিব

গেজেট" পত্রখানির সন্ধানকারী হইবেন, একজন বা কিছু প্রয়োজন, সম্পাদক লেখকসুল প্রভৃতিকে লজা লিখা এবং অস্বস্তি আয়োজন সব ঠিকঠাক, কিন্তু টাকার মারার শেষে আশপাটা কেঁদে উঠল, কথেক সংস্র মুখা হাত-ছাড়া করিতে কিছুতেই আর প্রবৃত্তি হল না, উহার তুলনার সববেগ কাগজ বাহির করার বাগনাটা সংঘত করা সহজ বোণ হল। লোকে রূপণ বলে নিশ্চা করিত, ইনি সে সব গায়ে মাখিতেন না। বুদ্ধ বয়সে, সমাপ্ত বুদ্ধবাক্যবদের নিকট গল্প করিয়া গল্প অহুতব করিতেন, তাঁহার স্ত্রাঘ চীন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার ঐ ভাষা ঘরে ছেঁড়া বিছনার উপরে বেশের কত গণ্যাস্ত্র লোক এসে বলিতেন।

লোকে জানিত, বুদ্ধার মত রূপণ বেশে দুটি নাই, বুদ্ধা যেন ঘণ্ডের স্ত্রাঘ ধন আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে, ব্যা করাত ঘুরের কথা ব্যয়ের স্বপ্নও বৃষ্টি সে কোন দিন বেধে নাই। বুদ্ধার পর উইল খুলে দেখা গেল, ধনকুবেরের সম্পত্তির পরিমাণ ছয় কোটি টাকার ত কম নহেই বরং পনের কোটির কাছাকাছি হইতে পারে। এই বিপুল সম্পত্তির গ্রাঘ সমস্তই ইনি বেশের কাছে দান করিয়া গিয়াছেন। ঘেঁচে থেকে লোকের কাছে প্রাশনা হুড়ান যেন একটা জুছাতজুছা দ্বাণ্য ব্যাপার বলে সকলের নিশা সধে, মারিবার সময় নিজের ধানের বহরটা সকলকে দেখিয়ে গেলেন। এক সঙ্গে বিপুল অর্থ না জুটিলে অনেক বড় বড় কার্য অহুত্বিত হয় না এবং সেজন্য ভাবে দানের বাগনা থাকিলে জীবনব্যাপী নীরব সাধনাকলে প্রথমে বিপুল সফরের প্রয়োজন এবং উহা করিতে হইলে আবার অল্প জন-সাধারণের নিকট অনেক সময় উপেক্ষা ও

অবজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয় কিন্তু প্রকৃত দানবীরের হৃদয় তাগাতে স্তুতিত হয় না। আশ্চর্যজন গণকেও ইনি একেবারে বঞ্চিত করিয়া যান নাই কিন্তু তাহাদের জন্য চার পাচ লাখ টাকা মাত্র রেখে গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট বিপুল সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মনোমত ভাবে জীবিতকাল বিস্তার জন্য, এক তৃতীয়াংশ, গৃহস্থান ভ্রমকাঁচী সম্প্রদায়ের জন্য হুলত ও আদর্শ বাসগৃহসমূহ নিশ্চাবার্থ এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ, শ্রম বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠার্থ পকারত বা মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের হস্তে প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন।

এক বৃহৎ হুটি ফুল ছুটার মত এই সমগ্র জন দেশের মধ্যে নগরে আর একজন কোটিপতি বিদায় করিতেন। ইহার নাম "কে. টি. সল্ডাটেনকোফ" (K. T. Soldatenkoft). ইনি পূর্বেবর্ণিত কোটিপতির প্রতিবাণী এবং ব্যবসায়েরও অংশীদার ছিলেন। দৈবক্রমে গ্রাঘ একই দিনে ইহারও দেহান্তর ঘটে। ইহার ছয় জনে কিছু পরস্পর বিপরীত প্রকৃতির পুত্র ছিলেন। আলো ও ছায়ায় সমভাবে চৈত্রোৎকর্ষ সাধনের স্ত্রাঘ ইহাদের দুইজনকে লাভ করিয়া কণিয়ার গৌরব বাড়িয়াছিল। এই শেষোক্ত কোটিপতি, এককালে বিপুল অর্থদানের অহুতোধে জীবনে কার্ণণ্যবৃত্তি বরণ করে না লয়ে, উপাঞ্জিত অর্থ জীবনকালেই সৎকার্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করে হাতের মুখটা করিয়া লইয়াছিলেন এবং সকলের মন কাড়িয়া লইয়া নগরের সকলশ্রেষ্ঠ পুরুষতপে পূজালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কণিয়ার উত্তর পাশ্চমে স্মেমের সন্নিহিতে নরওয়ে ও হইতেন বেশ। ছুটির মিলিত নাম কামিনোভিয়া। কন ও কামিনোভিয়া

শব্দস্বরের সাদৃশ্য দেখে কেত কেত অল্পমান করেন। আমাদের দেশে সেনাপতি জন্ম বা কাকিত্বের অল্পরপণের অল্পরপণ কহিতে করিতে হঠাৎ এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারই নাম হইতে দেশের নাম জাম্বিনো-ডিয়া পাড়াইয়াছে। ভগবান কাকিত্বের দেবের প্রসাধেই হটক বা অল্পরপণ হইতে অবতীর্ণ বলেই হটক জাম্বিনোবিরপণ এক সময়ে নোখো বীধো ও নৈহিক সৌন্দর্যো ছুরোপের মধ্যে স্রোতাসন অধিকার করিতেন। আধুনিক ঔরোগ্য জাৰ্ণাণ প্রকৃতি জাতির মধ্যে ইহাদেরই পূর্ণপুরুষগণের শোণিত প্রবাহিত আজকাল জাম্বিনোভিয়ার আর সে প্রতিপত্তি নাই, তথাপি এই দেশেরই এক মহাপুরুষ ডিনা-মাইট নামক ভীষণ পরাধীন আবিষ্কার করিয়া বর্তমান যুগের রপনীতিতে ও জীবন বাজায় যুগান্তর ঘটাইয়া বসিয়াছেন। পাগড় কাটান, ঘর উড়ান, বাহাজ ভূবান প্রকৃতি ভীমবলনাথ কণ্ডলা, ডিনামাইটের বলে আজকাল নিত্যস্ত সহজসাধ্য ব্যাপার হইয়া পাড়াইয়াছে। জাম্বিনোভিয়ার এই স্বনামধন্য পুরুষের নাম "আলফ্রেড নোবেল।" ডিনামাইটের ব্যবসারে ইনি অতুল ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু শুধু সেই কারণেই তিনি আজ ভগৎ প্রসিদ্ধ নহেন, আজ একটি কার্যের জন্য ইনি জগতের সকলের নিকট সম্মানিত। নিজের আবিষ্কৃত ডিনামাইট বিক্রয় করিয়া ইনি যে বিপুল বিস্তার অধীশ্বর হন, যত্নাকালে সে সমস্তই জগৎপীর চিত্তার্থ দান করিয়া দান। এই দানের পরিমাণ তিন কোটি টাকা। এই অর্থ হইতে প্রতি বৎসর পাঁচটি করিয়া পুরস্কার প্রদত্ত হয়; প্রতি পুরস্কারের পরিমাণ এক লক্ষ হুড়ি হাজার টাকা। ( ক ) পরার্থ বিজ্ঞা, ( খ ) রসায়ন শাস্ত্র, ( গ ) দেহতত্ত্ব ও

চিকিৎসা শাস্ত্র এই সব বিষয়ে নূতন নূতন আবিষ্কার; ( ঘ ) জীবনে আদর্শ প্রচার সমর্থ সাহিত্য রচনা; এবং ( ঙ ) শান্তি সমিতি-সমূহের সংগঠন, শৈল্প পোষণ সমস্ত। হইতে রাজ্যসমূহের উদ্ধার সাধনের সতপাথ নির্ধারণ প্রকৃতি উপায়ে জগতে মৈত্রী তাবের প্রতিষ্ঠা; এই পাঁচটি বিভাগে জগতের উন্নতি সাধনে প্রতি বৎসর ইহারা সর্বাধিক অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, জাতি-বর্ণ-নির্জিনেবে তাঁহারা ঐ পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইবেন। ভারতবাসী আজ হীনমশাগ্রস্ত বলে জগতের সর্বত্র অনাদৃত কিন্তু ভারতবাসী হলেও আমাদের রাজকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার জন্য নোবেল-পুরস্কার-সমিতি হইতে পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে এইতরূপে "বহু-ধৈব কুটুংকম্" নীতির অল্পরপণ ও বিশ্ব-প্রেমের পরিচয় দান জগতে দুর্লভ এবং ইহা নিশ্চিতই দাতার উন্নত ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক।

ছুরোপের মধ্যে কিছুকাল পূর্বে অবধি জাৰ্ণাণীরা-বু নাম ডাক ছিল। জাৰ্ণাণীর নকল নীল, মেগেটীর রঙ; পরিমাণে অধিক, মিষ্টতার অল্প, বিটপালকের চিনি; আখের চিনি অপেক্ষা তিন চারি শত গুণ মিষ্ট, এক চামচ মাত্র চিনিতে বৃহৎ এক জালা জল মিষ্ট করিতে সমর্থ, "জাকারিং" বা আলকাত-রায় চিনি; শস্তার পশমী আলোয়ন ও অল্প নানাতর, পিন্ন, ঔষধ ও অন্ত্যস্ত আবস্ত-কীর ত্রয় প্রকৃতি জগতের সর্বত্র জাৰ্ণাণীর প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়াইতেছিল। পিন্ন বাগিষা জাৰ্ণাণী ক্রমশঃ ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছিলেন। বিদ্যা চর্চ্চায়ও জাৰ্ণাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হুর্পট।



শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে জাৰ্মানীর উন্নতির মূল,—জাৰ্মানীর জড় বিজ্ঞানচর্চা। জাৰ্মানীতে যেমন সংস্কৃত চর্চা হয়, ভারতের বাতীরে আর কোন দেশে তেমন হয় না। ভারতীয় বিদ্যাবী এতপানে বিদ্যাবান্ধব অল্প অনেক দেশের চেয়ে অল্প অববিধা ভোগ করিতেম।

জাৰ্মানীর উন্নতি ও প্রতিপত্তি এইতপ দিন দিন বাড়িতেছিল কিন্তু সম্প্রতি যতি সাহসযশে জাৰ্মানী যে জীবন সুকক্ৰম ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, উহার পরিণামে তাঁহার যে কি দশা হইবে তাহা এখন ভগবীশ্বরের ও যুরোপের তিনটি জেষ্ঠ শক্তির কৰণার উপর নির্ভর করিতেছে।

যাহা হউক শতবর্ষ পূর্বে জাৰ্মানীর এ সমৃদ্ধির দশা ছিল না। জাৰ্মান সাম্রাজ্যোন্নতি তখন সূত্রি হয় নাই, পুষ্টি তব্বের কথা। ক্রাশী-শরাদ্ধি নেগোলিয়ন বোনাগাটি'র হস্তে জাৰ্মানী তখন নিত্য পরাজিত ও লাহিত। এই শতবর্ষ কাল মধ্যেই জাৰ্মানীর কি অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে এবং কি অতিক্রমীয় উপায়ে জাৰ্মানী উহা পুনরায় হারাইতে বসিয়াছে। জাৰ্মানী আজ ইংলণ্ডের ন্যায় শক্তিশালী উখিত হইতে সাহসী কিন্তু এক বিশালাবে ইংলণ্ডের কৰণাই যে বহু পরিমাণে জাৰ্মানীর বর্তমান ভাগ্যোন্নতির মূল অতিগর্বে জাৰ্মানী আজ সে কথা ভাবিয়া বেধিতেছে না।

ইংলণ্ডের শেক্সপীয়ার সফর উৎসব লৌহ শিল্প জন্ত বহুদিন হইতে জগতে প্রসিদ্ধ। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ক্রুজেরিক ক্রপ্প নামক জনৈক জাৰ্মানীর স্থানে লৌহের ব্যবসায়ে এই শেক্সপীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার বাসনা জাগিল। সহজেই যদি সকলের

পুস্তককার সকল হইত তবে আর ভাবনা কি ছিল? চারিবর্ষ পরে ক্রপ্প সাহেব হিসাব খতাইয়া দেখিলেন, লৌহ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থোন্নতি সাধনের পরিবর্তে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য ও শক্তিত অর্ধ হারাইতে বসিয়াছেন। ব্যয় সংকোচের জন্ত সপরিবারে তিনি একটি একতল কুঠীরে উঠিয়া আসিলেন কিন্তু নানা বিষয়ে দাবধানতা ও নিতবাগিতা স্বেচ্ছা বিশেষকিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নূতন গৃহে উঠিয়া আসিবার চারিবর্ষ পরেই একদিন চতুর্দশবর্ষ বয়স্ক পুত্র আলফ্রেড ক্রপ্পের ক্ষেপে সংসারের গুরুতার চাপাইয়া এবং জননী ও ছোট ভাই তলিকে ধোঁষাতে বলিয়া তিনি অগ্নিম পথ্যায় উহাদের নিকট বিবাহ গ্রহণ করিলেন। সম্প্রতি মধ্যে মৃত্র একটি কান্ধা-বানী ও চারিজন মাত্র কারিকর।

আলফ্রেড ক্রপ্পের জননী একজন অসামান্য রমণী ছিলেন। ইহারই গুণে নাবালক পুত্র মাহুদ হইতে পেরেছিল। বিবাহ করিলে পাছে মাতার সহিত বিছিন্ন হইতে হয় এই ভয়ে আলফ্রেড ক্রপ্প, মাতা বতরিনী দীর্ঘকাল ছিলেন, বিবাহ করেন নাই। মায়ে গোয়ে মিলিয়া ২৬ বৎসর কাৰণনাটি চালাইয়াছিলেন। প্রধানতঃ জননীর আশীর্বাদ ও প্রসাদেই পুত্রের নাম আজ লগাধিয়াত। জননীর আশীর্বাদ ও প্রসাদ থাকিলে আলফ্রেড ক্রপ্পের জায় বহু পুত্রের নাম আজও লগাধিয়াত হয়।

ইংলণ্ডের সাহস প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে গিয়া পিতা ক্রুজেরিক ক্রপ্প বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। বিচিত্র এই, ঐ ইংলান্ড শিল্পীর ক্রপ্পেই পুত্র আলফ্রেড ক্রপ্প অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ পাইলেন।

আলফ্রেড্‌ ক্রপ্প, চামচের উপর তপার গিন্ট লাগাইবার এক পেটেন্ট বাহির করেন; ইংরাজ ব্যবসায়ীর নিকট উহা বিক্রয় করিয়াই তিনি উহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলেন। ইহাই হইল উন্নতির সূত্রপাত। ইংরাজ ব্যবসায়ীর আশ্রয়ে এনে আমাদেব দেশের অনেক ব্যবসায়ীরও এইরূপ অত্যাশ্রয় ঘটেছে। চামচ গিন্ট করিবার পেটেন্ট বেচিয়া যে অর্থলাভ হইল, লোহার কারখানাটির উন্নতি সাধন জন্য তাহা ব্যয়িত হইল।

কিছুকাল পরে রেলপাড়ীর লম্বা উন্নত প্রণালীতে উৎকৃষ্ট ঢাকা নিখাণের কোশল আবিষ্কার করিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রস্তুত ধন্যশালী হইয়া উঠিলেন। নানাদিকে যেমন আর বাড়িতে লাগিল লোহার কারখানাটিরও তেমনই উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন জন্য গ্রাণ চালিয়া দিলেন। উৎকৃষ্ট ইল্পাত সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল; ক্রমে তিনি কামান ঢালাই করিতে মন দিলেন। এই কার্ণো প্রবৃত্ত চইয়া প্রথম করেক বৎসর জাৰ্মান গবৰ্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণে বা সহায়তা লাভে সৰ্ব্ব্ব হইলেন না। এই সময়ে ফ্রান্স দেশের প্যারিস সহরে একটা প্রদৰ্শনী বসিয়াছিল। নানাদেশ হইতে নানালোক ভাঙতে নানা জিনিষ পাঠাইয়াছিলেন। আলফ্রেড্‌ ক্রপ্পও তাঁহার নবাবিষ্কৃত কামানের চ একটি নমুনা উহাতে পাঠাইয়া দেন। আর একটু হইলেই জাৰ্মানীর সৌভাগ্যলক্ষী অন্তের মধ্যে চলে বাড়িলেন কিন্তু জাৰ্মানীরই আর একটু হুলস্থানের গুণে উহা ঘটিতে পাইল না। অনেকটী লক্ষ্য করিয়াছিল সাধারণ প্রযুক্তীবিদ্যার স্তর কর্কশ ও বৃহৎ করতল বিশিষ্ট যে একজন বিদেশী লোক

প্রদৰ্শনী ক্ষেত্রে কত মনোমুগ্ধকর ভাল ভাল জিনিষ থাকিলেও, কোন এক অজানা কারিকরের অজানা কারখানা হইতে প্রেরিত কতকগুলি নূতন কামানের নমুনা, দিনরাত নিবিটচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করছে। বলায়ত্ত সৌভাগ্য দৃষ্ট করানো জাতি শুধন কি জানিত এই কারখানার মালিক ক্রপ্প সাহেব—যজ্ঞান্তির নিকট আগ্নেয়রূপ সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়ে তাহারই দ্বারে তিক্ষাধীর ভাবে সমাগত—আর এই চাবাড়ে লোকটী জাৰ্মানীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা বিশ্ববিখ্যাত বিস্ময়ক।

দেশে আসিয়াই বিস্ময়ক কারখানার মালিকের খোঁজ লইলেন। তাহারই প্রবলে গবৰ্ণমেণ্টের সাহিত যোগাযোগ হইয়া গেল। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে প্রদৰ্শনায় গবৰ্ণমেণ্টের লম্বা ৩০০ কামান প্রস্তুত করিয়া দিবার আদেশ আসিল। ১৮৬৬ সালে অগ্নিয়ার সহিত জাৰ্মানীর যুদ্ধ বাধিল। প্রাচীন যুরোপস্থির জাপদরূপ তুর্কগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া অগ্নি দ্বা বহুকাল হইতে যুরোপের একটি প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু ক্রপ্প কারখানার নবাবিষ্কৃত কামানের জোরে অতি সহজেই পরাজিত হইল। তাগা এইরূপ নিমিত্ত পারদর্শনশীল; তুর্কবিধ্বস্তি রূপগণও এই সে দিন ক্ষুত্র জাপানের হস্তে কত না লাহিত হইল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে প্রদৰ্শনা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ফরাশিগণ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময়ে জাৰ্মানগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়াছে, হতভায় এবারও বিধ্বল্যস্ত জীব ও অতি সহজ জ্ঞান করিয়া যোগ্যসাধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। যুদ্ধকালে কিন্তু সৌভাগ্যগর্ভিত ফরাশিগণ বিধ্বস্ত হইয়া বেথিল তাহাদের বাছা বাছা কামানের গোলা অনেক ভেটায়ও হুত্রে

আর্থানু ব্যাটারিগুলোকে স্পর্শ করিতেও সকল সময় সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু জাখান কামান-নমুণ হইতে নিষ্কাশ পোলা অনাবাদে ফরাশি ব্যাটারি অতিক্রম করিয়া যাউতেছে। এই যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী ফ্রান্স গবর্ণমেন্ট ক্রাশের নিকট হইতে যুদ্ধের ধরচাবন্ধন তিন পত কোটি টাকা আদায় করে ছাড়েন। সকলে ভেবেছিল এত টাকা দিবে ফরাসিকে আর মাথা তুলিতে চবে না, কিন্তু ফরাসিও সামান্য জাতি নহে। ইহারই মধ্যে এট ভীষণ কণ্ডার কাটিয়ে উঠে সকলকে চমৎকৃত করে দিবেছে।

ফরাসি এখন ঠেকিয়া শিবিয়াছেন। ইউরোপের বর্তমান কৃৎক্ষের সময়ে, তাঁহার আর সেই ক্রাফোফ্রিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের জায় সৌভাগ্যপূর্ণিত বলদ্বন্দ্ব ভাব নাই। তিনি এখন পুনরায় বিজয়লক্ষীর বিভাগভাজন না হইবার জন্য প্রথম হইতে সাবধান। ক্রপকামানও এবার পূর্বের জায় অস্ত্রের তুলনায় সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয় নাই। ফলতঃ এই যুদ্ধে ইহারই মধ্যে ফরাসি এবং ফ্রান্স উভয়েই তাঁহাদের স্মরণ প্রতিপত্তি বহু পরিমাণে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। তুর্কি এখন অস্ত্র-হারা বন্ধু এবং অস্ত্র-হারা তাঁহার পূর্বকালই ছিলিত। গোড়ায় যে বৃষ্টিপ নিংহের প্রসাবে পুঠি হইয়া আর্দ্রানির ক্রপকারখানা মাথা তুলিয়া পাড়াইতে পারিয়াছিল, আজ আবার সেই বৃষ্টিপনিংহের কোশানলে পড়িয়া আর্দ্রানির গিন্ন বাগিয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে।

তথাপি ক্রপের কারখানা এখনও জগদ্বিখ্যাত। ইহার জন্য একাধিক নৌহ বনি এবং তিন তিনটা বড় বড় কয়লার খনি ইংলিসকে কিনিয়া লইতে হইয়াছে।

কয়লার সবট, সারা বৎসর প্রত্যহ প্রতি মিনিটে ৪ টন বা একশ মনবৎ অধিক। কারিকরের সংখ্যা ৪৫০০০ ছুটরশ হাজার। বহুলাংখ্যক শ্রমীর, প্রাকৃতিক তত্ত্ব বা ভাষাজ মেরামতি কারখানা, কামান পরীক্ষা ওস্ত্র হুত্বৎ তাঁহানির ক্ষেত্র প্রকৃতিরও ইহার মালিক। অথচ এমন রাজ্যটি নাই, যেখানে ক্রপের কামান সম্রাটের সন্নিহিত ব্যবহৃত হয় না। এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার কামান কারখানাতে চালাই হইতেছে। ইন্কম্ ট্যাক্সের পরিমাণ হইতে জানা যায়, কারখানার বর্তমান বার্ষিক আর প্রায় পনের কোটি টাকা। কারখানাটিকে একটি ছোটখাট রাজ্য বলিলেই হয়। চতুর্দশ বিভাগে ইহা বিভক্ত। প্রতি বিভাগে এক একজন কর্তা, সকলের উপর চেয়ারম্যান। ক্রপ বাণের যিনি উত্তরাধিকারী তিনিই অল্প সকলের মালিক। শীড়িতের কণ্ড, শেন্‌শন ফণ্ড, জীবন বীমার কণ্ড, সেভিস ব্যাঙ্ক প্রকৃতি আপৎকালে সাহায্য প্রাপ্তির নানা ব্যবস্থা ও সন্নিহিত আছে। কারিকরদের জন্য আদর্শ বাসগৃহ-বনি, হাসপাতাল, স্নানাগার, বিদ্যালয়, লাইব্রেরি প্রকৃতি নানা অস্থান আছে। এই সব বিষয়ের জন্য কারখানার আর হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়।

এতবড় কারখানার মধ্যে ক্রান্তরিক ক্রপের ক্ষুদ্র কুটিরখানি আরও বিখ্যাত। পূর্ব-পুরুষের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নরূপে ক্রপবংশীয়গণ ইহার কোন পরিবর্তন করেন নাই, যেমন ছিল সেই ভাবেই রাখিয়া রাখাছেন।

“যতদিন ক্রপের কারখানা থাকিবে ততদিন ক্রপবংশীয়গণ এই কুটির খানি দেখিলে, দুইদিনে কখন অবসর বা যুদ্ধের দিনে অস্ত্রায়ে আত্মহারা হইবেন না অথবা ক্ষতকে কখন

ভুক্ত জ্ঞান করিবে না।" পিতৃবংশল পুত্র আলঙ্কৃত রূপের ইচ্ছার ও আশেপাশে উক্ত লিপি দ্বন্দ্বের ধারণ করিয়া, চারিদিকে নানা ঐশ্বর্য্য বিকাশের মধ্যে কুটির বান এখনও পূজ্যবস্তুতেই বসতিমান আছে।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে আলঙ্কৃত রূপের দেহান্তর ঘটে; অল্পদিন হইল টহার পুত্রও ইহদাম ত্যাগ করিয়াছেন। রূপের কারখানা কিন্তু এখনও বিজ্ঞমান এবং বর্তমান রূপবাসীরও ইউরোপের একজন প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী বনস্বরের রূপে সজ্জিত।

লোহার কারখানা হইতে রূপসাহেবের নাম। লোহার কারবার করে আর একজন বনস্বরেরও দাত্তশ্রেষ্ঠরূপে আজ ভগ্নে পুজিত। আগুকার্ণেজির ভগ্ন ঘটলাও, দারিত্র্যের তাকনাহ আটলান্তিক পার হয়ে গিয়ে আমেরিকার আর্থ লন। আমেরিকার সবই বেন অবিস্মৃত ব্যাপার; তথায় এক লোহার কারবারে চুকে আগুকার্ণেজি ক্রমে টহার অংশীদার হন এবং শেষ জীবনে নিজ অংশ বিক্রয় করে বন চলে এলেন তখন টহার প্রাণ্য আশের পরিমাণ নির্ভরিত হল পটাস্তর কোটি টাকা। এই অগাধ সম্পত্তি লয়ে কার্ণেজি করিলেন কি? সংস্কার্য্য করিতে বাহ্যের মন আছে কিন্তু শক্তি নাই, সমুদ্র ভগ্নের এই জেষ্ঠীর লোককে টহার ঐ উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের স্বল্প নিয়ন্ত্রণ করিলেন। বাহ্যের প্রকৃত নিকার করী, টহার বাহ্যের হাত দিয়াই খরচ হউক না, আপনাদের মনোমত কার্য্যে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে দেখিলেই, নিম্নের চাতে ব্যয় করিবার মত স্থান পান। আগুকার্ণেজিও তাই অর্থ পাইলে কে কিতাবে উঠা ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন সে সম্বন্ধে জনদ্বাদীর সত্যমত

জানিতে চাহিলেন এবং এইরূপে প্রকারান্তরে ভগ্নের বাবতীর মহাপুত্রবর্ণকে তাঁহার অজ্ঞিত অর্থের আশী করিতে চাহিলেন। এইরূপে পরামর্শদানের দক্ষিণা দিবারও বাবদ্য হয়ে ছিল। অনেক দিন পূর্বে এক-খানা কাগজে দেখেছিলাম কোন পরামর্শ গ্রহণীয় বোধ হলে ঐ পরামর্শ দানের মূল্য স্বতন্ত্র কোন কোন পরামর্শ লাভা এক গিনি অধিক দক্ষিণা লাভ করেছিলেন। গৃহীত পরামর্শগুলির মধ্যে একটি প্রজ্ঞাব বুড়ার খুব মনোমত হয়েছে বলে বোধ হয়। নানা-দেশে পুত্রকাগারের প্রতিষ্ঠা করে তিনি টহারই মধ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে-ছেন।

এই সমস্ত দানবীর বনস্বরের ভগ্নের অলঙ্কার, যা লক্ষীর নিধিরক্ষকের উপযুক্ত অলঙ্কার। আমাদের দরিদ্র দেশে এইরূপ অগাধ সম্পত্তি সমুদ্রের অর্থের ও বাহ বেন বহু কথা বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত শক্তি যেখানে ক্ষুত্র, বহুজনের শক্তি সম্মিলন সেই ক্ষুত্রতা পরিহারের একটা উপায়। তা ছাড়া দারিত্র্যের ক্ষুত্র দানও মূল্যহীন নহে; ব্যক্তি-গত মহত্বের অভাব হলে, শুধু শক্তি সম্মিলন করিবে কি? দারিত্র্যের আর্থত্যাগ, ভগ্নের স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র স্থান স্বল্প আত্মোৎসর্গ প্রভৃতির ফল বসন্ত অকিঞ্চনকর হউক, তাবগ্রাহী জনাধনের নিকট সেগুলি নিশ্চিতই উপেক্ষিত হবে না। অনেক সময় বড়র চেয়ে ছোট কাজগুলোই কঠিনতর। বহু-লোকের চিত্তার্থ-প্রাপ্তত্যাগ, আর সর্প, কপোত, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ক্ষুত্র প্রাণীর প্রাণ রক্ষার্থ জীবন্তবাহন, শিবি, বৃক্ষের প্রভৃতি মহাপুত্রবর্ণের নিজ বেহায়ে উত্তম হওয়া কোনটা কঠিনতর? কলতঃ শক্তি অধিক

হটক বা অন্ন হটক, কণ্ঠ সৰল হটক বা চাই নয়া, চাই জনগণের মনঃ এই গুলিই বিকল হটক বাণ আলো না; চাই প্রেম, মূল।

ক্রীতারকনাথ মুনোপাধ্যায়

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ

যত দিন ধাইতেছে বঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ তত বাড়িয়া ধাইতেছে। যিনের পর দিন, গ্রামের পর গ্রাম হইতে বঙ্গালার সরস্বতীর ভাড়ায়ে নতন নতন গ্রন্থের নাম, নতন নতন প্রাচীন কবির পরিচয় আসিয়া অমিতেছে। মূল সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি চট হাজারের অধিক সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার বঙ্গপুর শাখার পুঁথিশালায় ঐতন তিনশ পুঁথি অমিয়াছে, দৌহাণীতে আশাম পতমেন্ট গ্রাম আড়াইশ আশামী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। কালুনা শাখাতেও সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কেবল যে সাহিত্য-পরিষদের মূল ও শাখার প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহা নহে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদেও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের চৌহাষ প্রায় তিনশত বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সমস্তগণের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ করিতেছেন। চট্টগ্রামের মুনসী আবদুল করিম সাহেব নিজের বাড়ীতে হাজারের অধিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। সিউড়ির শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ও নিজের রতন লাইব্রেরীতে হাজার খানেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। যালদহে পণ্ডিত

রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় ও কলিঘামের শ্রীযুক্ত চরিত্রাশ পালিত মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ-রিসার্চ-হাউসে শ্রীযুক্ত কেশর নাথ মহাশয়ের মহাশয় তিনশত পুঁথি জমা হইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয়-নাথ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বেকশ অসংখ্য সংগ্রহ আছে, এমন আর কোথাও নাই। শ্রীমান নলিনী রতন পণ্ডিত যখন বাউলের ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তখন তিনি উগাহের কয়েকখানি পুঁথি পাইয়াছেন। সেগুলিও বেশ অসংখ্য পরগের। ইন্ডের ও দৌভাগ্যের কথা এই যে, এই সকল ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত। এছাড়া বিশ্বকোষ-কার্যালয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি মহাশয় যে তিন হাজারের অধিক পুঁথি জমা হইয়াছিলেন, সেগুলি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় কিনিয়া লইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের চৌহাষ বেকশ পতমেন্ট যে প্রায় পাঁচশ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি কিনিয়াছেন, সেই পুঁথি রাশি এখন বেকশ এলিয়াটিক সোসাইটির ওরি-এটাল লাইব্রেরীতে জমা আছে। এছাড়া এই রাজশাহীর বরেন্দ্র অছলদান সমিতিও যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার

মধ্যেও বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিও কিছু আছে বলিয়া ভ্রমিরা'তি। বাঙ্গালী কলেক্টর লিট্লেও কয়েক শ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আছে। এই সকল সন্ধানমিতি ও তাৎপৰ্য্যে সম্পর্কীয় লোকের সংগ্রহ বাড়তি বহুলাল হইতে এদেশের কতকগুলি রাজপরিবারের পুঁথিশালায় বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আছে,— কুচবিহার, ত্রিপুরা, বিনাঙ্গপুর, ককনগর, বর্ধমান, হেতনপুর, পাকুড়, মহিষাবল ও বেদিনী পুরের কয়েকটি রাজবাড়ীতে বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আছে বলিয়া জানি। নাটোর রাজবাড়ী ও নীপাশক্তির রাজবাড়ীতে কি আছে না আছে, তাহার কোন সংবাদ আমরা পাই নাই, এতবড় পুঁথাতন বসানার লাইব্রেরীতে কিছু না কিছু থাকাই সম্ভব।—আর এক রাজবাড়ীতে এক সময়ে অগণ্য বাঙ্গালা পুঁথি ছিল। আজ সে রাজ্যের দুর্ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে সে পুঁথিশালা যে কত রকমে লুট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া দেব করা যায় না। সেখানে যে কত পুঁথি ছিল, তাহা অসম্ভব কথা বার না কারণ যিনিই এপর্ব্বন্ত কিছু না কিছু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারই হাতে সাত হাত ঘুরিয়া সে রাজ বাড়ীর দু এক থানা পুঁথিও আসিয়া পড়িয়াছে।—এই রাজবাড়ী—বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ী। বাঙ্গালা পুঁথির এক দর—এক সংগ্রহ বোধ হয় আর কোথাও ছিল না! এতদ্বির সেওড়াহুদীর রাজবাড়ীতে যে সকল পুঁথি ছিল, আরি ত্রাঙ্গ সবাই আর শান্তিপুরবাণী ৮৮শোধানস্মন প্রাবলিকের বাড়ীতে যে সকল পুঁথি ছিল, সেগুলির অধিকাংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিবাগার আসিয়াছে।

এই সকল সংগ্রহ যেখান দূর্য্য যাব যে,

যেমন প্রাচীন পুঁথির নূতন নূতন সন্ধান পাওয়া বাইতেছে, অমনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার এমটা প্রবল চেষ্টাও হেঁপে আসিয়াছে। কেবল এই সকল স্থানেই নয়, এমন কতগুলি গ্রামে গৃহস্থের ঘরে, জমীদারের বাড়ীতে, মওলার বাড়ীতে, ভট্টাচার্য্য পরিবারের বাড়ীতে, কাশ্মীর-বৈষ্ণবের ঘরে, সংস্কৃতের ঘরে, হাড়ীচোষ চণ্ডালের ঘরে, মঠে, মন্দিরে, বৈষ্ণবের আশ্রমে, ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে, কল্যাণী ও বাউলদের ঘরে যে কত হাজার হাজার প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ এখনও অজানা পড়িয়া আছে, তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত গ্রন্থের তীক্ষ্ণমত বোঝাযব লইলে, একদিন বড় দলার বলিতে পারা যাইবে যে, বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থ সম্পদের পরিমাণ কি আর তাহা কত বিভিন্ন।

এখন এই সকল বিভিন্ন স্থানে এই যে হাজার হাজার পুঁথি অসিদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে আবার একটি পুঁথি বহুস্থানে আছে। হিসাব করিয়া সে সমস্ত বাব দিয়া বসিলেও, প্রাচীন গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প হইবে না। এই সমস্ত গ্রন্থই যে এখনও একেবারে অজানা বহিয়াছে, তাহা নহে; ইহার অনেকগুলি গ্রন্থ বর্তমান আর এক আশ্বাসানি করিয়া কতকগুলি গ্রন্থ এখানে সেখানে ছাপা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলির পরিচয় মাত্র পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গপুর শাখার পত্রিকা, অত্রান্ত সাময়িক পত্রে আর পরিষদের প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে অনেকগুলি গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের পরিচয় বাহির হইয়া গিয়াছে। নীচের বাবু ইতিহাস ও সাহিত্যপরিচয় হইতেও ছাপা-অছাপা অনেক গ্রন্থের পরিচয়

পাওয়া যায়। এই সমস্ত জানা গ্রন্থ ব্যতীত অসংখ্য পুঁথি এখনও এত বেশী আছে যে, তারাদের কেবল সংকলিত পাঠের চাপিয়া বাহির করিতেই বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে।

নান্যদ্বায়ে এই সকল পুঁথির বিবরণ প্রকাশ হওয়ার দেশের একটা বড় কাজ হইয়াছে। এই সকল পুঁথির বোঝ করা যে আবশ্যক, এই সকল পুঁথির সংগ্রহ করা যে প্রয়োজন, এতদুপাধি উদ্ধার করিয়া রাখা করিবার ব্যবস্থা যে সরকার, তাহা দেশের লোকে বেশ বুঝিয়াছে। এখন অনেকের এই কাজে লাগিয়া পিড়াছেন, তাই এত জায়েগা এত পুঁথি জমা হইতেছে। মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা এবিষয়ে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিতেছেন,—তাঁহারা এখন যে আগ্রহে ছোট পত্র আর বড় কবিতা সংগ্রহ করেন, ঠিক সেই আগ্রহেই প্রাচীন পুঁথির বা প্রাচীন কবির বিবরণ পাইলে লুকিয়া লয়েন। এখন এমন একখানা মাসিক পত্রের নাম যোগ হয় করা যায় না, যাহাতে দু-একখানা প্রাচীন পুঁথির কথা, দু-একজন পুরাতন কবির পরিচয় ছাপা না হইয়াছে।

বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাস পত্রখণ্ডি যেমন সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ বহি করিয়া বাহির করেন—কিছুদিন হইতে সেই হিসাবে পরিষৎ-পত্রিকায প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ছাপা হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি সেখান হইতেও বহির আকারে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একদা চ-সংখ্য। বহি বাহির হইয়াছে। এই দুই সংখ্যায় চট্টগ্রামের সুন্দরী আবহুল করিম সাহেবের ছয় পুঁথির বিবরণ আছে। নীচের বাবু গ্রন্থগুলিতে এই সকল পুঁথির অবিকারের বিবরণ নাই ছতরান বসিতে

থেনে, সাত্তা-পরিষদের এই বহি দু-খানি হইতে অনেকগুলি পুঁথির কথা জনসমাজে নুতনই জানা গেল বলিতে হইবে। বহি দুখানি আরি আনিয়াছি, এই সম্বন্ধে সে দুখানি ধরিয়া দিলাম, এগুলি ছাপা হইয়াছে, কারণই আদার এ ফর্মে উহার কথা আর লিখি নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস যে কেবল নীচের বাবু নুতন লিখিয়াছেন, তাহা নহে; তবে তাঁহার উক্তিগতপাণি আর বঙ্গসাহিত্য-পরিচর দু-খণ্ডই এবিষয়ের খুব বড় সংগ্রহ হইয়াছে। পূর্নকার ইতিহাসগুলি অপেক্ষা এগুলি অনেক প্রাচীন পুঁথির ও প্রাচীন কবির বিবরণে ভরা। নীচের বাবুর পূর্ন পণ্ডিত রামগতি ভাষগর “বাঙ্গালা সাহিত্য বিবরণ প্রস্তাব” নামে একখানি কতকটা বড়সড় বহি লিখিয়া-ছিলেন। তাহাতেও কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রাচীন কবির বিবরণ ছিল। সে খানিরও এখন নুতন সংস্করণ হইয়াছে আর তাহাও অনেক বাড়ান হইয়াছে। ইহাদের আগে গঙ্গাচরণ সরকার, পদ্মনাভ ঘোষাল, কানীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, রাজ-নারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, কৈলাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস নামে কয়েকখানি ছোট ছোট বহি লিখিয়া পিড়াছেন। ইহাদের এই চেষ্টাটা নাকি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় মোড়ার দিকের, তাই তাঁহাদের গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের বড় বেশী সংখ্যন পাওয়া যায় না।

আজ কাল এবিষয়ে বড় শীঘ্র কাজ আগাইয়া যাইতেছে। নীচের বাবুর বহি-গুলির পর এই কম বৎসরে তাহাদের অতিরিক্ত এত প্রাচীন গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের

নাম বাহির চইয়া পড়িগাছে যে, তাহাদের লইয়া একটা পরিশিষ্ট মত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হয়। কেবল সাহিত্য-পরিষদের এই দু-খানি প্রাচীন পুথির বিবরণ ও রত্নপুর শাখার পত্রিকার বিবরণ নচে, আরও নানান্থানে এক্ষণে গ্রন্থবিবরণ ছড়াইয়া বাতির চইয়াছে, সমস্ত খুঁজিয়া-পাতিয়া জড় করা উচিত।

এই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের সম্পাদক দু-জন কুমার শরৎ রায়, ডাক্তার কেদারেশ্বর আচার্য্য। আর বরেন্দ্র-অহম্মদান-সমিতির সম্পাদক রমাশ্রদ্ধা চন্দ্র মহাপদ্মেয়া এবার মাঘমাसे বধন কলিকাতার আমোদের গ্রেফ-তার করিতে গিয়াছিলেন,—তখন আমরাই যাড়ে এই কাণ্ডটার তার চাপাইয়া আসেন। আমি সাহিত্যের এখিকটার একটা বীনেশচন্দ্র নহি, তা তাঁহারা জানিতেন, তবে এখিকটার একটু আধটু শব্দ রাখি বলিয়া যে অপরাধ করিয়া থাকি, সেই অপরাধে আমার যাড়ে এতবড় ভারটা চাপাইয়া দিয়া অপরাধের উপদ্রুত হওই বিদ্যা আশির্বাদ্বিলেন। আজ এই সাহিত্যের দরবারে সেই দণ্ড খাটিতে তবে ভয়ে আসিয়া পাড়াইয়াছি। যেমন করিয়া কাণ্ডটা করা উচিত ছিল, তেমন করিয়া করিতে পারি নাই সেই ভগ্নই ভয়—পাছে লড়াপতি মহাপদ্মের হাতের সবুজ পত্রবৃক্ক সবুজবেজের ঘাই বা সহিতে হয়।

এই কথাগুলো যে নিজের অক্ষমতা জানাইয়া কেবলই মৌখিক বিনয় প্রকাশের জন্য বলিয়াছি, কেহ তাহা মনে করিবেন না। কর্তব্য ঠিক মত করিতে না পারিলে, অপরাধ যে হয়, তাহা আমি বুঝি তবে এ ব্যাপারটা সত্য সত্যই কেমন গুরুতর, তাহা একটু বুঝাইয়া রা বলিলে আমার অপরাধের মার্জনা

চইবে না। দীনেশ বাবুর বাতির অভিত্রস্ত অজানা বহিষ্ঠালির বিবরণ দিতে হইলে, এ পর্য্যন্ত যে সব আচরণ্য প্রাচীন পুথি জমা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই সব আচরণ্য গিয়া দীনেশ বাবুর বহিঃধরিতা মিলাইয়া ফর্দ করিতে পারিলে, তবে সে কাণ্ডটা ঠিক হয়। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশাখার পুথিগুলিই বেধিবার আমার হৃদয় হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অজানা পুথিগুলিরই তালিকা করিয়া আনিতে পারি-রাছি। ইহার কালনা আর রত্নপুর শাখার পুথিশাখা বেধিয়া আনিবার বা চিঠি গিবিয়া তাহাদের এই বহর আনাইবার মত সমর্থ হুলাই নাই। জানাতনা রাজ-বাড়ীগুলির পুথিশাখাও বেধিতে ঘাইতে পারি নাই। জানাতনা বঙ্গ-বাহুবের ঘরে যে সকল পুথি আছে, তাহাও বেধিতে ঘাইতে পারি নাই। কাজেই আমার এ চেষ্টাটা একটা ছেলেখেলা হইয়া গিয়াছে। একে ত কাণ্ডটা যেমন গুরুতর তেমন করিয়া তুলিতে যথেষ্ট সমর্থও আবশ্যক,—দুমালের কম সময়ে তাহা ঘটয়া উঠিতে পারে না,—তাহা আমি হাইকোর্টের কেবালী, রায়ের বাবার বিবদ জামা কেন পাইবে না এই ভগড়া করিতে করিতে নিরু আশালভের ছই কোর্টে হারিয়া কাগজ-পত্র হাইকোর্টে আনিয়া পৌঁছিলে, আমার সে সকল সামলাইয়া শুছাইয়া রাখিতে হইবে, এই কালের পর পরিশ্রান্ত মেহে, অবশর মনে সাহিত্য-পরিষৎ-সমিতির আলিয়া। সর্বের প্রাণী আলিয়া আমার বসিতে হয়,—তাহার পর যে টুকু সামান্য অবশর ঘটে, তাহাও আমার হুইষতরন-চিভার তুলনবল্লভন চেষ্টায় কোথায় যে কেমন করিয়া উবিয়া যায়, তাহা ধরিতেও



পারি না। এখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন আমি একাই সমগ্র বকের পুঁথি অল্পসম্পদ-সমিতি সাধিয়া অমান্য অছাপা পুঁথি খুঁজিয়া বেড়াইবার জন্য হতটা প্রয়োজন ততটা অবশ্য করিতে পারি নাই।

এইত গেল অবস্থা। এইত গেল আপা ভরসার কথা—নেপের গুণ গ্রন্থ-সম্পদের কথা—এখন আপনারা বাহা ভনিবার আশা করছেন, তাহার ভিলকাকনী কর্খটা তখন।

দোনেশ বাবুর বহিখানি প্রকাশের পর সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিমালায় নিরূপিত নুতন পুঁথিগুলি আনিয়াছে,—

১। পদ্যভাষ্য—এই খানিতে চতুর্দশের অনেকগুলি অমান্য পদ পাওয়া গিয়াছে।

২। ধর্ম মঙ্গল—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইতিপূর্বে মাবিক দাদুলী, মহেশ্বর চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, কেশরাম, তপসরাম, রামকৃষ্ণ আদিক, প্রভৃতির রচিত ধর্ম-ঠাকুর লক্ষ্যীর গানের পালা পাওয়া গিয়াছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বঙ্গবাসী ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গিয়াছে। মাবিক দাদুলীর ধর্মমঙ্গল সাহিত্য-পরিষৎ ছাপাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ আদিকের অনাবিষমঙ্গল সাহিত্য-পরিষৎ ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রমাই পণ্ডিতের নূন্য পুরাণও সাহিত্য-পরিষৎ বাহির করিয়াছেন; কিন্তু গোবিন্দ দাড়ুয়ের ধর্মমঙ্গলের কোন কথা এপর্যন্ত আর কেহ কোথাও কখন প্রকাশ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষদে এই পুঁথিখানি বাঁহুড়া মেলায় বেশিখাতোড় গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রহকর্তা শ্রীযুক্ত বলভরদাস দাস বিশ্বকলিত। দোনেশ বাবু শেখের গ্রন্থখানিতে এই গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু খবরটা যে পরিষদে পাইয়াছেন, পুঁথিখানা যে পরিষদের

পুঁথিমালায় বসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করেন নাই।

৩। অনিল পুরাণ—এখানিও আর একখানি প্রাচীন ধর্মমঙ্গল শ্রেণীর গ্রন্থ। এখানির রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। পুঁথিখানি অতি বৃহৎ। ইহার দৃষ্টিভঙ্গ ও দেবভঙ্গ এক অদ্ভুত ব্যাপার। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দত্ত মহাশয় হুগলী জেলার কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের মন্দির হইতে এখানি আবিষ্কার করিয়াছেন আর তাহারই বাহে এখানি ছাপাও হইতেছে। আবার উপরেই ইহার লক্ষ্যন তার আছে। গ্রন্থখানি ঘনরামের গ্রন্থের স্তায় খুব বড়।

ইহাতেই শিবের তপিনী নারদের মাত্র খবর ও নিরঞ্জনবৈরাগ্যকার বেহ বাহের পর, কেমন করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গলার কাছে বাঁধিয়া ছিলেন তাহার খবর আছে। স্তম্ভধারিণী আদ্যার সহিত শিবের কেমন করিয়া বিবাহ তাহাও ইহা হইতে জানা যায়।

৪। অতিবেক পর্ক—ইহা কান্দিরাম দাসের লেখা। এ পর্যন্ত বহু মহাভারত পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে অতিবেকপর্কের উল্লেখ আছে। কান্দিরাম দাসের এই অতিবেকপর্ক ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায় নাই এবং ইহা বিজয় পণ্ডিত প্রণীত অতিবেকপর্কের আদর্শ রচিত।

৫। বসুপর্ক—এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় রচিত অনেকগুলি মহাভারত পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কান্দিরামের মহাভারত সর্বা-পেক্ষা বৃহৎ। সর্কদাখারণে কান্দিরামের অষ্টাদশ পর্ক মহাভারতই হুপ্রসিদ্ধ। এই অষ্টাদশ পর্ক বাতীত কান্দিরাম দাস কৃত পানাপর্ক, দানপর্ক ও দানপর্কের সংবাদ ইতিপূর্বে

জানা পিছাচ্ছে কিন্তু যন্ত্রণার সম্পূর্ণ নূতন।  
এ পক্ষের প্রতিপাত বিষয়—যন্ত্রণার  
ফলাফল, বাহার সভ্যতায় বিচার প্রকৃতি।  
প্রচলিত কাশ্মীরান বাসের মহাতারতে এই  
দুই পক্ষ নাই।

৬। চৌর-চক্রবর্তী—(বীর কাশ্মীর  
কৃত) ইহা চোর, তরুর প্রকৃতির প্রাচীন  
উপাখ্যান।

৭। ভীষণক—কৃষ্ণপ্রদায় ঘোষ কৃত।  
এই মহাতারতকারের নাম সম্পূর্ণ নূতন।

৮। নদিস্ত পুরাণ—এই পুরাণের কেবল  
একখানি পাতা পাওয়া পিছাচ্ছে। এই  
পুরাণের ভাষা দোবিধা ইহা জনৈক মূল-  
মানের রচিত বলিয়া বোধ হয়।

৯। ঐক্ক-কৌতব—এই পুথিখানির  
অক্ষর বৃষ্টি ১৩শ শতাব্দীতে গোঁড়া বিশ্বতপ  
সেনের ভাষ্যসনের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য-  
পরিষৎ-পত্রিকার ১৮শ ভাগ ২য় সংখ্যায় এই  
পুথির আবিষ্কার ঐক্ক বসন্তরতন রায়  
বিবরণের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির  
করিয়াছেন। এই পুথিখানি বাঁকুড়া  
দেশাতে পাওয়া পিছাচ্ছে। ইহা ১২শ খণ্ডে  
বিভক্ত। এই পুথিখাণ্ডে মনে হয় যে, ইহা  
চতুর্দশের প্রথম বর্ষের রচনা। এই কৃষ্ণ-  
কৌতবের ভাষাতে মৈথিল বা প্রাকৃত প্রভাব  
সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুথির  
পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ ও ইহা একখানি অভিনব  
শ্রুতিকাব্য। এই পুথি পাঠে জানা যায় যে,  
কবির অপর একটি নাম ছিল অনন্ত। ইহাতে  
চতুর্দশের রচিত সংস্কৃত কবিতাও প্রভি-  
পদের মাঝার মাঝার আছে। এখানিও  
সাহিত্য-পরিষৎ ছাপাইতেছেন।

১০। দ্বতী পর্ক—কাশ্মীরাম দাস বিব-  
চিত। এই গ্রন্থের প্রতিপাত বিষয় সকলেরই

জানা আছে। এ পঞ্চম বাঙ্গালা-সাহিত্যের  
ইতিহাসে নিম্নলিখিত তিনজন দ্বতীপর্ক-  
চর্চিতার নাম পাওয়া পিছাচ্ছে; বাঙ্গালাম দত্ত  
কবি মহোজ্ঞ ও কবি উমাকান্ত। এই গ্রন্থ-  
কর্তার নাম নূতন এবং পশ্চিমারাটে এই  
দ্বতীপর্কের বহুল প্রচার ছিল।

১১। কৃষ্ণ-চরিত—বিদ্য হরিদাসকৃত।  
এই গ্রন্থকার নূতন।

১২। মহাতাপবত পুরাণ—কৈলাসচন্দ্র  
বসু-রচিত। এই গ্রন্থকার নূতন।

১৩। চণ্ডিকামঙ্গল—হরিনারায়ণ দাস-  
প্রণীত। এই গ্রন্থকারও নূতন।

১৪। দুর্গামঙ্গল—বিদ্য  
প্রণীত। এই গ্রন্থকারও নূতন।

১৫। নিবৃত্ত-মঙ্গল চণ্ডী—বাণীরাম ঠাকুর-  
রচিত। এই গ্রন্থকারও নূতন।

১৬। একাদশীর পাঁচালী—লাগর বসু  
কৃত। এই গ্রন্থকার নূতন।

১৭। লগদাখ-মহাশ্মা—সুবুদ্ধ দাসকৃত।  
এই গ্রন্থকারও নূতন।

১৮। লগদাখ-মঙ্গল—বিদ্য মধুকর্তৃকৃত।  
এই গ্রন্থকার নূতন।

১৯। বজ্রিণ-পুত্রিকা—রত্নাই ব্রাহ্মণ-  
কৃত। এই গ্রন্থকার নূতন।

২০। উজ্জ্বল পর্ক—রাজীব সেন-প্রণীত।  
বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থকারের  
রচিত মহাতারতের উল্লেখ এই প্রথম।

২১। সম-সংবাদ—এই পুথিখানি নূতন।  
ইহা কৃষ্ণকৌবল দাস-প্রণীত। সংসারের  
অনিভাতা প্রদর্শন, কলিযুগে পাপপুণ্যজনিত  
বৃত্ত-পুঙ্খকারের আলোচনা প্রকৃতি এই গ্রন্থের  
আলোচনার বিষয়।

২২। অকৃত স্রামায়ণ—কৈলাসচন্দ্র বসু  
প্রণীত। এই গ্রন্থকারের নাম নূতন।

২৩। অমূল্যোৎকর্ষ—(মহাভারত) কাশ্মীরায় রচিত। এই পুঁর্ক প্রচলিত ১৮শ পুঁর্কের অন্তর্ভুক্ত। কৃত্তকের-মুখ-বন্দনপদের মত্রে সুখিত্রের শোক, দিব্যাক্ষ ও হিরণ্যাকশিপুত বৃত্তান্ত বর্ণনা এই পুঁখির প্রতীপাত্ত বিবর।

২৪। পরেশনাতিকা—কৃষ্ণদাস কৃত।

২৫। আনন্দলহরী—বৃন্দাবন দাস কৃত।

২৬। নারদ উপাসনা তত্ত্ব—

২৭। তত্ত্বমঞ্জরী—

২৮। ক্রীড়কের জয়লীলা—চণ্ডীদাস কৃত। প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস নয়। এই গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২১শ ভাগের প্রথম সংখ্যায় আমিই লিখিয়াছি। ইহার মধ্যে “লিঙ্গ পূরণ” নামে একখানি ব্যাঙ্গোক্ত নূতন পুরাণের পরিচয় ও তাহার একটি উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

২৯। ধর্মমঙ্গল—বিদ্য রামচন্দ্র রচিত। ইনিও আর একজন নূতন কবি। বর্ধের পালায় এ আর একখানি নূতন কাব্য।

৩০। জ্ঞানরণ—বিদ্য বাণেশ্বর লিখিত, মনদার পালা ইহার বিবর, কবি ও কাব্য নূতন।

৩১। রসালস—বলরাম দাস কৃত। (সহজিয়া গ্রন্থ)।

৩২। বিদ্য মাধুব—ধনঞ্জয় দাস কৃত।

৩৩। ক্রীড়কের বিচার—বিদ্য রামনাথ কৃত।

৩৪। ভক্তি-রসালিকা—দীনকৃষ্ণদাস কৃত।

৩৫। গুণতত্ত্বদার—বলরাম দাস কৃত।

৩৬। নিমাই-অষ্টৈত তত্ত্ব—কৃষ্ণদাস কৃত। নিতাই-নিমাই এইরূপ দোড়ার তত্ত্বকথার গ্রন্থই দেখা যায়—নিমাই-অষ্টৈত একপ দোড়ারে তত্ত্বকথা পূর্বে শুনা যায় নাই।

তত্ত্ব দেহরণ ভগ্নানক কথ্য—গ্রন্থ দেহরণ ভাতিগ্রন্থ আকারেব নগ্রে কৃত্যাকার।

৩৭। বটুর মঙ্গল (বটুক মঙ্গল) বিদ্য রামচন্দ্র কৃত। বটুক চৈতন্যের মাংসাত্ম্য। কীর্তন—একপ নূতন বিষয়ে এই গ্রন্থ এই প্রথম আবিষ্কৃত হইল।

৩৮। নারদ ধোপ পুস্তক—গদ্যক দাস কৃত।

৩৯। কালিকাপুরাণ—নারায়ণ

কৃত। কবি নূতন।

৪০। বাবাহর পাঁচালী—বিদ্য বৈক্যব দাস কৃত। কবি নূতন।

৪১। জুবানার দ্বিত্ত্রা ভজন—গদ্যধর দাস কৃত। কবি নূতন। কবিসঙ্কল্পের দ্ব্যামা-চরিতই প্রসিদ্ধ।

৪২। ক্রীড়কের জয়কথা—দীননাথ প্রণীত।

৪৩। বাস্তাকর্ণের পালা—বিদ্য পদমান কৃত।

৪৪। ক্রীড়কের জয়লীলা—রামেশ্বর দাস কৃত।

এই যে ৪৪ খানি নূতন পুস্তকের সংগ্রহ পরিষদের পুঁখিপালায় হইয়াছে, ইহার অনেকগুলি পুঁখির নাম, বিবর ও কবির নাম সবই নূতন। কতকগুলির কেবল কবির নাম নূতন, বিবর নূতন নহে। কতকগুলির কবির নাম—অনেক পরিচিত নামের সহিত সমান, যেমন কৃষ্ণদাস, বৈক্যবদাস, বলরামদাস ইত্যাদি—কিছু তাহার যে পূর্ক পরিচিত গ্রন্থকর্তাদের সহিত অতি, তাহা বলা যায় না। আর দুখানি অসূত গ্রন্থের পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সে দুখানি কাশ্মীরায় দাসের আদি পূর্ক ও ত্রোপ পূর্ক। সাধারণতঃ যে সকল আদি পূর্কের পুঁখি পাওয়া যায়, তাহা মাঝমাঝি আকারের পাতায় লেখা

হইলে, ৩০০ পাতার যেই বড় বয় না, কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ একখানি আদি পক্ষের পুথির সন্ধান পাইয়াছেন, সেই-খানির আকার হাজার পাতার উপর। আর একখানি কান্দীগ্রাম দাসের ত্রোপপক্ষ সংগ্রহ হইয়াছে, সেখানির পত্র সংখ্যা তিনশরের অধিক। সাধারণতঃ দেড়শ পাতার অধিক ত্রোপ পক্ষ দেখা যায় না।

এই সকল পুথি বাবে আরও কতকগুলি পুথির বিবরণ শেষকালে আমার হাতে পড়িয়াছে। সেগুলি পরিবর্ষের পুথিশালায় নাই। ইহার মধ্যে শ্রীমান নলিনীরঞ্জনর পুথিকথখানি আমি দেখিয়াছি। সেগুলি এই—

(১) স্বরূপ দামোদরের কড়চা—এইখানিতে বাউলদের সাধন ভজন প্রণালী, দত্তবুর সত্ত্ব তত্ত্বা সাধা সহজ সরল অঙ্গীল শেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উপশেষ দিতেছেন বিরক্ত বৈরাগী বৈকুণ্ঠচূড়ামণি স্বরূপ ও দামোদর।

(২) মীরাবাইএর কড়চা—ইহাতে রূপ-গোবিন্দীর সহিত দিখা। বৈকুণ্ঠী মীরাবাইএর অমৃত রসতত্ত্ব সাধনার কথা অঙ্গীল ভাষায় বোলাখুলি লেখা আছে। পুথিতে আছে, এই মীরা কৃষ্ণরূপার মহিষী কিন্তু তাহাতে ইতিহাস মেলে না কারণ রাণাকুন্ড আকবরের সময়ের দোক আর রূপগোবিন্দী বাবালার স্বাধীন পাঠান রাজা হুসেন শাহর উজীর ছিলেন।

(৩) অদ্বৈত কড়চা—এ গ্রন্থখানির ব্যাখ্যা আর এ সত্যার ধাঁড়াইরা করিব না,—নাথকৈই বুঝি। লইবেন যে শিবের অবতার সকলের অপেক্ষা বৃদ্ধ। বৈকুণ্ঠ অদ্বৈতচাণ্ডীর সম্পর্কে বাউলদের সাধনতত্ত্ব কেমন করিয়া লেখা হইয়াছিল। পুথিখানাই প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন।

(৪) দিল-কিতাব—

“কেহা হিন্দু কেহা মুলমান—

মিলজুলকে করে সব সাইকীকা নাম”

আর—শ্রীচন্দ্র সোনাভন ঘোর নিস্তার শাক্তী।

মাকামদিনার খবর আধা হৈতে পাই।

এই হইল দিল কিতাবের মূল সূত্র। রূপ-সনাতন যে মক্কা মদিনার খবর এত ভাল জানিতেন, তাহা বৈকুণ্ঠ চাকুরেরা জানেন না বা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠী রচনাও তাহারাও সে আভাস ঘেন নাই। এই মকামদিনা—আর-বের সহর মকামদিনা নহ—ইহা বটুচক্রভেদের ভাষা মাহুদের বেহের মধ্যে কল্পিত স্থান—ব্যাখ্যা অবশ্য অত্যন্ত অঙ্গীল কাজেই সে কথা বলিতে পারিব না। ইহার ভাষা—মুলমানী বাহাল। বলিয়া হঠাৎ ভুল হয় কিন্তু ঠিক সেসুত্র নহে। ইহাতে যথেষ্ট আরবী শব্দ আছে। বাউল-সরবেশী সম্প্রদায়ের এখানি সাধন প্রণালীর পুথি। রূপ-সনাতনের প্রায় আর উত্তরের হিসাবে সমস্ত কথা লেখা হইয়াছে। ১৩১৮ সালের ৩৪ সংখ্যা পত্রিকা যালদেহের পঞ্জীতাবা নামে হরিদাস বাবু প্রবন্ধ লেখেন এই দিল কিতাব ও আরও কয়েকখানি নূতন পুথির বিবরণ তাহাতে আছে। (৫) শ্রীলব্ধ চরিত্র—

রাধার সবী লবঙ্গলতার রসকৌরী বর্ণনা—  
(৬) মঙ্গল রসকারি, (৭) শ্রীচন্দ্র কলিকাগ্রন্থ,  
(৮) ভাবানুভূত, (৯) শকুন্তল (১০) আশ্বত্থ,  
(১১) রসালপ (১২) তেজোব্রহ্ম-তত্ত্ব—  
শ্রীমান নলিনীরঞ্জনর এই পুথিগুলির অধিকাংশ কলিগ্রন্থের হরিদাস বাবুও নিরুপা পণ্ডা।

তাহার পর পরিবর্ষের পুথিশালায় আরও কয়েকখানি পুথি দেখিয়া দীনেশ বাবু তাহার বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ পরিচয় দিয়াছেন—সেগুলির কথাও একটু বলা ভাল কারণ দীনেশ বাবু সেগুলি দীকার করেন নাই।

(১) ভাকের বচন—পরিষদের পুথিখানার পুথিখানার নাম ভাকচরিত্র।

(২) জাগরণ—ভবানীপতর দ্বারা রচিত। পুথিখানি পরিষদের—এই পুথিখানি ছাপার এক্ষেপেট ও নকল মিলাইবার জন্য বেওয়া হয় নগেন্দ্র বাবুর নিকট। লক্ষ্যতঃ দীনেশ বাবু তাঁহার নিকট ইহার সংবাদ পান। পুথির বিষয়—লক্ষণতী চণ্ডী। দীনেশ বাবু এতলি সাহিত্য পরিষদের পুথি বলিয়া বীকার না করায় আমি তাঁহাকে কোন বোঝ দিতেছি এমন কেহ মনে করিবেন না। আমার প্রবেশের নাম—বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পদ—তাই এদিকটায় পরিষদ কি কতটা কার করিয়াছেন, তাহাই দেখাইবার জন্য একখানারও নাম করিলাম যাত্র। এই পুথিখানি পরিষদের সমস্ত চট্টগ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ এখানিও ছাপার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তারপর মুনসী আবদুল করিমের পুথিগুলির মধ্যে সৌলত উজীরের লয়লায়মজহু, লেখ করজুহুর পোর্ববিজয় (এগ্রন্থখানি ঘোপী পোরকনাথের মাহাত্ম্য বিজয়ের গ্রন্থ। লেখক কিন্তু একজন চট্টগ্রামী মুসলমান), বিজয়ামতজহুর নূরনামা (লেখ করজুহুরা মুসলমান হইয়া যেমন হিন্দুঘোপী গোরকনাথের লীলা লিখিয়াছেন, এখানি ঠিক যেন তাহার পালটা বহি, ব্রাহ্মণ রামতহ মুসলমানের সাধন তত্ত্ব নূরনামা হাদিস অহুসায়ে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন)। চট্টগ্রামে এই মেলা-মেলায় তাহাট। দে দেশের সাহিত্যের ভিত্তির দিগা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মনসমন্ডলের ৩০-৩২ জন কবির নাম ও গ্রন্থ জানা গিয়াছে। রামজীবন বিভাজুয়ণ তাঁর মধ্যে একজন। তাঁহার মনসামন্ডল “বিভাজুয়ণী মনসা”।

নামেই বেশ পরিচিত। এই রামজীবন বিভাজুয়ণের—আজিতাচরিত্র নামে সুখোত্র পাচালী চট্টগ্রামের নবীন কবি শ্রীমান জীবেন্দ্র কুমার দত্ত আবিষ্কার করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায লুপ্তাভূত পাচালী নামে বাহির করিয়াছেন। মুনসী আবদুল করিমের পুথির বিষয়বস্তুর মধ্যে গোফুলমন্ডল, ইয়ামলাগর, গদ্য মরিকার পুথি ও মরিকার হাজার সওয়ালা, রত্নাই ব্রাহ্মণের বত্রিশ পুতলিকা, তারিণী ব্রাহ্মণীর শ্রবচনী ব্রতক্ষণা, প্রভৃতি নূতন নূতন পুথিগুলি বেশ ভাল বহি। পেগলির আবিষ্কারের কথাটা এ সভার বর্ত্ত সত্যই বিশেষ আনন্দের কথাই হবে।

পদ্মাপুরাণের কবি ময়মনসিংহের বিজ বংশীদাসের গ্রন্থ হাইকোটের উজীল শ্রীকৃষ্ণ ষারকানাথ চক্রবর্তী মহাশয় কিছুদিন হইল ছাপাইয়া বাহির করিয়াছেন। ময়মনসিংহ সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কেদারনাথ মজুমদার সম্প্রতি তাঁহার সৌরভপরে ঐ বংশীদাসের কত্বে চন্দ্রবর্তীর রচিত রামায়ণ-কথা নামে এক অশূর্ষ পুথির বিষয় দিয়াছেন।

গভর্ষেষ্ঠের সংগ্রহ হইতে দামরা বে কখনো পুথির নাম জানিতে পারিয়াছি,— তাহার মধ্যে ভৈরব দাসের উবারসার্বব, বিজ সৌরাসের গদ্যমন্ডল, বিজ শিবচন্দ্রের সৌরীমন্ডল, রামানন্দ গোবামীর চৌর শ্রীত—প্রভৃতি কথখানি নূতন। অত্যন্ত মাসিক পত্র হইতে ১৪১৭নংক রচিত কবিশুদ্ধ সন্তোষ বাঁড়ুয়ার কৃষ্ণমন্ডল, রামানন্দ গোবামীর (কবি আনন্দির) জয়দেব চরিত ও পদ্মাপুরাণ, গদ্যনোরাধের ভবানী-মন্ডল, লক্ষ্মীদেব দ্বিপ্রের মনসগেথিষ্ট প্রভৃতি নূতন গ্রন্থের নাম পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকা-শান্তিনাথ-বিষয়ের ঐক্য নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মহোদয়ের গান ছাপিবার সময় দু'মিকার হুতর মহাশয়ের রচিত একখানি মহোদয়গানের খবর দিত্যেচেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা জামলাপ সেনের "মীনচেতন" নামে এক নূতন পুথির সংবাদ পাটখাছি।

পুথি "উৎসাহ" পত্রিকার গোবিন্দ ভাগবত নামে একখানা পুথির বিবরণ পাইয়া ছিলাম, সে এক নূতন ধরণের পুথি—সেখানির উচ্চার হওয়া কর্তব্য—তাগাতে স্থতী পত্রাকারে রামকথা, বৃদ্ধ প্রসঙ্গে—বামাচারী তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কথা, শূদ্রাকারে চৈতন্যলীলা আর প্রসঙ্গতঃ সত্যনাথায়ণের উল্লেখ আছে—এই বাঙ্গালীর নূতন ভাগবত পানা ছাপা হওয়াও বরকার।

পরিষদের বলন্ত বাবু বাবুজীর কবি লগপ্রান রাবের আন্তর্যোগ নামে একখানি পুথি বাতির করিয়াছেন। সেখানি Pilgrims progress এর মত দেখে। সম্প্রতি তিনি আরও দুইখানি নূতন পুথি বাহির করিয়াছেন—হরিশ্চন্দ্রের কালিকামঙ্গল ও রামেশ্বর ঘোষের ঐতন্যমঙ্গল।

এই ত আমার কথাটি স্মরণ, কিন্তু এই সম্মিলনের পর আপনারা সকলে এখানকার নটে পাছ এইখানেই মুড়াইয়া বাড়ী বাইবেন না। তুলিলেন এখনও দেশের গ্রামে গ্রামে একতর প্রাচীন পুথি অনেক পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়া বাইতেছে, তাহারের খোঁজ করুন, উদ্ধার করুন। রক্ষা যেমন তেমন করিয়া করিলে হইবে না। এখন ছেলেশের ফুলের

পুতুলের মার একদাবশাটের খাতার ভাবে প্রত্যেক বাপ মা বিব্রত। তাহার উপর কোন বাবা যদি উকাল হন আর কোন মার যদি বাঙ্গাল। মাসিক পত্রের ছোট গল্প আর ছোট কবিতা পড়ার বৌক থাকে, তবে তাঁহাদের পুস্তকাবলীর ধ্বংস যাকপানে এসকল সেকলে অবলম্বনার স্বত্ব পুথি পাঠড়া বাড়িতে রাখা দায় হইয়া উঠিবে,—ক্যামিলী ভাস্কর মহাশয় এত দেখিয়া বলিবেন,—পুরাতন কাগজের ধূলার নানা জাতীয় রোগের কীটাপু নিশ্চয় আছে। অতএব মহাশয়দিগকে সন্নিবিষ্ট অল্পরোগ কদাচ যদি কেউ একতর কোন প্রাচীন পুথি নিষেধ গ্রামে কাহারও বাড়ীতে পান তবে তাহা বাড়ীতে আনিবেন না। একতর পুরাতন কাগজের আবলম্বনা ব্যাসিনী পূর্ণ প্রাচীন পুথিরাশি সাধরে গ্রহণ করিবার লজ্জা আমরা ৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়া সাতকঠা ভূমি মার্কস দিয়া মুড়িয়া সাহিত্য-পরিষৎ নামে একটা Waste paper basket ছেঁড়া কাগজের স্তুতি তৈয়ার করিয়াছি—নয়া করিয়া সেখানে বেহারি পার্শেলে ভাকে পাঠাইয়া দিবেন,—আমরা মাথা পাতিয়া ভগল ভাক মাত্র দিয়া তাহা লইব এবং বর্ষে বর্ষে এই উত্তরবধ সাহিত্য সম্মিলনে আদিয়া তাহার মধ্য হইতে কত নূতন কবিকোষিলের নূতন কবিতা হুজুরানি শুনাইয়া বাইব। এ প্যাকাচুলো বুড়োর অল্পরোগটা মনে রাখিলে, আমকার এ ব্যাক-বায় এই প্রাচীন পুথির ক্ষুর বিবরণ লেখা সার্থক হইবে। •

শ্রীযোমকেশ মুস্তাফী শর্মা।

# বিবাহ বিধি

( সমালোচনা )

গত কালীন মাপেব "গৃহহে" আয়ুবেবজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন মহাশয় "বিবাহ-বিধি" হািত ণিবক একটি নাতিদীর্ঘ ণিবন্ধ প্রকাশ করিযাছেন। সমগ্র-তত্ব-পাত্রে "বিবাহ" সর্কাপেক্ষা আবন্তক সমস্তা; হুতরাং এই সমস্তার সমাধান নিমিত্ত সামাজিকগণ সকলেই ণিব নিক বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কারচুপ্ত চেটা করিযাছেন এবং করিতে-ছেন। আমরা তাই শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিযাছি। এই প্রবন্ধ পাঠ কালে, আমাদের মনে যে সকল কথা উদিত হইযাছে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় এবং সাধারণের অবগতার্থ ণিবধন করিতেছি।

গত ১৩১৯ সালের চৈত্র সংখ্যা, এবং ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ এবং কাশিক সংখ্যা "আধ্য-কাবয়প্রতিভা" পত্রিকায়, আমরা "বিবাহে কস্তার বহন" শীর্ষক তিনটি প্রণোব প্রকাশ করিযাছিলাম। সে সময়ে কোন এটনী বাবু এ সবছে কোন আলোচনা করেন নাই। বর্ধমান, ইতিহাস, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আয়ুবিজ্ঞান শাস্ত্রের মত উদ্ধার করত আমরা ইহার আলোচনা করিযাছিলাম। এই প্রবন্ধের প্রকাশ কালে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রবীণ পণ্ডিত এই প্রণোবজয়ের প্রতিবাদ করিবেন বলিযা শুনিযাছিলাম, কিন্তু তাহার পর আর

কোন প্রতিবাদ পছন্দ করেন নাই। "প্রবাসী" পত্রে যে ণিবন্ধ ছিল, তাহা আমাদের প্রবন্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অসম্পূর্ণব্যাপি ছিল। বর্তমান প্রণোবের লেগত মহাশয়কে আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে সাহসনব অহুরোধ করিতেছি।

তাটপাড়া হইতে ৮৮বাক্যেণ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবর্তিত, বঙ্গের একমাত্র সংস্কৃত-পত্র, "বিদ্যো-দেবের" গত জ্যৈষ্ঠ হট্টে আশিন সংখ্যার পত্রে (একত্র প্রকাশিত) জনৈক পণ্ডিত-পত্র-প্রেরক পাত্র এবং মুক্তি সহায়ে আধ্যাত্মিকার বৌধন-বিবাহ শব্দের সমর্থন করিযাছেন। তাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রাচীন সর্কাবিধ অচোর ব্যবহারের একটি সমর্থক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পকানন তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য ও হুণতি ও জ্ঞাতুসুসুপ্তগল (১) সস্ত্রিতি "বিদ্যোদেবের" সম্পাদক। তর্করত্ন মহাশয় নিশ্চয়ই এই পত্র-প্রবন্ধ দেখিযাছেন। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে এই পত্রবানি পণ্ডিবার নিমিত্ত ও অহুরোধ করি-তেছি।

এই বিষয় লইয়া বাদ অথবা বিতণ্ডা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; ণিরপেক্ষভাবে এই কঠিন ও অন্ত্যাবন্তক সমস্তার সমাধান হউক,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় রাগধি হুত্বতের (২) নিয়মিখিত দুইটি বাক্যের সমাংর করিযা

(১) একজন "বিদ্যাবিদ" ও অজ্ঞান দ্ব্যুত কলেজের "এম. এ." ও "বিদ্যাবুদ্ধি"।

(২) হুত্বত মহাবি শব্দে, প্রস্তুত হাজদি। তিনি বিদ্যাবিদ্যের পুত্র। বিদ্যাবিদ্য ত্রাকপবদ্যে কথায়

প্রধানতঃ তাহারই উপর তাঁহার মত স্থাপন  
করিয়াছেন :—

(১) “শক্তিমন্তকৈনং জ্ঞাত্বা যথা-  
বর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ । অথাষ্টৈশ্চ  
পকবিশ্ণুতিবর্ষায় ত্রাদশবর্ষাং পত্নী-  
মাবহেৎ...” শরীর স্থান ১০ম  
অধ্যায় ।

(২) “উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ  
পকবিশ্ণুতিম্ ।  
যদ্যাধস্তে পূমান্ গর্তঃ কৃক্ষিঃ স  
বিপদ্যতে ॥  
জাতো বা ন চিরং জীবেদ্ জীবেদ্  
বা দুর্কলেন্দ্রিয়ঃ ।  
তস্মাদিত্যন্তব্রাণায়াং গর্তাধানং ন  
কারয়েৎ ॥” (৩) শরীর-  
স্থান, ১০ম অধ্যায় ।

এবম্বলেখক মহাশয় এই দুইটি বাক্যের  
অর্থ সুখে বলিয়াছেন যে “অর্থাৎ (পূর্বোক্ত  
প্রকারে প্রতিপালিত) স্ত্রীকে শক্তিশালী  
জানিয়া তাহার বর্ণবস্ত্র বিদ্যাশিক্ষা দিবে ।  
বিদ্যাশিক্ষার পর পকবিশ্ণুতিবর্ষ প্রাপ্ত হইলে  
অত্র ত্রাদশবর্ষীয়া পত্নীর বিধান করিবে ।”

“অর্থাৎ পকবিশ্ণুতিবর্ষ অপ্রাপ্ত পুরুষ যদি  
ষোড়শবর্ষের স্ত্রী নারীতে গর্তাধান করে,

তবে সেই গর্ত গর্তাধনেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়,  
যদি বা বিনষ্ট না হইয়া সন্তান প্রসূত হয়,  
তবে জ্ঞাত-সন্তান দীর্ঘজীবী হইবে না অথবা  
দুর্বল ইন্দ্রিয় লইয়া জীবিত রহিবে ।”

এবম্বলেখক মহাশয় (২) বাক্যের শেষ  
চরণের (তস্মাৎ ইত্যাদি) কোন অর্থবাদ  
হেন নাই । আমরা তাঁহার কৃত অর্থবাদ  
(বেশ ভাল না হইলেও) স্বার্থবাহি বলিয়াই  
ধরিয়া লইয়াছি । তিনি এই দুই বাক্য দ্বারা  
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,  
আষ্টষোড়শায়া রাজস্বী হুল্লভের মতে পক-  
বিশ্ণুতিবর্ষে পুরুষের এবং ষাদশ বর্ষে নারীর  
জিবাচ্ছেদ্য সুখ্যাকাল অবধারিত  
হইয়াছে কিন্তু তিনি উহা গর্তাধানের প্রকৃত  
সময় নহে বলিয়া পর্তাধানেই উপ-  
যুক্ত কাল দ্বিতীয় বাক্যে নির্ধারিত করিয়া-  
ছেন । অর্থাৎ পকবিশ্ণুতিবর্ষ পুরুষ যাদশ  
বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিবে বটে কিন্তু  
সে আরও চারি বৎসর অপেক্ষার পর তবে  
গর্তাধান করিবে ।

এই হুল্লভ বাক্যে একটি গুরুতর অবিচার  
হইয়াছে । তাহার মতে বালিকার বিবাহের  
সুখ্যকাল যাদশ ও গর্তাধানের কাল ষোড়শ  
বর্ষ অথচ পুরুষের পক্ষে বিবাহ এবং গর্তা-  
ধানের বয়স একত্রই পকবিশ্ণুতি বর্ষ দ্বারা  
হইয়াছে । যে পুরুষ যাদশ বর্ষী অত্যন্ত  
বালিকে বিবাহ করিবে, সে কখনই তাহার

পরে যে কখনও পুত্র লাভ করেন, তাহারই নাম ঋগ্বেদের পুত্র ঋগ্বেদের মধ্যে রহিয়াছে । উহাতে হুল্লভের  
মত নাই হুল্লভ যে বিধানের পুত্র, তাহার প্রমাণ, গুরুত্বপূর্ণের আদর্শবাক্যের প্রমাণ আছে, যথা :—

“বিদ্যাবিশ্ব-ব্রহ্মারৈব পুত্রভার মহামতঃ ।

ভারতাক্ষবিশ্বব্রাহ্মণে লক্ষ্য কর্তব্যঃ ১৪৮ । পূর্বপত্র, ১৪১ অধ্যায় ।

(৩) গ্রন্থের পাক্ষিতে “পকবিশ্ণুতি” শব্দের অর্থে ‘সম্প্রাপ্ত’ দ্রষ্ট হইয়াছে । আমরা তাহা স্ত্রীকণ  
এবম্বলিঙ্গী ইন্দোলা করিয়া “অপ্রাপ্ত” পাঠ করিলাম



পত্নীর ঘোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, অর্থাৎ গর্ভাধানের সময়ে, পুরুষিংসব বয়স থাকিতে পারে না। সন্তত বহমান কালজ্যোত ত পুরুষের মৃত্যু অপেক্ষা করিবে না,—সুতরাং বিবাহের চারি বৎসর পরে তাহার পত্নীর বয়স বহন ঘোড়শ হইবে, তাহার নিজের বয়স তখন উনত্রিশ বৎসর হইবে। এই অবি-  
রোধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কবিরাজ মহাশয় বহুবিধ জাঘ-শাস্ত্র-বিরোধি মুক্তি তর্কের অবতারণা করত বলিতেছেন, একই প্রকার শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা-  
প্রাপ্ত ও বিবাহ্য্যান্ পুরুষের বিবাহ ও গর্ভাধান করিবার উপযুক্ত বয়স হুজুর নির্দ্ধারিত করেন নাই। তিনি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ত্রেতে ত্রুতী স্থলস্থিত পুরুষের পক্ষে বিবাহের বয়স পুরুষিংস বৎসর স্থির করিয়াছেন,—সেই পুরুষ অবতাই উনত্রিশ বর্ষ বয়সে নিজ পত্নীর গর্ভাধান করিবেন; আর যে পুরুষ কোনও কারণে এককিংশ অথবা তরশেক্ষা নূন বয়সে বিবাহ করিবে, সেও পুরুষিংস বৎসর বয়সে গর্ভাধান করিবে; কিন্তু বালিকা সকলেই,—  
সাধারণ অসাধারণ, দ্বাদশবর্ষে বিবাহ ও ঘোড়শবর্ষে গর্ভ গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রের শৈলী অবলম্বন করিলে বলিতে হয় যে হুজুর কেবল বালিকার জন্য অপরিবর্তনীয় সাধারণ নিয়ম স্থির করিয়াছেন কিন্তু নিরুত্থ পুরুষের পক্ষে বিবাহের কোন নিরুত্থ বয়স (Minimum marriageable age) স্থির করেন নাই। শারীর শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান্

হুজুরের নাম কবিরাজ এমতাকার মতের প্রচার আর্গশভাড়া ও বিদ্যাবতার কতকুর সম্বানের পরিচায়ক, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যে মহা বিদ্বান্ রাজর্ষি পুরুষ এবং স্ত্রীর শারীরতত্ত্ব উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে তাহার দ্বাধ্যাক্রমে পুরুষিংস এবং ঘোড়শবর্ষে জুলাতন বীর্ধ্যলাভ করে (৪), যিনি অপরিণতবোতা বালিকার গর্ভাধান অভিযত অধিকতর বলিয়া নিতান্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন,—তিনি কি কারণে পতি-  
সংযোগাক্ষমা অন্তঃস্থ বালার (৫) বিবাহ দিবার জন্য বিধি বিবেন ? (৬) আমাদের কবিরাজ মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে (১) যেহেতু উচ্চপ্রধান ভারতীয় ললনার (ঈশ-  
প্রধান দেশীয়া অপেক্ষা অধিকালেই) সাধা-  
বয়সঃ দ্বাদশবর্ষেই বয়ঃ প্রসুতি হয় এবং এই রূপোধ্যাতু হইতে যেমন নারীর গর্ভাধান্যদি অনেকের পরিপুষ্টি হওয়ার বাধ্যাবস্থা অতীত হইয়া যৌবনের আগন্তু হয়, সেই প্রকার যৌবনকালীন কামনাসমূহেরও প্রবর্তন হইয়া থাকে। কামনা বজাব-স্থলত হইলে স্বা-  
বিকৃতি হওয়া অসম্ভব নহে এবং তাহা হইতে গর্ভোৎপত্তিও হইতে পারে। (এইখানে স্বপ্ন-মৈথুন হইতে নারীর গর্ভ বিকৃতি হওয়ার সম্বন্ধে প্রবক্তার হুজুর ও চরক হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা সেই প্রমাণসমূহ তাহার কথামত মানিয়া লইলাম।) (৭)

- (৪) পুরুষিংস ততো বর্ষে পুমান্ নারীতু ঘোড়শে ।  
সম্বয়গতবৌবে তৌ ঞানীয়াৎ সূক্ষ্মো ভিষক্ । ইত্যহান্বে, ৩৪ অধ্যায়, সম্বয়গোতা ওবভের ৪৪৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ততো উদ্ধৃত ।  
(৫) আবোক্তাভূতবেদু ধালা তরশী ত্রিপলা মতা । অগ্বেব কৃত রতিমজরা ।  
(৬) “সখ্যামো...পত্নীঃ আবহেৎ ।” এ হায়ে বিবিলিঙ লকারের প্রয়োগ “যিনি” পুচ্চি করিতেহে ।  
(৭) “ঈশ প্রধান দেশ অপেক্ষা স্ত্রীঃ প্রধান দেশ বজাবতঃ” আর বজাভা নারীর বয়ঃ প্রসুতি হয়, এই মত

(২) বহুবল্য নারীর কামনা স্বভাব-হুলত হয় এবং তৎক্ষণ কতৃভাতো রমণীর আনায়ে বাধি যুগ সম্পন্ন করা উচিত। (এখানেও হস্ততের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমবা তাহাও মানিয়া লইতেছি।)

(৩) অগ্নিমৈথুন সঙ্গত যুগপৎ হইতে নারীর জুনামের আশঙ্কা।

(৪) বোড়নবর্ষ বরণের পূর্বে বালিকার পর্ভাশয়াদির সম্পূর্ণ গোপন হয় না এবং তাহাদের স্ত্রেষ্ঠতম রত্নঃখাতুর (স্ত্রেষ্ঠ রত্নো-খাতু?) পরিশোধন হয় না; হস্তচাং তাহার অগ্রে পর্ভাধান করিয়া উচিত নহে। (৪৪৬-৪৪৭ পৃষ্ঠা, গৃহস্থ, পত কান্তন সংখ্যা।)

অতএব স্থির হইল যে আর্ধ্য মহিলাদিগের জুনাম, এবং পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত স্বাম্যবর্ষ বয়সেই তাহাদের বিবাহ বেগুনা কর্তব্য কিন্তু বোড়নবর্ষের অগ্রে কদাপি তাহাদের পর্ভাধান হইতে বেগুনা কর্তব্য নহে।

এই মত রাহর্ষি হস্ততের ৪৫তম না হটক, প্রবন্ধ লেখকের বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, সমাজে এই মত প্রবর্তিত হইলে আদৌ সফলের সম্ভাবনা নাই,—যেহেতু ইহার মূলেই গোল। রাহর্ষি হস্তত বৈদিককালের লোক,—তাহার সময়ে অর্ধাচীন স্ত্রীর ও

রত্নসম্বন্ধ প্রভৃতির নিবন্ধোক্ত অটাবধি সৌত্রী, নববর্ষা বোহিনী ও মনবর্ষা কস্তার বিবাহ-বিধি প্রবর্তিত হয় নাই। তখন তৎকাল-প্রচলিত যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, সম্ভব নাই। হস্তচাং তাহার মতে এক্ষণ অবিবাহিত থাকিতে পারে কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনার যোগ্য।

যদি কোন ব্যক্তি কবিরাজ মহাশয়ের কথামত পক্ষবিশেষ বৎসর বয়সে অথবা তৎপূর্বে স্বাম্যবর্ষ বয়সে কোন কল্পকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, বিবাহের পর মাসে মাসে (৮) বখন স্ত্রীর রজোদর্শন ঘটবে, তখন স্বামীর কর্তব্য কি হইবে? বোড়নবর্ষ বরণের আগে ত তিনি স্ত্রীর পর্ভাধান করিতে পারেন না। তবে কি তিনি চারি বৎসর পর্যন্ত রজবলা স্ত্রীর নিকটস্থ হইবেন না? তাহা হইলে,—বর্ষব্যস্তের অসুখা অবহেলার নিমিত্ত পারলৌকিক পাপের কথা (১) দূরে থাকুক,—স্ত্রীর অবস্থা কি হইবে? “বিবাহরত্না” মঙ্গল্যকার হইলেই কি তাহার “স্বভাব হুলত কামনার” পরিপূরণ হইবে? অথবা স্বামী দর্শ ও লোক উভয়ই নিশ্চিত অসময়ে স্ত্রীর সখীগহ হইবা বুঝা নিম্নের ও স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করত বর্ধহীন ও

চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্বিত হয় নাই। কালের গুচিত চক্রবর্তী, বহুজেন্দাল সরকার, কোয়ার, ইউগার্ট বর্দান ডোমার, সিম্ব, প্রমুখ অর বৈদ্য সৈন্য চিকিৎসক বহুবিধ অসুখবাদের পর বলিষ্ঠাছেন যে এদেশে বালিকাদিগের যে অর বয়সে রজো দর্শন ঘটে, তাহা সন্নিবিষ্টতা বালা বিবাহের ফল, অর বাহু তাহার অর দ্বারা নহে।

(৮) বাহিণ্যবৎসর্য্যদুর্ভাগ্যকালং নবাঃ স্ত্রিঃ।

নাসি বাদি তপসারো প্রভৃতিস্বার্থবাঃ প্রবেশঃ। বাণ্ডতঃ।

(৯) কতঃ সাত্যক্ যো কথ্যাঃ পরিবো নোপগচ্ছতি।

যোহাঃ সাত্যক্ যো কথ্যাঃ যোহাঃ সাত্যক্। পরাশর, ৪র্থ অধ্যায়, ১৪৭ শ্লোক।

যে, পুত্র এবং অজাত স্ত্রীকারও সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। আশা। হ্রাস সন্দেশ-হেতু কেবল কলিকালের বন পদক পরামে বহির দাক্য উদ্ধার করিতেছি।

ও দুর্দল হইবে? আবার তাহা হইলে—কবিরাজ মহাপদ-কথিত বশুমতীনাথার নিবরণাধা বালিকা যুগপৎ অথবা বক্তৃতাধা আক্রান্ত হইবে! অবিবাহিতা অথবা অজাত-বহুতা বালিকার কদাপি বশুমতীনাথ হইতে পারে না। অতঃপর বশুমতীনাথ-প্রদত্ত অশুমতীনাথ বালার ভাবনা বশুমতীনাথ ও অশুমতীনাথ। কিন্তু জাতাবান নারীজনের পক্ষে এবং তৎকাল বশুমতীনাথ-নিবৃত্তি বশুমতীনাথ-কৃত সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন। কলকাতা, ছাদপর্বতীনাথ বালার যদি বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি বশুমতীনাথ কি কামশাস্ত্র, এবং কি আত্মজ্ঞেয় কেহই তাহার বোড়শাগেকা অল্পবয়সে বাসিলমাগম নিবেদন করিতে পারেন না এবং কোন শাস্ত্রই একশ অশুমতীনাথ দেয় নাই।

কবিরাজ বৈষ্ণব মহাপদ আমাদেরই দ্বারা পরম্পর অধিকারি আদিষ্ট পৌরী ও গোহীনাথ বিবাহের সমর্থন করেন না,—তিনি দুইজনকে কলকাতা বিবাহে দাতা গ্রহীতার পাণপাক করেন না, বিবাহিতা বালিকার নাসিকদ্বার্য বার্ষিক প্রদত্ত করণ করেন না,—তখন তিনি কেন যে ছাদপর্বতীনাথ বালিকার বিবাহ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাহা আমাদের বুঝির অপমা, “বিবাহ” সংস্কার-কালে উচ্চারিত মন্ত্র অথবা তৎকালে প্রচ্ছন্নিত অগ্নির একশ কোন অনৌকিক শক্তি নাই, বহুতারা নরনারীর স্বাভাবিকী প্রেমজন প্রকৃতিকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে। সেই অশুমতীনাথ, কামশাস্ত্র ও আত্মজ্ঞেয়,

পর্জাপানযোগ্য বয়সেই নারীর বিবাহকাল স্থির করিয়াছেন। বিবাহের পর ত্রিরাত্র ত্র্যম্বকো জাত পালন করত বামী দ্বার সহ সমস্ত হইবেন, ইহা (একমাত্র গোষ্ঠিল ভিত্তি) সমস্ত গৃহস্থকারণে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, শ্রী বাসিন্দা সমস্ত না হইলে বাসিন্দাগোষ্ঠীতা পর্যন্ত প্রাপ্ত হন না (১০)। একশ হলে, কবিরাজ মহাপদের কথিত নিয়ম কখনও সমাজে চলিতে পারিবে না। যদি ছাদপর্বতীনাথ বালিকার বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোড়শ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তাহার দুই একটি সম্ভাবনা লাভ অনিবার্য; এবং মহাজানী, মহাবুদ্ধি, আত্মজ্ঞেয়গোষ্ঠীনাথ আশঙ্ক্য করিয়া অত্যন্ত বালার পর্জাপান নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রবর্তিত হইবে। হইবে কেন,—বর্তমান সমাজে অশুমতীনাথ বোড়শ বর্ষ বয়সের পূর্বেই একাধিক দুর্দল ও কর পুত্র কলকাতা জননী হইয়া নানাক্রম দ্বারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তীভূত অবস্থার জীবন, তৎকালে জীবন বাপন করিতে দেখা দাইতেছে। অতএব যদি প্রকৃতই হুহ ও বলিষ্ঠ সম্ভাবনের কামনা থাকে, তাহা হইলে পর্জাপান কালযোগ্য বয়সেই অর্থাৎ বোড়শ বর্ষ বয়সে বা তাহার পরেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। তাহার পরেও দুই এক বয়স ত্র্যম্বকো করিতে পারিলে উত্তম হয়; না পারিলেও তত ক্ষতি নাই। আমরা “আত্মজ্ঞেয় প্রতিকার” এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি; এখানে আবার তাহার পুনরুক্তি করিয়া ছাদ ও কালকর্য করা অনাবশ্যক।

(১০) বিবাহে ঠিক বিবৃতি চতুর্থেই দৃষ্টি রাখি।

একশ: নাসিকা তর্জ: পিণ্ডে পেন চ পুত্রকঃ।

চতুর্থা বোমবস্ত্র বহুতালে জ্বলন্তিহিঃ;

তর্জী নাহুতান্তে পতী তর্জী নোমী তেন শা তবৎ। তবৎবৎ তর্জী বৃত্ত দাসবস্ত্রভিচয়ন।

এই আলোচনার কলে আমরা পাই যে, রাজবি হুজুত "অধাটন...  
.....বোড়নবর্ষাং পরীয়াবহেত" লিখিত-  
ছিলেন; পরে সময়ের পরিবর্তনে আমাদের  
দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন বাধা হইয়াই সামাজিক-  
বিশ্বকে অত্যন্ত-বালা-বিবাহ প্রচলিত করিতে  
হইল,—ভীষণমিগকে হুজুতঃ বর্ষপাত্রেয়  
অহুজাও রচিত হইল; কারণ, এদেশের  
লোক বর্ষপাত্রেয় অহুজা ভিন্ন সামাজিক  
বিষয়ের পরিবর্তনে প্রোক্ত নহে। তাই,  
পরামর, লম্বাশাতপ, প্রমাণতি, অন্ধিরা  
প্রভৃতির নাম করিয়া অরহাঃ মরিকা শিশুর  
বিবাহের ব্যবস্থা প্রদীত ও প্রচারিত হইল;—  
দুইহুজার দাতা গ্রহীতার অল্প নানাতপ  
নরকবাসের ও সামাজিক শাস্তির ভয় দেখান  
হইল এবং সেই সময়েই শাস্ত্রের মিল রাখি-  
বার অহুরোধে হুজুতের "বোড়নবর্ষাং"  
কাটিয়া "দাদনবর্ষাং" লেখা হইল। হুজুত-  
সাহিত্য যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ,—উহার যে  
একাদেশের সহিত অস্ত্রাংশের সন্ধ আছে,  
তাহাত অর্ধগণিতগণ বুঝেন নাই,—হুজুতঃ  
ঐ প্রক্ষেপের কলে এক প্রকাণ্ড মারাত্মক  
অবিরোধের সৃষ্টি হইল! এখনও যে ঐ  
প্রক্ষেপ বচনকে অবলম্বন করিয়া রাজবিহ-  
জুত উদ্দেশ্যকে বিকল করিবার চেষ্টা হইতেছে,  
ইহাই বিশ্বের বিষয়। তদুপা করি,  
সামাজিকগণ ও প্রবন্ধলেখক মহাশয় এ  
সম্বন্ধে প্রবিধান করিবেন।

সুগণিত প্রবন্ধ লেখকের শুভ উদ্দেশ্যের  
সহিত আমরা একমত বলিয়াই তাঁহার  
লিখিত প্রবন্ধের এই আলোচনা করিতেছি;  
নচেৎ ধীহার "অটবর্ষা পৌরীঃ" বিবাহ দিবার  
নিষিদ্ধ ব্যক্ত এবং সীতা, সাবিত্রী, কালিনী ও  
দময়ন্তী প্রকৃতি দেবীসমূহের দৃষ্টান্ত হুৎকারে

উড়াইয়া বেন, তাঁহাদের সহিত বিচারে কোন  
কল নাই। তিনি প্রবন্ধলেখক যে বলিয়াছেন,  
—"বৃষক বৃষতীর বিবাহ-বানের চেষ্টা না  
করিয়া বেগে বাহাংতে বখারীত অশ্চর্যা প্রতি-  
পালিত হই, অশ্চর্য্যোয় অশ্চর্য্য বিলাপিতা বৃষ  
হই, অশ্চর্য্যোহুজুল আহার বিহার গৃহীত হই,  
তাঁহার চেষ্টা ও আলোচনা করিলে বরং অধিক  
হুৎকারে আশা করিতে পারা যায়," ইহা বড়ই  
দুঃখানু। আমাদের হৃদয়ে, অর্থাৎ বৈদিক-  
কাল হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্তের কাল পর্য্যন্ত  
এই প্রকার চেষ্টাই হইত। বেদে, গৃহসূত্রে,  
শ্রুতিতে, পুণ্যে, ইতিহাসে, কাব্যে, নাটকে,  
কথাগ্ৰন্থে,—অর্থাৎ আর্য ও অার্য সাহিত্যের  
সর্বত্র, এই চেষ্টার দ্বারা পাইই রহিয়াছে।  
বর্ষশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও আত্মকর্মে এই চেষ্টাই  
অম্ব্যস্তা। প্রাচীন ভারতেই বর্ষ, অর্ধ এবং  
কাম এই ত্রিবিধের বখারীতি পরম্পর অহুজুল-  
ভাবে অহুজান হইত। হুৎকারে সেমটিক অস-  
ত্যতা প্রলয়ের বস্ত্রের মত আশিয়া আমাদের  
সর্বত্র ভাসাইয়া দিয়া আমাদের সর্বত্র  
দরিজ করিয়াছিল। সেই সর্জনবর্ষাত হইতে  
আমাদের উপায়ান্তর না দেখিয়া হুদী  
সামাজিকবর্গ নিত্য ভীতিবিহ্বল এবং উত্তির-  
চিহ্নে সংকোচন-প্রধান কুদনীতি অবলম্বন  
দ্বারা কথকিং এ জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া  
দিরাছিলেন। তাই,—বৃষীষ পাক আরজ  
হইবার পর হইতে আমাদের শাস্ত্রে সর্জনপ্রকার  
সংকোচন-নীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া  
যায়। তাই, অসত্যভাতির ভিতরও যে সকল  
ঐতিহাসিক ও অহুজুল বিবিধবস্থা নাই,—  
আমাদের সমক্ষে তাহাও রহিয়াছে। তাই,  
আমরা এই প্রকার আবলম্বনশূন্য, নিরুৎসাহ,  
দুর্জল এবং বৈষম্যবাহ কপুতল জাতিতে  
পরিণত হইয়াছিলাম।

সৌভাগ্যবশতঃ এখন সে অন্ধকার দিগাচ্ছে।  
 যুরোপের শিক্ষাব্যবস্থার প্রোচ্ছল আলোকে  
 আমরা স্বতীতকালের প্রকৃতলভ্যতার শাস্ত্র-  
 পাঠ করিতে শিখিয়াছি। আর্থালমাজ সেই  
 শাস্ত্রশাস্ত্রের প্রথম কল এবং আর্থালমাজ  
 উহারই পরিণতি। আর্থালমাজ ভারতের  
 সনাতন বেদ ও ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা করিতে  
 কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্তিত  
 শুক্লকুল এবং কল্যাণমহাবিশ্বালয় ভগ্নতে নৃতন  
 যুগ আনয়ন করিতেছে। বিজ্ঞা যে কেবল  
 বিজ্ঞার নিমিত্তই অর্জনীয় তাহা ভুলিয়া  
 বিজ্ঞাকে আমরা কলমার দাগে নিমুক্ত  
 করিয়াছিলাম,—আর্থালমাজের প্রতিষ্ঠাতা।  
 যুগ্ম শ্রীমদ্রামানন্দ সনাতন বামিণাদ আমাদের  
 সে স্রম তাড়াইয়া দিয়াছেন। শুক্লকুলের  
 শিক্ষার পদ্ধতি দেশীয় ও বিদেশীয় যুগপের  
 সাগ্রহে গৃহীত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।  
 বোলপুরের ব্রহ্মবিজ্ঞালয়েও পরমার্থসাধিকা  
 বিজ্ঞার আরাধনা হইতেছে। ব্রহ্মচর্যের  
 পৌরবসীতি কাড়ী, বৃন্দাবন ও জালন্ধর  
 হইতে বহুদেশ পর্য্যন্ত সর্বত্র গীত হইতেছে।

বেদের আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য, স্মৃতির কথিত ব্রহ্মচর্য,  
 আত্মকর্মেদের অল্পমত ব্রহ্মচর্য পুত্র এবং স্ত্রী  
 উভয়েই পালন করিতে শিক্ষা করিতেছেন।  
 (১২) আমরাও এই ব্রহ্মচর্যের, বিজ্ঞাপিকা,  
 সৎসম্পালনের পক্ষপাতী। স্বামনবদীয়া বালি-  
 কার বিবাহ বিধা তাহার ব্রহ্মচর্য হানি করা  
 কাহারও উচিত নহে। যে বালিকা সাত্ত্বিক  
 ব্রহ্মচর্য ব্রত বিধিমত পালন করিয়া পরা এবং  
 অপরাধিষ্ঠার আরাধনায় রত থাকিবেন,—  
 অপরিশিখাত্তপিনী তেজস্বিনী সেই পতিমতীর  
 হৃদয়ে সূত্র ইঞ্জিরদৌর্লভ্য কহাপি ঘনিত্তেই  
 পারে না; আর যদি কোন দুঃস্বাদ দুর্ভিক্ষ-  
 বশতঃ তাহার বন্ধনাপন করিতে অগ্রসর হয়,  
 তাহা হইলে, ব্রহ্মজীর আক্রমণকারী ব্যাধের  
 স্রাব অথবা মহাবেতার আক্রমণকারী বিজ-  
 বদ্ধ বৈশম্যপায়নের স্রাব তাহার নাস  
 অবস্তাবাহী। বিজ্ঞানতী ব্রহ্মচারিণী বালার  
 চরিত্রচ্যুতির আশঙ্কা নিতান্তই অদ্ভুত।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

ভারতীকুপন।

(১২) বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গ বহু বিধিত। যেমনশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে “ব্রহ্মচর্য-  
 প্রতিষ্ঠায়া বীর্ণ্যাতঃ।” চরকশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

পুণ্যতপাৎ প্রকর্ষকঃ স্রাবাণিগ্রন্থনম্।

উত্করমদুতঃ শিবঃ পরশাস্বাতঃ যতঃ।

মোতুর্যোগ্যপদ্যারিতুঃ প্রকাশ্যমিতুঃ চ।

এতাদৃশপ্রার্থন্যঃ ব্রহ্মচর্যম্।”

পুত্রদের স্রাব কল্যাণ পক্ষেও ব্রহ্মচর্যেরই বিধি বলা “ব্রহ্মচর্যেপকর্তা দুবানঃ বিন্দতে পতিম্।” অর্ধকর্মে  
 ১১শ কাণ্ড। ২৪ শ প্রশ্নার্থক। ৪৪ শ্লোক। ১৮শ মতঃ।

“মহানির্গণ্যতত্ত্ব “কল্যাণোপপালনীয়া শিকরীমতি যতঃ।” এবং

“অজাত পতিমর্ধ্যাসমাজাত পতিসেবনাম্।

সোদ্যোহেতৎ পিতা বাদ্যঃ অজাত বর্গ্যপদ্যম্।”

অষ্টমউদাসে দিবিজা

ব্রহ্মচর্যের ও শিক্ষার সর্ব্ববিধ করিয়াছেন।

## বঙ্গে রেশম ও রেশম শিল্পের অবনতি ও

### তৎ সম্বন্ধে নানাকথা

( ১ )

ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় প্রাচীন ভারতবর্ষ ও চীন দেশ রেশম ও রেশমী বস্ত্রের আদি ভয়ঙ্করি। হিন্দু শিল্পীগণ রেশম প্রস্তুত ও তৎকাণ্ড রেশমী বস্ত্র বহন করিয়া দেশ বৈদেশ্যে বিক্রয় করত একসময় বিশেষ লাভবান হইরাছিলেন। বঙ্গদেশ এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি ছিল। একদিন তথায় অসংখ্য শিল্পীগণ কার্পাস সূত্র, রেশম ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত কর্যে সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই সকল বস্ত্রাদি তৎকালের সভ্যদেশ সকলে বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হইরাছিল। সেই সেই দেশের অধিবাসীরা এই সকল বস্ত্র পরিধান করত একদিন যৌর যৌর লজ্জা-নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। হিন্দুরা মূল ও স্থল বাণিজ্যদ্বারা একদিন প্রচুর অর্থ-রাশি উপার্জন করত আপনাবিশেষ ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বকালে এনিয়া ও আফ্রিকার উপকূলস্থিত সভ্য রাজ্য সকলে এই ব্যবসার বিশেষ অবনতি ঘুট হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ বস্ত্রের প্রধানভূমি বন্ধ হইল। তথা হইতে শত শত বাণিজ্য-পোত বস্ত্রের পণ্য সত্তার লইয়া সিংহল, কাম্বোজ, চীন, জাপান, আফ্রিকা প্রভৃতি দূরদেশে গমনাগমন করিত। যে দিন বাণিজ্যস্রোত পরিপূর্ণ বস্ত্রের পোতমালা বিদেশে প্রেরিত হইত সেই দিন বঙ্গ বণিক-গণ বঙ্গদেশের পুজা করিয়া মল্লপথের

দ্বিগুণা মুক্তির প্রার্থনা করিতেন। যজ্ঞ ধূমে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হইত। হিন্দু রমণীগণ নানা বৈশিষ্ট্যবান অলঙ্কার হইয়া কক্ষে পূর্ণ কলস লইয়া হালু ধান দ্বারা মূল্য জ্ঞাপন করিতেন। লালবর্ণ দ্বারা শুভচিহ্ন প্রদর্শিত হইত। নৃত্যঙ্গীল তরিমালা নবীন ক্রোড়ক বহুদ্রিত করত জাতীয় কেতন যৌর যৌর যজ্ঞকে ধারণ করিয়া মনোহর বেশে বিদেশে প্রেরিত হইত। পণ্যসত্তারের ভিতর রেশম, রেশমীবস্ত্র কার্পাসসূত্র ও কার্পাস-বস্ত্র প্রধান। সিংহলের সহিত বস্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল। হিন্দু বাণিজ্যতরঙ্গীণালি সিংহল অতিক্রম করিয়া আরব সাগর পার হইয়া আফ্রিকার পূর্ণ-উপকূলে লোভিত সাগর অতিক্রম করত স্থলভ্য মিসরবাজার বন্দরে উপস্থিত হইত। ইমিত্রা, দাবৌপ, চীন, ও জাপান প্রভৃতি দেশেও এইরূপে হিন্দু বাণিজ্য তরঙ্গীণালি বাণিজ্য-সত্তার লইয়া অর্থোপার্জন করিতে বিরত ছিল না। মিসরের টায়র নগর ইউরোপীয় বাণিজ্যের মাতৃভূমি ছিল। তথা হইতে ইটালীর ভেনোভা ও ভিনিসের বণিকেরা ভারতবর্ষের রেশম রেশমী ও কার্পাসবস্ত্র ক্রয় করিত। রোমীয় বরাদ্দনারা সমপরিমাণ স্বর্ণের ওষনে রেশম ও রেশমী বস্ত্র ক্রয় করিয়া ক্রীষকের শোভা সম্পাদন করিতেন। তিনি ও ভেনোভার বণিককুল টায়রনগর হইতে উক্ত বস্ত্র ক্রয় করিয়া সমস্ত ইউরোপে বস্ত্র বিক্রয় দ্বারা প্রচুর লাভবান হইতেন।

মূলপথে পারন্ত ভুক্ত দিগা হিন্দু ও মুসলমান  
 স্থানবিশিষ্টগণ ভাষ্যেতঃ অত্রাণ্ড পথা ভ্রব্যের  
 সতিত বৈশম্য ও বৈশম্যবস্ত্র রূপ করিয়া: অশ্ব  
 ও অশ্বস্তর সঙ্গযোগে মিলনের টাঙ্গন নগরে  
 বিক্রয় জন্ত লইয়া হাইত। এবং তাহা  
 বিক্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান  
 হইত। এইরূপে জল ও মূলপথে ভারতের  
 বৈশম্য বৈশম্য বস্ত্র এলিয়ার নানাস্থানে ও  
 আফ্রিকার সত্তা বৈশম্য লকলে ও তথা হইতে  
 ইউরোপের প্রাচীন রাজ্যগুলিতে প্রেরিত ও  
 বিক্রীত হইয়া প্রচুর অর্থ একদিন বঙ্গের  
 ধনাগার পরিপূর্ণ করিত। মহাবীর আলেক-  
 সাণ্ডর কর্তৃক টায়র স্বদেশের পর উহা  
 কর্তৃক সংস্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীই  
 উক্ত টায়র নগরের স্থান অধিকার করিয়া  
 ইউরোপের সহিত ভারতীয় পথা ভ্রব্যের  
 ব্যবসা চালাইয়া সমৃদ্ধি অঙ্গীকর হইয়াছিল।  
 প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের সময় হইতে মুসলমান  
 রাজবংশের শেষাবস্থা পর্যন্ত এইরূপ বাণিজ্য  
 দ্বারা বঙ্গদেশের ধনাগার বর্ধিত। হিন্দু ও  
 মুসলমান রাজ্যগণ ব্যবসা কার্যে হস্তক্ষেপ  
 করাকে পাপ মনে করিতেন। বরং প্রজাদের  
 এইরূপ ধনাগার সঞ্চয় বিশেষরূপ সাহায্য  
 করিতেন। তৎকাল বঙ্গের প্রজাজ্ঞেয়ী  
 ভিতর অমিত ধনশালী বহুস্তর বণিকজ্যেষ্ঠ  
 কুবেরের দ্বারা অসীম ধনে আপনাদের ধন-  
 ভাণ্ডার সঞ্চয় পরিপূর্ণ রাখিয়া অযোগ্য  
 প্রাপ্ত হইতেন। মুসলমান রাজবংশের শেষা-  
 বস্থায় মুর্শিদাবাদের শেঠ বংশীয়গণের অসীম  
 ধনবস্তুর বিবরণ কাকারও বোধ হয় অবিদিত  
 নাই। বর্তমান ধনকুবের রথ চাইন্তবংশীয়গণের  
 দ্বারা উহারও অমিত ধনশালী ছিলেন।  
 বঙ্গের নবাব ও দিল্লীর সম্রাটগণ সময় সময়  
 উর্দাবিশেষ নিকট কণগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয়

অভাগ মোচন করিতেন। বৈশম্য, বৈশম্য-  
 বস্ত্র ও কার্পাস-বস্ত্র ও কার্পাস-বস্ত্রের  
 বাণিজ্যই উহারদেব ধনাগারের প্রধান কারণ  
 ছিল। উহারদেব বাণিজ্যভরসী তৎকাল-  
 পরিচিত বৈশম্য মহাধনে বাণিজ্য ভ্রব্যে  
 পরিপূর্ণ হইয়া হিন্দুগোত্রব রক্ষা করিয়াছিল।  
 তাহা সেই শুভদিন স্মরণ করিলে আজও জনর  
 আক্সাদে নৃত্য করিয়া উঠে। এবং বর্তমান  
 দুঃস্বপ্নের সতিত সেই পূর্ব সৌভাগ্যের তুলনা  
 করিলে এক মস্তকোদী দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হয়।  
 জনর নোক দুঃখে অবলম্ব হইয়া পড়ে।

( ২ )

অক্সাদে পশ্চিমদগনে একবিম্ব কাল  
 বেখের সকার হইল। ক্রমে ক্রমে সেই  
 নীরবজাগ বহুভারতন হইয়া সমগ্র ভারত-  
 বর্ষকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কড় কড়  
 শেষে বঙ্গপাত হইতে লাগিল। উদুখল  
 প্রবল বায়ু প্রবাহে বৈশম্য মহাপ্রলয় উপস্থিত  
 করিল। চকিতে বাঙ্গালী ভাষা অশনিপাতে  
 বিদার হইয়া পেল। উহারের স্ববস্তু ভয়  
 হইল। ধীরে ধীরে নাবিক ভাষ্যোতি গায়া  
 পঞ্চম শতাব্দীতে আবিষ্কা পরিবেষ্টন পূর্বক  
 ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত করিলেন। উহার  
 নিবর্তিত পথে ক্রমে ক্রমে পটুগিজগণ ভারত-  
 বর্ষে বাণিজ্যার্থে ধাবমান হইল। এবং  
 কিছুদিনের মধ্যেই উহার বঙ্গদেশে বাণিজ্য-  
 গার স্থাপন করিয়া ফেলিল। উহার  
 তুলিয়াছিল বঙ্গদেশ স্বর্গপ্রস্থ। উহার কেন্দ্রে  
 কেন্দ্রে সোণা ফলে। নহী সিকতার উজ্জল  
 স্বর্গপ্রস্থ দীপ্তি পায়। কামবেছে ধলে ধলে  
 হৃদযাত্রা প্রধান করে। নিবিড় অরণ্যানী  
 পত পক্ষীতে পরিপূর্ণ। হুতরাং নোভাকট  
 চিত্তে উহার সেই শোণার বাংলায় বাণিজ্য-  
 গার স্থাপন করিল। বনহরিণী নাকিপয়ে

স্বপ্নময় ধারণ করিয়া এতদিনে খাঁর বুড়াকে ডাকিয়া আনি। পটুপিগ বণিকগণ সতীর পরিচয় ও দৃঢ় অধ্যবসায় বলে বস্ত্রের বহির্জগৎবিজ্ঞা বহুল পরিমাণে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিল। উদাহরণের উদ্ভূতি দূরে ওলন্দাজ, সিনেদার, ফরাসী বণিকগণ বৎ রকালের একে একে দর্শনদান করিতে বিরত রহিল না। যেখানে যেখানে ইট ইতিহাস কোম্পানী নামক এককল ইংরাজ বণিক অর্ধ-প্রস্থ বস্তুকৃষিতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের সহিত প্রবল প্রভি-ষম্বিতার অপরূপ ইটরোপীয়গণ মিশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে পরিচালিত হইল। ইংরাজ বণিকগণ বাঙ্গালার ভিতর হুগলী, কামি-বাঙ্গাল, হুতানী প্রভৃতি স্থানে আপনাদের বাণিজ্যালয় নির্মাণপূর্বক বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট পণ্যাদি গ্রহণ করিয়া স্বদেশের পণ্যব্যা-হায়া বস্তুকৃষিতে সমাবৃত্ত করিবার পথ নির্দেশ করিতে মন দিলেন। অল্পদিনের পর বিখ্যাত নির্দেশ অফিসের তাঁহারা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। হাথ সেই অল্পগ্রহ প্রার্থী বণিক সমুদায়ই তারতের বর্জ্য কর্তা বিবাহ্য হইলেন। প্রবল রাজস্বতির সহিত তারতের অর্থ ও বহির্জগৎবিজ্ঞা তাঁহাদের হস্তে মিশ্রিত হইল। যখন বণিক উৎসাহ কোম্পানী তারত-সিংহাসনে উপবেশন করেন নাট তৎপূর্বক তাঁহাদের কামিবাঙ্গালারের কুঠীতে রেশম ও রেশমী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ক্রীত হইয়া ইউরোপে পরিচালিত হইত। ধীরে ধীরে এই রেশম-বাণিজ্য হিন্দু ও মুসলমানগণের হস্তচ্যুত হইয়া উদাহরণ হস্তে পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎসম-কালে এই মুরশিদাবাদ সহরের নিকটে ফরাসীদিগেরও এক বাণিজ্য কুঠী বিদ্যমান

ছিল। ঐ কুঠীরের ভগ্নাবশেষ মাতা ভাঙ্গিরাই ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার চিহ্নমাত্র নাই। এইরূপে ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ নানা স্থানে কুঠী সংস্থাপন করত বস্ত্রের উৎপন্ন রেশম ও রেশমী বস্ত্র ক্রয় করিয়া উহার বহির্জগৎবিজ্ঞা নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মুরশিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলায় রেশম কুঠী প্রস্তুত করিয়া আপনাদের বেশ হইতে বিচক্ষণ কর্মচারী আনয়ন করত গুটীপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বেশীর রেশম তোলা কলগুলি একে একে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইল। হুতগ্রাৎ অল্প দিনের ভিতর কাঁচা রেশম প্রস্তুত করিবার কার্যেও তাঁহাদের হস্তে পতিত হইল। মুরশিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় উক্ত কোম্পানীগণ রেশম কুঠী প্রস্তুত করিয়া পুরাণময় কার্য চালাইয়া যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিলেন। মুরশিদাবাদে ফরাসীদিগেরও রেশম কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। বীরভূমের অথবা রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত পট্টয়া গ্রামে ল্যারেন মার্শেল কোম্পানী একটা বিরাট রেশম কুঠী প্রস্তুত করিলেন। ফোটাঙ্গর, ভরপুত্র, তারাপুত্র প্রভৃতি গ্রামে উহার এক একটা শাখাকুঠী স্থাপিত হইল। সকল-গুলিতে রেশম তোলা কার্য অস্থব্রহ্মণে চলিতে লাগিল। কোম্পানীগণ বস্তুবিশেষ অনেক জেলায় এইরূপে কাঁচা রেশম প্রস্তুত



করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে লাগিলেন। মূর্খনির্ধাবাক তেলাতেও দুইটী গ্রাম রেশম কোম্পানী আপনাদের অনেকগুলি রেশম কুঠী স্থাপন করিলেন। একের নাম হোজ কিনেচোর ফনলেট, ইহাদের সমস্ত আফিস রাখনগর। দ্বিতীয়ের নাম জুপেনে এও কোঃ। সমস্ত আফিস বহরমপুর। প্রথম কোম্পানী ইংরাজ, দ্বিতীয় কোম্পানী ফরাসী জাতীয়। ইহারা বঙ্গের রেশম কারখানার কাটা রেশম তুলিয়া বীর অম্বুজি ফ্রান্স দেশের ভাঁতে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া এক সময় প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন। উক্ত বাবলা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এইরূপে মূর্খনির্ধাবাক, বীরভূম, মালদহ, রাজ-সাহী জেলায় পূর্কোক্ত কোম্পানী ও অন্যান্য ইংরাজ বণিকগণ রেশম কুঠী স্থাপন করতঃ কাটা রেশম প্রস্তুত করাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিক অর্থাৎ রেশম তোলা কলগুলি একে একে উঠিয়া-সিরাহিল। অথবা বাহাছিল তাহা নিত্যই নিশ্চরভাবে দুই এক গ্রামে চলিতেছিল মাত্র। কলকথা শুণীশোকা হইতে রেশম তোলায় কাঁচা ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ আপন আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং উহার বিহীনগণিষ্ঠাও বহুদিন হইতে চালাইয়া আসিতে ছিলেন। এই দুই পথই তাঁহাদের অবিকৃত হওয়ার দেশীয়গণের সর্জনগণ ঘটাইয়াছিল। রেশম ব্যবসার অধিকাংশ লাভই তাঁহাদের হস্তে পতিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে যে প্রাথমিক শুণীশোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হইত ইহাধিগণের দ্বারা সেই প্রাচীন প্রথা কিয়ৎ-পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া নূতন কৌশলে রেশম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত

উপায়ে উক্ত রেশম প্রাচীন রেশম হইতে স্বল্প ও উচ্চল হইয়াছিল। তদন্ত প্রাচীন দেশীয় রেশম তোলা চোরিকগুলির দ্বারা দীর্ঘ গুচ্ছের অবনতি হইতে আরম্ভ হইল। হুতরাং বঙ্গের প্রায় সমস্ত শুণীশোকাগুলি উক্ত কোম্পানিগণ দ্বারা করিয়া আপন আপন কুঠীতে কাটাইয়া উহা হইতে কাঁচা রেশম তোলাইতে লাগিলেন।

( ৩ )

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বীরভূম জেলায় মার্শেল কোম্পানি গুণীয়া, ভদ্রপুর, কোটাপুর এবং তারাপুর নামে এক একটী রেশম কুঠী প্রস্তুত করেন। কিছু দিনের পর তারাপুরের কুঠীর কার্য বন্ধ হইল। গুণীয়া, ভদ্রপুর, কোটাপুর এই তিনটী কুঠীতে কার্য চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য গুণীয়া কুঠীর অধীনেই উক্ত শাখা কুঠীগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। সকল কুঠীর মালিক মার্শেল কোম্পানি। গুণীয়া রেশম কুঠী অতি বৃহৎ ছিল। সর্বদাই লোকজন পরিপূর্ণ থাকিত। বেড় হাকার দুই হাজার কুলী প্রত্যাহ ইহার কার্য চালাইত। বঙ্গের সময় যখন সমস্ত কলগুলি চলিতে থাকিত তখন আরও কুলির প্রয়োজন হইত। দুইজন ইংরাজ কৰ্মচারী সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। তদধিন যেওয়ান গোমস্তা মহরী প্রভৃতি নত নত কৰ্মচারী সাহেবদের অধীনে কার্য করিত। যেওয়ানজীর বেশী বেতন ছিল। নত নত দালাল রাশি রাশি শুণীশোকা লইয়া সর্বদাই কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিত। নতনত মহর দ্বারা উক্ত শুণীশোকা বাহিত হইত। অত্যন্ত নলে বহলায়ের বুয়রাশি বহির্গত হইয়া আকাশকে বুয়র করিত। ইহাদের কন্ঠকনি কর্ণে অবিরত প্রবেশ করিত।

বীরভূমের প্রবাসী তটিনী বিপুলভাণ্ডা মোরাকী-  
নদীর তীরে এইরূপ এক বিরাট রেশম কুঠী  
সম্পন্ন হই বোখামুন্ডার স্বপ্ন স্বপ্ন নক্সে প্রতি-  
ফলিত, কলম্বুধনে পলিত এবং জনকোলা-  
চলে কলোপিত ছিল। উক্ত কোম্পানি  
বহুদিন হইতে এই রেশম কুঠী স্থলিয়া ছিলেন।  
তাহারা এই স্থানে একটা সব পোষ্টাকিস্,  
একটা মাইনর কুল বলাইয়া ছিলেন এবং  
ছোট খাট একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ও  
উদ্যত সক্রিয় সংমিলিত ছিল। জানিনা চঠাৎ  
সপ্তদীয়ার ভাগ্যগণন দাক্ষণ অপরিশোধিত বিদীর্ণ  
হইল কেন? কোথাও কোনও জল্পনা  
কল্পনা নাই চঠাৎ বিলাত হইতে হুতুম  
আসিল কুঠী বন্ধ কর। সমস্ত দেশীয় কর্ম-  
চারীগণ ও কুলীয়জীবেরা এই সংবাদ প্রবণে  
ভীত ও ক্ষুব্ধ হইল। সকলে মনে মনে  
কল্পনা করিল এসংবাদ মিথ্যা। কুঠী কি  
বন্ধ হয়? কিন্তু হাথ উহারের স্থানিণী  
প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কুঠেলিপূর্ণ রূপের দিবস  
সমুদ্রে আগত। পরে তাগরা বুকিল সংবাদ  
মিথ্যা নহে প্রকৃত, স্থিরসত্য। বিলাতের বড়  
সাংসদের হুতুম কুঠী উঠাইয়া দিতে হইবে।  
কায় এতদিন ১৮১৫ শত কুলী মজুর পুন্-  
নৌজাদিক্রমে তথায় প্রতিপালিত হইত।  
ইহারা রেশম কুঠীর সক্রিয় স্থানে গৃহাদি  
প্রস্তুত করিয়া অতি সুখে সময় কাটাইত।  
রেশম প্রস্তুত ভিন্ন ইহারা আর অন্য কোন  
কার্য করিতে জানিত না। ব্রহ্মদ্য ছায়ায়  
থাকা হেতু রোমন্থে থাকিয়া কণকালও  
পরিগ্রহ করিতে পারিত না। তাহাদের  
পক্ষে আশ কি সুখ-বাদ। সুহৃৎের ভিতর  
উহার পথের তিথ্যারী হইল। সপ্তদীয়ার  
সক্রিয় অনেক তত্ত্বগম্যর শিক্ষিত ও অর্ধ  
শিক্ষিত ব্যক্তিরা পুঙ্খবান্ধবক্রমে এই কুঠীতে

চাকরী করিয়া বসে সংসারযাত্রা নির্বাহ  
করিতেছিলেন। কুঠীর দেওয়ানী উক্ত  
বেতন লাভ করিয়াও মানে মানে মস্তুরী  
সাবিতে অনেক টাকা উপার্জন করিতেন।  
তাহার পক্ষে আশ কি সুদিন উপস্থিত হইল।  
এক কথার বলিতে গেলে উক্ত রেশম কুঠী  
উঠিয়া বাওয়া হেতু সমস্ত বীরভূমের গুরুতর  
ক্ষতি হইল। ক্রমে ক্রমে আমি উহা বিবৃত  
করিতেছি। কুঠী উঠাইয়া দেওয়ার সম্বন্ধে  
সাংসদের নিয়মিত কয়েকটা কারণ নির্দেশ  
করেন।—“এ সকলে আর রেশম গুটী ভাল-  
রূপ দিতেছে না। তৎকর্ত্ত উহার দর খুব  
বাড়িয়াছে। লওনের বাজারে অত্যন্ত  
বেগের রেশম যে দরে বিক্রীত হয় এখান-  
কার প্রেরিত রেশম সে দরে বিক্রয় করিলে  
কিছু মাত্র লাভ থাকে না। তৎকর্ত্ত ক্রমশঃ  
ক্রমশঃ কতিয়ত্ত হইয়া উক্ত কোম্পানীগণ  
এ বেগের সমস্ত রেশম কুঠী উঠাইয়া বিলেন।  
চীন ও জাপানের কৃত্রিম রেশমের কাটতি  
বেশী হওয়াও ইহার অবনতির একটা প্রধান  
কারণ। যেমন কৃত্রিম নীল হইয়া নীলকুঠীর  
সাংসদের নীলের চাহ বন্ধ হইয়াছে সেইরূপ  
কৃত্রিম রেশমও আসল রেশমকে অবনত  
করিয়াছে। পূর্বে ইউরোপ হইতে বেশম  
কর্মচারী আনাইতে যে পরিমাণ বেতন দিতে  
হইত এক্ষণে তাহা অশেষা অনেক অধিক  
দিতে হইতেছে।” তাহারাই এইরূপ ও আরও  
নানা প্রকার বুদ্ধিবাদ প্রদর্শন করেন। চীন  
ও জাপানের রেশম খুব চাকচিক্য ও শক্ত  
হইলেও টেকসই নহে। পৃথিবীর মধ্যে  
পশ্চিম তাতারের রেশম সর্বোৎকৃষ্ট। তাহার  
নীচে ভারতবর্ষের রেশম। এই উত্তর দেশের  
রেশমে বস্ত্র প্রস্তুত করিলে উহা বেশী দিন  
স্থায়ী হয়। জাপান ও চীনের রেশমে প্রস্তুত

বস্ত্র উত্তমদিন টিকেনা। হইলে কি হয় আপানী  
 রেশম উজ্জল অতি সুকোমল ও দরে সস্তা।  
 তজ্জন্ত ইউরোপীয়গণের চিত্ত উহার দিকেই  
 আকৃষ্ট হইল। এই কারণে ভারতের রেশম  
 লগনের বাজারে পূর্বের স্তায় সমাধের বিক্রয়  
 বন্ধ হইল। একা বীরভূম নয় মুর্শিদাবাদ,  
 মালদহ প্রভৃতি বঙ্গের যে যে জেলায় ইউরো-  
 পীয়গণের রেশমকুঠী ছিল তাহারা সেই সমস্ত  
 গুলিই উক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া বন্ধ করিয়া  
 দিলেন। বিরাট রেশম কুঠীগুলির পরিণাম  
 বর্ণন করিলে বিশ্বব্যে অভিভূত হইতে হয়।  
 মুর্শিদাবাদ মালদহ জেলায় ইউরোপীয় কুঠীর  
 অল্পকরণে বর্তমান উন্নত প্রণালীতে দেশীয়  
 ব্যক্তিগণ দ্বারা অনেকগুলি রেশমকুঠী প্রস্তুত  
 হইয়াছিল। সাহেবদের কুঠী উঠিয়া যাওয়া  
 হেতু তজ্জন্ত মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় রেশম  
 তোলা কাণ্ড একবারে বন্ধ হইল না। দেশীয়  
 কুঠীগুলি উক্ত কাণ্ডের অনেক পরিমাণে ভার  
 গ্রহণ করিল। হংসপূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে  
 বীরভূমে মার্শেল কোম্পানীর ৪০০ রেশমকুঠী  
 ছিল। গুণীয়া কুঠী হেতু কুঠী। তারাপুর,  
 ভদ্রপুর এবং কোটাপুর তাহার শাখা  
 কার্যালয়। বহুদিন পূর্বে তারাপুরের কুঠী  
 উঠিয়া গিয়াছিল। তৎপরে আশ্রাফ ৮১০  
 বৎসর কি তাহার উপর হইল কোটাপুরের  
 কুঠীর কাণ্ড বন্ধ হয়। কেবলমাত্র ভদ্রপুর ও  
 গুণীয়া কুঠী দুইটির কাণ্ড চলিতে থাকে।  
 উক্ত কোম্পানি এবেশ হইতে চলিয়া বাইবার  
 সময় ভদ্রপুরের কুঠীটিকে লক্ষীপুর নিবাসী  
 শেখ মনিরুদ্দিন নামক একজন মুসলমান  
 ধনাকে চারি সহস্র টাকায় বিক্রয় করিয়া দান।  
 আর সেই বহুদায়ে প্রস্তুত গুণীয়ার বিরাট  
 রেশম কুঠীটিকে অল্পপাত্রবে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া  
 কেলেদে যে উহা একেবারেই কাণ্ডের

অল্পমূল্য হইয়া পড়ে। উক্ত কুঠীর বড়  
 সাহেব কুঠী ভাঙের সময় এই কথা বলিয়া-  
 ছিলেন—“আমি আমাঘের প্রায় গুণীয়ার  
 কুঠীকে অল্পপাত্রবে লও তও করিলাম যে  
 দেশেঘেরা আর হইতে কখনই কাণ্ড  
 চালাইতে পারিবেন না।” উক্ত কোম্পানী  
 গুণীয়ার সেই ভদ্রকুঠী ও তৎসংলগ্ন জমিদারী  
 মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জজান গ্রাম  
 নিবাসী কৃকখন বানুকে বিক্রয় করেন।  
 কৃকখন বানু কুঠীটিকে নূতন ভাবে প্রস্তুত  
 করাইয়া উহার কাণ্ড পূর্ববৎ চালাইতে ইচ্ছা  
 করেন না। জমিদারীর পথাবৈশ্ব্যপানি করিয়া  
 তদীয় লজ্যের টাকগুলি নিরাপদে ভোগ  
 করিতেছেন। উক্ত কোম্পানি কোটাপুরের  
 কুঠীটিকে পূর্বোক্ত গুণীয়া কুঠীর ছোট  
 সাহেব গ্রীণসকে বিক্রয় বা দান করিয়াছেন  
 জনিতে পাই। উক্ত সাহেব এক্ষণে কোটা-  
 পুর কুঠীর বন্ধাবিকল্পী। কিন্তু তাহার শক্তিতে  
 একাএক উক্ত কুঠীর কাণ্ডচালান অসম্ভব।  
 তজ্জন্ত তিনি আর উহাতে রেশমের কাণ্ড না  
 করিয়া ময়ুরাক্ষনদ্বার বালীদ্বারা বৈজ্ঞানিক  
 উপায়ে দুহার জালদার স্ক্রেন, খুঁচী, বরগাদি  
 প্রস্তুতের কারখানা স্থলিয়াছিলেন এবং উক্ত  
 দ্রব্য কতক কতক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।  
 ক্রেতার অভাব হেতু এবং বাহ্যিক্য প্রযুক্ত  
 তিনি আর উক্ত ব্যবসা চালাইতে না পারিয়া  
 কোষায় চলিয়া গিয়াছেন। বাইবার সময়  
 তিনি এই কুঠীর অন্তর্গত সমস্ত ভূখণ্ডে বহুতর  
 নারিকেলের বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন।  
 অতি উন্নত দৃষ্টিকোণ হেতু উক্ত বৃক্ষ নষ্ট হয়  
 নাই। অনেকগুলি আবৃত আছে। কুঠীটি  
 কিন্তু এখনও অত্যন্ত অবস্থার বিক্ষয়মান। এক্ষণে  
 কেবলমাত্র বীরভূমের প্রান্তণীয়ার ভদ্রপুরের  
 রেশম কুঠীটি শেখ মনিরুদ্দিন দ্বারা চালিত

হইতেছে যাত্রা। আর ময়ূরেশ্বর ধানার অন্তর্গত লাহিয়ার চাঁট নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র রেশম কুঠী উক্ত গ্রামের এক সম্পন্ন মুসলমান কর্তৃক সামান্য ভাবে চলিতেছে। এই কুঠী উক্ত মুসলমান নিজ ঘরে প্রস্তুত করেন। ইহারে বহলায় আছে। ইহার প্রস্তুত রেশম পশুচীরা কুঠীর সাহেবের। ক্রয় করিতেন। সুতরাং ইহাকে পশুচীরা কুঠীর শাখা কুঠী বলা অদ্বন্দ্ব নহে। কিন্তু ইহার অবাধিকারী সেই স্থানীয় মুসলমান। পশুচীরা কুঠী ধর্মপের পর এই কুঠী জীবিত আছে। ইহার প্রস্তুত রেশম বোঝাবের বেশীর মহাজনেরা ক্রয় করেন।

( ৪ )

বীরভূমের রেশম কুঠীগুলি উত্তীয়া বাওয়ার পর হইতে ইহার বে সামান্যতিক্রম ক্রম হইয়াছে এইবার ভায়া বর্ণন করি। উক্ত রেশম কুঠী উত্তীয়া বাওয়ার পর হইতেই কৃষকেরা পলুগোষা বন্ধ করিয়াছে। কারণ তাহারের অতি কঠোর উৎপন্ন রেশম কোষগুলি ভালরূপে বিক্রীত হয় না। বীরভূমের অধিকাংশ গ্রামে উক্ত রেশম চাষ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কৃষকসকল উক্ত চাষ দ্বারা প্রস্তুত পরিমাণে অর্ধোপার্জন করিত। বৎসরের মধ্যে প্রধান চারিবৎস্রে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন গুটীপোকা বিক্রয় করিয়া সর্বপ্রকার অভাবের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিত। রাজা মহাজনের ঘেনা মিটাইত। চাষের ব্যয়ের সাহায্য করিত। পূজার কাগড় চোশড় সবই এই গুটীপোকা বিক্রয় করিয়া তলীর বিক্রয়লভ অর্থে ক্রয় করিত। তখন স্বল্পকালে কাল কাটাইত। বীরভূমের চান্দী-দিসকে কখনই খাজ বিক্রয় করিয়া রাজা মহাজনকে টাকা দিতে বা বাজার খরচ

করিতে হইত না। আবার জীবন ভায়া কান্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ও চৈত্র মাসে ভিন্ন ভিন্ন বকমের পশুগুলি পরিপক হইয়া কৃষকের দ্বারা আশার বাতী জালিয়া দিত। দালালেরা প্রত্যেক বৎস্রে মলে মলে প্রত্যেক পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া রেশমকোষ ক্রয় করত অগ্রে কৃষকসকলকে হানন দিত। এই কয়েক মাসের মধ্যে রৌণ্য মুদ্রার স্বল্পতন মধ্যে বীরভূমের পল্লীগুলি সর্বদায়ই শব্দিত থাকিত। এক এক কৃষক পরিবার বৎসরে এই ব্যবসা দ্বারা এক হাজার বেড় হাজার টাকা লাভ করিত। সামান্য কৃষকগণও বৎসরে ২০০ নত টাকার কম লাভ করিত না। এখন বর্ষব্যব কোষবন্ধ গুটীপোকা-গুলিকে রৌণ্যে বেওয়া হইত তখন বোধ হইত যেন রাশি রাশি পোয়ার কল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৃষক পরিবারেরা যত্নের সহিত উক্ত কোষগুলিকে রৌণ্যদ্বারা পরিচাল্য করিত। দালালেরাও বৎসরময় এই রেশম কোষগুলি ক্রয় করিয়া বেশ ছ টাকা লাভ করিত। মজুরগণ উক্ত রেশম কোষগুলি মজুরকে বহিয়া লইয়া দিয়া কম লাভ করিত না। যে সকল মজুরের সাধারণ কার্যে দিন চারি আনার বেশী মজুরী নয়, তাহারাদি রেশম কীট বহিয়া দিন বেড় টাকা দুই টাকা রোজগার করিত। এই রেশম কীটের দ্বারা তুষপাতা। এই তুষ পাতার চাষ ব্রাহ্মণ হইতে সকল জাতিতেই করিতে পারিত। প্রত্যেক গৃহস্থের দুই এক বিঘা করিয়া তুষ পাতার চাষ ছিল। ব্রাহ্মণদিগের রেশমকীট প্রতিপালন করা নিষিদ্ধ কিন্তু তাহাদের তুষ-পাতার চাষ করার কোন শোষ ছিল না। তৎকালে সকল জেলীর ভিতর ইহার চাষ অব্যাহত চলিয়া আসিতেছিল। প্রত্যেক

কৃষকের ২৫ বিঘা করিয়া উক্ত তুত পাড়ার চাষ থাকি। বহু ও তাহাদিগকে অপর তুত পাড়া ক্রয় করিতে হইত। কারণ তাহাদের নিম্নের ক্ষেতের তুতপাতা বারা পোষিত রেশম কাটের খাত সংশ্লিষ্ট হইত না। তৎকাল কৃষকেরা সাধারণ তুতপাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে উহা ক্রয় করিত। এক বিঘা তুতপাতের চাষে গৃহস্থ বৎস পত দুই পত টাকার কম উপার্জন করিত না। খরচ খরচা বাহ সাধারণতঃ প্রত্যেক বিঘায় ঐ পরিমাণে লাভ পাড়াইত। এই লাভজনক তুতপাতের চাষও বীরভূমের সকল জেলায় লোকেরা করিতেন। রেশম প্রস্তুত ইয়াবদিগের হাতে পতিত হইলেও রেশম চাষ দ্বারা কৃষকেরা বেশ লাভবান হইত। সাধারণ লোকে তুতপাতের চাষ করিয়াও বৎসরে কম টাকা পাইত না। উক্ত গুণীয়া, কুঠী উঠিয়া বাওয়ার পর কৃষকেরা পল্লুর চাষ বন্ধ করিল। কারণ ক্ষেতের অভাবে অনেক বর্ষে তাহাদের প্রস্তুত গুটিগুলি অবিক্রীত রহিয়াছিল। এবং উহা বিক্রীত না হওয়ার তাহাদিগকে তুতপাতের দাম চাষের দ্বারা বিক্রয় করিয়া বা মুহাঙ্গনের নিকট কর্তৃক লইয়া পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ এইরূপে ক্ষেতের অভাব হওয়ার উহার গুটীপোকার চাষ একবারে তুলিয়া দিল। উক্ত চাষ তুলিয়া দেওয়ার তুতপাত অবিক্রীত রহিল। উক্ত তুতপাত ক্রমশঃ বিক্রীত না হওয়ার কৃষকেরাও আর উহার চাষে মন দিল না। তুতপাতের অতি উর্ধ্ব ক্রেত্রগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ পতিত ক্রেত্ররূপে পরিণত হইল। যে সকল ক্ষেত্র নদীতীরে ছিল কৃষকেরা উহাতে অন্তরঙ্গ পত্রের আবাদ আরম্ভ করিল।

আর দাঙা পুষ্করিণীর পাড়ারের কিংবা ডাকার উপর ছিল, সেই সকল ক্ষেত্রগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ দুই একবার ভিন্ন ভিন্ন কল সাবানের পর নিত্য অধুর্ধর হইয়া পড়িল। বলিতে নাকন জুগ হইতেছে যে পরিমাণ ভূমিতে তুতপাতের চাষ দ্বারা বৎসরে ২৩ পত টাকার তুত উৎপন্ন হইত তাহাতে এখন ২০ টাকার কমল হয় কি না। বৎসরের বিবরণ। ১৮১০ বৎসরের মধ্যে বীরভূমের এই অসম্ভব পরিবর্তন হইয়াছে। বীরভূমের মধ্যে তুতের চাষ, গুটীপোকা প্রস্তুত ও তাড়া হইতে রেশম তোলা প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। যে গ্রামে একপত বিঘা তুতের চাষ ছিল সে গ্রামে এখন উক্ত চাষ ও বিঘা আছে কিনা সম্ভব। যে গ্রামে একপত ঘর কৃষক পল্লু পুষ্কিত সে গ্রামে এখন চারি ঘর চাষা পল্লু পোষে মাত্র। অতি প্রাচীনকাল হইতে বীরভূমবাসীরা উক্ত রেশম চাষ ও ব্যবসা দ্বারা যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিত তাহা একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। বীরভূমে অনেক তাঁতের বাদ। উহার অধিকাংশ হলে রেশমী বস্ত্র বহন করিয়া তরঙ্গ অর্থে আপনাদের সামগরিক ব্যয় যথ সম্বন্ধে চালাইত। অনেক হলে উক্ত তত্ত্বাবহুল ইষ্টকনিষ্ঠিত গৃহে বাস করিত। স্বামীর থাকে বস্ত্র পরিবারবর্গকে সুখী করিয়া অকণী অবদার যথ সম্বন্ধে কাল কাটাইত। উহার অতি ক্ষুদ্র স্বামীর স্বামীর রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম ছিল। বীরভূম, মূর্শিগাবান, মালদহ বেলাঘর দেশীয় কলে প্রস্তুত রেশম হইতে উহার স্বামীর স্বামীর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া মহাশয়দিগকে বিক্রয় করিয়া বিশেষরূপ লাভবান হইত। একপে ডারভের বস্ত্র লগনের বাজারে কম বিক্রী হওয়ার ও উহার আশঙ্করূপ কাটা রেশম না

পাওয়া হেতু উদ্ভাসেরও বাবসা মাত্রী হইয়াছে। তজ্জাত উক্ত শিল্পী শ্রেণীর দুঃখের আর সাম্য নাই। অনেকের উক্ত বস্তু হইয়াছে অর্থ। ভাবে খর বাড়াইয়া মস্তাভনের নিকট বিধা পতি-  
 য়াছে। অনেক তত্ত্ববাহ্য উদ্ভাসেরও তত্ত্ব ভিক্ষা করিতেও পক্ষাৎপন্ন নহে। হাথ হত ভাগ্যাপণ যদি ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানীন দেশ সকলে জন্মগ্রহণ করিত তবে তাহাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতির ক্ষমতা চারিধারে হ্রাসপূর্ণ পড়িয়া যাইত। তাদৃশিতবাস্তবক চারিধারেক এই বিবাস সমাজের প্রেরণ করিত। পরিস্থায়েতে পুনঃ পুনঃ এই বিবয়ের আলোচনার পর উভার প্রতিকার সম্বন্ধে একটা না একটা বিবিধাবস্থা প্রণীত হইত। সংবাদপত্রগুলিতে সহস্র ভাষায়, সহস্র উচ্চীণনায় উক্ত শিল্পীগণের স্বাক্ষর জ্ঞানানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইত। মস্তভাগ্যাপণ পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর তাগার প্রতিবেশীরা নিত্যই স্বার্থপর, অলস ও অশার, তজ্জাত দেশের বাহারা প্রাণ সেট শিল্পীমূলের পতীর দুঃখে উদ্ভাসিতকে একবার মাত্র চায় হায় করিতে শুনা দেল না। একটীও সভ্যসমিতিতে প্রতিকারের উপায় নির্ধারিত হইল না। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে একটীও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল না। দেশীয়-  
 মিতকে জানান হইল না তাহাদের দেশের শিল্পীমূলের আর কি পতীর দুর্দশা! তাহারা আর কতদূর বিপদগ্রস্ত, উদ্ভাসের পরিবার আর পথের ভিখারী। উদ্ভাসের রেশম ও রেশমী কাপড়ের ব্যবসা দেল। কাঁচা রেশম প্রস্তুত বস্তু হইল, গুটীপোকা তৈয়ার করা উঠিয়া দেল, তজ্জাত দেশ হইতে কৃতপাতের চাব অস্তিত্ব হইল। সত্যতার আদিকাল হইতে যে বস্তুতত্ত্ববাহ্যপন স্বন্দর স্বন্দর

রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর ভিতর বিশেষ গৌরবান্বিত ছিল তাহাদেরও উক্ত ব্যবসা লোপ পাইল। ক্রেতার উৎসাহজনন অভায়ে ও বিবেচনীয় বস্ত্রের প্রতিবেশীতাৎবেময়ন তাকার মণ্ডলিত বস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পীগণ একবারে গোপ পাঠিয়াছে অতি অল্পদিনের মধ্যে সেইজন্য রেশম প্রস্তুতকারী শিল্পীগণ গুটী পোকা উৎপাদকর্তা কৃষকগণ, ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুতকারী তত্ত্ববাহ্য শ্রেণীও একেবারে বিলুপ্ত হইবে। জ্ঞাপতিতে উদ্ভাসের অর্থপতন ঘটতেছে ও প্রত্যেক শ্রেণীর কার্যাবিধি লোপ পাইতেছে। যে বীরকুম্ভ কোলাহ লক লক টাকার রেশম রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত হইত অল্পদিনের মধ্যেই উহা স্বপ্নের কথা বা অলৌক উপভাসের মধ্যে পরিণত হইবে তৎপক্ষে আর বিলুপ্ত্য লক্ষ্য নাই। আজ ২০ বৎসর পূর্বের অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে এই কথাই সর্বপ্রকারে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে বাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতেই উক্ত উক্তির সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হয়। আর মেলায় নীলকর সাহেবেরা নীলকুঠী উঠাইয়া দেওয়ার নীলের চাব একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, লৌহকুঠী উঠিয়া যাওয়া হেতু লৌহ প্রস্তুত একেবারে বস্তু হইয়াছে।

ইলাম বাগারের গালা কোম্পানি আগনা-  
 ধের ব্যবসা জুলিয়া লওয়ায় গালায় হুচিকণ শিল্পীস্বাব্যাদি একপদে নাম মাত্র প্রস্তুত হয়। নানাদিক দিগা বেধিলে মনে হয় বীরকুম্ভিতে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। তজ্জাত তাহাদের অতি লাভজনক গৌরবময় চিরদিনের রেশম শিল্পও এইজন্য অবনত হইল। যে রেশম শিল্পে বীরকুম্ভের শিল্পীগণ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সমাদীন ছিলেন বিধাতা ভবা

হঠাৎ বৃষ্টি উপস্থিত হইল। চিরদিনের জগৎ  
নামাটাই ছিলেন। বীরভূমের আর বহির্গত কি ?  
যদি উপস্থিত হইত কোম্পানিগুলি টংগা  
ছিল। তথাপি উহাদের সহিত বীরভূম-  
বাগিন্গ উক্ত নামগঃ সংশ্লিষ্ট ভাবে  
চালাইয়া বহল পরিমাণে লাভবান হইতে  
ছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।  
সমস্ত প্রকারের লাভ উদ্ভাবের ভাগ্যে না  
ঘটিলেও বিশেষ বণিকদিগকে লাভাংশের  
অর্ধেকও দিয়া গাইতে হইত। সুতরাং উক্ত  
প্রকার অর্থ উপার্জন করিয়া বীরভূমবাসী  
একপ্রকার সুখে ছিল বলিতে হইবে। এক্ষণে  
মূল্য প্রাপ্তির কোম্পানিগুলি আপন আপন  
ব্যবসা একবারে উঠাইয়া লওয়ায় বীরভূম-  
বাসী সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। উহাদের  
ভিতর এমন কাহারও প্রস্তুতি নাই যে উক্ত  
ব্যবসায়িত্য ত্যাগে স্বাধীনভাবে পরিচালিত  
করে। সুতরাং ইউরোপীয়গণের অভাবে  
উহাদের সমস্ত ব্যবসা চিরকালের জগৎ বৃষ্টি  
উঠিয়া গেল। এক্ষণে কৃষিকার্য্যই এই  
জেলার অধিবাসিগণের একমাত্র অবলম্বন।  
তাহাদের সর্বপ্রকার ব্যবসাই কৃষিকার্য্য  
দ্বারা চালাইতে হয়। কালমাহাত্ম্যে আর  
কেন্দ্রে দেখা পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না।  
ক্রমাগত কর্ণে কেন্দ্রগুলি ঘিরে ঘিরে অগ্রসর  
হইয়া পড়িতেছে। এবং অল্পাংশ, অনাবৃষ্টি  
বশতঃ অনেক বৎসরেই তালভূম ফল  
হইতেছে না। সুতরাং পুত্র ভাল না জন্মা  
হেতু বীরভূমবাগিন্গ ঘিরে ঘিরে অভিনব  
দুঃখের এক এক স্তর নিয়ে অবতরণ করি-  
তেছে। বীরভূমের অধিকাংশ কৃষকের ও  
মধ্য শ্রেণীর ভূসম্পত্তি মহাজনের নিকট রাখা  
পড়িয়াছে। অনেক ঘাইতে পাইতেছে না।  
অর্থাভাবে চিকিৎসা করাতে পারিতেছে

না। অর্থাভাবে হেতু দরিদ্র, দুঃখ, মৃত্যু প্রভৃতি  
পুষ্টিগত খাতিয়া গাইতে পাইতেছে না। যে  
বীরভূমে যালেবিরিয়ার কথা উপলব্ধিতে  
গাইতে সেই বীরভূমে আজ উক্ত রাক্ষসী  
লোলরগনী বিস্তার করিয়া তাহার লত লত  
প্রাণের নন্দনগুলিকে প্রতিদিন গ্রাস  
করিতেছে। অর্থাভাবে বীরভূমবাসী পুষ্টিগত  
খাতিয়া গাইতে পাইতেছে না। তাই কি  
তাহার একমাত্র কারণ নহে ? উপলব্ধি  
ভাবে বীরভূমের অধিবাসীরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ  
দুর্ভিক্ষ হইতেছে। যালেবিরিয়ার রাক্ষসীও এই  
দুর্ভিক্ষ শ্রী পুষ্টিগতিকে আনন্দের সহিত  
উদরলাভ করিয়া সকল আশা ভরসা নির্মূল  
করিয়া দিতেছে। কে এই ঘোর দুর্দিনে  
বীরভূমবাগিন্গকে উদ্ধার করিবে ? কে  
তাহাদিগকে ভবিষ্যতের আশাবাদক অন্তর্য্যাক্ষী  
জনাইবে ? তাহারা এতদিন যে শিল্প বাণিজ্য  
দ্বারা ধনধান ছিল, তাহাদিগকে পুনর্বার  
তাগ লাভ করিবার কেহ প্রবণ  
করিবে ? কে তাহাদিগকে হারিভোর প্রবণ  
করল হইতে উদ্ধার করিবে ?

তথু বীরভূমের নহে যে যে জেলা বৈশম-  
শিল্প ধনধানী ছিল সেট মূর্খবান মানব  
প্রভৃতি জেলার সাধারণ অধিবাসীর দুর্দশা  
বীরভূমবাসীর স্তায় চরমদশায় উঠিয়াছে।  
ঐ সকল জেলার বৈশম ব্যবসায়ী বড় বড়  
মহাজন অনেক অনেক স্বর্ণ শিল্পীরা  
অর্থাভাবে পথের ভিখারী হইয়াছে। উহাদের  
দুর্দশার আর বাকী নাই। তবে বীরভূমবাসী  
দেহন নিরস্ত হইয়াছে, তাহাদের চির লক্ষী-  
ভাগ্যের একবারে দেহন পুত্র হইয়াছে, তাহারা  
ততদূর দুর্দশায় হইয়াছে কি না জানি না।

(৫)

আমাদের জাতীয় জীবন-প্রত্যয়ের মধুর

মুচনা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বেশ সুশাস্ত্রের  
- আলম্ভ-নিহিতা পতিভাগ করতঃ বহু যুবকগণ  
আবার উত্তর দিকে দাবিত হইতেছে।  
ভাতীর চাব বীরে বীরে পরিপূর্ণ হইতেছে।  
তারতে বহুশীঘ্র আত্মপণ মাথের দারিত্র্য  
নিবারণ প্রকল্পেণ দেশান্তরে গমন করতঃ শিল্প  
শিক্ষার মনোনিবেশ করিয়াছেন। শুভক্ষণে  
বহুশীঘ্র প্রাণ প্রার্থিত হইয়াছে। এই শুভক্ষণে  
ইউরোপীয় রেশম বণিকগণ আপনাদের  
কার্যালয়গুলি উঠাইয়া দিয়া যথেষ্ট প্রতিগমন  
করিলেন। টাঃ আপাততঃ ক্ষতি ও দুঃখের  
কারণ হইলেও ভবিষ্যতের পক্ষে সুফলপ্রসব  
করিবে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি  
আমরা প্রকৃত বহুশীঘ্রভাবে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ  
হইয়া থাকি তবে বীরে বীরে বিবেচনার  
সহিত বীর বীর স্বার্থরানি বলিমান দিয়া  
কর্তব্যের পথে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হইব।  
আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রাচীন ব্যবসা  
পুনর্যার নিম্ন হস্তে গ্রহণ করতঃ আবার  
তাহার উত্তর দিকে দাবিত উৎসর্গ  
করিব। ভাগ্যলক্ষী আমাদিগকে আবার  
আলিঙ্গন করিবেন। আমরা আমাদের সেট  
গৌরবময় পথে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হইব।  
আইন বর্জী যুবকগণ তোমরা ইউরোপীয়-  
বিশ্বের পরিত্যক্ত সেই কর্তৃক্ষেত্রে আবার  
অব্যবহার্য বীজ বপন কর। তোমাদের  
আশা সফল হইবে। বীরে বীরে তোমরা  
আবার পূর্বগৌরব প্রাপ্ত হইবে। তোমরা  
বীরত্ব মূর্তিভাবে তানে তানে ছোট ছোট  
রেশম কার্যালয় পুনর্যার প্রতিষ্ঠিত কর।  
যৌবন কারবার দ্বারা ধনসংগ্রহের শক্তি যদিও  
এখনও তোমাদের তিত্তর কার্যকরী হয় নাই  
তবাপি বহুশীঘ্র প্রত্যেক ধনী একাএক ১০১৫  
গাজার মূলধন দিয়া এক একটা রেশম

কার্যালয় স্থাপন করিবা দিতে পারেন, তাহার  
সংখ্যা এদেশে বিরল নহে। উক্ত ধনীদিগের  
সাহায্যে ঐ সমাক্রম অর্থ লইয়া এক একটা  
রেশম কার্যালয় সংস্থাপন কর এবং অত্র  
জেলার কৃষকগণকে উপদেশ দিয়া আবার  
রেশমতটী প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দাও।  
তোমাদের প্রস্তুত রেশমে জেলার কৃষকগণ-  
গণ দ্বারা বস্ত্র বয়ন করাইবা বিক্রয় কর,  
দেখিতে পাইবে এইরূপ কার্য দ্বারা অচিরেই  
সুফল প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে কৃত পাতের  
চাব আবার আরম্ভ হইবে। কাঁচা রেশম  
প্রস্তুত হইবে। বহুশীঘ্র তত্ত্বাবধগণ উক্ত  
রেশম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া নিজ  
নিজ অঙ্গসংস্থান করতঃ আপনাদিগকে জীবিত  
রাগিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। তোমার  
ঐ রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে,  
ও ইউরোপ এশিয়ার নানা স্থানে বিক্রয়  
করিবা বেশ লাভবান হইবে। ইউরোপীয়েরা  
এদেশে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়া রেশম  
প্রস্তুত করাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক  
অল্প ব্যয়ে তোমরা উহা প্রস্তুত করিতে সক্ষম  
হইবে। তখন তোমাদিগকে আর বিবেচীর  
সহিত প্রতিযোগিতায় হার মানিতে হইবে  
না। ক্রমে ক্রমে আবার রেশমের  
বহির্বাণিমা তোমাদের হস্তগত হইবে।  
ক্রমে ক্রমে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার  
গুলি একীভূত হইয়া এক বিরাট ব্যবসা  
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা এক্ষণে  
উন্নতি ও স্বাধীনতার সন্ধি হলে গণ্যমান  
রহিয়াছ। এই মহোৎসব উপলক্ষে আপনারা পৈতৃক  
ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উৎসাহিত চিত্তে  
অগ্রসর না হও রেশম চাব এক্ষণে তেজস  
পরিভ্রাস্ত হইয়াছে সেইজন্যই তোমরা  
উহাকে স্থাপন চক্ষে দেখ তবে জানিও



ভাঙ্গানখী তোমাদিগকে চির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর যদি তোমরা তাঁহাকে প্রদত্ত করিবার নিমিত্ত আপনাদের চিরকালের ব্যবসা নিজেদের হাতে গ্রহণ কর তবে তোমাদের উন্নত অবিসংবাদিত। তাই বলি ভাঙ্গানখী তোমরা মুখে বশেষী বশেষী করিও না কার্যে বশেষী প্রমাণ কর। লুপ্ত শিল্প বাণিজ্য প্রকাশ বস্ত্রবান হও। আবার তোমরা নবীন উদ্যমে নানাপ্রকারে রেশম-কুঠী প্রস্তুত কর। তুত পাতের চাব করিতে ও তুতীপোক। প্রস্তুত লক্ষ কুবকপণকে উৎসাহ দিতে বন্ধপরিকর হও। উদ্যোগকে সাফল্যের যথুর গান শত মুখে শুনাইতে পাক। বশেষী তত্ত্ববাহ গুলিকে আবার কর্ষে লিপ্ত কর। এখনও ইউরোপীয়গণের অনেক কুঠী মালবহ ও মুনিগাবাদের ভিতর অবিক্রীত আছে চেষ্টা করিলে অল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে সেই কুঠী গুলিকে হস্তগত কর। তবেই জানিব তোমরা বশেষী হইরাছে। তবেই জানিব তোমরা মাধের হুংব হুড়াইতে পারিবে। তবেই জানিব আমাদের কিছু আশা ভরসা আছে। এখনও এক দেব রেশমের দাম কখন কখন ১৭১৮ টাকা। উক্ত রেশমে বস্ত্র প্রস্তুত করাইলে ৩-১৫ টাকা মূল্যে উহা বিক্রীত হয়। এমন সোণার ব্যবসা তোমরা পায়ে করিয়া চলিয়া দিও না। ইউরোপীয়ের তোমাদের বেশে এই ব্যবসা দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া নিজেদের বেশে বড় লোক হইরাছে। তোমাদের তাগ্যক্রমে তাহারা আদ্য এবেল হইতে নিজেদের কন্দ-ক্ষেত্র সংকল্প করিল !

যতদিন তোমরা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি

করিতে না পারিবে ততদিন তোমরা নিত্য নগ্না বহিবে। অর্থাৎ অগতির সঙ্গ হুংব - নিবারণ করে মানবকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ গৌরবের পথে লইয়া যায়। রপতে বস্ত কিছু মহানুভাবী সংস্কারিত হইরাছে তাহার মুখে বর্ণনাতি কাধাকরী। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য এই তিন উপায়ে অর্থ লাভ হয়। তোমরা কিছু এই তিন উপায়েই পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি তোমরা এই ভাব পরিত্যাগ না কর তবে কখনই তোমাদের উন্নতির আশা নাই। কৃষা রাজনীতির আকাশ-সুহ্ম আশায় সময় ব্যয় করিলে কখনই উন্নতির আশা নাই। বাহ্যের পেটে খাইবার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র নাই বাহ্যের বেশের শত শত লোক পাইতে না পাইয়া অনর্শনে প্রাণ ত্যাগ করে, বাহ্যের বেশের লোক চিকিৎসাতাবে ও পুষ্টির খাদ্য না পাইয়া অকালে মরন মরনে প্রেরিত হয় তাহাদের আবার রাজনীতি কেন ? এই দেখ সারি সারি অশ্রান কেনে বাহ্যের দুঃখমাখা দেহগুলি বড়ীকৃত হইতেছে, অনবধানে শত শত কোমল সুহ্মকলি এই বিকট অনলে ভস্মীভূত হইতেছে এক কথায় বলিতে গেলে বাহ্যের বেশে অশ্রা-ভাবে অর্থাভাবে এই বিকট দৈন্যদশা ও হুত্বার বিকটাতিনব চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহারা যদি ইহার প্রতিকার চিন্তা না করিয়া কৃষো রাজনীতির চিন্তায় জীবনান্তিপাত করে তবে উদ্যোগকে উন্নত ভিন্ন আর কি বলা হইতে পারে ? তৎক্ষণ বলি বেশে বাহ্যে বন্যম হই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে অগ্রে সেই চিন্তা কর পরে অন্ন ভাবনা ভাবিবে। আগে উন্নয়নীতি পরে রাজনীতি।

এই রেশম শিল্পে যদি তোমরা উদ্বিগ্ন  
- করিতে পার ঘীরে ঘীরে বহুদেশ ব্যাপিয়া  
যদি আবার পূর্ণের মত রেশম ও রেশমী  
বস্ত্রের কার্খালয় স্থাপিতে পার তবে  
তোমরা অতিবেই ধনবান হইয়া মাগের  
মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে। বীরভূম  
মুর্শিদাবাদ জেলায় আগে তোমরা প্রথম  
কার্খালয় স্থাপন কর।

উপসংহারে বলিয়া এই এখানে বীরভূম

মুর্শিদাবাদ প্রকৃতি জেলায় রেশম শিল্পের  
অবদতি হওয়ায় সাধারণ প্রজাদের দিতর  
বেজ্ঞান দারিত্র্য। ও দৃষ্টিভ্রম প্রদেপ করিয়াছে  
তাহার প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে রাজপুত্রবরণ  
অচিরে এক কমিশন বসাইয়া উগার প্রকৃত  
অবস্থা অবগত হউন। এবং কি করিলে  
আবার সুপ্ত প্রায় রেশম শিল্প এ দেশে পুনঃ  
প্রতিষ্ঠিত হই তাহার উপায় চিন্তা করুন।

শ্রীমামতারগ রায়।

## বাসন্তী-লীলা

“মোলায়াঃ বোল গোবিন্দঃ মকেছ মধুপদনম্।

রথেন বামনঃ দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিধাতেঃ”

মোল বাজার শ্রীগোবিন্দ, মকে শ্রীমধুপদন  
এবং রথোপরি শ্রীবামনদেবকে দর্শন করিলে  
ত্রিতাপশ্রিষ্ট ভীষের ভাবাবেগে প্রত্যাবর্তনের  
ভাবনা বিদূরিত হয়। জীব শোকতাপ দুঃখ-  
আলা বিনিষ্ট ও অয়তন্য বিরহিত হইয়া  
যোগীশ্বরোচিত শাস্ত্র নির্দোষ মুক্তি প্রাপ্ত  
হয়। তারবাহী বলদের মত অবিরত সংসার-  
তার বহন করিবার বস্ত্র তাঁহাকে আর আপা  
দায়ক করিতে হয় না, তবেই বোঝা। তবেই  
পড়িয়া থাকে। ভীষের একমাত্র লক্ষ্য ও  
আলোচনীয় পথ “কৈবল্য” অর্থাৎ কলাকাজ-  
নিবৃত্তি বা অবলান। যে কৰ্ম করিলে চরমে  
পরমগতি লাভ হয় এবং জন্ম-মরণ ময়ন ফেল  
পাইতে না হয়, এবং বাহ্যে নিত্য শুদ্ধ পবিত্র  
ও ধাৰা প্রাপ্ত হইলে আর তাহা হইতে প্রতি-  
নিবৃত্ত হইতে হয় না—আশক্তি-সাগরে ডুবিবার  
ভয় নাই—“অপুনরিত্যভয়ে” সেই কৰ্মই এক-  
মাত্র মুখ্য ও সর্বোত্তমভাবে সর্বসম্বন্ধের ক্রমে  
বাহুনীহ।

“নাক্তঃ পদ্মা বিদ্যাতে অমনায়”

ভগবান ব্যতীত পথ নাই, এবং তাঁহাকে না  
পাইতে পারিলে—সমস্ত কৰ্মাবলী ও ধৰ্মাবলী  
তাঁহাতে বিমল্লিত না করিতে পারিলে হুৎ  
দুঃখ, আশা-প্রত্যাশার নিবৃত্তিও নাই। হুৎতায়  
যে কোন উপায়েই হউক আত্মবিশ্বাসকে  
ঐতিগবানের সান্নিধ্যে পৌছাইতে হইবেই।  
তাই জীব এই বাসনাবলে পরিচালিত হইয়া  
ঐতিগবানের সেবার প্রকট উপায় ও সুযোগ  
অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার অদৃষ্ট  
প্রাণের হারণ পিপাসা কথকিং নিবারণের  
বস্ত্র ঐতিগবানের বাহুল্যের উৎসব করিয়া  
থাকে। এই বস্ত্রই হিন্দু শাস্ত্রে নানা পার্শ্বপ  
বা উৎসবের অবতারণা পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর  
এমন কোন কার্যকলাপ বা অছটান নাই  
যাহাতে জীবকে মানসিক ক্রমোন্নতি পথে  
অগ্রসর না করাইয়া দেয়।

শ্রীশ্রীমোললীলা আৰ্য্য বৈষ্ণবধর্মের  
একটি প্রধান উৎসব। এই লীলার উৎসব  
বাসন্তী-কালে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহার  
অপর নাম বাসন্তী-লীলা। সমস্ত বসন্তকাল

ব্যাপি। এই লীলার উৎসব হয়। সাধারণতঃ বাসন্তী পক্ষমী হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার ফুলদোল পর্য্যন্ত প্রায় কোন না কোন পক্ষে, কোন না কোন তিথিতে এই লীলার প্রকটন হইয়া থাকে। ঐশ্বৰ্য্যবান প্রকৃতি সকলে বাসন্তী পক্ষমী তিথি হইতে বোলবাজ। আরম্ভ হয়, তবে কল্কনী পূর্ণিমার দোলে যেমন সৰ্ব্বব্যাপি উৎসব হইয়া থাকে তেমন আর কোন সময়ের দোলেই পরিলুই হয় না।

অগম্যবান হরি ষাণ্মাসে কালিন্দীকূলে যে হোরিকালীনা করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের দেশে “বোল লীলা” বা “বাসন্তী লীলা,” এবং ঐশ্বৰ্য্যবান প্রকৃতি দ্বানে “হোলি” নামে অভিহিত। ঐতগবান নিত্যলীলা প্রকাশ কালে ঐশ্বৰ্য্যবানে পরকীয়া মধুর কান্ত্যভাবে সমাচ্ছন্ন। অকস্মেৎপূর্ণের সন্তিত যে মহাবাহিম-ময়ী লীলার প্রকটন করিয়াছিলেন এবং যে মধুর রূপানে ভক্তপ্রাণ নিত্যানন্দরূপে চির-ভাগমান তাহা সাধারণ মানব-বুদ্ধির পক্ষে নিত্যন্ত দুর্বিগম। এবং একমাত্র ইষ্ট রূপা সাপেক্ষ। তাই ঐতগবান সীতার বলিযাছেন “যেখা মাং প্রপঞ্চেষে তানু তথৈব ভয়ামাহম্।” আমাদের যে যেভাবে প্রার্থনা করে আমি তাহার নিকট সেই ভাবেই উপস্থিত হই। এই অচরবাস্তব উপর নির্ভর করিয়া জীব সত্ত্ব পরন্ত নানা উপায়ে তাহাকে পাইতে চেষ্টা করে এবং কালে যে সেই পরমপব লভ করিতে সমর্থ হয় তদ্বিবরে অমৃতমাত্র সম্বোধনাই।

“রোমহর্ষলোপার্ণণ পুণ্য লেখনা”

কুজা, নৈরিছৌ ঐক্যকে সামান্য অহলেশন প্রদান করিয়া যদি তাহার সামীপ্যলাভের অধিকারিণী হন তবে ঐতগবানের দেবার জন্ত জীবের বস্তু কিছু প্রাণস আশা ভরসা

বার্য্য হইবে কেন? ভগবান অমৃত্যামো, তাহার নিকট সমস্ত পরিব্যক্ত। বাহুকাণ্ডেব নিকট প্রাণের চাড়া লুকান বাক্য সম্বন্ধে কি প্রাণময়ের নিকট কিছুই অপ্রকাশিত থাকিতে পারে কি? তাই শাস্ত্রে যুক্তি এই,—

“ভাবনা বাসুঐশ্যান্ত নির্ভুক্তবতি তাদৃশী।”

যাহার যেমন ভাবনা সে তেমনি লিঙ্গিগত করে। প্রজ্ঞান তাই ভক্তি বাঞ্ছনে বাঞ্ছিত। যুগলের লেবার অধিকার পাইয়াছিলেন, আর হিরণ্যকশিপু লক্ষ্যভাবে থাকিয়া নৃসিংহপদে প্রাণ বিলম্বন করিয়াছিল।

এই বাসন্তী-লীলাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, হেতু বা উদ্দেশ্য, নারক নারিকা ও উৎসব পার্বণ ইত্যাদি।

হেতু

সাধারণ জীবের বিশ্বাস যে সে কখন ক্ষুদ্র অংশিকা টুকু হারাইয়া জাতাকে ভালবাসিতে পারে না। মাতৃশের হারা তাহাও যে কখন সম্ভব হয় তাহা বিশ্বাস উন্নিতে পারে না। তখন পাবন ক্ষুদ্রভাবন ঐতগবান অমৃত জীব শিকার জন্ত—জগতের শান্তি সংস্থাপনের জন্ত, মানব পরীর কস্তুর সম্ভব এবং জড় হারা চৈতন্য লাভ হয় কি না তাহাই দেখাইবার জন্ত নিজে নরবেদে অবতীর্ণ হইয়া অক্ষরান্যায় জড় মানবজগৎ লইয়া মহালীলা প্রকাশ করেন।

নায়ক

এই বাসন্তী লীলার নারক বহু ঐক্য। অমর ভক্ত চূড়ামণি বৈকবকবি বিভাষতি নারক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

অভিনব কুচমল তথ্য সমুজ্জল কুচিত

কুণ্ডল তার।

প্রণবি জনোচিত বন্ধন সহস্রত চূর্ণিত

ঘন ঘন সার ।

জয় জয় হৃদয় নন্দকুমার ।

দৌরভ সপ্তটে বৃন্দাবন তট, বিহিত

বসন্ত বিহার ।

চটুল দুগল, রচিত রণেশ্বর,

রাধা মন বিকার ।

ভুবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্তন, পতি

বিগলিত মণিহার ।

অধর বিরাজিত, মকত রশ্মিত,

লোচিত নিজ পরিহার ।

নিজ বসনভঙ্গ, হৃদয় সনাতন, চিত্ত

বিহর অবতার ।

নারিকাগণ :—স্বার্থশূন্য কুরুত্বা ব্রজদেবী-  
গণ এই লীলার নারিকা । ব্রজদেবীগণের  
চরিত্র, কৃষ্ণকর্ষণ ও কৃষ্ণের সহিত সখ্য  
বিবধে ভাগবত বলিতেছেন—

“অহো যুগঃ পূর্ণার্থা ভবতে গো লোক

পূজিতাঃ ।

বহুধেবে তপস্বিত্য হ্যামি ত্যর্পিতং মনঃ ॥”

আহা, আপনারা চরিতার্থ এবং লোক  
পূজনীয়, কারণ তপস্বান বাহুধেবে আপনাদের  
মন একগুণ সমর্পিত হইয়াছে ।

“দিষ্টা পুস্ত্রাণ্ণ পত্নীং দেহান্ বধনান্

ভবনানি চ ।

হিষা বুনীতং যং যুগং কৃষ্ণাখ্যাং পুরুষাং

পরম্ ॥”

ভাগ্যক্রমে আপনারা পুত্র পতিস্বরূপ ও  
সেহ ও পুত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া ঐকৃষ্ণাখ্যা  
পরম পুরুষ তরুকে আশ্রয়সমর্পণ করিয়াছেন ।

“ভবতীনাং বিরোগান্ নাহি সর্জ্যম্ভা

কচিৎ ।

যথা ভূতানি ভূতেষু যং বাহুধিকলৈঃ যদী ।

তথাহি মনঃপ্রাণ বৃদ্ধিঃ প্রাণাধা ॥”

ঐকৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি সকলের আশ্রা

অন্তঃপ্রবেশের সহিত আমার কখনও

কোথাও বিরোগ হইতে পারে না । যেমন

পুংবিদ্য, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চ

মহাকৃত সকল, সমস্ত চরাচরভূতে অবস্থিতি

করিতেছে, সেইরূপ আমি মনঃপ্রাণ বুদ্ধি ও জ্ঞান

সকলের আশ্রয় স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি ।

উৎসব

বৈকুণ্ঠ তরুণের উৎসবীভূত কার্ণা

সকলের অবগতির জন্য বৈকুণ্ঠকবিগণের

গ্রন্থ হইতে নিম্নবিত পংক্তি কয়টা উদ্ধৃত

করিলাম । ইহাতে জানিতে পারিবেন উৎসব

বলিলে কি বৃথা ।

“বিরহই নিধুবনে বৃন্দা কিশোর ।

কান্তরূপে আচ্ছ হইয়াছে বিভোর ।

চুয়া চন্দন তরি পিণ্ডকারি,

ভ্রাম্য নগর অঙ্গে দেওত ভারি ।

ললিতা বিশাখা আসি সখীগণ মিলি,

রাহিক নিয়ড়ে কাণ্ডেলি গেলি ।

স্বপনবী ভ্রান্ত নগর অঙ্গে ।

নগর খেলই রাহিক সঙ্গে ।

বীণা রত্না যুগল পিনাক ।

বিবিধ যন্ত্র লেই করায় বিলাস ।

কৈ কৈ গাহত নব নব তান ।

জান দাস হেরি জুড়ায় পরাণ ।

ঐতগবান জীঘের উদ্ধার হেতু ক্রোড় ও

ক্রেত্রবিদ্য হইয়া অষ্টোত্তরী নানা প্রকটনের

অভিলাস করিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন

আপনা আপনি লীলা প্রকাশিত হইল । ঐরাধাদি

ব্রজদেবীগণের ঐকৃষ্ণ প্রেম স্বাভাবিক ও

নিত্য হইলেও লীলারত্নকে সমুখে প্রস্তুতি

ও মধুর হইতে মধুরতর করিবার জন্য

গোপীদেবের উদ্যম ও প্রয়াস । কৃষ্ণস্তুতি

হেতু কৃষ্ণেশ্বর গোপীর চরম উদ্দেশ্য ।

গোপীনের নিজের কিছুই নাই,—খন ঘন  
আত্মীয় স্বজন, পতি পুত্র, জীবন ধোবন,  
পৃথলসার, মান অপমান, অস্কার ভেজ,  
আভিজাত্য ঘৃণা লক্ষ্য কুল দর্পভক্ত, এমন কি  
প্রাণ পর্যন্ত ঐক্যকে অর্পণ করিয়া তাঁহার  
ঐতিব মত্ত তাঁহার দেখা করিতে পারে  
তবে তাঁহার সব গোলে মিটিয়া গেল। এট  
মহামহিম দৃষ্টান্ত রূপে প্রকাশ করিবার মত  
লীলার অবকাশ। আপন ভুলিগা টেটে  
মিলিত হইবে তবে টেটরূপা চইবে। নচেৎ  
নহে। দুস্থল রাখা যায় না তাই গোপীগণ  
কুল রাখেন নাই। অকুলের কাণ্ডারী  
জামকায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাছ  
আড়ম্বরের চোকায়া গোছে তক্তিতে ভগবৎ  
প্রেম লাভ হয় না।

“দীর্ঘ কোটা লম্বা কোটা কটিক মালা গায়ে।  
মাইরি বলছি তোম মাথা বাই কিছুই

নাইকো তাতে।”

বাত্তবিক বাছ আড়ম্বর হইতে কুক বহু দূরে।  
মন না মন্ডিলে, কালা মজে না, কেবল মালা  
অপ করিলে কুককে ভজা হয় না। মনের গোল-  
মালা কাটা চাই—তবে ঈশ্বররূপা লাভ হয়।  
তাই ভক্ত ভুলনীলাস গাহিয়াছেন,—

“মনকা ফেরৎ হুগ পেয়া,  
না পেয়া মনকা ফের ;  
করকা মনকা ছোড়কে  
মনকা মনকা ফের।”

অর্থাৎ মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে হুগ  
হুগান্তর চলিয়া গেল তবু মনের ফের সেল  
না, তাই বলি মন এখনকার মালা ছেড়ে দিয়া  
মনময় মালা অপ কর। ভাবময় ভগবানকে  
ভাবনা থাকিলে পাওরা যায় না এবং ভাবে  
বতকণ আত্মদমর্পণ করিতে না পারে ততকণ  
সে ভাব লাভের উপায় নাই।

এই যে লীলা—এই যে বেলা—এই যে  
উৎসবানন্দ ইহার চরম শিক্ষা কোথায়  
ইহার চরম উদ্দেশ্য এবং চরম লক্ষ্যই বা কি ?  
ইহার চরম শিক্ষা জীব ও ব্রহ্মের একাত্ম  
সম্মিলন। জীবত্বপন্থী রাখা তাঁহার সবিত্তপন্থী  
বৃত্তিগুলির সহিত ঐক্যময় মিলিত হইয়াছেন  
এবং জীবের নিজের স্বং দিগা অস্তরঙ্গ,  
আকর্ষণ, সেবা প্রভৃতি ইষ্ট বস্তুকে সাজাইয়া  
দিতেছেন। এই ঐক্যের হোল বা বাসন্তী-  
লীলা সবচেহে তক্তভেট রামপ্রসাদ দাটা  
বলিয়াছেন তাহা বলিয়াই অস্তকার মত  
বাসন্তীলীলার উপসংহার করিব।

হৃদকমল-মকে দোলে করাল বনৌ ( জামা )।

মন পবনে ঢুলাইছে দিবস রজনী ( ওমা )।

ইড়া পিকলা নামা লুখয়া মনোরমা।

তার মধ্যে গাঁথা জামা ব্রহ্ম সনাতনী।

আবির কদর তাহ কি শোভা হয়েছে পায়।

কাম আবি মোহ বার হেরিলে অমনি।

যে বেবেছে মাঘের মৌল সে পেয়েছে

পায়ের কোল।

রামপ্রসাদের এই বোল, ভোলমারা বাধী।

রামপ্রসাদ স্ববরা যথোই অনাধত চক্ষে  
ব্রহ্মসনাতনী জামা অন্তরপবনে ধোতলাযতী  
দেখিতেছেন। আর অবে কদরকণী আবির  
এবং সেই আবিরে অগমবা শোভাময়ী  
হইয়াছেন। তক্ত এখানে নিজের স্বং দিয়া  
মাকে সাজাইয়াছেন। তক্তের পাপ প্রবৃত্তি-  
রূপী অহরীভলিকে যা বিনাশ করিয়াছেন  
এবং তাহাদের কবির নিজ অঙ্গে মাখিয়াছেন।  
বস্তুতঃ যা এখন এমন হইয়াছেন যে তাঁহাকে  
দেখিলে কামাদি মোহ বার অর্থাৎ কোন নীচ  
কামনা তিষ্ঠিতে পারে না।

জীবের সাধন পথের কটক বাসনা। সেই  
বাসনা যখন ছুটিয়া যায়, জীব তখন শিব হইয়া

পড়ে। আর তাহাকে জিতাপাশালা সঘ্ন করিতে হয় না। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ মাধের দোল দেখিবার ভলে বলিতেছেন, যে দোল দেখিবাছে সে মাধের কোল পাইবাছে, তাহার আর ভয় ভাবনা কি আছে? খন্ড রামপ্রসাদ

ভূমি যন্ত্র! যন্ত্র তোমার দোল যন্ত্র! দোল-  
লীলার সারতত্ত্ব এক ভূমিই আনিয়াছিলে।  
আন্বির্জাদ কর জীব যেন এই বাসন্তীলীলা  
তরঙ্গে চৈবশক্তি লাভ করে।

ত্রৈলোক্যচর্য্য দেবভক্ত।

## মফঃস্বলের বাণী ।

গোথ্লে কেন অদেশাঙ্গুরাগী  
হইয়াছিলেন

যাহারা অমৃতমির আসল মৃষ্টি দেখে নাই, অমৃতমির নির্মল নীল আকাশ ও অস্ত্রভেদী গিরিশিখরে অনন্তের রূপ দেখে নাই; যাহারা ধরস্রোতা নব নদীতে শত বোকাই তরী জালিয়া বাইতে দেখে নাই বা নাবিকের ডাটি-রাল হরের গান শোনে নাই; যাহারা পল্লীর সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় ক্ষুদ্র গর্ভস্থলীরের গোবর-লেপা অঙ্কন দেখে নাই; যাহারা ধানের খেতে বাহুর খেলা, আম বাগানে ফুলের গন্ধ, লেবু বাগানে ফুলের সৌরভের পরিচয় লাভ করে নাই; যাহারা সন্ধ্যা বেলায় স্বীর্ণনের ধ্বনি, গ্রাম্য নরনারীর আনন্দ ধ্বনি, বৎসের অস্ত্র দাড়ীঘের প্রাপ্তভেদী ডাক জবন করে নাই, তাহারা কখনও অংশে প্রেমিক হইতে পারে না। কোঙ্লাপুর প্রকৃতির কাম্য নিকেতন। ইহার পশ্চিম সীমায় মহাজি পর্বত—মধ্যস্থলে মহাজির সন্নিহিত লম্বভাবে গিরিমালা—পূর্বদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নদী। একদা দেবগিরি বাহবগণ এই স্থানে অবস্থিত করিয়া চতুর্দিকে আপনাদের বিজয়ী সেনানী প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাহুমানি বধশর, মুসলমান নরপতিগণ দ্বাদশদিক

পর্য্যন্ত করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকুলন্তিলক শিবাজী বিজাপুরের মুসলমান নৃপতির হস্ত হইতে কোঙ্লাপুর উদ্ধার করিয়া হিন্দু রাজ্যের বীজ বপন করেন। উদয়েশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সিঁছিয়া হোলকার প্রকৃতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন, কোঙ্লাপুরের রাজা ১৮৩৮ সন পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন।

কোঙ্লাপুর রাজ্যে মহাজিগণের, বিভিন্ন পর্বত শৃঙ্গে পানহালা, বিশালগড়, বডর, কুধরগড়, রহনা প্রকৃতি কত শৈল দুর্গ— ১৮৩৮ সালে ব্রিটিশ সৈন্য দুর্গের কামানগুলি নষ্ট করিয়াছিল—দুর্গে আর কামান নাই, গোলাগুলি নাই, কিন্তু রাজপ্রাসাদ ও সৈন্তা-বাগ সকলই রহিয়াছে। এখনও মহারাষ্ট্রগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে সহস্র ফুট উচ্চ দুর্গ সকলে ঐশকাল বাপন করিবার লজ্জা গমন করেন। দুর্গসমূহ প্রাচীন কালের কত সৌর্য্যসমূহ প্রাচীন কালের কত সৌর্য্যবাপা স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিতেছে।

এমন স্থানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে জন্মগ্রহণ করেন। বাগ্যকালে তিনি জীবী স্থলী হইতে

সম্রাট্রি পরীক্ষামাল্যঃ দেবিস্তেন, পরীক্ষিত পুণ্ডে  
প্রতিষ্ঠিত ভূগ্ন সমুদ্রেত দিকৈ বিম্বধনেত্রে  
চাছিয়া থাকিস্তেন, পিতামহটীর নিকট মহারাষ্ট্রী  
বীরগাথা শ্রবণ করিয়া যন্ত্রণাক্রো প্রবেশ  
করিতেন। কোলোপুর রাজ্যে প্রাচীন কাল  
হইতে অনেক লোহার গনি ছিল, অনেক  
অনেক স্থলে কৃপুণ্টেই লোহা পাওয়া যায়ত ;  
এই লোহার বড় আদর ছিল, কত লোক  
লোহার ব্যবসায় করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল,  
কিন্তু বিদেশ হইতে সম্ভার লোহার আমদানি  
হওয়াতে কোলোপুরের গনির কাজ বন্ধ চটয়া  
যায়। গনিতে প্রচুর লোহা রহিল কেত  
আর তাহা উত্তোলন করিল না। গনিকরগণ  
আরও কত শ্রেণীর লোক পরিত্র হইল।  
বাল্যকালেই গোখলে কোলোপুরের লোকদের  
পরিত্রতার ইতিহাস অবগত হইয়াছিলেন।  
তাঁরা তিনি স্বদেশ প্রেমিক হইয়াছিলেন।

সম্মানবানী।

## ২। হিন্দুর অধিকার

হিন্দু-ধর্মের একটা মূল রহস্য হইতেছে  
অধিকার :—অধিকার-ভেদেই হিন্দুধর্ম।  
হিন্দুর ধর্মঃ রূপে বৃত্তিতে হইলে অগ্রে এই  
অধিকার কথাটিকেই বিশেষ করিয়া বৃত্তিতে  
হইবে। কতকগুলি গোপানের উপর এই  
বিরাট হিন্দু-কৃতির হিন্দুধর্ম অবস্থিত। হিন্দুধর্ম  
এই অধিকার ধর্মঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তথায়  
নানা বিপত্তি ও জাতীয় ধর্মঃের সূত্রপাত  
হইয়াছে। অধিকার চর্চা করিয়াই ভ্রমতে  
আজ বত বৈধম্যের সৃষ্টি। বাহার যে গভী,  
সেই গভীর ভিতর থাকিয়া তাহাকে অগ্রসর  
হইতে হইবে। তাহা না পালন করিলে একটা  
ব্যক্তিগত জীবনেও যে অশান্তি, সামাজিক  
জীবনেও সেই অশান্তি। য য অধিকারকে  
চরিতার্থ করিয়াই প্রত্যেক মানব তাহার

জাতীয় সমষ্টিকে পুষ্ট করিতেছে। দেখানে  
মানব তাহার ধর্মঃ এবং অধিকার হইতে  
ব্যক্তি, দেখানেই মানব আত্মপ্রোত্তী এবং  
সমাজপ্রোত্তী হইয়া পড়ে ;—সেই অধিকার-  
এই ব্যক্তি সমাজ-অধিকার চান করে। বর্তমানে  
এই হিন্দুজাতি চতুর্দিক নিষিদ্ধে অধিকারে  
ছিল, ততদিন ইহার সমাজ-অধ পুষ্ট হইতে  
ছিল। আর যেমনি ইচার মন্তক, হস্ত, পদ,  
উদর স্থানশ্রষ্ট হইয়াছে, অমনি এই হিন্দুধর্মের  
অন্তরে মহা অনর্থের আশ্রয়সিঁড়ি জন্মিয়া  
উঠিয়াছে। সে দিন হইতেই হিন্দুজাতি  
আগার জ্বলের সম্মান জুলিয়াছে—ব্রাহ্মণ  
তাহার আদর্শ চারাইয়া স্বর্ণপর হইয়াছে,  
কাজির তাহার বাহবল হারাওয়া রম্যের অকল  
ধরিয়াছে, বৈজ্ঞ তাহার বাণিজ্য এবং ব্যবসা  
জুলিয়া গমনাগমনের সকল ধারে কন্ড করিয়াছে,  
মুত তাহার দেবাধর্ম জুলিয়া উপরের দিকে  
পদোত্তোলন করিয়াছে। তাহাতে ধর্মঃের  
ধারণ-শক্তি শিথিল হইয়াছে, সমাজ মূল্য  
বিশিষ্ট পুণ্ডের স্তায় করিয়া পড়িয়াছে। অ-  
ধিকারচর্চা হেতু হিন্দু তাহার কাঁধ মিলাইবার  
শক্তি, মালা গাথিবার কোনল, চিরদিনের  
মত হারাওয়া ফেলিয়াছে।

একদিকে আমরা যেমন জাতীয় অধি-  
কারকে পথদলিত করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনি  
মোহাজু হইয়া জাতীয় প্রতিভাকে উত্তিবার  
হবিষা দেই নাই। মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি  
এই অধঃপতিত হিন্দু-ধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া  
অধঃভাবে অগ্রভাবে উৎসাহভাবে আপনার  
ইশ্বর-বশত ধনকে বিকাশ করিতে পারে নাই।  
জাতীয় প্রতিভাকে পদে পদে অবমানিত  
করিয়াই হিন্দুর আজ উত্থান-শক্তি রহিত  
অধঃপতন।

হিন্দুর অধঃপতনের আর একটা কারণ

হইতেছে, যুগধর্মের সঙ্গে যোগ রাখিবার না-  
-ত্ব। অতীতের সঙ্গে সশেষে আবশ্যকতা  
আসে। ধর্মের মানি উপস্থিত হইলেই,  
সমাজ-বক্ষে আত্মজ্ঞান জ্বলিলেই, অবতার  
(super man) আদিয়া সমরোপযোগী  
বিবেকবান্ধী প্রচার করিতে আসেন। পার-  
লৌকিক ধর্ম এক হইলেও ব্যবহারিক ধর্ম  
বিভিন্ন প্রকৃতির। এই অতীত হিন্দুধর্মের  
দুইটা দিক আছে, তন্মধ্যে একটি ব্রাহ্ম-  
জিজ্ঞাসার দিক অপরটি ধর্ম-জিজ্ঞাসার দিক।  
এই শ্রেণীতে দ্বিতীতে ধর্ম বোল আনা  
আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন। ধর্ম না করিলে  
ধর্ম হয় না।

মানব স্বাধীন-চ্যুত হইয়া কণ্ঠ করিলে  
ব্যবহারিক ধর্মে মানি উপস্থিত হয়। অবতার  
সেই মানির প্রতিকার করে ভগবানের অংশ  
বিশেষ হইয়া ধরার পাশ-তার লাঘব করিতে  
আসেন। যখন যে শক্তির প্রাধান্য বা অধর্মিকা  
বৃদ্ধি পায় তখন তাহার ধমন করিতে আসেন  
এবং লাহিত শক্তিগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া  
যান।

ব্রাহ্মণ ধমন সবগুণ হইতে ব্রট হইয়া  
ব্রাহ্মণের বর্ণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে,  
তখন অবতার ব্রাহ্মণের এই ব্যতিকারকে  
ধমন করেন, কজির ধমন দুর্বলকে এবং  
সাধুকে পীড়ন করিতে উদ্যত হন, তখন  
তিনি—

“পরিভ্রাণ্য সাধুনাং বিনাশায় চ ভূকৃত্যাম”  
বলিয়া অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণব ধমন অস্তিত্বোপ্তি  
হইয়া ভগবতের নানারূপ অশান্তি উপস্থিত করে  
তখন তিনি বৈষ্ণবকেও শান্তি বিধান করিতে  
আসেন, নূর ধমন তাহার মার্গ পরিভ্রাণ্য  
করিয়া বিত্রোহের সৃষ্টি করে, তখন অবতার  
অসতে শান্তি ও ধর্ম স্থাপন করিতে আসেন।

যুগে যুগে স্থান কাল পাত্রভেদে অবতারের  
প্রবোধন হয়। তিনি পঞ্চমাত্র মানব  
পঞ্চিকে মার্গ-নির্দেশ করিয়া যেন। ভরত-  
বর্ষে যে সব অবতার ভয়গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন, তাহার বিভিন্ন আবশ্যকতা লইয়া  
আদিয়া ছিলেন। শতর বুদ্ধ চৈতন্য নামক  
কবীর রামকৃষ্ণ সকলেরই আদিবার  
আবশ্যকতা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতন-  
কালে যে মানি উপস্থিত হইয়াছিল, শতর  
তাহা বিভাতিত করিতে আসেন। তন্মধ্যে  
ব্যতিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, চৈতন্যদেব তাহা  
উঠাইতে আদিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে যে  
মানি উপস্থিত হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ  
তাহা সংশোধিত করিতে আদিয়াছিলেন।  
বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যে আদর্শ  
লইয়া এই হিন্দু ধর্মের মৃতপ্রাণ ধমনীতে নব  
সঞ্জীবনী সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন তাহার  
কাণ্ড এখনও অনেকটা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।  
এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শই হিন্দু  
ধর্মের এবং হিন্দু জাতির পুনরুত্থান ঘটাইবে।  
ব্রাহ্মধর্ম প্রকৃতি কতকগুলি সম সাময়িক  
উপধর্ম এই চরমধর্মসীল হিন্দু ধর্মের কোনরূপ  
হানি করিতে সমর্থ হইবে না—বরং এই  
ভোগমূলক ব্রাহ্মধর্ম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ  
প্রণোদিত উদার স্বভাব হিন্দু ধর্মের আলয়ে  
আগিয়া শান্তভাবে ধারণ করিবে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ  
করিতে হইলেই হিন্দুধর্মকে বর্তমান সর্বা-  
গ্রাণ্য ভ্রাণ্য করিয়া উদারস্বভাব হইতে  
হইবেই। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটবে সেই-  
দিন, বেদিন ব্রহ্মপণের সর্বাঙ্গতা ও গোঁড়ামির  
মূলক্ষেপ ঘটবে, বেদিন আমাদের উদীয়মান  
যুবকগণ হিন্দুধর্মের ধর্মার্থ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া  
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উদার আদর্শে য য



জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিবে। যে দিন হিন্দু আপন অধিকার বুঝিয়া লইয়া বর্ণাধিকারে প্রস্তুত হইবে। যে দিন হিন্দু বুঝিবে "ভারত কণ্ঠকুমিত অস্ত্রেতু ভোগচুময়!" সেদিন হইতে আবার ভারতে ভ্রাতৃপের মহা পাপিয়া উঠিবে—সে দিন হইতে ভারতের অমনেকা অবাধ্য হিন্দু সম্মান মনপ্রাপ এক করিবে! সমাজনী ধর্মজননীকে অপরাধের উপবন্ধের হস্ত হইতে মেঘদূক্ত শরীর হ্রাস উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

তাই বলি, তাই হিন্দু, তোমার স্বরূপ, তোমার অধিকার, তোমার প্রতিভা, তুমি কি ছিল, কি হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা কর। তুমি আত্মবিশ্বস্ত হইয়া আর বুধা কাল কাটাও না। যে হিন্দু, তুমি যে এই ব্রহ্ম-বর্ষের লগ্নে—ব্রহ্মবাদী কবিগণ যে তোমার পূর্ণপুঙ্খ, তোমাদিগের চতুর্কর্ণের ভিতর যে আত্মপের শুভ সবণ ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত তাহা একবার ধারণা কর। তাব তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুমি যে মোকাদিলাবী মহা ব্রাহ্মণ। The great pride of man in himself! তুমি যে নিম্নেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়াই আত্ম চতুর্কর্ণ বিক্লিপেবে নানের জাতি পূত্র হইয়া পড়িয়াছ। স্বকর্ণজনিত এই গভীর দুর্দণার লগ্ন অহুতাগ কর এবং বল ওই তেজস্বী বিবেকানন্দের সঙ্গে কঠ মিশাইয়া—ভারতের আচণ্ডাল সমস্ত ব্রাহ্মণ করিতে হইবে।

২৪ পরগণা বার্তাবহ ।

৩। সারা-সেতুর উদ্বোধন

বিগত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আট ঘটিকার সময় সারা-সেতুর উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হয়। ভারতের ব্রাহ্মপ্রতিনিধি লর্ড হার্ভিও এই শুভকার্যের সমাধা করেন।

গত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই সেতু

নিৰ্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল। পূর্বে সেতু নিৰ্মাণের প্রস্তাব অঙ্কমোদিত হয়, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে সেতুর নিৰ্মাণকার্য আরম্ভ হয়, পরে ১৯১৫ সালের ৪ঠা মার্চ প্রাতঃকালে লর্ড হার্ভিও ইহার উদ্বোধন করেন। অতঃপর এই সেতু "হার্ভি ব্রিজ" নামে অভিহিত হইবে।

সারা-সেতুর উদ্বোধন উৎসবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে উৎসব ক্ষেত্রে আনয়ন করিবার লগ্ন পূর্ণবয়স রেলওয়ে কোম্পানী ও বানি মেনশ্যাল ট্রেন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রথমগানি লর্ড হার্ভিকে মিট্রী হইতে আনয়ন করে, দ্বিতীয় থানিতে লর্ড কার-মাইকেল আগমন করেন এবং অবশিষ্ট দুই থানি কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বহন করিয়া আনে।

উদ্বোধন-উৎসব ক্ষেত্রে প্রায় ৪০০ সন্ত্রাস্ত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে লর্ড হার্ভিও লর্ড ও লেডী কারমাইকেল, কলিকাতার বিশপ, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ, দিনাজপুরের মহারাজ, ত্রর আর, এন্‌ মার্জি, ত্রর বে, এন্‌, জুবলে, ত্রর ড্যালেস্টাইন চিরোল, অনারবল ডায়মণ্ড হার্ভিও প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে সারা-সেতুর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিট্রর আর, আর, গোল্ড রামপ্রতিনিধি লর্ড হার্ভিওকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। অভিনন্দন পত্রের মূল মর্ম এই:—উত্তর বঙ্গে প্রকৃত পরিমাণে পাট ও চা উৎপন্ন হয়। এত সকল ব্রব্য কলিকাতার বিক্রয়্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষেই এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বাহাতে উক্ত বস্তু হইতে কলিকাতার মালপত্র প্রেরিত হইতে পারে, ব্যবসায়িগণ

ভাঙ্গার মস্ত উষ্ণ হন পদ্মার উভয়তটে  
বেলওয়ে কোম্পানী মালপত্র বহনের মস্ত  
ট্রেনের ব্যবস্থা করিলেও উত্তর বন্ধ হইতে  
কলিকাতায় মালপত্র পাঠাইতে অনেক সমস্যা  
বাহিত এবং ব্যবসায়েরও ক্ষতি হইত।  
ব্যবসায়ের এই ক্ষতি নিবারণের মস্তই সেতু  
নিৰ্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়।

অবশেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টীয়ার্ণ বেল  
রেলওয়ে কোম্পানী এই সেতু নিৰ্মাণের  
প্রস্তাব করেন। সেই সময়ে পদ্মার উপর  
সেতু নির্মিত হইতে পারিবে কি না, তৎ-  
সময়ে অধ্যয়ন করিবার মস্ত যে সকল  
ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন,—ভাঁহারা বলেন,  
পদ্মার উপর সেতু নিৰ্মাণ অসম্ভব নহে।

ইহার পর সেতু নিৰ্মাণের স্থান লইয়া তর্ক  
বিতর্ক আরম্ভ হয়। মিঃ জি, মইলী; স্তর  
ক্লেভারিক ডুমোয়েন; অনারেবল মিটার  
ইন্সলি; মিটার সাধারণ কর; মিটার নর্থাণ  
ম্যাকলিওড; এবং মেজর শেলীকে লইয়া যে  
কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি রাইত। নামক  
স্থান সেতু নিৰ্মাণের উপযোগী বলিয়া নির্দেশ  
করেন।

১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়টির বিচারভার  
আর একটা নতুন কমিটির হস্তে সমর্পিত হয়।  
ভাঁহারা বিচার করিয়া নির্ধারণ করেন যে  
পারাতোই সেতু নিৰ্মাণ হইতে পারে এবং  
তাহাতে বিপদের আশঙ্কা নাই।

তখন হইতেই সারা সেতু নিৰ্মাণের  
আবশ্যকতা পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি হয়। ১২  
বৎসর পূর্বে যে প্রস্তাবের উত্থাপন হয়,  
আই বৎসর ভারত পতিব তাহার অঙ্গমোদন  
করেন এবং এই বৎসরই সেতুর নিৰ্মাণ কার্য  
আরম্ভ হয়।

সেতু নিৰ্মাণের মস্ত এই স্থানটি নির্ধারিত

৫ইয়াছিল বলিয়া বাঘের মাজা পূর্বে দেখণ  
হইবে যেন করাগিবাছিল তদনুসারে। কম  
হইয়াছে।

সেতু নিৰ্মাণে মোট ৩২২ লক্ষ টাকা খরচ  
হইয়াছে।—১০৮ লক্ষ টাকা ট্রেন যাতায়াতের  
মস্ত ৭৬ লক্ষ টাকা 'এপ্রোচেট' মস্ত এবং  
২১৫ লক্ষ টাকা 'নিউক' সেতুর কার্যেই  
ব্যয়িত হইয়াছে। অবশ্য প্রাক্ট প্রকৃতির  
খরচা ইহার সহিত ধরা হয় নাই।

সেতুর উপর 'ডবল' রেল লাইন স্থাপিত  
এবং লোক চলচলের লক্ষও নির্মিত হইয়াছে।  
জোয়ারের সময়ে পদ্মার জল যতদূর উঠে  
হয়, তথা হইতে সেতুর তলদেশ পর্যন্ত জিয়ার  
যাতায়াতের মস্ত ৪০ ফিটের ব্যবধান স্থাপিত  
হইয়াছে।

১২০২—১২১০ খ্রীষ্টাব্দে সেতু নিৰ্মাণের  
মস্ত পরিপ, স্থান নির্ধারণ, জমি গ্রহণ, প্রকল্প-  
খণ্ড সংগ্রহ, 'পাভিস-লাইন' স্থাপন, লৌহরেল,  
কাঠের 'জিয়ার' প্রাক্ট প্রকৃতি জর, কন্সট্রাক-  
শনের মস্ত আবাসস্থান নিৰ্মাণ, জলসর-  
বরাহের ব্যবস্থা, ইলপাতাল স্থাপন, ইলেক-  
ট্রিক পাওয়ার হাউস, কারখানা ও গুদামনিৰ্মাণ  
প্রকৃতি কার্য হয়। ১২১০—১২১১ খ্রীষ্টাব্দে  
নদীর দক্ষিণ ও বাম কুলের তীর সাধন কার্য  
চলিতে থাকে; দুইবার পর পর স্তম্ভিকা খনন  
ও উত্তোলনকারী লম্বাঝীলিগের মধ্যে ওলা-  
উঠা রোগের প্রকৃতিই হেতু তীর বাধাই বন্ধ  
হইয়া যায়। ১২১১-১২১২ খ্রীষ্টাব্দে তীরের  
বাধাই কার্য শেষ হয়।

অতঃপর মিটার গোলপ সেতু নিৰ্মাণ  
কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের কার্যক্ষমতা ও  
কর্মীরা মিটার প্রকৃত প্রদর্শনা করিয়া রাজ-  
প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঙ্কে সেতুর উদ্বোধন  
করিতে অঙ্গমোদন করেন।

অভঃপর রাজপ্রতিনিধি লর্ড হাভিঞ্জ বক্তৃতা করেন।

ইহার সাক্ষিগু মর্থ এই—উত্তর বঙ্গ ও কলিকাতা বন্দরের মধ্যে অল্প সময়ে পণ্য উৎসার বহনের অল্প এই সেতু নির্মিত হইয়াছে। এক্ষণে যে চারি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। গত ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নলিখিত পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়। সেই সময় হইতে উত্তরবঙ্গে বাণিজ্য ও রেলপথের উন্নতির দৃষ্ট্যন। বহু এবং ক্ষুদ্রসত্তিতে স্তম্ভি পাইতে থাকে। এক্ষণে প্রাধান্যতঃ পাট ও চা বহনে এই সেতু একমাত্র সাহায্য হইবে। এই সেতু দ্বারা আসাম ও পূর্ববঙ্গে রেলপথ বিস্তৃত হইবে। শুধু তাহাই নহে, সেতুর উপর দিয়া যে রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে, অনতিদূর ভবিষ্যতে তাহাই বিস্তৃত হইয়া ভারতের সহিত অন্ধদেশের সংযোগ সাধন করিবে।

পাকদি ইতিপূর্বে অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, এক্ষণে এই সেতু নির্মাণ হেতু ইহা স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। মিটার গোলস এই সেতুর সহিত আমার নাম সংশ্লিষ্ট রাখিতে এবং ইহার উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করিতে অহুমোহন করিয়াছেন। আমি এই সেতুর সহিত আমার নাম সানন্দে সংশ্লিষ্ট রাখিতে অহুমতি দিতেছি। পতর্পমেন্টের প্রধান রেলওয়ে পরিদর্শকগণ ও রেলওয়ে বোর্ড এই সেতুর নির্মাণ কার্যের অহুমোহন করিয়াছেন। এই সেতুর উপর দিয়া সকল ট্রেন দ্রুতগতি করিতে পারিবে, সাধারণের ইহাতে কোন বিপদ হইবে না, তাহার ইহাও বলিয়াছেন। ইহাদের অহুমোহন ক্রমে আমি আনন্দের সহিত “হাভিঞ্জ ব্রিজ”

সকল প্রকার “রেলওয়ে ট্রাকিকের” অল্প উদ্বুদ্ধ করিলাম।

ইহার পর কলিকাতার লর্ড বিশপ সেতুর প্রায়বের অল্প এক ন্যস্তিবাধ প্রার্থনা করিয়া অপর্যায়ের আশীর্বাদ প্রিত্ব্য করিলেন।

বাস্তানী।

### ৪। ধর্ম্মের সংসার

হিন্দুর সংসার—ধর্ম্মের সংসার। হিন্দুর সংসার—হিন্দুর বিপ বিস্তার। বিস্তারসে বসিয়া পুস্তক পড়িয়া যে বিস্তারিত হয়, আগে হিন্দুরা তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিতেন না। সংসারের শিক্ষা—ধর্ম্ম মূলক শিক্ষা—তাহাই সেকালের হিন্দুর শিক্ষা ছিল। সংসার হিন্দুর শিক্ষা মন্দির, এ মন্দির পড়িয়া তুলিয়া-ছিলেন—বাস্য, বাস্মিকী প্রভৃতি মহর্ষিগণ। ধর্ম্ম পরিবর্তনের উপর শিক্ষার ভার ছিল বলিয়াই—হিন্দুর কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

হিন্দুর শৈশব অন্ধচর্য্যের অহুমোহনে নিব-  
মিত; শৈশবে সংসার শিখিয়া হিন্দুর সংসার-  
জ্ঞানে প্রবেশ। পাছে সংসার হিন্দু হুবককে  
বিপদগ্রামী করে, পাছে—বৌবনের দৃষ্ট  
উত্তেজনার সংসার পাপ পড়িল হইয়া উঠে,  
পাছে—অন্ধচর্য্য আশ্রমের অন্ধচর্য্যী সংসার  
আশ্রমে আসিয়া মায়াব আবদ্ধ হইয়া লক্ষ্যহীন  
হন,—হিন্দুর শিক্ষক গুরু ব্রাহ্মণ—তাহার  
প্রতিকারে মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন।  
হিন্দু সংসারের একদিকে বৌবনোদগু ভোগ  
লালসা, অপরদিকে সন্তুষ্টি ও ন্যস্তি পিপাসা,—  
হিন্দুর কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাই কর্ম্মক্ষেত্রের মহা-  
সমস্যা। এই বোর হুঙ্কে—হিন্দুর পথ প্রদর্শক  
গুরু ও পুরোহিত রূপী—সারথী নারায়ণ।

হিন্দুর ধর্ম্ম—অন্ধচর্য্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের  
জন্ত—বেদ, ধর্ম্ম উপনিষদ রাখিয়াছেন, কিন্তু

সংসারীর ভক্ত কি কিছুই রাখেন নাই ? কে বলিল রাখেন নাই ? সংসারীর ভক্ত তাঁহারা বাহ্য রাখিয়াছেন—সে মিনিব বড় পবিত্র, সে অমূল্য মিনিবের নাম “ভক্তি বিদ্যা”। এই ভক্তিই হিন্দুর সংসারকে ধর্মের সংসার করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দুর সংসারে—যে দিকেই যাও—কেবল এই ভক্তিরই লীলা। হিন্দুর অতিথি ভক্তি, দেব ভক্তি, গুরু ভক্তি, পিতৃ মাতৃ ভক্তি, রাগভক্তি—হিন্দু সংসারকে আদর্শ করিয়াছে। এই ভক্তিই আবার—স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, মাধুর্য, নানা মূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হিন্দুর সংসার—ধর্মের সংসার, হিন্দুর পূজাপার্কণ, শান্তি বতায়ন ব্যারমন্ত—সবতাতেই—ধর্মের বন্দন, ধর্মের শিক্ষা। হিন্দুর রোগে, শোকে, ঐশ্বর্যে, বিপদে, জন্মে, আগতে, গুণে সুখে—সর্বত্রই ভক্তির বিকাশ! হিন্দুর প্রারম্ভে, সাধ্য,

অন্তে—সাম্বিক অস্থান! হিন্দুর গৃহধাম, দেবধিকারে পূর্ণ। হিন্দুর চাতিদিকেই হেবতা। হিন্দুর সমার গড়িয়াছেন—জ্ঞান, আচার গড়িয়াছেন—পুত্রোহিত, পরিবার গড়িয়াছেন—কবি। ইচ্ছাধ অনিচ্ছাধ—আটপনব আবৃত্তা হিন্দু ধর্ম শিকাই করিয়া আসিতেছে।

যদি তুমি হিন্দু হও—তবে এ ধর্মের সংসার—কবি রচিত আশ্রম—ভাদিও না। ভক্তি পথে চলিয়া—একবার হিন্দু-সংসারে মূর্তিপাত কর,—ধর্ম শিকার ভিতরেই তুমি—বিজ্ঞান, মন্তের বিকাশ দেখিতে পাইবে। তুমি বাহ্যকে কুসংসার বল,—ভাষা হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-তত্ত্ব আবিস্কৃত হইলেক। তাই কবি বলিয়াছেন—

“হই বেন” আমি হই গো হিন্দু।”

“চুঁচুড়া বার্তাবহ।”